

বঙ্গলক্ষ্মী

বর্ষসূচী

16

পঞ্চবিংশ বর্ষ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৬—কার্তিক ১৩৫৭

অ	শ্রীচিত্রিতা দেবী—কুমার সম্ভবম্ প্রথম সর্গ—	৭৩
নারায়ণ শক্তি—	আশা—	২৩৮
—পুস্তক পরিচয়—	কনে দেখা—	৩৬৩
গজদন্ত—	ছ	
বি তরু দত্ত ও ইন্দু-ভারতীয় সাহিত্য	শ্রীছন্দা ভাটুড়ী—রামায়ণ—	২৩২
চট্টোপাধ্যায়—ভূমিত এলে না ঘরে—	জ	
ভুলের ফসল—	শ্রীজয়দেব রায়—রবীন্দ্রনাথের গানের রূপ—	২০৬
স্বাকার—এপার ও ওপার—	কাল যুগয়া—	২৭২
মূর্গা দেবী—মৃত্যুঞ্জয়ী	বালিকী-প্রতিভা—	৩০৬
পলাভক	শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ—উদ্বাস্ত সমস্তা ও	
আ	পশ্চিমবঙ্গ সরকার—	২৮
রতি দত্ত—চয়ন—	আজিকার কলিকাতা—	১২০
তৃতীয়-শ্রেণী—	তাকে যেমন দেখেছি—	২৪৪
যে ফুল না ফুটিতে—	টা পাটি—	৩২২
শিক্ষা দিবস নানা ধারা—	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—পঞ্চানন-নিয়োগী মহাশয়—	২৪৮
পাথাস্ত গির—খাদ্য ও পুষ্টি—	চিত্রশিল্পী: ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—	৩৬২
লি সরকার—চিরকল্যাণময়ী ভূমি ধন—	পরলোকে বিভূতিভূষণ	৪২০
ই	মহিলা সমাচার—	২২,
রা দেবী চৌধুরাণী—কোন নবদম্পতির প্রতি—	৬১, ৬১, ২২, ১৬৩, ১৮২, ২২৩, ২৫৬, ৩০২,	
চট্টোপাধ্যায়—বই পড়া	৩৩২, ৩৮৮	
উ	শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামপ্রসাদ প্রসঙ্গ—	৩১৮
না দেবী—দিদির ব্যাথা	ড	
ক	ডরোথি কেনিয়ন—স্ত্রীস্বাধীনতা ও	
লিদাসনাং—জ্যোষ্ঠ সন্তান—	নারায়ণ সমানধিকার—	২১
র শ্রীকালিদাস রায়—রমণী (কবিতা)	ড	
বৌদ্ধি—	ডাঃ তমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত—প্রাচীনকালের	
তোমার পূজা—	বঙ্গলক্ষ্মীগণের শিক্ষা—	১৬
গী চট্টোপাধ্যায়—কেরিওয়াল	দ	
মা—	শ্রীদীপ্ত দেবী—পান্না কুমারী—	৭২
গী মুখোপাধ্যায়—অজন্তা ইলোরা—	ফুল ফুটবে—	২৭৭, ৩১২, ৩৭১
ঘোষ দস্তিদার—রামায়ণ	স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	৩৭৫
রঞ্জন মল্লিক—বাঙালী ছেলে, বাঙালী মেয়ে—	ধ	
দুহুতি	শ্রীশ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া—জৈতবন—	৪
গ	ন	
মেয়েদের কলেজ—	শ্রীনির্মল কুমার চক্রবর্তী—	
চ	বাঙলা দেশে নারী আন্দোলনের গতি—	১০০
প্ত—ভেজাল	শ্রীনীলাঞ্জনা দেবী—	১২৫

নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়—

বিদেশিনী—২৫, ১৩২, ১৮৬, ২২১, ৩৩১, ৪২৩

প

শ্রীপদ্মিনী সেনগুপ্তা—

সমাজসেবা—অনুবাদক শ্রীজিতেন্দ্রলাল ঘোষ— ৯২

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার কবিত্রী—

আবোল তাবোল (কবিতা)— ৩

কবি প্রণাম— ১৭৮ বাদল দিনে— ২৭১

শ্রীপুষ্প দেবী—ভূভাগা— ৫৮

আমার মোনা মামা— ১১৮ আনারকলি—২৮৯

ভোরের স্বপন— ১৮৩ সমাদর বিলাট—২১৫

দীনবন্ধু এণ্ডরজের মহাপ্রয়াণে ৩৬৮

শ্রীপারুল রাণী ঘোষ—টোটকা চিকিৎসা— ১৯৪, ৩০৩

ফ

শ্রীফুল্লরা রায়—দুঃখী— ৯

বিলাতের স্কুলে কয়েকদিন— ১৪২ ছবি—৩২৮

ব

জনাব বন্দে অলী মিঞা—মানুষের অধিকার— ২৩৭

নীলকণ্ঠ (কবিতা)— ৩৭৭

শ্রীবাণী দাস—অন্ধের শিক্ষা— ৬৯

রাজ সম্মান—২০৮ ছোট দিয়াপলাই ওয়ালী—৩৮৫

শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়—

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে— ১৩৮

বাংলার বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা— ৩২৪,

শ্রীবীরেন্দ্র দাস—যা ছিল মোদের (কবিতা)— ৩৫১

শ্রীবিমলচন্দ্র সেন—শিক্ষার গতি ৪০

ম

শ্রীমোজ বসু—সংস্কৃতির সঙ্কট— ১২৭

শ্রীমণি ভট্টাচার্য—কুকী— ৩৮৭

শ্রীমৌর্য মৈত্র—একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা— ২৬৪

আমের আইসক্রীম— ৩০৩

ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু—গ্রাম পুনর্গঠন ও

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ৮৫

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী—স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে— ১৬৯

সরলা দেবী— ৩৫৮

শ্রীমহুয়া গোস্বামী—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য— ৩৪২

ষ

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—প্রদীপের কোলে অন্ধকার— ৩৮

স্বাধীনতার দান—২৪৪, ২৬৭, ৩৫৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার—দাহুবাণী— ১৫৮, ৪০১

র

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়—রাগাধর— ৩১, ১৩৪

সাধারণ বিলাত চা ও খাবার— ৬৩

তরকারীর ক্যাঃ

ল

শ্রীলীলা মজুমদার—মাতৃশিক্ষা—

বয়স্কের শিক্ষা—

শ

শ্রীশান্তা দেবী—মানুষের ধর্ম—

পুস্তক পরিচয়—

নারী প্রগতি—

ট্রামে বাসে—

বেথুন বিদ্যালয়—

দোল পূর্ণিমা—

সংসারের আদর্শ—

শিক্ষা জীবন যাত্রার সহায়—

গ্রন্থ সমালোচনা—

জর্জ বার্নার্ড শ'

শ্রীশান্তিশ্রী নাগ—আমার জীবনের অলৌকিক ঘটনা—

নাস' ডেভিস—

স

স্বর্গীয়া সরোজ নলিনী দত্ত—ভারের হইতে কয়েক প

সরোজ নলিনী ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ—

শ্রীস্বজাতা রায়—বাল শিক্ষা—

শিশু শিক্ষা—

কিশোর শিক্ষা—

বাল শিক্ষা—

শ্রীস্বমিতা দত্ত—পথের কথা—

ডাকাত—

তিস্থথরঞ্জন মৈত্র—অকাল বর্ষা

শ্রীস্বধাকান্ত দে—

কুস্তা— ২২৪ স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্কর

স্বদেশ ও বিদেশ—৩৩, ৬৭, ৯

১৯৫, ২২৬, ২৫৯, ২৯৭, ৩৩৫, ৩

সরোজ নলিনী নারীমন্ডল সমিতি—২২, ৬৬, ১

১৬৮, ১৯৯, ২২৬, ২৫৭, ৩৪৪,

হ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর—সঙ্গীতবী (কবিতা)—

রজত সিংহাসন—৭৮ যুগান্তর (কবিতা)

বাস্তবহারা—

শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায়—আশীষ—

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়—নৃত্যকলা—

ক্ষ

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা—শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী—

দুর্গাপূজা ও নবপত্রিকার বৈশিষ্ট্য—৩৯ প্রিয়তম

মিউচুয়েল লাইফ

এস্যুরেন্স লিমিটেড।

স্থাপিত—সন ১৮৭১ সাল।

ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম

জীবন-বীমা কোম্পানী।

স্বার্থ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

পলিসি হোল্ডারদের সেবায়—

১৯ বৎসর যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।

ভীষণতার জন্য সত্বর লিখুন—

হেড অফিস:

১৯ মিউচুয়েল বিল্ডিং

হর্নবাই রোড, ফোর্ট, বোম্বে।

বিজ্ঞাপনের হার

পূর্ণ	পৃষ্ঠা	এক মাসের
		জন্ম.....৪০/-
২	" "	২১/-
৪	" "	১২/-

বিজ্ঞাপনের জন্ম বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, তিন মাসের
বিজ্ঞাপন নেও। হয় না। বিস্তারিত জানিবার
জন্য লিখুন।

ম্যানেজার—

বঙ্গলক্ষ্মী

২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড,

কলিকাতা—১২

কম্প্রাই চাই.

উপযুক্ত বেতন ও এলাউন্স অথবা উচ্চ
কমিশনে আমেরিকান ফাউন্টেন পেন ও
সুইস ঘড়ি (Swiss watches 1950
model) বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট
চাই। নমুনা ও সর্ভাদির জন্য (ইংরাজীতে)
লিখুন :—

BANSAL BROTHERS

Kothi Meme, Delhi—6.

গৃহস্থালীর পক্ষে অপরিহার্য

ডিসিল্টার—ডিসিল্টার দিয়ে গঙ্গা জল
(DESILTE) পরিস্কার করে নিয়ে জলকষ্ট
থেকে বাঁচুন। কর্পোরেশনের
অনুমোদন সংগ্রহের দায়িত্ব
আমাদের।

ইলেকট্রিক পাম্প—আমরা পাম্প অতি
(ELECTIC PUMP) সুলভে মাসিক
ভাড়া দিয়ে থাকি।

বিঃ সং—ডিনমস্ট্রেশান করিয়া দেখান, হয়।

অনুমোদন করণ—

বি. পি. রায়

৪৩ নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

১,০০০, হাজার টাকা পুরস্কার

অমৃতসহরে মাত্র ২১০ টাকা সোণার ভরি।

ধরশালার বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী এল. মুরিয়ার লিখিয়াছেন :—“১৩ ভরির আমেরিকান নিউগোল্ডের পাইল্যাম, আপনাদের প্রেরিত সোণা ও খাঁটি সোণার ভিতরে কোনপ্রকার পার্থক্যই নাই দেখিয়া বিশেষ প্রীত হই এই নিউগোল্ড প্রস্তুত করিয়া আপনারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ১২ ভরি সোণা ফেরৎ ডাকে পাঠাইবেন। আরও অর্ডার পাঠাইতেছি” এই চিঠি যিনি জাল প্রমাণ করিতে পারিতাহাকে উপরোক্ত নগদ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমাদের নিউগোল্ড কন্টিপাথরের উপর খাঁটি সোণার মতই দাগ কাটে, খাঁটি সোণার তায়ই ই গাথান যাইতে পারে। সকল প্রকার অলঙ্কারই এই নিউ গোল্ড দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে। এমন কি অতি স্বর্ণকারও এই নিউগোল্ড ও খাঁটি সোণার মধ্যে কোন পার্থক্য ধরিতে পারবেন না। বাজারে প্রচার কাল নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হইতেছে।

১ তোলা ২১০ টাকা। ৩ তোলা ৭১। ৬ তোলা ১৩১। ১৫ তোলা ৩০১ এবং ৪০ তোলা ৭০১।

৩ ভরি অর্ডারে ২টি বোম্বাই ফ্যাসানের আংটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৬ ভরির অর্ডারে ২টি ফ্যাসানের আংটি, একটা ইয়ারিং, এবং ২ গাছা বালা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ১৫ ভরির অর্ডারে ২টি ফ্যাসানের আংটি, ২ জোরা ইয়ারিং, এবং লকেট সহ একটি চেইন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৪০ ভরির অর্ডারে বোম্বাই ফ্যাসানের আংটি, ৪টি বালা এবং লকেট সমেত একটি চেইন বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

মাত্র কয়েকদিনের জন্ত এই স্বযোগ পাইতেছেন, আজই অর্ডার দিন। ডাক ব্যয় ও প্যাকিং খরচ অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

New Gold Supply Coy. (B.L.C.) P30208
Post Box 86. Amritsar.

বিনামূল্যে



আমাদের ব্লেক হেয়ার অয়েল নং ৫০১ (রেজিষ্টার্ড) ব্যবহার করিলে চুল মসৃণ ও কালো হয় এবং চিরকালই কালো রহিবে। ইহা চুল উঠা নিবারণ করে, চুল দীর্ঘ ও কৌকড়ান হয়। প্রতি বোতলের দাম ২০। তিন বোতল (এক সাথে লইলে) ৫৬।০।

এই আশ্চর্য্য তৈলটি প্রচার করিবার জন্ত ১ বোতল তৈল ক্রেতাকে ১৫ বৎসরের চুক্তি দিয়া একটি হাত ঘড়ী ও একটি আংটি (নিউগোল্ড) বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। তিন বোতল এক সাথে লইলে ৪টা হাত ঘড়ী আর ৪টা আংটি বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

Add :—Sanyasi Ayurvedic
Pharmacy (B. L. C.)
P. B. 95. Amritsar.

আপনি কি চান

১০০০ টাকা পুরস্কার!

যখন আপনি সঙ্কট অবস্থায় পড়বেন মন খারাপ তখনই একটা ম্যাজিক আংটি চাহিয়া পাঠান ব্যবহারে পরীক্ষায়, মামলা-মোকদ্দমা, মারামারি কৃতকার্য হইবেন। আপনার হারাণ জিনিষ, মূল স্বজন এবং জয়ী ভালবাসা সম্বন্ধে জানতে পারেন ১টা ৫০ আনা, ৩টা ২০। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

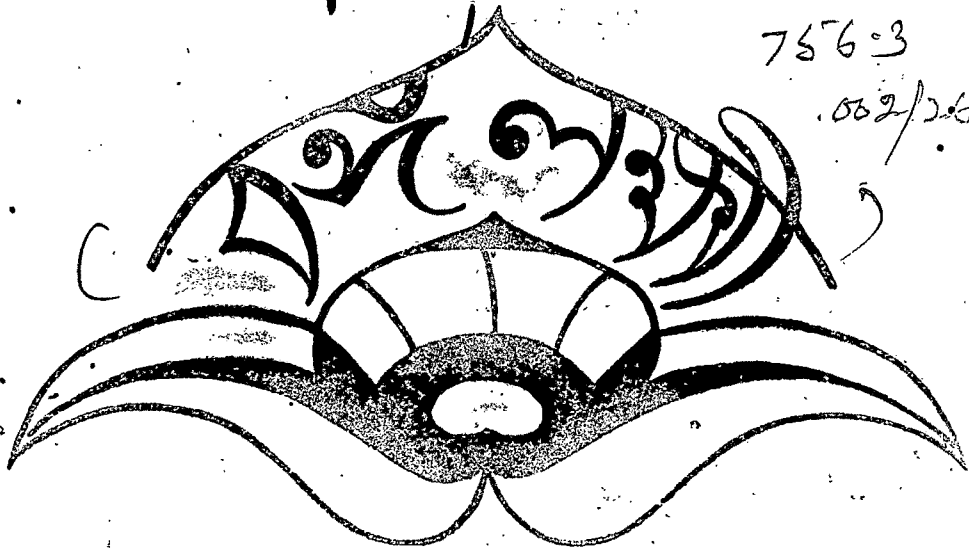
Sree Mahamuni Jyotish Ashram (B. L. C.)
Azad Nagar, Amritsar.

অভিনব পুস্তক

স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য এই অভিনব পুস্তক পাঠ করি জয়ী এবং স্বথ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত শতবর্ষব্যাপী উপায় অবগত হউন।

হিন্দী ভাষা মাত্র তিনদিনে শিক্ষা করি “হিন্দী-শিক্ষক” পুস্তক আজই চাহিয়া পাঠান।

India Book Depot. (B. L. C.)
Azadnagar. (Amritsar)



756-3

. 562/16

২৫শ বর্ষ

অগ্রহায়ণ-১৩৫৬

১ম সংখ্যা

মানুষের ধর্ম শ্রীশান্তাদেবী

16

মানা মানুষ নানা ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিল; হিন্দু
ন খৃষ্টান ধর্মের কত মতবাদ। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সকল
বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীতে তাই লইয়া কত সারামারি
টি হইয়া গিয়াছে, এবং আরও কত হইতেছে আমাদের
শ। মৃত্যু বলিতে গেলে শুধু ধর্মের নামেই আমাদের
দেশকে কাটিয়া ছুটুকরা করিয়া ফেলা হইল।
ক দেশ হইতে আর এক দেশের, দুই রেলগাড়ী
এরোপ্পনের সাহায্যে যতই কমিয়া আসিতেছে ততই
পরের কাছে আসিয়া কি দেখিতেছ না যে সত্যকার
ধর্ম অর্থাৎ লোকনীতি সর্বত্রই এক হইয়া আসিতেছে?
বলে যারা পৃথিবীটাকে জয় করিয়াছে ব্যবহারিক
রীতির সব যুক্তাবাদী মানুষই ক্রমে তাহাদের আধুনিক
দিতেছে। খৃষ্টান ও মুসলমানের ধর্ম পরধর্মকে
লায়, তাহাদের জাত যায় না; কিন্তু আমাদের
আপনার করিয়া লয় না, আপনজনের ক্রটি
তাকে ত্যাগ করে। সুতরাং আমাদেরও
হইয়াছে সেইটাই বেশী দেখা দরকার।

অন্ত দেশের মত এ দেশেও সংস্কারকরাই ইহার গোড়া পত্তন
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানই ইহাকে অগ্রসর করিয়া লইয়া
যাইতেছে। মানুষ পরস্পরের যত কাছে আসিতেছে
ততই বুঝিতে পারিতেছে সব মানুষই কতখানি এক জাতের।
সুতরাং যে নীতিতাদের ধারণ করিয়া আছে সেই নীতিকে
যদি ধর্ম বলা হয়, তবে তাও পৃথিবীতে সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক
হইয়া আসিতেছে দেখি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যদিও খণ্ডিত ভারতের
স্বাধীনতা এবং যদিও আমরা এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
ছায়ায় আশ্রয় খুঁজিতেছি, তবু আজ ভারতবাসী বিশ্বের
দরবারে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা দেখাইতেছে।
আজ প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা রথী মহারথী
পদাতিক পর্যন্ত পশ্চিম দেশে গিয়া বড় গলায় ভারতের
বাণী বলিতেছেন। ভারতবর্ষের কাগজে যদিও আমরা খুব
গর্বের সহিত রাজাজী কালীবাড়ীতে কি করিলেন এবং ডাঃ
কাটজ পূজামণ্ডলে কি করিলেন তাহা ছাপি, কিন্তু পশ্চিমে
যখন আমরা ভারতের বাণী বলি তখন কোন বিশেষ পূজা

মণ্ডপের গম্বুজ কাটিয়া ভারতকে দেখাইনা। তখন পশ্চিমের যে একমাত্র ভগবান মানবজাতির পিতা, ভারতেরও সেই ভগবানই মানবজাতির পিতা। তখন হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র এসকল কথা আমরা তুলিয়া বাই। আমরা তখন বিশ্ব মানবের কল্যাণের কথাই বড় করিয়া বলি। তখন আমরা পশ্চিম যেখানে সাদা কালোর ভেদ দেখাইয়া মানব ধর্মের অপমান করিয়াছে গান্ধীজির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার সমালোচনা করি।

আমাদের পরম ভাগ্য যে গান্ধীজি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। যে সকল বুদ্ধিমান নেতা আজ কাল পশ্চিম দেশে গান্ধীজির আদর্শের কথা তুলিয়া ভারতকে জগৎ সমক্ষে বড় করিয়া দেখাইতে চান তাঁহারাও বোধ হয় মনে মনে এইজন্ত ভগবানকে ধন্যবাদ দেন। ভারতবাসী যে অব্রাহ্মণকে এত বড় উচ্চ সম্মান দিয়াছে ইহাতে ভারতেরই যে মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন। পুরা কালে অব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ হইলে পিতা পুত্রী উভয়েই পতিত হইতেন, কিন্তু আজ গান্ধীজির পুত্রকে কন্যা দিয়া রাজাজী আপনাকে ধন্য মনে করেন। জাতি বিচারের উর্দ্ধে উঠিতে পারায় বিশ্বের কাছেও তাঁহাদের মর্যাদা বাড়িয়াছে। খ্রিশ চল্লিশ বৎসর আগেও ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে সরকারী বৃত্তি পাইয়া কালাপানি পার হইবার ভয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, দেশপূজ্য ব্রাহ্মণ নেতার কেহ কেহ সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ গঙ্গাজল প্রভৃতি লইয়া তবে জরুরী কাজে বিলাতে যাইতে পারিয়াছেন, হস্ত বাড়ী ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও করিয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহাদের পুত্র পৌত্ররা সেই হিন্দু বজায় রাখিয়াও ছত্রিশ জাতের সহিত মাথা-মাখি করিয়া অনায়াসে বছরে ২৪ বার বিলাত আমেরিকা যুরিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যে জাতি বিচার করেন খাদ্য বিচার করেন একথা বিদেশে স্বীকার করিতে ও তাঁহাদের লজ্জা হয়। এবং বিদেশে কোন হোটেলে কালো বলিয়া অপমানিত হইলে তাঁহারা মহা নোরগোল করেন। তাঁহারা জানেন পাশ্চাত্য জাতি ইহা লইয়া তাঁহাদের ঠাট্টা করে, তাই এসকল বিষয়ে তাহাদের সহিত সমতা দেখাইতে সেখানে তাঁরা ব্যস্ত। কিন্তু শুধু কি পরের চোখে বড় হইবার জন্যই তাহা তাঁহারা করেন? তা নিশ্চয়ই

নয়। তাঁহারা দেখিতে পান ইহাতে স্বথ স্বা স্বাস্থ্য সকলই বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতর করিতে হইলে তাহার সহিত রীতি নীতি চলনের সাদৃশ্য কমানো অপেক্ষা বাড়ানোই দরকার। আমাদের দেশে নিম্নজাতির উচ্ছিষ্ট মাড়াইলে জাত আহারের সময় অন্য জাত স্পর্শ করিলে কি জল দিলে জাত যায়। জল অবশ্য আজ কাল সহরে কলের দিয়া বহু জাতির স্পর্শ লইয়াই আসে, কিন্তু ছোট উচ্ছিষ্ট এখনও বড় জাতে ছোঁয় না, বি চাকরেও আতি দেখাইতে হইলে বলে—আর সব কাজ করব কিন্তু বাসন ছোঁব না। কিন্তু সেই দেশেই ব্রাহ্মণ নেতার ধাড়েরা যখন রাস্তা বাঁট দেওয়া বন্ধ করিল, তখন দিল কে? উচ্চকুলের ছেলেরা দলে দলে পথে হইয়া বাঁটা বালতি লইয়া নর্দমা পাথরনা পরিষ্কার কি নাই? তাহারা একঘরে হইল না দেশান্তরের আঁকুড়াইল? কোন বুদ্ধিমান শাস্ত্রজ্ঞ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কি আজ বলিতে পারিবেন যে এই ছেলেরা অনায়াস করি অথবা অপবিত্র হইয়া গিয়াছে?

এইরকম করিয়া সকল দিকেই আমরা দেখিতে পাই যে বাংলায় গৌরীদান না করিলে পাপ হইত সেই অতি নিষ্ঠাবানের গৃহেও আজন্ম কুমারী চল্লিশ পঞ্চাশ করিয়াও জাতিচ্যুত হন নাই; স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ধর্মিতা নারীর সকল জিনিষই আজ সভা বাংলার ও ভারতে চলে, অশুভ হইয়া অবশ্য দেশ ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়ে রাজা রামমোহনের যুগে সমাজের ভিতর হইতে যে সংস্কারের সূত্রপাত করিতে গিয়া তিনি শ্বেচ্ছ মুসলমান, আখ্যা পাইয়াছিলেন আজ সেই সকল সংস্কারই গাছ নামে দেশে বিদেশে ধন্য ধন্য বলিয়া প্রচার করা হইতে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রশীল বলিতেন, সত্য কখনও চাপা পড়ে যে মানুষ সত্যকে দেখাইয়া দেয় তাহাকে লোকে পাবে, অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার আপনার পথ আপনি করিয়া লয়।

বাস্তবিক মানুষ হিন্দু হউক মুসলমান হউক তাহার নিকট সত্য ধর্ম অর্থাৎ মানব

তাহা কি ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন? এই জগৎ বিধাতার সৃষ্টি, তাঁহার বা আজ কি? মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান নয়, মেঘের হাটে থাওয়া নয় বা খুঁটকে অস্বীকার করা নয়, মন্দ মানুষের এক কথায় বলিবে। ধর্ম ও অধর্ম সকল মানুষই সাধারণ ভাবে প্রতি মানুষের অবিচার ও অত্যাচার।

বলে তাহাকে যাহার আর এক নাম ভাল ও মন্দ। এই ধর্ম সংস্কার মুক্ত মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক যুগে ইহাই জাতি বা ভাল বেদ কোরাণ বা বাইবেল উক্ত প্রণালীতে মন্ত নির্বিশেষে সকল মানুষের ধর্ম বলিয়া বুঝিবে ও স্বীকার উচ্চারণ নয়, ইহা ছোট বা বড় ভাবে মানুষের সেবা। সন্দেহ করিবে।

“আবোল তাবোল”

(কবিতা)

ত্রিপিলাকী রঞ্জন কর্মকার

অকস্মিক কথা আবোল তাবোল

নেইক' মাথা মুণ্ড।

হাতীর কেন চোখটা ছোট

লম্বা কেন শুণ্ড?

জলটা কেন এমনি ধারা,

গাছটা সোজা কেন?

সূর্য্য হ'তে চন্দ্র মাগো,

দেখায় ভালো যেন।

কেমন করে মাকড়সটা

বুনছে ছোট জাল

কেমন করে নোকামাঝি

চালায় তাহার হাল?

মৌমাছিরা গুণ-গুনিবে

করছে কী মা গান।

ঐ বনেতে যাচ্ছে উড়ে

শিখতে বুঝি গান?

অকস্মিক কথা এমনি ধারা

সকলি অজুত।

মরে গেলে সব মানুষই—

হয় কেন মা ভূত?

এমনি তর প্রসন্ন করে

ব্যস্ত করে তুলে।

মায়ের মুখের এক চুম্বাতেই

সব যায় সে ভুলে।

জেতবন

শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়ার অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে

বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারার্থে বহির্গত হইয়া রাজগৃহে শীতবন নামক এক সুরম্য নির্জন স্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধ ভগবানের বাণী মধ্য ভারত হইতে অগ্ন্যগ্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী সুদত্ত রাজগৃহে তাঁহার পরমাশ্রিতের ভবনে অতিথি হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন গৃহপতি কন্দব্যাস্ত। অট্টালিকা পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত করা হইতেছিল, বহির্প্রাঙ্গণে নহবতের বাদ্যবানি ও শানায়ের রাগ রাগিণী চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। তখন দিনমণি পশ্চিম আকাশপটে সোণালী আভাষ বিশ্ববাসীকে বিদায় সন্তোষ জ্ঞানাইতেছেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল এবং মুক্ত আকাশে অসংখ্য তারকারাজি প্রস্ফুটিত হইয়া নবরূপে মানবের মন মোহিত করিয়া তুলিল।

শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু! আপনার বাড়ীতে বিবাহোৎসবের আয়োজন হইতেছে কি?” প্রত্যুত্তরে গৃহপতি বলিলেন, “না বন্ধু! বুদ্ধ ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘসহ রাজগৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, এবং আগামী দিবস মধ্যাহ্নে তাঁহাদিগকে এই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।” তিনি গৃহপতির মুখে বুদ্ধ ভগবানের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অসীম শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন এবং বুদ্ধের দর্শন আশায় তাঁর চিত্ত উতলা হইয়া উঠিল; আহ্বানের পর তাঁহার স্তনিদ্রা হইল না। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়াছে মনে করিয়া, গভীর নিশ্চল রজনীতে তিনি বুদ্ধ ভগবানের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় বহির্গত হইয়া পড়িলেন। শীতের শীতল সমীরণে বৃক্ষরাজির পল্লব তুলিতেছিল এবং কুজঝটিকা বনানীর পর বনানী অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। গভীর অন্ধকারে অরণ্য মধ্যে হিংস্রজন্তুর গর্জনে বনভূমি কম্পমান। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন এবং হিংস্রজন্তুর হাত হইতে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত মনে মনে উপায় খুঁজিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল পরম

কারুণিক বুদ্ধের নাম। বুদ্ধ নাম করিতেই তাঁহার অন্তর হইতে হিংস্র জন্তুর ভয় দূরীভূত হইয়া গেল। তিনি অকুশল ভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তচিত্তে শান্তির সহিত পথ অতিক্রম করিতে করিতে সূর্যোদয়ের পূর্বে শীতবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রাতঃ-কৃত্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। তথায় ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া তিনি সমস্তম্বে একান্তে উপবেশন করিলেন এবং পথ শ্রান্তি দূরীভূত হইলে কুশল প্রশ্নাদির পর তিনি আশ্রমে একপ্রান্তে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

বিশ্রামের পর অনাথপিণ্ডিক সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া একাগ্রচিত্তে পুনঃ ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া সমস্তম্বে একান্তে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধ ভগবান তাঁহাকে চতুরাধ্য সত্য ধর্ম সরল ভাবে শ্রবণ করাইলেন। ভগবানের ধর্ম দেশনায় তাঁহার ধর্মচক্ষুলাভ হইল। তারপর অনাথ পিণ্ডিক বলিলেন, বুদ্ধ ভগবান! আমি আপনার শরণ লইলাম, ধর্ম এবং সজ্জ্বর শরণাগত হইতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব ততদিনের মত, অল্পগ্রহ পূর্বক আমাকে উপাসক রূপে ধর্ম দীক্ষা প্রদান করুন। তথাগত বিপুল আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে উপাসক শ্রেণীতে দীক্ষাদান করিলেন এবং তিনি উপাসকত্ব লাভ করিয়া শ্রাবস্তীতে বর্ষা উদযাপন করিবার জন্ত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে কাতর প্রার্থনা করিলেন।

প্রত্যুত্তরে ভগবান কহিলেন, “প্রিয় অনাথ পিণ্ডিক! আমার সাধনা ও চক্রমণ স্থান লোক সমাগমের অল্পকূল এবং সুরম্য ও নির্জন উদ্যান হওয়া উচিত। এইরূপ স্থানে আমি বর্ষা-উদযাপন করি।”

অনাথ পিণ্ডিক প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “প্রভু! আপনার সাধনা, চক্রমণ ও বর্ষা উদযাপন উপযোগী মনোরম স্থান শ্রাবস্তীতে আছে।”

ইহাতে বুদ্ধ ভগবান নীরবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন।

কর সম্মতি লাভ করিয়া অনাথ পিণ্ডিক উল্লসিত মনে বস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অনাথ পিণ্ডিক প্রাবস্তীতে ফিরিয়া বুদ্ধ ভগবানের বর্ধা বাসোপযোগী স্থান অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আহাৰ বিহারে লক্ষ্য নাই, তিনি স্বজন-বর্গের নিকট বুদ্ধের অমৃতময় চতুরাৰ্থ্য সত্যার্থ্য বাণী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তাহারা মুগ্ধ হইত এবং বর্ধা বাসোপযোগী স্থান খুঁজিত। তিনি প্রাবস্তীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু কোনও স্থান তাঁহার মনঃপূত হইল না। পরিশেষে কুমার জেতের উদ্যানে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থান তাঁহার মনঃপূত হওয়ায় অনাথপিণ্ডিক কুমার জেতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুমারের সহিত সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের পর তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন, “কুমার, আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বর্ধাধাপন করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং আমার কাতর প্রার্থনার ভগবান সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বাসোপযোগী সুরম্যস্থানের অভাবে আমি আপনার শরণাপন্ন। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার উদ্যানটি বিক্রয় করিলে সুখী হইব।” মহাশ্রেষ্ঠীর প্রস্তাব শুনিয়া কুমার স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে শাস্ত্রভাবে জবাব দিলেন “দানবীর, আপনি যদি অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রায় উদ্যানটি আচ্ছাদিত করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি উদ্যানটি বিক্রয় করিতে পারিব।”

কুমার স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া নীরব রহিলেন। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মহাশ্রেষ্ঠী আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, “কুমার, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। আগামী কাল আপনার কথিত মতে অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রার দ্বারা উদ্যানটি স্বর্ণাচ্ছাদিত করিয়া দিব।” অতঃপর তিনি সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের পর প্রফুল্ল

অন্তঃকরণে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। দানবীর অনাথপিণ্ডিকের প্রাসাদ জনকোলাহল মুখরিত। মহাশ্রেষ্ঠী উৎফুল্ল হৃদয়ে জনতার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অধরে হাসির রেখা পরিস্ফুট। তিনি স্হাস্য বদনে প্রকাশ করিলেন, “আমাদের সৌভাগ্য, কুমার জেত তাঁহার উদ্যানটি আমার নিকট বিক্রয় করিতে

সম্মত হইয়াছেন। উহা বড়ই রমণীয় নির্জন এবং জন-সমাগম উপযোগী। উক্ত স্থান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের বর্ধাধাপনের সাধনারও চক্রমণের খুবই উপযুক্ত এবং তাঁহাদের বাস যোগ্য বিহার নির্মাণ করিবার জন্ত এই স্থান ক্রয় করিতে পারিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। আগামী কল্য শ্রবোদয়ের পূর্বে উক্ত উদ্যানটি স্বর্ণ মুদ্রার দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।”

তাঁহার মুখে এইরূপ আনন্দ দায়ক বাণী শ্রবণ করিয়া জনমণ্ডলী বিপুল উল্লাসে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া প্রান্তরী মুখরিত করিয়া তুলিল। অন্তঃপুরে কুলমহিলারা মঙ্গল হৃৎক উল্লধনি ও শঙ্খধ্বনি এবং কাঁশার রবে চারিদিক আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। দলে দলে লোক শ্রেষ্ঠির গুণ কীর্তন করিতে করিতে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে লাগিল। আশোদ আচ্ছাদে দিনের পর রাত্রিও অবসান-প্রায়।

প্রত্যুষে দানবীর স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা শকটে করিয়া উদ্যানে আনয়ন করিয়া উদ্যান আচ্ছাদনের কাজ শুরু করাইয়া দিলেন। শ্রবোদর সোণালী আভাষ স্বর্ণের উজ্জলতা বৃদ্ধি পাইয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল—এই অপূর্ব রমণীয় দৃশ্য দেখিবার জন্ত দূরদূরান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী সমাগম হইতে লাগিল। অনাথপিণ্ডিকের স্বীয় স্বর্ণ ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টি নাই; তিনি একাগ্র চিত্তে উদ্যানের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধ নাম স্মরণ করিতেছিলেন। উদ্যানটি স্বর্ণে সুসজ্জিত করিবার সময় কুমার জেত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহাশ্রেষ্ঠীর ত্যাগের মহিমা দেখিবার জন্ত উদ্যানে আসিলেন এবং উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন উদ্যানের একাংশ তখনও অনাবৃত। তথায় আসিয়া কুমার মহাশ্রেষ্ঠীর দানের দৃষ্টান্তে আশ্চর্য্যাবিত হইলেন এবং মহাশ্রেষ্ঠীর সমীপে গিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, “দানবীর, আমি স্বর্ণমুদ্রায় অনাবৃত স্থানটি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলাম।” বুদ্ধের প্রতি কুমারের আস্থা দেখিয়া দানবীর ও মুগ্ধ হইলেন।

দানবীর অনাথ পিণ্ডিক স্বর্ণাচ্ছাদিত সুরম্য উদ্যানে বিপুল অর্থব্যয়ে সাধনা-চক্রমণ ও সভাগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য দক্ষ শিল্পীদিগকে আহ্বান করিলেন।

শিল্পীগণ জনসাধারণের প্রশংসাহঁ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিল এবং কুমার জেতের নাম অনুসারে স্থানটির নাম করণ হইল ‘জেতবন।’ আশ্রমটি অনাথ পিণ্ডিক আরাম নামে কথিত হইল।

খাত্ত ও পুষ্টি

(রবীন্দ্রনাথের মতামত)—শ্রীআশাখাত্তগির

খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা লেখনী হইতে সংগ্রহ করে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। দেখা যায় তিনি একমাত্র বাংলা দেশেরই খাদ্যের অসারতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। খাদ্য সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি করা সম্ভব, সে সকল সম্বন্ধে আমরা অচেতন, কারণ সে সকল বিষয়ে আমরা চিন্তাভ্যস্ত; তিনি বলেছেন, “সেই সকল অভ্যাসের সাংঘাতিকতা মুগ্ধ মনকে সতর্ক করিতে পারে না, বহুকাল ক্রমাগত মমত্বের অন্তরালে তাদের শত্রু স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারিলে বলেই তাদের নিরবচ্ছিন্ন হিংস্রতা এমন সর্বনাশ।”

তিনি উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, “আজ বাংলাদেশে কে না জানে যে চোখ-ভোলানো সাদা রঙের ছেলেমানুষী মোঁহে আমরা যে কলের চালের ভাতে আকৃষ্ট হই, তার পরিত্যক্ত অংশই খাদ্য হিসাবে মূল্যবান, আমরা তার যে অংশকে দাম দিয়ে কিনি, সে অংশ বাস করে মৃত্যু? চালের সেই ছাল বিদেশে রপ্তানি হোয়ে থাকে, আহার্য সম্বন্ধে যাদের বুদ্ধি সজাগ এবং নির্বাচন শক্তি সতর্ক তারা আমাদের ভোজ্যের সেই অনাদৃত আবর্জনাকেই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে।”

“আজ কে না জানে ভাতের ফেনের সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রাণশক্তির ধারা প্রতিদিন গড়িয়ে চলে যাচ্ছে রান্নাবরের নর্দমায়া.....

“আজ কে না জানে আমাদের খাদ্যে যে কলের শব্বের তেল ও অপাচ্য মসলা ব্যবহার করে থাকি, তা অজীর্ণ রোগের মারাত্মক বাহন—

“আমাদের জাতির ইতিহাসে বিনাশের বীজ কোন ঔদাসীন্তের মধ্যে নিহত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রতাহ প্রশ্রয় পেয়ে আসছে, সেই কথা ভেবে দেখতে হবে; কেন না তার প্রতিকার একমাত্র আমাদের নিজেদের হাতে।”

জীবিকার ক্ষেত্রে আমরা ছোটো বড়ো সকল দিক থেকে হটে যাচ্ছি, স্বেচ্ছা লাভ সম্বন্ধে বাইরের বিয়্যকে দোষ দিয়ে আমরা

সাম্প্রদায়িকতা চেষ্টা করে থাকি, কিন্তু সেই বিয়ের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লড়াই করতে যে পারিলে তার গোড়াকার কারণ আমাদের অপব্যবহার খাদ্যের কার্পণ্যে শক্তিকীর্ণতা, তাতে আমাদের কোনোমতে জিইয়ে রেখে দেয় বিশ্বপ্রতিদ্বন্দিতার নেপথ্য প্রান্তে; সভ্যতার দুক্লহ পথযাত্রায় তা স্থায়ী প্রবর্তনা দিতে পারে না, তাই দুর্গমের অধ্যবসারে কেবলি আমাদের ক্লান্তি আসে, আমরা হার মানি। বুদ্ধির মূলধন আমাদের যথেষ্ট নেই সে কথা সত্য নয়, কিন্তু সেই বুদ্ধিকে অক্লান্ত চেষ্টায় ষোলো আনা খাটাতে যে উদ্যমের প্রয়োজন তাকে সক্ষিত করে রাখতে পারে পুরুষানুক্রমে যথোচিত খাদ্য সেবনে। অতএব যে সকল কর্তব্যকে আমরা হাশনাল আখ্যা দিয়ে গৌরব করে থাকি, ভোজ্যের উৎকর্ষ সাধন তার মধ্যে প্রধান স্থান পাবার যোগ্য। তাই যখন ভারতীয় সকল জাতির খাদ্য বিশ্লেষণ তালিকায় দেখা যায় বাঙালীর খাদ্য পুষ্টিগততার গুণে প্রায় সকলের নীচের কোঠায়, তখন সে জন্তে লজ্জিত না হোয়ে থাকতে পারি নে। বাঙালী জাতিকে কেনো বিদেশী যদি নির্বোধ বলে নিন্দা করত, সেই গল্পনা কখনো আমরা ধৈর্যের সঙ্গে স্বীকার করতে পারতুম না। কিন্তু যে আহ্বারের প্রথা জীবনী শক্তির অল্পকূল নয়, যা সমস্ত জাতিকে অক্ষমতার মধ্যে শটনঃ শটনঃ নিয়ে চলেছে, জেনে শুনেও সেই আত্মঘাতী অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে না পারার মতো মূঢ়তা কি কম ভৎসনার যোগ্য?”

“.....আমাদের দেশে চিরদিনের অবরোধে দেশের অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরে আধপেটা খেয়ে আসছে তার উত্তরোত্তর সক্ষিত পরিণামের কথা ভালো করে ভাবি নে। আমরা যতটা খাই তাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন, কেন না, শুধু কেবল নিশ্বাস নেওয়াকেই তো বাঁচা বলে না! শিশুর মৃত্যু সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশী, কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে চিরজীবন সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে থাকবার মতো আহ্বার পায় না সেইটেই দুঃখ! কেবলমাত্র

আর্থিক দিক হ'তে যদি এর ফল দেখি, তাহ'লে দেখা যাবে আমাদের দেশের মজ্জায়, কর্মোদ্যম দুর্বল হওয়ায় অধিক মূল্যে অল্প ফল পাই; অত্রদেশে একজনে যে কাজ করে, আমাদের দেশে সে কাজে হয়ত চারজনের দরকার হয়। এতে কেবল কাজের পরিমাণ হ্রাস হয় তা নয়, কাজের গুণও নষ্ট হয়, কেন না কাজের শক্তি থাকলে সে শক্তি খাটাতে আনন্দ পাই, কাজে ফাঁকি দিতে সহজে ইচ্ছা হয় না। কর্ম সম্বন্ধে সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুণ।

“মুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে আমাদের দেশের লোক কাজে শৈথিল্য করে, তাদের কেবলই পাহারা এবং শাসনের উপর রাখতে হয়। বংশাশ্রমে প্রভুদের নিজেদের দেহ সহজেই পুষ্ট বলে একথা তারা মনেই করতে পারে না যে এদেশে কর্তব্য এড়াবার ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতঃই শরীর পোষণের অভাব হোতে; দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরছে এবং জীবমৃত হ'য়ে আছে, তার ও কারণ ঐ; শুধু বেচারী মশাকে দোষ দিলে চোলবে না; কী ক'রে আমরা বাঁচব একথা ভাববার নয়, কেন না কোনোমতে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। কী ক'রে আমরা পুরোপুরি বাঁচব, সেইটেই ভাববার কথা। কৃশতাবশতঃ জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নেই বলে জীবন যাত্রা সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি ক'রে ফাঁকি দিচ্ছি, কর্মসাধনায় সত্যপর হচ্ছি না, এতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক ও আন্তরিক যে লোকসান হোচ্ছে, সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে কম কাজ হোচ্ছে, কম ফসল ফলছে, কম বিয় কাটছে, প্রাণের স্রোতবেগে মহুরতা ঘটছে, অঙ্ক দিয়ে কি তার পরিমাণ পাওয়া যায়? শরীর মনের উপবাসজাত যে অবসাদ, যে ভীকৃত্য, ওদাসীত, জড়স্ত্র আমাদের ধূলিসাৎ ক'রে রেখেছে তার ভার কি সামান্য?”

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য অসম্ভব রকমের ভাল ছিল; সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যের প্রতীক ছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে যখন সামান্য কারণে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা হয়, তখন তিনি স্বাস্থ্যকে বজায় রাখবার জন্য নিয়মিতা বাটা, পক্ষতিজ্ঞ, মেথিভিজ জল, এমনিধারা নানা উৎকট জিনিষ প্রাত্যহিক আহারের সঙ্গে অন্তর্গত বদনে খেতেন।

আমাদের আহাৰ্য্যবস্তুর অসারতা এবং আহাৰ্য্য প্রণালীর অবৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলতেন, তার

মধ্যে একটা কথা উদ্ধৃত করছি—“দারিদ্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু বিচারবুদ্ধির অভাবও কম নেই। যে দামে যে খাদ্য আহরণ করে তোমরা, সেই দামেই তার চেয়ে সারবান খাদ্য পেতে পারো, যদি বেছে নিতে জানো। আর যে পদার্থ থেকে যে খানা তৈরী করে, তারও উন্নতি বিধান করতে পারো অনায়াসেই, যদি উপকরণগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে চेतনার অভাব না হয়।”

বাল্যকালেও রবীন্দ্রনাথের শরীর অত্যন্ত ভাল ছিল, এত ভাল ছিল যে বাল্যকালে তাঁহার কোনও ভারী অসুখ হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কড়া শাসনে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে ভোরে উঠে খালি গায়ে ধূলোমাটি মেখে পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে হোতো, ডুফেলতে হোতো।

এই রকম ভাবে জীবন যাপনের ফলে পরবর্তী কালে রোগভোগের বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় নাই; ছেলেবেলার কথা তিনি লিখছেন—“শরীর এতো বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে ইঞ্চুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রাণ করে দিত তখনো শরীরে কোনো রকম জ্বলমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সন্দি হোলো না। কাস্তিক মাসে খোলা ছাতে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজ, গলার মধ্যে একটু খুশুখুশি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদ-হজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পারি নি পেটে, কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মাথের কাছে। “দৈবায় কখনো আমার জ্বর হয়েছে, তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম।...”

“জরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না।...”

“গারে ফোড়া কাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমে ভালো।

“আমার একটা বড় মুশ্‌কিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না।”

আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্যহীনতার প্রতি তাঁর বরাবরই একটা মানি মনে ছিল। তিনি ২২শে অক্টোবর, ১৯১২ সনে তাঁর মেয়ে মাধুরীলতাকে লিখেছেন, “এখানে একটা জিনিষ

খুব আমার মনে লাগে। এখানে, অন্ততঃ পশ্চিম আমেরিকায়, প্রায় সকল অৱস্থার মেয়েদেরই নিজের হাতে সমস্ত ঘরকন্নার কাজ করতেই হয়, কেন না এখানে চাকর দাসী পাওয়া অসম্ভব বললেই হয়। রান্না, বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাগনমাজা সমস্তই প্রায় গৃহকর্ত্তীরা করেন—অনেক সময় গৃহকর্ত্তাদের তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়। কিন্তু কাজ করবার এত রকম সুবিধা আছে, তাতে বথা সম্ভব ভার লাঘব করে। রান্না গ্যাসের উত্তানে হয়—তাতে কষ্ট নেই—অনেক কাজ ইলেকট্রিক সিটির সাহায্যেই চলে যায়। এসমস্ত সুবিধা এখনকার দিনে আমাদের দেশে চালানো অসম্ভব নয়,—যদি তা করা যায় তাহলে চাকরদের অধীনতা থেকে অনেক পরিমাণে মুক্তিশাল্য করা সম্ভব হয়।”

এর আগের বছর ১৯১২ সনে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে লিখেছেন :—“এখানে ঘরকন্নার ব্যাপারটা তেমন

অত্যন্ত গুরুতর কিছুই নয়—এখানে সমস্ত কাজই প্রায় কলটিপে চলে। বাজারকরা টেলিফোনেই হয়ে যায়। দোকানদারেরাই সমস্ত জিনিষপত্র দরজায় পৌঁছে দেয়—এদেশী রান্নাবান্নার বাটনা বাটা কোটনা কোটার জুলুম অতি যৎসামান্য—তারপরে গ্যাসে ইলেকট্রিক সিটিতে মিলে রান্নাবান্না অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অন্তএব এখনকার ঘরকন্নার বিদ্যা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগবে এমন কথা মনে করিস্ নে। সেখানে আবার সেই বাঁটি নিয়ে বসতে হবে—এবং মোটা ও খোড়ের মুণ্ডপাত করতে কুরুক্ষেত্র করতে হবে। এখানে পান সাজার বালাই একেবারেই নেই। দেশে তোদের সেই এক বিষম সাজা।”

এই সকল উদ্ধৃত অংশ যদি কাহারও ভাল লাগে বা কেউ ইচ্ছা করে উপকৃত হন, তাহা হলে এই লেখা সার্থক

রমণী

শ্রীকালিদাস রায়

বিলাসীর ফুলদানিতে থাকুক

অথবা থাকুক দেবের পায়ে

ফুলশয্যায় সাজানো থাকুক

অথবা শায়িত শবের গায়ে,

বৌটায় আপন ফুটিয়া থাকুক

অথবা লুটুক ধূলির তলে

কোলবালিকার খোঁপায় থাকুক,

অথবা হুলুক রাণীর গলে।

কেউবা গোলাপ, কেউবা কমল,

কেউ ঘেঁটু, কেউ অপরাজিতা।

কেউ বিলাসিনী, কেউ পূজারিণী,

কেউ অভাগিনী, কেউ পতিতা।

ফুল সে ফুল, ফুলই থেকে যায়

মূল্য তাহার সমানই থাকে।

তাহার প্রাপ্য ঘৃণা কভু নয়,

ককণা বরণ করিও তাকে।

দুঃখী

[চেকভের রশ গল্প]

শ্রীফুল্লরা রায়

গ্যালটিচ্ ক্যান্টনের সব চেয়ে অলস অথচ সব থেকে ভাল ছুতোর গ্রেগরি পেট্রিক্, তার বৃদ্ধী স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেক দূরের পথ, রাস্তাও অতি খারাপ। ডাকগাড়ীর কোচোয়ানরাই সে পথে যেতে চায় না, গ্রেগরির পক্ষে যাওয়া তো প্রায় অসম্ভব। ঠাণ্ডা কনুনে হাওয়া তার সমস্ত মুখ জমিয়ে দিচ্ছিল। চারিদিক থেকে ঘূর্ণি হাওয়ায় যে বরফ ঘূরে ঘূরে ছুটে বেড়াচ্ছিল তা আকাশ থেকেই পড়ছে না মাটি থেকেই উঠছে তা বলা শক্ত। পথ, ঘাট, গাছপালা সব বরফে ছেয়ে গিয়েছিল। এক একটা দম্কা হাওয়া যখন গ্রেগরির চোখে মুখে এসে লাগছিল, তখন তার ঘোড়ার লাগামগুলো পর্যন্ত তার চোখে বাপসা হয়ে উঠছিল। পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা কোন রকমে ঠুক ঠুক করে চলছিল। তার সমস্ত জোয়ারই যেন বরফ থেকে পা টেনে তুলতে ও মাথা নাড়তে খরচ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রেগরির বড় তাড়া। সে অস্থির হয়ে উসখুস করছিল ও মাঝে মাঝে ঘোড়াটাকে চাবুক মারছিল।

‘কৈদোনা, ম্যাট্রেনা, কৈদোনা, একটু ধৈর্য ধরো। ভগবানের আশীর্বাদে আমরা শীগ্গির হাসপাতালে পৌঁছে যাবো। আর তখন... প্যাভেল ইভ্যানোভিচ্ হয়তো তোমাকে একটা ওষুধ দেবে, কিম্বা একটু রক্ত বার করে দেবে; হয়তো তোমার গায়ে লাগাবার জন্তে কোন একটা মলম দেবে। সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে... সে চেষ্টাবে, লাফালাফি করবে, কিন্তু তার সাধ্যমত চেষ্টাও সে করবে... সে খুব উঁচুদের ডাক্তার। তার কাজ তার ঠিক জানা আছে। ভগবান তাকে আশীর্বাদ করুন... যে মুহূর্তে আমরা গিয়ে পৌঁছবো সে দৌড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখবে, তার পরেই চিৎকার করে আমাদের বলবে, ‘একি, তোমরা আরো আগে আসোনি কেন? তোমরা কি ভাব যে তোমাদের জন্ত আমি সারা দিন রাতই খাটবো? সকালে আসোনি কেন? ভাগো,

ভাগো, কাল সকালে এসো।’ আমি তার উত্তরে বলবো, ‘হে সহৃদয় ডাক্তার প্যাভেল ইভ্যানোভিচ্, মহাশয়!...’

এই পর্যন্ত বলেই তার স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই ঘোড়াকে ছবার চাবুক মেরে গ্রেগরি আবার বলতে লাগল :

“মহাশয়, ভগবান সাক্ষী, সত্যি বলছি, আমি সকাল বেলাই রওনা হয়েছিলাম... কিন্তু ভগবান যদি রাগ করে এই রকম ঝড় তোলেন তাহলে কি করে আমি এর থেকে আগে এসে পৌঁছতে পারি? আপনি নিজেই বলুন। এমন কি আমার যদি একটা ভাল ঘোড়াও থাকতো তাহলেও এর থেকে আগে আসতে পারতাম না। আর আমার এটা কি ঘোড়া? এটা তো ঘোড়া নামের কলঙ্ক মাত্র। তখন ইভ্যানোভিচ্ বিরক্ত হয়ে চেষ্টাবে, ‘আমি তোমাদের অনেক দিন ধরে জানি। সব সময়ই একই ওজুধাত—বিশেষ করে তুমি, তোমাকে আমি খুব চিনি। তুমি অন্তত পাঁচবার মদের দোকানে থেমেছ।’ কিন্তু আমি তার উত্তরে বলবো, ‘মহাশয়, আপনি নিশ্চয় আমাদের অতটা খারাপ ভাবেন না। আপনি কি ভাবেন যে যখন আমার বৃদ্ধা স্ত্রী মর-মর তখন আমি মদের দোকানে যাবো? চুলোয় থাক সব মদের দোকান... প্যাভেল ইভ্যানোভিচ্। সহৃদয় মহাশয়, আমি অনুন্নয় করে বলছি আমরা একবারেই অধম, বোকা লোক, আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের দোষ নেবেন না। আমরা গরীব চাষাভুষা লোক। আপনি অবশ্যই আমাদের লাথি মেরে এখান থেকে বার করে দিতে পারেন, কিন্তু দেখুন আপনিও তো এই বরফের মধ্যে ভিজে আমাদের দেখতে বেরিয়ে এলেন।”

“তাতে ইভ্যানোভিচ্ আমার দিকে এমন ভাবে তাকাবে যেন সে আমাদের মারতে চায়, কিন্তু সে বলবে, ‘থাক, থাক, আর পায়ে ধরতে হবে না, যদি আরেকটু কম মদ খেতে এবং স্ত্রীকে যদি একটু বেশী ভাল বাসতে, তাহলেই ভাল হতো। তোমাকে ধরে চাবুক মারা দরকার।’... ‘সে তো ঠিক

কথাই, আমাকে যেন চাবুক মারাই হয়। ভগবান যেন আমাকে চাবুকই মারেন, কিন্তু তাই বলে আপনার পায়ে ধরবো না কেন? আপনি অতি দয়ালু, আমাদের পিতার মতন! ভগবানের সাম্নে বলছি, এটা সত্যি কথা। যদি মিথ্যা হয়, আমার মুখে থুতু দেবেন, যে মুহূর্তে ম্যাট্রেনা ভাল হয়ে উঠবে আপনি যা চাইবেন আমি তাই আপনাকে তৈরী করে দেবো। আপনি যদি চান তাহলে হলুদ বার্চের কাঠ দিয়ে আপনার জন্ত একটি চুরোট রাখার খাপ করে দিতে পারি...কিন্তু আপনার ক্রোকে খেলার জন্ত বল তৈরী করে দিতে পারি—বিদেশ থেকে তৈরী হয়ে সব থেকে ভাল যা এদেশে আসে একেবারে সেই রকম করে দেবো, আপনার এক পয়সাও দিতে হবে না। তখন ডাক্তার হেসে বলবে, ‘আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। আমি তোমার জন্ত দুঃখিত’... শুধু তুমি যদি মাতাল না হতে!.....ওঃ—এইসব ভদ্রলোকদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় আমার সব জানা আছে। পৃথিবীতে এমন লোক নেই যার সঙ্গে আমি সমানে সমানে কথা বলতে না পারি...এখন ভগবানের রূপায় রাস্তা না হারালেই হোল। উঃ, চোখ যেন বরফে ভরে যাচ্ছে।”

এই রকমে গ্রেগরি বিড় বিড় করেই যাচ্ছিল। বোধহয় নিজের মনের ভাবটাকে দমিয়ে রাখবারই চেষ্টা। মুখে কথা লেগেই আছে—কিন্তু তার থেকেও বেশী চিন্তাভাবনা তার মাথায় ঘুরছিল। বিপদ, কষ্ট, তার উপর এমন আচম্ভক্য এসে পড়েছিল যে সে তখন পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিতে পারেনি। এই গতকাল পর্যন্ত সে আজীবন আধমাতাল হয়ে কোনরকম দুঃখ কষ্ট না জেনে কাটিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ পেলে এক ভীষণ আঘাত। অলস, অকেজো, আধমাতাল, হঠাৎ যেন জেগে উঠে দেখলো প্রকৃতির সঙ্গে তার ভীষণ যুদ্ধ।

গ্রেগরির মনে পড়লো, কি ভাবে মাত্র কাল থেকে তার দুঃখের স্বরু হোল। অভ্যাসমত মাতাল হয়েই সে কাল রাত্রে বাড়ী ফিরেছিল, এবং অভ্যাসমতই তার স্ত্রীকে গালাগালি দিয়েছিল এবং মারবার ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু কাল তার স্ত্রীর চাহনির মধ্যে যেন কি একটা ছিল। আগে তার চহনির মধ্যে একটা নিষ্কলতার ভাব থাকতো, যেমন

একটা অনাদরের সন্মাহারী পোষাকুরের চোখে থাকে; কিন্তু কাল রাত্রে সে এমন একটা স্থির দৃষ্টিতে গ্রেগরির দিকে চেয়েছিল যা একমাত্র সাধু সন্ন্যাসীদের বা মৃতপ্রায় মেয়েদের চোখেই দেখা যায়। তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টিটাই সব গোলমালের সূত্রপাত করলো। গ্রেগরি ভয় পেয়ে পাড়ার একজনের কাছ থেকে একটা ঘোড়া ধার করে এনে তার স্ত্রীকে নিয়ে চলেছিল হাঁসপাতালে প্যাভেল ইভ্যানোভিচের কাছে, যদি সে তার ওষুধ বা মলম দিয়ে তার স্ত্রীকে আবার আগের মতন করে দিতে পারে এই আশায়।

“আর শোন, ম্যাট্রেনা, সে আবার বিড় বিড় করতে আরম্ভ করলো, “যদি প্যাভেল ইভ্যানোভিচ তোমায় জিজ্ঞেস করে, আমি তোমার মাররোধ করি কিনা, তাহলে তুমি বলবে—না, কখনো না—কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি আর কোনদিন তোমায় মারবো না, তাছাড়া, আমি রাগ করে তোমায় কোনদিন মারিনি, আমি মেরেছি কারণ—কারণ—সে যাকগে, এখন তো আমি তোমার জন্য দুঃখিত। আর কেউ হলে হয়তো তোমার জন্য ভাবতই না, কিন্তু দেখো আমি তোমায় হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা কোরব। কিন্তু এই ঝড়, কি ঝড়ের বাবা! ভগবান তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—কিন্তু রাস্তা যেন না হারাই। তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? ম্যাট্রেনা, আমি যে জিজ্ঞাসা করছি তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা, তুমি উত্তর দিচ্ছ না যে?”

হঠাৎ তার খেয়াল হওয়ায় নিজের মনে বলে উঠলো “আরে, আশ্চর্য্য তো, আমার মুখের উপর বরফ গলে যাচ্ছে, কিন্তু ওর মুখের উপরের বরফ তো গলছে না!”

গ্রেগরি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কেন স্ত্রীর মুখের উপরকার বরফ গলছিল না বা কেন তার স্ত্রীর মুখের রঙ মোমের মতন হয়ে গিয়ে একটা শান্ত সমাহিতভাব ধারণ করেছিল।

সে আবার বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, “তুমি দেখছি বড়ই অকৃতজ্ঞ; আমি একেবারে আমার মনের কথা বললাম, আর তার উত্তরে কিছু বলার ভদ্রতাটাও তোমার নেই। ...—বোকারাম, তুমি যদি আরও সাবধান না হও তাহলে কিন্তু আমি তোমায় প্যাভেল ইভ্যানোভিচের কাছে নিয়ে যাবো না।”

হঠাৎ একটা ধারণা তার মাথায় আসায় সে লাগামটা হাত থেকে ফেলে দিল। তার স্ত্রীর দিকে আর সে কিছুতেই তাকাতে পারে না, কি রকম অস্থির হয়ে উঠলো, তার স্ত্রীর নিশ্চরতায় সে বেশ ভয় পেয়ে গেল। শেষকালে, অনেক ভেবে, তার স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে তার হাতটা ধরলো; প্রাণহীন নিম্পন্দ হাত।

“মনে হচ্ছে মরে গেছে; এ এক অভিজ্ঞতা বটে।” এই বলে সে কঁাদতে আরম্ভ করলো। সে দুঃখে যত না কঁাদলো, কঁাদলো তার থেকেও বেশী বিহ্বলতায়। তার মনে হোল পৃথিবীতে সব কিছুই কিরকম তাড়াতাড়ি ঘটে যায়, জীবনে দুঃখ কি তা বুঝবার আগেই সেটা এসে পড়ে। তার মনে হল তার স্ত্রীর সঙ্গে সে ভালভাবে ঘরই করতে পারলো না, তার সঙ্গে কথা বলার, ভালভাবে তাকে বুঝবার আগেই সে মারা গেল। তারা একসঙ্গে চল্লিশটা বছর কাটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে চল্লিশটা বছর যেন এক নিমিশ্রে কেটে গিয়েছে। দারিদ্র্য মাতলামি আর ঝগড়াঝাঁটি করতেই যেন সময়টা কেটে গেল। সব থেকে তার যেটা খারাপ লাগছিল সেটা হোল, ঠিক যখন সে তার স্ত্রীকে ভালবাসতে আরম্ভ করছিল সেই সময়েই সে মারা গেল; এখন সে স্ত্রীকে ছেড়ে থাকবেই বা কি করে? এবং স্ত্রীর চোখে সে তো দোষীই থেকে গেল।

তার মনে পড়লো, এমন কি তাকে ভিক্ষে করতেও বেরোতে হয়েছিল; আমি নিজেই তাকে একটা রুটির জন্ত ভিক্ষে করতে পাঠিয়েছিলাম। কি অভিজ্ঞতা! তার অন্তত আরও দশ বছর বাঁচা উচিত ছিল। সে তো নিশ্চয়ই ভাবতো আমি একটা অপদার্থ। হায় ভগবান! আমি কোথায় যাচ্ছি; এখন আর হাঁসপাতালে গিয়ে কি হবে; এখন তো গোর শেবার ব্যাপার; ফিরে চলি।”

গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে ঘোড়াকে আবার জোর চাবুক লাগালো। রাস্তা যেন ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো, হাতের লাগামও আর দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফারগাছের ডালগুলো তার হাতে মুখে লাগে, কিন্তু সে তখন চারিদিকের শাদা বরফের রাশি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

নিজের মনেই একবার সে বলে উঠলো, “যদি আবার

প্রথম থেকে আরম্ভ করতে পারতাম।” তার মনে পড়লো চল্লিশ বছর আগেকার ম্যাট্রোণাকে, সেই হাসিখুশী, সুন্দরী যুবতীকে। সে ছিল বেশ বড় ঘরের মেয়ে। তার নিজের ভাল কারিকর বলে নাম ছিল বলেই সে তাকে বিয়ে করতে পেরেছিল, এবং সত্যিই তখন তার ভালভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ ছিল, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই সে মদ খেতে আরম্ভ করেছিল এবং সারাদিন আগুনের কাছে বসে কুঁড়েমি করতো। এখন মনে হতে লাগলো যেন সেই সময় থেকে সে ক্রমাগত ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। বিয়ের দিনটা তার বেশ মনে পড়ছিল, কিন্তু তারপরে মাতলামি, কুঁড়েমি আর ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া আর কিছুই সে মনে করতে পারছিল না। এইভাবেই অনর্থক চল্লিশটা বছর কেটে গেছে।

বরফের শাদা মেঘ আস্তে আস্তে ছাই রঙের হয়ে এল, সন্ধ্যা হোল।

গ্রেগরি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, “আরে, আমি কোথায় যাচ্ছি? আমার এখন ওকে নিয়ে বাড়ী যাওয়া উচিত, আর আমি এখনও হাঁসপাতালেই চলেছি; আমার মাথা খারাপ হোল নাকি।”

এই বলে সে আবার গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। ঘোড়াটাও তার সব শক্তি একত্রিত করে, একটা নিশ্বাস ফেলে, এবার দৌড়তে আরম্ভ করলো। গ্রেগরির পিছনে কি রকম একটা আওয়াজ হতে লাগলো, এবং যদিও তার পিছনে তাকিয়ে দেখতে সাহস হচ্ছিল না, তবু সে বুঝতে পারলো যে তার স্ত্রীর মাথা গাড়ীতে ঠোকার জন্তই ঐ আওয়াজ হচ্ছে। দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হাওয়াটা আরও তীব্র ও কনকনে হয়ে উঠলো।

গ্রেগরি আবার ভাবতে লাগলো, যদি আবার জীবন আরম্ভ করতে পারতাম, নতুন যন্ত্র কিনতাম, নতুন কাজ নিতাম, এমন কি টাকটাও ওকেই দিতাম...হায়রে।”

ভাবতে ভাবতে অগতঃ হয়ে তার হাত থেকে লাগামটা পড়ে গিয়েছিল, একটু পরে সে খুঁজতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না; তার হাত দুটো যেন আর তার কথা শুনছে না।

গ্রেগরি ভারলো, “যাক্গে, ঘোড়াটা তো রাস্তা-চেনেই

ও নিজেই ঠিক যাবে; আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়েনি। তারপরে গোর দেওয়া, ভগবানের নাম করা।”

সে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লো। তার মনে হোল যেন এক মিনিট পরেই ঘোড়াটা থেমে গেল। সে চোখ খুলে দেখলো তার সাম্নে আশ্চর্য মতন একটা কুঁড়ে ঘর। সে গাড়ী থেকে নেমে কোথায় এসেছে দেখবে ভাবলো, কিন্তু তখন তার শরীরে এমন সুন্দর আরামদায়ক একটা অবসাদ এসেছে যে তার মনে হোল, নড়াচড়া করার থেকে জমে যাওয়াও ভাল, এই ভেবে সে নিশ্চিত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভেঙ্গে সে দেখলো একটা লাল দেয়ালওয়ালা একটা বড় ঘরে সে শুয়ে। জানালা দিয়ে উজ্জল সূর্যের কিরণ আসছে। তার চারদিকে আরো লোক দেখতে পেয়ে সে ভাবলো সে যে একজন অভিজ্ঞ লোক তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে; সে বলে উঠলো, “ভাই সব, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। পুরোহিতকে বল—

কে একজন বলে উঠলো, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, চুপ করে শুয়ে থাকো।”

গ্রেগরি আশ্চর্য হয়ে বল, “আরে, প্যাভেল ইভানোভিচ! সদাশয় মহাশয়, আমার উপকারী বন্ধু।” সে লাফিয়ে ডাক্তারের পায়ে পড়তে চাইল, কিন্তু তার হাত পা আর তার কথা শুনছে না। সে বলে উঠলো, “মহাশয়, আমার হাত পা কি হলো?”

“তোমার হাত পার কথা ভুলে যাও—সব জমে গেছে। আরে আরে, কি হোল, কেঁদে আর কি হবে! তুমি তো বুড়ো হয়েছ—ভগবানকে ধন্যবাদ দাও—যাট বছর কি কম কথা।”

“দয়া করে আমায় ক্ষমা করুন, কিন্তু যদি আমার কোন রকমে আর পাঁচ ছটা বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন।”

“কেন হে, তাতে আর কি হবে?”

“ঐ ঘোড়াটা তো আমার নয়, ওটা ফিরে দিতে হবে।—আমার স্ত্রীকে কবর দিতে হবে—হায়রে, পৃথিবীতে সব কি রকম তাড়াতাড়ি ঘটে যায়! ইভানোভিচ মহাশয়, সব থেকে ভাল বার্চ কাঠের চুরোটের খাপ...কিন্তু ক্রোকে খেলার বল আমি তৈরী করে দেবো।”

ডাক্তার হাত নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গ্রেগরি মরে গেছে।

শিকারী কানীনাথ

(সত্য বলিয়া কথিত)

চাঁদরায় কেদার রায়ের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দীঘিরপাড় গ্রামে প্রতাপ রায় নামক এক জমিদার বাস করিতেন। জমিদারের দাপটে প্রজারা দু' শব্দটা করিতে পারিত না, এমনি তেজী ছিলেন। আবার দয়ালুও ছিলেন খুব, প্রজারা জমিদারকে ভয় ও ভক্তি করিত। শিকারের উপর জমিদারের ভীষণ ঝোঁক। দিগন্তব্যাপী মাঠ। মাঠ পার হইলে প্রকাণ্ড দীঘি, দীঘির পাড়ে বাগান, বাগানটা প্রতাপ বাবুর বড় প্রিয়। বাগানের ফুল গাছগুলিতে তিনি নিজহাতে জল দিতেন, অনেক সময় তিনি বাগানে থাকিতেন। বাগানের সংলগ্নই জমিদারের বাস ভবন, সুরম্য বিতল অট্টালিকা।

গ্রামখানি বড়ই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গ্রামবাসীদের সুরুচির পরিচয় দেয়। কিন্তু দীঘির অপর পাড়ে গভীর অরণ্য, প্রায় শত বৎসর পূর্বে বৃদ্ধা এই গ্রামটিকে ডাকাতের দীঘির পাড় বলিত।

প্রবাদ আছে এখনও শীকারীরা ঐ জঙ্গলে পথী শিকার করিতে আসে, বেদেরা বাঁশী বাজাইয়া সাপ ধরে।

প্রতাপবাবুর একটা পুত্র ও একটা কন্যা। ছেলে মেয়ে দুইটিকে প্রতাপবাবু যত্নেব সহিত শিক্ষা দিতেছেন। ছেলে মহিম বিদ্যালয়গামী ও পুত্র চরিত্র। প্রতাপবাবুর মনে উচ্চ আশা। মহিম প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই, এ,

পড়িতেছে। প্রতাপবাবু রাত্রি ৮টার সময় আহারাদি সারিয়া শয়ন করিতে যাইতেন এবং রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া প্রাতঃ-কৃত্যাদিতে যাইতেন। তাহার পরে বিশ্বাসী ভৃত্যকে দিয়া নিজের শরীরে তৈল মাখাইতেন, ইহা তাঁহার নিত্যকার অভ্যাস। আম বাগান লিচু বাগান প্রভৃতি ফলের বাগানের মধ্য দিয়া তাঁহার পায়খানায় যাইবার রাস্তা। প্রায়ই তিনি গভীর রাত্রে বাগানের মধ্যে আলো দেখিতে পাইতেন। কিসের যে আলো তাহা তিনি ঠিক করিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে তিনি এ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতেন।

আজ কয়েকদিন যাবৎ প্রতাপবাবুর শরীর অসুস্থ। স্ত্রী স্মিত্রা বলিল, “আজ তোমার জ্বর বড় বেশী, মহিমকে সংবাদ দিব কি? প্রতাপবাবু বলিলেন, “না ওর পরীক্ষা চলিতেছে, পরীক্ষা শেষ হইলে তার করিও।”

সেই রাত্রেই জ্বর প্রবলীকার ধারণ করিল, প্রতাপবাবু সংজ্ঞাহীন হইলেন, মহিমকে তার করা হইল, মহিম ডাক্তার নিয়া কলিকাতা হইতে আসিল। সেই দিনই প্রতাপবাবু রাত্রি ১২টার সময় পরলোক গমন করিলেন। শোকে স্মিত্রা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মহিম অকস্মাৎ এই বিপদে মুহ্যমান হইল। ম্যানেজারবাবু মহিমকে সাবধান দিয়া বলিলেন, “তোমার শোক করিলে চলিবে না। তোমার পিতার উপযুক্ত সন্তান তোমাকে হইতে হইবে।

প্রাক্ক কার্য সমাপনান্তে মহিম কলিকাতা চলিয়া আসিল। পরীক্ষার ফল শীঘ্রই বাহির হইল এবং মহিম আই, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার হইয়া বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিল। স্মিত্রার অসুখের দরুণ মহিমের দুই বৎসর পড়াশুনা হয় নাই, তাই এম, এ, পরীক্ষা দিতে এত দেরী হইয়া গেল।

আজ ৫৬ দিন হইল মহিমের এম, এ, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মহিম বাড়ী যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। এমন সময় মহিমের সমপাঠি ৮১০টা ছেলে আসিয়া বলিল, ‘মহিম আমরা সকলেই মনে করিয়াছি এখন বাড়ী যাব না। আমরা সকলে একত্র হইয়া শিকারে বাহির হইব। মহিম তুমিও আমাদের সহিত চল।’

মহিম রাজী হইল না, বলিল “মা বড় দুঃখ পাবেন। বাবা ৬ বৎসর যাবৎ মারা গিয়াছেন। আমি যদি যাই মা দুঃখ পাবেন। তোমরা যদি আমাদের বাড়ী যাও মা খুসী

হইবেন। আমাদের দীঘির পাড়ের ডাকাতের জঙ্গলে তোমরা পাখী শিকার করিতে পারিবে।”

ছেলের দল মহা উৎসাহে মহিমের সঙ্গী হইল এবং পর দিন তাহারা বিনা খবরে মহিমদের বাড়ী পৌছিল। মহিমের মা এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

ছেলেদের রান্না করিয়া তিনি তৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন, রাত্রিতে আহারাদির পর স্মিত্রা বলিলেন, “তোমাদের দুই কোঠার শয়ন করিতে হইবে। নতুবা কষ্ট হইবে।”

তখন ছেলেদের মধ্যে কাশীনাথ নামে একটা ছেলে বসিল, “মা আপনি আমাদের সেই ঘরে শয়ন করিতে আদেশ করুন। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।” ছেলেরা বাগানের সংগম্য নিরালা ঘর পাইয়া খুব খুসী হইল, দলের সর্দার কাশীনাথ যেমন বুদ্ধিমান, তেজে বীৰ্য্যে তেমন দীপ্তিমান।

আজ তিন দিন যাবৎ সে দলবল নিয়া শিকারে বাহির হয় এবং গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া অনেক পাখী শিকার করিয়া আসিতেছে, তাহারা যেমন অব্যর্থ লক্ষ্য তেমন সাহস। সে আজ মহিমের নিকট নৌকা চাহিয়া বরাহ শিকার করিতে বাহির হইল। একটা বৃদ্ধ বরাহ শিকার করিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি বেশী হইয়া গেল।

আহারাদি শেষ করিয়া কাশীনাথ পায়চারী করিতে লাগিল। গভীর রাত্রি নিস্তব্ধ গ্রাম। এমন সময় কাশীনাথ দেখিল কিসের যেন একটা আলো বাগানে জ্বলিতেছে। আলো দোঁগিতে পাইয়া কাশীনাথের শিকারী মন কিসের আলো জানিবার জন্য উৎসুক হইল। কিন্তু শত চিন্তা করিয়াও কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিসের আলো জানিবার জন্য কাশীনাথের মন অধীর হইল। ক্রমাগত চিন্তা করিয়া যে শিকারের যন্ত্রপাতির ব্যাগ বাহির করিল এবং দড়ি দূরবীন প্রভৃতি আবশ্যিক দ্রব্যাদি লইয়া আলো দেখিবার জন্ত একটা বৃক্ষে আরোহণ করিল। দড়ি দিয়া নিজকে ভাল ভাবে বাঁধিয়া লইল এবং দূরবীন দিয়া আলো নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যে দৃশ্য সে দেখিল তাহাতে তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

কাশীনাথ দেখিল একটা অজগর সাপ ক্ষুধিত হইয়া আহার আবেষণ করিতেছে। ক্ষুধিত অজগরের সেই ভীষণ

মুষ্টি দেখিয়া কাশীনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিল। অজগর গাছের গোড়ায় মাটির উপর মণিটি রাখিয়া অনেকদূরে চলিয়া গেল। সর্পরাজ যখন আহ্বারে মনযোগী তখন কাশীনাথ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত গতিতে আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

মহিমদের পুরাণো ভৃত্য রঘু বলিল, “বাবু, কয়েকদিন বাবু তুমি রাত্রিতে বাহির হও। আর বাহির হইও না। আমার মনিব বাঁচিয়া থাকিতে তিনিও ঐ ভূতের আলো দেখিতেন।”

কাশীনাথ নীরবে শয়ন করিল। পরদিন কাশীনাথের উঠিতে একটু দেরী হইল, সে মহিমকে বলিল, “ভাই আমি বাগানের কাছে যে একটি ভাল গাছ আছে তাহার তলায় কিছু মাটি আমাকে উঠাইয়া দিতে বল।”

মহিম রঘুনাথকে মাটি উঠাইয়া দিতে বলিল, রঘুনাথ মাটি উঠাইয়া দিল।

কাশীনাথ বহুক্ষণ বসিয়া তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। এবং রাত্রের সেই জীবন মরণ সমস্তার সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল। নানা রকম চিন্তা আসিয়া তাহার মনে দেখা দিতে লাগিল। দীঘির পাড় জঙ্গলে পাখী শিকার করিতে আসিয়া যে এক ভীষণ শক্তিশালী অজগরের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে জয় করিতে হইবে ইহা তাহার কল্পনারও অত্যন্ত ছিল। সন্ধ্যার পরই মহিম আহারাদি সরিয়া তাহার যজ্ঞপাতির ব্যাগ বাহির করিল এবং বাছিয়া বাছিয়া অতি ভীষণধার যুক্ত কয়েক খানি ছুরি বাহির করিয়া রাখিয়া রাত্রি ১টার সময় যাইয়া তাহার সেই বৃক্ষটির উপর আরোহণ করিয়া বসিল। রাত্রি যখন নিখর, ২টার সময় সর্পরাজ বাহির হইয়া আসিল এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে মণি খুলিয়া রাখিল। মণির আলোতে সেই স্থান আলো হইয়া উঠিল এবং আহা

অশ্বেষণে সর্পরাজ অনেক দূরে গেল। কাশীনাথ বৃক্ষ হইতে নামিয়া তাড়া তাড়ি মণিটার উপর মাটি চাপা দিল এবং ছুরি-গুলি মাটির উপর সাজাইয়া দিল। গভীর বন অন্ধকারে ডুবিয়া গেল, তাড়াতাড়ি রঘুনাথ বৃক্ষে আরোহণ করিল। অকস্মাৎ এরূপ ভাবে বিপন্ন হইয়া সর্পরাজ ক্রোধে সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে কি ভীষণ শব্দ! লেজের বাড়ীতে গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। সমস্ত বাগানে যেন প্রলয় ঝঞ্ঝা বয়ে যেতে লাগিল, সমস্ত বন কাঁপিয়া উঠিল। গাছ পালা ভাঙ্গার শব্দে লোকেরা ঘুমের ঘোরে বলিতে লাগিল, খুব বড় হইতেছে। রাগে দুঃখে সর্পরাজ যে স্থানে মণি রাখিয়াছিল সেই স্থানে ছোবল দিতে দিতে ছুরিকা আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া মরিয়া গেল। ভোর হইলে কাশীনাথ সর্পরাজের রথন মাণিক হাতে বাসায় ফিরিল।

সুমিত্রা তখন চায়ের টেবলে চা ঢালিয়া ছেলেদের আহাৰ্য্য সাজাইতে ছিলেন। কাশীনাথ আসিয়া চা খাইতে সকলের সঙ্গে বসিলেন। এবং বলিলেন, ভাই মহিম এত দিন যে আমরা চায়ের টেবলে কত রকম গল্প বলিয়াছি। আজ তোমাদের কাছে আমার শিকারী জীবনের সত্য ঘটনা বলিতেছি। গত গল্য রাত্রিতে আমি এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় জয় লাভ করিয়াছি, বলিয়া সমস্ত ঘটনা বলিল। সকলে অবাক বিষয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে কথা শুনি। কাশীনাথ সুমিত্রার চরণে প্রণত হইয়া মণি তাঁর হাতে দিল। সুমিত্রা মণি নিতে চাহিলেন না। কাশীনাথ বলিল, “মা আমার অপরাধী করিবেন না। মহিমের পিতা এই তথ্যের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন। অসময়ে চলে গেলেন। আমি আপনার সন্তান, আমি আপনার হাতে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জিনিষ দিলাম। মা আমার আশীর্বাদ দিন, আমি আজ বাড়ী রওনা হইব।”

চয়ন

শ্রীআরতি দত্ত

জীবনে সবচেয়ে সৎ মানুষ যা দেখেছি

আমি যখন প্যারিসে ছাত্র ছিলাম তখন অবসর সময়ে এক দোকানে কাজ করতাম। সে দোকানটি ছিল পুরনো জিনিষের, সেখানে ভালো বুদ্ধিমূর্তি থেকে আরম্ভ করে নেপোলিয় যুগের মূল্যবান পায়ের গহনা পর্যন্ত সবই পাওয়া যেতো। একদিন একটি মহিলা এসে দোকানের সামনের কাঁচের আলমারিতে রাখা একছড়া পাথরের মালা দেখতে চাইলেন। বহুদিন ধরে মালাটির উপর ধূলো জমছিল, ক্রেতা পাওয়া যায়নি, তাই মহিলাটি যে দাম দিতে চাইলেন, তাতেই রাজি হয়ে গেলাম।

কয়েকমাস কেটে গেছে, আবার সেই মহিলা দোকানে এসে উপস্থিত। তাঁর কথায় জানা গেল যে সেই হলদে মালাটির পাথরগুলি প্রকৃতপক্ষে হলুদ রঙের হীরা। নিউইয়র্কের কোন রত্নব্যবসায়ী সেই মালাটির জন্য মহিলাকে ৬৫০০০ ডলার দিতে চেয়েছিল। তিনি কিন্তু তখনি মালাটি ফিরিয়ে দিতে চান, কিন্তু তাঁর দোকানের নাম জানা ছিল না। এইবারে তাই প্যারিসে ফিরে এসে সেই হীরার মালাগাছি এনেছেন তার 'আসল', মালিককে ফিরিয়ে দিতে।

একবার এক সুইস (Swiss) ভ্রমলোক ফ্রান্সে মোটরে পরিভ্রমণ করছিলেন। এক জায়গায় একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তিনি ছবি তুলতে নামেন। প্রায় ২০০ মাইল চলে আসার পর তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর মূল্যবান ক্যামেরাটি তিনি সেখানে ফেলে এসেছেন। ক্যামেরাটির সঙ্গে কোন নাম বা ঠিকানা ছিল না তাই তিনি সেটি ফিরে পাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর এক ক্রেঞ্চ ভ্রমলোক সেই ক্যামেরাটি ফিরিয়ে দিতে এসেছেন দেখে, তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

ভ্রমলোকের কাছে শুনলেন যে, ক্যামেরাটির উপর কোন নাম না দেখে তিনি সেটি বাড়ী নিয়ে যান ও ক্যামেরার

ফিল্মটি বের করে ডোভেলোপ করতে দেন, যদি ছবির মধ্যে থেকে ক্যামেরার মালিকের কোন সন্ধান মেলে। একটি ছবির মধ্যে মোটর দেখা যায়, কিন্তু তার নম্বরগুলি এত ছোট দেখায় যে পড়া যায় না। তখন তিনি ছবিটি আবার বড় করে নেন তাতে নম্বরগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন তিনি সুইস কনসালের কাছে গাড়ীর নম্বর দিয়ে তার মালিকের সন্ধান করেন। এইভাবে ক্যামেরার প্রকৃত মালিকের সন্ধান পেয়ে, তিনি জেনেভায় এসেই ক্যামেরাটি ফিরিয়ে দিতে এসেছেন।

*

*

e

একবার আমাদের গ্রামের ডাক্তারের বাড়ী আমার ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের বসবার ঘরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেখানে আরও অনেক রোগীরা ডাক্তারের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের কাছেই একটি ছোট ছেলে ও তার মা বসে ছিল। তাদের শীর্ণ দেহ ও ছেঁড়া কাপড় দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা ডাক্তারের বিনা পরামর্শ রোগী। তাদের দেখে আমার বড় কষ্ট হলো। এমন সময় আমার ছেলে খেলতে খেলতে আমার টাকার ব্যাগ বের করে সব টাকা পরসে ছড়িয়ে ফেললো। আমি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম, কারণ তখনি ডাক্তারের কাছ থেকে আমাদের ডাক পড়েছিলো। বাড়ী ফিরে টাকা গুণে দেখলাম যে একটি দশটাকার নোট কম পড়ছে। দশটাকা খুব বেশি না হলেও অনেকের কাছে তার মূল্য অনেক। বিশেষ করে সেই মা ছেলের অভুক্ত দেহ ও ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মনে করে টাকা পাবার আশা ছেড়ে দিলাম।

এরপর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, একদিন আমি বাজারের পথ দিয়ে যাচ্ছি; একটু দূরে দেখলাম একটি ছোট ছেলে খুব লক্ষ্য করে রাস্তায় চলন্ত লোকদের মুখ দেখছে। আমাকে দেখেই সে চোঁচিয়ে ডাকলো, “মা, মা, থাকে আমরা এতদিন ধরে খুঁজছি সেই লোককে পেয়েছি।”

আমি তখন চিনতে পাঁচলাম, ডাক্তারের বাড়ীতে দেখা সেই ছেলটি। তার মা এগিয়ে এসে তার শতছিন্ন কাপড়ের ভেতর থেকে একটা ময়লা কাগজে সযত্নে মোড়া আমার সেই দশটাকার নোটখানি বের করলো। আমি কিছু বলবার আগেই আমার হাতে নোটখানি দিয়ে—তার বাজারের ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

* * *

কোন রাজনৈতিক কারণে—সাইবেরিয়ার এক কারাগারে আমি ও অর্ড্রে' দুজনেই বন্দী ছিলাম। রাজনৈতিক বন্দীদের কেবলমাত্র কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখার কত সামান্য খাদ্য দেওয়া হতো। ক্ষুধায় ও অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রমে বহু বন্দীর মৃত্যু হতো। ফলে বন্দীরা বা কিছু খাবার পেতো চুরি করতো। আমার মা ২০০০ হাওয়ার মাইল দূর থেকে বহু কষ্টে ও গোপনে আমাকে কিছু বিস্কুট ও মাখন পাঠিয়েছিলেন। আমি সেগুলি খুব যত্ন করে জমিয়ে রেখেছিলাম যদি কখনও ক্ষুধা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠে তখনকার জন্ত। আমি আমার খাবারের ছোট টিনট সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখতাম।

একদিন সকালবেলা—কোন অস্থায়ী কাজের জন্ত আমি কারাগারের অল্প শিবিরে যাবার আদেশ পেলাম। আমার খাবারের টিনটি নিয়ে কি করবো ভাবছিলাম। অর্ড্রে' বললো, “আমার কাছে রেখে যাও। আমি ওটি কাছে রাখবো ও আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে জেনো।”

আমি চলে যাবার পরই তিনদিন ধরে অবিভ্রান্ত তৃষ্ণার বৃষ্টি হয়ে ষাতায়াতের সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। আমি অনুমান করলাম আমাদের বন্দীনিবাসের খাদ্যের অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে। কারণ রাস্তা পরিষ্কার হতে প্রায় দশদিন লেগে গেল। আমি আবার ফিরে এলাম। আমি যখন এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বন্দীরা সব কাজ থেকে সব ফিরেছে কিন্তু তাদের মধ্যে অর্ড্রে'কে দেখতে পেলাম না। আমি প্রধান রক্ষককে জিজ্ঞাসা করলাম, “অর্ড্রে' কোথায়?” সে বললো, “অল্প অনেকের সঙ্গে অর্ড্রে'কেও কবর দেওয়া হয়েছে। সে তোমার জন্ত একটি জিনিয় রেখে গেছে।” আমার বড় মন খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম আহা বেচারি অর্ড্রে', আমার বিস্কুট, মাখনও তাকে দুর্দিনে রক্ষা করতে পারলোনা। কিন্তু টিনটি খুলতে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম আমার খাবারগুলি ঠিক তেমনি আছে ও তার সঙ্গে একটুকরো কাগজে লেখা রয়েছে, “প্রিয় বন্ধু, আমি আমার হাত চলা বন্ধ হবার আগেই তোমাকে লিখতে বসেছি। আমি জানিনা তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো কিনা, কারণ আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের খবর দিও। তুমি তাদের ঠিকানা জানো। তোমার জিনিষটি আমি প্রধান রক্ষকের কাছে রেখে গেলাম, আশাকরি তুমি ঠিকমত পাবে। বিদায়। ইতি অর্ড্রে'”।

(Readers Digest হইতে)

প্রাচীন কালের বঙ্গলক্ষ্মীগণের শিক্ষা

ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি

প্রাচীনকালে বাঙ্গলা দেশে শিক্ষার প্রসার বিরূপ ছিল তাহা মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠে কিছু অবগত হওয়া যায়। এই শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। নারীগণ ও পুরুষগণ তুল্যভাবেই শিক্ষালাভ করিত। এই শিক্ষা বিশেষতঃ নারীদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। আধুনিক যুগের পূর্বে

(খৃঃ চম হইতে ১৮শ শতাব্দী) বাঙ্গালার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা সুদীর্ঘ এক সহস্র বৎসর একরূপ না থাকিতে পারে, কিন্তু মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে ইহাদের যে পরিচয় মোটামুটি পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

সেকালে শিক্ষা বলিতে শুধু লিখিতে ও পড়িতে জানাকেই বুঝাইত না। ইহা না জানিয়া শুধু কানে শুনিয়া ও

চোখে দেখিয়াও অনেকে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। কথাকতা, পাঁচালী, যাত্রা ও কীর্তন গান শিক্ষাকার্যের বিশেষ সহায়ক ছিল। দেহ ও মনের সম্যক অহুশীলন দ্বারা পরিবার ও সমাজের উপযোগী শিক্ষালাভ তখনকার বাঙ্গালীর উদ্দেশ্য ছিল। নৈতিক আদর্শ ও সংসার সম্বন্ধে বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ইহার পক্ষেতে ক্রিয়া করিত। ব্যক্তিগত নীতির সহিত সামাজিক নীতির অপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিতে বঙ্গনারী সক্ষম হইয়াছিল। পার্শ্বজনীন মানবপ্রীতি সেকালের শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধ, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলি প্রাচীন বঙ্গে শিক্ষার মানদণ্ড নির্দেশ করিত। এই প্রকার শিক্ষার জাতীয়তা বোধের সঙ্গীর্ণতা ছিল না, অথচ স্বজাতি প্রীতির কোন অভাবও হইতে পরিলক্ষিত হইত না। একদিকে ধর্মভাব এবং অপরদিকে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার ফলে বাঙ্গালার হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে শিক্ষার যে বিশেষ আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা সময়োপযোগী ও তুলনায়হিত ছিল। ইহাতে পারিবারিক সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছিল।

মধ্যযুগের গল্পগুলিতে কখনও কখনও দেখা যায় ছেলে ও মেয়ে একই পাঠশালার একত্রে অধ্যয়ন করিত। ফকিররাম কবিত্বের “পুষ্পমালা” গল্পে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসীমা পর্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার পর উভয়ে ভিন্ন পথে স্ব স্ব উপযোগী বিশেষ শিক্ষালাভ করিত। সাধারণ শিক্ষা, বিভিন্ন বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা—সব শিক্ষাদানেরই ভাল ব্যবস্থা ছিল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কাব্য, দর্শন ও ব্যাকরণাদিতে উচ্চশিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। নারীগণের বিশেষ শিক্ষার মধ্যে গৃহস্থালি জ্ঞান, রন্ধন ও সৌন্দর্য্য কার্যে পটুতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা ভিন্ন সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্য ও চিত্রকন প্রভৃতি কলাবিদ্যার চর্চাও নারীগণের মধ্যে দেখা গিয়াছিল এবং সমাজ কর্তৃক উহা উৎসাহিত হইত। নানারূপ ব্রত ও মালিন্যের সাহায্যে নারীগণ ইহাদের সম্বন্ধে আংশিক শিক্ষালাভ করিত। তাহাদের কোন শিক্ষাই মানসিক পটভূমির সম্বন্ধে সীমিত অতিক্রম করিত না। দেব-দেবী ও গুরুভক্তি, আত্মত্যাগ এবং বিশেষ করিয়া

স্বামিভক্তি ও সেবার্থ অহুশীলন ভিন্ন তাহাদের শিক্ষা কখনই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিত না।

এই স্থানে প্রাচীন যুগের বিদুষী ও নানাগুণসম্পন্ন নারীগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নামোল্লেখ করা গেল। যথা—

- ১। খনা
- ২। লীলাবতী (বীজগণিত গ্রন্থে)
- ৩। ময়নামতী
- ৪। রামমণি
- ৫। চন্দ্রাবতী
- ৬। মাধবী
- ৭। আনন্দময়ী
- ৮। গঙ্গামণি
- ৯। বেহলা
- ১০। ফুলরা
- ১১। খুলনা
- ১২। লীলাবতী (চণ্ডীমঙ্গল)
- ১৩। কানেড়া
- ১৪। কলিঙ্গা
- ১৫। মল্লিকা
- ১৬। বিদ্যা
- ১৭। পুষ্পমালা
- ১৮। কাঁজলরেখা
- ১৯। সুরিখা
- ২০। লক্ষ্মী (লখা)।

ইহাদের মধ্যে লীলাবতী (বীজগণিত গ্রন্থে), ময়নামতী, রামমণি, চন্দ্রাবতী, মাধবী, আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি সত্যি বর্তমান ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দান বা উল্লেখ সুপরিচিত। খনা, কলিঙ্গা, কানেড়া ও বিদ্যা ঐতিহাসিক নারী হইলেও হইতে পারেন। বেহলা, ফুলরা, খুলনা, সুরিখা, বিষয়া, মল্লিকা, কাঁজলরেখা, পুষ্পমালা ও লীলাবতী (চণ্ডীমঙ্গল) কিম্বদন্তিমূলক এবং পৌরাণিক ও লৌকিক গল্প সমূহের অন্তর্গত চরিত্র। এই নারীগণের মধ্যে সুরিখা বারবণিতা ও শিক্ষিতা নারী ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে তাহার উল্লেখ আছে। রাজকন্যা কানেড়া ও রাজকন্যা কলিঙ্গা

ময়নার (মেদিনীপুর) রাজপুত্র লাউসেনের পত্নী ছিলেন। এই দুই নারী দৈহিক বল ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। কথা-সাহিত্যে ফকিররাম কবিভূষণের মল্লিকা গল্পে রাজকুমারী মল্লিকারও দৈহিক বলের সুন্দর বর্ণনা আছে। ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের ডোমকন্ঠা লক্ষ্মী বা লখার নাম ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের ফুল্লরা নিরক্ষর ব্যাধপত্নী হইয়াও গল্পে অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। বণিক-পত্নী খুলনা (চণ্ডী-মঙ্গল) ও বিধবা নারী লীলাবতী (চণ্ডী-মঙ্গল) উভয়েই বিদ্বম্বী ছিলেন। বণিক-পত্নী বেজলারও তান্ত্রিক জ্ঞান ও লেখা-পড়া জানার প্রচুর পরিচয় মনসা-মঙ্গলে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি নৃত্য ও রন্ধনবিদ্যায় বিশ্বয়কর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। দেবলোকে নৃত্য দেখাইয়া তিনি মৃত স্বামী লক্ষ্মীন্দরের পুনর্জীবন লাভ করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বর্দ্ধমানের রাজকন্ঠা বিদ্যা অসামান্য বিদ্বম্বী নারী ছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে যে ব্যক্তি তর্ক-যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিবে তিনি তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন। অবশেষে কাঞ্চিদেশের রাজপুত্র সুন্দর তাঁহাকে পণে জয়লাভ করিয়া বিবাহ করেন। কাঁজলরেখা (ময়মনসিং-গীতিকা) অক্ষয়-বিদ্যায় অপরিমিত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এইতো গেল বিভিন্ন কাব্য ও কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের উল্লেখ। ইহাতে প্রাচীন যুগের স্ত্রী-শিক্ষার মান, ধারা ও আদর্শ উপলব্ধি করা যায়।

ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের মধ্যে জ্যোতিষ ও নানাবিদ্যার অধিকারিণী খনার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। অক্ষশাস্ত্রে (বীজগণিতে) পারদর্শিনী লীলাবতীর সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। নাথ-পত্নী সাহিত্যে ময়নামতীর তত্ত্বশাস্ত্রেও নানা অদ্ভুত বিদ্যায় অপরূপ দক্ষতার বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। ত্রিপুরা ও রঙ্গপুর জেলায় এই অদ্ভুতকর্মী নারীর অনেক স্থিতি-চিহ্ন ও কাহিনী অদ্যাপি বর্তমান আছে। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রসিদ্ধ কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী একখানি বিশেষ মূল্যবান রামায়ণ রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি পিতার মনসা-মঙ্গল রচনাতেও অনেক সাহায্য

করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর বাড়ী পূর্ব ময়মনসিংহে ছিল। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তৎসংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে “চন্দ্রাবতীর” নামে যে গীতিকাটি নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই মহিষমারী ও বিদ্বম্বী নারীর ব্যর্থ প্রণয়ের কল্পনা-কাহিনী অবগত হওয়া যায়। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যরাজবল্লভের জ্যোতিষ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ সেনের ভ্রাতৃপুত্রী আনন্দময়ী বৈদিক সাহিত্যে অপরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে অনন্দময়ীর জ্ঞান তৎকালীন পণ্ডিত বর্গকে বিস্মিত করিত। তিনি জয়নারায়ণের সহিত একযোগে “হরিলীলা” নামে সত্যনারায়ণের পুথির গল্প ছন্দে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আনন্দময়ীর সংস্কৃত ছন্দজ্ঞানেও প্রচুর পরিচয় রহিয়াছে। এষ্ট সময়ে গঙ্গামণি (সম্ভবতঃ আনন্দময়ীর ভ্রাতৃপুত্র) নামে অত্র একটি শিক্ষিতা মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধপদকর্তা চণ্ডীদাসের (১৪শ শতাব্দী) প্রিয় পাত্রী রামমণি অসামান্য কবিত্ব-শক্তির স্বধকারিণী ছিলেন। ক্ষেত্র-সাহিত্যে চৈতন্য-পার্বদ শিখ মাছাতর ভগিনী মাধবা রচিত বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়। এইখানে সামান্য উদাহরণ দিওঁছি।

(১) “নয়নের কঙ্কণ লইল স্থিখানে।

লেখিল বিষয়া দান দিহুত মদন ॥”

—ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত

(বিষয়ার উপাখ্যান)।

(২) “দুইজনে একস্থানে করিয়া যুক্ত।

কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে লীলাবতী ॥

স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।

অশেষ মঙ্গলধাম লংগা ঘুঘুতী ॥

লংগার বেলে তে খুলনা পদে পাতি।

তাসেন খুলনা ছন্দ দেখি ভিত্তভাত ॥

—কাঁজলরেখা চণ্ডীকাণ্ড,

(লীলাবতীর পত্র-লখন)

(৩) “উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজ ইয়া।

ধুইয়া মুছিয়া কল্লা লইল বাটিয়া ॥

পিটালি করিয়া কল্লা পংখমে জাঁকিল।

বার্ণ আর মাঘের চরণ মনে গাঁথা ছিল ॥

জোরা টাইল জাঁকে কছা আর খান জুড়া।

মাঝে মাঝে জাঁকে কছা গিরলক্ষীর পায়া ॥” ইত্যাদি।

—কাঁজলরেখা (ময়মনসিংহ-গীতিকাব্য)।

(৪) “পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।

প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥

ক্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।

অলঙ্কার আদি সাব্য সাধন লাভক ॥” ইত্যাদি।

—ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল

(বিদ্যাসুন্দরের গল্প)।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ

আছে। সেকালে পাঠশালা এবং চতুষ্পাঠীতেই শুধু

বিদ্যাদান হইত না। নারীগণ কথকথা, রূপকথা, নীতিকথা

প্রভৃতির সাহায্যে এবং কথকগণের, কীর্তনীয়া, পাঁচালী-

গায়কগণের গান ও ব্যাখ্যা শুনিয়া ও অনেক জ্ঞানলাভ

করিত। নারীশ্র ও মাতৃশ্র উভয়ের আদর্শই তখন পারিবারিক

জীবনের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রেরণা জোগাইত।

বাল-শিক্ষা

ক্রীষ্ণজাতা রায়

বর্তমান কালের জগতে অনেক নতুন জিনিষ এসেছে যা প্রাচীন জগতে ছিল না। বৈজ্ঞানিক শক্তি, নানা রকম নতুন যানের ব্যবহার, বেতার বাস্তা, সবাক ছায়াচিত্র—বর্তমান জগতের বিশেষ জিনিষ; আমাদের খাওয়া, দাওয়ার ব্যবস্থাও আজকাল অল্পরকম এবং জীবিকা নির্বাহের প্রণালীও সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্থান ও কালের সীমা ছোট হয়ে গিয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ ও বিরোধ অনেক ব্যাপক হয়েছে। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন সম্পূর্ণ অল্প রকম হয়েছে। মনস্তত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে শিখেছি যে বালকবালিকার স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি যদি অটুট রাখতে হয় তবে তাদের খোলা জায়গায় নিজেদের শক্তির পরিচালনা করে এবং জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। আমরা এটাও বুঝেছি যে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আরও জ্ঞান আমাদের লাভকর। দরকার এবং কি কি বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে হবে তা বাইরের থেকে ঠিক না করে তাদের মনের দিক দিয়ে কি

“ছেলেদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য”

শিক্ষা দেবার সময় কোন বয়সের ছেলে মেয়ের শরীর ও মনের দিক দিয়ে কি প্রয়োজন তাও যেমন ভাবতে হবে তেমনি বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে কি পার্থক্য এবং শিক্ষার প্রণালী সেজন্য কি ভাবে পরিবর্তন করতে হবে, তাও না ভাবলে চলবে না।

“আধুনিক জগতের শিক্ষা আধুনিক ভাবেই দিতে হবে”

বর্তমানের জীবন আগেকার জীবনের থেকে অনেক বেশী জটিল। ভবিষ্যতের জীবন আরও জটিল হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অনেক সহজে জীবন বাপন করতেন। তাঁদের থেকে আমাদের সামাজিক আদান প্রদান এবং সংঘর্ষ অনেক বেশী, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেশী। জীবন যাত্রার ধরণ এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়ও আমাদের খুব পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের মধ্যে নিজে থেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয় এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা ভেবে রাখতে হয়। আজকালকার জগৎ সাম্যবাদী, সেজন্য শিক্ষার

দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকে নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে উপযুক্ত কার্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পার।

আজ তাই শিক্ষার আদর্শ—শিশুর মধ্যে যা কিছু আছে তা বিকাশ করে তোলা।

“স্কুলের কর্তব্য”

উদ্দেশ্য ঠিক হলেই শুধু চলবেনা, কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সফল করা যাবে তাও ভাবতে হবে। এই উপায় নির্ণয় একেবারেই সহজ কাজ নয়। কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করে ছেলে মেয়েদের মধ্যে তা বিতরণ করাকে শিক্ষা দেওয়া বলা চলে না। শিক্ষক যা করতে চান তা করতে পারলেই শিক্ষা দেওয়া হবে না। নির্বাচন, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব স্কুলের আবহাওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুকূল মনোভাবের উপর শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে।

সেই জন্য ছাত্র-ছাত্রীর মনে কতকগুলি অভ্যাস করিয়ে দিতে হবে; এই অভ্যাস মানসিক ও শারীরিক দুইকমেই হবে। জ্ঞান—অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার মধ্যে কি সম্পর্ক তা বোঝবার শক্তি—তার উন্মেষ করতে হবে। একাধারে উদ্যোগী এবং উৎসুক হতে শিক্ষা দিতে হবে। এর কোনটা পৃথক ভাবে শিখান যাবে না, সবগুলি একযোগে শেখাতে হবে। তা নাহলে অভ্যাসের দাসত্বে বুদ্ধির বিকাশ নষ্ট হতে পারে, জ্ঞান জীবন্ত না হয়ে কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহে পরিণত হতে, উৎসুক্য ও উৎসাহ স্বার্থপরতায় পর্যাবসিত হতে পারে।

“শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কি ভাবে মনের ভাব এবং কর্মদক্ষতাকে সাহায্য করে”

যে কোনও বিষয় শিক্ষা দিতে শিক্ষকের বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জ্ঞান থাকাও যেমন দরকার আবার বিশেষজ্ঞ হওয়াও সেই রকম দরকার। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী ভাষা নিলে আমরা দেখতে পাই যে এটা সাধারণ ভাবে বিভিন্ন জাতির চিন্তার আদান-প্রদানের সহায়তা করে; আবার বিশেষ ভাবে এর সাহিত্য পড়া যায় এবং সাহিত্যের থেকে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়।

জীবনের এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যা গণিতের ভাষা দিয়ে ভালভাবে প্রকাশ করতে পারা যায়, সেই জ্ঞান গণিত শিক্ষা জীবনে প্রয়োজন। কিন্তু তাছাড়াও নির্ভুল

ভাবে কাজ করতে শেখার জন্য গণিত শিক্ষার দরকার হয়। ইতিহাস এবং ভূগোল শিক্ষা করলে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পায়, এবং পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার থেকে হয়। স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্যনীতির শিক্ষা থেকে ছেলে মেয়েরা সামাজিক কর্তব্য ভালভাবে শেখে এবং শিল্প ও কলা শিক্ষার থেকে তারা নিজেদের চিন্তা ও ভাবকে রূপ দিতে শেখে।

স্কুল কি ভাবে জীবনকে সাহায্য করে”

(১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রগতির জন্য পারিপার্শ্বিক গড়ে তোলা।

(২) এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা।

(৩) পূর্ণ কার্যকরী জীবন যাপনের জন্য যে সকল অভ্যাস, জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা, ও উৎসুক্য অর্জন করা প্রয়োজন তা করতে সাহায্য করা।

(৪) যে সকল আদর্শ দিয়ে জীবনকে বিচার করা যাবে সে সকল আদর্শ গ্রহণ করা।

“প্রকৃত শিক্ষার নিদর্শন”

দৈনিক কাজের মধ্যে উপরিউক্ত আদর্শ অনুসারে চলতে চেষ্টা করলেই শুধু হবে না নাগরিক দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে পারলো কি না এই দিয়ে স্কুলের সফলতার বিচার হবে—এমন মানুষ গড়তে হবে যারা যা কিছু স্বন্দর যা কিছু সর্বসাধারণের জন্য ভাল ভাবে ভালবাসতে শিখবে। প্রকৃত শিক্ষিত লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ দিয়ে চালিত হবে না, সাধারণের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করতে শিখবে এবং যে কাজ হাতে নেবে তা সুসম্পন্ন করতে শিখবে; সেই সঙ্গে অন্য লোককে সাহায্য করতেও বিমুখ হবে না। কোন স্কুলে এরকম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়, কারণ যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষি এবং জ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহলী হয় তারা আনন্দের সঙ্গে এবং নিখুঁত ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করে, তারা জানে যে তারা যা করছে জীবনে সে কাজের মূল্য আছে।

জোরা টাইল আঁকে কত আঁর ধান জুড়।

মাঝে মাঝে আঁকে কত গিরলক্ষীর পাঁরা ॥” ইত্যাদি।

—কাঁজলরেখা (ময়মনসিংহ-গীতিকাব্য)।

(৪) “পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।

প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শব্দের প্রসঙ্গ ॥

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।

অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন লাধক ॥” ইত্যাদি।

—ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল

(বিদ্যাহৃদয়ের গল্প)।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। সেখানে পাঠশালা এবং চতুষ্পাঠীতেই শুধু বিদ্যানান হইত না। নারীগণ কথকথা, রূপকথা, নীতিকথা প্রভৃতির সাহায্যে এবং কথকগণের, কীর্তনীয়া, পাঁচালী-গায়কগণের গান ও ব্যাখ্যা শুনিয়া ও অনেক জ্ঞানলাভ করিত। নারীত্ব ও মাতৃত্ব উভয়ের আদর্শই তখন পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রেরণা জোগাইত।

বাল-শিক্ষা

শ্রীমুজাতা রায়

বর্তমান কালের জগতে অনেক নতুন জিনিষ এসেছে যা প্রাচীন জগতে ছিল না। বৈজ্ঞানিক শক্তি, নানা রকম নতুন যানের ব্যবহার, বেতার, বাস্তা, সবাক ছায়াচিত্র—বর্তমান জগতের বিশেষ জিনিষ; আমাদের খাওয়া, দাওয়া ব্যবস্থাও আজকাল অল্পরকম এবং জীবিকা নির্বাহের প্রণালীও সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্থান ও কালের সীমা ছোট হয়ে গিয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ ও বিরোধ অনেক ব্যাপক হয়েছে। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়েছে। মনস্তত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে শিখেছি যে বালকবালিকার স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি যদি অটুট রাখতে হয় তবে তাদের খোলা জায়গায় নিজেদের শক্তির পরিচালনা করে এবং জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। আমরা এটাও বুঝেছি যে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আরও জ্ঞান আমাদের লাভকর। দরকার এবং কি কি বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে হবে তা বাইরের থেকে ঠিক না করে তাদের মনের দিক দিয়ে কি

“ছেলেদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য”

শিক্ষা দেবার সময় কোন বয়সের ছেলে মেয়ের শরীর ও মনের দিক দিয়ে কি প্রয়োজন তাও যেমন ভাবতে হবে তেমনি বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে কি পার্থক্য এবং শিক্ষার প্রণালী সেজন্য কি ভাবে পরিবর্তন করতে হবে, তাও না ভাবলে চলবে না।

“আধুনিক জগতের শিক্ষা আধুনিক ভাবেই দিতে হবে”

বর্তমানের জীবন আগেকার জীবনের থেকে অনেক বেশী জটিল। ভবিষ্যতের জীবন আরও জটিল হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অনেক সহজে জীবন বাপন করতেন। তাঁদের থেকে আমাদের সামাজিক আদান প্রদান এবং সংঘর্ষ অনেক বেশী, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেশী। জীবন যাত্রার ধরণ এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়ও আমাদের খুব পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয় এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা ভেবে রাখতে হয়। আজকালকার জগৎ সাম্যবাদী, সেজন্য শিক্ষার

দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকে নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে উপযুক্ত কার্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পার।

আজ তাই শিক্ষার আদর্শ—শিশুর মধ্যে যা কিছু আছে তা বিকাশ করে তোলা।

“স্কুলের কর্তব্য”

উদ্দেশ্য ঠিক হলেই শুধু চলবেনা, কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সফল করা যাবে তাও ভাবতে হবে। এই উপায় নির্ণয় একেবারেই সহজ কাজ নয়। কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করে ছেলে মেয়েদের মধ্যে তা বিতরণ করাকে শিক্ষা দেওয়া বলা চলে না। শিক্ষক যা করতে চান তা করতে পারলেই শিক্ষা দেওয়া হবে না। নির্বাচন, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব স্কুলের আবহাওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুরূপ মনোভাবের উপর শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে।

সেই জন্য ছাত্র-ছাত্রীর মনে কতকগুলি অভ্যাস করিয়ে দিতে হবে; এই অভ্যাস মানসিক ও শারীরিক দু'রকমেরই হবে। জ্ঞান—অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার মধ্যে কি সম্পর্ক তা বোঝবার শক্তি—তার উন্নয়ন করতে হবে। একাধারে উদ্যোগী এবং উৎসাহ হতে শিক্ষা দিতে হবে। এর কোনটি পৃথক ভাবে শিখান যাবে না, সবগুলি একযোগে শেখাতে হবে। তা নাহলে অভ্যাসের দাসত্বে বুদ্ধির বিকাশ নষ্ট হতে পারে, জ্ঞান জীবন্ত না হয়ে কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহে পরিণত হতে, উৎসাহ ও উৎসাহ স্বার্থপরতার পর্যাবসিত হতে পারে।

“শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কি ভাবে মনের ভাব এবং কর্মদক্ষতাকে সাহায্য করে”

যে কোনও বিষয় শিক্ষা দিতে শিক্ষকের বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জ্ঞান থাকাও যেমন দরকার আবশ্যিক বিশেষজ্ঞ হওয়াও সেই রকম দরকার। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী ভাষা নিলে আমরা দেখতে পাই যে এটা সাধারণ ভাবে বিভিন্ন জাতির চিন্তার আদর্শ প্রদানের সহায়তা করে; আবার বিশেষ ভাবে এর সাহিত্য পড়া যায় এবং সাহিত্যের থেকে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়।

জীবনের এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যা গণিতের ভাষা দিয়ে ভালভাবে প্রকাশ করতে পারা যায়, সেই জ্ঞান গণিত শিক্ষা জীবনে প্রয়োজন। কিন্তু তাছাড়াও নির্ভুল

ভাবে কাজ করতে শেখার জন্য গণিত শিক্ষার দরকার হয়। ইতিহাস এবং ভূগোল শিক্ষা করলে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার থেকে হয়। স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্যনীতির শিক্ষা থেকে ছেলে মেয়েরা সামাজিক কর্তব্য ভালভাবে শেখে এবং শিল্প ও কলা শিক্ষার থেকে তারা নিজেদের চিন্তা ও ভাবকে রূপ দিতে শেখে।

স্কুল কি ভাবে জীবনকে সাহায্য করে”

(১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রগতির জন্য পারিপার্শ্বিক গড়ে তোলা।

(২) এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা।

(৩) পূর্ণ কার্যকরী জীবন যাপনের জন্য যে সকল অভ্যাস, জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা, ও উৎসাহ, অর্জন করা প্রয়োজন তা করতে সাহায্য করা।

(৪) যে সকল আদর্শ দিয়ে জীবনকে বিচার করা যাবে সে সকল আদর্শ গ্রহণ করা।

“প্রকৃত শিক্ষার নিদর্শন”

দৈনিক কাজের মধ্যে উপরিউক্ত আদর্শ অনুসারে চলতে চেষ্টা করলেই শুধু হবে না নাগরিক দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে পারলো কি না এই দিয়ে স্কুলের সফলতার বিচার হবে—এমন মানুষ গড়তে হবে যারা যা কিছু স্কুলের যা কিছু সর্বসাধারণের জন্য ভাল তাকেই ভালবাসতে শিখবে। প্রকৃত শিক্ষিত লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ দিয়ে চালিত হবে না, সাধারণের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করতে শিখবে এবং যে কাজ হাতে নেবে তা সম্পন্ন করতে শিখবে; সেই সঙ্গে অন্য লোককে সাহায্য করতেও বিমুখ হবে না। কোন্ স্কুলে এরকম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়, কারণ যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কশিষ্ঠ এবং জ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহলী হয় তারা আনন্দের সঙ্গে এবং নিখুঁত ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করে, তারা জানে যে তারা যা করছে জীবনে সে কাজের মূল্য আছে।

শিশু ও পূর্ণবয়স্কের মধ্যে পার্থক্য

শিশু ও পূর্ণবয়স্কদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে এক রকম হলেও শরীরের প্রয়োজন এক রকম নয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোক যখন হেঁটে যাবে শিশু তখন চাইবে দৌড়িয়ে অথবা লাফিয়ে চলতে, সে এই কারণেই ডিগবাজী খাবে কিম্বা গাছে চড়বে। মনের দিক দিয়েও আমরা এই তুলনা দেখতে পাই। ছোট বড় সবজিনিষ সম্বন্ধেই শিশুর চঞ্চলতা, উৎসাহ এবং উৎসুক্য দেখা যায়। নতুন কোন জিনিষ দেখলেই সেটিকে নাড়া চাড়া করে অথবা সে বিষয়ে অনর্গল কথা বার্তা বলে সে খুসী হয়। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য এই গতি ও চঞ্চলতা একান্ত প্রয়োজন। এই চঞ্চলতার সাহায্য নিয়েই শিক্ষকে শিক্ষা দিতে হবে, একে বাদ দিয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে সে শিক্ষা যে শুধু ব্যর্থ হবে তা নয়, শিশুর শরীর ও মনকে পঙ্গু করে ফেলেবে।

দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলি নিজের সময় মত পরিষ্কৃত হয়। উঠে বসবার শক্তি হ'লে তবেই শিশু বসতে পারে। মানুষের কথাবার্তা শুনে তার মানে বোঝবার এবং অনুকরণ করবার শক্তি হ'লে তবেই সে কথা বলতে পারে। নাসারী স্কুলে যখন শিশু যায় তখন তার শিক্ষা আরম্ভ হয় খেলার মধ্য দিয়ে। তার পরের অবস্থায় সে উদাহরণ দেখে শিখতে পারে এবং তারও পরে সে উপদেশের মানে বোঝে। ক্রমে নিজে নিজে খেলা ছেড়ে সে দলের সঙ্গে খেলা করতে শেখে। শিশুর মধ্যে কোন সময় কোন বৃত্তির বিকাশ হচ্ছে শিক্ষকে সব সময় সেটা খেয়াল রেখে চলতে হবে। প্রত্যেকটি ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজন তাকে মনে রাখতে হবে। ছাত্রকে কোন সময় একক ভাবে শিক্ষা দিতে হবে এবং কোন সময় দলের সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে, এ সবই তাকে বুঝে দেখতে হবে। কেবল মাত্র বুদ্ধি বৃত্তির চর্চা দিয়েই শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন হয় না। জগৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং নিজের শক্তির ব্যবহারের ভিত্তি কতকগুলি Sentiment এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজাত সংস্কার এবং তার স্দের অনুভূতি এবং ধারণা—এই সবগুলি নিয়ে Sentiment তৈরী হয়। সেই জন্য শিক্ষকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে

এবং ন্যায়পরায়ণতা, সেগুলি যেন শিশুর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিশু সম্বন্ধে জানবার আমাদের এখনও অনেক থাকী আছে। তাকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে তার জীবনের গতি এবং শিক্ষণীয় বিষয় এই দু'টি সম্বন্ধেই আমাদের মনে রাখতে হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানসিক উন্নতির ভিত্তি হচ্ছে শারীরিক উন্নতি; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, মনের দুরন্তবেগকে সংযত করে দূরদৃষ্টির সঙ্গে জগতের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেকে গড়ে তোলা, জীবনকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব এবং ভোগ করা—এইগুলি শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

“বাড়ীর ও স্কুলের শিক্ষার সম্পর্ক”

স্কুলে আসবার আগেই শিশু অনেক শিক্ষা বাড়ীতে পায়। নানা বিষয়ে ধারণা, নানা বিষয়ে অনুভূতি, চরিত্রের বিকাশ, যেমন বড়দের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অথবা সব সময়েই অগ্রাহ্য করবার এবং বিদ্রোহিতার ভাব—এই সবই স্কুলে আসবার আগেই অভ্যাস হয়ে যায়। শিক্ষক মনোযোগ সহকারে শিশুর স্বভাব সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখবেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রতি ব্যবহার করবেন। শিশুর কাছে বাড়ীর জগৎ এবং স্কুলের জগৎ বিভিন্ন কিন্তু শিক্ষকের চেষ্টা হবে যে শিশুর বাড়ীর কাজ কর্ম, খেলা—ধূলার সঙ্গে যোগ রেখে স্কুলের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাড়ীর কাজগুলি স্কুলে আরও ভাল ভাবে করতে পারলে শিশুর জীবনে একটি একত্ব বোধ আসবে এবং সে আত্মনির্ভর পরায়ণ হ'তে শিখবে।

বাড়ী এবং স্কুল ছাড়াও শিশুর জীবনে আর একটি জিনিষ কাজ করে, তা হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক। শিশুর কাজ-কর্ম, শিশুর ভাষা, শিশুর বন্ধুত্ব, সবই পারিপার্শ্বিকের উপর খুব বেশী নির্ভর করে। পাড়ার সঙ্গীরা, ক্লাব, সিনেমা, বেতার, খবরের কাগজ—এইগুলিকে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গণ্য করতে হবে। এই সব সম্বন্ধেও শিক্ষকের সচেতন থেকে এগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে।

অভিভাবকদের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্তে “মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী, “শিক্ষা সপ্তাহ” ইত্যাদি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রধান শিক্ষক মধ্যে মধ্যে “অভিভাবক দিবস” রাখেন। এই সকল দিনে অভিভাবকেরা এসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগ আরও সহজ হয়।

যে সহরে বা গ্রামে স্কুলটি অবস্থিত তার চারিদিকে ভৌগোলিক ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া স্কুলের পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। নিজেদের ফুটবল ও ক্রিকেটের দল কত দূরে খেলা করতে গেল কিম্বা পরিচিত লোকদের মধ্যে কে বিদেশে গেল এই সব বিষয়ে আলোচনা করলে নানা শিক্ষণীয় বিষয় সহজেই আরম্ভ হয়ে যায়।

আগের কালে Three Rs. সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই স্কুলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। জীবনে আর সকল শিক্ষা শিশু বাড়ীতে পাবে বলে আশা করা হতো। বর্তমান কালে লোকে মনে করে স্কুলেই সবরকম শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু স্কুল একটি অতি ক্ষুদ্র জগৎ। জীবনের সব অল্পভূতি সেখানে হওয়া সম্ভব নয় এবং বাইরের জগতের ঝড়-ঝঞ্ঝা সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। কাজেই স্কুলের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ হবে যে শিশুকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেওয়া যাতে করে সে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, স্কুলের সাবধানতার আবহাওয়ার বাইরে গিয়েও সে যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তারপরে যতদূর সম্ভব নানা অল্পভূতি নানা কার্য স্কুলের শিক্ষার ভেতরে এনে ফেলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান কালে বেতার ও ছায়াচিত্রের ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার এলো মেলো ভাবে করলে চলবে না, যাকে বাহন হয়ে ব্যবহার করতে চাই সে কর্তা হয়ে

বসলে চলবে না। কোন জিনিষ কি উদ্দেশ্যে ও কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে আগে থেকেই তার গ্লান করে রাখা দরকার। যে সব স্কুলে এইগুলির ব্যবস্থা করবার সংস্থান নেই তাদের চেষ্টা করতে হবে যে শিশুরা নিজেরাই যে বেতার শুনে তার আলোচনা যাতে স্কুলে হয়। নিজেদের সহরে বা গ্রামে যে ছায়াচিত্র আসে প্রয়োজন অনুসারে সেগুলো দেখতেও ছেলেদের নিয়ে যাওয়া যায়।

প্রত্যেক স্কুলেই একটি সময় তালিকা থাকা দরকার। এটির যে কোনও সময় পরিবর্তন করা যাবে না তা নয়, কিন্তু মোটামুটি কাজের একটি বিভাগ থাকিবে। নীচের ক্রাশের ছাত্রদের সময় তালিকার দেখা যাবে যে পড়ার থেকে কাজ এবং খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষা লাভের অংশটা বেশী। উঁচুর দিকে দেখা যাবে পড়াশুনার ভারটাই বেশী। সময় তালিকা প্রস্তুত করবার সময় শিক্ষক বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন যেন মাথার কাজ বা হাতের কাজ অনেকক্ষণ একটানা করানো না হয়। একটি খানিকক্ষণ করবার পরেই আবার অল্পটি খানিকক্ষণ করাতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে স্কুলের আগাগোড়া সব ক্রাশের তালিকা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তিনি সমস্ত স্কুলের কাজ কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কিভাবে চালানো হচ্ছে তা বুঝতে পারবেন।

শিক্ষকেরা যে Syllabus তৈরী করেন তাতে বিভিন্ন পুস্তকের নাম কিম্বা তার থেকে কতখানি পড়তে হবে শুধু তাই লেখা থাকলে চলবে না, সেই বিষয়টি পড়বার উদ্দেশ্য কি এবং কি প্রণালীতে পড়ানো হবে তাও লেখা থাকা দরকার।

শিশু ও পূর্ণবয়স্কের মধ্যে পার্থক্য

শিশু ও পূর্ণবয়স্কদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে এক রকম হলেও শরীরের প্রয়োজন এক রকম নয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোক যখন হেঁটে যাবে শিশু তখন চাইবে দৌড়িয়ে অথবা লাফিয়ে চলতে, সে এই কারণেই ডিগবাজী খাবে কিম্বা গাছে চড়বে। মনের দিক দিয়েও আমরা এই তফাৎ দেখতে পাই। ছোট বড় সবজিনিষ সম্বন্ধেই শিশুর চঞ্চলতা, উৎসাহ এবং উৎসুক্য দেখা যায়। নতুন কোন জিনিষ দেখলেই সেটিকে নাড়া চাড়া করে অথবা সে বিষয়ে অনর্গল কথা বার্তা বলে সে খুসী হয়। শারীরিক ও মানসিক বুদ্ধির জন্য এই গতি ও চঞ্চলতা একান্ত প্রয়োজন। এই চঞ্চলতার সাহায্য নিয়েই শিক্ষককে শিক্ষা দিতে হ'বে, একে বাদ দিয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে সে শিক্ষা যে শুধু বার্থ হ'বে তা নয়, শিশুর শরীর ও মনকে পচু করে ফেলবে।

দৈনিক ও মানসিক শক্তিগুলি নিজের সময় মত পরিষ্কৃত হয়। উঠে বসবার শক্তি হ'লে তবেই শিশু বসতে পারে। মাহুষের কথাবার্তা শুনে তার মানে বোঝবার এবং অনুকরণ করবার শক্তি হ'লে তবেই সে কথা বলতে পারে। নাসারী স্কুলে যখন শিশু যায় তখন তার শিক্ষা আরম্ভ হয় খেলার মধ্য দিয়ে। তার পরের অবস্থায় সে উদাহরণ দেখে শিখতে পারে এবং তারও পরে সে উপদেশের মানে বোঝে। ক্রমে নিজে নিজে খেলা ছেড়ে সে দলের সঙ্গে খেলা করতে শেখে। শিশুর মধ্যে কোন সময় কোন বৃত্তির বিকাশ হচ্ছে শিক্ষককে সব সময় সেটা খেয়াল রেখে চলতে হ'বে। প্রত্যেকটি ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজন তাকে মনে রাখতে হবে। ছাত্রকে কোন সময় একক ভাবে শিক্ষা দিতে হবে এবং কোন সময় দলের সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে, এ সবই তাকে বুঝে দেখতে হবে। কেবল মাত্র বুদ্ধি বৃত্তির চর্চা দিয়েই শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন হয় না। জগৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং নিজের শক্তির ব্যবহারের ভিত্তি কতকগুলি Sentiment এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজাত সংস্কার এবং তার সঙ্গের অনুভূতি এবং ধারণা—এই সবগুলি নিয়ে Sentiment তৈরী হয়। সেই জন্য শিক্ষককে সব সময় মনে রাখতে হবে যে

এবং ন্যায়পরায়ণতা, সেগুলি বেন শিশুর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিশু সম্বন্ধে জানবার আমাদের এখনও অনেক শাকী আছে। তাকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে তার জীবনের গতি এবং শিক্ষণীয় বিষয় এই দু'টি সম্বন্ধেই আমাদের মনে রাখতে হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানসিক উন্নতির ভিত্তি হ'চ্ছে শারীরিক উন্নতি; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, মনের ছুরতবেগকে সংযত করে দূরদৃষ্টির সঙ্গে জগতের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেকে গড়ে তোলা, জীবনকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত এবং ভোগ করা—এইগুলি শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

“বাড়ীর ও স্কুলের শিক্ষার সম্পর্ক”

স্কুলে আসবার আগেই শিশু অনেক শিক্ষা বাড়ীতে পায়। নানা বিষয়ে ধারণা, নানা বিষয়ে অনুভূতি, চরিত্রের বিকাশ, যেমন বড়দের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অথবা সব সময়েরই অগ্রাহ্য করবার এবং বিদ্রোহিতার ভাব—এই সবই স্কুলে আসবার আগেই অভ্যাস হয়ে যায়। শিক্ষক মনোযোগ সহকারে শিশুর স্বভাব সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখবেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রতি ব্যবহার করবেন। শিশুর কাছে বাড়ীর জগৎ এবং স্কুলের জগৎ বিভিন্ন কিন্তু শিক্ষকের চেষ্টা হবে যে শিশুর বাড়ীর কাজ কর্ম, খেলা—ধূলার সঙ্গে যোগ রেখে স্কুলের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাড়ীর কাজগুলি স্কুলে আরও ভাল ভাবে করতে পারলে শিশুর জীবনে একটি একত্ব বোধ আসবে এবং সে আত্মনির্ভর প্রায়শ হ'তে শিখবে।

বাড়ী এবং স্কুল ছাড়াও শিশুর জীবনে আর একটি জিনিষ কাজ করে, তা হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক। শিশুর কাজ-কর্ম, শিশুর ভাষা, শিশুর বন্ধুত্ব, সবই পারিপার্শ্বিকের উপর খুব বেশী নির্ভর করে। পাড়ার সঙ্গীরা, ক্লাব, সিনেমা, বেতার, খবরের কাগজ—এইগুলিকে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গণ্য করতে হবে। এই সব সম্বন্ধেও শিক্ষকের সচেতন থেকে এগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।

অভিভাবকদের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্তে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী, “শিক্ষা সপ্তাহ” ইত্যাদি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রধান শিক্ষক মধ্যে মধ্যে “অভিভাবক দিবস” রাখেন। এই সকল দিনে অভিভাবকেরা এসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগ আরও সহজ হয়।

যে সহরে বা গ্রামে স্কুলটি অবস্থিত তার চারিদিকে ভৌগোলিক ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া স্কুলের পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। নিজেদের ফুটবল ও ক্রিকেটের দল কত দূরে খেলা করতে গেল কিম্বা পরিচিত লোকদের মধ্যে কে বিদেশে গেল এই সব বিষয়ে আলোচনা করলে নানা শিক্ষণীয় বিষয় সহজেই আয়ত্ত্ব হয়ে যায়।

আগের কালে Three Rs. সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই স্কুলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। জীবনে আর সকল শিক্ষা শিশু বাড়ীতে পাবে বলে আশা করা হতো। বর্তমান কালে লোকে মনে করে স্কুলেই সবরকম শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু স্কুল একটি অতি ক্ষুদ্র জগৎ। জীবনের সব অল্পভূতি সেখানে হওয়া সম্ভব নয় এবং বাইরের জগতের বড়-বড় সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। কাজেই স্কুলের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ হবে যে শিশুকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেওয়া যাতে করে সে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, স্কুলের সাবধানতার আবহাওয়ার বাইরে গিয়েও সে যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তারপরে যতদূর সম্ভব নানা অল্পভূতি নানা কার্য স্কুলের শিক্ষার ভেতরে এনে ফেলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান কালে বেতার ও ছায়াচিত্রের ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার এলো মেলা ভাবে করলে চলবে না, যাকে বাহন হয়ে ব্যবহার করতে চাই সে কর্তা হয়ে

বসলে চলবে না। কোন জিনিষ কি উদ্দেশ্যে ও কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে আগে থেকেই তার প্ল্যান করে রাখা দরকার। যে সব স্কুলে এইগুলির ব্যবস্থা করবার সংস্থান নেই তাদের চেষ্টা করতে হবে যে শিশুরা নিজেরাই যে বেতার শুনে তার আলোচনা যাতে স্কুলে হয়। নিজেদের সহরে বা গ্রামে যে ছায়াচিত্র আসে প্রয়োজন অহুসারে সেগুলো দেখতেও ছেলেদের নিয়ে যাওয়া যায়।

প্রত্যেক স্কুলেই একটি সময় তালিকা থাকা দরকার। এটির যে কোনও সময় পরিবর্তন করা যাবে না তা নয়, কিন্তু মোটামুটি কাজের একটি বিভাগ থাকিবে। নীচের ক্লাশের ছাত্রদের সময় তালিকায় দেখা যাবে যে পড়ার থেকে কাজ এবং খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষা লাভের অংশটা বেশী। উচুর দিকে দেখা যাবে পড়াশুনার ভারটাই বেশী। সময় তালিকা প্রস্তুত করবার সময় শিক্ষক বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন যেন মাথার কাজ বা হাতের কাজ অনেকক্ষণ একটানা করানো না হয়। একটি খানিকক্ষণ করবার পরেই আবার অল্পটুকু খানিকক্ষণ করাতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে স্কুলের আগাগোড়া সব ক্লাশের তালিকা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তিনি সমস্ত স্কুলের কাজ কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কিভাবে চালানো হচ্ছে তা বুঝতে পারবেন।

শিক্ষকেরা যে Syllabus তৈরী করেন তাতে বিভিন্ন পুস্তকের নাম কিম্বা তার থেকে কতখানি পড়তে হবে শুধু তাই লেখা থাকলে চলবে না, সেই বিষয়টি পড়বার উদ্দেশ্য কি এবং কি প্রণালীতে পড়ানো হবে তাও লেখা থাকা দরকার।

স্বাধীনতা ও নারীর সমানাধিকার

(ইন্ডিপেন্ডেন্ট উওম্যান পত্রিকাতে ডরোথি কেনিয়ন কর্তৃক লিখিত)

“নারীর সমান অধিকার,” “জাতি, ধর্ম, স্ত্রী, পুরুষ এবং ভাষা নির্বিশেষে সকলের জ্ঞান সমান মৌলিক অধিকার”—এই দুইটিই হইল জাতিসংঘ সনদের গোড়ার কথা। নারীজাতির অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘ যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারাও এই আদর্শ হইতে নিজেদের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করেন। আজ সারা বিশ্বময় মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যে আন্দোলন চলিতেছে, নারী-জাতির অধিকার সম্পর্কীয় আন্দোলনটির উৎপত্তি স্থলও সেখানেই। স্বাধীন জগতে নারীজাতিও মানুষ হিসাবে নিজেদের পূর্ব অধিকার লাভ করিয়া সমাজকল্যাণ তথা বিশ্বকল্যাণের কাজে নিজেদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবেই পালন করিতে চায়। জাতিসংঘ নারীজাগরণের এই মূল কথাটি ভালভাবেই জানেন এবং সেজন্ম নারীজাতিকে তাঁহাদের আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে তাঁহারা সর্বদাই প্রস্তুত।

নারীজাতির অধিকার সম্পর্কিত কমিশনটির উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী। সমগ্র বিশ্বের মোট অধিবাসীদের অধেকের বেশীই তো নারী। কাজেই এই নারী সমাজের মুক্তিতেই মানবজাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে। ফ্রান্সে নারীদিগকে ভোটাধিকার দিবার পূর্বে সেখানে একটা ভয় ছিল যে হয়তো বা নারীরা নিজেদের স্বাভাবিক রক্ষণশীল মনোভাবের জন্ম ফ্রান্সের তদানীন্তন সোশ্যালিস্ট গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ভোটদান করিয়া তাহার পতন ঘটাইবেন। গ্রীসেও একটা ভয় দেখা গিয়াছে যে মহিলাদিগকে ভোটাধিকার দিলেই “তাঁহারা সকলে কম্যুনিষ্টদের পক্ষে ভোট দিয়া সব কিছু গুণগোল করিয়া দিবেন। নারীজাতি সম্পর্কে এই যে অবস্থা ভয়, আমরা চাই জগৎবাসীর অন্তর হইতে তাহা দূর করিতে। আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে যে সুবিধা এবং সুযোগ পাইলে আমরা প্রমাণ করিতে পারিব যে পুরুষ অপেক্ষা বিচারবুদ্ধিতে নারী কোন অংশেই হীন-নয়।

আমাদের এই বিশেষ সংগঠনের মধ্যে জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী, সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রতিনিধি রহিয়াছেন। তবে ১৯৪৯ সালে বেইরুতে এই সংগঠনের যে অধিবেশন হয় তাহার পূর্ব পর্য্যন্তও ইহাতে একটা বিষম গলদ ছিল। পরে এই কমিশনে হাইতির একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার পর ইহার গঠন সর্বোদ্বাসন্য হইল। একজন নিগ্রো মহিলাও এখন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

একথা সত্য যে এখানে আমরা সকলেই কিছু সকলের ভাষা বুঝি না। কিন্তু তাহাতে আমাদের কাজের কোন ক্ষতি হয় না। আমরা সকলেই এই নারী আন্দোলনের মূল প্রমুখ সম্পর্কে একমত। সকল মানুষকেই যে সমান অধিকার দেওয়া উচিত, একথা আমরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করি। এখানেই আমাদের কাজের গোড়াপত্তন। এখন এই আদর্শকে কি ভাবে বাস্তব রূপদান করা যায়, সেইটাই আমাদের পরবর্তী বিবেচনার বিষয়। এজন্ম জাতিসংঘের সেক্রেটারিয়েট আমাদের কাছে তথ্যসংগ্রহের কাজে প্রভূত সাহায্য করিতেছেন। এখানে আমাদের এই প্রাথমিক কার্যের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—কোন কোন দেশে মহিলাদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি এখনও প্রবর্তিত আছে এবং ইহার ফলে মহিলারা সেখানে কোন কোন সুবিধা হইতে বঞ্চিত হন, আমরা তাহা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। যদি দেখা যায় যে কোন একটি দেশে নারীরা ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত আছেন তবে সেখানে আমরা নারীর ভোটাধিকারের স্বপক্ষেই প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ অন্যান্য ব্যাপারেও আমরা অনুরূপ পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকি।

এখন আমাদের কর্মপরিধি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ আমরা নারীর রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকারের জন্যই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি। ভোটদানের অধিকারকে ইহার মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকি।

আমরা জানি এবং বুঝি যে এই অধিকারের বলেই আমরা সমাজে নারীজাতির যোগ্য স্থান করিয়া লইতে পারিব। শিক্ষার ব্যাপারেও নারীর সমান অধিকার লাভ আমাদের অন্যতর প্রধান লক্ষ্য। আমরা জানি শিক্ষা ব্যতীত আধুনিক যুগে মানুষ তাহার অন্যান্য নানাবিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাও আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় জগতে আজও নারীজাতির সম্বন্ধে যে-সমস্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বর্তমান রহিয়াছে সেগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করিয়া আমরা মানব-সমাজকে একটি সুস্থ পূর্ণাঙ্গ রূপদান করিতে কৃতসঙ্কল্প। কোথাও যদি এখনও নারীর ব্যক্তিবোধে সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা বর্তমান থাকে, যদি এখনও তাহাকে ঘবনিকার অন্তরালে পুরুষের “সম্পত্তি” হিসাবে সম্বন্ধে রক্ষা করিবার প্রথা বর্তমান থাকে তবে সেই দুঃস্থ কুপ্রথার উৎসাদনই আমাদের লক্ষ্য।

আমরা যে সমস্ত পরিবর্তন সাধনের সুপারিশ করি তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ আইনকাহ্নের পরিবর্তন প্রয়োজন; কোন কোনটিতে আবার বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক চুক্তির পরিবর্তন প্রয়োজন। কোথাও হয়তো আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন হয় সামাজিক অভ্যাস এবং আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন। আমাদের কাজ, এই সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক তথ্যসংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনানুসারে বিধিনির্দেশদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যুক্তির দ্বারা সত্যকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজ। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার বা জনসাধারণ উভয়ের সহিতই আমাদের যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কখনও সরকারকে বুঝাইতে পারিলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়, আবার কখনও কার্যোদ্ধারের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই জন্যই তো বিভিন্ন দেশের নারীপ্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতা আমাদের এত বেশী প্রয়োজন।

জীবাধীনতা এবং নারীজাতির অধিকারের ব্যাপারে এক এক দেশে এক এক নিয়ম বর্তমান। কাজেই এ-সম্বন্ধে আমাদের কাজও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। দৃষ্টান্তরূপে নারীদের ভোটাধিকার সম্পর্কে বিচার করিলে

দেখা যাইবে যে এব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রীসের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। যুক্তরাষ্ট্রে নারীজাতি পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু এখানে সমস্যা হইল, তাঁহাদের নিজেদের এই আইনসম্মত অধিকার সম্পর্কে তাঁহাদের উদাসীনতা। এজগৎ তাঁহারা “নিজেসই দায়ী—যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইহাতে করিবার কিছুই নাই। অপরপক্ষে, গ্রীসে নারীদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে সেধানকার সরকার। নারীজাতির ভোটাধিকারের স্বপক্ষে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না করিয়া গ্রীস গভর্নমেন্ট সেধানকার নারীদের প্রতি যে অবিচার করিতেছেন তাহার প্রতিকারের উপায় আর মার্কিন নারীসমাজের উদাসীন্য দূরীকরণের উপায় এক।

এই সমস্ত কারণেই আমরা কার্য আরম্ভ করিবার পরেই বিভিন্ন দেশে গিয়া একদিকে সেধানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি, অন্যদিকে সেধানকার নারীসমাজকে যথাসম্ভব শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার পর যখন আমাদের ১৯৪৯ সালের অধিবেশনের জন্য লেবাননের নিকট হইতে আমন্ত্রণ আসিল তখন স্বভাবতঃই আমরা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং জীবাধীনতা ও জীজাতির আত্মাধিকার অবিচ্ছেদ্য। জীজাতির সম্মুখ হইতে যদি এতদিনকার শত শত বাধানিষেধ অপসারণ করা হয় তবে তাহার ফলে সমস্ত সমাজেই পদমকল্যাণ সাধিত হইবে, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবনযাত্রার মান তাহাতে উন্নত হইবে, অতি সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই। কোন দেশের নারীসমাজকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া যদি তাঁহাদিগকেও সমাজসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হয় তবে তাহাতে নিশ্চয়ই কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। আধুনিক জগতে সমস্যার আর যেন অন্তই নাই। এই সমস্তাধীর্ণ জগতে শান্তি, প্রাচুর্য, নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা পাইতে হইলে আজ আর নারী সমাজকে অবহেলা করিলে চলিবে না। যে দেশে নারীকে দয়া করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়, যেখানে নারীর ভোটাধিকার অধিকার নাই, যেখানে জীশিক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই এবং যেখানে কর্মক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের

সমান বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, সে সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে আছে বলিয়া আমরা কখনোই স্বীকার করিতে পারি না। যে দেশের নারীসমাজ পিছনে পড়িয়া আছেন সে-দেশটিও নিশ্চয়ই আজও পিছনের অন্ধকারেই পথ হারিয়েছেন। এমনিধারা দেশ কেবল নিজের “পথেই কাঁটা দেয় না” সে-দেশ কার্যতঃ সমগ্র জগতের অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। জগৎটা তো আর অধেক স্বাধীন, অধেক কৃতদাস হইয়া থাকিতে পারে না! তাই মানবসমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্ত

নারীসমাজকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ণ আত্মাধিকার দেওয়া উচিত। এমনভাবে তাঁহাদিগকে যদি মানুষের অধিকার দেওয়া হয় তবে তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গুণরাশি স্তম্ভ অবস্থায় রহিয়াছে সেগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইবে, মানবসমাজ তাহাতে অশেষ উপকার লাভ করিবে। ইহাতে অথবা ভয় পাইবার কিছুই নাই, কারণ নারীও তো মানুষ! নারীসমাজের পূর্ণ বিকাশে মানুষেরই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিদেশিনী

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত

ওয়াশিংটন, ২০শে অক্টোবর—গত বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ডেনমার্ক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে শ্রীমতী ইউজেনী এণ্ডারসন নারী জর্নেকা মহিলার নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছে। শ্রীমতী এণ্ডারসন মিনেসোটা স্টেটের অধিবাসী।

এই নিয়োগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রীমতী এণ্ডারসন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত (Ambassador)। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও অন্যান্য কয়েকজন মার্কিন মহিলা বিভিন্ন কূটনৈতিক পদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা লাভ করেন নাই।

শ্রীমতী এণ্ডারসন এতদিন ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সমিতির সদস্যা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন নাগরিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিতও তাঁহার সংস্ব ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, কয়েক মাস পূর্বে শ্রীমতী পাল মেটা নারী অপর একজন মার্কিন মহিলাকে প্রায় অনুরূপ একটি কূটনৈতিক পদে নিয়োগ করা হইয়াছিল। শ্রীমতী মেটা বর্তমানে লুক্সেমবুর্গে মার্কিন সচিব (Minister) হিসাবে কাজ করিতেছেন।

শ্বেতকার সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রচারে মার্কিন কলেজের অঙ্গীকৃতি : সতর্কভাবে মার্কিন ধনকুবেরের সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

ন্যাচেল (মিসিসিপি) ৩রা নভেম্বর—সম্প্রতি জর্জ ডাব্লিউ, আর্মস্ট্রং নামে আমেরিকার জর্নেক ধনী তৈলখনির মালিক এই সর্বোচ্চ জেফারসন মিলিটারী কলেজকে ৫ কোটি ডলার প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন যে এই কলেজের ছাত্রগণকে এই শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে যে শ্বেতকারগণ জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ। মাত্র ২০ মিনিট আলোচনার পর উক্ত কলেজের ট্রাষ্টি বোর্ড উল্লিখিত সর্বোচ্চ ঐ অর্থ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ১৪৭ বৎসর পূর্বে মিসিসিপি স্টেটের অন্তর্গত ন্যাচেলের সন্নিকটে উক্ত মিলিটারী কলেজটি স্থাপিত হয়। উহার বর্তমান আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া বলা হইয়াছে। মিসিসিপি স্টেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত।

উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে ট্রাষ্টিগণ ইহাও জানাইয়াছেন যে মিঃ আর্মস্ট্রং যে শিক্ষা প্রদান করার কথা বলিতেছেন ঐরূপ শিক্ষা প্রদান করা জেফারসন কলেজের নীতি নহে, কোনদিন তাঁহারা ঐ নীতি অল্পসারে কার্য

করেন নাই এবং যতদিন পর্যন্ত বর্তমান ট্রাষ্টি বোর্ডের একজন সদস্যও কোন না কোন প্রকারে উক্ত কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত এই নীতি অনুসারে শিক্ষাদান করা হইবে না।

ন্যাচেল ডেমোক্র্যাট পত্রিকা এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে অনেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচিবেন। আমাদের সম্প্রদায়ের বহুলোক ইহাতে আনন্দিত হইবেন।

নিউইয়র্ক টাইলন, বালটিমোর সান, ওয়াশিংটন পোস্ট প্রভৃতি বিশিষ্ট মার্কিন সংবাদপত্রগুলিও এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ট্রাষ্টিগণ যে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশও পুনর্মুদ্রিত করেন।

মিঃ আর্মস্ট্রং উক্ত কলেজের ৫০০০ ডলার ঋণ পরিশোধের

১৯৪৯-৫০ সালের জন্য নিম্নলিখিত ছাত্রছাত্রীদিগকে বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে।

নাম	বাসস্থান	মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ	বিষয়
সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়	রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারীং
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	বেনারস	উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়	পদার্থবিদ্যা
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য	কলিকাতা	মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়	তেজস্বীসাধন
মিসেস রাজমালগি, দেবদাস	তিরুপাতুর	ওহিও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়	গৃহ-অর্থনীতি
হরিকৃষ্ণ গার্গাল	নতুন দিল্লী	কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়	রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং
তালাত আইজাজ	লক্ষৌ	মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়	সাংবাদিকতা
পি, সি, টমাস	কোন্টিয়াস	পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	অর্থনীতি
শান্তা বশিষ্ঠ	ত্রিবাঙ্কুর	শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজবিজ্ঞান
পি, কে, বিজয়রামবন	দিল্লী	ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাণরসায়ন ও পুষ্টি বিজ্ঞান

“সিরিয়ান মহিলাদের ভোটদানে সমগ্র বিশ্বে নবজীবনের সূচনা”

নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার মন্তব্য

নিউইয়র্ক, ২০শে নবেম্বর—গত সপ্তাহে সিরিয়ান মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটদান করিয়াছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, এই ঘটনাটিতে কেবল আরব নারীদের নবজীবন সূচিত হয় নাই; ইহা সমগ্র বিশ্বের নারীজাতির হৃদনের সূচনা করিয়াছে।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আরও বলা হইয়াছে : আরব অগণ যে ক্রমোন্নতির পথে পাই বাড়াইয়াছে একথা বাহারা বিশ্বাস করেন না, গত মঙ্গলবার তাঁহাদের দামস্কাস, আলোপো প্রভৃতি প্রাচীন শহরে যাওয়া উচিত ছিল। সেদিন সেখানে

প্রস্তাব করিয়াছিলেন ট্রাষ্টিবোর্ড তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

জেকারসেন মিলিটারী কলেজ একটি ক্ষুদ্র সামরিক বিদ্যালয়, যাহাদের পূর্বপুরুষ এসিয়া অথবা আফ্রিকা হইতে আসিয়াছে এইরূপ কোনও ব্যক্তি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না বা পরিচালক বোর্ডেরও সদস্য থাকিতে পারিবে না আর্মস্ট্রং এইরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত

ভারতীয় ছাত্রছাত্রী

১৯৫০—৫১ সালে যে সকল ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন করিতে চাহেন তাঁহারা মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা এবং নতুন দিল্লীর যে কোনও স্থানের ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের নিকট হইতে বৃত্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ করিতে পারেন।

১৯৪৯-৫০ সালের জন্য নিম্নলিখিত ছাত্রছাত্রীদিগকে বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে।

নাম	বাসস্থান	মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ	বিষয়
সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়	রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারীং
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	বেনারস	উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়	পদার্থবিদ্যা
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য	কলিকাতা	মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়	তেজস্বীসাধন
মিসেস রাজমালগি, দেবদাস	তিরুপাতুর	ওহিও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়	গৃহ-অর্থনীতি
হরিকৃষ্ণ গার্গাল	নতুন দিল্লী	কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়	রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং
তালাত আইজাজ	লক্ষৌ	মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়	সাংবাদিকতা
পি, সি, টমাস	কোন্টিয়াস	পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	অর্থনীতি
শান্তা বশিষ্ঠ	ত্রিবাঙ্কুর	শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজবিজ্ঞান
পি, কে, বিজয়রামবন	দিল্লী	ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাণরসায়ন ও পুষ্টি বিজ্ঞান

গেলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন কেমন করিয়া মুসলিম মহিলারা জীবনে এই সর্বপ্রথম ভোটদান করিতেছেন। সমগ্র আরব জগতে মহিলাদের ভোটদান এই প্রথম। এই ঘটনাটির বিশেষত্ব এই যে, অতি অল্পদিন পূর্বে যে-দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং যেখানে পুরুষের পূর্ণ ভোটাধিকার এখনও কতকটা নতুন সেখানে আজ মহিলারাও ভোটদানের অধিকার পাইলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমেরিকার নারীরা ভোটদানের অধিকার লাভ করেন; আর ফরাসী মহিলারা এই অধিকার পান মাত্র চার বৎসর পূর্বে।

মার্কিনবার্তা

উদ্বাস্ত সমস্যা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবার অপরিহার্য পরিণতি উদ্বাস্ত সমস্যা। এই উদ্বাস্ত সমস্যা লাঘব করিবার জন্য সরকারী প্রচার, অর্থ ব্যয়, অল্পকম্পামূলক বক্তৃতা, পরিকল্পনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু হতভাগ্য উদ্বাস্তদের জুখের লাঘব হয় নাই, হইবে বলিয়াও আশা করা দুর্বাশা। হিন্দুরা যে ভাবে দলে দলে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে ইতিহাসে ইহার নজির বড় বিরল এবং পরবর্তী কালের পাঠকেরা যখন আজিকার হতভাগাদের বিষয় ইতিহাসে পড়িবে, তখন তাহারা ইহাকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করুক না কেন, ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলিয়া যে গণ্য করিবে না তাহা নিশ্চিত বলা চলে।

উদ্বাস্তদের প্রতি সরকারী ও বেসরকারী যত প্রকার দরদ দেখান হইতেছে, তাহার বিস্তৃততা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ যে নাই তাহা বলা চলে না। পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে যখন উদ্বাস্তরা আসিতে আরম্ভ করে তখন হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বাড়ীর মালিকগণ “পোয়া বারো” গণিলেন। যে বাড়ী পশুর বাসের অযোগ্য তাহাও হাজার হাজার টাকার সেলামীতে ও মোটা টাকার মাসিক ভাড়ার বিকাইতে আরম্ভ করে। ইহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। জনসাধারণের অল্পকম্পা মৌখিক স্বতই থাকুক না কেন, অন্তরের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়।

সরকারী নীতিও এই বিষয়ে সন্তোষজনক নয়। বড় বড় আদর্শবাদী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের হাতে পড়িয়াছে দেশ ও প্রদেশের শাসনভার। তৎসত্ত্বেও উদ্বাস্তদের প্রতি অপরাপর প্রদেশসমূহ সহানুভূতি মূলক আচরণ দেখাইতেছে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে আসামের বান্দাল ভাড়া অভয়ান ও বিহার অঞ্চলের বান্দালী বিদ্রোহমূলক প্রয়োচনা। পশ্চিম বঙ্গ সরকার অবশ্য কিছু করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ইহাতেও গলদ পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহায্য ও পুনর্বাসতি করিবার চেষ্টে আত্মপ্রচার করিবার

প্রয়াসই যেন তাহাদের প্রচেষ্টার পিছনে প্রবল। যেটুকু সরকারী সাহায্যের বরাদ্দ হয় তাহার সম্পূর্ণটাও প্রকৃত ক্রেশ-ভোগকারীদের দ্বারে আসিয়া পৌছায় না। তাহাদের উমেদারী ও তদ্বির করিবার লোক রহিয়াছে, তাহারা ই তাহার ফলভোগ করে বলিয়া অভিযোগ শোনা যায়। পুনর্বাসতির জন্য কয়েক শত উদ্বাস্ত আন্দামানেও পাঠান হইয়াছিল। আন্দামানে পাঠাইবার পূর্বে যে সরকারী প্রচার কার্য চালান হইয়াছিল এবং যাত্রাকালীন বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দায়িত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ যে ভাষণ ও উপভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে করা গিয়াছিল হতভাগাদের ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হইল, তাহারা বুঝি স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত। প্রবাদ আছে “ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে”। এই হতভাগাদের অবস্থাও হইল তাই। হতভাগ্যেরা যে আশা মনে পোষণ করিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা হইতে নিরাশ হইতে হইল এবং শেষ পর্যন্ত আন্দামান ঘাতীর কতকাংশ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। আন্দামান অভিযান যে সার্থক হয় নাই ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ মিলে এবং সরকারী প্রচার বিভাগের নীরবতা হইতেও তাহাই অনুমান হয়।

এতৎ সত্ত্বেও উদ্বাস্ত ও পূর্ববঙ্গের লাঞ্চিত হিন্দু সমাজ সরকারের উপর তাহাদের ভাগ্য সম্বন্ধে নির্ভরশীল ছিল; কিন্তু ১৬ই নবেম্বরের সরকারী প্রেসনোট দেখিয়া তাহাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে। প্রেসনোটের এক স্থানে বলা হইয়াছে “দেশের বর্তমান পর্যায়ে এই অর্থনৈতিক অবস্থায় এত বেশী লোকের সম্পূর্ণ ভার নেওয়া বাস্তবতার দিক দিয়া কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।” লাঞ্চিত জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য আছে, যে অকপট স্বীকারোক্তি সরকার বর্তমানে করিতেছেন, তাহা বঙ্গ বিভাগের প্রাক্কালে ছিল কিনা? পশ্চিম বঙ্গে বা ভারতীয় ইউনিয়নে তাহাদিগের বসবাসের সম্মানজনক ব্যবস্থা করা হইবে এই আশ্বাসেই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করিয়াছিল। আশ্বাসও

দিয়াছিলেন দেশের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। পূর্বের আশা-বাণী ও বর্তমান উক্তির ভিতরে কতটা ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা সরকারের বিবেচনা করা কর্তব্য। “এত বেশী লোক” উক্তিটির দ্বারা সরকার যেন নিজেদের কর্তব্যকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ পূর্ব বঙ্গের সমগ্র হিন্দুর সংখ্যা প্রায় শোয়া কোটি। উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৫ লক্ষের ভিতর; ১৫ লক্ষ সংখ্যার দিক দিয়া যতই অধিক হউক না কেন, পূর্ব বঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার অল্পপাতে অধিক বলা যায় না। কারণ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ লীগের কার্যকলাপ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন, অধিকন্তু কলিকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গাও তাঁহারা দেখিয়াছেন। তাহাতে পাকিস্তানে হিন্দু সম্মান বজায় রাখিয়া থাকিতে পারিবে সেই আশা তাঁহারা নিশ্চয় করেন নাই। কাজেই উদ্বাস্তুর জনসংখ্যা দেখিয়া তাঁহারা যদি নিরস্ত হইতে চাহেন তাহা হইলে এই হতভাগ্যরা যাইবে কোথার? মিঃ জিন্নার “অধিবাসী বিনিময়” প্রস্তাবকে অবাস্তব ও মানববিরোধী বলিয়া কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করিয়া বৃহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কিন্তু সেই কংগ্রেসের সম্মুখে গৃহহীন, সম্বলহীন, লক্ষ লক্ষ পরিবার যদি স্থানান্তরে ও অনাগারে শুকাইয়া মরে তাহা হইলে সেই মহান আদর্শ কি মান হইবে না?

এই ভাগ্যহীন হিন্দুরা স্বাধীনতা যজ্ঞে কী না দিয়াছে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে লাজনাতোগ, কাঁরাবরণ, আত্মাহুতি বাঙ্গালী যতটা দিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের যে প্রেরণা যোগাইয়াছে, অস্ত্রাস্ত্র প্রদেশের তুলনায় তাহা নূনতম নয়ই বরং অধিকতর শ্রেয়—আজ বহু দৈনিক স্বাধীনতা আনিয়াছে তাহাদের জন্ত নিজ দেশে লাজনা, বাহিরে উপেক্ষা। অন্তরের কাতর নিবেদন জানাইবারও তাহাদের স্থান নাই। ইহাকেই বলা চলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস।

প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে “এই সব উদ্বাস্তুরা জোর করিয়া এমন সব জায়গা দখল করিয়া বসবাস করিতে চাহে যে, সে সব জায়গা দখলের কোন প্রকার আইনসম্মত অধিকার তাহাদের নাই। এইরূপভাবে হস্তক্ষেপের পরিণাম সাংঘাতিক” ইত্যাদি। এই উক্তি সরকারের মনের দুর্বলতা ও সঙ্কীর্ণতাই প্রমাণ করিতেছে—উদ্বাস্তগণ আইন বহির্ভূত কার্য যদি করিতে আরম্ভ করিয়া

থাকে, তাহা হইলে প্রারম্ভেই বাধা দেওয়া হয় না কেন? অধিকন্তু উদ্বাস্তগণ অনেক ক্ষতি ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। তজ্জপরি স্বার্থপর ও ধুরন্ধর লোকের দপ্পরে পড়িয়া তাহারা যাহাতে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সরকারের কি কর্তব্য নয় সেই ব্যবস্থা করার? দ্বিতীয়তঃ এমন একাধিক স্থান রহিয়াছে যেখানে উদ্বাস্তগণ সরকারী অনুমোদন ব্যতিরেকেও বসবাস করিতেছে এবং প্রদেশপাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই তথায় আমন্ত্রিত হইয়া পরিদর্শন করিয়াছেন এবং স্মিতহাস্ত দ্বারা উহাদের কাজে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের আচরণ এবং সরকারী প্রেসনোটের কোনটা সত্য তাহা সাধারণের ধারণার বহির্ভূত। তৃতীয়তঃ উদ্বাস্তগণের সকলেই প্র্যাটিকম বা সরকারী সাহায্য শিবিরে থাকিবার শ্রেণীর লোক নয়। ইহাদের ভিতরে অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক রহিয়াছেন যাহারা পূর্ববঙ্গে বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য নিয়া বাস করিয়া আসিয়াছেন। নোয়াখালির দাঙ্গা ও বঙ্গবিভাগের পর হইতে তাহারা মোটা টাকা সেলামী এবং জায্য ভাড়ার ৮-১০ গুণ দিয়াও এমন স্থানে দীর্ঘ ২ বৎসর বাস করিয়া আসিয়াছে যাহা পশুর বাসেরও অযোগ্য। কলে তাহারা অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই হারাইয়াছে। সেই অবস্থায় সরকারী বা বেসরকারী জমি যাহা পতিত রহিয়াছে কার্যতঃ কোন প্রয়োজনে আসে না, সেখানে তাহারা নিজব্যয়ে যদি বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা আইনের চক্ষে অগ্রাঙ্গ হইলেও নীতির চক্ষে বোধ হয় অগ্রাঙ্গ হইবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ৫০এর মর্মান্তকের কথা। যখন সরকারী ও চোরাকারবারীদের কবলে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল পচিতেছিল সেই সময়েই লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশু বৃদ্ধ অনাহারে প্রাণ দিয়াছে, তাহারা কোন প্রতিবাদ জানায় নাই, প্রতিকারের জন্ত আবেদনও করে নাই। তাহারা যদি নীরবে মৃত্যুর কোলে না এলাইয়া প্রতিবাদ করিয়া মরিত তাহা হইলে মৃত্যুর প্রতিকার না হইলেও দেশবাসী সেই অবস্থার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে পারিত। বর্তমান অবস্থাও অনেকটা তজ্জপ দাঁড়াইয়াছে বলা চলে। নিজেদের কোন অপরাধে নয় কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘ্যোগেও নয়, লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশু বৃদ্ধ তাহাদের বড় সাধের বাসভূমি

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং মৃত্যুর কিনারায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হয়ত কেহ বলিবেন, তাহাদের জন্ত ত সরকারী শিবির খোলা রহিয়াছে। উত্তরে বলা যায় ৫০এর মনুষ্যের সময়েও লক্ষ্যরখানা ইত্যাদি বহুপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মৃত্যুকে রোধ করিতে পারে নাই। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থার পরিচালনায় তাহারাই যাইতেছে বাহারা অতি দয়িত্ব এবং সত্য বলিলে বলিতে হয়, তাহাদের অস্তিত্ব লোপকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

সমস্যা জটিল হইয়াছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তদের লইয়া এবং সম্ভবতঃ যে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া। তাহার বিনা প্রতিবাদে মরিবে না এবং তাহার নিজেদের ভাগ্যের জন্ত নিজেরাই সংগ্রামের জন্য উদ্যত হইয়াছে। সরকারী বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলপূর্বক দখল করা আইনের চোখে যেমন অপরাধ আবার একাধারে প্রচুর জমি অব্যবহার্য পড়িয়া থাকিবে বা বড় লোকদের ভাবী সৌধ নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করিবে অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ নরনারী শীত বর্ষায় গৃহচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবে তাহাও নীতির দিক হইতে সমর্থন যোগ্য নয়।

উদ্বাস্তদের সকল কার্যকলাপই সমর্থনের জন্য আলোচ্য প্রবন্ধ নয় বরং ইহাদের মধ্যে অনেক উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ রহিয়াছে তাহাদের বিষয়ে সরকারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন এবং জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয় হইতেছে বর্তমান পরিস্থিতি এবং উদ্বাস্তদের দাবী মিলাইয়া একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান

করা। সরকারের পক্ষে সবকিছু বিধান করা সম্ভব নয় কিন্তু সরকার যদি কেবল মাত্র ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন তাহা হইলে বিপর্যয়ও অনিবার্য। মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তদের ভিতরে শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী এক কথায় রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন অনেকেরই রহিয়াছেন। তাহাদের সহায়তায় এই সমস্যার গুরুত্ব অনেকটা লাঘব হইতে পারে এবং সত্যকার ভাবে তাহারাই শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

প্রতিবন্ধক না হইয়া বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের কাজে সহায়তা করিলেই বরং সমস্যা সমাধানের সুবিধা হইবে। বিশেষতঃ উদ্বাস্তগণের অনেকেই সর্বদা-ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে, এবং তাহার দখলী-কৃত জমির নায্য মূল্য দিতেও পশ্চৎপদ নয়। এমন অবস্থায় সমস্যাকে জটিল না করিয়া বাহারা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দান করাই প্রকৃষ্ট পথ। সেই সঙ্গে আরও মনে রাখা কর্তব্য যে পূর্ববঙ্গে যে নীতি প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে তাহার ফলে আরও অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তের দায়িত্ব ভারত সরকারকে লইতে হইবে। পূর্ব বঙ্গের হিন্দু হিন্দু বজায় রাখিয়া বাস করিতে পারিবে, সে আশা কোন বিজ্ঞানই করিতে পারেন না। পূর্বে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কারণে বহু হিন্দুকেই ধর্মাস্তরিত হইতে হইয়াছে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র হিন্দু সমাজকে করিতে হইয়াছে। আজও যদি ভারতীয় হিন্দু পূর্ব বঙ্গের হিন্দুর যথাবিধি ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন গানি ও অশুশোচনায় ভারতকে বিশ্বের নিকট মন্তক অবনত করিয়া রাখিতে হইবে।

মহিলা সমাচার

ত্রিভ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

ডাঃ বীণা চাটার্জি, পি-এইচ-ডি, (অক্স)

শ্রীমতী বীণা চাটার্জি, একজন কৃতী বঙ্গ মহিলা। তিনি বাল্যজীবনে নানা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা সঙ্ঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি পাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যান। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি পান। তিনি ১৯ শতাব্দীর ব্রহ্মপুত্র রচিত 'বাণেশ্বরদায়ক' শাস্ত্রের উপর গবেষণা করিয়া ডাক্তারি উপাধি পাইয়াছেন। নবম শতাব্দীর লাল কাকত রচিত বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্র "শিখীজি বুদ্ধিদা" পুঁথির ইংরাজিতে অনূবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ১৯৪৭ সাল হইতে ডাঃ চাটার্জি ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তরে সহকারী পরামর্শদাতার কাজে নিযুক্ত আছেন।

প্রথম বাঙ্গালী নারী সৈন্ত বাহিনী

তিন মাস হইল ৭৬তী ছাত্রী লইয়া লেডী ব্রোবোর্গ কলেজে একটি নারী সৈন্ত বাহিনী গঠিত হয়। সম্প্রতি বাংলা, বিহার উড়িষ্যার সর্বসেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহ রায় মহাশয় এই নারী বাহিনীর যুদ্ধ কৌশল ও সামরিক কার্যে দক্ষতা দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আশা করেন কলিকাতার মতন সাংস্কৃতিক ভাবাপন্ন নগরে অবিলম্বে একটি সুসজ্জিত নারী বাহিনী গঠিত হইয়া ভারতের ও বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ কেবল সামরিক জীবনেই প্রয়োজন না, দৈনন্দিন জীবন গঠনেও একান্ত উপযোগী।

টপ কমান্ডার লেফটেনেন্ট মায়া দে এই বাহিনী গঠনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—এই কলেজ হইতে আমাদের তিনজনের দিল্লিতে 'ন্যাশনাল ক্যাডাট কোর' দলভুক্ত হইয়া সামরিক শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্য হয়। এখানে আসিয়া আমার বাঙ্গালী ভগ্নীদের মধ্যে এই সামরিক আত্মবিশ্বস্তি ও কৌশল শিখিবার আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার

বাসনা হয়। এইরূপ শিক্ষা কেবল সামরিক কৌশলে পরিণতি লাভ করিবার জন্য প্রয়োজন নহে, সমাজের নানা হিতকর কার্যের জন্য দরকার। এই ইউনিটের মেয়েদের সামরিক শিক্ষার সহিত ব্যায়াম, খেলা, সস্তরণ, সংঘচলন (ড্রিল), প্রাথমিক চিকিৎসা, পারিবারিক সেবা, টেলিফোন ও রেডিও পরিচালন, টেলিগ্রাফ ও মোটর মোরামত বিভাগে শিক্ষান হয়। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য যুদ্ধসময়ে সৈনিক পুরুষদের আফিস ও ঘাঁটির কার্য হইতে অবকাশ দিয়া প্রত্যক্ষ লড়াই করিতে অবসর দিবার জন্য মেয়েদের প্রস্তুত করিয়া রাখা। ইহার দ্বারা সমাজেরও কল্যাণ হইবে।

নৃত্যশিল্পী গীতা—আমেরিকায়

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর কতকগুলি নৃত্য নাট্য প্রদর্শন করিয়া সদলবলে লণ্ডন হইয়া আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন। ভারতের নৃত্যকলা-কৌশল প্রদর্শন করিয়া উদয়শঙ্কর ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। তিনি নিজে বাঙ্গালী, তাঁহার প্রধানা নৃত্যসঙ্গী তাঁহারই সহধর্মিণী শ্রীমতী অমলা বিখ্যাত ইকনমিক জুয়েলারীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার নন্দীর কন্যা। তাঁহার দলে দীপ্তি ঘোষ, স্মৃতি চক্রবর্তী ও প্রীতি চক্রবর্তী এবং কয়েকজন বাংলার কৃতী নৃত্যশিল্পী আছেন।

এবারে আমেরিকায় যাত্রার প্রাকালে উদয়শঙ্কর কয়েকটি নৃত্য শিল্পী সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে গীতা নন্দী অন্যতম। বয়স নবীন (১৩) কিন্তু নৃত্যশিল্পে দক্ষতা খুবই প্রথর। তিনি অমলার কনিষ্ঠা। বাংলার ছেলে মেয়েরা যতই বিশ্বে তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিবে ততই বাংলার গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে প্রথম মহিলা ভাইস চ্যান্সেলার

ভারতের মহিলারা শিক্ষাপ্রদান কার্যে বহু বৎসর ধরিয়া লিপ্ত আছেন। তাঁহারা বড় বড় মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হইয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের

পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হইবার গৌরব
ভারতের কোন নারীর পক্ষে লাভ করিবার সৌভাগ্য হয়
নাই।

বরদা ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে শ্রীমতী
হংসা মেটা মনোনিীত হওয়াতে ভারতের শিক্ষিত নারী সমাজ
আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। বরদা বিশ্ববিদ্যালয় আকারে বড়
না হইলেও বরদারাজ্য শিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা দানে

ভারতের ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে অগ্রণী।
অতএব শ্রীমতী মেটার নিয়োগে আমরা আনন্দিত।

মহিলা সাধারণ সম্পাদিকা

কুমারী গৌরী ভট্টাচার্য মেদিনীপুর কলেজ ইউনিয়নের
সাধারণ সম্পাদিকা ও পত্রিকা সম্পাদিকা নির্বাচিত হইয়াছেন।
মেদিনীপুর কলেজের শতাব্দী কালের মধ্যে মহিলা সম্পাদিকা
এই প্রথম। কুমারী ভট্টাচার্য একসঙ্গে ২য় বর্ষ বিজ্ঞান,
৩য় বর্ষ কলা ও লোকশিক্ষা সংসদের ছাত্রী। আমরা
তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি রজত জয়ন্তী উৎসব

আগামী ১০শে জানুয়ারী ১৯৫০, সরোজ নলিনী নারী
মঙ্গল সমিতির ২৫ বৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে। এতদুপ-
লক্ষে সমিতির যে রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং
সমিতি ভবনে শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। উক্ত সম্মেলন এবং
শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ
সমাজ সংস্কার মূলক বহু প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানান হইবে।

স্বদীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি
মহিলাদের শিক্ষা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে
কাজ করিয়া আসিতেছে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এবং

পার্ব্বর্তী প্রদেশসমূহে মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া মহিলাদের
ভিতরে কর্মপ্রেরণা এবং স্বাবলম্বী হইবার সন্ধান এই সমিতিই
দিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের নারীজাতির অশিক্ষা
এবং বিশেষ করিয়া বিধবাদের দুর্দশার বিষয় সকলেই অবগত
আছেন। এই অনাথা বিধবাদের জীবিকা অর্জনের সন্ধান
দিয়া সরোজনলিনী-নারী মঙ্গল সমিতি সমগ্র ভারতে বিশিষ্ট
স্থান অধিকার করিয়াছে।

উক্ত রজত জয়ন্তী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে সকলকে
আন্তরিক আবেদন জানান যাইতেছে। বিস্তারিত কর্মসূচী
বঙ্গলক্ষ্মীর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীশান্তা দেবী

বাংলা বর্ষলিপি—সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া
রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৮ টাকা মাত্র।

বাংলা ভাষায় ইহা একটি প্রয়োজনীয় বই। সচরাচর
শিক্ষক, রাজনৈতিক ও সাংবাদিকরা ইংরাজী বর্ষলিপি ব্যবহার
করেন। বাংলায় এইরূপ পুস্তক থাকিলে সাধারণ ইংরাজী
জানেন না তাঁহারাও অপরের সাহায্য ব্যতীত সহজে তথ্য
সংগ্রহ করিতে পারেন। বইটিতে আদম স্মারী, কৃষি,
ঘটনাপ্রবাহ চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গালী,
বাজেট ভারতবর্ষ, শিল্প শাবসাবানিজ্য, ভারত সরকার,
পাকিস্তান প্রভৃতি বহু বিষয়ের তথ্য আছে। লাইব্রেরী ও
স্কুলে এই জাতীয় পুস্তক রাখিলে ভাল হয়।

তবে যে সকল বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়া খবর সংগ্রহ
করিতে হয় তাহা যাহাতে আরও নিখুঁত হয় সেদিকে
সম্পাদকের দৃষ্টি রাখা দরকার। “ভারতীয়দের মধ্যে
বাঙ্গালীই প্রথম” একটি চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় বিষয়।
কিন্তু ইহাতে অনেক বিখ্যাত বাঙ্গালীর নাম বাদ
পড়িয়াছে। যথা—

প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট বাঙ্গালী।

প্রথম অসবর্ণ বিবাহ বাঙ্গালী করেন।

প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ বোধহয় বাঙ্গালীই করেন।

আরও অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী পথ প্রদর্শক, তাহার সম্পূর্ণ
তালিকা চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করা দরকার।

বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গালীর মধ্যেও পুরুষ ও নারী
অনেকের নাম বাদ পড়িয়াছে। নারীর নাম নাই বলিলেই
চলে।

পরবর্তী সংস্করণে এই সকল দিকে আর একটু লক্ষ্য
রাখিলে বইটির আদর বাড়িবে।

বিলাতের চিঠি—শ্রীনগেন্দ্র নাথ রক্ষিত প্রণীত।
প্রকাশক ডাঃ সচ্চিদানন্দ, ৬-এ যতীন দাস রোড, কলিকাতা
—২৬। সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী। মূল্য—২৮ টাকা।
ডবল ক্রাউন, ১০২ পৃঃ।

এই বইখানিতে নগেন্দ্র বাবুর ইংলণ্ড ও ইউরোপ
ভ্রমণের কিঞ্চিৎ কাহিনী লিখিয়াছেন। ভ্রমণ কাহিনী হইলেও
অনেক জটিল ও জ্ঞাতীগঠনের মূল্যবান তথ্য ইহাতে আলোচিত
হইয়াছে। ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও জার্মানীর
যুদ্ধোত্তর কালের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অল্পবিধা ও
দুর্ভাগ্যতার সহিত বাঙ্গালীর ঋণ ও পরণ সমস্তার তুলনামূলক
সমালোচনা “বিলাতের চিঠি” কয়েক পৃষ্ঠায় সুনিপুণ
ভাবে লেখা হইয়াছে। স্বাধীন জাতির নাগরিক হইতে
হইলে যে সব গুণের অধিকারী হইতে হয় তাহারও ইঙ্গিত এই
পুস্তকে কিছু পাওয়া যায়। এ পুস্তকটি মন দিয়া পাঠ
করিলে আধুনিক যুগের বাঙ্গালায় সামাজিক বিশৃঙ্খলার
সমস্তা সমাধানের বিষয় কিছু জানা যায়।

নগেন্দ্র বাবু স্বয়ং একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লৌহ শিল্পপতি।
তিনি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দেশের যুবকদের স্বদেশের
শিল্প উন্নতির প্রচেষ্টাগুলি ধরিয়া বাঙ্গালী যুবকদের শিল্প
উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।

বইখানি যে কেবল প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা দেশবিদেশের
ঐশ্বর্যের কথাই পূর্ণ তাহা নয়। নগেন্দ্র বাবু দরদ দিয়া
জার্মান বালক ও যুবতীর পরাধীনতার তীব্র জালা ও অপমান
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা কেবল যে পাঠকের মনকে দ্রবীভূত
করিয়া ফেলে তাহা নহে—কারণ সাহিত্যও সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীঅণামিকা

রান্নাঘর

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

বিলাতী পাক প্রণালীতে প্রস্তুত কয়েক রকম খাবার
যে ক'টি খাবারের রান্নার প্রণালী দেওয়া গেল—এগুলি অত্যন্ত সাধারণ বিলাতী বা আমেরিকান ঘরে করা হয়ে থাকে। এগুলি করা খুব সহজ এবং এত সাধাসিধে যে শিশুরা খেলেও কোন ক্ষতি হবে না।

আমাদের দেশে এখন এত ভেজাল তেল ঘিয়ে রান্না করতে হয় যে তা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। তার চেয়ে কখনও কখনও এই জাতীয় জিনিষ করে খেলে মনে হয় অনেক রোগ কমে যাবে। এই খাবারগুলি সব ক'টি আলাদা করে খাওয়া যায়—যথা, দুপুরে খাওয়ার সময় ওসব দেশে, মাছের ক্রোকের খুব চলতি আছে। সঙ্গে কিছু সবজির (গাজর, ফ্রেন্চ বিন, টমাটো, ইত্যাদি) সেলাড থাকে। চায়ের সময় বড়াগুলি খাওয়া যায়, কারণ চট করে করা যায়, এবং সস্তার অনেক হয়। মাংসের মোন্ড বা হাঁচি দুপুরে বা রাত্রে খাওয়া চলে।

এই ধরনের খাবারকে ওসব দেশের “simple meal” বা সাধারণ খাবারের নমুনা পাওয়া যায়।

মাছের ক্রোকে

(৪ জনের পরিমাণ)

১১/৮ মাছের পুর * ১০/৮ সাদা সস * * ১টা মুরগীর ডিম ১ পেয়লা কটর ক্রাশ (পাউরুটির) ১ চায়ের চামচ পরিমাণ কুচানো পাসলি পাতা।

অল্প গোলমরিচ বা কাঁচা লবঙ্গ, স্বাদের জন্য। ছুন (আন্দাজ মত), ভাজবার মত ঘি।

প্রণালী—সসটা গরম থাকতে থাকতে এর সঙ্গে মাছের পুর, ছুন পাসলি পাতা কাঁচা লবঙ্গ ইত্যাদি মেখে নিন। সমস্ত পাকটা ঠাণ্ডা হতে দিন। এর পর এক চামচ পুর নিয়ে লবঙ্গ পান্ডয়ার মত গড়ুন। খুব আলগা ভাবে গড়বেন কারণ পুরটা এত নরম যে সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে। এর পর এগুলি একবার ক্রাশে ভাল করে গড়িয়ে নিন। ডিমটা অল্প ফেটিয়ে আবার ক্রাশে গড়িয়ে মেখে নিন। খুব গরম ঘিয়ে ভাজুন। বেশ লাগচে রংহলে ঝাঁজরা দিয়ে ঘি ছেঁকে তুলবেন। ঘি গায়ে লেগে থাকলে মুচমুচে ভাবটা চলে যাবে। গরম থাকতে থাকতে পাত্রে দেবেন।

পুর :—সাধারণতঃ বড় কাটা মাছের থেকেই ভাল পুর হয়। মাছটা অল্প জলে (একটু ছুন দিলে ভাল স্বাদ হয়) সেদ্ধ করে, কাঁটা, ছাল, সবকিছু বেছে নেবেন। পরে খুব মিহি করে চটকে নেবেন যাতে গড়বার সময় বড় বড় টুকরো না থেকে যায়। পেঁয়াজ, আদার কুচি দিয়ে মেখে নেবেন।

* * **সাদা সস**—১/৮ ঘি বা ২৥ বড় চামচ মাখন, ১ পেয়লা ময়দা, ১ পেয়লা গরম দুধ, ছুন, গোলমরিচ, অল্প চিনি।

প্রণালী—ঘি বা মাখন গালিয়ে নিন। ময়দাটা (আগে ভাল করে চালুনিতে চেলে নেবেন) এর মধ্যে চেলে নেড়ে মিশিয়ে নিন। সমস্তটা টগবগ করে ফুটে উঠলে উল্লুনের পাশে রাখুন। এতে আঁস্তে আঁস্তে গরম দুধটা সব চালুন যতক্ষণ না ভাল করে ফোটে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন। ছুন, গোলমরিচ আর চিনিটা (আন্দাজমত স্বাদের উপর নির্ভর করে) ছড়িয়ে দিন।

সসটার বিশেষত্ব এই যে খুব সাদাসিধে ভাবে সিদ্ধ খাবারেও স্বাদ দান করে—এবং শিশুর খাবার থেকে আরম্ভ করে রোগীর পথ্যের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

মাংসের মোল্ড বা ছাঁচ

১ পেয়ালা সাদা সস, ১টা কাটা পেঁয়াজ, ছন, গোলমরিচ
অল্প চিনি ও কুচানো পাসলি পাতা, সামান্য ঘি বা মাখন।

৷ কিমা মাংস, ২টা আলু, ২টা গাজর, ১টা স্কোয়াশ
১টা মুরগীর ডিম, ১ মুঠো ফ্রেঞ্চ বিন, ১ বা ১২ পেয়ালা
কটির ক্রাশ বা কটির শাঁস (জলে ভেজানো)

প্রণালী—কিমাটা ছন জলে সেদ্ধ করে নিন।
তরকারিগুলি ছোট চৌকো টুকরো করে কেটে সেদ্ধ করে
নিন। ডিমটা অল্প ফেটিয়ে নিন। মাংসে ছন ইত্যাদি
মেখে সঙ্গে পেঁয়াজ মিশিয়ে নিন। পরে, তরকারির সঙ্গে
এবং পাউরুটির শাঁস বা ক্রাশের সঙ্গে একত্রে চটকে নিন।
ডিমটাও এতে মাখন। সমস্ত পাকটির সঙ্গে এখন সস
মাখন। এর গাঢ়তার পরিমাণ এখন ঘন ক্ষীরের মত হওয়া
উচিত। এর পর ঘি বা মাখন অল্প নিয়ে ভাল করে
ছাঁচটাতে (ছোট এলুমিনিয়াম পাত্র) মাথাবেন, তারপর
তাতে পুরটা ঢালুন। একটা বড় ডেকচিতে এই পাত্রের
অর্দ্ধেক পর্যন্ত পৌছয় এর কম জল দিয়ে, মুখটা ভাল করে
বন্ধ করে ছাঁচটা ফুটতে দিন। প্রায় ঘণ্টা ২২। ফুটবে।
ভাল করে ফুটে, হয়েছে কিনা তার প্রমাণ পাবার জন্য
একটা খড়কে কাঠি নিয়ে ছাঁচের ভেতরে ঢুকিয়ে দিন।
শুকনো অবস্থায় কাঠি বার হয়ে এলে বুঝবেন হয়ে গেছে।
গরম থাকতে থাকতে ভোতা ছুরি দিয়ে পাত্রের ভেতর
থেকে ছাঁচ আলগা করে নিন। ভাল করে ঘি বা মাখন
মাখিয়ে থেকে থাকলে এটা সহজে হয়। বড় প্লেট বা থালা
এই ছাঁচের উপর উল্টো করে রাখুন তারপর সবস্বচ্ছ উপড়
করে দিন। মাংসটা ছাঁচের পাত্রের গড়নে স্থান্য ভাবে
প্লেটের উপর বেরিয়ে আসবে। পাউরুটি বা কেকের মতই
কেটে কেটে গরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করবেন।

(৪—৬ জনের পরিমাণ)

বড়া

২ গেসাম জল, ২ছটাক মাখন, ১ ছটাক চিনি, ২টা
মুরগীর ডিম, ১ ময়দা, ঘি ও ছন।

প্রণালী—১ জল, মাখন, চিনি ও ছন এক সঙ্গে
ফুটতে দিন।

২। ফুটে গেলে নামিয়ে, ময়দাটা (আগে চলে নেবেন)
অল্প অল্প করে ঢেলে দিন।

৩। নরম আঁচে ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে নিন এবং
পরে ঠাণ্ডা করতে নামিয়ে নিন। এখন একটা একটা
করে ডিমগুলি মিশিয়ে নিন। আগে অল্প অল্প ফেটিয়ে
নেবেন।

৪। বড়া ভাজার মতন করে গরম ঘিতে ফেলুন।
টোপ টোপ হয়ে ভেসে উঠবে, লালচে লালচে হলেই বাজরা
করে ঘি ছেকে তুলুন। এই ভাবেই পরিবেশন করতে
পারেন, বা ছুধের কাষ্টার্ডের সঙ্গে দিতে পারেন।

*

*

১। ছুটা বড় চামচে চিনি।

২। মুরগির ডিম তেনিলী বা লেবুর এসেন্স।

প্রণালী—১। ডিমটা ভাল করে ফেটিয়ে নেবেন যাতে
আপনিই দাঁড়ায়।

২। ছুধে চিনি দিয়ে ফেটান। ভাল করে ফুটলে,
নামিয়ে ঠাণ্ডা করুন।

৩। ডিমে এই হাত সওয়া ছুধ, চিনি আন্তে আন্তে
ঢেলে দিন।

৪। বড় ডেকচিতে এই ছুধের পাত্রটা রাখুন। এর
অর্দ্ধেক পর্যন্ত জল দিয়ে, জলটা ফুটতে দিন।

৫। এই সময় ছুধে তেনিলী বা লেবুর এসেন্স দিতে
পারেন। জলটা ফুটতে থাকলে, ছুধটা হাতা দিয়ে নাড়তে
থাকুন, কারণ এখন ঘন হয়ে আসবে।

৬। ঘন ক্ষীরের পরিমাণ হ'লে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে
দিন। এই সসটা যেন কোন প্রকারে না ফোটে, কেবল
বাইরের জলটাই ফোটে কারণ ত'হলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।
বড়গুলি এমনিতে জলখাবারের সময় খাওয়া যায়। এই
কাষ্টার্ডটা সঙ্গে দিলে রান্ধিরে বা দিনে, পুজি-এর জন্যও
চলতে পারে।

(৪—৬ জনের পরিমাণ)

স্বদেশ ও বিদেশ

ক্রীষ্মাকান্ত দে

মুদ্রা-মূল্য হ্রাস

সেপ্টেম্বর মাসে যে ঘটনা সমস্ত জগৎকে বিচলিত করিয়াছিল, তাহা হইতেছে বিলাতী পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস। বিলাতের অর্থ সচিব ইতিপূর্বে বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পাউণ্ডের দাম কমান হইবে না। এমন কি সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা যাত্রার প্রাকালেও তিনি তাঁর মত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন। তথাপি পাউণ্ডের দাম হ্রাস করা হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ গোপনতার কারণ এই বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, পূর্বাঙ্কে জানিতে পারিলে কাল-বাজারীরা আগে থেকে আমেরিকান মাল কিনিয়া রাখিয়া বেশী দামে বিক্রী করিতে পারে, তা নিবারণ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা।

ডিভ্যালুয়েশন বা মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের অর্থটা বুঝিয়া দেখা যাক। বিলাতী মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টালিং এবং আমেরিকান মুদ্রা ডলার। পূর্বে ইহাদের সম্পর্ক ছিল ১ পাউণ্ড = ৪.০৩ ডলার। কিন্তু বর্তমানে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করার অর্থ—১ পাউণ্ড = ২.৮০ ডলার। অর্থাৎ আমেরিকার সহিত বিলাতের মাল আদান প্রদানে আগে একজন ইংরেজ সওদাগর যে মাল পাইতেন এখন তার এক তৃতীয়াংশ কম পাইবেন। ফলে প্রত্যেক ইংরেজ সওদাগরের নিকট এখন আমেরিকান জিনিষের দর কাজে কাজেই চড়া হইবে।

পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে টাকার দামও ঠিক সেই অল্পপাতে কমান হইয়াছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, ষ্টালিং আয়তনের প্রায় সকল দেশ তাদের মুদ্রা মূল্য কমাইয়া দিয়াছে। ফলে আমাদের সহিত বিলাতের ও অন্য যে সব দেশ মুদ্রার মূল্য কমাইয়াছে, সেগুলির সম্পর্ক প্রায় পূর্বের মত আছে। কিন্তু অন্য যে সব দেশ মুদ্রামূল্য কমায় নাই তাদের সহিত সম্পর্ক আমাদের আমেরিকার সহিত সম্পর্কের মত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান প্রধান। অন্য দিকে যে সকল দেশ মুদ্রামূল্য কমায় নাই, সেগুলি আমেরিকার সহিত লেনদেনে আমাদের চেয়ে বেশী সুবিধার মাল আমদানি করিতে

পারিবে এবং তাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক আমাদের সহিত আমেরিকার সম্পর্কের মত হইবে।

আমেরিকার সহিত ভারতের সম্পর্কটা বুঝিয়া দেখি। আমাদের এক টাকা = ১ শিলিং ৬ পেন্স। ∴ অতএব ১ পাউণ্ড = ১৩/৪ পাই অর্থাৎ ৪.০৩ ডলার = ১৩/৪ পাই ছিল, সুতরাং ১ ডলার = (প্রায়) ৩/০ ছিল এখন ২.৮০ ডলার = ১৩/৪ পাই

অর্থাৎ ১ ডলার = ৪৬২৩ পাই

অন্ত কথায়, টাকার তুলনায় ডলারের দাম বাড়িয়াছে। আগে যেখানে ৩/০ দিলে ১ ডলার পাওয়া যাইত এখন সেখানে ৪৬২৩ পাই দিতে হইবে বা ১৩/২৩ পাই বেশী দিতে হইবে। প্রত্যেক ১০০ ডলারে এখন আমরা যত টাকা দি তার চেয়ে ১৪৫ টাকা বেশী দিতে হইবে। আমেরিকান জিনিষের দর বাড়িবার কারণ হয়ত এতক্ষণে বুঝা যাইবে।

ভারতীয় মুদ্রার মূল্য-হ্রাসের অর্থাৎ পাউণ্ড ষ্টালিং আয়তনের সহিত ভারতের যুক্ত থাকিবার কারণ ভারতের অর্থ-সচিব ডক্টর জন ম্যাথাই বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বিশ্ব আর্থিক ভাণ্ডার হইতে ভারতকে বেশ বেশী রকম ধার লইতে হয়। ষ্টালিং আয়তনের সহিত যুক্ত না থাকিয়া এই সুবিধা পাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষ খাদ্য-দ্রব্য ও নানারকম কাঁচা মালের জন্য পর-মুখাপেক্ষী। ইহার মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যের অনটনটাই ভয়ানক। সেজন্য ভারত সরকার পরিকল্পনা করিয়াছেন, আগামী ২১ বৎসরের মধ্যে আমাদেরকে খাদ্য বিষয়ে স্ববলস্বী হইতে হইবে। বস্তুত, বিলাতে ভারতের সঞ্চিত কোটি কোটি ষ্টালিং শুধু বিদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতেই আমরা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি। অর্থ-সচিব আমাদের ভরসা দিয়াছেন দেশের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্য ও অত্যাধিকারী দ্রব্যের দর বাহাতে না বাড়ে অথবা কম হয়, সেইজন্য ভারত সরকার দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ইতিপূর্বে যে সকল মালের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি পূর্ব মূল্যেই পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ হইতে পাওয়া যাইবে।

আমাদের সব চেয়ে বেশী অসুবিধা হইয়াছে, পাকিস্তান মুদ্রামূল্য না কমানতে। পাট, তুলা, চামড়া, চা প্রভৃতি আমরা পাকিস্তান হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করি। এগুলির দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্তানে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের সহিত বাংলা দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। দুই দেশে দুই প্রকার মুদ্রা মান প্রচলিত থাকায় আমাদের প্রতিদিন কার স্বাভাবিক আদান-প্রদান পর্যন্ত ব্যহত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম বঙ্গে জিনিষ আসিতে না পারার দরুণ খুব সম্ভাব্য সেখানে বিকাইতেছে কিন্তু বেপারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এদিকে ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তার ফলে তাঁরা আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় পাট ও তুলা উৎপাদন করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে পাট কলের মালিকরা—প্রায় সব পাট কল পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত—স্থির করিয়াছেন তাঁরা পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দরে পাট কিনিবেন না। পাটের দর সরকার বাধিয়া দিয়াছেন। তুলার সম্বন্ধেও চেষ্টা হইতেছে, পাকিস্তানের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ চালাইবার জন্ত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে দেশ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী করে সে অধম দেশ, তাকে ঋণ শোধ করতে হয়। ইহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য বলে। ভারত এখন প্রতিকূল বাণিজ্যের আওতায় পড়িয়াছে। সেজন্য ভারত স্থির করিয়াছে, আমদানি যথাসাধ্য কমান্বই ও রপ্তানি বাড়ান্বই। অল্পকূল বাণিজ্য সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত অর্থদ্বারা ডলার আয়তন হইতে জিনিষ কেনা সম্ভব হইবে। ভারতীয় মুদ্রা-দ্রুপও সেই উদ্দেশ্যে অবলম্বিত হইয়াছে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্রোতকে কৃত্রিম উপায়ে দিক্ পরিবর্তন করানো সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।

মুদ্রা মূল্য হ্রাস-জনিত সমস্যা

বিগত ১০ই অক্টোবর বাণিজ্য-মন্ত্রি শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগী ভারতীয় পার্লামেন্টে মুদ্রা-মূল্য হ্রাস জনিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্ত ভারত সরকার কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, কাঁচা পাট, কাঁচা তুলা আমদানিই রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বৃদ্ধির কারণ। ১৯৪৮-৪৯ সালে

আমদানি করা হয়:—খাদ্যদ্রব্য—১৩০ কোটি টাকা, যন্ত্রপাতি—৮১ কোটি টাকা, কাঁচা পাট—৭০ কোটি টাকা, কাঁচা তুলা—৬৫ কোটি টাকা। ১৯৪৯ সালে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণ নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নিয়োগী মনে করেন, বুঝা যাইতেছে, তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান দ্রাব্যনীতি অনুসরণ করায় সেখানকার জনগণ হুৎ হুৎ ভোগ করিতেছে। তিনি আশা করেন, খাদ্যোৎপাদনের ক্ষতি না করিয়াও আগামী বৎসর পাট-উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে। তুলা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী নিম্ন লিখিত আট দফা ব্যবস্থা অবলম্বন যুক্তি-যুক্ত মনে করেন।

(১) বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহিত একমত হইয়া সরকার তাঁদের পাট ও তুলা নীতি ঘোষণা করিয়াছেন।

(২) ফাটকা বাজারে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি নিরোধের জন্ত এবং রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে যাতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে এবং ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য সম্ভা হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনে ভারতের ক্ষতি নিবারণের জন্ত, বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্যের উপর রপ্তানি কর ধার্যের জন্ত অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে।

(৩) কয়লা রাষ্ট্র-পরিচালিত করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

(৪) পাট শিল্পপতিদের সহিত পরামর্শ করিয়া নতুন রপ্তানি নীতি স্থির করা হইয়াছে। তাহাতে ডলার অঞ্চলে উহা পাঠানো যাইবে। যানবাহনের-সুবিধাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

(৫) তুলা ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনার পর তুলা নীতি ধার্য হইতে বাইতেছে।

(৬) অবাধ্য বাণিজ্য লাইসেন্স দ্বারা পাকিস্তান হইতে পণ্য আমদানি বাতিল করা হইয়াছে।

(৭) আমেরিকা হইতে আমদানি অত্যাবশ্যক ভেজের মূল্য বৃদ্ধি বা অভাব বাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৮) রপ্তানি বৃদ্ধি কমিটির সুপারিসগুলি দ্রুত বিবেচনা করা হইতেছে।

পাটের কথা

ভারতীয় পাটকল সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, পাটের মণ করা মূল্য ৩৫ টাকার না হইলে তাঁরা পাকিস্থান হইতে পাট কিনিবেন না।

দেশ-বিভাগের পর হইতে পাট-চাষ বৃদ্ধির জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৪৭ সালে ভারতে ১৭ লক্ষ গাঁট, ১৯৪৮ সালে ২২ লক্ষ গাঁট উৎপন্ন হইয়াছিল। আশা করা যায় ১৯৪৯ সালে ৩০ লক্ষ গাঁট পাওয়া যাইবে। ১৯৫০ সালে ৪৫ লক্ষ গাঁট পাট উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। ইহা ছাড়া এবৎসর ছয় লক্ষ গাঁট মেস্তা বা বিমলি পাটম্ এবং দুই লক্ষ গাঁট শন পাট পাওয়া যাইবে। কাঁচা পাটের পরিবর্তে ইহাদের ব্যবহার চলে। এই বৎসরের পাটের হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাটকল সমিতির নিকট মজুত..... ৭.১৩ লক্ষ গাঁট। পাকিস্থানে পূর্বের খরিদা মাল—এখনও ডেলিভারি দেওয়া হয় নাই..... ৬.৭৫ লক্ষ গাঁট

ভারতে উৎপন্ন..... ৩০ লক্ষ গাঁট

মেস্তা ৬ ,, ,,

শন পাট ২ ,, ,,

৫১.৮৮ লক্ষ গাঁট

ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ গাঁট রপ্তানি করিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মিলগুলি চালু রাখিলে আগামী ১২ মাসে আমাদের ৪২।৪৩ লক্ষ গাঁটের বেশী পাট দরকার হইবে না। অর্থাৎ পাকিস্থান হইতে পাট না কিনিলেও পাট-কলগুলি এবৎসর কাজ চালাইতে পারিবে ও ১৯৫০ আগস্টে ৫ লক্ষ গাঁট বা ওতোধিক মজুত থাকিবে।

গত বৎসরের চুক্তি অনুসারে পাকিস্থানের ৫০ লক্ষ গাঁট পাট যোগাইবার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্থানে পাটের দাম চড়া হারে চাওয়ার মিল মালিকেরা ৪১ লক্ষ গাঁটের বেশী ক্রয় করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই সব মিল ৩০ লক্ষ গাঁটের বেশী পায় নাই। তথাপি কোন সংকট দেখা নাই।

ভারতে তুলার অবস্থা

ভারতে বৎসরে ৪২২ লক্ষ গাঁট তুলার প্রয়োজন। তন্মধ্যে ৩৫ লক্ষ গাঁট পূর্ক-ভারতে উৎপন্ন হয়, বাকী ৭২ লক্ষ

গাঁট বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। সুতী-বস্ত্রের উপর হইতে কর প্রত্যাহত হওয়ায় বস্ত্র-রপ্তানি প্রসারিত হইয়াছে, আর মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের ফলে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রের স্ববিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উপনিবেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ হইতে ২৪ কোটি ২০ লক্ষ গজ কাপড় কিনা হইতে পারে, একটা বড় অংশ ভারত সরবরাহ করিতে পারিবে।

১৯৪৮ সালের পূর্বাভাস অনুসারে ভারতে তুলা উৎপাদন ২০.৩৬ লক্ষ গাঁট। ১৯৪৯ সালে উহা ২৮ লক্ষ গাঁট দাঁড়াইবে। ১৯৪৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর বাবসারীদের নিকট ১৩ লক্ষ মজুত ছিল বলিয়া প্রকাশ।

সুতরাং ১৯৪৯-৫০ সালে দেশের অভ্যন্তরে ৪১ লক্ষ গাঁট পাওয়া যাইবে। ২ লক্ষ গাঁট রপ্তানী হইলে, ভারতে উৎপন্ন ২৬ লক্ষ গাঁট ও মজুত ১৩ লক্ষ গাঁট পাওয়া যাইবে। সুতরাং ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত প্রয়োজন মিটাইতে বাট্টি ৩২ লক্ষ গাঁট, এবং ডিসেম্বরে নূতন তুলা না পাওয়া পর্যন্ত আরও ১৩ লক্ষ গাঁট বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে।

১৯৪৯-৫০ সালে ভারতের বিদেশ হইতে নিম্ন-পরিমাণ তুলা পাইবার সম্ভাবনা : পূর্ব আফ্রিকা ৩ লক্ষ গাঁট পাট ; মিশর ৩ লক্ষ গাঁট ; ইহা ছাড়া স্বদান, ব্রাজিল, পেরু ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুলা পাওয়া যাইতে পারে।

তুলা পাকিস্থানের একচেটিয়া নহে। সুতরাং পাকিস্থানে তুলা ব্যবসারীদের বিশেষ অস্ববিধা ঘটতেছে। পাকিস্থান সরকার তুলার দাম কমানো সত্ত্বেও বাজার মিলিতেছে না। চুক্তি ছিল, পাকিস্থান ভারতকে ৪২ লক্ষ গাঁট তুলা যোগাইবে। কিন্তু মুদ্রা-মূল্য পাকিস্থানে হ্রাস না পাওয়ার, শতকরা ৪৪ টাকা লোকসানে ভারতের আমদানিকারকেরা তুলা কিনিতে বিশেষ অস্ববিধা ভোগ করিতেছেন।

কাশ্মীর সমস্যা

কাশ্মীর সমস্যা আজও মিটে নাই। ইউ এনও হইতে নিযুক্ত কমিশন ভারতে আসিয়া যে সন্তোষের পূর্ণ বিরতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তা ভারত সরকার গ্রহণ করেন নাই। প্রধানত, আব্বাদ কাশ্মীর ফৌজ ও পাকিস্থান সৈন্য অপসারণের পর কাশ্মীর গণভোট লওয়া হউক ইহাই ভারতের দাবী।

ইতিমধ্যে কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান রাজদ্রোহী ইহা তাঁকে পূর্বাঙ্কে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, করিয়াছে ও কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বিতে সেখ আবহুল্লা এবং রাজদ্রোহীদের সঙ্গে যোগসাজসে কাণ্ড তিনি সরকারের প্রমুখ ৪ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। কাশ্মীরের আদেশের বিরুদ্ধেই করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী সেখ আবহুল্লা পুনঃ পুনঃ যোগা করিয়াছেন, বিষয়টি ইউ এন-ও কমিশনের কর্তৃপক্ষ ও ইউ এন এর তাঁরা ভারতের সহিত যুক্ত থাকিবেন। গোচর করা হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রে গমন

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ইউ এনও কর্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীর কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা জেঃ ডেলভরের বিরুদ্ধে কাশ্মীর সরকার এই গুরুতর অভিযোগ অবলম্বন করিয়াছেন যে, তিনি রাজদ্রোহী সর্দার এদেগির মূল্যবান দ্রব্য বোঝাই সাতটি বাস এরোপেনে রাওলপিণ্ডিতে লইয়া গিয়াছেন। সর্দার এদেগির পলাতক। বেগম এদেগির বাড়ীখানা ব্যবহারের জন্ত জেঃ ডেলভরকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সেই সৌজন্ত ও ভদ্রতার অসহ্যবহার করিয়াছেন ও নিন্দনীয় আচরণ করিয়াছেন।

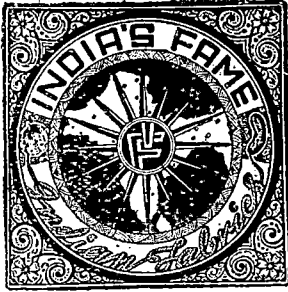
ডেলভরের নিজ অপরাধ ফালনের চেষ্টা এইরূপ—তিনি জানিতেন না যে এদেগির রাজদ্রোহী। আর এদেগির অহুরোধে তিনি জিনিসগুলি তাঁকে পৌছাইয়া দিয়াছেন স্বীকার করেন, কিন্তু ইহা দোষের বলিয়া স্বীকার করেন না। বক্সী গোলাম মহম্মদ জানাইয়াছেন যে, এদেগির আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গত ৬ই অক্টোবর ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ট ম্যানের আমন্ত্রণ রক্ষার্থ দিল্লী হইতে লণ্ডন হইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি ১০ই অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।

বিপুল দেশ আমেরিকার সর্বশ্রেণীর লোকেরা ও গবর্নমেন্ট পণ্ডিতজিকে বৈরূপ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাতে আমাদের আনন্দ ও গর্ব বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মান দেখাইয়াছে এবং তাঁর বক্তৃতা সমূহ মন্ত্র-মুগ্ধবৎ শুনিয়াছে।

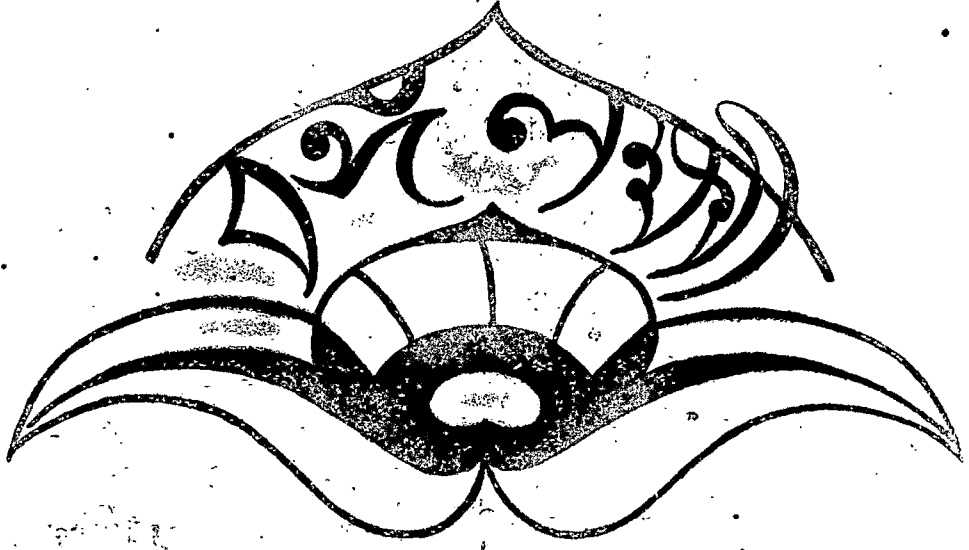
তিনি কানাডায় গিয়াছিলেন।

আশা করা যায়, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই সফরের ফলে বিভিন্ন অগ্রসর দেশ-সমূহের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
BHOWANIPUR :: CALCUTTA.

ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্স (মিত্র মুখার্জী জুয়েলারের উপর তৈলার) ৩৫নং আগুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা। ফোন সাউথ ১২৭৮



২৫শ বর্ষ

পৌষ-১৩৫৬

২য় সংখ্যা

“সঞ্জীবনী”

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

পৃথিবীতে এল কতজন,
আসিয়া চলিয়া গেল, করি সমাপন
পৃথিবীর কাজ। তারা রহিল না বসি
জীবনের বৃত্ত হ'তে পড়ি গেল থলি
পৃথিবীর পথে; সেথা ভূমিতে লুটিয়া
প্রভাতে বরিয়া গেল সন্ধ্যায় ফুটিয়া।

ফুল সে যে ফুল সে যে প্রফুল্ল মুকুল
সৌন্দর্যে-অনিম্য সে যে সদৃশে অতুল,
বরিয়া রাখিয়া গেল নন্দন স্বাস
পৃথিবীর প্রাণ তাহে নিভেছে নিঃশ্বাস।
পাপরাশি বিদূরিত সে প্রাণ-সৌরভে
বনরাজি মুখরিত সে প্রাণ-গৌরবে।

পৃথিবী সব্বারে ধরি রাখিয়াছে প্রাণে
জলে স্থলে কোন খানে বাধা নাহি মানে,
আসিতে যাইতে পথে গাহিতেছে গান
পৃথিবীর বৃকে এ যে অমৃতের দান।
করিয়া গেলেন যারা পৃথিবীর কাজ
পৃথিবীর প্রাণে তাঁরা সঞ্জীবিত আজ।

প্রদীপের কোলে অন্ধকার

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রদীপের কোলে বা নীচে যে অন্ধকার থাকে এটা আমাদের সকলেরই পরীক্ষিত সত্য—এবিষয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছি, সেকথাই বলিব। একদিন সকাল বেলা শ্রাবণ মাসের প্রথমভাগে শ্রীমান শিশির বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি যুবক আসিয়া বলিলেন, আমি রাহতা সেবক-সজ্জের কর্মী, আপনাকে একবার আমাদের গ্রামে যেতে হবে। শিশিরের সঙ্গে আলাপ ও আলোচনা করিয়া আমি স্থখী হইলাম এবং রাহতা সেবক-সজ্জের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে স্বীকার করিলাম। শিশির বলিল, ৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট আমাদের সেবক-সজ্জের অধিবেশন হইবে—আপনি প্রস্তুত থাকিবেন, বেলা ১২-১৫মিনিটের গাড়ী ধরিতে হইবে। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং তাহার সহগামী হইব বলিয়া প্রস্তুত থাকিব বলিয়া বিদায় দিলাম।

৩০শে শ্রাবণ শিশির কুমারের সহিত রওনা হইলাম। সঙ্গী হইলেন ঢাকার স্থলিত সরকার ও ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমরা অতি অল্প সময়ের জন্ত গাড়ী ধরিতে পারিলাম, লোকেল ট্রেন-একটা না ধরিতে পারিলেও অপরটি ধরিবার সুবিধা আছে। শ্রামনগর স্টেশন হইতে রাহতা গ্রামের দূরত্ব ২২ মাইল তিন মাইল হইবে। রিক্সা চলে। রিক্সাতে রওয়ানা হওয়া গেল। শ্রামনগর জগদল প্রভৃতি স্থানের সহিত আমার পরিচয় নূতন নয়। বেলা ২২ টার সময় শ্রামনগর হইতে রাহতার নিকে রওয়ানা হইলাম। কলিকাতার আশে পাশের পল্লীর সহিত বাহারা পরিচিত, তাঁহারা জানেন—স্টেশনের কাছাকাছি যে স্থানটুকু তাহা যেমন জন-বহুল, এবং দোকান ইত্যাদি পরিপূর্ণ এবং জনমুখর, গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে তাহার রূপ তেমনি একেবারেই বদলাইয়া যায়—ঘন জঙ্গল, ডোবা, পুষ্করিণী, নালা, পরিত্যক্ত বাড়ী-ঘর—আবর্জনা ও ম্যালেরিয়ার বাসভূমি ও যমদূত স্বরূপ ম্যালেরিয়া বহনকারী মশকের বিপুল প্রাচুর্য্য।

আমরা চলিলাম—আমবাগানে ও দুইদিকের গভীর বাঁশবনের মধ্য দিয়া খানিকটা পাকা ও খানিকটা কাঁচা পথে। বাঁশ তলাতে বাঁশের পাতা জড় হইয়া পড়িতেছে, আমবাগানের নীচেও সেই অবস্থা—আমপাতা পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া দিয়াছে। এই মাত্র একপশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, ভিজামাটির গন্ধে চারিদিকে একটা বিশ্রী বাষ্পের আবহাওয়া অসোয়াস্তির স্রষ্টি করিতেছিল।

রাহতা গ্রামের সীমান্তে আসিয়া দেখিলাম, কান্তিচন্দ্র ইন্সটিটিউশনের বিরাট অট্টালিকা। কান্তিবাবু জয়পুর রাজার দেওয়ান ছিলেন। রাহতা গ্রামে বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কান্তিবাবুর সহোদর ভ্রাতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। গ্রামে তাঁহাদের বিরাট বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—উদাস্তর দল আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। তাই নীরব পুরী—এখন জনগণ সুপরিচিত। কান্তিবাবুর পুত্র ও পৌত্রেরা জয়পুরের এক একজন খ্যাতনামা জাইগীরদার। তাঁহাদের বাড়ী ইত্যাদি সহরের বাহিরে বহুস্থান জুড়িয়া আছে। আমি জয়পুরে তাঁহাদের বিরাট প্রাসাদ দেখিয়া আসিয়াছি, অল্প সময়ের জন্ত আলাপের সুযোগ হয় নাই সে পরিবারের সঙ্গে।

আমরা দুইখানি রিক্সা চড়িয়া রাহতা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। গ্রামের উত্তর মাথা হইতেছে নূতন গ্রাম, ও উচ্ছেগোড়, বিজাধরপুর, পূর্বে বারতা বিল, পশ্চিমে পদ্মপুর, দক্ষিণে বাসুদেবপুর ও গুড়দহ গ্রাম। গ্রামে একটা সজ্জ আছে, তাহার নাম রাহতা সেবক-সজ্জ। আমরা সজ্জের বাড়ীতে আসিয়া নামিলাম। একটা খোলা মাঠ—সম্মুখে প্রাঙ্গণের মধ্যে সেবক-সজ্জের বাড়ী। স্থানীয় নাম বারোয়ারীতলা। দুইটি বিরাট বটগাছ তোরণের মত দাঁড়াইয়া আছে। সজ্জের বাড়ীটি মাটির দেয়াল দেওয়া, উপরে টিনের ছাউনি। আমরা এখানে বারোয়ারী তলার ঘরে গিয়া বসিলাম—এবং একটু বিশ্রাম ও চা পান

করিয়াই আমি একজন সেবক-সজ্জের কর্মীকে লইয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইলাম। কাঁচা ও হু'একটি পাকা রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ী—কোন বাড়ী অর্ধভগ্ন, কোন বাড়ীর ছাদ ও ঘরগুলি ধসিয়া পড়িতেছে। জঙ্গল-গাছে সব ঢাকিয়া পড়িয়াছে, সাপ শূকর কুকুরের বাসভূমি। চণ্ডীমণ্ডপ শ্রীহীন, পূজামণ্ডপ ভগ্ন ও জীর্ণ—গ্রামের যাহারা কৃতী সন্তান তাঁহারা ঘর ছাড়া। নির্জন পল্লী। গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত। ব্রাহ্মণ ২০০ শত, ইহাদের পেশা চাকুরী—চাষ অল্প। শিক্ষিত শতকরা ১০ জন। কায়স্থ ৪ ঘর, শিক্ষিত ১ জন। সদগোপ ১৫০ জন, শতকরা ৫ জন মাত্র লিখন-পঠনক্ষম। পদ্মরাজ (পোদ) ১৫০ জন, লিখন-পঠনক্ষম। শতকরা ২ জন, কাজেই গ্রামের অবস্থা কিরূপ সহজেই অনুমেয়। সেবক-সজ্জ একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পুস্তক সংখ্যা ৩০০ শত, পাঠক সংখ্যা ৩০। এই সজ্জ দ্বারা নিম্নলিখিত কাজগুলি হইতেছে—পাঠাগারের উন্নতিবিধান, ২ খানি মাটির ঘর ইহার নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বালক-বালিকাদের জন্য একটি পাঠশালার প্রতিষ্ঠাও করিয়াছেন। খেলা-ধুলার ব্যবস্থাও আছে,—ফুটবল, কুস্তি, লাঠিখেলা, ব্যায়াম, রাস্তা মেরামত, পুস্তক পরিষ্কার, মৃষ্টিভিক্ষা প্রতি রবিবার সংগ্রহ করেন এবং তাহার দ্বারা গ্রামের দুঃস্থদের সাহায্য করেন। চুরি রাহাজানি প্রভৃতি দূর করিবার জন্য গ্রাম্য রক্ষীদলও একটি আছে। সজ্জনায়ক হইতেছেন—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ নিম্বোগী সদগোপ সম্প্রদায়ভুক্ত—গ্রামের কল্যাণকারী উৎসাহী ব্যক্তি।

গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল নয়। গ্রামের একটি অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক—সম্ভবতঃ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, গ্রামে তাঁহাকে সকলেই ঠাকুরদাদা বলেন,—বলিলেন, গ্রামে ম্যালেরিয়ার ভয় বাস করা অসম্ভব। আমার একটি মেয়েকে সেদিন বাড়ী আনিয়াছি, বাড়ী আসিয়াই সে ভীষণ জরে পড়িয়াছে, তাহাকে জর ত্যাগ হইলেই শিশুর বাড়ী দিয়া আসিব। গ্রামে বাস করিতে আসিয়া বড় ভুল করিয়াছি।

আসন্ন সন্ধ্যায় সভার কাজ আরম্ভ হইল। শ্রাবণের জলভরা মেঘ উঁকি বুঁকি মারিলেও পশ্চিমদিকে সূর্যের শেষ লোহিত রশ্মিটুকু তখনও মিলাইয়া যায় নাই। গ্রামের মহিলারা, বধুরা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা পর্যন্ত অনেকে সভায়

আসিলেন। দুই একটি ছেলেমেয়ে ছাড়া কাহারও পায়ে জুতা ছিল না। একান্ত কুণ্ঠিত ভাবে সকলে একপাশে বসিয়াছিলেন। আমি ও আমার বন্ধুরা গ্রামের সেবা ও উন্নতির জন্য আলাপ ও আলোচনা করিলাম। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইহাদের মধ্যে এমন একটা নৈরাশ্র ও উদাস ভাব দেখিলাম, যেন সবই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে; এমনভাবে তাঁহারা দিন চালায়। সামান্য লোকেরই চাষ-বাগ আছে, চাষ করিতে আসে সাঁওতাল, দিনমজুরী ২২ দুই টাকা ২১০ টাকা। দেশে চাষার ও জনমজুরের অভাব। পদ্মরাজ জাতীর যাহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কলে ও কারখানায় কাজ করেন—সুযোগান ইহাদের চাই-ই—চাই। বারতা বিলে বাইবার পথে একটি বৃদ্ধ পদ্মরাজের সহিত আলাপ হইল—সে ব্যক্তি বলিল, আমি কোন দিন কলিকাতা যাই নাই! আমি আশ্চর্য হইলাম।

কাহাভরা পথে জল-কাদা কোনরূপে দূরে রাখিয়া বারতা বিলের পারে আসিলাম। বিরাট বিল, বারাসত পর্যন্ত ইহার সীমা। কচুরিপানা ও জঙ্গল গাছে ভরা, মাঝে মাঝে জল। আমাদের পাশ দিয়া মাছভরা চুবড়ি লইয়া কয়েকজন জেলে চলিয়া গেল—মাছের দর এখানেও কলিকাতার বাজার অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই গ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, হয় পদ্মবিজ ও বারতা বিলকে পরিষ্কার করিয়া মৎস্য ধরবার উপযোগী করিয়া দিন—নতুবা উহার জল নিকাশ করিয়া দিয়া ধানের ব্যবস্থা করুন। ইহার কোনটিই কার্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কম। অথচ কৃষি বিভাগ কিংবা মৎস্য বিভাগ যদি এবিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে ধানের চাষ বা মাছের চাষ ইহার যে কোন একটির ব্যবস্থা অতি সুন্দর ভাবে হইতে পারে এবং বহুলোকের অন্নাতা এবং মৎস্যের অভাব দূর হয়। বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ আমল হইতেই কৃষি বিভাগ এবং মৎস্য বিভাগ প্রভৃতি আছে। দুঃখের বিষয় ইহাদের দ্বারা কোন গঠনমূলক কার্য এপর্যন্ত হয় নাই—আমাদের দেশ বলিয়া প্রাণের টানও দেশের সেবা করিবার জন্য একটা অথও আগ্রহ কোথাও দেখিতে পাই না। বাঙ্গলাদেশের খাদ্যাভাব অনেক দূর হইতে

পারে—যদি মন্ত্রী মহোদয়েরা এবং সরকারি কার্যকারীরা বক্তৃতা কমাওয়া দিয়া প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সহযোগিতা পাইবার মৌখিক ভাষণ না দিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিতে হয়। সেরূপ চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং দলদলি ত্যাগ করিয়া কর্মে উৎসাহ দেখা যায় না।

অনেক দিন পূর্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন, “আমরা কি স্বাধীন?—অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, যখন হিন্দু রাজত্ব ছিল তখন স্বাধীন ছিলাম। বিদেশী রাজা ভারত অধিকার করিলে আমরা অধীন হইয়াছি। ভারতবর্ষের হিন্দুরাজাদের স্বাধীনতা গিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজাদের স্বাধীনতাই বা কি আর অধীনতাই বা কি? হিন্দু রাজত্বকালেও প্রজাদের কোনও ক্ষমতা ছিলনা, রাজা যাঁহা করিতেন তাহাই হইত। * * * যেখানে প্রজার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই সেখানে যে অত্যাচার হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পূর্বেও ভারতের প্রজাদের স্বাধীনতা ছিল না এখনও নাই। মুসলমান রাজত্বেও ছিল না। তবে আমরা স্বাধীন ছিলাম বলেন কেন? * * * দেশীয় রাজারই অধীন থাকি, আর বিদেশী রাজারই অধীন থাকি, অধীনতার ফল একই প্রকার। কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজ রাজত্বে প্রজারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। একথা সত্য নহে। ভারতের প্রজার ভাগ্যে স্বাধীনতা আছে ইহা স্বয়ং রাজেশ্বরী বলিলেও বিশ্বাস হয় না।” [স্থূলত সমাচার ৯ই ফাল্গুন, ১২৮০]। আজিকার দিনেও আমাদের এ প্রশ্ন মনে জাগে—আমরা কি স্বাধীন? একদিন ইহার উত্তর দিব।

গ্রামের নারীদের কথা বলি। তাঁহারা শিক্ষালাভের কোন সুযোগই পান নাই। সুযোগ পাইবার সুবিধাও নাই। সম্বৎসরিক বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। সরকারী কোন সাহায্য ইহারা পান নাই। সামান্য চাঁদার দ্বারা ই স্থূল পরিচালিত হয়। অথচ গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা লাভ করিবার ইচ্ছা যথেষ্ট আছে। কোনরূপ আন্দোল প্রমোদ, ছাত্রাচিত্র প্রদর্শন, সিনেমার সাহায্যে শিক্ষা, কুটির শিল্প সম্বন্ধে ব্যবস্থার কোনই উপায় নাই—গ্রামের বর্ষীয়সী ও প্রৌঢ়া মহিলারা গ্রাম্যবালিকা ও বধূবেশে যেসব কুটির ও গার্হস্থ্য শিল্প শিখিয়াছিলেন—তাহাই তাঁহাদের একমাত্র

অবলম্বন। কিন্তু সে সকলের আদর এখন নবযুগে কে করে? বর্তমান যুগের শিক্ষা, সভ্যতা, পল্লীসংগঠন এসব কার্যে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইবার জন্য গ্রামবাসীদের প্ররোচিত ও উদ্বোধিত করিবার জন্য লোক কোথায়?

বাঙ্গলা দেশে যে কয়টি মহিলা সমিতি আছে তাহাদের মধ্যে স্বর্গত মহাপ্রাণ গুরুসদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত সরোজনলিনী এবং লেডি অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত—নারীশিক্ষা সমিতি—বিদ্যাসাগর বাণী ভবনই দেশের নারী সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু যে পরিমাণ মহিলাকর্মী, শিক্ষয়িত্রী এবং কর্মী পুরুষ ও মহিলার প্রয়োজন তাহারই একান্ত অভাব। গ্রামের মহিলাদের স্বাধীন ভারতের বোণ্যা অধিকারিণী করিতে হইলে শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা একান্ত আবশ্যক। ছুতীভাগ্যের বিষয় এতদিন আমরা বিদেশী শাসকদের শিক্ষার ব্যয়ের অল্পতার জন্য নিন্দা ও সমালোচনা করিয়াছি, বর্তমান সময় গণতন্ত্র সংজ্ঞাভূষায়ী শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যয়ের হ্রাসের জন্য তাহাকে অপরাধী করিব? বাঙ্গালী জাতি নারীজাতিকে যে ভাবে অপমানিত ও লাঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল, সহমরণের বীভৎস চিত্র। কৌলীন্যের দারুণ অত্যাচার, বহু বিবাহ প্রতি পদে পদে নারীজাতির মর্যাদাহানি, প্রতিদিনই হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার, পীড়ন অবমাননা এখনও কি দূর হইয়াছে! আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—পল্লীর বিধবা মহিলাদের মত নিরাশ্রয় নারী আর কোথাও নাই। এজন্য কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সে কি সহজ কথা? এ বিষয়ে সরকারের যেমন লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, তেমনি উদ্যমশীল শিক্ষিতা মহিলাদেরও কর্মক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর হওয়া উচিত। কলিকাতাতে সভাসমিতি হয়, বক্তৃতা হয়, কিন্তু সে আলোর ক্ষীণ রশ্মিটুকুও গ্রামে পৌঁছে কি?

আমার মনে হয় যেমন রাহতা গ্রাম দেখিলাম, তেমনি পশ্চিম বঙ্গের বহু গ্রামে দেখিয়াছি—শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে লজ্জা, ভয় ও নিন্দার আশঙ্কায় শত শত পল্লীরমণী অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সদস্যরা যদি ‘মাঝে মাঝে, দূরে নাইবা হইল, কলিকাতার নিকটস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া সমিতি

প্রতিষ্ঠা, কুটির শিল্পের প্রবর্তন, বিদ্যালয় স্থাপন এবং যাহাতে মেয়েরা পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হইয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে সেরূপ চেষ্টা করেন তবে দেশের নারীসমাজের দুর্গতি ও দুর্দশা অনেক পরিমাণে ঘুচিতে পারে।

এবার উত্তর ভারত ও রাজপুতানার কোন কোন স্থান বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম পাঞ্জাবী উদাস্ত মহিলা ও পুরুষেরা অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হারাইয়া—সমাধিবনের কিংবা খোলা মাঠের মধ্যে ছিন্ন তাঁবুর ভিতর বাস করিয়াও জীবিকা উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। মহিলারা শীতকালেও রাত্রিশেষে কাজে বাহির হন, সংসার সমাজকুটির শিল্প সব দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য রহিয়াছে। আমাদের গ্রাম্য নারীদের মধ্যে যে শক্তি স্তুষ্ট রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত্ত করিতে না পারিলে পশ্চিম বাঙ্গলার উন্নতির আশা থাকিতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা কাহারও উদর পূরণ হইতে পারে না। আমি মনে করি—সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সদস্তারা, বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের পরিচালকমণ্ডলী এবং অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাঁহারা কলিকাতার পার্শ্বস্থ গ্রামে ভ্রমণ করিয়া নারীদিগকে নূতন জগতের সন্ধান দিন। আমি রাহতায় সমবেত মহিলাদের এই সব কথা বলায়, তাঁহারা বলিয়াছিলেন—সহরবাসিনী শিক্ষিতা মহিলারা যদি আমাদের মধ্যে আসেন, তাহা হইলে আমরা নূতন করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি—কিন্তু কে তাঁহাদের পথ দেখাইবে?

প্রদীপের কোলে—কলিকাতার পার্শ্ববর্তী একটি পল্লীর কথাই আজ বলিলাম, আশা করি দেশের মহিলা নৈতৌগণ আমার কথা কয়টি উপেক্ষা করিবেন না।

আমার শেষ কথা—এই বিষয়ে ঘেরূপ উদ্যম, উৎসাহ এবং কর্মপ্রবণতা চাই তাহারই একান্ত অভাব। আমি দেখিয়াছি যে হু' চারিজন গ্রামহিতৈষী তরুণ বা বৃদ্ধ ব্যভীত অধিকাংশ লোকই জীবিকা অর্জনের জন্য সারা দিন খাটিয়া অন্যান্য কার্য করিবার অবসর অতি অল্পই পান। তাঁহাদের সহায়ত্বভূতি যে নাই, তাহা নহে, তবে অবসরের অভাবে এবং সংসারের পীড়নেই দিবারাজি বিব্রত থাকেন। এরূপ স্থলে সবচেয়ে সহজ উপায় হয়, যদি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির

মহিলারা মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়া নারী প্রতিষ্ঠান ও বালিকা বিদ্যালয় ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে আশা ও উৎসাহ দেন, কাজের পথ দেখাইয়া দেন। তাহা হইলে ধীরে ধীরে মহিলাদের শিক্ষাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভাব দূর হইতে পারে।

আমরা স্বাধীন হইয়াছি—স্বীকার করি, তবু বাঙ্গলাদেশের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে ঘেরূপ আত্মপ্রাধাত্য পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে আমরা এসব বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা না করিলে হইবে না। ধরুন বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহার দ্বারা কোন উপকার হইবে কিনা সন্দেহ! রাইটার্স' বিল্ডিং এ বসিয়া এ বিষয়ে কোন একটা পত্রা নির্দেশ করা চলে না,—গ্রামের অবস্থা দেখিতে হয়, বুঝিতে হয়, সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়, এবং সে শিক্ষার ভার গ্রাম্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে দিতে হয়। এ বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, মাসিক অর্থ সাহায্য করা এবং শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে নূতনতর শিক্ষা না দিলে তাহা হইতে পারে না। তার পর পুঁথিপত্র, মানচিত্র, প্রাচীর পত্র ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য করা কর্তব্য—এ রাষ্ট্রের কাজ। এসব কাজে গ্রাম্য যুবকেরা রাষ্ট্রের সাহায্য পাইলে নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি করিতে পারেন। রাহতা দেবক সমাজের সম্পাদক শ্রীমান শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কর্ম্মী, তিনি গ্রামের পথ, ঘাট, পুকুরিণী সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গ্রামটিকে বলা চলে water logged village। কাজেই এসব গ্রামে কাজ করিবার প্রশস্ত সময় হইতেছে শীতকাল। যদি বিদ্যাসাগর বাণী ভবন বা সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির মহিলারা ঐ গ্রামে যাইয়া কর্ম্মক্ষেত্র খুলিতে ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই কৃতকাৰ্য্য হইবেন। শ্রীযুত শিশির বাবুর ঠিকানা হইতেছে—শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রাহতা গ্রাম, পোঃ শ্রামনগর, জেলা চব্বিশপারগণা। শিশির বাবু এ বিষয়ে মহিলাদের সাহায্য করিতে সততই উৎসুক। এইরূপ এক একটি গ্রাম ধরিয়া কাজ করিলে—ক্রমশঃ কয়েকটি পল্লী লইয়াও এক একটি গ্রাম্য কেন্দ্র গঠিত হইতে পারে। আমি আমার প্রবন্ধের নাম দিয়াছি—‘প্রদীপের কোলে অন্ধকার’। রাহতা গ্রামে গেলে একথার সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে।

পথের কথা

ত্রিপুরা দত্ত

স্বরূপা বিরক্ত মনে ফিরিয়া চলিয়াছে গ্রামে। স্কুলে ছুটি হইয়া গিয়াছে, কর্মহীন দিনগুলি কি রকম নিস্তর্র একঘেয়ে সুরে বহিয়া চলিতেছে। বোডিঙও প্রায় জনহীন, কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষয়িত্রী ছাড়া আর কেহ সেই নির্বাক পুরীতে দিন কাটাইতে পড়িয়া নাই। স্মরণ্য শহরের সিনেমা থিয়েটারের লোভ জোর করিয়া সংবরণ করিয়া স্বরূপা ফিরিয়া চলিয়াছে তাহার মামাবাড়ীর গাঁয়ে পূজার ছুটি কাটাইতে।

হাওড়া ষ্টেশনের বিরাট জনসমুদ্রে হাবডুবু খাইতে খাইতে স্বরূপার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গে তাহার রক্ষক হিসাবে স্কুলের দারোয়ান আসিয়াছে। মামারা কেহ এই পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় মেয়েটির জন্য এতদূর ঠেলিয়া আসিতে রাজী নহেন। একেই ত এত টাকা খরচ করিয়া তাহাকে স্কুলে পড়ানটাই তাঁহাদের অত্যন্ত গাত্রদাহের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পিতার সংসারে তাঁহাদের কোন জোর নাই।

স্বরূপা এতক্ষণ একটা জায়গায় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল— দারোয়ান কুলী ঠিক করিতে এবং গাড়ীর ভাড়া চুকাইতেই ব্যস্ত ছিল, এ দিকে বিশেষ নজর দিতে পারে নাই। শত শত লোকের অভ্যস্ত কোঁতুলী দৃষ্টির আঘাতে বিব্রত স্বরূপা যখন ঘর্মাক্ত মোটবাহী কুলীদের ধাক্কায় প্রায় সেইখানেই বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, তখন হরিসিং (দারোয়ান) কোন মতে নিজের বক্তৃত্তা সমাপ্ত করিয়া স্বরূপার দিকে দৃষ্টি বিকশিত করিয়া তাকাইয়া বলিল, “চলো দিদিমণি, বড় কষ্ট হল।” স্বরূপার ইচ্ছা করিতেছিল নিজের হাতের টর্টো ছুঁড়িয়া তাহাকে মারে। কিন্তু এ জগতে সামাজিক জীবের যাহাই যখন ইচ্ছা করে তাহাই করিবার অধিকার যদি থাকিত তাহা হইলে পৃথিবী বোধ হয় আরই সমস্তা সঙ্কুল হইয়া উঠিত। স্মরণ্য মনের রাগ মনেই চাপিয়া স্বরূপাকে দারোয়ানের পিছন পিছন দৌড়াইতে হইল।

বিরাট ঘুমন্ত সন্ন্যাসপের স্টায়-ট্রেন দাঁড়াইয়া আছে।

প্লাটফর্মে বিদায়ব্যথাতুর নরনারীর দল সব এই খানেই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে একটি ছোট থাট বইয়ের ষ্টল, চক্চকে স্বচ্ছ কাগজে মোড়া রঙ্গীন বিচিত্র মলাট যুক্ত বইগুলি পাশাপাশি সারিসারি সাজানো রহিয়াছে। স্বরূপার ইচ্ছা করিতেছিল কয়েকটা কিনিয়া লয়, কিন্তু দরিদ্রের কামনা বাসনাগুলি মনসমুদ্রে বৃহদেবের মত ফুটিয়া উঠিয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। সার্থক হইবার উপায় তাহাদের কোথায়? ঘড় ঘড় করিয়া খোলা ও বন্ধ ঠেলাগাড়ী করিয়া ফেরিওয়ালা জিনিষ সওদা করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও কোন নিভৃত কোনে দাঁড়াইয়া কোন যাত্রী একমনে সিঁটাড়া কচুরী ও মিহিধানার সদ্যবহার করিতেছে, ষ্টেশনের গোলমাল ও জনতা তাহার একাগ্রতায় কোনই বাধা দিতেছে না।

স্বরূপার ছোট ও নগ্ন মাল গুলি তুলিয়া দিয়া ও ভাড়া চুকাইয়া দিয়া দারোয়ান এতক্ষণে ভারমুক্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, স্বরূপাও চট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। মেয়েদের কামরা, সবস্বল্প তিনটি বেঞ্চ। সামনেরটিতে একটি বিধবা প্রৌঢ়া একটি বছর খানেকের শিশু কোলে করিয়া বসিয়া আছেন—শ্রামবর্ণা দোহার গঠনের মহিলা, মাথায় খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা চুল, গলায় কাঠের মালা ও কপালে ও নাকে শ্বেতচন্দনের তিলক কাটা। শিশুটির পরণে একটি চক্চকে মথমলের সবুজ জামা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা দুটি অলঙ্কৃত রঞ্জিত ও ধূলায় ধূসরিত, উত্তমার্জে সাজ সজ্জার যতই বাহ্যিক থাকুক, অধমার্জে সে সবেগ কোন বাল্যই নাই; কজ্জল শোভিত বড় বড় চোখে বিষ্ময় ফুটাইয়া সে এদিক ওদিক তাকাইতেছে। বিধবার পাশেই একটি অত্যাধুনিক মহিলা বসিয়া আছেন—তাঁহার ববকরা চুল, কিউটেজ ও লিপষ্টিক রঞ্জিত নখ ও ঠোঁটের শোভা দেখিয়া তাঁহার সহযাত্রীদের প্রায় চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। মহিলাটির মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, তাঁহার যেন এই মূর্খ অশিক্ষিত নারী

সমাজের মধ্যে বসিতে মাথা কাটা যাইতেছে। কিন্তু কোন উপায় নাই, “পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।” সুতরাং উহারই মধ্যে যতখানি স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া চলা যায় তাহারই চেষ্টা করিয়া তিনি প্রাণপণে একটা কোন ঠেসিয়া আছেন।

গাড়ীর মধ্যে উৎকট গরম, গাড়ী না চলিলে হাওয়া পাইবার জো নাই। সুতরাং সকলে যতখানি পারে কামরার জানলা দিয়া মাথা গলাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। সুরূপা গুছাইয়া বসিয়া এবার একটু এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল—ওদিকের বেঞ্চে একটি গৌরবর্ণী তব্বী বিবাহিতা তরুণী বসিয়া আছে, মুখের ভাবে কিরূপ ক্রোধ ও বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারও ক্রোড়ে একটি শিশু কন্যা, সঙ্গে সাদা খান পরা বিধবা ঝি। সে সীটের উপরই উবু হইয়া বসিয়া পান চিবাইতেছিল, ও মাঝে মাঝে জানালা দিয়া পানের পিক্ ফেলিতেছিল।

টং টং টং—ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ট্রেন এইবার ছাড়িবে বোধ হয়। কামরার সামনে একটি নীল সার্ট ও ধুতী পরিহিত শ্যামবর্ণ যুবা ও একটি তসরের পাঞ্জাবী ও ধুতী পরিহিত গৌরবর্ণ অশুভ্রম যুবা আসিয়া দাঁড়াইল। বিধবা মহিলাটি বলিয়া উঠিলেন, “বাবা, তুই পাশের গাড়ীতে আছিস ত?” শ্যামবর্ণ যুবাটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ তাহাই সে আছে। তরুণী বধূটি বোধকরি অল্প যুবকটির ঈর্ষিতেই অত্যন্ত বিরক্ত মুখে এদিকে উঠিয়া আসিল। বোধকরি দাম্পত্য কলহ একটা চলিতেছিল—যুবকটির মুখে একটা অতি নির্বিকার ভাব। সে বলিল, পাশের গাড়ীতেই আছে, ‘দরকার হ’লে ডেকে পাঠিও’ তরুণীটি অতি সংক্ষেপে “আচ্ছা” বলিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

বাঁশী বাজাইয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল—যাহারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু ছাড়িয়া যাইতেছিল তাহারা বুঁকিয়া পড়িয়া শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ক্রমাল উড়াইতে লাগিল, যাহারা নিতান্তই “একলা চলেছে অভবে” তাহারা নির্বিকার মুখে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। কোন বিদায় তাহাদের মনকে পীড়া দিতেছিল না বটে; কিন্তু হয়ত বিধবার সঙ্গে অত্যাধুনিক তরুণীটির দৃষ্টি বিনিময় হওয়াতে তিনি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন “কি গরম মা—টেরেনটা ছাড়াতে যেন একটু বাঁচলুম”। তরুণীটির চোখে অবজ্ঞা ও ক্রোধ মিশ্রিত

একটা অন্তত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, কথার উত্তর না দিয়া তিনি এক বাটকায় মুখটা অন্ধ্র দিকে ফিরাইয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। বিধবা অগ্রস্বত মুখে সুরূপার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন, সুরূপা তরুণীটির কাণ্ড দেখিয়া এমন অবাক হইয়াছিল যে সে খুব অমায়িক ভাবে বিধবাটির দিকে তাকাইয়া হাসিয়া দিল। বিধবাটি উৎসাহিত হইয়া এবার একটু তাহার দিকে আগাইয়া বসিয়া বলিলেন, “কোথায় চলেছ মা?” সুরূপা বলিল “মামার বাড়ী”। বিধবা বলিলেন “অ—কলকাতাতেই নুন্নি থাক, সঙ্গে কেউ নেই যে? একলা চলেছ নাকি?” সুরূপা বলিল “হ্যাঁ”। বিধবা বলিলেন “ও মা, কেন গো? মোমন্ত মেয়েকে এমন ভাবে মা বাপে ছেড়ে দিতে পারলে কি করে গো? কোথায় থাক গো মা তুমি?” সুরূপা বিপদ দেখিয়া অতি সংক্ষেপে বলিল, “বোড়িঙে।” বিধবা চুক্ করিয়া মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিলেন “আহারে, কোন প্রাণে মা বাপ এমন করে রাখে? বিয়ে হয়নি বুঝি? নিজের সংসার না হলে কি আর মেয়েছেলেদের শোভা খোলে?”

সুরূপা এইবার বিবক্ত হইয়া উঠিল। এই হচ্ছে বিপদ এ দেশের মেয়েদের, কোন দিকেই একটা মাঝামাঝি পথ ধরিয়া তাহারা চলিতে পারে না। এই দিকে পূর্ণ নৈত্রে তাকাইয়া থাকিয়া ওধারের বেঞ্চার সেই বধূটি তাহার শিশুকন্যাটির দোয়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে বেশ নিয়ম করিয়া বারংবার নিজের ভাঙ্গা পুতুলটি গাড়ীর মেজিতে ফেলিয়া দিতেছিল, এবং সেটি আবার তাহার মা বা ঝি তাহার হাতে তুলিয়া দিতেছিল। কখনও মায়ের কোল হইতে লাকাইয়া নীচে নামিয়া পড়িবার একটা প্রচেষ্টা চলিতেছিল। সুরূপার ইচ্ছা করিতেছিল যে বধূটির সহিত একটু গল্প করে, কিন্তু সে সন্দেহ মুখটাকে এমনই প্রলয়গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল যে সেই গান্ধীধোর আবরণ ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়ার মত উৎসাহ আর সুরূপার রহিল না।

ঝিক্ঝিক্ঝিক্ঝিক্—ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে, একটানা সুরে—বাহিরের দৃশ্যাবলী চকিতের মত চোখের সামনে আসিয়া আবার বিহ্বলের তায়ই চোখের আড়ালে চলিয়া যাইতেছে। কোথাও বিশাল প্রান্তর—এদিক ওদিকে প্রাগ-ঐতিহাসিক দানবের-তায় বিপুল নারিকেল ও তালগাছ

হুএকটি দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও ডোবা—মাছরাঙা টেলিগ্রাফের পোষ্টের উপর দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে আকাশের গায় সবুজ রেখা টানিয়া দিয়া ডোবার ঘোলাটে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে মাছ ধরিবার জন্ত। কোথাও সবুজ মাঠের উপর দিয়া সাদা ধুলীর পথ চলিয়া গিয়াছে গ্রামের দিকে, ইহার প্রতিটি ধুলি কণায়, মাঠের প্রতিটি ঘাসে সূর্যালোকে কিরূপ যেন একটা নির্জনতা ও বৈরাগ্যের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। এই পথ দিয়াই বোধ করি মাঝে মাঝে তরুণ রাখাল আপনাবাঁশের বাঁশীটি করুণসুরে বাজাইতে বাজাইতে আনমনে চলিয়া যায়। সুরুপা নিজের কাছে স্বীকার না করিয়া পারিল না যে তাহার রূপপিপাসু মন ইহাদের মধ্যে যে রূপের খনির সন্ধান পায় তাহা বাহিরের বিজলিবাতি, সিনেমা, ট্রাম ও মোটর গাড়ীর মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। ইহাদের সান্নিধ্যে যে আনন্দ নিবার তাহার মনের মধ্যে বহিতে থাকে শহরের মধ্যে কি সে সেই রসের যোগান পায়?

মাঝেমাঝে কোন মাঝারী রকমের বড় ষ্টেশনে ট্রেন থামিতেছে, হুড়মুড় করিয়া যাত্রীগণ উঠা নামা করিতেছে, ফেরিওয়ালা বিচিত্র সুরে হাঁকিয়া বিচিত্র জিনিস বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীতে এ পর্যন্ত অল্প কোন যাত্রী ওঠে নাই—এবার ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইতেই “এই ইহার আও মেন্” বলিয়া এক কৃষ্ণকায়া ও কৃষ্ণকায়া ফিরঙ্গী মেম আসিয়া তাহাদের কামরার সামনে দাঁড়াইলেন। কামরায় ঢুকিয়া তিনি সুরুপারই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং চারিদিকে তাকাইয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন। তাঁহার কেন জানিনা সুরুপাকে বড়ই আশ্চর্য লাগিয়া গেল, তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিতে করিতে তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুরুপার বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল—একেত উৎকট গন্ধ গায়ে, তাহার উপস্থিতি সিগারেটের ধোঁয়াটি তাক করিয়া তিনি তাহারই মুখের উপর ছাড়িতেছেন, আর সেই একাগ্র দৃষ্টি। স্ততরাং তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসি ছাড়া আর কিছু করিবার রহিল না।

সামনের বেঞ্চে বিধবার ক্রোড়স্থিত শিশুটি বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। ঠোঁট ফুলাইয়া মাঝেমাঝে সে কাঁদিয়া উঠিতেছিল—বিধবা তাহাকে একবার বিহ্বল বাটী বাহির

করিয়া হুধু থাওয়াইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন লাভ হইল বলিয়া মনে হইল না। ধমকের মত বাঁকিয়া পড়িয়া সে ক্রমাগত চীৎকার করিয়া চলিল। বিধবা এবার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, মাথা দোলাইয়া ছড়া কাটিয়া কোনমতেই সুবিধা না করিতে পারিয়া এবার জানালায় বাহিরে তাকাইয়া ছলিয়া ছলিয়া টানিয়া টানিয়া সুরুপায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—“ওই গরু,—ও গরু গরু আঃ আঃ আঃ, ও ছাগল আঃ আঃ আঃ”। খুব কি কারণে ভাল লাগিল জানিনা, সে কান্না থামাইয়া, মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া ছাগল গরু দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

কাল মেমসাহেবটি এতক্ষণ সিগারেট টানিতে টানিতে ইহাদের দিকে তাকাইয়াছিলেন, এখন সুরুপার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, বাচ্চাটির ভাল training হইতেছে না, অকারণ এরকম কাঁদা ত উচিত নহে।

অত্যাধুনিক তরুণীটি এতক্ষণ আপনাবাঁশের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছিলেন, এখন বোধহয় কাল মেমসাহেবটিকে আপনাবাঁশের সমগৌরব বোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন “ইংরাজী শিক্ষার অভাবই এদেশের মাতাদের এরূপ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। স্ততরাং সন্তানগণ এরূপ বেয়াড়া হইয়া পড়িতেছে।”

কাল মেমসাহেবটি খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঠিক কথা। এই দেখনা আমার জন্কে আমি কখনো বেয়াড়া রকমের আক্লান্দ দিইনি, তার ফলে আমাদের সোসাইটির সে একজন রক্ত বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে, আর ছেলে আমাদের ভক্তি করে বেশ। যদিও বৌ আছে তবুও আমার কথা ছাড়া সে একপাও নড়বে না। এই দেখনা B. N. R.-এ এতবড় চাকরী পেল, সবার আগে আমাকেই জানাইয়াছিল, বৌ এর একটা কথাও জানিত না।” সুরুপার ইচ্ছা হইল বলে যে এরকম রক্ত বাঙ্গালী সমাজের ঘরে ঘরে বর্তমান। কিন্তু এই পাশ্চাত্যসভ্যতা অল্পরাগী, নকল মেমসাহেবদিগের গর্ভোদ্ধত কথা গুলি তাহার বিশেষ ঐতিমতুর লাগিতেছিল না, স্ততরাং সে অল্পদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ী আবার নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, বিধবার ছোট বাচ্চাটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বিধবাও ভাল করিয়া পা ছড়াইয়া ঠেপান দিয়া বসিয়া গাড়ীর চলার তালে ছলিয়া ছলিয়া নিজের

আয়োজন করিতেছেন। কালো মেমসাহেবটিও Holdall পাতিয়া জুতা খুলিয়া পা ছড়াইয়া দিয়া একটি ইংরিজী novel খুলিয়া বসিয়াছেন—বান্দালী মেমসাহেবটিও আপনার পদমর্দাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার দেখাদেখি একটা ইংরাজী novel পড়িতেছেন—তিনি যে এই মূর্থ গোঁয়ো রমণীগণের সমগোত্রীয় নহেন সেটা দেখাইতে হইবে ত।

তরুণী বধুটি একদৃষ্টে তখনও বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। স্বামীর উপর রাগ হওয়াতে বোধকরি কোলের শিশুটির দিকেও নজর পড়িতেছে না—সে বিয়ের কোলে বসিয়া একমনে একটি Illustrated Weekly of Indiaর পাতা ছিঁড়িয়া ঘাইতেছে, কি মাঝে মাঝে তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি হইতে বইটি টানিয়া লইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তারস্বরে চীৎকার করিয়া, কখনও বা ধমকের মত বাঁকিয়া গিয়া সে প্রাণপণে ঘুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে।

সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে উঠিয়াছেন—প্রথর রোদ্রে ধরণীর শ্যামল বক্ষ পুড়িতেছে—গাঁয়ের বধূগণ তেল গামছা লইয়া পুকুরে ও ঝর্ণায় স্নান করিতে আসিয়াছেন—আবক্ষ জলে নিমগ্ন হইয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া তাঁহারা এই বিরাট সরীসৃপের গ্রাস যন্ত্র দানবের দিকে তাকাইয়া আছেন। কোন মাতা তাহার শিশুটিকে পর্য্যন্ত বহন করিয়া আনিয়াছেন—জলের কিছুদূরে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছেন—সে আপন মনে মাটি ঘাস লইয়া খেলিতেছে ও নিজের মুখে মাখিতেছে, কিশোর বালকের দল ঘাট হইতে ঝপাৎ করিয়া জগে পড়িয়া পুকুর তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে, ও রমণী শশব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

সুরূপার চোখে কি অপরাধই লাগিতেছে ইহাদের সকলকে। অতি সাধারণ মানুষ হয়ত এরা—কিন্তু সুরূপার নিকট ইহারা কাব্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে—রূপে, রঙ্গে, রসে ইহারা যেন ঝলমল করিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠের পয় মাঠ চলিয়া গিয়াছে, একখানি নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্র যেন পড়িয়া আছে—“মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে—”, সুরূপার মন পুলকিত হইয়া উঠিল—কি স্থখে মানুষে শহরে থাকে, সুরূপাকে কেহ যদি একঘেয়ে জীবনধারণের স্নান হইতে মুক্তি দিয়া এই রূপের

সমুদ্রের সামনে বসাইয়া দিয়া যায়। আপনার ক্ষুদ্র নগণ্য অস্তিত্ব তুলিয়া (অস্তিত্ব তাহাকে পদে পদে পোড়া দেয় মাত্র ?) এ নির্মম সমালোচক ক্ষুদ্রস্বার্থসম্পন্ন জগৎকে তুলিয়া সে সারা জীবন যদি এই রূপের সমুদ্রেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে।

ট্রেনের গতি ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, কোন স্টেশন সামনে পড়িয়াছে। কালো মেমসাহেবটি Holdall বাঁধিয়া, জুতা পরিয়া তাঁহার ভ্যানিটি ব্যাগ বাহির করিয়া প্রসাধন সমাপ্ত করিতেছেন, বোধ করি তাঁহার গন্তব্য স্থান আসিয়া গিয়াছে। বিধবাটি চকিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া উঠিয়া বসিলেন। সুরূপার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “কি স্টেশন মা?”

বিকট শব্দ করিয়া ট্রেন থামিয়া গেল, সুরূপা দেখিল ইহা খড়গপুর স্টেশন, বিধবাকে বলিতে তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ওমা, এখানে যে আমার মামাস্বশুর থাকেন গো! মস্তবড়লোক! এই আমার নীরদ যখন হ’ল তখন একটা মোহর দিয়ে মুখ দেখেছিলেন তার। সে কতদিনের কথা; বৌ মেমসাহেব, স্বশুরঘর কোনদিন করেন নি প্রথম-থেকেই স্বামীর কাছে আছেন—বাচ্চাকে ত আমিই মানুষ করলাম প্রথম থেকে। শুনছি নাকি বড় একলাগালে তাই বুড়ী শাশুড়ীর ডাক পড়েছে।”

কালো মেমসাহেবের সরু বাঁশীর মত স্তম্ভিত ও হুটচ কণ্ঠস্বরে তাহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল—চাহিয়া দেখিল তিনি মাথায় সযত্নে একটি রঙ্গীন রুমাল বাঁধিয়া কুলীদিগকে তাড়া দিতেছেন—কাঁধে তাঁহার ভ্যানিটি ব্যাগ দোলায়মান।

গাড়ীর সামনে একটি বিজাতীয় পোষাকধারী রক্ষমূর্তি যুবক আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেদীপ্যমান—কোমরে হাত দিয়া সে খানিকক্ষণ তাহার মাতার অফালন দেখিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল “Oh! Will you stop your jabbering? I have got works to do I can’t stand here and listen to you the whole day” মাতা ও তাড়া দিয়া কি একটা বলিয়া উঠিলেন। সুরূপা ভাবিল ছেলের “Fraining” যে খুব ভাল হইয়াছে তাহাত মনে হয় না। যাহা হউক মাতা ও তাঁহার রক্ত বিশেষ পুত্র অবশেষে নামিয়া গেলেন—নামিবার

আগে মেমসাহেবটি goodbye deary বলিয়া আধুনিক তরঙ্গীটিকে অভিবাদন জানাইয়া গেলেন। সুরূপার ভয় হইল যে খুদীর চোটে তিনি জানালা দিয়াই না লাফ দিয়া পড়েন। গাড়ীর ভিতরে সকলেই এবার আহারাদি কার্য সমাপন করিবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সুরূপা খাদ্য কিছু সঙ্গে আনে নাই, কারণ আর ছ তিনটা ষ্টেশন পরেই সে নামিয়া যাইবে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া সহযাত্রীদেরই কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিধবা এলুমিনিয়ামের টিফিন বাস্ক হইতে লুচী তরকারী বাহির করিয়া সমস্ত নাতনীকে খাওয়াইতে বসিলেন—নিজে কিছুই খাইলেন না বোধ হয় আচারের বাধিল—সুরূপা কিছুই খাইতেছে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু খাবে না মা? সুরূপা বলিল “না”। বিধবা বলিয়া উঠিলেন, “ওমা সেকি গো? এতটা পথ যাবে কি করে? একটু কিছু মুখে দাও, আমি দেব কিছু খাবে?” সুরূপা হাসিয়া বলিল, “না আমি আর ছ একটা ষ্টেশন পরেই নেমে যাব, বাড়ী গিয়েই খাব একেবারে।”

ওপাশের স্তম্ভের তরঙ্গীটি চূপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল,—এখন হঠাৎ এক ঝটকায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া সামনের দিকে ফিরিয়া বসিল। সুরূপা ভাবিল, বাবাঃ, মেয়েটি দেখতে যতই স্তম্ভের হোক, কোমল স্বভাবা একেবারেই বলা যায় না—তবে রাগটা তাকে যেন আর স্তম্ভের করে তোলে। কিন্তু এখন হঠাৎ এত চটে উঠবার কি ঘটল? স্বামী আসছে বোধ হয়।

তাহার অনুমানই ঠিক দেখা গেল, কারণ ছ এক মিনিটের মধ্যে সেই পূর্বোক্ত স্তম্ভের যুবকটি গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—স্ত্রীর পাশে বসিয়া বলিল, “খাবে না কিছু?” স্ত্রী বলিল, “না।” যুবক বলিল “সে কি খিদে পায়নি?” স্ত্রী বলিল, “না।” যুবক বলিল কিন্তু এতটা পথ না খেয়ে যাবে কি করে?” স্ত্রী বলিল, “সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।” যুবক অগত্যা কাঁধ দুটি ইংরাজী কাঁদায় উপর দিকে তুলিয়া একটু Shrug করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং খানিকক্ষণ পরে একটি Orange Squashএর বোতল আনিয়া স্ত্রীর পাশে রাখিয়া চলিয়া গেল। মেয়েটি বোতলটি তুলিয়া এদিক ওদিক ঘুরাইয়া

দেখিল, তাহার পর একটি গেলাস বাহির করিয়া—জলের বোতল হইতে জল ঢালিয়া উহা মিশ্রিত করিয়া সরবৎ তৈয়ারী করিয়া বাচ্চার ঝিএর হাতে তুলিয়া দিল, এবং বলিল “খাইয়ে দাও।”

সুরূপা বসিয়া বসিয়া বাচ্চার খাওয়া দেখিতে লাগিল, বোধ হয় চুমুক দিয়া খাওয়া ততটা অভ্যাস নাই—মুখ দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, জামা কাপড় নষ্ট হইতেছে, তবুও মার জেদ খাওয়াইতেই হইবে।

সুরূপা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বেশ মজার এই ট্রেন ভ্রমণ,—কত নূতন লোকের সহিত দেখা হয় আলাপ হয়। তখনকার মত একটা যেন নূতন জগৎই গড়িয়া উঠে—পরস্পরের স্বথ হুঃখের ইতিহাস শুনা পরস্পরের ব্যক্তিত্বের সহিত পরিচিত হওয়া—তখনকার মত মাহুসে যেন প্রাণমন দিয়াই জড়াইয়া পড়ে, একবারও ভাবিয়া দেখে না, কয়েক ঘণ্টা পরে যে যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবে, আর জীবনে দেখা হইবে কিনা তাহাও তাহার জানে না—ব্যক্তিগত জীবনের স্বথ হুঃখের জোয়ার তটটার স্রোতের মধ্যে পড়িয়া এ সকল স্মৃতি মনের কোন্ ধূলামলিন অবহেলিত কক্ষে পড়িয়া থাকিবে তাহার অর্গল খুলিয়া দেখিবার ইচ্ছা বা সুযোগ কোনটাই কোন দিন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আর দেৱী নেই—গ্রামের ষ্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে। সুরূপা উঠিয়া “এটাচিকেস্” হইতে চিরুণী, আয়না ভোয়ালে ইত্যাদি বাহির করিয়া প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন—“ষ্টেশন এসে গেল মা?” সুরূপা মাথা নাড়িয়া জানাইল “হ্যাঁ”। বিধবা বলিল “তা যাও মা। আর দেখা হবে না বোধ হয়—যেখানেই থাক সুখে থাক এই আশীর্বাদ করি।” সুরূপা নতশিরে একটা প্রণামও তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল। ওপাশের তরঙ্গী বধুটি বড় বড় চোখ তুলিয়া চাহিয়াছিল, সুরূপার সহিত চোখাচোখি হইতে তাহার রক্তাধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সুরূপা ইঙ্গিতে বিদায় হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতা অল্পবয়সীরা ইংরাজী নভেল পড়িতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলেন না। সুরূপা জুতা পরিয়া গাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—ট্রেনের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে—অদূরে ষ্টেশনও দেখা যাইতেছে।

ধীরে ধীরে গাড়ী প্রবেশ করিল,—সুরূপা বুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল ট্রেনে কেহ পরিচিত আসিধাছে কি না। বড় মামার কোট মাফলার মণ্ডিত মূর্তি অদূরে দেখা গেল— ট্রেন থামিতেই তিনি আগাইয়া আসিলেন, সুরূপাকে দেখিয়া বলিলেন “তুই নেমে আয়, এরা নামিয়ে নিচ্ছে” সুরূপা নামিয়া পড়িয়া মাতুলকে প্রণাম করিল—তিনি মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিলেন “আরও লম্বা হয়েছিস যে রে।”

তাহার ছোট ট্রাক এবং বিছানা কুলীরা নামাইয়া দিল,

তাহার বড়মামা যতক্ষণ কুলীদের ভাড়া চূকাইতে ছিলেন, সুরূপা যতক্ষণ ট্রেনের যাত্রীদের নিরীক্ষণ করিতেছিল— তাহাদের কামরার সহযাত্রীগণ, ইহারই মধ্যে যেন অল্প জগতের লোক হইয়া গিয়াছেন—সুরূপার সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে—পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের পালা ইহারই মধ্যে শুরু হইয়াছে—তাহার পর বৎসরের পর বৎসর যাইবে, দিনান্তে এক মুহূর্তের জ্ঞাতও কেহ কাহাকে মনে করিবে না।

ভেজাল

চন্দ্রশুভ

ভারতবর্ষের মত ভেজালের প্রচলন পৃথিবীর অল্প কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ থাকার বা খাওয়ার ভেজাল দেওয়া পাশ্চাত্য দেশে নাই বলিলেই চলে। আমাদের দেশে কতকটা ভেজাল আবার আইনানুসারেও দেওয়া চলে।

বর্তমান বাংলায় ভেজালবিহীন কোন জিনিষ পাওয়া যায় কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। খাওয়া, পরা, গাড়ী, রাস্তা, ঘাট, এমন কি ভগবানের সৃষ্টি জল এবং হাওয়া পর্যন্ত ভেজাল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত কি জিনিষ আছে তাহা খোঁজ করিতে হইলে সম্ভবতঃ গণ্যকার হইতে হয়।

দেখা যাক জীবনধারণের পক্ষে অত্যাৱশ্যকীয় কি কি জিনিষ আমাদের লাগে। চাল, ডাল আটা, তৈল, দুধ, ঘী, নুন, মশলা, চিনি, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ ইত্যাদি। ইহার কোনটাই ভেজালবিহীন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। জল এবং হাওয়া বিস্তৃত অন্ততঃ বাংলা দেশে পাওয়া অসম্ভব।

দুই কারণে ভেজালের বিস্তৃতি লাভ এবং স্থায়িত্ব সম্ভব। প্রথমতঃ সমাজ জীবনের অধঃপতন—দ্বিতীয়তঃ ক্রেতার অর্থের অভাব। শেষোক্ত কারণই আমাদের দেশে ভেজালের প্রচলনকে বিশেষ সাহায্য করে। অর্থের অনটন হেতু দরিদ্র বাংলা দেশে খাটী জিনিষের মূল্য

দিতে অধিকাংশ লোক অসমর্থ। বিক্রেতা এ সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করে এবং লাভের অঙ্ক তাহাতে বহুগুণ বাড়িয়া যায়। ভেজালবিহীন দ্রব্যে লাভের যে পরিমাণ স্বচ্ছল ক্রেতার কাছে আশা করা যায় সেই জিনিষে ভেজাল দিয়া সম্ভা দরে বিক্রয় করার জন্য ক্রেতার সংখ্যাও বাড়ে এবং তদনুপাতে লাভের মোট পরিমাণ বেশী হয়। অপর দিকে ক্রেতা অল্প পরিশ্রমে ভেজাল জানিয়াও সম্ভাব্য পাওয়ার জন্য কিনিয়া সম্ভব হয় এবং সেই কারণেই ভেজালের বিরুদ্ধে জানিয়া শুনিয়াও কোন প্রতিবাদ করে না। বিস্তৃত ঘী পাইতে হইলে বর্তমান বাজারে ৯০ টাকার কম পাওয়া অসম্ভব বলা যায়, কিন্তু ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই জানিয়া শুনিয়াই ভেজাল ঘি ৪ হইতে ৬০ টাকা পর্যন্ত কেনা বেচা করে। সম্পর্কটা ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রায় এই রকমই দাঁড়াইয়াছে। এতো গেল বিষয়ের কথা। চাল, ডাল, আটা, তৈল, ময়দা, মশলা ইত্যাদিতেও একই প্রকারে ভেজালের ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক কারণ একটা মন্ত সমস্যার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এর শেষ কোথায়? জনসাধারণ স্বচ্ছল হইলেই কি ভেজাল দেওয়ার অভ্যাস বিক্রেতার কমিয়া যাইবে? এই প্রশ্নে প্রথম কারণটির আলোচনা আসিয়া পড়ে। জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন—ভেজাল দেবার প্রবৃত্তির মূল কারণ। বিক্রেতা

গচ্ছিত এবং সাধু প্রকৃতির হইলে বেশী দামের বিপুল জিনিষই বিক্রয় করিবে, তথাপি ভেজাল দিয়া বেশী বিক্রয় চেষ্টা করিবে না। খাণ্ডদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া প্রচলিত আইনানুসারে খুব বেশী গুরুতর অপরাধ নয়। এমন কি গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ পর্যন্ত নয়। আইন খুব কড়া হইলে এবং সেই আইন যদি নিয়মমত প্রয়োগ করা যায় তবেই অসাধু প্রকৃতির বিক্রেতা সায়েস্তা হয়। খাণ্ড দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া বিষ প্রয়োগ করার সামিল। ফৌজদারী আইনে কাহাকেও বিষ প্রয়োগ করিলে গুরুতর সাজা হয়। কিন্তু খাণ্ডে ভেজাল দেওয়া এই আইনের আওতায় পড়ে না। সংশোধিত আইন জারী করিয়া খাদ্যে ভেজাল দেওয়া খাদ্যে বিষ দেওয়ার তুল্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া দরকার। অন্তর্গত অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ভেজাল বন্ধ করা উচিত। কিন্তু সকলের পূর্বে প্রয়োজন সমাজ চেতনা। যতক্ষণ সমাজ এ বিষয়ে সচেতন না হইবে ততক্ষণ আইন বা অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ফল হইবে না। হইলে ব্ল্যাক মার্কেট আজও অব্যাহত থাকিত না।

দুধ, ঘী, তেল, চাল, আটা, ময়দা, খাবারের দোকান, চায়ের দোকান, হোটেল, সরবৎ চা লেমনেডের দোকান ইত্যাদি সবই আইনের আওতায় পড়া দরকার। ভেজাল নিবারক আইন ফলপ্রসূ হওয়া দরকার। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক রাখা, বাবজীবন কারাদণ্ড এবং প্রকাণ্ডে সেক্সদণ্ড ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই প্রকার আইন ছাড়া ভেজাল নিবারণের সহজ রাস্তা আর আছে বলিয়া মনে হয় না। নির্দোষী লোক সাজা না পায় সে জন্ত সরকারী খরচায় পরীক্ষক থাকা দরকার, যারা বিনামূল্যে বিক্রেতার যে কোন দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দিবে। এই সার্টিফিকেট ছাড়া বিক্রেতার আর কোন ওজর গ্রাহ্য হইবে না, আইনে এই সব বিধান থাকা দরকার। কথা উঠিতে পারে যে এই প্রথায় ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইতে পারে—আপাত দৃষ্টিতে তাহা মনে হইলেও প্রত্যেক পাড়ায় যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষক থাকেন এবং তাঁহারা যথাযথ নিজের কর্তব্য পালন করেন তাহা হইলে এই প্রথায় অস্ববিধা বোধ করার কিছু নাই। খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে অধিক ব্যয়সাধ্য ল্যাবরেটরীর

প্রয়োজনীয়তা নাই। এ ছাড়া বিনা নোটিসে এবং অন্তর্কিতে পরীক্ষা দ্বারাও ভেজাল নিবারণ হওয়া সম্ভব। কেহ বলিতে পারেন এই প্রথায় দুর্নীতির আরও প্রসার হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন্দের চেয়ে ভাল অনেক পরিমাণে বেশী হইবে। তা ছাড়া পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সমাজ চৈতন্য ছাড়া কোন ভাল কাজই সম্ভব নয়। সুতরাং সকলেই যদি একযোগে এবং একই সময়ে দুর্নীতিপরাণ হইয়া তাহা হইলে কোন আলোচনা করাই চলে না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সংস্কার এবং ভাল থাকিতে চায় ইহাই সত্য। ঘটনাচক্রে বা অজ্ঞাত কারণে স্বভাব পরিবর্তন হয়। ক্রেতা ভেজাল চায় বলিয়া, সামাজিক অসুশাসন নাই বলিয়া, আইনের বন্ধন শিথিল বলিয়াই অপ্রতিহত গতিতে ভেজাল দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং সমাজ যদি সচেতন হয়, রাষ্ট্র যদি ভেজালওয়ালাকে কঠোর দণ্ড দান করে তবে ভেজাল কতক্ষণ চলিতে পারে?

এই সঙ্গে প্রয়োজন স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের প্রচলন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ও অবহেলায় বাংলার গো-ধন লুপ্ত প্রায়, তাই স্বল্পমূল্যে দুধ পাওয়া অসম্ভব; ঘী একই কারণে দুপ্রাপ্য। কলু যেদিন ঘানি ছাড়িয়াছে কলওয়ালাকে, সেদিনই খাঁটি তৈল অদৃশ্য হইয়াছে। খাঁটি জিনিষের দাম দেওয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে বর্তমানে অসম্ভব। ভেজাল বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্নই বড় হইয়া দেখা দিবে। সুতরাং সমস্তর বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করাও সমাজের এক প্রয়োজনীয় সমস্যা। সাংস্কার কথা এই যে বিশুদ্ধ জিনিষ এক ফোঁটা খাওয়া ভেজাল এক সের খাওয়ার চেয়েও নিরাপদ।

কলিকাতা সহরের অসংখ্য তেল, ঘায়ের দোকান, হোটেল ইত্যাদি প্রথমেই পরীক্ষা করা দরকার। প্রত্যেক পাড়ায় একজ্ঞ খাদ্য সমিতি গড়িয়া ওঠা দরকার। সমিতি বাহাতে সরাসরি কর্পোরেশন এবং সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগকে জানাইয়া ব্যবস্থা করিতে পারে এমন নিয়ম হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ভেজাল ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা, পোষ্টার, প্রদর্শনী, ম্যাজিক লঠন, বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রত্যেক পাড়ায় হইলে আরও ভাল হয়। সরকার এবং কর্পোরেশন এই

সমিতিতে সর্বপ্রকারে উৎসাহ এবং সাহায্য দিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা কর্পোরেশন সহজেই সমাধান করিতে পারেন। গভীর নলকূপ দিয়া পাম্পের সাহায্যে প্রত্যেক পাড়ায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যেমন শক্ত নয়। এ ব্যবস্থা কলিকাতা কর্পোরেশন কয়েক জায়গায় করিতেছেন। ব্যবস্থা সফল হইয়াছে বলিয়াই শুনিয়াছি। বর্তমানে কলের জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধ কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সন্দেহান। গভীর নলকূপের জল সরবরাহ করিলে সহজে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাইবে।

সহরের যেখানে সেখানে গরু মহিষের খাটাল শুধু যে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করে তাহাই নহে। এই সব খাটালেই সহরের অধিকাংশ গরু ও মহিষ থাকে এবং অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ব্যবস্থার ভিতর জনসাধারণের জন্ম দুধ সরবরাহ করে। কাজেই ভেজাল দেওয়া দুধ এইরূপ অবস্থার স্বাস্থ্যের পক্ষে আরও ক্ষতিকর হইয়া ওঠে। এই জাতীয় খাটাল অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার। লাভের অঙ্ক যা থাকে তাহাতে গোয়ালারা স্বচ্ছন্দে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গরু মহিষ রাখিতে পারে—কিন্তু বর্তমান সেটা বাজে খরচ বলিয়াই তাহার মনে করে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্রেতা এবং পাড়ায় লোকেরা। কিন্তু জানিয়া গুলিয়াও তাহারাই ইহা কেনেন এবং পাড়ার মধ্যে খাটালের উৎপাত সহ করেন।

ঘীরে ঘীরে ভেজালের মারফৎ জাতি অনেক পছন্দ হইয়াছে—স্বাস্থ্য গিয়াছে, বল গিয়াছে, বুদ্ধি কতদূর আছে এবং কতখানি সুস্থ আছে ভেজাল দেওয়া এবং ভেজাল দেওয়া জিনিস কেনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একে খাদ্য নাই তারপর যা কিছু সামান্য পাওয়া যায় তাহাও যদি ভেজাল মানে বিধাক্ত বা নিষ্ক্রিয় হয় তাহা হইলে স্বাস্থ্যই বা কি করিয়া থাকিবে? ভাল হোটেল ভিন কোর্সের লাঞ্চ দিয়া ৩০ টাকা ৪০ টাকা বা কোথাও আরও

কিছু বেশী নেয় কিন্তু ওজন হিসাবে বা পরিমাণ হিসাবে তেমন কিছু থাকে না। খাদ্যের বিশুদ্ধতাই একমাত্র কারণ যাহাতে এত কম খাইয়াও শরীর সুস্থ থাকে। একটুখানি সাধারণ সুপ, কয়েক টুকরা মাংস, খানিকটা আলুসিদ্ধ, একটু ফল, হয়ত ইহাতেই লাঞ্চ সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং উপরোক্ত দাম ধার্য করা হয়। যুদ্ধের সময় এবং পরে ইংলণ্ডের খাদ্যের কড়াকড়ি এতখানি ছিল যা একমাত্র গল্পেই সম্ভব। তবুও সেখানকার লোক বাঁচিয়াছে, প্রাণপাত করিয়া অটুট মনোবল নিয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং যুদ্ধের পরে আবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এত সংক্ষিপ্ত খাদ্য খাইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া জীবন ধারণ করার মূলে রহিয়াছে খাদ্যের বিশুদ্ধতা। আগে আমাদের পল্লীগ্রামে অন্ততঃ ভেজালবিহীন খাদ্যপ্রব্য পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন পল্লীগ্রামেও ভেজালবিহীন জিনিস পাওয়া শক্ত।

ভেজালের মারফৎ ঘীরে ঘীরে আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি প্রায় অজ্ঞাতসারে। এই ধরনের slow poisoning সহসা নজরেও পড়ে না বা পড়িলেও আমরা তাহা তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না। সমগ্র জীবন যতদিন না এ বিষয়ে সচেতন হইবে ততদিন এ পাপ দূর হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে কড়াকড়ি আইন প্রণয়ন হওয়া উচিত যাহাতে ভেজালকারী কঠোর দণ্ড লাভ করে এবং বিষ প্রয়োগের সমতুল্য অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। তবেই ভেজাল বন্ধ হইতে পারে, জাতির স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে। না হইলে নষ্ট স্বাস্থ্য জাতি দিন দিন একটু একটু করিয়া মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইবে—কিছুতেই তাহা রোধ করা সম্ভব নয়। বিষ খাওয়ার চেয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য অল্প মাত্রায় খাওয়া ভাল এ বোধ জাগ্রত হইয়া উঠুক। সামাজিকতা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বিধাক্ত খাদ্য খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করার ইচ্ছা দূর হোক—তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে, জাতি আবার স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিবে।

(যুগবাণী হইতে উদ্ধৃত)

শিশু-শিক্ষা

শ্রীমুক্তা রায়

“বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তিনটি ভাগ”

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়—
শৈশব, প্রথম বাল্যকাল ও পরবর্তী বাল্যকাল। এই
তিনটি ভাগের মধ্যে হঠাৎ কোনও ভাঙা হয় না। একটি
ভাগের থেকে আর একটি ভাগে শিশু আস্তে আস্তে চলে
যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষকের অবহিত হতে হবে যে
শিশু কোন্ অবস্থায় রয়েছে এবং সেই অবস্থায় তার শরীর ও
মনের বিকাশের পক্ষে কি প্রয়োজন; সেই অনুসারে তার
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক অবস্থাতেই
তাকে একদিকে স্বাধীন ভাবে বিকশিত হতে দেবার
সুযোগ দেওয়া এবং অতদিকে সংযত হতে শিক্ষা
দেওয়া—দুটোই খুব বেশী প্রয়োজনীয়।

“শৈশব”

৪।৫ বৎসর বয়সের শিশু সাধারণতঃ খুব দ্রুত এবং
কর্মপ্রিয় হয়। তার প্রবৃত্তি ও সংস্কারগুলি খুবই শক্তিশালী
থাকে এবং খেলার মধ্যদিয়ে সেগুলিকে সে প্রকাশ করতে
চায়। অনুসন্ধিৎসা এবং নিজের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার
চেষ্টা তার মধ্যে এক বেশী থাকে যে সে সব সময়েই গ্রহণ করে
এবং সব জিনিষের মধ্যে হাত দিয়ে ও চঞ্চলতা করে বস্তুদের
অস্থির করে তোলে।
তার চিত্ত বৃত্তির বেগ ক্ষণস্থায়ী হলেও খুব জোড়ালো হয়
এবং সে বস্তুদের ওপর খুব নির্ভরপরায়ণ হয়।

সামাজিক ভাবে সে এখনও খুবই অপরিণত, কারণ
আত্মাহুঁরাগই এখন তার প্রধান মনোবৃত্তি; সামাজিক বৃত্তির
সামান্য উন্মেষও অবশ্য হয়েছে,—অন্ত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে
মিশে সে এখন খেলা করতে পছন্দ করে।

এই বয়সের ছেলে মেয়ে যদি স্কুলে ভর্তি হয় তাহলে
তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। নানা উপকরণ দিয়ে
ক্লাসের ঘরটা এমন ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যে শিশু
সেগুলি নিয়ে নিজের মনে স্বাধীন ভাবে খেলা করতে পারে।

শিক্ষক সেখানে থেকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে শিশুদের যা
প্রয়োজন তারা যেন সেটা পায়। প্রত্যেক শিশুর স্বভাবের
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার সুযোগও এই সময় শিক্ষক লাভ
করবেন।

বিদ্যালয়ে আসবার পূর্বেই নিজ নিজ বাড়ীতে শিশুরা
অনেকটা জ্ঞান আহরণ করে আসে। কিন্তু এই জ্ঞান
সুব্যবস্থিত নয়। বিভিন্ন ইচ্ছার উপলব্ধিগুলি তার খুবই
তীব্র এবং বস্তুদের শক্তির সমান কিন্তু এখনও সেগুলির পূর্ণ
তাৎপর্য বোঝবার অভিজ্ঞতা তার হয়নি।

কতকগুলি কাজ করবার, যেমন খাওয়া, কাপড়পরা
ইত্যাদির অভ্যাস তার হয়েছে। কিন্তু কাজগুলি করতে
তার অনেক সময় লাগে এবং পরিশ্রম হয়।

তার ব্যক্তিত্ব ভেগে উঠতে আরম্ভ হয়েছে এবং হয়তো
এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা তার হয়েছে যা তার ব্যক্তিত্বের
ওপর চিরকালের মত ছাপ রেখে যাবে।

ভাবার ওপরে তার যথেষ্ট দখল হয়েছে, তার সংখ্যার
জ্ঞানও কিছু পরিমাণ হয়েছে।

ভাল আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হতে পারলে উপরিউক্ত
শক্তিগুলি শিশু সহজেই লাভ করে। কিন্তু অনেক সময়ে
দারিদ্র্যের নিপীড়নে অথবা অন্যান্য কারণে শিশু স্বাধীনভাবে
নিজের শক্তিগুলি বিকাশের সুযোগ পায় না। শৈশবে
উপযুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হতে না পারলে পরবর্তী
জীবনে নানা রকম শারীরিক ও মানসিক পীড়া দেখা দেয়।
সেগুলির নিরাকরণের জন্য যখনই প্রয়োজন তখনই একেবারে
ছোট শিশুর (যেমন ছ’ তিন বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ করে
পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত) জন্য বিশেষ ভাবে Nursery
School স্থাপন করা প্রয়োজন।

Nursery School গুলির উদ্দেশ্য হবে সুস্থ শরীর ও
মন, সুদৃঢ় চরিত্র গড়ে তোলা। বাড়ীর আবহাওয়া ভাল
হলে এই কাজ যত দ্রুত ও সহজে হয় স্কুলে হয়তো ঠিক

ততখানি হবে না। কিন্তু তবুও যথাসম্ভব স্থলেরও ওই কাজ করবার চেষ্টা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে স্থলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করতে হয়। মনের দিক দিয়ে শিশু যেন সেখানে নিরাপদ বোধ করে এবং সম্ভব ব্যবহার পায়। তার যেন ইচ্ছা মত খেলা এবং কাজ করবার উপকরণ হাতের কাছে থাকে। স্থলে যথেষ্ট খোলা জায়গা থাকাও প্রয়োজন। স্বাধীন ভাবে নানা রকমে অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারলে তার আনন্দ অমূল্য। এবং সহানুভূতির বৃত্তিগুলি সার্থকতা লাভ করবে এবং তার শরীর ও মন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হয়ে গড়ে উঠবে।

শিশুদের সাধারণ ভাবে সময় তালিকা বলে কিছু থাকবে না, কিন্তু তাহলেও কাজের একটা নির্দিষ্ট ধারণা শিক্ষকের এবং শিশুর মনেও থাকবে। তাতে করে অতিরিক্ত বাধাবাধি না থাকা সত্ত্বেও শিশু বুঝবে জীবনের একটা কাঠামো আছে এবং তা দিয়ে তার অনেক অভ্যাস নিয়মিত হবে। খাবার সময়, বাইরে যাবার সময় এবং বিশ্রাম করবার সময়গুলি স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। বাকী সময়ের খানিকটা ছেলেরা নিজেদের ইচ্ছামত খেলা বা কাজ করবে, আর খানিকটা সময় শিক্ষক এমন কতকগুলি নির্দেশ করে কাজ করাবেন যাতে—ছেলেদের চিন্তা শক্তির উন্নয়ন হয়, সহযোগিতা সহকারে নতুন কাজ করবার উৎসাহ জন্মে এবং আত্মশক্তির বিকাশের উপরে বিশ্বাস হয়।

ছেলেরা স্বাধীন ভাবে যা করবে তার মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি উল্লেখ করা যায় :—গাড়ী, চাকা, পুতুল, ও পুতুলের সরঞ্জাম নিয়ে খেলা; কাঠের তক্তা এবং চৌকনা টুকরো (block) ইত্যাদি দিয়ে গাড়ী তৈয়ারী করা; দোলনা, স্লাইড (slide) মইয়ের মত সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবহার করা; দরজা বন্ধ করা, খোলা; টেবিলে খাবার সাজানো; ঘর কাঁট, ধুলো ঝাড়া, ফুল সাজানো, জল নিয়ে যাওয়া, বালি বা মাটি খুঁড়ে খেলা, হাতুড়ি বা অন্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখা; জীব জন্তুকে স্বয়ং করতে শিক্ষা করা যাতে দায়িত্বজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বাড়ে; পুঁতি দিয়ে মালা গাঁথতে শেখা, মটিসরী উপকরণের ব্যবহার, কাঁচি ও আঠার ব্যবহার এবং ছবির বই দেখতে শেখা। এই কাজ গুলি

করবার সময় ছেলেরা কোনও সময়ে বেশী হৈ চৈ করবে, আবার কোনও সময়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে কাজ করবে; কিন্তু কথা বার্তাটা সব সময়েই চলবে। শিক্ষক এই সময়ে নিরপেক্ষ দ্রষ্টা থাকবেন না, তিনি লক্ষ্য করতে থাকবেন ছেলেরা কি উপকরণ ব্যবহার করেছে এবং কোন্ কাজ করেছে। প্রয়োজন মত তিনি তাদের কোনও উপদেশ দিয়ে নতুন পথের নির্দেশ করবেন। তাঁর কথাবার্তা সর্বদাই এমন হবে যে ছেলেরা তা শুনে নিজেদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা স্বচ্ছ ভাবে প্রকাশ করতে শিখবে।

শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে যে কাজগুলি করানো হবে তা হচ্ছে এই :—গান ও নাচ, গল্প শোনা ও বলা, বিশেষ কোনও ছবি নিয়ে আলোচনা, সমস্বরে ছড়া আবৃত্তি করা; রাস্তায় কৌতুহলোদ্দীপক কোনও ব্যাপার হলে সে বিষয়ে এবং নতুন খেলনার বিষয়ে আলোচনা করা; মাঠে দোকানে, রেল লাইনের ধারে, কামারের দোকান ইত্যাদিতে যাওয়া, বাড়ী তৈয়ারী ইত্যাদি দেখতে নিয়ে যাওয়া।

Nursery school এ এই ভাবে ছেলেরা স্বাধীনভাবে এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে পালা করে সময় কাটাবে। শৈশবের নিরুদ্দেশ ক্রিয়াশীলতা থেকে তারা ক্রমে উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ মনোযোগ সহকারে করতে শিখবে। চোখ কাণ এবং মাংসপেশী ব্যবহার করে ছেলেরা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং অল্প প্রত্যক্ষকে আয়ত্বের ভেতরে নিয়ে আসবে। গান, সাহিত্য এবং কলা, আর মনুষ্য চরিত্রের মধ্যে যা কিছু ভালো তার সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ হতে শিখবে। আত্মনির্ভরশীল এবং অত্যন্ত সাহায্য করতে আগ্রহান্বিত হয়ে মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে।

“Nursery School এর বাড়ী এবং উপকরণ কিছু হওয়া উচিত”

বাড়ীটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলো বাতাসে ভরা হওয়া দরকার। খেলার জায়গা যথেষ্ট থাকা উচিত এবং গ্রীষ্মকালে ছায়া ও শীত কালে রৌদ্র পাওয়া যায় এমন ব্যবস্থার দরকার। এই বয়সের ছেলে মেয়ের মনের প্রসার নির্ভর করে শারীরিক ক্রিয়াশীলতার উপরে, সেইজন্য শিশুরা যেন স্বচ্ছন্দভাবে নড়েচড়ে, বেড়াতে পারে এবং নিকিড়ে খেলা করতে পারে তা দেখতে হবে। ক্লাশের ঘরগুলি সুন্দর

হওয়া দরকার। যে সব ছবি ঘরে টাঙ্গানো হবে সে গুলি বেশী উঁচুতে টাঙ্গানো চলবে না, শিশুর মাথার সমান করে টাঙ্গাতে হবে। খেলনা এবং খাওয়া দাওয়া ও ঘর পরিষ্কার করবার জিনিষপত্র সবই শিশুর আয়ত্বের ভিতর থাকবে। খেলার মাঠে একটি বালির চৌবাচ্চা থাকা দরকার। শিশুরা নিজেরা বাগান করতে পারে এবং গাছ, ফুল, পাখী প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে এ রকম জমি রাখতে হবে।

“প্রত্যেক শিশুর স্বভাবের বিশেষত্ব

লক্ষ্য করা দরকার

পাঁচ বৎসর বয়সের সব শিশুর স্বভাব একরকম হয় না। কেউ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেউ কমবুদ্ধি, কেউ কোতূহলী ও চঞ্চল, আবার কেউ ধীর ও শান্ত হয়। কাজেই সকলকে একরকম ভাবে শিক্ষা না দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা দিতে হয়। আবার কতকগুলি কাজ আছে যেমন, ঘর সাজানো, জীব-জন্তুকে দেখাশোনা করা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদিতে ছেলেরা একযোগে কাজ করে আনন্দ পায় এবং শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে এই সব কাজ যেন একঘেয়ে হয়ে ওঠে না বরং এগুলির মধ্যদিয়ে যেন তারা দৈহিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখে, সামাজিক ব্যবহার রীতি নীতি শেখে এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিষ্কৃত করে তুলতে পারে।

এই বয়সের শিশুর পাঠক্রমের (curriculum) জ্ঞান বিশেষ ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তার আত্মানুরাগ কমে গিয়ে সে যাতে সামাজিক হতে শেখে, নিয়মানুগভিতার মধ্যে থাকতে তার চিত্তবৃত্তি আপনার থেকে সংযত হয়ে আসে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নিজেকে প্রকাশ করতে শেখে ও আত্মনির্ভর পরায়ণ হতে শেখে। এই হচ্ছে এখনকার উদ্দেশ্য।

উপরি উক্ত কাজগুলি করবার সুযোগ যদি শিশু পায় তবে সে আপনা থেকেই পরবর্তীকালের স্কুলের পাঠক্রমের জ্ঞান তৈরী হতে থাকবে। সে যদি বাগানে বা গামলায় বা কাঠের বাক্স করে ছোট ছোট গাছ করে, তবে তার থেকে তার প্রকৃতি পাঠের শিক্ষা হবে। চৌবাচ্চার মাধ্যম মাছ রাখতে শিখলে কিংবা খাচায় পায়রা বা খরগোষ পুষলে তার প্রণীতত্ব শেখা শুরু হয়ে যাবে। চারি পাশের বাড়ীর,

দোকানের জিনিষপত্র, প্রকৃতির পরিবর্তন, সূর্য, চন্দ্র, তারার গতি—এই সব লক্ষ্য করলে তার ভূগোল শিক্ষা আরম্ভ হবে। জন সমাজের কাজে নিযুক্ত বাড়িদার, ডাকপিয়ন, পুলিশ ইত্যাদি সম্বন্ধে সজাগ হলে তার মনে ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন হয়ে যাবে। খেলাগাড়ীর কলকজা, বাড়ীর মধ্যদিয়ে আলো বাতাসের গতি—এসব গুলি লক্ষ্য করতে শিখলে বিজ্ঞানের জ্ঞান আরম্ভ হয়ে যাবে!

তাই বলে সব রকম জ্ঞানই যে সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করতে পারবে তা সম্ভব নয়। সেই জ্ঞান শিক্ষক মধ্য মধ্য নানা গল্প বলবেন, ছবি দেখাবেন এবং বই পড়ে শোনাবেন।

“ভাষার ব্যবহার”

শিশুর পক্ষে কেবল মাত্র অভিজ্ঞতা লাভই যথেষ্ট নয়। অভিজ্ঞতা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করতে না পারা পর্যন্ত তাকে জ্ঞান বলে মনে করা যায় না। ভাষাই হচ্ছে এই প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়—এবং জ্ঞানের ক্রমোন্নতির সোপান। সেই জ্ঞান শিশুদের কথা বলতে দেওয়া এবং তাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করা বিশেষ দরকার। একেবারে বাচ্চা যে কাজ তখনই করছে সেই বিষয়ে কথা বলতে পছন্দ করে; আর একটু বড় হলে অতীতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কথা বলতে পারে। শিক্ষক এই বয়সের শিশুকে নানা বিষয়ে কথা বলতে উৎসাহিত করবেন। তারা যা দেখেছে বা করেছে, যা পছন্দ বা অপছন্দ করে সেই সব বিষয়ে তুলনা ও আলোচনা করতে পারে। শিক্ষক দেখবেন যে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাদের সংখ্যা ও মাপের জ্ঞান যেন বৃদ্ধি পায় এবং কার্য কারণ বোধবার শক্তি প্রসার লাভ করে। অনেক সময়েই দেখা যাবে যে দুটো একটা কথা শিশু জানেনা সেইগুলি পূরণ করে দিলে তার কথার মূলধন বেড়ে যাবে এবং ভাষা অর্থপূর্ণ হবে।

“অল্প বয়সের প্রকাশ”

চিন্তা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় ভাষা হলেও আরও অল্প উপায়ে চিন্তা প্রকাশ করা—যেমন, চিত্রাঙ্কন, হস্ত-শিল্প, অভিনয় ইত্যাদি। গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদি শিশুর জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ অনেক রকমের উপলক্ষ্য দ্বা-ভাব যা শিশু নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তা এগুলির

মধ্যদিয়ে প্রকাশ হয়। শিক্ষক এগুলির ভেতর দিয়ে শিশুর অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।

পরীক্ষার ও গুরুত্বাবে কথা বলতে শেখা সামাজিক প্রয়োজন এবং শিশুকে তা শেখাবার চেষ্টা করতে হয়; কিন্তু তাই বলে তার চিন্তাব ধারা বাধা পায় এরকমভাবে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আর একটি জিনিষও শেখাতে হবে, সেটি হচ্ছে চুপ করে বসে শুনতে পারা। এটাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

“লৈখাপড়া ও অঙ্ককথা”

Nursery school এ থাকতে থাকতেই শিশুরা সামান্য পড়তে শেখে। “বিভিন্ন অক্ষর আলাদা শিক্ষা না দিয়ে এক একটা পুরো কথা একসঙ্গে যদি শেখানো যায় তাহলে ভালই হয়। শিশুরা যে সব ছবির বই নাড়াচাড়া করে কিংবা ক্লাসে নানা নির্দেশ যা লেখা থাকে তা বোঝবার যদি চেষ্টা করে, নিজের নাম লেখা খাতা যদি দেখে, তবে এগরের থেকেই অক্ষর পরিচয় ছাড়াও পড়তে শিখে ফেলে। এটাই পাঠ-শিক্ষার ভাল উপায়।

নানা রকম চিত্রাঙ্কন থেকে হাতের লেখা শুরু হয়ে যায়।

বেশীদূর শেখাবার আগেই ছোট ছোট সংখ্যার যোগ রিয়োগের জ্ঞান শিশুদের হয়। এই জ্ঞানকে আস্তে আস্তে সংখ্যা সংকেতের মধ্যে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে অঙ্ক শাস্ত্রের ভিত্তি। এই ভিত্তি যাতে অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, শূন্যের মধ্যে না চলে যায়, সেটাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার। যে কোন অঙ্কই শুধু কষতে জানলে হবে না, সেটা যে সত্যেরই সংকেতিক প্রতিকল্প তা শিশুকে বুঝতে হবে।

“দৈনিক কর্ম ব্যবস্থা”

সব স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি দৈনিক কর্ম ব্যবস্থা থাকে। Nursery school এও তাহা থাকা প্রয়োজন; কিন্তু অত্যন্ত শ্রেণীতে যে রকম ছোট ছোট

period এ দিনটিকে ভাগ করে ফেলা হয় এখানে সে রকম করা চলবে না। নাম ডাকবার জন্ত, ধর্মশিক্ষার জন্ত কিংবা টিফিনের ছুটির জন্ত ছোট ছোট period রাখতে হবে। অল্প period গুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় (হয়তো বা এক ঘণ্টা) দিতে হবে; কারণ কোন শিশু কোন কাজ করতে কতখানি সময় নেবে তার কোনও ঠিকানা নেই, সেই জন্ত সময়টাকে লম্বা করে বরং তার মধ্যে দুটো বিষয় এক সঙ্গে দিয়ে রাখা ভাল। যে শিশুর কাজ যখন শেষ হবে তখনই সে অল্প কাজটা আরম্ভ করতে পারবে। একটা বিষয়ে বিশেষ মন দিতে হবে, স্থির হয়ে বসে কাজ করার সুযোগ যেন শিশুরা পর্যায়ক্রমে পায়।

প্রত্যেক শিশু সারাদিন কি কি করলো তার একটা অভিলেখন রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এইটা থেকে বোঝা যাবে শিশুর মনের প্রগতি ঠিক ভাবে চলেছে কি না।

“শিক্ষক”

শিশুর শিক্ষক হওয়া শক্ত কাজ। তাঁর শুধু জ্ঞান থাকলেই চলবে না, শিশুকে ভালবাসতে জানতে হবে এবং তার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। শিক্ষককেও শিশুর মত জীবন্ত জাগ্রত হতে হবে। তাঁর এক দিকে সাধন হতে হবে—শিশুকে যা শিক্ষা দেবেন তা যেন সত্যি শিক্ষা হয়, শিশুকে লোক দেখানো বস্তু করে না তোলেন; অল্প দিকে দেখতে হবে যে শিশুকে স্বাধীন ভাবে বাড়তে দিলেও তার সমস্ত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার যেন সে করতে শেখে, সে যেন কোন রকমেই অলস না হয়।

Nursery school এ পরীক্ষার কোনও স্থান নেই। কিন্তু শিশুদের সকল বিষয়ে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তার অভিলেখন রাখতে হবে। সব শিশুই উন্নতির গতি যে সমান হবে তা নয়, কিন্তু মোটামুটি এক রকম হলেই শিক্ষক সন্তুষ্ট হবেন।

কোন নবদম্পতির প্রতি

শ্রীহিন্দুরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রী পুরুষের পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ কোন আদিকাল থেকে চলে আসছে তার ঠিক নেই; সম্ভবতঃ সৃষ্টিরক্ষার উদ্দেশ্যে ভগবান এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

তারপর আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তারই গোড়াপত্তন থেকে মানুষ যখন দল বেঁধে সমাজ গড়তে আরম্ভ করলে, সেই সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য নানাদেশে এই আদিম আকর্ষণকে বিবাহ নামক এক অল্পাঙ্গনে আবদ্ধ করা হল; যার ভিতর দিয়ে না গেলে এই সমাজকে অসিক্ত ও নিন্দনীয় মনে করা হয়।

দেশভেদে এই অল্পাঙ্গন নানাপ্রকারের হয়ে থাকে; কিন্তু মোটের উপর এই পার্থক্যগুলিকে দুইটি বড় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, এক হচ্ছে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে ধর্মসম্মত বিবাহ; আর হচ্ছে, শুধু মানুষের সাক্ষাতে আইন সম্মত বিবাহ।

ভারতবর্ষ ধর্মপ্রধান দেশ। স্মৃতরাং এ-দেশের বিবাহ পদ্ধতিতে যার যে প্রভেদই থাকুক না কেন, সবগুলিই ঈশ্বরকে স্মরণ বা সাক্ষী রেখে তৈরী করা। হিন্দু ধর্মের মূল উৎস যে বেদ, তা' যে কতকাল আগে সংকলিত হয়েছে তা পণ্ডিতেরা এখনও মীমাংসা করতে পারেন নি; কিন্তু শুনতে পাই আমরা আর যে বিষয়ে যত দূরেই সরে এসে থাকি না কেন, আমাদের বিবাহপদ্ধতি আজও মোটের উপর বৈদিক রীতিকেই অনুসরণ করে থাকে। তা'তে বোঝা যায় আমরা এই অল্পাঙ্গনটিতে কত গুরুত্ব আরোপ করে থাকি।

ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যদিও ভিন্ন ভিন্ন কারণে বৈদিক রীতিকে অনেক সংক্ষিপ্ত ও আধুনিক করে আনা হয়েছে, তবু কেউই বৈদিক মন্ত্র একেবারে ত্যাগ করেননি। ত্যাগ করতে চাইলেই বা এমন হৃদয় ভাব আর ভাষা পাবেন কোথায়? আদি সমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে এক জাতি ছাড়া আর হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির প্রায় কিছুই বাদ

দেওয়া হয়নি। এই যে মন্ত্রটি বরকে বিবাহসভায় পাঠ করতে বলা হয় :

ঔ বধামি সত্যগ্রহিণী মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥

আমি সত্যগ্রহিণী দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করি ॥

ঔ যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদন্তু হৃদয়ং তব ।

যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদন্তু হৃদয়ং মম ॥

আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হৃদয়, তোমার যে এই হৃদয় তাহা আমার হৃদয় ॥

ঔ ঋবা দ্যৌ ঋবা পৃথিবী ঋবং বিশ্বমিদং জগৎ ।

ঋবাসঃ পর্বতা ইমে ঋবা পতিকুলে ইয়ং ॥

দ্যুলোক যেমন ঋব, পৃথিবী যেমন ঋব, এই সমস্ত জগৎ যেমন ঋব এবং এই সকল পর্বত যেমন ঋব, সেইরূপ এই শ্রী পতিকুলে ঋব হইয়া থাকুন ॥

—এর চেয়ে সুন্দর বিবাহমন্ত্র কোনো দেশে কোনো কালে ছিল বা আছে কিনা জানিনে; আর এর চেয়ে ভালো আশীর্বাদই বা তোমাদের কি করব তাও ভেবে পাইনে।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বলে এই মন্ত্রগুলির প্রতি কিছু পক্ষপাত স্বভাবত আমাদের থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু যাদের তা' নেই, তাঁদেরও যদি এগুলি শোনানো ও বোঝানো যায়, আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা এর মাধুর্য ও গাভীর্ষ উপলব্ধি না করে থাকতে পারবেন না। সংস্কৃত শব্দেরই কি একটা মহিমা আছে, না বুঝলেও তার ধ্বনি মাহাত্ম্যে মনপ্রাণ অভিভূত হয়ে পড়ে। আর বহু পুরাতন জিনিসের প্রতি একটা সম্মম ও শ্রদ্ধা আপনা হতেই মনে আসে।

অন্ততঃ আমার ত আসে। তবে হাজার সেকলে হলেও আমি এটুকু বুঝি যে, আর একটি দল আছে—এবং আজকাল হয়ত সংখ্যায় তারাই বেশি—যারা বিবাহ জিনিসটাকে ধর্মাল্পনৈতিক বলে মনে করে না; ভাবে ওটা আইন বাচিয়ে একত্র থাকার একটা স্বযোগ মাত্র। কিম্বা

ভাবে প্রাপ্তবয়স্ক জীপুরুষ আমরা হু'জনে ইচ্ছামতো পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে পরস্পরে মিলিত হবো—তাতে ভগবানেরই বা কি, অস্ত্র মাল্লষেরই বা কি ?

পূর্বেই বলেছি অন্তর্ধানটিকে মোটামুটি দুইশ্রেণীতে ফেলা যায়। এক-ধর্মসংগত বা Sacrament, আর এক-আইনসম্মত বা Contract। উক্ত স্বাধীনপন্থীরা দায়ে পড়ে আইনটুকু মানেন—কিন্তু তার বেশি কিছু মানা আবশ্যক মনে করেন না। আমার বতাই বয়স হোক আমিও এক হিসেবে একেলে—অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। আমরাও ভাঙনের যুগে জন্মেছি এবং পুরনো বিশ্বাস ও পুরণো আচারকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হইনি। একজনের বিয়ে যে আর এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে পুরাকাল থেকে স্থির হয়েছিল, এবং তাকে ছাড়া আর কাউকে সে ইহজন্মে বা পরজন্মে বরণ করতে পারতনা বা পারবেনা—এতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসের বল আমার নেই; তা স্বীকার করছি। অপরপক্ষে এও স্বীকার করছি যে, ঘটনাচক্রে যদি হু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্বক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও ভবিষ্যতের সামাজিক জীবনের উপর তার ভালোমন্দ ফলাফল ও প্রভাব যে কত দূর ব্যাপক হতে বাধ্য, এবিষয়ে তাদের দায়িত্ব যে কত বেশি তা যদি তাদের হৃদয়ঙ্গম না হয়ত তাদের আমি মাল্লষ বলেই গণ্য করিনে।

মাল্লষ মাল্লষেরই মন ছুঁবল, চিত্ত অস্থির। তাই এই শুভলগ্নে আমরা নানা সুন্দর আয়োজন, গান, মন্ত্র ও উপদেশ দ্বারা তার চঞ্চল মনকে ঠিক স্থরে বেঁধে তোলবার চেষ্টা করি ও এই নতুন দায়িত্ব বহন করবার জন্ত ভগবানকে আমাদের বল দেবার ও সহায় হবার জন্ত প্রার্থনা করি। যারা মনে করেন তাঁদের নিজের মনের মধ্যেই এই ভার বহনের পক্ষে যথেষ্ট বল রয়েছে, সুতরাং আর কিছুর বা আর কারও সাহায্য অনাবশ্যক, একটা সই করলেই কার্য উদ্ধার হবে,—আমি ছুঁবল। নারী সে মহাপুরুষদের দলে নই। এবং আমার বিশ্বাস অন্ততঃ অধিকাংশ বাঙালীর

মেয়ে আমার দলে যোগ দেবেন। (কনের প্রতি) তোমাকে সম্বোধন করেই বিশেষভাবে বলছি, আজ যে বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার পবিত্রতা ও মহত্ব চিরজীবন রক্ষা করবার যথা-সাধ্য চেষ্টা কর; যে পরিবারের পজন হল, যে গৃহের কর্তৃত্বের ভার আজ থেকে তোমার উপর অর্পিত হল, সে পরিবার ও সে গৃহের সুখস্বচ্ছন্দ্য, শান্তি ও উন্নতি, মান সম্ভ্রম ও কল্যাণ যে বেশির ভাগ তোমার উপরেই নির্ভর করছে, সে কথা সর্বদাই মনে রেখো। শুধু দায়িত্বের কথা বলে ভয় দেখাবো না—এর যে আর একটা মধুর দিক আছে, সেটা ভুললেও চলবেনা। জানিনে এ-বিষয় তোমার কি মত, কিন্তু আমার ত মনে হয় যে, একটি সুখী পরিবারের কেন্দ্র হবার মতো সুখ ও আদর্শ গৃহ রচনা করবার মতো সৌভাগ্য নারীর পক্ষে আর কিছু হতে পারে না—তাঁ তার বতাই বিদ্যাবুদ্ধি নাম ডাক থাকুক না কেন। তুমি নিজগুণে সেই সৌভাগ্যবতী হও, পতিব্রত হও, এই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ।

(বরের প্রতি)—তোমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলিনি বলে মনে করোনা যে, পরের মেয়ের উপর দিয়েই উপদেশের বোঝাটা যাবে। তুমি ঘরের ছেলে, তোমারও কর্তব্যভার কম নয়। এক হাতে তালি বাজে না—সেকথা না বললেও বুঝবে আশা করি। তোমার পক্ষে এই কথাটি বুঝলেই যথেষ্ট হবে মনে করি, যে একটি মেয়েকে তার স্নেহপূর্ণ গৃহ ও আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে তুলে সম্পূর্ণ আলাদা আবেষ্টনের মধ্যে এনে ফেলেছ; সেই সকল অভাবই তোমাকে পূরণ করতে হবে, সকল বিষয়ে তোমাকে তার আশ্রয় ও বন্ধ হতে হবে। ভগবান তোমাদের দুজনেরই সহায় হোন ও মঙ্গল করুন। তোমরা নতুন জীবন আরম্ভের পথে দাঁড়িয়েছ—আমি জীবনপথের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অমর কবির ভাষায় তোমাদের আশীর্বাদ করি :
চিরসুখাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়ে রাখুক জীবন,
হু'জনার বলে সবল হু'জন, জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে।

নারীপ্রগতি

শ্রীশান্তা দেবী

নারীপ্রগতি আমাদের দেশে খুব বেশী হয়েছে কি? কিছুই হয়নি ত অনেক সময় মনে হয়। দেখি যে সব পরিবারের মেয়েরা পুরুষেরই মত বাইরে খেটে খায় তারা ত এক অক্ষর পড়তে জানে না, সন্তান পালনের স্বাস্থ্যরক্ষার, পরিচ্ছন্নতার, নাগরিক রীতি নীতির কোনো কিছুই তাদের পরিচয় নেই। গ্রামে তারা যে পুকুরে স্নান করে, ময়লা কাপড় কাচে, শৌচাদি করে সেই পুকুরেরই জল খায়; সহরেও রাস্তার ধারের গঙ্গাজলের পাইপ খুলে সেইজলে রাঁধবার খাবার বাসন এবং ছেলের ময়লা নির্বিচারে ধোয়, স্নানও করে, এমন কি অনেক সময় মুখও ধোয়। তাদের ছেলে পিলেরা ফুটপাথ ও বড় রাস্তাকে প্রত্যহ পয়খানা হিসাবে ব্যবহার করে, আবার হাতের খাবার পড়ে গেলে সেই পথ থেকেই তুলে খায়। দুঃখ হয় যখন দেখি এরা নিজের ও পরের বাড়ীর আবর্জনা সারা পাড়াময় ছড়ায়, যে কোন লোকের বাড়ীর দেওয়ালে স্তব্ধা পেলেই ঘুঁটে দিয়ে চিত্রিত করে, সামান্য স্বার্থের জন্য সর্বদাই মিথ্যা কথা বলে, এবং অভদ্র ভাষা ও নীচ ব্যবহারের জন্যও তারা কখনও লজ্জিত নয়। অবশ্য অভদ্রতা ও নীচতা সহরের নিম্ন-শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেই বেশী।

এঁত গেল নিম্ন-শ্রেণীর মেয়েদের কথা। ষাঁরা ভদ্র বাড়ীরই মেয়ে তাঁদের মধ্যেও কতজনের যে শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে সেজান না নিয়েও একবার ভাল করে দেখলে ও ভাবলেই বোঝা যায়। খাঁস কলকাতায় একটু বাইরে নিরিবিলিতে যে সব ভদ্র পরিবার বাস করেন, নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে খোঁজ করে দেখলে অনেকই বুঝতে পারবেন সে সব বাড়ীর মেয়েরা বাড়ীতে সামান্য চিঠিপত্র লেখার মত বিত্তা অর্জন করে আর পড়াশুনা করেন নি। কেউ বা পড়তে যদি বা একটু পারেন লিখতে একেবারেই পারেন না। আমি অনেক ভদ্র পরিবারের কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের মেয়ে দেখেছি ষাঁরা রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঘর সংসারের মোটা কাজ এই ছাড়া আর বিশেষ কিছুই শেখেন নি;

অথচ তাঁদের কাজ কম, বিবাহও হয়ে যায় নি। কাজকর্মের ফাঁকে তাঁরা আত্মীয় অনাত্মীয়ের নিন্দাকুৎসা করা ও সম্ভব হলে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখায় অবসর বিনোদন করেন। ভদ্রপরিবারে জন্ম বলে এবং স্ত্রীলোক বলে কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষার পরিচয় এই সব মেয়ের মধ্যে পাওয়া যায়ই, কিন্তু অনেক বিষয়ে এই সব মেয়ের শিক্ষার অভাব দেখলে বিস্মিত হতে হয়। যদিও জানি দোষ তাদের নয়।

ভদ্র বাড়ীর মেয়েদের ঘরের পোষাকে আসাকে যতখানি আবর ও শালীনতা থাকা উচিত তা অনেক মেয়েই রাখতে শেখেনি দেখেছি। বাড়ীর মেয়েদের কাছেই মেয়েদের শিক্ষা। মায়েরা যদি না শেখান মেয়েরা শিখবে কোথা হ'তে? স্নানাদির ব্যাপারেও যথেষ্ট আবর অনেক মেয়েকে শেখান হয় না। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে মাছ পোষাক স্নান ইত্যাদি বিষয়ে শীত প্রধান দেশের লোকের চেয়ে কম আবর স্বভাবতই রাখে। কিন্তু তবু তাহারও একটা শোভন নীমা থাকা দরকার। মাছের আবর রক্ষাই-তার পশুত্ব থেকে উন্নতির প্রথম ধাপ।

শিশুপালন মেয়েদের একটি প্রধান কর্তব্য। কিন্তু দেখা যায় ধনী দরিদ্র অনেক বাড়ীর মেয়েরাই যত্নস্বদের মুখরোচক খাদ্য রন্ধনে যেটুকু শিক্ষা পেয়েছেন শিশুর খাদ্য বিষয়ে তাহার সিকিও শিক্ষা পান নি। গোয়ালারা যে দুধ বাড়ী বাড়ী ঘোগান দিয়ে যায় তা যে জল মিশানো সেটা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মায়েরাই জানেন; কিন্তু একটুখানি সস্তা পাবার জন্য অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দোয়ানোর হাঙ্গাম ভাল লাগে না বলে অধিকাংশ মাতা শিশুদের অনায়াসে এই দুধ খাওয়ান। জল-চালা দ্রুমে যে জল ছাড়া আরও অনেক বিষ থাকে সে শিক্ষা মাদের দেওয়া হয় নি বলেই তাঁরা এটা করেন।

খুব ধনীর ঘরের শিশুকেও দেখা যায় বিয়ের সঙ্গে ফুটপাথের আবর্জনার মধ্যে বসে খেলা করছে, মুঠো করে খুলে মুখে দিচ্ছে। শিশুর শরীর অসুস্থ বলে ডাক্তার হয়ত

তাকে হাওয়া খাওয়াতে বলেছেন। বি রোদে এমন কি বৃষ্টিতেও শিশুটিকে অনাবৃত মাথায় হাওয়া খাওয়াচ্ছে। হয়ত শিশুর রক্ত আমাশা হয়েছে, তাই গায়ে একটা গরম জামা, কিন্তু অধমানে কিছু নেই। ছেলে মরছে কি বাঁচছে না দেখে মা হয়ত রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘর করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের স্বাস্থ্য ছাড়া মনটাও যত্নে উন্নত করবার জিনিস। মায়ের সে শিক্ষা না থাকলে মা শিশুকে ভালর চেয়ে মন্দই বেশী শেখান। আমাদের দেশে মেয়েরা এবং হয়ত পুরুষেরাও শিশুদের কাছেই কে ফর্সা কে কালো এই আলোচনা সারাক্ষণ করেন। তাই দেখি কোথাও কোথাও ভদ্র বাড়ীতে নতুন বোঁএর সম্মুখে বসে বালিকা নন্দরা বলছে, “বৌদি কালো, বৌদি কালো।”

কোথাও বাড়ীতে অভ্যাগতা একজন এসে শিশু মেরেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নাম কি?” শিশু সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, “তুমি কালো।” কোনো শিশু মায়ের কোলে শুয়ে ভোঁতাপাখীর মত মুখস্থ বলছে, “আমি ফরসা, আমার মা ফরসা, আমার বাবা ফরসা।” এই অভদ্র ও অশোভন শিক্ষা শিশুকাল থেকে অশিক্ষিতা বা নাম মাত্র শিক্ষিতা মায়েরাই দিয়ে আসেন।

আমাদের দেশের অনেক গৃহ-বিচ্ছেদও অশিক্ষার জন্তই হয়ে থাকে। বোঁ বাড়ীতে ঢুকেই নিজের আত্মীয় স্বজনের নিন্দা শোনে আবার বাপের বাড়ী গিয়েই স্বশ্বরবাড়ীর নিন্দা শোনে। ননজ ভাজ এর ওর কাণে পরস্পরের নিন্দা করতে ব্যস্ত, যায়ে যায়েও হিংসার সম্পর্ক। ফলে যে সব ভাইবোনের এক সময় প্রায় অভিন্ন হৃদয় ছিল তারাও কিছু দিন পরে আর কেউ কারুর মুখ দেখে না। পালায় পার্কে পিত্তরক্ষার মত নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এক পরিবারের বন্ধন স্বীকার করে মাত্র।

অবশ্য লিখতে পড়তে শিখলেই যে মানুষের এ সব দোষ আর থাকে না বা অল্প দেশের মেয়েদের এরকম দোষ নেই একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে নারীপ্রগতির কথা আমরা যখন খবরের কাগজে লিখি বা পড়ি, অথবা বক্তৃতা মঞ্চে শুনি তখন চারপাশের অন্ধ শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা মেয়েদের এই রকম অবস্থা দেখে কেবলি মনে হয়, “ভারত-নারী সত্যি কি শিক্ষিতা?” আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত একজন হলেই বা কি আর দেশে গভর্ণর আর একজন হলেই বা কি? নারী শিক্ষায় ভারত এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আশ্রয় প্রার্থী

নহে ভীত প্রাণ ভয়ে অর্ধাসনে স্নান
ভিটা ছাড়ে বাঁচাইতে ইজ্জত সম্মান।

আত্মপ্রসাদ

সর্প বলে সং আমি—বাসুকীর জাতি
ছুষ্ট ও নকুল শুধু রটায় অখ্যাতি।

—ত্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

“দুর্ভাগা”

শ্রীপুষ্প দেবী

খবর পেলুম সেজমামীর অসুখ। সত্যি তাঁর কথা ভাবলে বড় কষ্ট হয় আমার। কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না জীবনে হোলো। হিন্দুর ঘরে জন্মেও হিন্দুনীর মধ্যে মানুষ হননি তো?

বাপ ছিলেন মস্ত নামকরা ব্যারিষ্টার। সেকালের ব্যারিষ্টার—যখন লোকে বলতো মদ না খেলে ইংরাজী শেখা যায় না। হাবে ভাবে, আচারে ব্যবহারে ইংরেজের আগাগোড়া অনুকরণ করাটাই ছিল ওসব পরিবারে গৌরবের বিষয়।

মস্ত গোড়া বাড়ীর ছেলে সেজমামা—বরাবর স্কুল থেকে ফাষ্ট হয়ে আসছেন, কলেজের পড়াও শেষ হল কৃতিত্ব ও গৌরবের সঙ্গেই; ইচ্ছেটা সিভিলিয়ান হবার, কিন্তু তাতে বিলৈত যেতে হবে। বাপের অমত, কাজেই ইন্ডিয়ান অডিট পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিজানি কেমন করে সেজমামীর বাপ তাঁর খবর পেলেন, বিষেও ঐত তাড়াগাড়ি হয়ে গেল যে কেউ যেন কিছু ভাববারও সময় পেলেনা। বাঃ বাঃ, বিষে তো নয় সে যেন ফাঁসীর ব্যাপার। দদামশায়ের মুখ ভার দিদিমার মুখ ভার। আমরা ছোটরা যদিবা মাঝে মাঝে হৈ হৈ করে উঠি, সঙ্গে সঙ্গে তখনি ধমক খাই মামাদের কাছ থেকে।

বিষের পর সাত দিনের জন্তে সেজমামী এসেছিলেন এখানে, তারপর মামীমা ফিরে গেলেন হজরফোর্ড স্ট্রীটে তাঁর বাবার কাছে। আর সেজ মামাও বিলৈত থেকে ঘুরে এসে উঠলেন ঐখানেই। সেজমামীর বাবারও তো আর কেউ ছিলনা—নাস্ত্রী না পুত্রকন্যা। সেজমামীর সঙ্গে সম্পর্কটা আমাদের চিরদিন দূরেরই রয়ে গেল। তবুও মনে পড়ে যেদিন সেজমামা মারা যান সেদিন বড় কষ্ট হয়েছিল সেজমামীকে দেখে। যদিও তখন আমি খুব ছোট, তবুও মা যখন ছোট মামীকে বলছিলেন, ‘কি করে যে কাটবে সেজ বৌদির জীবনটা? না আছে ছেলেমেয়ে না আছে

ঠাকুর দেবতা,’ তখন আমার মনেও সমস্তটা যেন গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, চাকরীর কল্যাণে নানাদেশ ঘুরে পূজার ছুটিতে কলকাতায় এসেছি, হঠাৎ ন’দা বলে—জানিস অমল, সেজমামীর বড় অসুখ। বিকেলে গেলুম সেজ মামীমাকে দেখতে। প্রকাণ্ড বাড়ী জনশূন্য থাখাঁ করছে। ওপরের ড্রয়িংরুমে গরদের লাড়ী পরে সেজমামী বসে আছেন সোফায়, কোলে ছোট্ট এ্যালেসিয়ান কুকুর। আমাদের দেখেই চোঁচিয়ে উঠলেন সলোমান সলোমান করে।

আমরা ত অপ্রস্তুত। শেষে মামীমা বলেন, ওগুড তোমরা? আমি তো ভয় পেয়ে গেছলুম। সোলেমান বেয়ারা সেলাম করে দাঁড়ালো। অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে সেজমামী বলেন, ‘কোনোও কমনসেন্স নেই তোমাদের। যেকোন লোক আমার ঘরে ঢুকে আসে। যাও তোমায় জবাব দিলুম আমি। একথা যদি শোনে আমার ডাক্তার ব্রাউন সব কজনেরই চাকরী যাবে তোমাদের। বারে বারে বলে গেছেন মিসেস গাঙ্গুলী—ভারি উইক হার্ট আপনার, দেখবেন কোন রকম ট্রেন্ যেন না হয়। আমি যতই বলি বাঁচার আমার কিইবা দরকার তা কিছুতে বোঝাতে পারিনা তাঁকে। এই বাড়ী শুদ্ধ বি চাকরের ওপর কি কড়া সে তাঁর আইন।’

আমরা তখন ভীষণ অপ্রস্তুত। বেচারী সোলেমান! আমাদের জন্তে তার চাকরীটা শুধু শুধু গেল। বড় দুঃখের কথা। তারপর সেজমামী অনেক কথা বললেন। সবই অলৌকিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। যথেষ্ট নাকি নানা রকম আদেশ পান সেজমামী। দেখালেন পূজার ঘরে তাঁর সোনার রাধাকৃষ্ণ, খেত পাথরের বিরাট মহাদেব আর কালো পাথরের আত্মামার মূর্তি। প্রকাণ্ড নাড়ু গোপালের অয়েল পেণ্টিং এমন কায়দা করে ঠ্যাণ্ডে বসান যে সূইচ

টিপলেই লক্ষী ছেলের মত জিঞ্জির খাটে শুয়ে পড়ে। প্রত্যেক ঠাকুরের জন্তু খেত পাথরের খাট, তাতে সিঁকের বাগর দেওয়া নেটের মশারী, খাটের পাশে ছোট্ট ছোট্ট রূপার খড়ম। প্রত্যেক ঠাকুরের ছসেট করে বাসন, এক সেট করে রূপার একসেট করে পাথরের। জপের মালাও দেখলুম রকমারি—রুদ্রাক্ষ, তুলসী, ক্ষতীক নানা ধরণের।

বললেন—বাঁচার ইচ্ছে একেবারে না থাকা সম্ভবও ব্রাউনের জালায় এই তিনমাসের মধ্যেই এই পোড়া শরীরের ওপর পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেলো, তবু মরণ আসে না। হঠাৎ গেটের দিকে নজর পড়তেই কম্পানিয়নকে বললেন, শীঘ্র যাও, দরওয়ানকে বলো ওদের এক্ষুনি দূর করে দিতে—ওসব চোর ভিখিরীর বেশ ধরে ঘরের সম্মান নিয়ে যায়। দেখি একটা বুড়ী একটা ছোট্ট ছেলের হাত ধরে দরজায় এসে দাঁড়ালো, হাতে একটা টিনের মগ। সাধারণ ভিখারী। খুব কাতর স্বরে ছেলেটিকে দেখিয়ে বলছে, ‘আমি ছুদিন না খেতে পেরে মরবো না বাবা, কিন্তু এ ছুধের বাছা শুকিয়ে মরবে। একে যাহোক ছুটো দাও।’ দরওয়ান বীর বিক্রমে ধাক্কা দিয়ে তাদের গেটের বাইরে করে দিয়ে এল।

সেজমামীর গল্প আবার চলছিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে লক্ষ্য পড়ায় কম্পানিয়নকে বললেন, আমার ইনফারেন্স দেবার লোক তো আজ এখনও এলনা। তুমি ব্রাউনকে ফোন করে জানাও ওকে বদলে দিতে। বারে বারে বলেন, কি নিয়ে জীবন কাটাবো বল দেখি। কিন্তু দেখলুম জীবনে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের মোহ তাঁর প্রচুরই রয়েছে। তাছাড়া নিজের একটা শরীরের তদারকে তিনি এত ব্যস্ত যে স্বামী সন্তান ও সংসারের বন্ধনটাই তাঁর ওপর না চাপিয়ে ভগবান সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। রেফ্রিজারেটর থেকে ঠাণ্ডা আপেল কুরে রস করে দিতে গিয়ে আয়া লছমী জোর ধমক খেলে দেবী করে ফেলেছে বলে। বজ্রেন, দিনে তিন হাজার ক্যালোরী ফুড আমায় খেতেই হবে। নইলে ব্রাউন অনর্থ বাধাবে, অথচ এদের কোন রকম দায়িত্ব জ্ঞান নেই। আমায় তো খেতে মোটেই ইচ্ছে করে না, অথচ ব্রাউনের জালায় এ থেকে মুক্তি নেই আমার।

কমালে রগড়ে শুকনো চোখ দুটো লালচে করে তুললেন একটু। কিকরে উঠবো ভাবছি, এমন সময় বেয়ারা এসে জানালো ডাক্তার সাহেব এসেছেন। আমিও তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম।

* * *

দৈবক্রমে তার পরদিন যেতে হল এক বড় অফিসারের বাড়ী—গেটের কাছে তঁকমা আঁটা চাপরাশি সেলাম করে আমায় ভেতরে নিয়ে গেল। বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত ড্রয়িং রুম। দেখলুম গৃহস্থামীর পরণে ধুতি ও পাঞ্জাবী, গৃহিণীর সাজসজ্জায় ও বেশ স্নরুটির পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহস্থামী পিতৃবন্ধু। শান্ত সৌজতের মধ্যে আলাপ চলছিল। এমন সময় ছুটতে ছুটতে আরদালী এসে বললে, ‘একটো বুঢ়া বাবু আয়া হুজুর।’ সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ, বয়েস আশির ওপর হবে। হাঁটুর ওপর মলিন ধুলি ধুসরিত ধুতি পরা, হাতে একটা ভাঙ্গা কক্ষির টুকরো, গায়ের জামা শতছিন্ন, মাথায় একমাথা রুক্ষ চুল, আবক্ষ দাড়ি। গৃহস্থামী তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বললেন, ‘একী ভোলাদা তুমি কোথথেকে।’ অতি সরল স্বন্দর শিশুর মত হেঁসে বৃদ্ধ বললেন, এলুম চলে বাসে ক’রে। কতটুকুই বা পথ? বিশ্বেশ্বর কিছুতে আসতে দেবে না। বলে এই তিরিশ মাইল রাস্তা, তুমি চোখে দেখতে পাওনা, শেষে কি পথে একটা বিপদ বাধাবে? হাঁরে আমার মীরা কই, মীরা? কতো দি—ন দেখিনি তাকে, তা পাঁচ বছর হবে। হাঁয়ে ওর ছেলে মেয়ে হবেনা? হবে বৈকি, ঠিক হবে, এই বছরের মধ্যেই হবে।’ আপনমনে বলে চলেন বৃদ্ধ। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বছর উনিশ কুড়ির একটা মেয়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালো। আনন্দে অশ্রু সজ্জল চোখে বৃদ্ধ তাকে টেনে নেন কোলের কাছে, বললেন, হাঁয়ে এত রোগা হয়ে গেলি কেন মা? না বাপু, এখন ছেলে মেয়ে এসে কাজ নেই। আগে শরীর সারুক, কি এত তাড়াতাড়ি ভোমাদের? ছুদিন দেবী হলেই বা ক্ষতি কি তোদের? হবে এখন ঠিক সময়।

এমন সময় এসে দাঁড়ালো এক বালক একহাতে তার খেলার ইঞ্জিন। তাকে দেখে বৃদ্ধ যেন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। ‘এই যে গোপাল এস এস।’ বালকের মা

বলেন, 'ওর হাতটা দেখুনতো আপনি, লেখাপড়া হবেতো ওর?' গভীর বিষ্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে বুদ্ধ বলেন, 'হবে না কি মা? ওতো পি সি রায় হবে।' হ্যাঁমা আমার রুহু কই, রুহু? তার মা বলেন, 'সেতো ঋগুরবাড়ীতে।' ব্যাকুল আগ্রহে বুদ্ধ বলেন, 'দাওনা তার ঠিকানা, তাকে একবার দেখে আসি।' গৃহস্থামী বলেন, 'না না আপনি কেন কষ্ট করে যাবেন? সেতো অনেকদিনই আসে এসময়। মীরা ফোন করে দিক্ এক্ষুনি এসে পড়বে হয়তো।' মীরা ফোন করে রুহুকে ডাকতেই বুদ্ধ আর বসে থাকতে পারেন না। মীরার হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বলেন, 'হ্যাঁরে আমি আমি, তোমার গলাটা অমন লাগছে কেন বল দেখি? অসুখ বিষ্ময় হয়নি তো? রোজ ছুটো করে পের্যাজ আর গোল-মরিচ খা দেখি। সব সেরে যাবে? সব অসুখ সেরে যাবে তখন খুব আনন্দ করো। খুব আনন্দ, বেশ বেশ।' রিসিভারটা হাত থেকে নামিয়ে বুদ্ধ দরজার দিকে পা বাড়ান।

গৃহকর্ত্তী ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'সেকি, চলে যাচ্ছেন নাকি, একটু চা খেয়ে যান?' বুদ্ধ বলেন, চা? তা দাও একটু চা। আবার কৰ্ত্তে যাবে কষ্ট করে?' গৃহিণী বলেন, 'না না কষ্ট আবার কি?' প্রকাণ্ড হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বুদ্ধের মুখ। বলেন, 'দেখো আমার বিশ্বেশ্বর বজ্জ—দাঁড়াও চা খেয়ে যাও। তা আমি বলুম না, দেবী হয়ে যাবে। চা তারা অমায় দেবে। তা বিশ্বেশ্বর বলে, হ্যাঁ বসে আছে তোমার জন্তে চা নিয়ে। এইতো চা ছিল।' মীরা চা করে এনে দেয়, সঙ্গে শিশুভায়ের হাতে প্লেটে করে মিষ্টি। গৃহিণী বলেন, রুহুর শরীর ভালো নয়, ডাক্তার বলছে অপারেশন করতে হবে অ্যাপেন্ডিসাইটিস। বুদ্ধ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, বলেন, না না কিছু হয়নি ওর। কিবে মিছি মিছি ভাবো তোমরা, আমি ওষুধ বলে দিয়েছি রোজ ছুটো করে পের্যাজ আর গোলমরিচ খাবে, তাতেই সেরে যাবে ও।

চায়ের কাপ শেষ করে নামান। গৃহিণী বলেন, 'চা মিষ্টি হয়েছিল তো? যা চিনির দুর্গতি? আমরা তো শুধু কনডেন্সড মিল্ক দিয়েই খাই চা। আমি বলি ওর সঙ্গে একটা স্ম্যাকারিনের বড়ি দিয়ে দেখবেন চিনির অভাব বুঝতে পারবেন না।' বিষ্ময় ভরে বুদ্ধ চান আমাদের দিকে,

বলেন, 'কেন অত সব তোমরা কষ্ট পাও বল দেখি? আমরা তো গুড় দিয়ে দিবি মজা করে চা খাই।'

জগতের যা কিছু অসুবিধে যা কিছু অসুন্দের সবকিছু সহজ ভাবে মেনে নিতে এতটুকু দেবী নেই। অত তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে দুঃখ পাওয়া যে কত অনর্থক তা এক কথায় বুঝিয়ে দেন যেন। হঠাৎ বলেন, জানো কি সুন্দর হয়েছে আমাদের শ্রীহরির ছেলেটি! ওর মধ্যে এক সঙ্গে চার জন আছে—আমার দাদা, নমামা, সেজকাকা আর শিউলীর খোকন। মিষ্টি হেসে গৃহিণী বলেন, 'কি যে বলেন ভোলাদা, ওইটুকু দেহের মধ্যে চার চারটি আত্মা থাকবে কি করে?' বুদ্ধ বলেন, 'কেন থাকবে না? এই সহজ কথাটা যে কেন বুঝতে পার না তোমরা? শঙ্কর ভাষা তো এইই বুঝিয়েছেন।' তারপর গৃহ কৰ্ত্তাকে বলেন, কী চমৎকার কারখানা হয়েছে—আমাদের ওখানে, আর কী ভালো সব ছেলেরা? জানো আমাদের জামাই যে ডাক্তার হয়ে এসেছে ওখানে। আমাদের দুর্গার বর গো? বলতে বলতে বুদ্ধ উঠে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে যান গৃহকর্ত্তী।

তিনি ফিরে এসে বুদ্ধের প্রসঙ্গে বলেন, মস্ত পণ্ডিত লোক। অগাধ জ্ঞান মানুষটির, অথচ চাকরী করলেন না কিছুতে। বলেন 'অধ্যাপনা ছাড়া আর কিছু করার ইচ্ছে আমার হয় না, কিন্তু বিজ্ঞা বিক্রয় করব না।' চির ব্রহ্মচারী, ত্রিসংসারে আপনাদের বলতে কেহ নেই, একেবারে নিঃস্ব, যাকে বলে পপার। ওই বিশ্বেশ্বর শিউলী দুর্গা কেউ ওর নিজের কেউ নন।

অথচ মানুষটির মনে বাৎসল্যের যেন সীমা নেই। কি এক অপার্থিব আনন্দে বুক যেন পরিপূর্ণ। সে আনন্দের ছোয়াচ যারা আসে পাশে থাকে তাদের বুককেও স্পর্শ করে যায়। বারে বারে মনে হল সেজ মামীর কথা। সত্যিই সেজ মামীর করার কিছু নেই। ঐ খেত পাথরের খাটে শোবার লোভে ঐ ক্লপোর বাসনে খাবার জন্তে সত্যি কি নারায়ণ আসেন সেখানে দরিদ্র নারায়ণ আর শিশু নারায়ণ যদি অনাদর পেয়ে ফিরে যায়? মনে আজ সত্যি সত্যি বেদনা অনুভব করলুম সেজমামীর জন্তে। এত বড় আনন্দের স্বাদ যে পেল না সেতো সত্যিই দুর্ভাগ্য।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী

বর্তমান বর্ষে বি, এ পরীক্ষায় শ্রীমতী সূজাতা বসু সমগ্র ছাত্র ও ছাত্রীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া অনার সহ বি, এ পাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা লেকচারার

শ্রীমতী ইরা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে বিজ্ঞান কলেজে প্রাণীতত্ত্বের (জুওলজীর) লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি জুওলজীতে অনার্স লইয়া বি, এস, সি, পরীক্ষায় এবং এম, এস, সি, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি গ্র্যাশুয়াল ইনঃ অব সায়েন্সের জুনিয়র ফোলোশীপ পাইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার নদী গবেষণা বিদ্যায়ত্তনের ডাইরেক্টর শ্রী এন, কে, বসুর কন্যা।

কলিকাতা হাইকোর্টে মহিলা উকীল

শ্রীমতী জ্যোতিষ্ময়ী মিত্র এম, এ, বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিবার জন্ত নামজারী করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ইতিপূর্বে কর্ণেলিয়া সোরাবজী এম, এ, বি, এল ও বেগম মকুবজ্জনা এম, এ, বি, এল মহোদয়ারা ও আরও ২১টি মহিলা ওকালতি ব্যবসা করিবার জন্ত যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীমতী মিত্রর ওকালতী কার্যের প্রতিষ্ঠা লাভ এবং প্রসারের কামনা করি।

ভারতে মাদাম কুরী

বিখ্যাত রেডিয়াম গবেষক ও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারক ম্যাডাম জুলিও কুরী ও অধ্যাপক জুলিয়ো কুরী বিজ্ঞান কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত ভারতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। ভারতে স্বল্পকাল অবস্থতির মধ্যে তাঁহারা যে বক্তৃতা দিবেন তাহা শ্রবণে ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

আমেরিকায় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের আন্তর্জাতিক

সন্মেলনে উষা রায়

১৯৫০ সালে নিউইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউনএর উদ্যোগে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের একটি মহাসন্মেলন অহুষ্ঠিত হইবে। তাঁহারা ভারত গভর্নমেন্টকে একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী পাঠাইবার জন্ত অহুরোধ জানান। ভারত সরকার প্রাদেশিক মন্ত্রীগণকে ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূতগণকে লইয়া একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা এক রচনা প্রতিযোগিতা করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ একটি ছাত্র ও একটি একটি ছাত্রী নির্বাচন করিয়াছেন।

ছাত্রীটি শ্রীমতী উষা রায় (বয়স ১৬) লক্ষ্মী লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্রটি ত্রিবাঙ্কুরের বালকৃষ্ণন নাম্নার নির্বাচিত হইয়াছেন।

উদ্যোক্তাদের ব্যয়ে কুমারী উষা আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। সংবাদটি দিল্লী শিক্ষা মন্ত্রী দপ্তর হইতে প্রকাশ।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি ছাত্রী—

১৯৪৯ সালের সমাবর্তন উৎসবে নিম্নলিখিত বাঙ্গালী ছাত্রীগণ সম্মানিত হইয়াছেন—সংস্কৃতে আশাশীলতা দেবী, দর্শনে কুমারী কমলা মৈত্র ও শ্রীমতী নীরা চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজীতে ক্ষণিকা বসু ও সরোজবাসিনী দত্ত, ইতিহাসে শ্রীমতী বীণাপাণি মিত্র ও শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জি, অঙ্কে উষা রায়, হিন্দী সাহিত্যে শ্রীমতী মনোরমা গুপ্ত ও শ্রীমতী সুধা মুখার্জি, কৃতিত্বের সহিত এম-এ, পাশ করিয়া ডিগ্রী পাইয়াছেন।

বি, এড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৬ জনের মধ্যে ছয় জন বঙ্গললনা—বীণা রায়, দুর্গারানী চাটার্জি, কিরণপ্রভা দত্ত, রমা ব্যানার্জি, রমা চৌধুরী, বেবা ব্যানার্জি কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া ডিগ্রী পাইয়াছেন।

বি, এ, পরীক্ষায় অনিতা রায়, লীলা ব্যানার্জি, গীতা

ব্যানার্জি (কে, সি, ব্যানার্জির কন্যা) গীতা ব্যানার্জি, (পি, বি, ব্যানার্জির কন্যা), কমলা গুপ্ত, রেণু রায়, অনিমা নিয়োগী, বীণা মুখার্জি, রমলা বসু, তারামণি গুপ্ত সম্মানের সহিত পাশ করিয়া ডিগ্রী গ্রহণ করেন।

প্রবাসে বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষায় এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন বাঙ্গালীর গৌরব।

অক্সফোর্ডে বাঙ্গালী মহিলা পি, এইচ, ডি,

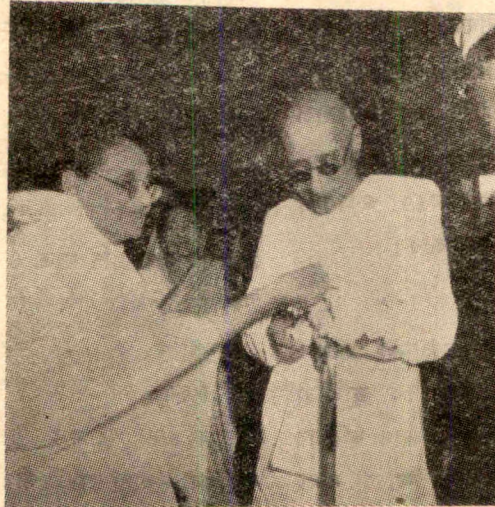
বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী দেবী মুখার্জি সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মূল্যবান গবেষণা করিয়া পি, এইচ, ডি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে কয়েক মাস রক্তের চাপ হ্রাস করিবার পন্থা নিরূপণের জন্ত ভারতীয় ঔষধী বনস্পতি রসের গবেষণা করেন। তাহারই জন্ত তিনি ডক্টার ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন আগ্রহী রসায়নের গবেষক। কলিকাতায় ইতিপূর্বে নানা বিষয় গবেষণা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কয়েক মাস অক্সফোর্ডে অধ্যয়নের জন্ত গিয়া পি, এইচ, ডি, লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীমতী বিভা মুখার্জি পি, এইচ, ডি

শ্রীমতী বিভা মুখার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃতি ছাত্রী। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম, এস, সি, পাশ করিয়া স্যার পি, সি, রায় রিসার্চ স্কলার থাকিয়া খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া নানা নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৯৪৬ সালের শেষে ভাগে গভর্ণমেন্টের স্কলারশিপ লইয়া তিনি পুষ্টিকর খাদ্যের বিষয় উচ্চতর গবেষণার জন্য আমেরিকায় গমন করেন এবং আইওয়া স্টেট কৃষি কলেজে অধ্যয়নরত থাকেন। ১৯৪৯ সালে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খাদ্য পুষ্টি বিষয় আবিষ্কার ও গবেষণার জন্ত পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া স্যার পি, সি, রায় রিসার্চ স্কলারশীপ পদ প্রাপ্তির প্রার্থী।

আন্তর্বিদ্যালয়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় মহিলার কৃতিত্ব

সম্প্রতি কলিকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া তাহাতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী কল্পনা ভট্টাচার্য্য ৭ পয়েন্টে শ্রেষ্ঠ হইয়া সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন।



পুরীতে বসন্তকুমারী বিধবাস্রমে শ্রীহেমলতা দেবী আশ্রমের পক্ষ হইতে
শ্রীরাজগোপালাচারীকে অঙ্গবস্ত্র উপহার দিতেছেন।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীঅনামিকা

সাধারণ বিলাতী চা ও খাবার

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

এখানে যে ক'টি পদ দেওয়া গেল সব ক'টিই সংক্ষেপে করা চলে, এবং অত্যন্ত মুখ রোচক।

* * * *

১। 'চা' করার প্রণালীর বোধ হয় বাংলা দেশে কাউকেই শেখাতে হ'বে না। তবে এদেশে চা-সচরাচর দুধ ও চিনির সাহায্যে পান করা হয়।

ওদেশে দুধের বদলে অনেকে ক্রীম (দুধের সর তুলে তা'কে ফেটিয়ে প্রস্তুত করা হয়), বা পাতি লেবুর রস দিয়ে, চিনি দিয়ে বা না দিয়ে পান করে থাকেন।

এ তো গেল শীতের সময়। গরমের দিনে এই চা অনেক সময় ঠাণ্ডা করে পান করা হয়ে থাকে।

প্রণালী—সাধারণ ভাবে বেশ কড়া করে চা তৈরী করুন। তা'কে ছেকে অল্প পাত্রে ঢালুন। এই পাত্রটি হয় বরফে বসান থাকবে নয় এর ঠে অংশ কুচি বরফে ভরা থাকা চাই। তা'রপর ছোট গেলাসে বা পেয়ালাতে পরিবেশন করুন। প্রতি পাত্রে এক টুকরা পাকি লেবু কেটে দেবেন। বরফের 'চা'তে দুধ বা ক্রীম চলে না। চিনি অবশ্য দেওয়া হয়।

* * * *

২। তিন প্রকারের বাহারের স্মাণ্ডুয়িচ্

(ক) ১ পাউণ্ড রুটি ১/২ মাখন

হুন, গোলমরিচ পনীর

প্রণালী—১ পাউণ্ড (১/২) রুটিতে ১৮২০ পাতলা ২ স্লাইস পাওয়া যায়। এগুলি জোড়া ২ করে, উপর ২ রেখে চার পাশ কেটে ফেলুন। (এই টুকরাগুলি সেক্রে crumb হিসাবে ব্যবহার হয়)

পনীরটি মিহি করে কেটে নিন। মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে, আন্ডাজ মতন হুন, গোলমরিচ দিয়ে, রুটির

উপর মাখান। মেশাবার সময় অল্প (১'চা চামচে) দুধ দিলে আরও মোলায়েম হয়।

এরপর তিন কোণা বা আধা আধি ভাবে জোড়া sliceগুলিকে কাটুন। (৪—৫ জনের পরিমাণ)

(খ) ১/২ মাছের পুর রুটি ও মাখন

প্রণালী—ঠিক আগের মতন করবেন কেবল পনীরের বদলে মাছের পুর (কাটা মাছ থেকে যেমন সিদ্ধাড়ার পুর করা হয়ে থাকে) দেওয়া গেল।

(গ) ১/২ মেটে ৩ রুটি ও মাখন

প্রণালী—মেটেটা সেদ্ধ করে, মিহি করে বেটে নেবেন। পেঁয়াজ, কাঁচা-লঙ্কা, পার্সাল, ছুন মরিচ দিয়ে অল্প ঘিতে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নেবেন। মাখনের সঙ্গে পরে মেখে নিয়ে রুটিতে লাগিয়ে নেবেন। স্মাণ্ডুয়িচ্ আগে ক'রে, ভিজে কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখলে আরও ভাল খেতে হয়।

* * * *

৩। প্যান্ কেক্

১/২ দুধ ১ ডিম

১/২ বা ১/৪ ময়দা ১ মাঝারি চামচে চিনি
ঘি ছোট fry pan

প্রণালী—দুধের সঙ্গে ময়দা আর চিনি অল্প ২ করে মিশিয়ে দিন। (পাটিনাপটার মিশ্রনের মতন হুন হবে) ডিমটা আলাদা ফেটিয়ে নেবেন, পরে এই মিশ্রণে মিশিয়ে দেবেন। সামান্য ঘি'র ময়েন ও এতে দিতে পারেন (ই 'চা'র চামচে ঘি)

ছোট fry pan এ ঘি বুলিয়ে গরম হ'তে দিন। মাঝারি চামচের ২ চামচ করে এক ২ বার এতে

চালুন। এক পাশ শক্ত হয়ে, লাল হয়ে উঠলে অল্প পাশে উল্টে দিন। অল্প দিক হয়ে গেলে নামিয়ে পাত্রে রাখুন। সমস্ত মিশ্রণটি এই ভাবে ভাজা হয়ে গেলে পরিবেশন করুন।

এগুলি এমনি খাওয়া যায়, বা অল্প পাতি লেবুর রস বা চিনি দিয়ে বা কোন রকম জ্যাম দিয়েও খাওয়া যায়।

অনেকের চাম্চে দিয়ে তুলতে ও ঢালতে অসুবিধা হয়। আমি নিজে সমস্ত মিশ্রণটি একটা ছুথের জগে ঢেলে দরকার মতন fry pan এ ঢালি। এতে তাড়াতাড়ি ও কম ছাঙ্কামে কাজ সারা হয়। (৬-৮টি প্যান্ কেঙ্ হ'বে)

৪। জিজ্ঞার বিস্কিট

১/১ ময়দা ৩ চামচ ছাঁচা আদা

১/১ গুড় ১/১ মাখন

১ চামচ বেকিং— ১ মাঝারি চামচ ছুথ

পাউডার

প্রণালী—ময়দাটা ২৩ বার চেলে নিন। শেষেরবার সঙ্গে বেকিং পাউডারটা ও চেলে নেবেন। এবার আদা ছাঁচাটা এই ময়দার সঙ্গে হাত দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

মাখন আর গুড় এক সঙ্গে একটি পাত্রে ফুটিয়ে নিন। ভাল করে ফুটে থাকলে নামিয়ে, ময়দার মধ্যে ঢালুন। গরম থাকতে ২ মাখন। একটু শুক্কো মনে হলে ছুথটা আলাদা করে এতে ঢালতে পারেন। এবপর এই মাখাটা অল্প ঠাণ্ডুন। তা'র পর গোল করে সমস্তটা বেলুন। কিছু বেলবার সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন বেশী চাপ দিয়ে না বেলেন তা'হলে মাখন বেরিয়ে আসার আশঙ্কা থাকতে পারে।

বেলাটা চাকির মাঝ খান থেকে পাশে হওয়া চাই। তা'হলে সমান হ'বে—এবং লুচিটা ঠিক ইঞ্চি পুরু হওয়া চাই।

এইবার চাকা ২ করে, কিম্বা চার কোণা করে কেটে খুব গরম তেজালে বেক করতে দিন। ৫।১০ মিনিটে হয়ে যাওয়া উচিত।

বেক্ হয়ে যাওয়ার আগে এপাস ওপাস করে দেবেন। হয়ে গেলে লালচে সোনালী রং হবে। নামিয়ে ঠাণ্ডা করে টিনে রাখুন, সপ্তাহ খানেক ত নিশ্চয়ই থাকবে, বরং আরও থাকতে পারে। ২০।২৪টা বিস্কিট হ'বে।

তেজালের তাপ ঠিক করার অত্যন্ত সহজ উপায়—উপরে যে কাঠ কয়লা দেন তা'র পরিমাণ কমানো ও বাড়ানোর সঙ্গে ২ তাপ বাড়বে ও কমবে।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীসুধাকান্ত দে

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

সুদূর আমেরিকার ওয়াশিংটনে বিগত ২৪ শে নবেম্বর ১৯৪৯ তারিখে ভোরবেলায় অধ্যাপক বিনয় সরকারের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রী ও সমাজ-তত্ত্ববিদ্রূপে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে সমভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এত বহু ভাষাবিদ ও গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন লোক বিরল। ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হইয়াও এবং তাঁহার

ইংরেজী ও অল্প ইম্মোরোপীয় গ্রন্থাবলী সর্বত্র সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষায় অর্থতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সম্পাদিত 'আর্থিক উন্নতি' ২৫ বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের আর্থিক অংশকে পুষ্ট করিয়া আসিতেছে। যেমন তাঁহার অন্যান্য লেখায় তেমনি এই পত্রিকা পরিচালনায়ও তাঁহার নিজস্ব চাপ ও ভঙ্গী রহিয়া গিয়াছে।

তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। 'বর্তমান জগৎ' সিরিজের অন্তর্গত পুস্তকাবলী উপন্যাসের চাইতেও মনোজ্ঞ। 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' কত যুবকের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে, ইহা নাই। 'পরিবার গোষ্ঠী ও সমাজ' পড়িয়া বুঝবার উপায় নাই উহা ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি যখন যে বিষয়ে চর্চা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার আলোচনা ও বলিবার গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার দরকার হইলে তিনি কখনও ইতস্তত করিতেন না। তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন, একপদে একা বিনয় সরকার দাঁড়াইবার সম্মান লাভ করে। সেই কারণে শিক্ষা, সংখ্যা, শিক্ষা প্রণালী ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মত অপর মতের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন।

তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁকে আজন্ম শিক্ষক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা সত্য। তাঁহার লিখিত শিক্ষা সম্পর্কিত পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য নহে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। উচ্চ সরকারী পদপ্রাপ্তির সুযোগও তাঁর ঘটিয়াছিল। কিন্তু অর্থ বা পদ তাঁকে তাঁর পথ হইতে কখন বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অসীম অমুরাগের পরিচয় আমরা তাঁর জীবনের প্রতি অধ্যায়ে পাই। বস্তুতঃ স্বদেশের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলে একটু অত্যুক্তি করা হয় না। মালদহে তিনি শিক্ষায়তন স্থাপন করিয়া তাঁর কলনাকে কাজে পরিণত করিত প্রবৃত্ত হন। তাঁর দূর দৃষ্টি ও ঔদার্যের কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সামান্যতম উৎকর্ষ দেখিলেও তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। তাঁর মত এত সরাসরী ছাত্রদের সহিত মিশিতে খুব কম দেখিয়াছি। তিনি বাঙ্গালী বা ভারতীয়দের মধ্যে প্রশংসার যোগ্য একটু কিছু দেখিলেই তাহা লব্ধ প্রচার করিতেন। বলিতেন, জাতিটাকে বড় করিতে হইবে। 'বাড়তির পথে বাঙ্গালী' তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান ছিল।

একাকী সরকারী বা বে-সরকারী আর্থিক সাহায্য না লইয়া তিনি অনেকগুলি পরিষৎ বা আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। এগুলি বস্তুতই অধ্যয়ন ও গবেষণার কেন্দ্র ছিল। তিনি সর্বদা লেখাপড়ার উপর বোঁক দিতেন।

তিনিই এগুলির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ভোটাভুটির উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গুলিকে রাখিয়া জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় দেড়শত নিয়মিত গবেষক তিনি তৈরী করিয়াছিলেন এবং তাঁদের অবদানের পরিমাণ সামান্য নহে।

তাঁর বাগ্মীতা ও বুঝাইবার ধরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। বাংলা দেশে তথ্য ও বস্তু প্রীতি তিনিই আনয়ন কারণে ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। বাঙ্গালীর তথ্য, অঙ্ক ও বস্তু বিমুখতার দুর্গাম তিনি ঘুচাইয়াছিলেন। রাশি রাশি অঙ্ক, রাশি রাশি তথ্য ইহাতেই ছিল তাঁর অনন্দ। এবং তাঁর গবেষকেরাও সেই পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি তত্ত্ব বা থিওরি লইয়া সাধারণত আলোচনা করিতেন না, বা নূতন আবিষ্কারে নিযুক্ত হইতেন না, বলিয়া কেহ আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, আমাদের দেশে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত করাই এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য।

তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যাপক সরকার মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত ভারতের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিতেছিলেন, তার স্মৃতি দেখিলে কেহই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারিতেন। বক্তৃতার সময় অনর্গল তথ্য অঙ্ক ও স্মৃতির উল্লেখ করিতেন।

ওয়াশিংটনে ভারতের এই কৃতী সন্তানের মৃত্যু শ্রদ্ধাধিক বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহনের যুগে মৃত্যু কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ সমাজ বিজ্ঞান পরিষৎ ও অন্যান্য পরিষদের উদ্যোগে আহৃত এক সভায় একটি বিনয় সরকার স্মৃতি সমিতি গঠিত হয়। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা উহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ও ডাক্তার অমৃলাচন্দ্র উকীল সম্পাদক, ডাক্তার আর আহামদ কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

এই সমিতির উদ্যোগে গত ১০ই জানুয়ারী ১৯৫০ সেনেট হলে যে জনসভা হয়, তাহাতে বাঙ্গালার প্রদেশপাল ডক্টর কাটজু সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি ও অন্যান্য বক্তাগণ অধ্যাপক সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেনেট গৃহে লোক পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সহরে নানা

প্রকার হাঙ্গামা থাকা সত্ত্বেও লোক সভাটি অপূর্ণ গাভীরা ও নিম্নজাতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি অধ্যাপক সরকারের মৃত্যুতে শোক-স্বচক, দ্বিতীয়টিতে বলা হয় দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ

করিয়া অধ্যাপক প্রতিষ্ঠিত পরিষৎগুলি ও গবেষণার কাজ চালাইয়া যাওয়া হউক।

এরূপ একজন জ্ঞানী মনীষীর প্রতি জন-সাধারণ যে দলে দলে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, ইহা তাঁদের মহত্বের পরিচায়ক।

সরোজ নলিনী স্মৃতি সমিতি

রজত জয়ন্তী উৎসব

জানুয়ারী—১৯৫০

১৪ই হইতে ২১শে জানুয়ারী ১৯৫০ পর্যন্ত রজত জয়ন্তী উৎসব সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তার কার্যসূচী নিম্নরূপ :

১৪ই, শনিবার, অপরাহ্ন ৪টা—“উদ্বোধন সভা”।

সভানেত্রী—ময়ূরভঞ্জন মাননীয়া

মহারাগী সূচাক দেবী।

উদ্বোধন (Inauguration)—।

মিসেস এস. সি. মুখার্জি

“সমাজ সেবা সম্মেলন”।

“শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন”—বর্দ্ধমানের

মহারাগী অধিরাণী বাহাদুর।

১৫ই, রবিবার, অপরাহ্ন ৪টা—“শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্মেলন”।

সভানেত্রী—লেডী প্রতিমা মিত্র।

১৬ই, সোমবার, অপরাহ্ন ৫টা—ব্রতচারী মৃত্যু।

৬টা—“সরোজনলিনী বক্তৃতা”

—ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু।

১৭ই, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন—প্রদর্শনীর মহিলা দিবস।

১৯শে, বৃহস্পতিবার—(১) সকাল ৯টা—“প্রার্থনা সভা”

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দাসের

পরিচালনায়

(২) অপরাহ্ন ৫টা—“বার্ষিক স্মৃতি সভা”

সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা স্বভদ্রা হাক্‌সার

“পুর্নস্কার বিতরণ” করিবেন—লেডী সিংহ

২১শে, শনিবার অপরাহ্ন ৪টা—প্রান্তন ছাত্রী সম্মেলন,

ছাত্রাচিত্র প্রদর্শন।

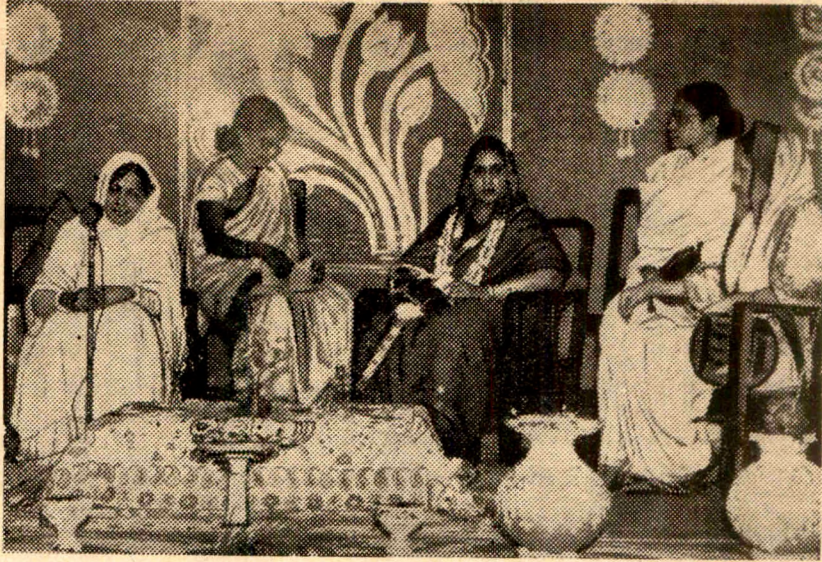
ভগবানের রূপায় এই প্রতিষ্ঠান যে এতদিন ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতে পারিয়াছে, এজন্ম সর্বাপেক্ষে তাঁকে প্রণাম করি। আমরা আশা করি, ভবিষ্যত ইহা উত্তরোত্তর আরও বেশী কাজ করিতে সক্ষম হইবে এবং নারীদের সর্বাদীন উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারিবে।



Indian Fabrics

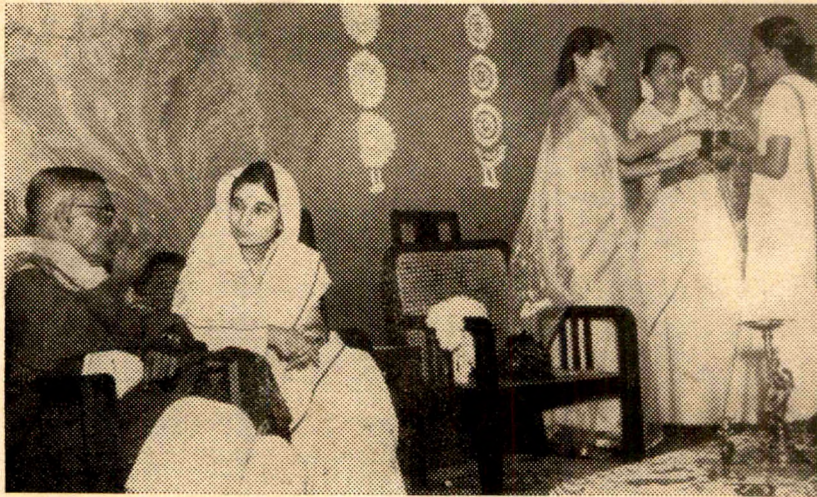
CLASSIC SILK & COTTONS

• BHOWANIPUR :: CALCUTTA •



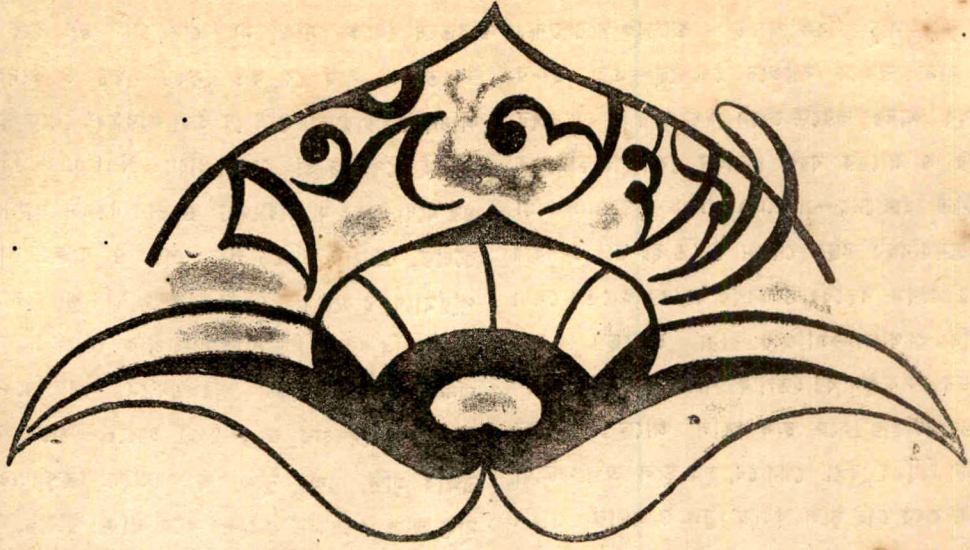
১৪ই জানুয়ারী শনিবার সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির রক্ত জয়ন্তীর উদ্বোধন সভা। সভানেত্রী ময়ূরভঞ্জের মাননীয় মহারানী সূচাক দেবী বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে যথাক্রমে সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সূজাতা রায়, মধ্যস্থলে বর্ধমানের মহারানী ডাঃ ফুলরেণু গুহ ও শ্রীযুক্ত এস, সি মুখার্জিকে দেখা যাইতেছে।

(ফটো—আনন্দবাজারের সৌজন্তে)



১২শে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির রক্ত জয়ন্তী উৎসবের বার্ষিক স্মৃতি সভা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বার্ষিক স্মৃতি সভার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সূভদ্রা হাক্সার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন, তাঁহাকে সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে। লেডী সিংহ পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন। সরোজনলিনী স্কুলের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মনিষা রায় তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন।

(ফটো আনন্দবাজারের সৌজন্তে)



২৫শ বর্ষ

মাঘ—১৩৫৬

৩য় সংখ্যা

ডায়েরী হইতে কয়েক পাতা

সরোজনলিনী দত্ত

৩১শে মে, ১৯২০,
কোবে, জাপান।

৩১শে মে ১৯২০ সাল। আজ সকালে মিঃ মাইতানী গভার্ণারের ইন্টারপ্রেটারকে নিয়ে আমরা একটা মেয়েদের middle school দেখতে গেলুম—দুকতেই দেখা গেল স্কুলের বাড়িটা প্রকাণ্ড বড়। এখানকার প্রিন্সিপেল আমাদের একটা ঘরে বসিয়ে জাপানি চা খাওয়ালেন, তারপর সমস্ত স্কুলটা দেখালেন—এ স্কুলে ৮০০ জন মেয়ে আছে—প্রথমে মেয়েরা ড্রিল করছে দেখলুম। এখানেও আগে যে ছোটো মেয়েদের হাইস্কুল দেখেছি সেই রকম করে মেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছে—ড্রিল শেখাচ্ছে, মেয়ে টিচারে কিন্তু। এখানে ৪০ জন টিচার আছে, তার মধ্যে অনেক পুরুষ টিচারও আছে। এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার

বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। সাবান কেমন করে তৈরী হয় আজ তারা নিজেরা ক্লাসে ছোট ছোট কাঁচের টিউবে সাবান তৈরী করে শিখছিল। ড্রইং ক্লাশে প্রত্যেক মেয়ে এক একটা কাঁচের পাত্রে সত্যিকার জিয়ন্ত সোনালী মাছ জলে ভাসছে সামনে রেখে আঁকছে—প্রায় প্রত্যেক ক্লাশে মাষ্টারের সামনে টেবিলে ফুল সাজান আছে, এ স্কুলেও বিজ্ঞানের ছ তিনটা লাবরেটরী আছে। গান শিক্ষার ক্লাসও আমরা দেখলুম। একজন মেয়ে টিচার পিয়ানো বাজাচ্ছে আর প্রায় ৫০টা মেয়ে দাঁড়িয়ে জাপানি গান ইংরিজি স্বরে গান করছে। প্রত্যেক ক্লাশে একটা করে ছোট আলমারিতে সেই ক্লাশের মেয়ের পড়বার উপযোগী বইয়ের এক একটা লাইব্রেরি আছে। রেফারেন্স রুম আছে সেখানে মেয়েরা নিজেরা বই ও ডিকশনারী দেখে পড়ছিল। এখানেও সহবৎ শেখানোর ক্লাশ হয়।

তারপর আমরা মেয়েদের ডরমেটারী দেখলুম। শোবার ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঘরে খাট বিছানা নাই, শুধু একটা .করে নীচু টেবিল আছে। প্রত্যেক ঘরে স্নন্দর করে ফুল নানা রকমে সাজিয়ে রেখেছে—এরা স্নন্দর জিনিষের খুব আদর করতে জানে দেখা যায়। মেয়েদের মুখ ধোবার ও স্নানের ঘরও দেখলুম বেশ পরিষ্কার। এ স্থলের প্রকৃতি বিজ্ঞানের—natural historyর-museum ছিল। মেয়েদের বছর বছর কেমন উন্নতি হয় তাই দেখবার জন্তে তাদের প্রথম বছরের ও পরপর বছরের হাতের লেখা ও আঁকা ছবি দেখালে—সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এদের মেয়েরা নিজেরা সব স্থল ঘর ইত্যাদি পরিষ্কার করে, এ স্থলে মেয়েদের ডরমেটারীর সঙ্গে হাসপাতাল আছে। এখানে আরও একটা জিনিষ দেখা গেল যে, সব স্থলে এলিমেন্টারী থেকে আরম্ভ করে হাই স্কুল পর্যন্ত ড্রিল ও অগ্নাত্ত ব্যায়াম করবার জন্ত এক একটা প্রকাণ্ড ঘর আছে।

স্থলটা দেখে আমরা ইম্পিরিয়াল (Imperial) মিউজিয়াম দেখতে গেলুম, মিউজিয়ামে ঢুকবার জন্তে টিকেট কিনতে হলো। অগ্ন মিউজিয়ামের মত বেশী জিনিষ এখানে নেই। খালি ঐতিহাসিক ও পুরাতন বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় মূর্তি ছবি ও লেখা ইত্যাদি অতি স্নন্দরভাবে সাজান আছে। পুরাতন শিল্প সম্বন্ধীয় কিছু কিছু জিনিষও রয়েছে—এই সব জিনিষের মধ্যে অনেকগুলি হচ্ছে National Treasure এ সবার মধ্যে একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে বোঝা যায় যে জাপানের সভ্যতার উপর বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের কতদূর প্রভাব। কি sculpture কি ছবি সব জিনিষেতেই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব নিয়ে প্রাচীন জাপানের সৌন্দর্য জ্ঞান দেখে মনে হয় বুদ্ধের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এতে ফুটে উঠেছে। আর এই সৌন্দর্যগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে তোলবার

জন্তে জাপানের প্রাচীন শিল্পীদের মনে যে কি গভীর আবেগ ছিল তা এগুলি দেখে বোঝা যায়। জাপানের বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে সোজা না এসে চীন দেশ হয়ে এলেও ভারতবর্ষের সঙ্গে যে কত নিকট সম্বন্ধ ও ওদের প্রধান আধ্যাত্মিকতার ভাবগুলি যে এরা ভারতবর্ষ থেকে খুব নিকট ভাবেই পেয়েছে তা বোঝা যায়। National Treasure এর মধ্যে বুদ্ধের মা মায়াদেবী ও তাঁর তিনটা দাসীদের মূর্তি রয়েছে, প্রত্যেক ছবিতে প্রায় পদ্ম ও বজ্রের ছবি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। একটা প্রকাণ্ড ছবি আছে যাতে খালি অনেকগুলি বক ও পদ্ম সারি সারি আঁকা রয়েছে। দাইগেজি মন্দির থেকে কয়েকটা ছবি এখানে অল্প দিনের জন্তে সাধারণের দেখবার জন্তে রাখা হয়েছে—তাতে হংসবাহন ব্রহ্মার মূর্তি, বিষ্ণুর মূর্তি, ও বৃষবাহন ত্রিশূলধারী শিবের মূর্তি অতি পরিষ্কার ও স্নন্দর করে আঁকা রয়েছে, বৃষবাহন শিবের অনেক ছবি এই মিউজিয়ামে দেখা গেল। প্রাচীন জাপানে গরু বাছুর ছিগ না স্ততরাং এই শিবের মূর্তি কল্পনা যে সোজা ভারতবর্ষ থেকে ধার করা সে সম্বন্ধে কোন ভুল হতে পারে না। কোন কোন চিত্রে ও লেখায় দেবনাগরী অক্ষর রয়েছে, একখানা বড় চিত্র রয়েছে যাতে মাঝখানে বুদ্ধের ছবি ও চারিদিকে অতি স্নন্দরভাবে আঁকা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ধর্মের দ্বাদশ রাশি অর্থাৎ মেঘ, বৃষ, মিথুন, ককট, সিংহ, বস্ত্রা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনের ছবি রয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকরা যে জাপানে এসেছিলেন এবং তাদের উপর এখানকার লোকের যে কত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তার একটা অতি আশ্চর্য ও চূড়ান্ত নিদর্শন এই মিউজিয়ামে দেখা গেল—সেটা হচ্ছে একজন ভারতীয় ধর্ম-প্রচারক যে খড়ম ছুটি ব্যবহার করেছিলেন দুটা অতি যত্নে রাখা হয়েছে।

অন্ধের শিক্ষা

শ্রীবাণী দাস

অন্ধেরা সভানেত্রী ও সমবেত বন্ধগণ :

যাঁরা চোখে দেখতে পান তাঁদের জন্তে নানান শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, আমি এবার অন্ধদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলব।

যে দেশে শতকরা চৌদ্দ জন মাত্র শিক্ষিত, সে দেশে অন্ধদের শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হবার অবসর কোথায়? দৃষ্টিমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা যত শীঘ্র ও সহজেই করতে পারি, দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ব্যবস্থা তত শীঘ্র করা সম্ভব নয়, কারণ শিক্ষার প্রণালী ও ধারা সম্পূর্ণ আলাদা।

যাঁরা দেখতে পান, তাঁরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন, নানাজাতীয় কাজ ও আকর্ষণের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু অন্ধরা—? তারা সঙ্গী ও কাজের অভাবে নিরাশায় জীবন কাটায়। সে জীবন কত দুর্ভিক্ষহীন দৃষ্টিমানের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। এই অন্ধরা যখন মুণ্ডে পড়ে জীবনের অস্তিত্ব স্বভোগ সম্বন্ধে তারা তখন নিলিপ্ত ও উদাসীন হয়ে যায়। তখন শিক্ষার সাহায্যে তাদের মধ্যে চেতনা জাগতে হয়। বোঝাতে হয় তাদের জীবনেরও মূল্য আছে। হেলেন কেলার বলেছেন—দৃষ্টিহীনতা তত বড় দুঃখ নয়—যত বড় দুঃখ কর্মহীনতা ও অলস জীবন যাপন। এই যে স্পষ্ট চেতনা, একে জাগিয়ে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। সাধারণ শিশুদের ছবি দেখিয়ে, ভুলিয়ে অ আ, ক খ, শেখান চলে, কিন্তু অন্ধ শিশুদের সে সব শিক্ষার ব্যবস্থা করা একেবারেই সম্ভব হয় না। অন্ধ বলে তার পিতামাতা হয়ত তাকে দস্তান হিসাবেই গণ্য করেন না।

অন্ধদের শিক্ষা বলতে আমরা প্রথমেই বুঝব তাদের স্বাবলম্বী করার শিক্ষা, স্বাবলম্বী হওয়া মানে শুধু যে এখানে উপার্জনক্ষম হওয়া বোঝাচ্ছে তা নয়—দৃষ্টিমানদের মত চলাফেরা করা, নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ নিজের হাতে করা এবং কুপমণ্ডুক না থেকে লেখাপড়া শিখে বাইরের

জগতের সংস্পর্শে আসা বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ দৃষ্টিমানদের মত যাতে তারা হতে পারে তারই চেষ্টা করা ও তারই শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই ধরনের শিক্ষা দিতে দরকার প্রচুর ঐশ্বর্য ও সময়। আমাদের অনেকের ধারণা যে অন্ধরা যেহেতু দৃষ্টিহীন তাই তাদের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয় নাকি খুবই প্রখর। কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য তা বলব না। কারণ অন্ধমাত্রেরই যে স্পর্শশক্তি ও শ্রবণ শক্তি সাধারণ দৃষ্টিমানের চেয়ে বেশী হতে হবে তা নয়। নিজ নিজ অভ্যাসের দ্বারা তারা এই দুই শক্তি বাড়াতে পারে। কারণ তাদের এই স্পর্শশক্তি বা অনুভব শক্তি ও শ্রবণ শক্তি তাদের দৃষ্টিশক্তির কাজ করে। আমাদের মধ্যে দৃষ্টিমানেরা কি সবাই সমান দেখেন? তেমনি প্রত্যেক অন্ধ ছাত্রছাত্রীর নিজের নিজের মতই তার স্পর্শশক্তি ও শ্রবণ শক্তি। তাদের হাতের স্পর্শ ও কানে শোনা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলে তারা এই বিষয়ে সাধারণ লোকদের চেয়ে বেশী অনুভবশক্তিবিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্ধরা রেলের সাহায্যে পড়ে ও লেখে। রেল হচ্ছে অন্ধদের লেখবার ও পড়বার প্রণালী। সাধারণতঃ মোটা কাগজের উণ্টোদিকে রেল পিন দিয়ে চাপ দেওয়া হয়, তাতে কাগজের সোজা দিকে ঐ পিনের চাপের দরুন, পিনের মাথা আন্দাজ বড় একটুখানি কাগজ উঁচু হয়ে উঠে; এই যে উঁচু করা একটুখানি বিন্দু, এটাই হ'ল অন্ধদের বর্ণমালায় একটা অক্ষর। ৬টা বিন্দুর সাহায্যে এবং তাদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর নির্ভর করে অন্ধদের বর্ণমালা গড়ে উঠেছে। আপনারা প্রত্যেকই বাড়ী গিয়ে পিন দিয়ে চাপ দেওয়া বিন্দুর উপর চোখ বুজে হাত বুলিয়ে দেখবেন, কতটুকু সাড় আপনারা ঐ আঙ্গুলের ডগাটুকুর উপর পান। প্রথমে কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। অন্ধদের হাতও আপনাদের পাঁচজনের মত। তাদের ডান ও বাঁ হাতের তর্জনী ও

মাঝের আঁঙ্গুল দিয়ে অভ্যাস করান হয় এই বিশু সারির উপর হাত বুলিয়ে পড়তে।

এদের শিক্ষা বয়স হিসাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমে তাদের দেওয়া হয় একটা ছোট কাঠের পাটা, তাতে ৬টা গর্ত আছে এবং ঐ গর্তের মধ্যে ৬টা মার্বেল। অঙ্করা এই কাঁচের মার্বেলের উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব বা স্পর্শশক্তি অভ্যাস করে। যখন তারা মার্বেল দিয়ে লেখা পড়তে বেশ পটু হয়ে যায়, তখন তাকে দেওয়া হয় কাবলী মটরের মাগে লোহার একটু চেকটা গুলি বা গোল বোতাম; এবং যখন এই দিয়ে পড়তে তারা বেশ পটু হয়, তখন তাদের আসল ব্রেদ পড়তে ও লিখতে দেওয়া হয়। এই অনুভব শক্তি প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সমান নয়। এই অনুভব বা স্পর্শশক্তির সাহায্যে এরা পরে উলের কাজ বেতের কাজ, কাঠের কাজ আর বই বাঁধানো ইত্যাদি নানা আয়কর কাজ শিখতে পারে।

আমাদের দেশে অন্ধদের সংখ্যা ১৯৩১ সালের লোক গণনা হিসাবে ভারতবর্ষে—৬০০,০০০ উপর, বাংলাদেশে ৮৮,০০০ উপর। ১৯৪১ সনে অন্ধদের গণনা করা হয়নি।

এইসব অন্ধদের মোট প্রতিষ্ঠান আছে মাত্র ৩৭টা, তারমধ্যে বাংলা দেশে মাত্র ৩টা।

বেহালায়—বেহালা অন্ধ বিদ্যালয়।

কলিকাতায়—অন্ধ আলোক নিকেতন।

কালিম্পঙে—১টা।

এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ২১২৫ জনের জ্ঞান ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র ১৮৭৫ জন এর সুযোগ নেয়। বাংলাদেশে মাত্র ২৫০ জনের জ্ঞান স্থান আছে, কিন্তু গড়ে মাত্র ১২৫ জন।

এর কারণ অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে পাই—

প্রথমতঃ—প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাত্ম।

দ্বিতীয়তঃ—অন্ধদের অভিভাবকদের ওদাসীত্ব।

তৃতীয়তঃ—জনসাধারণের সহানুভূতির অভাব।

১৯৩১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে অন্ধদের শর্তকরা ৯০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক।

১ম শ্রেণী:—৫ বছরের কম বয়সের বয়স তাদের জ্ঞান নার্সারী স্কুল। এদের অন্ত্যন্ত দেশে বলা হয় “Sunshine Homes” বা Sunshine Schools. এই সব অন্ধ-শিশুদের নার্সারী স্কুলে, অন্ধ-শিশুরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যাতে মানিয়ে চলতে পারে, তারই উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে অন্ধ শিশুদের নয় অত্যন্ত আদর বা অত্যন্ত অনাদর ও অবহেলা করা হয়। এর কোনটাই শিশুমন গঠনের উপযোগী নয়।

২য় শ্রেণী:—৫ থেকে—১৬ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের জ্ঞান স্কুল। বেহালার অন্ধ বিদ্যালয়ে এই ২য় শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত হয়। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দৃষ্টিমান ছেলেমেয়েদের সমান হওয়া দরকার। কারণ অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা যে অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে আলাদা এই ভাব ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গড়ে উঠতে পারে না। বিশেষ করে অন্ধ-ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা গড়ে ওঠে। এই ধরনের স্কুল আমরা অন্ত্যন্ত দেশে দেখতে পাই, বিশেষ করে আমেরিকায়। অন্ধ ছেলেমেয়েরা সেখানে সাধারণ ভাবেই অন্ধ ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ক্রাশ করে। ২১টা বিশেষ ক্রাশ শুধু অন্ধ ছেলেমেয়েদের জ্ঞান আলাদা করে নেওয়া হয়। এই ধরনের সহ-শিক্ষা আমেরিকায় বিশেষভাবে সমাদৃত। এই ধরনের সহ-শিক্ষার ক্রাশ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

সুযোগ ও সুবিধা পেলে অন্ধ ছাত্র ছাত্রীরাও বেশ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। দৃষ্টান্তরূপে ২৪ জনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন অধ্যাপক নগেন্দ্র সেন গুপ্ত, সুবোধচন্দ্র রায়, সাধনচন্দ্র গুপ্ত, প্রতিভা বাগ্‌চী (এই ছাত্রীটি এবছর বিএ, দেবেন), খোদেজা খাতুন, ও সাবিত্রী চৌধুরী।

৩য় শ্রেণী:—১৬ বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের জ্ঞান স্কুল। এই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আবার ২ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১ম ভাগ—যাঁরা বেশী বয়সে অন্ধ হয়েছেন।

২য় ভাগ—জন্ম থেকেই অন্ধ, কিন্তু আগে শিক্ষার কোন সুযোগ পাননি।

এই ১ম ভাগের ছাত্রছাত্রীদের অর্থাৎ যাঁরা বেশী বয়সে অন্ধ হয়েছেন, এবং অন্ধ হবার আগে মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাঁদের শুধু ব্রেল শিখিয়ে স্বাবলম্বী হ'বার শিক্ষা দেওয়া হয়।

২য় ভাগকে অর্থাৎ যাঁরা জন্ম হতেই অন্ধ এবং আগে কোন সুযোগ পাননি, তাঁদের মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়ে, হাতের কাজ অর্থাৎ স্বাবলম্বী হবার মত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে কম; বাংলাদেশের ও কলকাতার “অন্ধ আলোক নিকেতন বা Light house for the Blind”এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে দেখা গিয়েছে যে প্রথমভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের অহুভূতি (perception) দ্বিতীয় ভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বেশী।

আমাদের দেশে অন্ধদের সাধারণ লেখাপড়া শেখান ভটিঙ্গ ব্যাপার। তার সব চেয়ে বড় কারণ বইএর অভাব, এদেশে ব্রেলছাপাখানা নেই। সেইজন্য প্রত্যেকটা বই ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের ব্রেল করে নিতে হয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য। অহুদেশে অন্ধদের পড়ার বই ব্রেলেই ছাপান হয়, এবং সেইজন্য বইএর সমস্তা একেবারেই নেই। শুধু তাই নয়, ওদেশে ব্রেল-বই এত অধিক সংখ্যায় ছাপা হয় যে ২১টা ব্রেল লাইব্রেরীও গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে ব্রেল-লাইব্রেরী এখনও স্বপ্ন বলে মনে হয়। আমেরিকা, লণ্ডনে অনেক মাসিক পত্রিকা ব্রেলএ বার হচ্ছে। “Readers-Digest”এর ব্রেল সংখ্যা নিয়মিত ভাবে বার হচ্ছে, জাপানে একটা ব্রেল দৈনিক সংবাদ পত্রও আছে।

অন্ধ ছাত্রছাত্রীরা দৃষ্টিমানদের মত সহজভাবে বই পড়তে পারে না বলেই, তাদের অনেক কথা মনে রাখতে হয়, এই মনে রাখার অভ্যাস এঁদের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেয়।

অন্ধদের শুধু লেখাপড়া ও কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া ছাড়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে নিজ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা

দেওয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। হিসাব করে দেখা গেছে যে অন্ধদের আয়ু দৃষ্টিমান লোকদের চেয়ে কম। ভারতের বাইরে অগ্রাঙ্গ দেশে তফাৎ তত বেশী নয়, যত বেশী তফাৎ আমরা পাই ভারতবর্ষে। কারণ নির্ণয় কোরে দেখা গেছে, যে মনের নিকৃৎসাহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আয়ু কমিয়ে দেয়, এবং অন্ধরা সাধারণ লোকের মত সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে না বলে শারীরিক বৃদ্ধি (Physical development) তাদের হয় না, তারা ক্ষীণজীবি থেকে যায়। এইজন্য এদের এমন ব্যায়াম করতে দেওয়া উচিত যাতে শারীরিক পরিশ্রম অল্প অথচ মন প্রফুল্ল রাখে, হৃন্দ-নৃত্য বা ব্রতচারীর নৃত্যের সহজ হৃন্দর ভঙ্গিমা এদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অন্ধদের অন্যদের মত সহজভাবে পরিষ্কার থাকা সম্ভব হয় না, এইজন্য প্রতি প্রতিষ্ঠানের উচিত ছাত্রছাত্রীরা যাতে সব সময়ে পরিষ্কার থাকে সেই-দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং এদের মনে পরিচ্ছন্ন ভাব জাগিয়ে তোলা।

এদের অন্য পরিশ্রম করলে, এরা অনেক কিছুই শিখতে পারে। কারণ এরা দৃষ্টিহীন বলে বাইরের কোন চাক্ষুষ্য এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেইজন্য এবং এদের শিখবার আগ্রহের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে এরা অনেক বেশী মনোযোগী হয়।

অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থার পর শিক্ষান্তে কাজসংগ্রহ সেও একটা মস্ত সমস্তা। জনসাধারণ এখনও এদের ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহান ও উদাসীন।

সমস্তার কিছুটা সমাধান আমরা হয়ত ২১টা উপায়ে করতে পারি।

প্রথমতঃ—যেসব প্রতিষ্ঠান অন্ধদের শিক্ষা দেন, সেইসব প্রতিষ্ঠানএর উচিত নিজেদের কারখানা করে, পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের সেইখানের কাজে তর্গি করা।

দ্বিতীয়তঃ—এইসব প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য সরকারের নানারকম ভাবে সাহায্য বিশেষ করে আর্থিক সাহায্য করা উচিত। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে সরকার থেকে, এই সব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে সাহায্য আসে; এবং কিছু স্থায়ী চাকরীও অন্ধদের জন্যই বন্দোবস্ত করা আছে।

সরকারী পক্ষ থেকে অন্ধদের তৈরী জিনিষও নিয়মিত ভাবে কেনা হয়।

তৃতীয়তঃ—জনসাধারণের উচিত অর্থ দিয়েই হোক বা অন্য উপায়েই হোক এদের সাহায্য করা। শিক্ষিত অন্ধদের নিজের বাড়ীতে গানের শিক্ষক হিসাবেও ভর্তি করা যেতে পারে। অন্ধ-প্রতিষ্ঠানে যে সব জিনিষ তৈরী হয়, সেসব সব-পুঙ্খস্বেরই দরকার লাগে, সেইসব জিনিষ কিনেও প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখা যেতে পারে।

অন্ধদের শুধু যে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে কর্তব্য রয়েছে তা নয়, শিক্ষান্তে তারা এই শিক্ষার দ্বারা কোন সুবিধা বা উপকার পেল কিনা তারও খোঁজ রাখার দরকার আছে। কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ বলে গণ্য করা যায় না, যদি না সেই শিক্ষার সার্থকতা লাভ হয়।

আমাদের দেশ স্বাধীনতার পর অনেকটা সচেতন হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ব্রেল-ছাপা-যন্ত্র আনার ব্যবস্থা করছেন, এবং এই প্রেসের কাজ শেখবার জন্য, বিশেষজ্ঞ আমেরিকায় পাঠানুর ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের দেশের একমাত্র ব্রেল পত্রিকা “দীপাবলী” ইংরাজীতে বার হয়; কিন্তু তাও আমেরিকায় ছেপে আসে, এবং একটা হিন্দী সংস্করণও শীঘ্র বার হবে।

সম্প্রতি “Indian Uniform Braille” বা সর্ব-ভারতীয় সাধারণ ব্রেল লিপিমাল্য বার করার কথা হচ্ছে, তাতে যে খুব সুবিধা হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অন্যান্য দেশে এমন বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে স্বচ্ছাসেবক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অন্ধ শ্রোতাদের সুবিধামত বই পড়ে বা খবরের কাগজ পড়ে শুনিতে আসেন। এদেশে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান বেশী নেই, এবং যে কয়েকটা আছে তাদের স্বচ্ছাসেবক সংখ্যা এত অল্প যে তাদের কাছ থেকে বারোমাসী কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

আমরা কি এই কাজে সাধারণের মনোযোগ এবং এই দৃষ্টিহীনদের জন্য তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না?

মুক-বধির ও অন্ধ মহিষসী হেলেন কেলার বলেছেন—
“The public must learn that the blind is neither a genius nor a freak nor an idiot. He has a mind which can be educated, a hand which can be trained, ambition which it is right for him to strive to realise, and it is the duty of the public to help him to make the best of himself, so that he can win light through work.”*

* সরোজ নলিনী সমিতির রচিত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে “শিক্ষা স্বাস্থ্য” দিবসে পঠিত।

কুমারসম্ভবম্

শ্রীচিত্রিতা দেবী

প্রথম সর্গ

দেবতা আত্মা পর্বতরাজ উত্তরদিকে রাজে,
পূবেপশ্চিমে ডুবেছে প্রান্ত, নীল সমুদ্র মাঝে,
ধরণীর মানদণ্ডের মত, হিমালয় উন্নত,
কল্পনা করি বৎস তাহারে, পাহাড় রয়েছে যত । ১

মেককে দোপা করিয়া, পৃথুর আদেশে
রত্নভার,

বাহির করেছে বক্ষ হুহিয়া, গোন্ধুপা—
সে বসুধার ॥২

কোটি রত্নের প্রভাপ্রদীপ্ত স্নাতাগ্য হিমালয়,
ভূষারে আবৃত, তবুও তাহার যশের
নাহিক ক্ষয় ।

গুণরাশি মাঝে শুধু এক দোষ,
কোথায় লুকিয়ে থাকে,

শুভ্রচন্দ্র কিরণে যেমন বলক তার ঢাকৈ । ৩
মেঘে ছায়া পড়ে শিখরে ছড়ানো
ধাতুরশ্মির আভা,

অঙ্গুরী ভাবি অকাল মক্ষা
পরে বেশ মনলোভা । ৪

মেঘমালা দোলে মেঘলার মত,
বিশাল বক্ষ বেড়িয়া
ছায়া নীচে পড়ে গিরি সাগুদেশে
সেই ছায়া তার সেবিয়া ।

হৃদ্বিনে ভিজে বর্ষাকাতর
যতেক সিদ্ধমলে,

আশ্রয় নেয় গিরিনুপতির
তপ্ত শৃঙ্গতলে । ৫

বিদীর্ণ করি নখে মস্তক হাতী বধ
করে সিংহ ।

ছড়ায় মুক্তা নথবিগলিত,
ফেলে রেখে যায় চিহ্ন,

কিরাতেরা তাই সন্ধান পায়
পথ নাহি যায় দেখা

ভূষারপ্রপাতে কখন তাদের
মুছেচে রক্তরেখা । ৬

বিজ্ঞাধরের স্মরণীগণ, পত্র করিছে রচনা,
পাতার উপরে ধাতুরসে লিখে, প্রণয় বার্তা প্রেরণা । ৭
বংশরঞ্জে বাজে নিঃস্বণ অল্পকুল বায়ুভরে
কিন্নরদের সঙ্গীতে যেন তানপ্রদানের তরে । ৮

হিমালয়ভরা সোজা সোজা গাছ
হাতী ঘষে তার মাথে,

সেই ঘর্ষণে ঝরে ক্ষীরধারা
গন্ধে ভুবন মাতে । ৯

অতৈলপুর প্রদীপের মত
গুহাগৃহদ্বার পাশে,
জলে ওষধিরা, বনচর যেথা,
বনিতা সহিত নিবাসে । ১০

পয়োধরভারে মন্দগমনা,
ধীরে ধীরে চলে কিন্নরী,
ভূষারে অবশ অঙ্গুলি তবু
না পারে চলিতে সঙ্গরি ॥১১

রৌদ্রের ভরে, ভীত সে আধারে
রাখিছে গুহার দীন,
শরণে রক্ষা মহৎধর্ম,
হোক সে ক্ষুদ্র দীন । ১২

শুভ্রচন্দ্র কিরণের মত
চামর তাদের বিস্তারি,
চমরীরা ফেরে গিরিনুপতির
ছত্রচামরধারী ।

গুহামুখে যত লগ্ন অলদ
আঁখিরে করিছে শানা,

গিরিকামিনীর লজ্জা চকিতে
 যেন যবনিকা টানা । ১৪
 গঙ্গাপ্রবাহ হতে বারিকণা
 ভরি লয় বায়ু হেথা,
 চিরে চিরে দেয় ময়ূরপুচ্ছ
 কাঁপে দেবদারু পাতা । ১৫
 সপ্তষির ফুল তোলা হলে,
 যে কমল থাকে বাকী,
 উর্দ্ধকিরণে সূর্য্য তাদের
 ফোঁটায় নিম্নে থাকি । ১৬
 ধরারে ধরিতে পারে হিমালয়,
 সোমলতা রাখে তরি,
 তাই প্রজ্ঞাপতি দিল আগে ভাগে
 পর্ত্তরাজ করি । ১৭
 পিতৃগণের মানসী কন্যা
 মাননীয়া মেনকারে,
 বিবাহ করিল এই মেক্সসখা
 বংশ রক্ষিবারে । ১৮
 কতকাল পরে পতি অক্লান্ত
 গিরিসহধর্মিণী ।
 মেনকা গর্ভে ধরিল কুমার,
 মধুঘোবনশালিনী । ১৯
 নাম মৈনাক, সাগরের সখা,
 পতিনাগকন্যা,
 কুপিত ইন্দ্র হানেনি বজ্র
 পক্ষ কাটিতে তার । ২০
 তারপরে এল গর্ভে তাঁহার
 কন্যা সে মধুমতী
 ভব পরিণীতা দক্ষতৃষ্ণিতা
 পূর্ব্বজন্মে সতী ॥
 পিতামুখে শুনি পতি অপমান,
 যোগবলে যিনি ত্যজিলেন প্রাণ,
 সেই সতী পতিব্রতা
 শৈলবধূরে জন্মানসে
 আশ্রয় করি বিপুল হরষে
 পুন হল সমাগতা । ২১

নীতি সাথে যবে মেলে উৎসাহ
 রচে বৈভব অতি,
 সেই মতো গিরি মেনকাগর্ভে
 সৃজন করেন সতী । ২২
 জন্মদিবস, হল শুভকর
 স্বাবর জন্মের
 প্রসন্নদিক, পুষ্পবৃষ্টি
 ধূলি নাহি বাতাসের । ২৩
 নবমেঘোদয়ে ওঠে অঙ্গুর
 যেন রত্নের শিখা
 কন্যার প্রভা জননী ললাটে
 পরায় জ্যোতির টিকা । ২৪
 দিনে দিনে বালা বেড়ে ওঠে ধীরে
 গলিত জ্যোৎস্না রেখা
 শুক্লপক্ষে দিনে দিনে যথা
 বাড়ে সে চন্দ্রলেখা । ২৫
 বক্ষুস্বজন পার্বতী বলি
 ডাকে সে বাণ্যকারে,
 ভূপে নিষেধিল উ, মা, বলে মাতা,
 উমা, নাম দিল তারে । ২৬
 মধুকালে যথা ভ্রমরের দল
 ছাড়ি নব নব কুসুম সকল
 ফেরে চূত সন্ধানে,
 হিমালয় আঁখি তেমনি উন্মারে
 সকলেরে ফেলে দেখে বারে বারে,
 তবু না তৃপ্তি মানে ।
 প্রদীপ যেমন শিখাসহকারে,
 স্বর্গ যেমন সুরধুনী ধারে,
 মনীষী যেমন শুক্ল বচনে
 পবিত্র উন্নত ।
 তেমনি অজি কন্যাপ্রভার
 অতি সুন্দর পূত । ২৮
 শৈশবে উমা গঙ্গার তীরে
 খেলিতেন সখী মিলিয়া ।

কন্দুক আর পুতুলী লয়ে,
কতুবা বেদিকা রচিতা। ২৯
শরতে যেমন গঙ্গার কোলে,
হংসের মালা দোলে
আঁধারে যেমন মহৌষধির
দীপ্তি বলকি জলে।
গতজনমের অজিত জ্ঞান
তেমনি আছিল হৃদয়ে,
শিখানো মাজ লভিল উমারে
আবার নূতন হয়ে। ৩০
শৈশব তাঁর পার হয়ে গেলে
ধীরে এল যৌবন,
নবশায়ে তরু ভরে ওঠে তাই
বিনা কোন আয়োজন
মদ নয়, তবু নেশা যেন চোখে ধরে।
ফুলবান নয়, তবু ত্রিভুবন, কাম জেনে এই শরে। ৩১
নবযৌবনে বিকশিত তরু
যেন আঁকা তুলিকার,
সুখ্যাকিরণে কমল ধেমল
সৌরভে সুসমায়। ৩২
রক্তিম তাঁর পদনখপ্রভা
চলিতে বলকি ওঠে,
হুলকমলের চঞ্চল শোভা
ঘুরে ঘুরে যেন ফোটে। ৩৩
মধুর নুপুর শিজিতধ্বনি
শুনিবার আশে কিরে,
রাজহংসীরা চলনভঙ্গী
শিখালো নতাজিনীয়ে। ৩৪
জুগোল তাঁহার অনতিদীর্ঘ
জজ্বাহুটীরে স্থজি
অশেষ বিধির রূপভাণ্ডার
নিঃশেষ হল বুঝি।
বাকী দেহ তাঁর নিম্নিতে তাই
মধ লাষণ্য গড়ি,

নতুন প্রয়াসে করেন সৃষ্টি
নব মাধুর্যে ভরি। ৩৫
উক্লয়গলের শোভা অপরূপ
তুলনা কোথায় তার,
শীতল কদলী, আর হাতী শুঁড়
নয় কত সুকুমার। ৩৬
* * * *
শিরীষপুষ্প হতে সুকুমার
বাহু তার মনে লয়।
পরাজিত কাম তবু পিনাকীর
কণ্ঠের পার্শ্ব হয়। ৩৭
শুনবন্ধুর বন্ধিম গ্রীবে
মুক্তাকলাপ দুগিছে,
জুঘণ সে যেন দৌছে দোহাকার,
কিবা সুন্দর শোভিছে। ৩৮
নিশীথে চন্দ্র ছড়ায় মাধুরী
দিবসে পদ্ম ফোটে,
উষামুখে দেখি চন্দ্রকমল
মিলিয়া বিকশি ওঠে। ৩৯
প্রবালের মাঝে মুক্তা অথবা
কিশলয়পরে ফুল ওঠে যথা বিকাশি
তাম্রবর্ণ ওষ্ঠের পরে
তেমনি শুভ্র, উমার দিব্য হাসি। ৪০
কোকিলের ডাক কর্ণক তার
না হয় তর্খন তুলনা।
সুধানিশাবী কণ্ঠে কুমারী
করে যবে জল্পনা। ৪১
চকিত দৃষ্টি বায়ুহিলেলে,
যেন সে কমল নীল,
হরিণী কতকি শিখালো তাঁহাকে
অথবা নিজেই শিখিল। ৪২
আরত তাঁহার বন্ধিম ভুরু
অজ্ঞানে যেন আঁকা,
পরিহার করে মর্প মনন
নিজ ফুলময় বাঁকা। ৪৩
শিথিল করে না চামর
চুমুরী, লাজহীন পল্ল যত,

হেরি কেশপাশ গিরিকুমারীর

কাজল মেঘের মত ।৪৮

এই বিশ্বের সকল মাধুরী

একসাথে হেরিবারে,

বিধি শৃঙ্গে উমা সকল উপমা

নিবেশি একক আধারে ।৪৯

নারদ একদা কহিল বাগারে,

পিতার সমীপে হেরিয়া

পিনাকপাণির সহধর্মিণী

উমা হবে প্রাণ প্রিয়া ।৫০

নারদ বাক্যে ধোঁজেনা

অন্ত বর গিরি তাই তাঁর,

কে করিবে ভোগ পুত সে হব্য

অনল বিহনে আর ।৫১

ভবুও নিজের না চাহিতে শিবেরে

সাধিয়া কল্যাণদান,

করিতে গিরির নাহি উৎসাহ

পাছে হয় অপমান ।৫২

সতী যবে প্রাণ করেছিল ত্যাগ,

দক্ষ রোষের আঙনে,

সেই হতে শিব ছিল সন্ন্যাসী—

সকল গুণ বিহনে ।৫৩

কপ্তরীবাস সুরভিত কোন

দেবদাক্ষ ঘন দেশে

হিমালয় মাঝে সাধনের তরে

রহেন যোগীর বেশে ।৫৪

নন্দকপুপ ধারণ করিয়া

মুহু বকুলে সাজিয়া,

মনশিলারাগে রঞ্জিত ভহু

প্রমথেরা সেথা আসিয়া

শিলাজতুময় শিলাগন পরে,

রহিত লীলায় বসিয়া ।৫৫

না পারি সহিতে সিংহের নাদ

গর্জে বৃষভরাজ,

উড়ায় তুষার থুৱায়ে তার

ভীত গরুদের মার ।৫৬

যিনি ফল দেন সকল তপের

সেই বিধি কোন কামনার,

সাধন করেন স্থাপিয়া অগ্নি

সমুখে আপন দ্বিতীয় মূর্তিপ্রায় ।৫৭

দৈব অর্চিত মহাদেবে আজ

হিমালয় নিজে পূজিল,

শুক্রবাতরে আপন স্তূপারে

সখীজন সাথে সঁপিল ।৫৮

মূর্তিমতী বিয় শিব

করে না বারণ ভবু,

ধীর যিনি, তিনি কারণ সমুখে,

চপল হন না কভু ।৫৯

পুষ্প তুলিত পূজা লাগি উমা,

বেদী মার্জনা করিয়া

শশীশেখরের চন্দ্র কিরণে

শ্রম তার দূর করিয়া

জল কুশ আনি নানা মতে তাঁরে,

পূজিত নিত্য সেবিয়া ।৬০

ট্রামে বাসে

শ্রীশান্তা দেবী

ভারতবর্ষের অস্ত্রান্ত্র সহরের কথা ভাল করিয়া জানি না। কিন্তু কলিকাতা সহরে দেখিতে পাই ট্রামে বাসে যত পুরুষ যাতায়াত করে তাহার সমান না হইলেও এক তৃতীয়াংশ শ্রীলোক অফিসের ভীড়ের পরে ট্রামে বাসে চড়ে। অফিসের সময় স্ত্রী-যাত্রীর সংখ্যা খুব কম থাকে। কিন্তু একেবারে স্ত্রী আরোহী-হীন গাড়ী বোধ হয় বেশী চলে না। ইহা ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া দোকান বাজার সিনেমা স্থল কলেজ অফিস বন্ধু আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী ও মন্দির প্রভৃতিতে অনেক শ্রীলোকেই যায়। যাহারা পথে বা বাসে যাতায়াত করে তাহাদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধার সংখ্যা কম। তরুণ বয়স্ক মেয়েরাই পথে চলে বেশী, কারণ পড়াশুনা কাজকর্ম এবং ঘোরাক্ষেপা তাহারা বৈশী করিতে পারে এবং তাহাদেরই ইহা করিবার সময়। আট দশ বৎসর আগে গত যুদ্ধের পূর্বেও এত মেয়ে পথে কখনও দেখা যাইত না। তাহার কারণ দুইটি; প্রথম কারণ—তখন বোড়ার গাড়ী অত্যন্ত সস্তা ছিল, ট্যান্ডিও অপেক্ষাকৃত স্থলভ ছিল; কাজেই অল্প দূরের পথে বোড়ার গাড়ী ও বাসে ৪।৫ বা ছয়জন উঠিলে খরচের কিছুই তফাৎ হইত না; গাড়ীতে মেয়েরা একটু আবরু রক্ষা করিয়া যাতায়াত করিতে পারিত। পেট্রোল সহজলভ্য ছিল বলিয়া স্থল কলেজের বাসেও অল্প খরচে যাওয়া যাইত। দ্বিতীয় কারণ—আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে আগের তুলনায় মেয়েদের পথে বাহির হওয়া বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আগে যত মেয়েকে উপার্জন করিতে হইত, এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশী মেয়েকে উপার্জন করিতে হয়, সংসারে টাকার অভাব এবং বিবাহের সমস্তা কঠিনতর হওয়াতে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কারণে মেয়েরা এখন কাজ পায়ও অনেক বেশী। আগে মেয়েরা স্থলের কাজ ছাড়া অন্য কাজ সহজে লইত না, শুশ্রূষার কাজেও সব শ্রেণীর মেয়েদের পাওয়া যাইত না। এখন স্থলের কাজই বরং টাকার দিকে কম লোভনীয়। কাজেই নানা অফিসে মেয়ের ভীড় বাড়িয়াছে।

সব জিনিষেরই যেমন আজকাল একটা না একটা সমস্তা দেখা দেয় তেমন মেয়েদের এই পথে চলারও একটা সমস্তা দেখা যাইতেছে। সে সমস্যার দুটি দিক; এক মেয়েরা কি ভাবে চলিবে আর পুরুষেরা তাহাদের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিবে তাহা লইয়া।

আমাদের দেশের মেয়েরা নতুন পথে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কাজেই পথ-চলার লোক-নীতি তাহারা অনেক ঠিক বোঝে না। কেহ মনে করে পথ ঘাট বাস তাহার মা মাসির বাড়ীর মত, সেখানে যেমন খুসী করা চলে, কেহ বা মনে করে পথ সহস্র মুখ দিয়া তাহাকে গিলিতে আসিতেছে, এখানে ভয়ে কাঁটা হইয়া ছাড়া চলা যায় না। পথভয়ভীতা যাত্রিনীদের তুলনায় পথকে ঘর বাড়ী মনে করে যাহারা তাহাদের সংখ্যা অবশ্য বেশী। কারণ পথ-ভয়ভীতার পথে খুব কমই বাহির হয় এবং পারিলে সন্ধ্যা লইয়া আসে। একাকী যাহারা স্থল কলেজ অফিসে যায় তাহাদের কতকগুলি লোক-নীতি মানিয়া চলা ভাল। প্রথমে দেখিতে হইবে পোষাক আসাক কি রকম হইবে। পথের পোষাক খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু যথাসম্ভব সাদা সিধা হওয়া উচিত। পথচারীদের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয় এমন পোষাক পরিয়া পথে না বাহির হওয়াই ভাল। অনেক সময় দেখি উজ্জল রঙের কাপড় চোপড় ও অত্যাগ্র প্রসাধনে সজ্জিতা মেয়েরা বাসে চলিয়াছেন, গাড়ীশুদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি তাহাদের উপর গিয়া পড়ে। এইজন্য বড় বড় বোলানো গহনা, হাত কাটা জামা, খোলা চুল, চকচকে কাপড় চোপড়, গালে ঠোঁটে রং এই সমস্ত পথে বিশেষতঃ ট্রাম বাসে ব্যবহার করা ভাল নয়। পায়ের জুতাও বাঁধিয়া পরা ভাল। পোষাকের পর ব্যবহার। পথে পরিচিতির সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা না বলাই ভাল। হাসাহাসি, ঠাট্টা বিজ্ঞপ এবং বৈঠকী গল্প অশোভন। অপরিচিতের সঙ্গে ত নিতান্ত বিপদে না পড়িলে কথা বলাই উচিত নয়। মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক সময় দেখি দুই তিনখানা বেঞ্চে চার

পাঁচজন মাত্র মেয়ে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের উচিত সকলে এক জায়গায় বসিয়া বাকি জায়গা পুরুষদের ছাড়িয়া দেওয়া। অবশ্য একাজে বাস তদারককারীরও বিশেষ সাহায্য করা উচিত। পথে ও বাসে ট্রামে কাহাকেও দেখিয়া ভয় পাইয়াছি এটা বুঝিতে দেওয়া ভাল। ইটাচলা খুব দ্রুত ফিপ্র হওয়া ভাল। একবার এ দোকানের সামনে দাঁড়াইলাম একবার ও দোকানের সজ্জা দেখিলাম, এগুলি যথা সম্ভব না করাই ভাল। রাজে নিঃসঙ্গ আশা যাওয়া খুবই ভাল, তবে মাল্লমকে বাধ্য হইয়া তাহাও করিতে হয়। যতটা সাধ্য এড়াইতে পারিলে অনেক বিপদ আপদের সম্ভাবনা কমে।

মেয়েদের পথচলা যাহাতে সহজ ও নিরাপদ হয় তাহার জন্ত মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষদের দায়িত্বই বেশী। ট্রাম বাসে মেয়েদের সঙ্গে অভদ্রতা যে একদল লোক করে তাহার বিষয় কিছু দিন পূর্বে খবরের কাগজে অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু খবরের কাগজে প্রেরিত পত্রের দ্বারা অভদ্রকে ভয় করিয়া তোলা এত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। পথে যাহারা চলাফেরা করে তেমন মেয়েরা ঠাট্টা তামাসা

ভুক্তি এবং অগ্রাহ্য করিতে ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অভদ্র কথা, পিছু লওয়া, অভদ্র ব্যবহার এগুলি মাল্লমের গা সওয়া হয় না এবং হওয়া উচিতও নয়। এ কারণে ভদ্র মেয়েরা সর্বদাই মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া পথ চলে। এসব বিষয়ে ভদ্র ছেলেদের উচিত অভদ্রদের উপর কড়া নজর রাখা এবং প্রয়োজন হইলে শাসন করা। ট্রাম বাসে যাত্রীদের ব্যবহার তদারক্য করিবার লোকও একজন থাকা ভাল এবং পথে পুলিশের আরও সজাগ এবং কড়া হওয়া উচিত। তদুপরি ট্রাম বাসের গাড়ীর সংখ্যা না বাড়িলে এই সমস্যা সমাধান সহজ হইবে না।

জাপানে থাকিতে ১২।১৩ বৎসর আগে দেখিয়াছিলাম সেখানে পথে মেয়েদের কোন ভয় নাই। সেখানে নাকি এই সব অভদ্রতার শাস্তি এত কঠিন এবং পুলিশ এত ভাল যে সকলে নির্ভয়ে ছোট ছোট মেয়েদেরও বহু দূরের পথে ছাড়িয়া দেয়। যাহারা কোন ভাষায় জাপানীকে নিজের কথা বুঝাইতে পারিবে না এখন বিদেশী মেয়েকেও নির্ভয়ে পথে ঘুরিতে দেখিয়াছি এবং নিজেও রাজে একা ঘুরিয়াছি।

রজত সিংহাসন

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

রজত সিংহাসন

তোমাদের লাগি পাতিয়াছি মোরা

এসো বসো দুইজন।

ইন্ডের পাশে ইন্দ্রাণী বসি

যুগল তারকা ভূমে পড়ি থসি

রজত বরণে, রজত কিরণে

করে যুগ্ম আলাপন,

সার্থক হলো জীবনের ব্রত

জন্মের শুভক্ষণ,

আজি সারা দেশে নগরে নগরে

শিল্প সাজানো রহে থরে থরে

কল্যাণী তুমি কল্যাণ করে

করেছিলে আয়োজন,

শিল্পের পথে যুগের সাধনা

ধরে ছিলে দৃঢ় পন।

ভালবাসা দিয়ে সবারে বাঁধিলে

কত দুঃখোগ তরাইয়া দিলে

মিলন বাসরে আজি সাজাইলে

তব প্রিয় নিকেতন,

সমোজ নগিনী, গুরুসদয়ের

অক্ষয় বন্ধন।

পান্নাকুমারী

তৃতীয় দৃশ্য

[ছোটদের জন্ত নাটক। সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সরোজ নলিনী ট্রেনিং স্কুলের অন্তর্গত শ্রাইমারী স্কুলের ছাত্রীদের জন্ত লিখিত ও তাহাদের দ্বারা এই জামুয়ারী অভিনীত হয়।]

প্রথম দৃশ্য

রতনপুরের রাজা ও তাঁর রাণী চন্দ্রাবতী তাঁদের

ঘরে আছেন।

রাজা—দেখ রাণী, তোমার উপরি উপরি সাত মেয়ে জন্মেছে। এ আর আমি কিছুতেই সহ্য করব না। এবার যদি একটি পুত্রসন্তান না জন্মায় তবে আমি তোমার কোলের মেয়ে পান্নাকুমারীকে জন্মদের হাতে তুলে দেব।

রাণী—(চমকে উঠে) কি বলছ রাজা! ছয় ছয়টি মেয়ে হারিয়ে শেষে আমার ঐ একটি মেয়েতে ঠেকেছে। তুমি তাকে বধ করবে?

রাজা—(বিরক্ত হয়ে) আমার এত বড় রাজ্য তবে ভোগ করবে কে? পুত্র আমার চাইই।

রাণী—আমার পান্নাকুমারীই এ রাজ্যের রাণী হয়ে তোমার প্রজাদের প্রতিপালন করবে।

রাজা—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। পুত্র যদি না দিতে পার তো তোমার কন্যা পান্নাকুমারীকে বিসর্জন দিতে হ'বে।

রাণী—(ক্রন্দনরতা) কি করে এমন নিষ্ঠুর আদেশ দেবে তুমি? পান্না যে তোমার নিজের মেয়ে?

রাজা—তবে সব কথা তোমার খুলে বলি রাণী। রাজ জ্যোতিষী গণনা করে বলেছেন রাণীর কোল খালি না হলে পুত্র আসবে না। তাই আমি এবার শেষ পরীক্ষা করব। এবার যদি পুত্র না জন্মায় তবে পান্নাকুমারীর আর বেঁচে থাকা চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও নিরাসনে যেতে হবে। (রাজার প্রস্থান)

দাসীর প্রবেশ :—

দাসী—রাণীমা, তোমার স্নানের আয়োজন করেছি।

রাণী—সে পরে হ'বে এখন। তুমি আগে রাজকুমারীকে আমার কাছে নিয়ে এস।

(পান্নাকুমারীর প্রবেশ)

রাণী—(ছলছল চোখে, মেয়েকে আদর করে কাছে বসালেন)

পান্না—আমায় কেন ডেকেছ মা?

রাণী—একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে, পান্না।

পান্না—কি দরকারী কথা? বলনা মা!

রাণী—দেখ বাছা, রাজার হুকুম হয়েছে যে এবার যদি তোমার একটি ভাই না হয় তবে তোমাকে তিনি জন্মদের হাতে দেবেন।

পান্না—কি যে বল মা? বাবা কখনও তা করতে পারবেন না।

রাণী—না মা, রাজার কথার কোন নড়চড় হ'বে না, সে আমি জানি। এখন আমার অল্প উপায় করতে হ'বে।

পান্না—কি উপায় করবে মা?

রাণী—আমি তোমাকে বনে পাঠিয়ে দেব। তুমি সেখানে লুকিয়ে থাকবে। রাজ একবার করে পাহাড়ে চড়ে দেখবে। যদি দেখে রাজপ্রাসাদে সাদা পতাকা উড়েছে তবে জানবে তোমার ভাই হয়েছে। আর যদি দেখে প্রাসাদে লাল পতাকা উড়েছে তবে যেন তোমার বিপদ। তুমি তখন আরও গভীর বনে চলে যাবে। আমার মানুষ করা দাইমা তোমার সঙ্গে যাবে।

পান্না—তুমি যা ব্যবস্থা করবে তাই হ'বে মা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বনের ভিতর একটি ছোট কুটারের সামনে বসে দাইমা চরকার স্তূত কাটছে, এমন সময় পান্নার প্রবেশ)

পান্না—দাইমা, আজ পাহাড়ে চড়ে দেখলাম রাজপ্রাসাদে সাদা পতাকা উড়েছে। দেখে আমার কি আনন্দ হ'ল কি বলব! আমার তা' হ'লে এবার একটি ভাই হয়েছে। আর ভয় নেই। আমি এবার রাজ্যে ফিরে বেতে পারব।

দাইমা—না বাছা, তোমার আর রাজ্যে ফেরা চলবে না। রাজজ্যোতিষী গণনা করে বলেছেন রাজকন্ডার দৃষ্টি আছে ভাইয়ের উপর। রাণী তাই রাজাকে বলেছেন তোমার মৃত্যু হয়েছে। এখন তুমি রাজ্যে ফিরে গেলে রাজা তোমাকে আস্ত রাখবেন না।

পান্না—তবে কি আমি চিরকাল এই বনেই বাস করব?

দাইমা—কি করব বল? উপায় কি আছে? তবে তোমার বরাতে যদি থাকে তবে কোন রাজপুত্র তোমায় বিয়ে করে তাঁর নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেন।

পান্না—সে আর হয়েছে! এই বনের মধ্যে আবার রাজপুত্র আসবে কোথা থেকে? ও আশা নেই। তার চেয়ে তুমি আমার বিএর কাজ কর্ম শিখিয়ে দাও আমি না হয় ছদ্মবেশে দূর কোন গ্রামে গিয়ে দাসী হয়ে থাকব।

দাইমা—বালাই, বাট, তুমি কোন হুংখে দাসী হ'তে যাবে? আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমায় গায়ে জাঁচটি লাগতে দেব না। তবে আমি যে আর কতদিন আছি তা' বলতে পারি না।

পান্না—তুমি মরলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'বে। ভুল হয় না যেন।

দাইমা—হায় কপাল! এমন চাঁদের মত মেয়েকে আমি কিনা নিজের হাতে যমের মুখে তুলে দেব? সেটি হচ্ছে না। (একটু থেমে) আমার কথা শুনে রাখ বাছা, তোমার ভাল সময় আসবে, আমি তোমার কুষ্টি গণনা করিয়েছি। তোমার কোন ভয় নেই।

পান্না—ভয় আবার নেই! এই বনের ভিতর একলা আমি কখনই থাকতে পারব না! তুমি যদি আমায় ছেড়ে যাও দাইমা, আমি তা হ'লে প্রাসাদে ফিরে যাব।

দাইমা—বাট, বাট, রাজপ্রাসাদে তোমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি অনেক মানসিক দিয়েছি। তোমার কোন ভয় নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজপ্রাসাদ; কুমার ইন্দ্রজিৎ ও তাঁর মাতা রাণী

চন্দ্রাবতী কথাবার্তা বলছেন।)

ইন্দ্রজিৎ—মা, সেদিন তোমার ঘরে একটা বাঘের ভিতর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর জামা দেখলাম। সেগুলি

তোমার নয়। জামাগুলি খুব ছোট। ও জামাগুলি কার আমার বলতেই হবে।

রাণী—থাক বাবা, ও সব কথা শুনে তোমার কাজ নেই।

ইন্দ্রজিৎ—না মা, সে হ'বে না। আমাকে বলতেই হ'বে ও জামাগুলি কার।

রাণী—না রাজকুমার, ও সব কথা তুমি শুনে চেওনা। ও কথায় তোমার কাজ নেই। তুমি বরং অস্ত্র শিক্ষা করগে যাও।

ইন্দ্রজিৎ—ও সব পরে হ'বে। আগে তুমি আমার বল ও জামাগুলি কার। না বললে আমি এক গ্রাসও আহাৰ মুখে দেব না।

রাণী—ও সব অমঙ্গলের কথা বোল না বাবা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। এবড় রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধীশ্বর। তুমি কোন হুংখে না খেয়ে থাকবে?

ইন্দ্রজিৎ—সে তুমি যাই বল মা। জামাগুলি কার না বললে আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব।

রাণী—(বিচলিত হয়ে) অমন কথা মুখে এন না কুমার। কত হুংখে তোমায় পেরেছি সে তো তুমি জান না।

ইন্দ্রজিৎ—সব তো আমি জানতে চাই। এখন আমি বড় হয়েছি। আমার কাছে কোন কথা লুকনো তোমার উচিত হ'বে না।

রাণী (কান্না দৃষ্ট করে) ও জামা পান্নাকুমারীর।

ইন্দ্রজিৎ—পান্নাকুমারী কে?

রাণী—রাজকন্ডা!

ইন্দ্রজিৎ—কোন দেশের রাজকন্ডা?

রাণী—এই দেশের।

ইন্দ্রজিৎ—তা' হ'লে?—

রাণী—হ্যাঁ, পান্নাকুমারী তোমার দিদি।

ইন্দ্রজিৎ—আমায় দিদি এখন কোথায়?

রাণী—বনবাসে!

ইন্দ্রজিৎ—কেন?

রাণী—তোমার উপর পান্নাকুমারীর দৃষ্টি আছে বলে রাজা তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। আমি তাকে লুকিয়ে বনে পাঠিয়ে দিয়ে তার মৃত্যুরটনা করেছিলাম।

ইন্দ্রজিৎ—দ্বিদি কেমন আছেন মা ?

রাণী—(চোখ মুছতে মুছতে) কেমন করে জানব বাবা ? তার সঙ্গে তো আমার আর দেখা সাফাৎ নাই ।

ইন্দ্রজিৎ—আমি আমার দ্বিদিকে খুঁজে বের করব ।

রাণী—না বাবা । রাজা জানতে পারলে তোমার দ্বিদিকে তো মেরে ফেলবেনই আমাকেও নির্দাসনে পাঠাবেন ।

ইন্দ্রজিৎ—তুমি ভয় পেওনা মা । আমি বাবাকে বলে শিকারে যাব । তারপর আমি আমার দ্বিদিকে খুঁজে বের করব ।

রাণী—কাল থেকে আমার ডান চোখটা কেবলই নাচছে । কি জানি বাছা কি অশুভল তুমি টেনে আনবে ।

ইন্দ্রজিৎ—কোন ভয় নেই মা । আমি ঠিক আমার দ্বিদিকে খুঁজে বের করব ।

যবনিকা পতন

চতুর্থ দৃশ্য

(বনে, কুটারের বাইরে পান্নাকুমারী বসে কাঁদছেন, এমন সময় রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ সেখানে এসে পড়লেন । তাঁকে কাঁদতে দেখে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন)

ইন্দ্রজিৎ—কে তুমি ? তোমার কি হয়েছে ?

পান্না—(চোখ মুছতে মুছতে) আমার দ্বিদিমা মারা গিয়েছেন, এখন এই বনে আমি একলা কি করে থাকব তাই ভাবছি ।

ইন্দ্রজিৎ—কেন তুমি বনে থাকবে ? তুমি আমার সঙ্গে চল । আমি তোমায় আমার মা রাণী চন্দ্রাবতীর কাছে নিয়ে যাব । তুমি সেখানে স্থগেই থাকবে ।

পান্না—(চমকে উঠে) কি ? কোন্ রাণীর নাম করলে তুমি ?

ইন্দ্রজিৎ—রাণী চন্দ্রাবতীর নাম করলাম ।

পান্না—রাণী চন্দ্রাবতী তোমার কে হ'ন ?

ইন্দ্রজিৎ—তিনি আমার মা হন ।

পান্না—(নিঃশ্বাস ফেলে) সেই ভয় হচ্ছিল ।

ইন্দ্রজিৎ—(আশ্চর্য হয়ে) ভয় হচ্ছিল ? এ কথা বললে কেন ?

পান্না—(কাপড় মুখের দিকে)

ইন্দ্রজিৎ—উত্তর দাও ।

পান্না—(ধীরে ধীরে মুখ তুলে) রাণী চন্দ্রাবতী আমারও ত মা হন ।

ইন্দ্রজিৎ—কী বললে ? রাণী চন্দ্রাবতী তোমার ও মা ? তা হলে তুমি কি আমার হারাণ বোন পান্নাকুমারী ?

পান্না—হ্যাঁ, আমি তোমারই আভাঙ্গা ভগ্নী পান্নাকুমারী ।

ইন্দ্রজিৎ—ও কথা বলছ কেন দ্বিদি ! আমরা এখন পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছি । আর আমাদের কোন দুঃখ নেই ।

পান্না—তুমি কি ভাই সব কথা জান ?

ইন্দ্রজিৎ—হ্যাঁ, জানি ! তুমি রাজ্যে ফিরে গেলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে—

পান্না—(বাধা দিয়ে) শুধু ভাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাকেও নির্দাসনে যেতে হবে ।

ইন্দ্রজিৎ—কিন্তু আমরা যদি রাজ্যে ফিরে না যাই ?

এই কুটারে যদি আমরা দুই ভাই বোনে বাস করি ।

পান্না—তা' কি কখনও হয় ভাই ? তুমি দেশের ভবিষ্যৎ রাজা । মার একটি মাত্র সন্তান ।

ইন্দ্রজিৎ—একটি সন্তান বলছ কেন ? তুমি ও তো মার সন্তান ।

পান্না—(নিঃশ্বাস ফেলে) আমি না থাকারই সাক্ষ্য ।

কিন্তু ও কথা যাক । তোমাকে রাজ্যে ফিরে যেতেই হবে ।

ইন্দ্রজিৎ—কিছুতেই আমি রাজ্যে ফিরে যাব না যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও ।

পান্না—সব জেনে শুনে কেন আমার ফিরে যেতে অগ্ররোধ করছ ।

ইন্দ্রজিৎ—বেশ, তা হলে তুমিও আমার ফিরে যেতে বোল না । আমরা দুজনে এই ছোট্ট কুটারে থাকব । আমি বন থেকে আহার সংগ্রহ করে আনব । তুমি রাখবে, বাড়বে, ঘর সংসার দেখবে ।

পান্না—(নিঃশ্বাস ফেলে) জানি না এ কাজটা ভাল হ'বে কিনা । তবে এখন তুমি জেদ করছ তখন কিছুদিন না হয় থাক এখানে ।

যবনিকা পতন

পঞ্চম দৃশ্য

(ইন্দ্রজিৎ—আহার সংগ্রহ করতে গিয়েছে। পাম্মাকুমারী গুণ গুণ করে গান গেয়ে গাছপালার পরিচর্যা করতে করতে দেখতে পেলে একটি গাঁদা গাছে গোলাপ ফুল ফুটে আছে। ফুলটি দেখে তার ভারি আনন্দ হল। সে নিজের মনেই বলল।)

পাম্মা—বাঃ, কি সুন্দর গোলাপটি, অথচ গাছটি হল গাঁদা ফুলের। এ ফুলের নিশ্চয় কোন বিশেষ গুণ আছে। এটি আমি রাজ কুমারকে দেব। (পাম্মা ফুলটি তুলে, অমনি একটি জোরে আওয়াজ হল। পাম্মা চমকে উঠে বলল)

পাম্মা—ওঃ, ওটা কিসের শব্দ! (চারিদিকে চেয়ে) অনেক রাত হয়ে গেল। রাজকুমার এখনও যে ফিরল না? কোন অমঙ্গল ঘটে নি তো?

(একটি বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা—তোমার ভাই আর ফিরে আসবে না। ঐ ফুলটিতে তার প্রাণ ছিল। তুমি ঐ ফুল কেন ছিঁড়তে গেলে?

পাম্মা—(বৃদ্ধার পা জড়িয়ে ধরে) দয়া করে বলে যাও কি করে আমি আমার ভাইকে বাঁচাতে পারব?

বৃদ্ধা—এক বছর যদি তুমি মৌন হয়ে থাকতে পার তો আবার তোমার ভাই বেঁচে উঠবে।

(চিন্তিতভাবে পাম্মা কুটিরের সামনে বসে রইল। এমন সময় আর এক রাজ্যের রাজা চন্দ্রনারায়ণ সেখানে এসে পরমাসুন্দরী পাম্মাকুমারীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন)

চন্দ্রনারায়ণ—তুমি কে? (পাম্মা কোন উত্তর দিল না।) তুমি এই কুটির থেকে থাক? (পাম্মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল)

চন্দ্রনারায়ণ—তোমার মা বাবা কে? (পাম্মা নিরুত্তর) আমি নয়নগড়ের রাজা চন্দ্রনারায়ণ। তুমি কি আমার রাণী হবে? তা হলে আমি তোমাকে আমার রাজ্যে নিয়ে যাব। (পাম্মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।)

বঙ্গলক্ষ্মী পঞ্চম

ষষ্ঠ দৃশ্য

(চন্দ্রনারায়ণের সৎমার ঘর। রাজার ধাত্রী বিন্দু ও দুইজন পরিচারিকা ও রাজার সৎমা ঘরে আছেন।)

সৎমা অর্ধশায়িত ভাবে পালকে শুয়ে।

সৎমা—বাতের জ্বালায় অস্থির হ'লাম। (একজন পরিচারিকার দিকে চেয়ে)—দে তো বাছা, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে। (বিন্দুর দিকে চেয়ে)—বাছা বিন্দু, সেই কখন মুখে চারটি ভাত গুঁজেছি, এবার একটু জলখাবার এনে দাও।

বিন্দু—না মা ঠাকুরণ, যখন তখন খেয়ে খেয়েই তোমার বাতে ধরেছে।

সৎমা—দেখ বিন্দু, তুই কি বাছা কোবরেজ হয়েছিস?

বিন্দু—না মা আমি কেন কোবরেজ হ'তে যাব? কাল বন্দি এসে বলে গেছেন।

সৎমা—(রাগ করে) বন্দির কি এ নিজের কথা মনে করেছিস তুই? তা' নয়। ও সব শেখান কথা।

বিন্দু—বন্দিরকে আবার কে শেখাবে মা? সে নিজেই বলেছে।

সৎমা—না, গো, না, এ সব ভোম্বাদের রাজা চন্দ্রনারায়ণের কারসাজি। হাজার হোক সতীনের ছেলে তো? সৎমাকে শুকিয়ে মারতে চায়।

বিন্দু—(জিত কেটে) ছিঁমা, রাজার নামে কি এমন বলে? চন্দ্রনারায়ণ আমাদের দেবতার মত মানুষ।

সৎমা—থাক বাছা, তোমার আর আদিখোতা করতে হ'বে না। এখন যাও দেখি, মতিরাণী আর তার বোনকে ডেকে আন তো? একটু নাচ দেখাও।

(বিন্দুর প্রস্থান ও মতিরাণী ও তাহার ভগ্নীসহ পুনঃ প্রবেশ)

সৎমা—(মতিরাণীর দিকে চেয়ে) দেখ বাছা মতি, তোমার বিন্দু মাসির জ্বালায় তো আমার দাঁতে কিছু কাটবার জো নেই।

এখন তোমরা বাছা আমায় একটু নাচ দেখাও তো দেখি। তবু ক্ষিদের জ্বালাটা একটু কমবে।

(মতিরাণী ও তাহার ভগ্নীর প্রস্থান)

বিন্দু (নৃত্য শেষ হ'তে, বাইরের দিকে চেয়ে) ঐ যে রাজা চন্দ্রনারায়ণ আসছেন। সঙ্গে আবার কা'কে এনেছেন। ঐ পরমাসুন্দরী মেয়েটিকে তো এর আগে দেখি নি।

সৎমা—পরমা সুন্দরী মেয়ে এল আবার কোথা থেকে?

(পান্নাকে নিয়ে রাজার প্রবেশ)

রাজা—(সৎমার দিকে চেয়ে) নতুন মা, (পান্নাকে দেখিয়ে) ইনি হলেন আমার রাণী, একে তোমার কাছে দিয়ে গেলুম। আমার বাইরে একটু কাজ আছে।

সৎমা—(পান্নার দিকে চেয়ে) ইয়া গা, বৌমা, তোমার নামটা কি বাছা? (পান্নাকে নীরব দেখে দাসীদের দিকে চেয়ে) ওমা, বৌ কথা কয় না কেন গা?

১মা দাসী—দেখাক নয় তো?

২মা দাসী—না গো না, আমার মনে হয় বৌ কালা। একটু চোঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করুন তো, মা ঠাকরণ।

সৎমা—(চোঁচিয়ে), বলি ইয়াগা, বড় লোকের বি, কথা কানে পৌছল? (পান্না নীরব)

১মা দাসী—বৌ কি শেরে হাবা বোবা হল?

২মা—তা নয়, আমার মনে হয় বৌ কোন ছোট ঘরের মেয়ে, কথা বল্লই তো ধরা পড়ে যাবে? তাই বোবা সেজে আছে।

সৎমা—মন্দ কথাটা বলিস নি বাছা। (পান্নার দিকে চেয়ে) তুমি রাখতে পার? (পান্না মাথা নেড়ে সম্মতি দিল) বাঁট দিতে পার?

(পান্না মাথা নেড়ে পারে বল); বাসন মাজতে পার? (পান্না মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।)

সৎমা—(দাসীর দিকে চেয়ে) দেখলি বাছা? তোর কথাই ঠিক। বৌ হ'ল বাঁদীর মেয়ে। রাজার ঘরের মেয়ে হ'লে কি রাখতে জানত? না ঘর বাঁট দিতে পারত?

না বাসন মাজতে পারত? দাসীর মেয়ে, তাই দাসীর কাজ গুলই জানে। (বিন্দুর দিকে চেয়ে) দেখলি বিন্দু? তোর দেবতার মত চন্দ্রনারায়ণের কীর্তিটা দেখলি? কোথা থেকে এক বাঁদীর মেয়েকে এনে চাপাল আমার ঘাড়ে! একে নিয়ে ঘর করলে কি আমার জাত ধর্ম কিছু থাকবে? সতীনের ছেলের কাণ্ডখানা দেখ, একবার।

সপ্তম দৃশ্য

রাজা চন্দ্রনারায়ণ ও পান্না ঘরে বসে আছেন।

রাজা—(পান্নার উদ্দেশ্যে) প্রায় ১১ মাস হ'ল তুমি আমার রাণী হয়েছ, অথচ আজ পর্যন্ত তোমার নামও জানলাম না। বলবে না আমার?

(পান্না রাজার আঙুলের সবুজ পাথরের আংটির দিকে হাত দিয়ে দেখাল)

রাজা—এ পাথরটা তো পান্না! তোমার নাম কি পান্না?

(পান্না মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল)

রাজা—তুমি কথা বলছ না কেন পান্না? আমার বিখ্যাস হয় না যে তুমি বোবা। (পান্না চুপ করে রইল)

রাজা—কেন তুমি তোমার নিজের পরিচয় দিচ্ছ না? কত লোকে কত কথাই না বলছে। আমি কাউকে কিছু বলতে পারছি না।

(বাড়ের মত সৎমার প্রবেশ)

সৎমা—(মুখ বাঁমটা দিয়ে চন্দ্রনারায়ণের প্রতি)—এ কি করলে বাছা চন্দর, এক বাঁদীর মেয়েকে শেষে রাণী কোরে নিয়ে এলেন?

রাজা—(গম্ভীর ভাবে) পান্না বাঁদীর মেয়ে নয়।

সৎমা—ওঃ বাবা, বৌয়ের নাম “পান্না” রাখা হয়েছে?

রাজা—নাম আমি রাখিনি। “পান্না” নাম ওর মা বাপই দিয়েছেন।

সৎমা—(সঙ্গে দুই দাসীর দিকে চেয়ে) দেখলি বৌয়ের কাণ্ডখানা? আমার কাছে বোবা সেজে থাকা হয় তারপর সব কথা রাজার কানে তুলে দেয়। তাই বলি বাছা চন্দর আমার কেন অমন মার মূর্তি ধরছে। এ সব ঐ বৌয়েরই কাজ! (স্বর নরম করে) একে তো বাতে ভুগে মরছি, তার উপর পেটে আহার নেই, এখন ঐ বৌয়ের সঙ্গে লড়াই করা কি আমার কাম? চল বাছা, আমরা যাই।

(দাসীসহ প্রস্থান)

রাজা—(পান্নার উদ্দেশ্যে) দেখলে তো পান্না? লোকে তোমায় কত ভুল বুঝছে, তুমি কেন চুপ করে থাক? কথা বলবে না কোন দিন?

(পান্না মাথা নেড়ে বোঝাল সে কথা বলবে)

রাজা—(সাগ্রহে) কবে কথা বলবে পান্না ?

(পান্না একটা আঙ্গুল তুলে দেখাল)

রাজা—একদিন পরে কথা বলবে ?

(পান্না মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল)

রাজা—তবে কি এক মাস পরে বলবে ?

(পান্না মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল)

রাজা—থাক, এতদিন ধৈর্য ধরে রইলাম আর একটা মাস না হয় চুপ করে থাকব। একমাস পরে কিন্তু তোমার কথা বলা চাই।

(পান্না মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল)

অষ্টম দৃশ্য

(সৎমার ঘর। পরিচারিকা সহ তিনি

পালংএ বসে আছেন।)

সৎমা—(দাসীদের উদ্দেশ্যে) দেখুলি বাছা, বোবা সেজে বৌ আমার রাজার কাছে কেমন জব্ব করে দিল ?

১মা—তা আর দেখলুম না ? রাণী আমাদের গুণ করতে জানেন !

২মা—শুধু কি তাই ? আমি যা শুনে এলুম গণক ঠাকুরের মুখে তাতে তো আমার হাত পা পেটে সোঁদিয়ে গেছে।

সৎমা—(বিচলিত হয়ে) ওলো, তুই কি শুনে এলি গণক ঠাকুরের মুখে, খুলেই বলনা বাছা ? তোর কথা শুনে যে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

২মা—তা মা, গায়ে তো কাঁটা দেবারই কথা ! আমার কিন্তু মা কাল থেকে আহাির নিদ্রা ঘুচে গেছে ?

সৎমা—(ব্যস্ত হয়ে) আরে বাছা বলই না কি বলল গণক ঠাকুর ! আমার বুকখানা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে।

২মা—আর কি বলব, মা ঠাকরণ, রাণী তো আমাদের মাল্লব নন ? উনি ডাইনি !

সৎমা—(চিংকার করে) ও মা গো, কোথায় যাব গো, সতীনের বেটার মাথায় গেঁষে এই ছিল গো ! আমার কি শেষে ডাইনির হাতে মৃত্যু হবে ? ওরা যে বাছা রক্ত শুষে খায়। তাই বলি রোজ কেন এমন কাহিল বোধ করি ?

(বিন্দুকে নিয়ে পান্নার প্রবেশ)

সৎমা—(পান্নাকে দেখা মাত্র) অমন ডাব ডাব করে আমার দিকে চেয়ে দেখছ কি গা ? (দাসীর দিকে চেয়ে) নিয়ে আয় তো বাছা আঁশ বোঁটিখানা। ডাইনির নাকটা দিই কেটে।

(পান্না বিড় বিড় করে আঙ্গুল গুণতে লাগল)

সৎমা—(জলে উঠে) ঐ দেখ তোরা, আমার শাপ দিচ্ছে ডাইনিটা বোঁটিখানা কই ? (দাসী বোঁটি এগিয়ে দিল এমন সময় বাইরে থেকে বাজনা বেজে উঠল। তারপর রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ একদিক দিয়ে ঢুকলেন, বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করলেন রাজা চন্দ্রনারায়ণ। ইন্দ্রজিৎকে দেখে পান্নাকুমারী ছুটে তাঁর কাছে গেলেন।)

পান্না—ভাই ইন্দ্রজিৎ, তুমি তা হ'লে বেঁচে উঠেছ ? বাচলাম !

রাজা—(পান্নার দিকে চেয়ে) কুমার ইন্দ্রজিৎ তোমার ভাই ? তা হলে রতনপুরের রাজা রত্নসেন তোমার পিতা ?

পান্না—হ্যাঁ, আমি তাঁরই কন্যা।

রাজা—এতদিন তুমি কেন কথা বলনি পান্না ?

পান্না—এক বছর আমি মৌন না থাকলে আমার ভাই ইন্দ্রজিৎ বাঁচত না।

রাজা—এখন সব বুঝলাম।

সৎমা—(আশাবোঁটি হাতেই এগিয়ে এসে, মোলায়েম স্বরে) দেখ বাছা চন্দ্রনারায়ণ, আমার কি কখনও ভুল হয় ? আমি দেখেই বুঝছি বোমা আমার সাফাৎ লক্ষ্মী ! (দাসীদের দিকে চেয়ে) ওলো, তোরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বোমার বাপের বাড়ীর লোক এসেছেন, শাঁখ টাক বাজা ! (নিজের হাতের বোঁটির দিকে চেয়ে) এ বোঁটিটা আবার আমার হাতে ধরিয়ে দিলি কেন ? কুটুম এসেছেন বলে কি আমি সভাস্থলে মাছ কুটতে বসব নাকি ? (ইন্দ্রজিৎের দিকে চেয়ে) এস বাবা। ঘরে এস। বোমা ছেলে মাল্লব, ওকি বাছা তোমার যত্ন আত্তি করতে পারবে ? তুমি আমার ঘরে এস। আমি নিজের হাতে ব্যঞ্জন রেঁধে তোমার খাওয়াব। তোমার মা হলেন আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের মেয়ে। আমার বাবা তাঁদের বাড়ীর গোমস্তা না, না, খাজাকি ছিলেন। তুমি তো বাছা আমার ঘরের লোক !

(ইন্দ্রজিৎ ও পান্না পরস্পরের দিকে চেয়ে মুহূ হাসল।)

রাজা—নতুন মা, তোমার রন্ধনশালায় আমাদেরও তো নৈমস্ত্য রইল ?

যবনিকা পতন

সমাপ্ত

গ্রাম পুনর্গঠন ও জন হিতকর প্রতিষ্ঠান

ডাঃ শ্রীমৈত্রেয়ী বসু

বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে হইতেই ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে নানা প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টিয়ান মিশনারী সম্প্রদায় তাহারও বহুপূর্বে এইরূপ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদেরই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশের বহু কর্মবীর অল্পরূপ কার্য করিতে আরম্ভ করেন। মিশনারীরা এদেশে আসিবার পূর্বে সামাজিকভাবে জনহিতকর কার্যের প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। তবে গৃহস্থ অতিথি সেবা, জলছত্র স্থাপন, কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজন বা ব্রাহ্মণকে গোদান নিশ্চয়ই করিতেন। কিন্তু এসব কার্যের পশ্চাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করিয়া পূণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল। সজ্জবদ্ধভাবে সামাজিক মঙ্গল সাধন করিবার প্রচেষ্টা আবার নূতন করিয়া বিগত শতাব্দীতে ভারতবাসীরা রুক্ষ করিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে এ সকল কার্যে ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তন কর্মীরা অগ্রগণ্য। তখনকার দিনের (১৮৯১) দামাশ্রম আজও “রেফিউজ” রূপে বহু বাজার স্ট্রীটে বর্তমান। স্বর্গীয় শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বরাহনগরের শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বহু জনহিত কার্যের নামের তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। দিটি স্কুল ও কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন ইত্যাদি বিদ্যালয় গুলি ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন শাখা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও আজও পরিচালিত। পরবর্ত্তীকালে লেডী অবলা বসুর বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, স্বর্গীয় গুরুদয় দত্ত মহাশয়ের সরোজনলিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে ও প্রশংসার সহিত চলিতেছে। ইহা ভিন্ন অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নাম লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের শিষ্যদের প্রচেষ্টা সর্বোপরে উল্লেখ যোগ্য।

বোম্বাই এর Servants of India Society দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। আরও বহু নাম করা যাইত কিন্তু এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের প্রামাণিক তালিকা তৈয়ারী নহে, উদাহরণ হিসাবে কয়েকটা নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের পিছনে কোন না কোন ধর্ম সম্প্রদায় কার্য করিতেছেন। ইহার অবশ্য সকলেই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জন সাধারণের সেবাই করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ লোক জনহিতকর কার্যে নামিয়াছেন অতি অল্প দিন। ব্রতচারী সংঘ কিংবা শ্রীনিকেতনের গ্রাম সংগঠন প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত নহে। এইরূপ অগণ্য বহু প্রতিষ্ঠান আজ গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় পরিকল্পনা এই সকল কার্যে নূতন অনুপ্রেরণা নূতন জীবন আনিয়া দিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে ও এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কর্মবীর ও বীরাদনারা কার্য ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন তাঁহারা স্বদেশ প্রেম ও ধর্ম বুদ্ধি প্রমোদিত হইয়াই কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার পিছনে কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কার করিবার প্রবল ইচ্ছাও বর্তমান ছিল, Reformist মনোভাব প্রবল ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা অল্পই ছিল, যদিও প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই নানারূপ শিল্পকার্য শিক্ষা দেওয়া হয় ও হইত। তখন এই শিল্পশিক্ষাদানের পিছনে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করিবার কথা উদয় হয় নাই ও এই চিন্তাধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির বুনিন্দা নূতন করিয়া গঠন করার পরিকল্পনাও রচিত হয় নাই। আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে সকল কার্যকেই এই বুনিন্দা গঠনের সহিত যুক্ত করিতে হইবে মনে করিয়া আমি এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি। বলা বাহুল্য এই বুনিন্দা গঠন প্রচেষ্টাই গান্ধীজীর সর্বোদয় পরিকল্পনা। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের গ্রামোন্নয়নই বুনিন্দা গঠন ও

গ্রামোন্নয়নের প্রথম সোপান শিক্ষালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন। কারণ দেশ ও কালোপযোগী বিদ্যাশিক্ষা দান করিতে না পারিলে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন-সাধন করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। দুই শত বৎসরের ইংরাজ রাজত্বে নগরবাসী ভারতীয় একটা কিস্তিকিমাকার জীবে পরিণত হইয়াছে। পুরুষেরা নেকটাই পরিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু নারীকে সভ্যতারের সম্মান দিতে ভুলিয়াছেন, সিনেমা দেখিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য ভুলিয়াগিয়াছেন। হুঁকা পরিত্যাগ করিয়া সিগার-সিগারেট ধরিয়াছেন, কিন্তু দাঁতন করিয়া দাঁতের মর্যাদা রক্ষা করা ভুলিয়াছেন। নারীরা লিপটিক্ লাগাইতে শিখিয়াছেন, কিন্তু শিশুপুত্রের মলযুক্ত পুরাতন সংবাদ পত্র ধপ করিয়া রাস্তার ফুটপাথে ফেলিতে সঙ্কোচ বোধে করেন না। পাশ্চাত্য বিলাসিতায় গা' ঢালিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য নারীর কর্মকুশলতা শেখেন নাই। সমাজের শৃঙ্খলা অমান্ত করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন নাই। এই সকলই প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির কুফল। এই সব কারণেই গ্রামবাসী আজ নগরবাসীকে স্বদেশবাসী বলিয়া মনে করেন না। কলিকাতা ও লণ্ডন যত নিকটবর্তী—কলিকাতা ও তাহার দশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম তাহা নহে। দরিদ্র, অজ্ঞ, মুখ-গ্রামবাসী আজ নিবিড় অরণ্যে গড়িয়া রহিয়াছে, নগরবাসী কোন সাহায্য করিতেছে না। ভারতের মেরুদণ্ড তাহার লক্ষ লক্ষ গ্রাম। এইগুলির উন্নতি করিতে হইলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। সেই শিক্ষা কেমন করিয়া সকল গ্রামে পৌছিতে ও কি প্রাথমিক সেই শিক্ষা দেওয়া হইবে? দরিদ্র দেশে যতদূর সম্ভব আবলম্বী শিক্ষায়তনের প্রয়োজন ও শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীন করা প্রয়োজন। ইহা সম্ভব হইবে তখনই যখন আমরা বুনিন্দী শিক্ষা প্রচলন করিতে পারিব। বুনিন্দী শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। লেখিকা শিক্ষাবিদও নহেন তবে সাদা ভাবে একথা বলিলে ভুল হইবে না যে বুনিন্দী শিক্ষা দেওয়া হয় একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া—সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সহিত কোন হস্তশিল্পকে

যুক্ত করিয়া দিলেই বুনিন্দী শিক্ষা হয় না। হস্তশিল্পটিই হইবে শিক্ষাশ্রমের কেন্দ্র ও তাহার সহিত স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা রোগীর শুশ্রূষা, গ্রামসেবা ইত্যাদি সব শিক্ষাই বালক বালিকা পাইবে। হস্তশিল্পটিকে ভিত্তি করিয়া প্রথমে মাতৃভাষা ও পরে রাষ্ট্রভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল সবই শিখিবে। মালুয়ের প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়—এই ত্রয় বালক বালিকারা শিখিবে মাটি কোপাইতে, জমিচাষ করিতে, বড় হইলে লাঙ্গল দিতে ও ধানচাষ করিতে, মৎস্য চাষ করিতে ইত্যাদি। আরও তুলার চাষ, সূতা কাটিতে বস্ত্রবয়ন করিতে, কাঁচা ঘর তুলিতে, বাঁপ তৈয়ারী করিতে ছুতার ও কামারের কাজ করিতে ও শিখিতে হইবে। এই ভাবে সকল বালক বালিকা যদি অল্প বয়স হইতেই বৃষ্টি সহিষ্ণু ও কর্মপটু হয় তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে বেশী দেরী হইবে না। কারণ শিক্ষায়তনের ব্যয় শিশুরাই বহন অংশে বহন করিতে পারিবে। তিনটি আপত্তি উঠিয়াছে—প্রথমটি এইরূপ—আমাদের রাষ্ট্র পুলিশের মাহিনা দিতে সক্ষম আর প্রাথমিক শিক্ষায়তনের খরচ বহনে সক্ষম নহেন একেমন কথা! লেখিকা সকল বিষয়ের শত করা হিসাব সম্বন্ধে ভাল করিয়া ওয়াকিবহাল নহেন তবে এইটুকু বলিতে পারেন যে সমস্ত দেশটায় পুলিশ যত প্রয়োজন শিক্ষকের প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী ও সাধারণ পুলিশের মাহিনার অল্পরূপ মাহিনা কিংবা তাহা হইতেও কম মাহিনা প্রাথমিক শিক্ষকেরা পান বলিয়াই দেশে শিক্ষার এই অবস্থা। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে আবলম্বী অন্ততঃ আংশিক ভাবে হইতেই হইবে। দ্বিতীয় আপত্তিটি এই—শিশুকে দিয়া বাধ্যতামূলক Productive (ফলপ্রসূ) কার্য করান উচিত নহে। বাধ্যতামূলক কার্য করান নিশ্চয়ই অসুচিত কিন্তু শিশুকে যদি এমন করিয়া পরিচালনা করা যায় যে দিনের সমস্ত সময়টাই তেঁতুল বিচি না গুলিয়া কিছুটা সময় তুলার বীজ ছাড়ায় ও তুলা পিঙ্কন করে তবে কি অনর্থ হইয়া যাইবে? তৃতীয় আপত্তিটি এরূপ—এত কার্য করা কি শিশুর পক্ষে সম্ভব? অতি অল্প বয়স্ক বালক বালিকা নিশ্চয়ই সব কার্য পারিবে না—কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কিছুটা বড় হইলেই বালক বালিকারা রজকের কার্য ও রন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনযাত্রা

নির্কাহের সকল কার্যই সংঘবদ্ধ ভাবে করিতে পারে ও করিলে আনন্দ বোধ করে। গান, ক্রীড়া, নৃত্য, সম্ভরণ, পার্কিংগের ও জাতীয় দিবস পালনের আনন্দোৎসবও বাদ যায় না।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া স্বাবলম্বী গ্রামকেন্দ্র গঠন করা ও অতিদূর প্রসারিত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বীজ বপন করা যাইতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ যদি সকল রাষ্ট্রেরই শেষ (ultimate) পরিকল্পনা হয় তবে বুনিয়াদী শিক্ষাকেই ভিত্তি করিতে হইবে। যাহারা বুনিয়াদী শিক্ষা পাইবে তাহারা ৭-১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকা। ১৪ বৎসর বয়সের পর যে কোন মেধাবী বালক কিংবা বালিকা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হইতে পারে— এমন শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে ও আশা করা

যায় যে, সে চেষ্টা সফল হইবে। বর্তমান কালে যে কোন জনহিতকর কার্যই করা হউক না কেন তাহার পিছনে যদি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বীজ বপনের চেষ্টা না থাকে তবে তাহা বৃক্ষের গোড়ায় জল না ঢালিয়া আগায় ঢালিবার মত হইবে ও অভিপ্রায় যতই ২৭ হউক না কেন কার্য ফলপ্রসূ হইবে না। গ্রাম পুনর্গঠনের প্রথম কথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মূল কথা দেশের বর্তমান অবস্থায় গাধ্যমত স্বাবলম্বন ও স্বাবলম্বনের চেষ্টার প্রথম সোপান বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। বর্তমানে জনহিতকর কার্যকে reformism এর পর্যায়ে রাখিলে চলিবে না— তাহাকে revolutionany রূপ দান করিতে হইবে। তবেই গ্রামপুনর্গঠন করা সম্ভব হইবে ও দেশের সংস্কৃতি রক্ষা পাইবে।

আমার জীবনের অলৌকিক ঘটনা

শ্রীশান্তিশ্রী নাগ কর্তৃক অনুদিত

গুনেছি আজকাল কেউ অলৌকিকে বিশ্বাস করেন না— সেসব কাল নাকি বহুদিন চলে গেছে। কিন্তু অতীতের মত যাই হোক না কেন, আমার জীবন একটি অলৌকিক ঘটনার জগ্ন রক্ষা পাওয়ার আমার অলৌকিকে দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রমাণস্বরূপ কাহিনীটাই খুলে বলি। ৭ই মার্চ ১৯৪২ সালে যবদ্বীপ থেকে কিছু দূরে, স্বর্ঘ্য অস্ত যাবার কিছু আগে, ভারত-মহাসমুদ্রে এই ঘটনাটি ঘটে। আমি তখন ছিলাম ইউনাইটেড প্রেসের একজন সংবাদদাতা। জাপানীরা এই সময় ক্রমশঃ যবদ্বীপ গ্রাস করে ফেলেছে—জাপানীরা কবে কতদূর অগ্রসর হোল সেই খবর যথাস্থানে পৌছে দেওয়াই আমার কাজ। আমি যখনকার কথা বলছি তখন সবেমাত্র ব্যাটেভিয়া জাপানীদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে— শীতাই-সারা দ্বীপটি শত্রু সৈন্যে ছেয়ে যাবে—কাজেই কোন-মতে আমাদের দেশটি ছাড়তেই হবে।

ওলন্দাজদের একটি জাহাজ ভারত অভিমুখে রওনা হচ্ছিল; কয়েকটি ওলন্দাজ কর্মচারী, শেল অয়েল কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার এবং আমি সেই জাহাজে রওনা হ'লাম। আমরা মোট ২৪০ জন ছিলাম। আমাদের জাহাজ যখন তীর থেকে আড়াইশো মাইল আন্দাজ অগ্রসর হয়েছে—তখন হঠাৎ জাপানী বিমানপোত তাকে আক্রমণ করলো। বেলা ১১টা ৩ মিনিটে প্রথম বোমা পড়লো আমাদের জাহাজে এবং ১১টা ৩৮ মিনিটে সম্পূর্ণ ভাবে সেটা জলের তলায় তলিয়ে গেলো।

কতক্ষণ ধরে যে আমি জলে সাঁতার কেটেছি আমার খেয়াল নেই—কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েই আছি এক জায়গায়—যেখানটাতে জাহাজটা কিছুক্ষণ আগেই দাঁড়িয়েছিলো। সমুদ্রের চারপাশ থেকে কেবল মানুষের

চীৎকার শুনছি.....ভয়ানক চীৎকার.....প্রাণে বাঁচবার জন্ত
করণ প্রার্থনা।

যতদূর দেখতে পাচ্ছি এখনও পর্যন্ত কেবল একটাই
লাইফবোট দেখা যাচ্ছে—আকুল ভাবে সবাই সেটাকে
ডাকছে তাদের তুলে নিতে—কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা সরে
যাচ্ছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে সাঁতার কেটে এগিয়ে
চলেছি। লাইফবোটটা এখন একটু কাছে মনে হচ্ছে—
বোধহয় ২০ গজ আন্দাজ দূরে হ'বে।

“বাঁচাও! দয়া করে বাঁচাও!”

ওরা জ্রুপও করেনা, আস্তে আস্তে দাঁড় টেনে দূরে
চলে যায়। ওদের পথ আটকাবার জন্তে নিজের গতি বদলে
আরও জোরে এগিয়ে চলি। প্রায় এসে গেছি। “বাঁচাও!
বাঁচাও!” আঃ বিরক্ত করলো এই লাইফবোটটা, ছেড়ে
ফেললেই ভালো ছিলো—যাকগে।

এখন ওদের এতো কাছে এসে গেছি যে প্রত্যেকের মুখ
দেখতে পাচ্ছি। যাক এ যাত্রা বেঁচে গেলাম—আমায় এবার
ওরা টেনে তুলবে। সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করার মত অমূল্য
বোধ হয় আর কিছুই নেই। তুলে ধরবার জন্ত দুটো হাত
বাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু কেউ আমায় তুলে নিলো না।

ছোট্ট নৌকাটা মান্নবে ঠাণা। প্রত্যেকের মুখ কাঠের
মতো ভাবলেশহীন—সবাই একবার আমার মুখের দিকে
তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে লোকটি হাল ধরে বসে
আছে তাকে মান্ননয়ে বলি—“দয়া করে আমায় তুলে নাও—
আমি তো আর যব্বীপ অবধি সাঁতার কেটে যেতে পারবো
না।” উত্তর নেই। হঠাৎ মনে পড়লো আমার পকেটে
দুটো দিকনির্দেশক যন্ত্র। আশাঘ্রিত ভাবে আবার চীৎকার করে
উঠি—“দেখো আমার কাছে দুটো এই যন্ত্র আছে—
তোমাদের নৌকা চালাবার অনেক সুবিধা হবে।” লোকটি
মাথা নেড়ে শুধু বলে ‘আমাদের আর একটুও জায়গা নেই—
একেবারে ভর্তি।’

মনে মনে ভাবি—তা ঠিক—একেবারে ঠাণা। কিন্তু
তাই বলে ওরা তো আমায় ডুবে যেতে দেবে না? ইঁা ডুবে
যেতেই রেখে গেলো—ঐ তো ওরা সরে যাচ্ছে।

পাগলের মতো খপ করে একটা দাঁড় চেপে ধরলাম।

টান মেরে সরিয়ে নিলো। থাক আর চেষ্টা করবো না—
শেষে হৃৎ দাঁড়টা দিয়েই আমায় মারবে। নৌকার একটা
পাশ ধরতে চেষ্টা করি লাফিয়ে উঠে—আঙ্গুল ফস্কে যায়।
নৌকাটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। হালের থেকে একটা
দড়ি জলে ভেসে চলেছে, চট করে সেটা ধরে ঝুলে পড়ি—কে
একজন ইঁাচকা মেরে ছাড়িয়ে নিলে।

শ্রান্তিতে সারা দেহটা জলের মধ্যে ঝুলে পড়তে চায়—
পাথরের মতো ভারী মনে হয় শরীরটাকে। মুখটাও যেন
জলে নেমে পড়ছে।

ঠিক মনে হয় আমি যেন এখন দুটো “আমি।” একজন
জলে, আর একজন কোথাও একটু উপর থেকে যেন আমাকে
লক্ষ্য করছে। জলের আমি বিপদে পড়ে কি করছি—কি
ভাবছি—তা যেন বিচার করে দেখছে “দর্শক” আমি।

“দর্শক” বলে: “শান্ত হও ম্যাক ডু গাল। যা শক্তি
অবশিষ্ট আছে সেটার অপচয় কোরো না। লাইফবোট বেঁধে
অনেকক্ষণ ভেসে যাওয়া যায়। আর, তাছাড়া তোমাকে
তাই করতেই হ'বে—কারণ এটাই ছিলো শেষ নৌকা।
ওদের উপর রাগ ক'রেও লাভ নেই—সত্যিই ওদের আর
তিল ধরবারও স্থান ছিলো না।”

আস্তে আস্তে অবসাদের ঘোর কেটে আসে, শ্রান্তির
কুয়াসা মিলিয়ে যায়। আকাশে, বাতাসে আর কোনও
ভয়ানক কারার আওয়াজ শুনি না, কাছাকাছি আর কাউকে
সাঁতার দিতেও দেখি না। তবে কি এত তাড়াতাড়ি
এতগুলো লোক ডুবে গেল?

পর্বতপ্রমাণ জলরাশি ভেদ করে চোখ বেশী দূর
যায় না। দুটো চেউএর মাঝে যতটুকু শান্ত জল দেখা যায়
এবং পাহাড়ের মতো উঁচু চেউএর শিখরে উঠলে চার পাশের
উন্নত জলরাশির মধ্যে যা দেখা যায় তারই মধ্যে আমার
দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। ক্রমাগত আর একটি সাঁতারু দৃষ্টিগোচর
হ'ল। লাইফবোটএর উপর মুখ রেখে সে ধীরে ধীরে
এগিয়ে আসছে। আমরা এক সংগে ভেসে চলেছি।
আমাদের একবার চোখাচোখি হ'ল, কিন্তু আমরা কেউই
কথাও বলায় না বা পরস্পরকে কোনও রকম অভিধানও
জানালাম না। আমার সঙ্গীর মুখে শুধু একটা ক্লান্তির ছাপ,
তাছাড়া মুখটি খুব প্রশান্ত। খানিকক্ষণ একসঙ্গে ভেসে
আমরা দুজনে হৃদিকে সরে যাই।

হুদিন আগে প্রশান্ত মহাশয়গরের ওপার থেকে টেলিফোন যোগে আমার মার সংগে আমার যে শেষ কথাগুলি হয়েছিল সেগুলি কানে বাজতে থাকে, “মনে রাখিস বাছা, তুই যেখানেই থাকিস আমার আশীর্বাদ তোর সংগে সংগেই ফিরছে।”

মনে হচ্ছে যেন মা আবার বলছেন—“আমি তোর জন্তে প্রার্থনা করছি—তুই সাঁতার দেওয়া থামাস না।”

মনে মনে বলি—‘তোমার কথা রাখব মা, যতক্ষণ জ্ঞান থাকে সাঁতরেই যাবো।’

ভাবতে লাগলাম—ডুবে যাবার আগে কতক্ষণ সাঁতার দেওয়া যায়? ষাড়টী যখন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়বে তখন তো আপনিই মাথাটা জলে ডুবে যাবে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত গল্প মনে পড়ল। কি ভাবে একটা মানুষ ডুবে গেল ও তার মনের ভাব। সাঁতার দিতে দিতে সে এমন শান্ত হয়ে গিয়েছিলো যে তার চোখ এবং মন সব ধাঁধিয়ে গেলো। কোনটা যে আকাশ আর কোনটা যে সমুদ্র তা পর্যন্ত সে ভুলে গেলো—কোনটা যে জল আর কোনটা যে বাতাস তাও সে ঠিক করতে পারলো না—কাজেই শেষে সে ভুলেই গেলো ছুটোর মধ্যে কোনটার থেকে সে নিশ্বাস নেবে।

আমি ভাবতে লাগলাম কতক্ষণে আমিও ঐরকম ভুলে যাবো।

“দর্শক” আমি উত্তর দিলো—“ভগবানকে ডাকো—তোমারও আর বেশী দেরী নেই।”

আমি প্রার্থনা করতে থাকি। এই প্রথম উপলব্ধি করি প্রার্থনা কাকে বলে। যে সব জিনিসকে আগে কতো মূল্যবান ভেবেছি সেগুলোর কোনও মানেই আর হয় না। একেবারে শেষে শুধু ছুটি জিনিস মানুষের মনে পড়ে—তার নিজের ছোট্ট পরিবার আর তার ভগবান। জীবনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে যখন এপার আর ওপার হুঁদিকেরই তীর দেখা যায় তখন অতীতের মাপকাঠিতে মাপা জীবনের সংগে বর্তমানের কোনও মাপই যেনে না যেন।

তখন মনে ভয় থাকে না মনে অশুশোচনা আসে। যে সব জিনিস করেছি, যে সব জিনিস না করলেই ভালো হ’ত, যে সব জিনিস করিনি কিন্তু করতে পারতাম—সবের জন্তেই মনে গভীর অশুশোচনা জাগে। তখন মনে হয় এই

পাখিব জীবন ধারণের সৌভাগ্য লাভ করেও কি তাচ্ছিল্যভরে তার অপব্যবহার করেছে।

“দয়া করো ভগবান, আর একটু সময় দাও, সেটুকুর সুব্যবহার করবার প্রাণপণ চেষ্টা করব।”

মনটা অনেক হালকা লাগছে। হতাশা আর নেই। আমার ভিতরে যে দন্দ জাগছিলো সেটা কেটে গিয়ে আশ্ব-বিশ্বাস ফিরে আসছে। অশুশোচনার তীব্র জ্বালাও যেন মিলিয়ে আসছে। এখন দৃঢ় ধারণা হচ্ছে আমি রক্ষা পাবো, যদিও ধারণা করতে পারিনি কি ভাবে। কিছু উপায় হবেই। হয়ত একটা সাবমেরীন (ডুবো জাহাজ) দেখতে পাবো। সাবমেরীনের উপরের যে লোহাটা উঁচু হয়ে থাকে সেটা দেখতে পাবার জন্ত এদিক ওদিক ভাঁকই।

হঠাৎ দেখতে পেলাম জাহাজ ভাঙা বিরাট একটা টুকরো কাঠ ভেসে আসছে। ধরে ঝুলে বইলাম বিশ্রামের জন্ত। কিছু একটার উপর ভর দিয়ে থাকতে পারলে কয়েক দিন ধরে ভেসে চলা যায়।

কটা বেজেছে? সূর্যটাই বা কোনদিকে? ঐতো, ছাই মাখানো আকাশের গায়ে ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে। অনেকদূর নেমে এসেছে—বোধ হয় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো।

দিগন্তের কোনে একটা উঁচুমতো কি যেন দেখা গেলো। জাহাজ ভাঙা কিছু কি? না, দেখি চেউটা ভাঙুক। নিশ্চয়ই সাবমেরীনের ডাঙা, মনে মনে যা ভেবেছিলাম। জোরে সাঁতার কাটতে হ’বে—নইলে ওরা দেখতেই পাবেনা। কিন্তু ওটা সাবমেরীন্ নয়—ওটা একটা মাঙ্গল—লাইফ বোটের মাঙ্গল।

“দর্শক” আমি বলছি—‘সুযোগ এসেছে। সাঁতার কাটতে থাকো—প্রার্থনাও করো। ঐ যে তোমার সংগের ভদ্রলোকটি ওকেও দেখাও নৌকোটা।’

সে ভদ্রলোককে ঠিক আমার একটু আগেই দেখলাম। তার পাশে গিয়ে কাঁধ ধরে নেড়ে মাঙ্গলটার দিকে দেখলাম—ভদ্রলোক মাথা নেড়ে অল্প একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

ভদ্রলোকের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। ধারণা করতে পারিনি এতক্ষণ ধরে এইভাবে সাঁতার কাটতে পারব।

নৌকোটা খুব জোরে যাচ্ছেনা—ভেসে চলেছে। এই ভাবে চললে আমি ধরতে পারবো।

হে ভগবান! ওরা পাল তুলে দিচ্ছে। গতবারের মতো এরাও আমার ফেলে চলে যাবে।

“হে ভগবান,” আমি সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে চীৎকার করে উঠি—“ভগবান, ওদের পালটা যেন এখনি না উঠে পড়ে।”

পালটা ঝুলে পড়ে। “হে ঈশ্বর—তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।”

আমি অনেক এগিয়ে এসেছি। লোকদের দেখতে পাচ্ছি। ওরা পাল তোলবার চেষ্টা করছে আবার। মান্ডল বেয়ে কেঁপে কেঁপে আবার পালটা উঠছে।

“হে প্রভু, এই আমার বাঁচবার একমাত্র সুযোগ।” পালটা প্রায় উঠেই পড়েছে।

“হে ঈশ্বর হে প্রভু, নামিয়ে দাও পাল।” একি অলৌকিক কাণ্ড? আবার পালটা নেমে গেল।

“হে ভগবান—আমার ধন্যবাদ নাও।”

প্রাণপণ চেষ্টাতে হ’বে—তবে ওরা এসে তুলে নেবে।

“বাঁচাও—রক্ষা করে—বাঁচাও!”

আমার দিকে একজন লোক হাত নাড়ছে। কি হৃদয় লাগছে ঐ হাতটা। আমাকে দেখতে পেয়েছে। এবার আমার নৌকায় তুলে নেবে।

কিন্তু নৌকোটা তো আমার দিকে আসছে না। কেউ একটা দাঁড়ে হাত পর্যন্ত রাখছে না। ওরা কেবল পাল তোলবার চেষ্টা করছে। আমার পিছন থেকে কার চীৎকার শোনা যাচ্ছে, যদিও ক্ষীণ কিন্তু বুঝেছি—সেই ভদ্রলোক। আমার তাকাবার সময় নেই—আমি এগিয়েই চলি।

এসে গেছি, হাঁপাতে হাঁপাতে, দুটো হাত বাড়িয়ে দিই। কারা দুজন আমার টেনে তুলে নেয়।

আমার সর্কান্ন কাঁপছে—আমি আসন্ন, কিন্তু আমি নিরাপদে নৌকায় বসে আছি। নিরাপদ! আমার মনে যে অদ্ভুত আনন্দ ও অত্যাশ্চর্য ভাবসঞ্চার হচ্ছে স্বর্গ বোধকরি তারই একটি রূপান্তর। গতীয় নিঃশ্বাস নিয়ে বল্লাম—“ভগবান তোমাদের কল্যাণ করবেন—অনেক ধন্যবাদ তাই।”

আবার আর একটি নিঃশ্বাস নিলাম। জলের উপরের বাতাস কি মধুর। আমার সংগে যে ভদ্রলোক সাতার দিয়ে আসছিলেন তাঁর কথা এদের বল্লাম। “ঐযে ঐখানেই আছেন। কিন্তু কৈ দেখছি নাতো।” এই তো কিছুক্ষণ আগেই ছিলেন—বেশীদূরে নয়—ঐ দিক দিয়ে চলো।”

খানিকক্ষণ সব চুপ। তারপর একটি লাল চুলওয়ালী ওলন্দাজ নাবিক ভাদ্রা গলায়, নিজেদের ভাষায়, কি একটা হুকুম করে। ও এবং আরও সাতজন নাবিক দাঁড় চলে পিছনে ঝুঁকে পড়ে—নৌকোটা আমার বন্ধুকে ফেলে এগিয়ে চলে।

“এই ও দিকে”—আমি সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠি।

লাল চুলওয়ালী নাবিক বলে—“ওকে আমরা নিতে পারবো না। দেখছো না আমরা কতজন—একজনের জায়গা আর ছিলো—তাই তোমাকে তুলে নিলাম।”

আর কেউ কিছু বলছে না। দৃঢ় ও দ্রুত দাঁড়ের ঘায়ে নৌকেটি এগিয়ে চলেছে। সাতারীদের মধ্যে শেষ যে জীবিত ছিলো তার থেকে নৌকেটি ক্রমশঃ আরো দূরে যাচ্ছে।

চঞ্চল জলরাশির মধ্যে কত খোঁজবার চেষ্টা করি ওকে—কিন্তু কাউকেই দেখতে পাইনা। ও নিশ্চয় দেখেছে আমি কি রকম ভাবে রক্ষা পেয়েছি। নিশ্চয় মনে মনে খুসী হয়ে ভেবেছে—“বাক্—আমিও যে আছি তা ওরা জেনেছে—আমিও রক্ষা পাবো।” কিন্তু ও কি ভাবল যখন দেখল নৌকোটা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে?

আমি জানি ও কি ভেবেছে—আমার নিজের মনে যে তা গাঁথা হয়ে আছে। প্রথম নৌকোটা যখন সরে গেল তখন আমি যা ভেবেছি ও নিশ্চয়ই তাই ভাবছে। আশা করি অন্তত একটা জিনিষ ও ভাবেনি। আশাকরি ও ভাবেনি আমি ওকে ঠকালাম।

এখনও মাঝে মাঝে রাজে ঘুম হয়না—যখন ভাবি সেই ভদ্রলোকের কথা—বাকে ফেলে এসেছিলাম। ভাবি, আর কতক্ষণ ও সাতার কেটেছিলো, যতক্ষণে প্রাণ্তি ও অবসাদে কোনটা জল আর কোনটা বাতাস, আর সে ঠিক করতে পারলো না—কাজেই সে তুলেই গেল দুটোর মধ্যে কোনটার থেকে নিঃশ্বাস নেবে?*

* উইলিয়ম, এইচ্, ম্যাকডুগাল লিখিত।

বেথুন বিদ্যালয়

শ্রীশান্তা দেবী

একচল্লিশ বৎসর আগে এই বেথুন বিদ্যালয়ে আমরা ছুই বোন বাবার সঙ্গে আসিয়াছিলাম ভক্তি হইবার জন্য। তাহার পূর্বে আমরা কখনও কোন স্কুলে পড়ি নাই। কাজেই স্কুলসম্বন্ধে মনে যথেষ্ট ভয় ছিল। তিন জনে ছোট একটা ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলাম, একটু পরে আসিলেন তখনকার হেডমাষ্টার শ্রীমাচরণ গুপ্ত মহাশয়। তিনি আমাদের অল্প স্বল্প পরীক্ষা লইয়া বাবাকে বিদায় দিয়া আমাদের নিজ নিজ ক্লাশে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কোন একটা অজানা রাজ্যে নিঃসঙ্গ পড়িয়া রহিলাম ভাবিয়া মনটা বিষন্ন হইয়া গেল। ধীরে ধীরে অস্ত্রান্ত মেয়েদের কৌতুহল আমাদের চারপাশে তাহাদের টানিয়া আনিল। তারপর আমাকে উৎসাহে পড়ায় শুনায় হাসিতে গল্পে পাঁচ ছয় বৎসর বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে। বেথুন কলেজ আমাদের, আমরা বেথুন কলেজের মন হইতে এই কথা বহু বৎসর সরাইতে পারি নাই। মাছুষ যে সংসারে জন্মায় সে সংসার কেন তার মন হইতে কখনও মোছে না তার জীবনের সব চিন্তা ও কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যায়, তেমনই যে শিক্ষানিকেতনে মাছুষ তার গুরু ও সতীর্থদের সঙ্গে আর একটা নূতন জগতে বিজ হইয়া আসিয়া পড়ে, সে শিক্ষানিকেতন ও তার মন হইতে সহজে মুছিয়া যায় না।

আমাদের যুগে যেমন ছিল আজকাল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ঠিক সেরকম নাই। আমরা স্কুলে হেডমাষ্টার মহাশয় এবং কলেজে অধ্যাপক পরেশনাথ সেন, অধ্যাপক বিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট যে পড়িতাম তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যবহারের উৎকর্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম, আমরা তাঁহাদের ছাত্রী মনে করিয়া গর্ব অনুভব করিতাম, ছাত্রজীবন শেষ হইয়া যাইবার বহু পরে কখনও তাঁহাদের স্মৃতি দেখা হইলে সেদিনটা সার্থক মনে করিতাম। আজ কাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নাকি সেই গুরুভক্তির কোন চিহ্নই নাই শুনি। কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না, যতটুকু হয়

তাহাতে গুরু ও শিষ্য উভয়পক্ষের জন্তই মনটা দুঃখ পায়। সেকালের গুরুদের মধ্যে কেহ কেহ খুব সহজেই ছাত্রীদের আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহাদের কাছে মেয়েরা নিজেদের আবেদন অভিযোগ আশা নিরাশার কথা অন্যায়সেই বলিতে পারিত, তাঁহাদের ক্রোধে বেশ এতটা নির্ভয় আনন্দের ভাব ছিল, মেয়েরা আবদার এবং জুলুমও যে একেবারে করিত না তা নয়। কোন কোন এবং বেশীর ভাগ অধ্যাপকই কিন্তু খুব গাভীর্ষ্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। সেই গাভীর্ষ্য তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মানের আসন অক্ষুন্নই রাখিত। মনে পড়ে অধ্যাপক সেন ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশে আসিতেন, এক মিনিট এদিক ওদিক হইত না। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদে হাতে নখে একটি ধূলিকণাও কখন লাগিতে দেখা যাইত না, তিনি অতি সন্তর্পণে খড়ি ধরিতেন, পাছে হাতে দাগ লাগে, দরজা জানালা নখাঘ্র দিয়া ছুইতেন পাছে ধূলা ছুইতে হয়। ক্লাশে কখনও হাসিতেন না, কখনও বাংলা বলিতেন না, মেয়েরা তটস্থ হইয়া তাঁহার পড়ানো শুনিত। কিন্তু কাহারও অসুখ করিয়াছে শুনিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের পাঠচিন্তা-কঠিন মন হঠাৎ কোমল হইয়া যাইত, মেয়েটিকে যতক্ষণ না শুইতে পাঠাইতে পারিতেন তাঁহার মন নিশ্চিন্ত হইত না। পরীক্ষার সময় তিনি খুব শক্ত বিচারকর্তা ছিলেন না।

আমাদের যুগে আমাদের মেয়েদের মধ্যে অন্তত অধ্যয়ন সত্য সত্যই অধ্যয়ন ছিল। ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ করিবার ইচ্ছা মেয়েদের মধ্যে দেখিতাম না। কি ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া ও তপস্যার মত নিষ্ঠা লইয়া সেকালের এক একজন মেয়েকে পড়িতে দেখিয়াছি। দিনে রাতে আঠারো ঘণ্টা পড়িয়াও এক একজনের তৃপ্তি হইত না। ছাত্রজীবনে অষ্ট ছাত্র হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাদের ছিল তাহারাই ছাত্রীদেরও আদর্শ ছিল। ছাত্র জীবনের বাহিরে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, তাহার চিন্তা লইয়া তাহার তখন এক

বিন্দুও মাথা ঘামাইত না। ছাত্রীদের জগৎ কোন কোন দিক দিয়া প্রাচীন মঠের সহিত তুলনীয় ছিল। এই চল্লিশ বৎসরে ছাত্রীদের জীবনে যে সকল আধুনিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার অগ্রদূত আমাদের যুগের মেয়েরাই ছিলেন। সে সব কথা অনেকেই জানে না। সামান্য পথে হাঁটা, নিরভিভাবক ট্রামে বাসে চড়া, এটুকুও আমাদের বেথুনের মেয়েরাই যখন স্বল্প করি, তখন সেটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া অনেকের মনে হইত। এখন ভাবি, মানুষের অজ্ঞাতে নূতন জিনিষ কত শীঘ্র চলিয়া যায়।

ঘরের বাহিরের জগৎকে বিশেষ করিয়া 'সেখানকার' মেয়েদের জীবনের বিচিত্রতাকে আমরা এই আমাদের

বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়াই অনেকটা দেখিতে শিখি। এই জগৎটা এদেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রের বাহিরে ছিল, আমাদের হাতে-খড়ির সঙ্গে সঙ্গে এজগৎ বাংলাসাহিত্যে নিজের স্থান খুঁজিয়া লইয়াছে।

আজ আমাদের সেই বিদ্যালয়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব। আমরা শৈশবের সেদিন হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছি। আমাদের অন্ধ শতাব্দী পরে যাহাদের জন্ম বেথুনের দ্বিতীয় শতাব্দীর মুখে তাহাদের প্রবেশের দিন আসিয়াছে। সেই নূতন শিশুযাত্রীদের জীবনে এই বিদ্যালয় আনন্দ ও সফলতা ভারে ভারে আনিয়া দিক প্রার্থনা করি।*

* বেথুনবিদ্যালয় শতবার্ষিকীতে পঠিত

সমাজ সেবা

শ্রীপদ্মিনী সেন গুপ্তা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ও উৎসবের ভিতরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল পল্লীবাসীদের স্বতন্ত্র যোগদান ও তাহাদের আনন্দের অভিব্যক্তি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে দিন আমি মাত্রাজে যাইতেছিলাম—যাইবার পথে লক্ষ্য করিলাম স্বাধীনতার অরুণোদয়ে দীর্ঘদিনের স্তম্ভের পরে পল্লীসমূহ যেন আনন্দ মুখর হইয়াছে। কুটীরে কুটীরে ভগ্ন গৃহে সর্বত্র ফুল ও কাগজের মালা স্বেচ্ছাভিত হইয়াছিল এবং সর্বত্র ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছিল। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই শোভাযাত্রা বা ভজন গানে যোগদান করিয়াছিল, মনে হইতেছিল তন্মায় ও মৃতপ্রায় জাতি যেন যাহুস্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়াছে—স্বাধীনতার জয়ধ্বনি সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মাত্রাজে পৌঁছিয়া দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম যে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের অনেকেই বস্ত্র ও কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী এবং সেই দিনের আনন্দউৎসবের সহিত তাহাদের যোগদান অন্তরের। সমাজসেবায় জীবনের অধিকাংশ সময় স্নানিত করিয়া পল্লীবাসী ও বস্তিবাসীদের সহিত প্রকৃত বন্ধু

স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আসিয়াছি, আর সেই দিন তাহাদিগকেই সকলের মাঝে পাইয়া আবার বক্ষ গর্কে স্নাত হইয়া উঠিয়াছিল এবং নূতন ভারতের ছবি তাহাদের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নূতন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের নানাবিধ সঙ্কল্প সেদিন করিয়াছিলাম। মনে হয় অল্প মেয়েরাও আমারই মত করিয়াছিলেন।

সেই দিনের পরে দুইটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল এবং ভারতবর্ষও রাজনীতির দিক হইতে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা তীব্র অসন্তোষের ধূয়াও জাতির অগ্রগতিকে বাধা দিতেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণী ধনী ও উপরওয়ালাদের উপর রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কারণ বহুদৈর্ঘ্য স্বাধীনতা তাহাদের অভাব ও দারিদ্র্যকে মোঁচন করিতে পারে নাই। রাতারাতি অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করা যে সম্ভব নহে তাহাও তাহাদের বুঝাইবার উপায় নাই। একশ্রেণীর লোক ধ্বংসাত্মক কার্য দ্বারা সরকারকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে মহিলারাও কেহ কেহ উহাতে যোগদান করিতেছেন। বিগত মহাযুদ্ধের ক্ষয় পূরণ হইতে না হইতেই উষ্মতা, খাদ্য

সঙ্কট পূরণ প্রভৃতি বহুবিধ অপ্রত্যাশিত সমস্যার পড়িয়া সরকারকে ভীষণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে এবং সেই কারণে অনেক জনহিতকর পরিকল্পনাকে বাতিল করিতে হইয়াছে। ধনী ও দরিদ্রের ভিতরে যে আকাশ পাঁতাল ব্যবধান রহিয়াছে, তাহাই বর্তমানে দেশের অগ্রগতিকে বাহ্যত করিতেছে সব চেয়ে বেশী। একদিকে সামাজিক বন্ধন অপরদিকে ব্যক্তিগত দৃষ্ট প্রতিনিয়তই এই উভয় শ্রেণীকে দূরে রাখিয়া আসিতেছে।

একদিকে প্রাসাদসৌধ জহরং গহনার অগ্রযোজনীয় প্রাচুর্য, অপর দিকে অনাহার অন্ধার ক্লিষ্ট নিরক্ষর পল্লী ও বস্তিসমূহ এই দুই বিপরীতমুখী ধারাকে একত্রিত করিবার উপায় কি? নিশ্চয়ই ধনসাত্ত্বিক কার্য দ্বারা নয়। ধৈর্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোটি কোটি হৃদিশ্রান্ত নরনারীদের প্রতি ধনীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে যে তাহাদের দুঃখ ও হৃদিশ্রা আমাদের প্রতিবেশকেই দুঃখ ও হৃদিশ্রা। যখনই সম্ভব তখনই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে এবং পল্লী ও বস্তিবাসীদের বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি যে আরামকেদারায় বসিয়া জাঁকজমকপূর্ণ কোনও সমাজমঞ্জল সভায় বোগদান করার চাইতে একজন মিলমজুরের স্ত্রীর সহিত বন্ধুত্ব করা এবং তাহার তৈরী চা পান করা অনেক গুণে চিত্তাকর্ষক। আমার মনে হয় এই জবজ্বল শ্রেণী বিভেদের দমন ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি এই উদাসীনতার জন্ত আমাদের তথাকথিত ভদ্র শ্রেণীর অনেক মহিলা, জীবনের বহু রস ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

দিল্লীতে অধুনা অস্থগীত এক সমাজকল্যাণসমিতিতে একজন বক্তা বাধ্যতামূলক সমাজসেবা ছাত্রদের ভিতরে প্রবর্তন করিবার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহার পরিকল্পনা নূতন নয়। এক সময়ে উপাধি দিবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে পল্লীতে পল্লীতে জনহিতকর কার্য করিতে হইবে এইরূপ কথা উঠিয়াছিল। এই ব্যবস্থা মেয়েদের ভিতরেও যদি প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে মেমসাহেবরূপে বা সনাতন অন্তঃপুরের পরদায় আড়ালে বাহারা দূরে সরিয়া আছেন তাঁহাদের অনেকেই প্রকৃত ভারতের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। স্বভাবতই অনেক মহিলা বাধ্যতামূলক সমাজ সেবায় ঘোর আগ্রহ

জানাইবেন। বাহারা প্রাচীনপন্থী, বাহারা নারীকে মনে করেন সম্ভান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ এবং সমাজে স্বামী পুত্রের জন্তই তাহার প্রয়োজন, তাঁহাদের মধ্যে এই ধরনের অগ্রগতি মূলক প্রস্তাবে কিরূপ সৌর গোল পড়িয়া যাইবে কল্পনা করা শক্ত নয়। প্রকৃত কথা আমাদের দেশের নারীশক্তির বহুল অংশ অপচয় হইতেছে। এক মাত্র বিধবাদের কথাই ধরুন না। জীবনের বিষয় সকল চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া অর্থহীন শূন্য জীবন যাপন করিতেছে অসংখ্য স্ত্রীলোক। তাহারা সরকারের কাজে বা অসহায়ের সাহায্যে অগ্রসর হইলে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ নিশ্চয় হইবে না। বরং এই বিধবাদেরই মধ্যে বাহারা অগ্রণী হইয়া আশ্রয় বা শিল্প কেন্দ্র খুলিয়াছেন সহস্র সহস্র লোকের আশীর্বাদ তাঁহারা পাইয়াছেন—এবং কাজের ভিতর দিয়া পুণ্যার্জনও করিয়াছেন। দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে সমাজ সেবা মূলক কাজের চাইতে স্ত্রীলোকের আর কোন আদর্শ কাজ থাকিতে পারে না। সৈন্ত বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্ত্রী এবং বাহাদের স্বামী নৌবিভাগে ও বিমান বিভাগে কাজ করিতেছেন তাঁহাদিগের, অত্যাচার বিভাগীয় পরিবারের জন্ত কিছু না কিছু সমাজসেবামূলক কাজ করা অনেকটা বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত বাহারা, বাহারা নিভিলিয়ানের পত্নী এবং বাহাদের স্বামী নির্দিষ্ট হারের উপরে উপার্জন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি সমাজ সেবা মূলক কাজকে নৈতিক কর্তব্য মনে করেন এবং তদনুযায়ী কাজ করেন তাহা হইলে দেশের স্ত্রী অনেক ফিরিয়া আসে। এই নীতিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেশের কাজে যদি অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে হতভাগিনী ভাইবোনদের সেবা দ্বাধর্ম্য না হইয়া ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই ক্রমে বুঝাইবে যে দেশসেবা আনন্দদায়ক কাজ।

সমাজ সেবা কি? অভিধানগত 'সেবা' কথার অর্থ "জীবনকে উপভোগযোগ্য করিবার প্রয়াস" এবং 'সমাজ সেবা' কথা দুটির দ্বারা সমাজের ব্যাপক উন্নতিমূলক প্রয়াসই বুঝায়, কাজেই মহিলারাই এই কাজের প্রকৃত অধিকারী; কারণ তাঁহারা ই সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলেন নিজ নিজ পরিবার, লক্ষ্য করিয়া থাকেন পরিবারের প্রতিটি

লোকের সুখ সুবিধার প্রতি তাঁহাদের আশৈশব অভিজ্ঞতার ফলে সমাজের কল্যাণে হস্তক্ষেপ করিলে অতি সহজেই তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন। কিন্তু এই কাজে ত্রুটি হইলে প্রথমটা বড়ই বিরক্তিকর বোধ হয়, কারণ দরিদ্র নরনারীর বিশ্বাসভাজন হওয়া ও তাহাদের প্রকৃত বন্ধু লাভ করা প্রথমটা বড়ই কষ্টকর। প্রথমে কতক গালিমন্দা এমন কি অকৃতজ্ঞ আচরণও অবশ্য প্রাপ্য। এই ধারণা লইয়া কাজে ত্রুটি হইতে হইবে এবং পরে ইহার পুরস্কার মিলিবেই। একবার একজন পল্লীবাসীর বিশ্বাসভাজন হইতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাহারা যে বুদ্ধব্রতী ও বিশ্বাস লইয়া আসিবে তাহা অবর্ণনীয়। সে শিশুর ছাত্র সরল বিশ্বাস লইয়া আত্মসমর্পণ করিবে। কাজেই 'সমাজ সেবা' বলিতে বুঝায় নীরবে দক্ষতার সহিত প্রেম ও অল্পকম্পা লইয়া সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনে ত্রুটি হওয়া। হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম উভয়ই শিক্ষা দেয় সংকর্মই কর্মের পুরস্কার, কাজেই এই কাজ হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের বিশেষ উপযোগী।

দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক মাতা মা হইবার যোগ্য নয়, ভগ্নস্বাস্থ্য ভিন্নও তাহাদের শিক্ষা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার মা হইবার পথে বিশেষ বিপদ সৃষ্টি করে। আমাদের ভিতরে যাহারা শিক্ষার আলো পাইয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহারা সহজেই উপকার করিতে পারেন। প্রতি বস্তির পাশেই প্রাসাদসম অট্টালিকা রহিয়াছে। ঐ প্রাসাদে যাহারা থাকেন, বস্তিতে যাইয়া বস্তিবাসির সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারেন এবং শুধু শিক্ষার কাজেই নয়, সম্মান পালনের প্রাথমিক কর্তব্য, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং সংসার-চালনা বিষয়েও অনেক বিষয় বুঝাইতে পারেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষক, প্রসূতিভবন এবং শিশুমন্ডল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেশের পক্ষে অপরিহার্য হইয়াছে, এই বিষয়ে রাষ্ট্রের আরও সচেতন হওয়া দরকার। অবশ্য রাষ্ট্র প্রসূতি ও শিশুদের সুযোগ সুবিধাদান করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার দরুন তাহার সকল সংকল্প বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু আমরাও সরকারের অংশ বিশেষ, কারণ আমাদের রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। আমাদের প্রাণ 'মায়ের প্রাণ'। সেই অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য ব্যক্তিগত

অভিপ্রায় সিদ্ধির আশায় শুধু পূজাপার্কণ আর নিজেকে গভীব পরিবারকে লইয়া লিপ্ত থাকা? আমাদের টাকা, অগাধ ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত সাহায্য রাষ্ট্রের কাজে অনেক সহায়ক হইতে পারে। Health Survey Development সমিতির ১৯৪৩ সালের রিপোর্টের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—“জনসাধারণের স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে যে আবহাওয়ায় তাহারা বাস ও কাজ করে, তাহার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার উপর, ভয় ও অভাবের নিরাপত্তা, পুষ্টির খাতি এবং ব্যায়াম ও বিশ্রাম বিনোদনের শিক্ষার উপর।” তাহা হইলে একমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থাই আমাদের দুর্বস্থার কারণ নয়, শিক্ষার অভাবও ইহার অন্ততম কারণ। ধনী সম্প্রদায় গরীবদের সম্পর্কে আসিলেই পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের মনে বিশ্বাস জাগে।

হেলথ রিপোর্টারের মতে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরীক্ষকের সংখ্যা ৭০০ হইতে ৭৫০ এর ভিতর। যেখানে ৩০ কোটি লোকের বাস সেখানে সাত শত স্বাস্থ্যপরীক্ষক সমুদ্রে জলবিন্দুর ছায় নগ্ন। সেই স্থলে যে প্রতি হাজারে ২০ জন প্রসূতি প্রসব কালে মারা যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রসূতিমৃত্যুর হার আমাদের দেশেই বোধ হয় সর্বাধিক। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে ৭টি বিভাগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয় ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর ৬০ জন মহিলা স্বাস্থ্য পরীক্ষার ট্রেনিং পান। আমাদের দেশের পল্লী ও বস্তির সাধারণ দাইদের অজ্ঞতা, নোংরামি, গোভ ইত্যাদির সহিত সকল নারীই পরিচিত আছেন। এবং এই অশিক্ষিতা দাইদের জন্যই অনেক প্রসূতি ও শিশু অকালে মারা যায়, ইহার প্রতিকার করা সমাজ সেবার সর্বপ্রধান কাজ। রিপোর্ট অনুযায়ী ১ কোটি প্রসূতির জন্য অন্ততঃ ৫ হাজার শিক্ষিতা দাইয়ের প্রয়োজন। ভক্ত মহিলারা এই চেষ্টা করিলে এই অভাবের অনেকটা পূরণ করিতে পারেন। পল্লী বা বস্তির লোকদের সহিত একত্রিত হইয়া নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতালের সাহায্য লইয়া শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্র খোলেন তাহা হইলে আনাড়ী ও অশিক্ষিতা দাইয়েরা এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অর্থসংগ্রহ করিয়া ম্যাট্রনিটী ব্যাগ তাহাদিগের জন্য যোগাড় করিয়া দিলে তাহারা তাহার

পরিষ্কার যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে। আমাদের দেশে অনেক স্থানেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই। এই স্থলে সমাজ হিতৈষী মায়েরা নিজ বাড়ীতে সপ্তাহে দুই এক দিন করিয়া দুই এক ঘণ্টার জন্ত ক্লাস বসাইতে পারেন; সেখানে অশিক্ষিতা মায়েরা স্বাস্থ্য ও নবজাত শিশুদের লালন পালন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আধুনিক মহিলাদের সাধারণ কয়েকটা বিষয়ে অন্ততঃ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যেমন, সন্তান জন্মলাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা; ঐ সময়ে খাওয়াখাওয়া বিচার, রাস্তায় ফিরিওয়ালাদের নিকট হইতে ভেজালপূর্ণ খাদ্য খাওয়ার বিপদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, জানলা দরজা খোলা রাখিবার উপকারিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অশিক্ষিতাদের সহিত সৌহার্দ স্থাপন পূর্বক এই সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সহজেই জানান যাইতে পারে। ভেজাল খাদ্য বিষয়ে এবং ড্রেন ও পায়খানার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা বিষয়েও কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী। ইহার প্রতিকার করিবার জন্ত জনমত সংগ্রহ ও বাদ প্রতিবাদ জানানও প্রয়োজন হইলে করা প্রয়োজন। এই সমাজ কল্যাণ কাজে প্রত্যেক খবরের কাগজের নিকট হইতেই সমর্থন পাওয়া যাইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়েই যেন ইহা করা হয়, ধর্মসাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর যেন কিছু না করা হয়।

বাড়ীর হলঘরে বা বাগানে পাড়ার গরীব-ছেলেমেয়েদের জন্ত কয়েকঘণ্টার স্থল করিবার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। স্বামীরা যখন অফিস বা কাজে এবং ছেলেরা বিদ্যালয়ে বাহির হইয়া যায় সেই অবকাশে দেশের গঠনাত্মক কাজ করিয়া দেশের কতবড় মঙ্গল সাধনই না সম্ভবপর। আমাদের ভিতরে যাহারা অবসরপ্রাপ্তা রহিয়াছেন-সকাল ও বিকাল এই দুইটা সময়ে তাঁহাদের বিশেষ কিছু করিবার থাকে না; তাঁহারা এই শ্রেণীর বিদ্যালয়কে অনেক প্রকার সাহায্য করিতে পারেন। আমাদের দেশে শিক্ষায়াতনের অভ্যন্ত অভাব। বাড়ীতে বাড়ীতে বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক এই অভাবের অনেকটা পূরণ হইতে পারে এবং রাষ্ট্রপুত্র কতকটা আয়াস পায়।

সাধারণ ভারতীয় রমণীরা নিজেদের ঘর দোরের সৌন্দর্যকে গর্বের বিষয় ভাবিতে শেখে নাই। মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর এমন বহু গৃহ আমাদের দেশে রহিয়াছে যাহারা দরিদ্রতার কারণে নয় কার্পণ্য-দোষে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অশিক্ষার অন্ধকারে বদ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের ধারণা টাকা জমানোই জীবনের কাজ। ইহাদিগকে শিক্ষা দ্বারা ঘর দোর আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করান যায় এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা যায়। কার্পণ্য দোষেও সমাজকে ত কম আবর্জনাপূর্ণ করা হয় নাই! শিক্ষাশূণ্য এই সকল গৃহ আলো ও হাসিতে স্তব্ধ হইয়া উঠিতে পারে।

সময় ও শক্তিতে কুলাইলে সমাজ সেবার ক্ষেত্র আরও বর্ধিত করা যায়; যেমন সামাজিক কুপ্রথা বিলোপ সাধন, বাল্য বিবাহনিবারণ, বিধবানির্ধাতনের প্রতিরোধ, যুবক যুবতীদের হিতকর কার্যা, সমাজ সংস্কারমূলক কাজ ইত্যাদি। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, প্রভৃতি আরও অনেক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেখানে সাধারণের সাহায্য অতীব প্রয়োজনীয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে রেডক্রস, নিখিলভারত মহিলাসম্মেলন, সেরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি, ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত অন্যান্য দেশের সমাজ সেবামূলক কাজের পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে। কাজের নিশ্চয়তা, সামাজিক নিরপত্তা, বার্তাক্যবয়সের পেনশান, বিধবাদের ভাতা, একাধিক শিশুর জন্ত নগদ টাকার সাহায্য, বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদের জন্ত বিনামূল্যে দুগ্ধ ও খাদ্য বিতরণ, শিশু পরিচর্যা, বিনামূল্যে সকলের জন্য চিকিৎসার সস্তে জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা, বার্তাক্য ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রবর্তন এবং স্বাস্থ্যকর আবাস ইত্যাদি গ্রেট ব্রিটেনে সরকারের করণীয় কর্তব্য। আমেরিকার সরকার প্রত্যক্ষভাবে এই সব কাজে হাত না দিলেও, সমাজসেবা মূলক কাজে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে এবং বাহির হইতে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে ব্যক্তি বিশেষে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি সচেতন হইয়া থাকে। ব্যক্তি বিশেষ বা সম্ভবদ্বন্দ্ব প্রচেষ্টার সমুদয় ইতিহাস পুস্তকাকারে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যাহাতে জনসাধারণ

সকল প্রকার প্রগতি-মূলক প্রচেষ্টার সহিত পরিচিত হইতে পারে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই হে, সমাজসেবা মূলক কাজের অর্থ হইতেছে, জীবনকে সুন্দর ও সহজ করিয়া গড়িয়া তোলা। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, শুধু নিজের জন্য নয়, অন্য দশ জনের জন্যও আমরা কতটুকু করিয়াছি—যাহাতে দেশের ও সমাজের মঙ্গল হইতে পারে। গঙ্গায় স্নান বা পূজা অর্চনার ভিতর দিয়া কতটুকু পুণ্য অর্জন করা যায় জানি না, তবে ইহা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি যে যে দেশে কোটি কোটি নরনারী অনাহার ও অশিক্ষার পেশনে পিষ্ট, সেখানে সমাজ সেবার দ্বারাই প্রকৃত ধর্ম অর্জন করা যায়,

এবং আমাদের হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও অপরাপর সকল ধর্মের মূল কথা “দেব পরম ধর্ম”। আমাদের বেদান্ত ও দর্শনের শিক্ষাও এই যে, প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারাই অক্ষয় স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। আমাদের রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র—প্রতিটি মানুষের উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের উন্নতি ও মঙ্গল। নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের পার্শ্বই ভাইবোনদের জীবনে আশার আলো জালিয়া তুলিতে সচেষ্ট হওয়া প্রধান কর্তব্য।*

* রজত জয়ন্তী উৎসবে ‘সমাজ-সেবা’ সম্মেলনে শ্রীমতী পদ্মিনী সেনগুপ্তার প্রেরিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ—অনুবাদ করিয়াছেন—শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ।

মহাত্মাজী স্মরণে

সরোজ নলিনী ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রবৃন্দ

জাতির জনক মহামানব মহাত্মাগান্ধী ১৯৪২ সালের ৩০শে জানুয়ারী আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। জাতির পিতার হত্যা এখনও আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে। যে জ্যোতিষিক আমাদের নানাবিধ দুর্যোগ অতিক্রম করিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহার অভাব আজ আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

পৃথিবীতে যত মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধীজী তাঁহাদের অন্যতম। বুদ্ধদেব, খৃষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন সকল ধর্মমতের প্রচারক। গান্ধীজীর জীবনে অহিংসাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। এই অহিংসার মধ্য দিয়াই তাঁহার সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত সর্বপ্রকার উন্নতি করিবার ইচ্ছা ছিল, এবং যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন। আমাদের জাতির ভিতর নানা বিভেদ আছে, সেই ভেদাভেদ ভুলিয়া পরস্পরের মিলনই তাঁহার কাম্য ছিল।

কুটীর শিল্পকে গান্ধীজী অতি উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। কারণ অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে যাহা কিছু উন্নতি লক্ষিত হয়

তাঁহার মূলে ছিল এই কুটীর শিল্প। এহলে আমাদের সুদৃঢ় অভিমত এই যে আমরা স্বয়ং চেষ্টায় যদি গ্রামের মতকর কুটীর শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে না পারি তাহা হইলে জাতির উন্নতি হইতে পারে না। অতএব কোন মত বাদের দ্বারা বা ব্যবস্থার আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়, ইহাই মহাত্মাজী প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। তাহাও আবার কয়েকজন কেবলমাত্র নাম সহী করিবার উপযুক্ত। কিন্তু দেশ শুধু কয়েকজনের নয়, সকলেরই জন্ত। এই জন্ত গান্ধীজী বলিয়াছেন বুনিয়াদি শিক্ষাই জাতির উন্নতির প্রকৃত পথ। শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার বিস্তার করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। চরকাই ছিল তাঁহার প্রিয় সহচর। তিনি তাঁহার অবসর সময়ে চরকা কাটিয়াই নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাই নিজ হাতে কাটা স্বতা হইতে খাদি প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতেন এবং সমগ্র দেশবাসীকে এইরূপে চরকা কাটিতে উৎসাহিত করিতেন।

এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন হয়। গান্ধীজী বলিয়াছেন গ্রামকে স্বীকার করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে। দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী

শেষে, কেন্দ্রীভূত সভ্যতায় শহরকেই স্বীকার করা হইয়াছে, গ্রামকে স্বীকার করা হয় নাই। ইহার ফল আমরা নিজেরাই আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এই কারণেই গ্রামের আজ এত অবনতি।

মহাত্মাগান্ধী আমাদের যে মহতী শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের জন্ত যে আদর্শাবলী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি আমরা এই শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্বৃত হই তবে আমাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী হইতে তাঁহার উপদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহার স্মৃতি ও বাক্যের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে আমাদের কার্য পরিচালিত হইতে না দিয়া রাজনীতি এবং তাঁহার প্রচারিত সমস্ত কার্য ও নিষেধ বিধির মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করি তাহা হইলে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন ও পূজা প্রকৃতই প্রতারণার কার্য হইবে। মহাত্মাজী ভারতবর্ষকে শুধু স্বাধীনতাই প্রদান করেন নাই, তিনি ভারতবাসীদের আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করিয়াছেন, ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীদের অন্তরে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। আজ কেন আমরা তাঁহাকে স্মরণ করি, তাঁহার প্রশংসা করি এবং সময় সময় তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলি? যে মহান আদর্শের জন্ত তিনি কাজ করিয়া

গিয়াছেন এবং যাহার জন্ত তিনি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিলেন তাহার বিষয় আমরা কতটুকু জানি? তবুও আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমাদের জীবন উৎসর্গিত করিতে পারিব।

তিনি এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং আমাদের কার্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন ইহা মনে ভাবিয়া আমাদের কার্য করা আবশ্যিক।

মহাত্মাজীর জন্ত এখন আর আমাদের শোক প্রকাশ করা শোভা পায় না। তিনি যদিও আজ ইহলোকে নাই তথাপি কে না জানে যে তাঁহার অমর কীর্ত্তি তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি সর্বদাই আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এই কথা মনে রাখিয়া আমরা যেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

জয়তু বাপুজী—

তোমার বিজয় বার্তা কোটাকণ্ঠে শব্দ হীন ফিরে;

ধনীর প্রাসাদ হতে দরিদ্র কুটীরে,—

কে বলে বা চিনি নাই? তব কীর্ত্তি ধ্বজা স্তম্ভহীন

কাঁপিতেছে লক্ষ বক্ষে মর্ম্মরিয়া চিরনিশি দিন।

হে রোমের যীশু, মক্কার রহিম, অযোধ্যার রাম

ত্রিধারা প্রেমের একরূপ ধারা—বাপুজী—

লহ প্রণাম!

মহিলা সমাচার

শ্রীমতী রমা মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সার্ভিসে প্রথম মহিলা

শ্রীমতী বাণী পাল চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়াছেন। নিম্ন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি একমাত্র মহিলা প্রার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রথম মহিলা সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইলেন।

বাণী দেবী ফরিদপুর জিলার মেয়ে। তিনি বেথুন স্কুলে

ও কলেজে শিক্ষাপাঠ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সজল পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন মহিলা কলেজ

শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসরের জন্ত ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। অশোকা গুপ্তা একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা। মোহাখালীতে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিশ্বস্ত নারীদের সাহায্য ও অপহৃত নারী উদ্ধারের কার্যে তিনি অত্যন্ত নির্ভীকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধির নোয়াখালীতে বাসের সময় অশোকা গুপ্তায় সেবাকার্য্য করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি স্বাধীনচেতা, নির্ভীক আই, সি, এস শৈবাল গুপ্তের পত্নী। তিনি শিক্ষার অনুরাগিনী।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্তী বাঙ্গালী ছাত্রী

বর্তমান বর্ষে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব জাহ্নুয়ারী (১৯৫০) মাসে ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীর মরিশ গাওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবর্তন সভায় কৃত্তিদের সহিত এম, এ পাশ করিয়া শ্রীমতী উমা দত্ত, উমা চৌধুরী, স্বরূতি মজুমদার ডিগ্রী গ্রহণ করেন।

কুমারী উমা দাস, স্বশীলা দেবীগুপ্ত, কুমারী ইন্দ্ৰা পাল কৃত্তিদের সহিত বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বি, এ-তে অনার লইয়া ইন্দ্রপ্রহ কলেজের ছাত্রী রমলা সেন, আভা বসু, নমিতা চক্রবর্তী, উষা ঘোষ, লিপিকা বসু, কল্যাণী, ঘোষ, লীলা চক্রবর্তী সুপর্ণা চক্রবর্তী, শ্রীতি সেনগুপ্ত, গীতা সরকার, মঞ্জুলা বসু, উমা গুপ্ত, বাণী বসু এবং ননকলিজিয়েট ছাত্রী রীতা মুখার্জি ও রেবা বসু পাশ করিয়াছেন।

বিশিষ্ট মহিলাসংবাদিকের মৃত্যু

মাদ্রাজের শ্রীমতী কমলা সাথিয়ানাথন গত ২রা জাহ্নুয়ারী পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। ১৮৯৮ খৃঃ তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় লইতে বি, এ পাশ করেন। এবং ১৯০১ সালে তিনি এম, এ পাশ করেন। তিনি প্রথম মহিলা মাদ্রাজ প্রদেশে এম, এ পাশ করেন। তাঁহার বিবাহ ডাঃ সাথিয়ানাথনের সহিত হইয়াছিল। ২৮ বৎসর বয়সে দুইটা সন্তান লইয়া বিধবা হন।

তিনি বিদ্যোদয় বালিকা বিদ্যালয় পদস্থ ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্ত সংস্থাপিত করেন এবং আমরণ শিক্ষাত্রুতী ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ ও অঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য থাকিয়া নানা গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র ও কন্যার শিক্ষার জন্ত বিলাতে বহু

বৎসর অবস্থান করেন। তিনি বিশ্ব-ওয়াই, এম, সি, এর কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন।

তিনি ১৯০১ সালে “ইণ্ডিয়ান লেডীস্” নামে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এই পত্রিকাটি ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড প্রবাস কালে এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনরায় প্রকাশ করেন এবং ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদনা করেন। তাঁহার এই কাগজে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয়।

তাঁহার অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক ম্যাকমিলন কোং ও লংম্যান এণ্ড সন্স প্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী পদ্মিনী সেনগুপ্তা স্নেহলিখিকা।

লেডী প্রতিমা মিত্রের শোক

ভারতের বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা লেডী প্রতিমা মিত্রের স্বামী স্বনামখ্যাত শ্রীর ব্রজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় ২৬শে জাহ্নুয়ারীতে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যখন সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণা উৎসবে নর-নারী ব্যাপ্ত তখন আলিপুরের এক নিভৃত কক্ষে লেডী প্রতিমা তাঁহার স্বামী বিয়োগ ব্যথায় কাহ্নর।

শ্রীর ব্রজেন্দ্রের জীবন নানা কষ্ট ও সাফল্যের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্তীছাত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, বাঙ্গলার ষ্টাণ্ডিং কাউন্সিল, অ্যাডভোকেট জেনারেল, ভারত সরকারের “ল” মেম্বর, ভারত সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল হইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া বরদার দেওয়ান হন। তিনি ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা কমিটির সভ্যও কিছু কাল ছিলেন। ১৯৪৭ সালে কয়েক সপ্তাহের জন্ত বাঙ্গলার গভর্নর হইয়াছিলেন।

লেডী মিত্র মহোদয় অল্পদিন পূর্বে সরোজনলিনী রক্ত-জয়ন্তী উৎসবের নারী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে সভামেজীর পদ অলঙ্কৃত করিয়া কতসং উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোকে অসংখ্য আন্তরিক সহায়তুতি প্রাপন করিতেছি।

বেথুন কলেজের শত বার্ষিক উৎসব

বেথুন কলেজ ভারতের সর্বপ্রাচীন মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এক শত বৎসর পূর্বে বেথুন সাহেবের উদ্যোগে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহার অরণে গত ২৮শে ডিসেম্বর বিপুল আড়ম্বরের সহিত শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎসবের প্রারম্ভে শতজন প্রাক্তন ছাত্রী—অনেকেই ষাট বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক—শোভাযাত্রা করিয়া কলেজের অভ্যন্তরে গমন করিয়া বেথুন সাহেবের মর্ম্মর মূর্তিতে মালা প্রদান করেন। তাহার পর শত মহিলা প্রত্যেকেই মঙ্গল প্রদীপ হস্তে ধীর পদক্ষেপে শব্দ, বাদ্য, গীত মুখরিত প্রান্তর বাহিয়া সভামণ্ডপে গমন করেন। শোভাযাত্রার পুরভাগে সর্বপ্রাচীন শ্রীমতী শৈললতা চক্রবর্তী ছিলেন, এবং পশ্চাত্তাগে প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু ও মহারাণী সূচাক দেবী (ময়ূরভজ) প্রভৃতি বক্তারা ছিলেন।

ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের মেট্রোপলিটান রেভাঃ সি হাবক মহোদয় মঙ্গলাচরণ করিয়া উৎসব উদ্বোধন করেন, তিনি স্বাধীন ভারতের নারীগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা করেন।

বাঙ্গলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু এক শত বৎসরের জ্ঞী শিক্ষার ক্রমোন্নতির এক বিরাট প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন। তিনি বলেন, বাংলাই এবং এই বিদ্যালয়ই ভারতে ইংরাজ আমলে নারীদের শিক্ষার পথপ্রদর্শক এবং উচ্চ শিক্ষাদানের প্রথম প্রতিষ্ঠান। তিনি প্রার্থনা করেন বাংলার মেয়েরা ও এই বেথুন কলেজই স্বাধীন ভারতের জ্ঞী শিক্ষায় প্রধান নেতৃস্থান অধিকার করিবে। ছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে “বন্দেমাতরম্” জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। বিপুল শব্দ ও হর্ষধ্বনির মাঝে ময়ূরভজ মহারাণী শ্রীসূচাক দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

ডাঃ রাধা বিনোদ পাল শত বার্ষিক উৎসবের সভাপতি রূপে সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি বলেন এই বিদ্যালয়ের গৌরব প্রকৃষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তাহার এই জীবন্ত ছাত্রী মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা হইতে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ কালিদাস নাগ বলেন

জাতীয় স্বাধীনতা তখনই পূর্ণ হইবে যখন তাহার নারীজাতি শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে। বেথুন বিদ্যালয় সেই পথ অতীতে পরিষ্কার করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে।

শ্রীমতী তটিনী দান তাঁহার বেথুন কলেজের ছাত্রী, অধ্যাপিকা ও ১৩ বৎসর নিরবিচ্ছিন্ন প্রিন্সিপ্যাল থাকিবার কথা অন্তান্ত কথার সহিত নিবেদন করেন।

ভাইস চ্যান্সেলার চারুচন্দ্র বিশ্বাস বলেন বেথুন কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শত সহস্র নারী দেশে এক অপূর্ব চেতনা আনয়ন করিয়াছেন, ইহাতে স্বাধীনতা অনার্য্যসে লব্ধ হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ই আবার স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলার নারীদের তেমনই করিয়া গঠন করিয়া তুলিবে।

শ্রীমতী শান্তা দেবী (প্রাক্তন ছাত্রী প্রতিনিধি), বেথুন কলেজ বাংলার ছাত্রীদের হৃদয়ে তাঁহাদের যুগে বিরূপ স্থান লাভ করিয়াছিল সেই বিষয়েই প্রধানতঃ বলেন।

মহারাণী বলেন, আমার জীবন সেই অশিক্ষিত নারী সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত নারী মহলের ক্রমবিকাশ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। আজ আমার দেশের মেয়েদের সকল দিকে উন্নতি দেখিয়া আমি আমার জীবন সার্থ্য্যে নিজেই ধন্য মনে করিতেছি। বেথুন কলেজ ও মহামতি বেথুনই এই পরিব্রাজনের আধার। তাহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় পুলকে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে।

জনগণ মন অধিনায়ক সঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হয়।

কলিকাতায় মাদাম জোলিও কুরি

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রেডিয়াম দক্ষ ম্যাডাম জোলিও কুরি পুণায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদানের পর তিন দিনের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক ও স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যে প্রীতির রস ও জ্ঞানের আলোক বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা পরম উপকারী। কলিকাতার নাগরিকগণও তাঁহাকে সাদরে ও সম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

তিনি চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন এবং “শীলা ধর নাসেস হোঃ” এর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কলিকাতায় চিরস্মরণীয় হইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে ২২ অপর সারকুলার রোড

নিউ ক্লীয়ার ফিস্কল গৃহের দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রাচ্যের ও প্রান্ত্যের বৈজ্ঞানিকগণের প্রীতির বন্ধন চিরস্থায়ী হইল।

ম্যাডাম কুরিকে ইণ্ডিয়ান কালিটিভেসন অব সায়েন্স এসোসিয়েশন (ভারতের প্রাচীনতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ডাঃ মহেন্দ্রলালসকার কর্তৃক ৭০ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত) “জয় কিশন” স্বর্ণ পদক দ্বারা ভূষিত করেন। এই যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন ডাঃ মেঘনাথ সাহা। জয়তু ম্যাডাম জোলিও কুরী।

চিত্তরঞ্জন নগরে ইঞ্জিনকারখানা উদ্বোধনে বাসন্তী দেবী

২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বরণীয় দিন এই দিন। ভারত স্বাধীন সার্বভৌমিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইল। এই শুভ দিনে মিহিঝামের নিকট বাঙ্গলার বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনএর নামে নগর গড়িয়া উঠিতেছে সেখানে রেলের ইঞ্জিনপ্রস্তুতির এক বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন মাননীয়া বাসন্তী দেবী। চিত্তরঞ্জনের দাসের পত্নী বাসন্তী দেবীর হস্তে ২৬শে জানুয়ারী যে শুভাচরণ হইল তাহা স্বাধীন ভারতকে গৌরবময় ও জয়যুক্ত করিবে। বাসন্তী

দেবীর ভাষণ যেমন উদ্দীপক তেমনই কবিত্বপূর্ণ। তিনি অনুভূতাবশতঃ ভাষণ পাঠ করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহার বহু শ্রীমতী অপর্ণা দেবী সেই ভাষণ পাঠ করেন। আমরা এই কারখানার প্রধান কর্মকর্তা পি এন মুখার্জিকে এই অকুণ্ঠানে চিত্তরঞ্জনের পত্নীর নাম সংশ্লিষ্ট করিবার সুযোগ দেওয়াতে ধন্যবাদ দিতেছি।

পুরী বিধবাপ্রশ্রম

বিগত ৩রা ডিসেম্বর ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালচাৰী পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাপ্রশ্রম দেখিতে যান। আশ্রমের অধিবাসিনীরা তাঁদের তাঁতের স্বস্তে বোনা রেশমী চাদর গভর্ণর জেনারেলকে উপহার দেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর উপহারটি হাতে করিয়া দেন। পৌষ সংখ্যা বঙ্গলক্ষীতে তাহার ছবি বাহির হইয়াছে। গভর্ণর জেনারেল আশ্রমের কাজ দেখিয়া খুসী হইয়া আশ্রমের সাহায্যের জন্ত কিছু অর্থ দান করেন এবং মন্তব্য করেন—

The work and the worthy lady who has made it her life-joy deserve the worshipful admiration of all of us. I am filled with joy seeing this place.

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীস্বধাকান্ত দে

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের ইতিহাসে বিশেষ স্বরণীয় এক উজ্জ্বল দিন। স্বাধীন ভারতের রিপাবলিক কনষ্টিটিউশন ঐ দিন গৃহীত হইয়াছে এবং ভারতকে সার্বভৌম ক্ষমতা বিশিষ্ট স্বাধীন রাজ্যরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৯৩০ সালের ২৬শে-জানুয়ারী প্রথম স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য কংগ্রেস গ্রহণ করে। তাহা এইরূপ ছিল :—

“আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিধানের পূর্ণ সুযোগ

লাভের জন্ত অগ্রান্ত দেশের অধিবাসীদের দ্বারা ভারতবাসীদের ও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় অমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গবর্ণমেন্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নিধাতন করে তবে সেই গবর্ণমেন্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীদেরকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া

ভারতবর্ষকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও ধর্মনীতির দিক দিয়া ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গতান্তর নাই—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

“অর্থনীতির দিক হইতে ভারতের সর্বনাশ সাধন করা হইয়াছে। আরের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক গড় আয় মাত্র সাত পয়সা। আমরা যে গুরু কর-ভার বহন করিতে বাধ্য হই তাহার শতকরা ২০ টাকা কৃষকদের নিকট হইতে ভূমিকর স্বরূপ এবং শতকরা ৩ টাকা লবণের শুদ্ধ বাবদ আদায় করা হয়। এই শুদ্ধভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। হতা-কাটা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অস্বাভাবিক দেশের ছায় কোনও নূতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই—ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারি মাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হইতেছে এবং কুটির শিল্পের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে।

“বাণিজ্য শুদ্ধ এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে যে, তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রাপ্ত। বাণিজ্যশুদ্ধ ধার্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতহুই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুদ্ধ লব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণে ব্যয়িত না হইয়া একটা ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা বিনিময় নীতি আরও অধিক যথেষ্টাচারিতার পরিচায়ক, ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

“সভ্যতার দিক দিয়া বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃংখল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে সেই শৃংখলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি। মনুষ্যত্বের দিক হইতে বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদিগকে নিবীর্ণ করিয়াছে।

যে শাসন পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসন পদ্ধতির অধীনে আর মুক্তকালও

বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ধর্মের দিক হইতে অপরাধ বলিয়া মনে করি। একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃতই পন্থা নহে। সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সব প্রকার স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং কর প্রদান বন্ধ এবং অস্বাভাবিক উপায়ে নিকপত্র প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসার পথ অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং কর প্রদানে বিরত হই তবে এই অমূল্যবিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্বারা আমরা দৃঢ়পংকর করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেকোন নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিক ভাবে পালন করিব।”

তারপর প্রতি বৎসর কংগ্রেস ঐ ২৬শে জানুয়ারীতে এই সংকল্প বাধ্য গ্রহণ করিয়াছে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে। ইহার জন্য ভারতবাসী কত না দুঃখ কষ্ট, মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়াছে। তারপর একদিন ভারতবাসীর অহিংস সংগ্রাম সফলতা লাভ করিল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিল আপন অপেক্ষে হুই প্রাপ্ত ছিন্ন করিয়া। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রাত্রি ১২ ঘটিকায় ইংরেজ ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তানে পরিণত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালচারি ভারতের গবর্নর জেনারেল হইলেন এবং পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু প্রধান মন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন।

ইহার আগে ৩০ জন সভ্য লইয়া গণ-পরিষদ কায়েম হইল ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য (১৯৪৬ সালের ২ই ডিসেম্বর)। ইহার মোট ২ বৎসর ১১ মাস ৮ দিনে শাসন-তন্ত্র রচনার কার্য সমাপ্ত করিয়াছে। আইন সচিব ডকটর আম্বেদকার ইহা রচনার ও গণপরিষদে উপস্থাপিত করিবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে ইহাতে ৩২৫টি অনুচ্ছেদ ও ৬টি পরিশিষ্ট আছে। এই গণ-পরিষদের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৬৩,২৬,৭২৯ টাকা। কার্য সমাপ্ত হওয়া মাত্র গণ-পরিষদ গতাস্থ হইয়াছে।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই নব শাসনতন্ত্র জন্ম লাভ করিয়াছে। শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে, ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হইবে। মুখবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে, ভারতের জনসাধারণই এই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। শাসনতন্ত্র ইংরেজি ভাষায় রচিত এবং হিন্দি ভাষায় ইহার প্রামাণ্য অনুবাদ হইয়াছে। বাংলা প্রভৃতি ভাষায়ও অনুবাদ হইতেছে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের ভূমিকা নিম্নরূপ :—

“আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে সংগঠিত করিবার ও ভারতের সকল নাগরিকের জন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনবিচার,

“চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মমত ও উপাসনার স্বাধীনতা,

“সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগলাভের সমানাধিকার প্রদানের এবং

“ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠার পরিশ্রমে

“ভারতের জনগণের মধ্যে সৌজাত্যের উন্মেষের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিতেছি ;

“এতদ্বারা ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের ছাব্বিশে তারিখে আমাদের গণপরিষদে আমাদের জন্ত এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করা হইল।”

এই শাসনতন্ত্রে কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এগুলি দ্বারা উহার যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

“সমানাধিকার”

আইনের সমদৃষ্টি ও ভারতরাত্রে আইনের আশ্রয়ে সমভাবে থাকিবার সুযোগ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইবে না।

কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জাতি-পুরুষ ভেদ, জন্মস্থান বা উহাদের যে কোনো একটি কারণের জন্ত কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না।

রাষ্ট্রের অধীনে যে কোনো কার্যে নিয়োগ ও চাকুরীতে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে।

“অস্পৃশ্যতা”র বিলোপ-সাধন করা হইল। এবং যে-কোনো ভাবে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইল। অস্পৃশ্যতার দক্ষণ কাহারও উপর অযোগ্যতার আরোপ করা হইলে তাহা আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

সামরিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত রাষ্ট্র কোনো প্রকার খেতাব প্রদান করিবে না।

স্বাধীনতার অধিকার

সকল নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকার থাকিবে :—

(ক) বক্তৃতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

(খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশ

(গ) সমিতি ও সংঘ গঠন

(ঘ) ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধ পদচারণা

(ঙ) ভারত রাষ্ট্রের যে কোনো অংশে অবস্থান ও বসবাস

(চ) সম্পত্তি অধিকার, রক্ষা ও বিলি ব্যবস্থা

(ছ) যে কোনো বৃত্তি গ্রহণ বা জীবিকা, বাণিজ্য ও ব্যবসা চালান

আইন, দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি তাহার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ না জানাইয়া কোনো ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হইবে না.....।

শোষণ মুক্তির অধিকার

মহাত্মা ক্রম-বিক্রয়, বেগার প্রথা এবং অন্যান্য ধরণের বলপূর্বক শ্রম করাইবার রীতি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল ; এই বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক বালিকাকে কোনো কারখানা বা খনি বা অন্য কোনো বিপদসংকুল কার্যে নিয়োগ করা চলিবে না।

ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা

জনগণের শৃংখলা, নীতি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সকল ব্যক্তিরই বিবেকের স্বাধীনতা তথা ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মপ্রচার ও ধর্মপ্রচারের অবাধ অধিকার থাকিবে।

সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় অর্থ হইতে পরিচালিত কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হইবে না।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অধিকার

ভারতীয় রাষ্ট্র বা উহার কোনো অংশে বসবাসকারী নাগরিকগণের মধ্যে যে কোনো শ্রেণীর নিজস্ব স্থানিষ্ঠ ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার থাকিবে।

ধর্ম বা ভাষার দিক দিয়া সংলগ্নবিধি হইলেও সংখ্যালঘুদের সকলের নিজ ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

সম্পত্তির উপর অধিকার

আইন ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।”

ভারত ইউনিয়নের উপরাষ্ট্রসমূহ

ভারতকে কতকগুলি উপরাষ্ট্রের ইউনিয়ন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উপরাষ্ট্রগুলির কিকিৎ পরিচয় নীচে দেওয়া গেল :-

উপরাষ্ট্রের নাম	রাজধানী	আয়তন বর্গমাইল	লোক সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
১। আসাম	শিলং	৫৪,০৮৪	৭১,৭০,০০০	৭'১২ কোটি
২। বিহার	পাটনা	৭০,৩৬৮	৩,৭৭,০১,০০০	২৪ ,,
৩। বোম্বাই	বোম্বাই	১,১৫,৫৭০	৩,১৪,৬২,০০০	৪১ ,,
৪। মধ্যপ্রদেশ	নাগপুর	১,৩০,৩২৩	২,০৫,১১,০০০	১৮ ,,
৫। মাদ্রাজ	মাদ্রাজ	১,২৭,৭৬৮	৫,৩৩,৮৪,০০০	৪১ ,,
৬। উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	৫২,৮৬২	১,৩৮,৭৪,০০০	১৩ ,,
৭। পাঞ্জাব	সিমলা	৩৭,৪২৮	১,৪০,৫৪,০০০	২৩'২৬ ,,
৮। যুক্তপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	১,১২,৫২৩	৫,৯১,৪১,০০০	৫০ ,,
৯। পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা	২২,৪৭৬	২,২০,৬১,৪৫৩	৩৩ ,,
* ১০। হায়দরাবাদ	হায়দরাবাদ	৮২৩১৩	১,৭৩,১৭,০০০	১৬ ,,
* ১১। জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর	৮২,২৮৮	৪২,৭০,০০০	৪ ,,
* ১২। মধ্যভারত	গোয়ালিয়র	৪৬,৭১০	৭৫,৮২,০০০	১০ ,,
* ১৩। পাতিয়ালা ও পূর্বপাঞ্জাব	পাতিয়ালা	১০,০৯৯	৩৭,১০,০০০	৪ ,,
* ১৪। মহীশূর	মহীশূর	২৯,৪৫৮	৭৮,০০,০০০	১০'৭৭ ,,
* ১৫। রাজস্থান	জয়পুর	১,২৮,৪২৪	১,৩৮,১২,০০০	১০ ,,
* ১৬। সৌরাষ্ট্র	জামনগর	২১,৩৬২	৩৮,০২,০০০	৯ ,,
* ১৭। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন	ত্রিবাঙ্কাম	৯,১৪১	৭৪,১২,৮৯৩	১০ ,,
১ ১৮। বিজ্ঞাপ্রদেশ	রেওয়া	২৪ ৬০০	৩৭,৯০,০০০	২'৯০ ,,
১ ১৯। আজমীর	আজমীর	২,৪২৫	৭,০০,০০০	১'১৬ ,,
১ ২০। ভূপাল	ভূপাল	৬,৯২১	৮,০০,০০০	১'৩৬ ,,
১ ২১। বিলাসপুর	বিলাসপুর	৪৫৩	১,১০,৩৯৬	৬'৫ ,,
* ২২। কুর্গ	ঘরঘরা	১,৫৯৩	১,৬৮,৭২৬	৫'১ ,,
১ ২৩। দিল্লী	দিল্লী	৫৭৫	৯,১৭,৯৩১	১'৩৫ ,,
১ ২৪। হিমাচল প্রদেশ	সিমলা	১০,৬০০	১০,০০,০০০	১'৩২ ,,
১ ২৫। কচ্ছ	ভূজ	১৬,২২৫	৫,০০,০০০	৫'০ ,,
১ ২৬। মণিপুর	ইম্ফল	৮,৬৩৮	৬,০০,০০০	১'১৯ ,,
১ ২৭। ত্রিপুরা	আগরতলা	৪,১১৫	৬,০০,০০০	৫'৪ ,,
১ ২৮। আন্দামান, নিকোবর	পোর্ট ব্লেয়ার	৩,৬৪৬	৭,০০০	

উক্তর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মন্ত্রী সভা গঠন করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (পররাষ্ট্র ও বৈজ্ঞানিক)।

সহকারী প্রধান মন্ত্রী—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (স্বরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য)।

শিক্ষা মন্ত্রী—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

খাদ্যমন্ত্রী—শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম

শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী—ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অর্থ মন্ত্রী—ডাঃ জন মাধাই।

শ্রম মন্ত্রী—শ্রীজগদীবন রাম।

পুত্র, খনি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী—শ্রীনারায়ণ বিষ্ণু গ্যাডগিল।

বাণিজ্য মন্ত্রী—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী।

যোগাযোগ মন্ত্রী—জনাব রফি আশ্বেদ কিদেয়াই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী—রাজকুমারী অমৃতকুমারী।

আইন মন্ত্রী—ডাঃ ভীমরাও রামজী আশ্বেদকর।

যানবাহন ও রেলওয়ে মন্ত্রী—শ্রীগোপাল স্বামী আয়েদার।

ইহাছাড়া ৪ জন রাষ্ট্র সচিব ও ২ জন সহকারী সচিব আছেন।

রাষ্ট্র সচিব। শ্রীমোহন লাল সেকসেনা (সাহায্য ও পুনর্বাসতি)। শ্রী কে সান্তনম (যানবাহন ও রেলওয়ে)। শ্রীরাম চন্দ্র রজনাক্ষন দিবাকর (তথ্য ও বেতার)। শ্রীসত্য নারায়ণ সিংহ (পার্লামেন্টারি)।

সহকারী সচিব। শ্রীখুরসেদ খান (যোগাযোগ)। ডাঃ রামকৃষ্ণ কেশকর (পররাষ্ট্র)।

ভারতের প্রধান বিচারপতি—ডাঃ হীরালাল কানাইয়া

ভারতের অডিটর জেনারেল—শ্রী ভি, নরহরি রাও।

ভারতের প্রধান সেনাপতি—কে এম কারিয়ারা।

ভারত রাষ্ট্রের আয়তন ১২,২০,০৯৯ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৩ কোটি।

কলিকাতা কর্পোরেশন অনুসন্ধান সমিতি

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহশয়ের সভাপতিত্বে যে অনু-

সন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাঁর রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে। ইহার মর্ম আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। যে ব্যবস্থা ভবিষ্যতে অবলম্বন করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহা কতকটা আমেরিকার নাগরিক শাসন-ব্যবস্থার মত। শাসন ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখিয়া একজন নগর পাল (সিটি ম্যানেজার) এর হাতে দিবার প্রস্তাব আছে। পূর্ণ বয়স্কের ভোটে কলিকাতার পৌরসভার সভ্যগণ নির্ধারিত হইবেন, কিন্তু তাঁরা শুধু উচ্চ প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ করিবেন কিন্তু শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

ঢাকা ও কলিকাতায় হাঙ্গামা

বাগেরহাটে হাঙ্গামার ফলে কলিকাতায় ও কলিকাতার ফলে ঢাকায় যে সর্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির তৎসম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধ্যান করিয়া কর্তব্য স্থির করা দরকার।

উপদ্রবের সময় আমরা দেখিলাম, মানুষ কিরূপে পশুতে পরিণত হয়। কিরূপে উন্নত জনতার অংশরূপে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ নাগরিকও কাণ্ডজ্ঞানহীন অনপারজানোচিত কার্যে প্রবৃত্ত হন। লুটতরাজ, অগ্নিদান, নরহত্যা যেন মানুষের স্বাভাবিক কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার দৃঢ়হস্তে এই অরাজকতা ও বিশৃংখলা দমন করার বহুলোকের নিকট অপ্রীতি ভাজন এমন কি নিন্দিত হইয়াছেন। তাঁদের যুক্তি এই হিন্দুরা যখন অত্যাচারিত, হইতেছে, খনে প্রাণে বিধ্বস্ত হইতেছে, তখন মুসলমানদের ক্ষমা করিবার কোন কারণ নাই। আমরা এই যুক্তি সমর্থন করি না এবং মনে করি পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঠিকই করিয়াছেন। আমি নিজে ভুক্তলোপী। ঢাকায় আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা গুরুতর ভাবে গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁর শর তাঁহাদের আর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পশ্চিম বঙ্গের শত শত গৃহে কান্নার রোল উঠিয়াছে। তথাপি আমাদের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন না হয়। আমরা যেন হত্যার উত্তরে হত্যা, লুণ্ঠনের উত্তরে লুণ্ঠন না করি।

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

রক্ত জয়ন্তী উৎসব

১৯২৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে সমিতির ২৫ বৎসর পূর্ণ হয়। এই ২৫ বৎসরের ইতিহাস বহুলাংশে নারীপ্রগতির ইতিহাসের অংশ। এতদুপলক্ষে সমিতি ভবনে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির রক্ত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং মহিলাদের হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। রক্ত-জয়ন্তী উৎসব এক সপ্তাহ কাল প্রতিপালিত হয় এবং উহার পূর্ণ বিবরণী নিয়ে প্রস্তুত হইল।

১৪ই জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ন ৪টার উদ্বোধন সভা হয়। ময়ূরভঞ্জের মাননীয় মহারানী সূচাক্ষ দেবী মহিলা সম্মেলনের উদ্বোধন সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বর্জমানের মহারানী অধিরানী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ময়ূরভঞ্জের মহারানীকে উৎসবানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ জনাইয়া বলেন, বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকেও ব্যক্তি বিশেষ বা সজ্জ শক্তির চেষ্টায় ভারতীয় মহিলাসমাজ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

মহারানী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, মানুষ তাহার কীর্তির মধ্যেই অমর হইয়া থাকে, জীবনের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেলেই মানুষের মৃত্যু হয় ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না; সরোজ নলিনী এবং গুরুসদয় তাঁহাদের প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অমর হইয়া আছেন, মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সকল কিছু শেষ হইয়া গেলে মানুষের কাজে উৎসাহ থাকে না; বস্তুতঃ এই সব প্রতিষ্ঠানে স্থাপয়িতাগণের স্মৃতি, তাঁহাদের বিদ্যমানতা ও তাঁহাদের সভা পরবাস্তবগণ অনুভব করিতে পারেন।

অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ লাভে সন্তোষ প্রকাশ

করিয়া তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাকালেও তিনি ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন, জীবনের সন্ধ্যাকালে ইহার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। তাঁহার দেও ও মনের অমুহুতা সঙ্গেও উদ্যোক্তাদের আস্থানে তিনি ইহার স্মৃতির সহিত বিজড়িত থাকিবার আশায় চিরকাল ইহার মঙ্গল কামনা করিতে থাকিবেন।

রক্ত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া তারতের ভূতভূর্য গভর্নর জেনারেল ত্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালচাঁদ্রী বাজনার গবর্নর ডাঃ কৈলাশনাথ কাটক, ভারতের স্বাস্থ্য সচিব রাজকুমারী অমৃতকুমারী, ত্রিবাঙ্কুরের মহারানী, শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু মিসেস হংস মেহতা, এবং লেডী রমা রাও যে সব বাণী পাঠাইয়াছেন, সেগুলি পঠিত হয়। সমিতির মহিলা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর অমুহুতার জন্ত উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। এতদুপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি পাঠাইয়াছেন, তাহা সভার পঠিত হয়।

সমাজ সেবা সম্মেলন

উদ্বোধন কার্য্যারম্ভের পর এক সমাজসেবাসম্মেলন হয় এবং উহাতে মিসেস এস. সি. মুখার্জি, শ্রীযুক্তা বাসনা সেন, শ্রীযুক্তা ইসিতা চ্যাটার্জি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা পরিষদের স্বাস্থ্য আস্থায়ক মিস জেনি ক্রিষ্টেনসান, ডাঃ ফুলরেণু গুহ এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সঞ্জাতা রায় সমাজের কল্যাণ মূলক নানাবিধ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন।

১৫ই জানুয়ারী রবিবার—স্বাস্থ্য সম্মেলন

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় লেডী প্রতিমা মিত্রের সভানেতৃত্বে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বহু মহিলা শিক্ষাব্রতীর সমাবেশ হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সঞ্জাতা রায় সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্তা পরমল দাস, শ্রীযুক্তা লীলা মতিকা রায়চার্জি, শ্রীযুক্তা রাণী ঘোষ, শ্রীযুক্তা বাণী দাস, শ্রীযুক্তা

ফুলগেণ্ডু গুহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন, শ্রীযুক্তা পরিমল দাস আমেরিকার তাঁহার বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও সমাজ সেবা শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। শ্রীযুক্তা বাণী দাস অন্ধদের শিক্ষা সম্বন্ধে ও শ্রীযুক্তা গুহ বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্তা রাণী ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লীলা লতিকা ব্যানার্জি বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১৬ই জানুয়ারী সোমবার

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সরোজ নলিনী শিল্প ও ট্রেনিং বিভাগীয় ছাত্রীগণ কর্তৃক ব্রতচারী নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় এবং ডটায় ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু “সরোজনলিনী” বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে সহরের সহিত পল্লীর যোগাযোগ রক্ষা করিয়াই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। তাঁহার বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে বঙ্গলক্ষ্মীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই দিনের সভায় সমিতির সহসভানেত্রী শ্রীযুক্ত নীরপ্রভা চক্রবর্তী সভানেতৃত্ব করেন।

১৭ই মঙ্গলবার অপরাহ্নে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতির প্রতিনিধিদের মিলিত সভায় মহিলা সমাজ ও পল্লীর উন্নতিমূলক নানা বিষয়ক আলোচনা হয়।

১৯শে বৃহস্পতিবার সকাল ৯।০ টায় সমিতির সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্তীর পরিচালনায় ‘প্রার্থনা সভা’ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা চক্রবর্তী স্বগীয়া সরোজ নলিনী দত্তের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করেন এবং প্রার্থনাস্তিক ভাষণে বলেন যে অল্প রয়সে সরোজনলিনী মারা গিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে কাজ তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আদর্শে সমস্ত নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ জানান।

অপরাহ্ন ৫।০ ঘটিকায় শ্রীমতী স্তম্ভজা হাক্দারের সভানেতৃত্বে “বার্ষিক স্মৃতি সভা” অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সভাপতি শ্রীচন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস একটি বক্তৃতায় সমিতির ইতিহাস এবং গত পঁচিশ বর্ষব্যাপী এই সমিতির কার্য কলাপের বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পঁচিশ বৎসর পূর্বে যে সমিতির

জন্ম হইয়াছিল তাহা যে ভবিষ্যতে আরও উন্নতিলাভ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মফঃস্বলে ও গ্রামে যেখানে মহিলাদের কোন পৃথক সামাজিক জীবন নাই, সেখানে এই সমিতির শাখাগুলি সংগঠনের মাধ্যমে মহিলাদের জীবনে অভূতপূর্ব জাগরণ আনিয়া দিয়াছে।

সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্তম্ভজা রায় সমিতির বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন, তার স্মরণীয়কালের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করেন।

সাধারণ সম্পাদিকার কার্যবিবরণী পাঠের পর লেডী সিংহ পুরস্কার বিতরণ করেন।

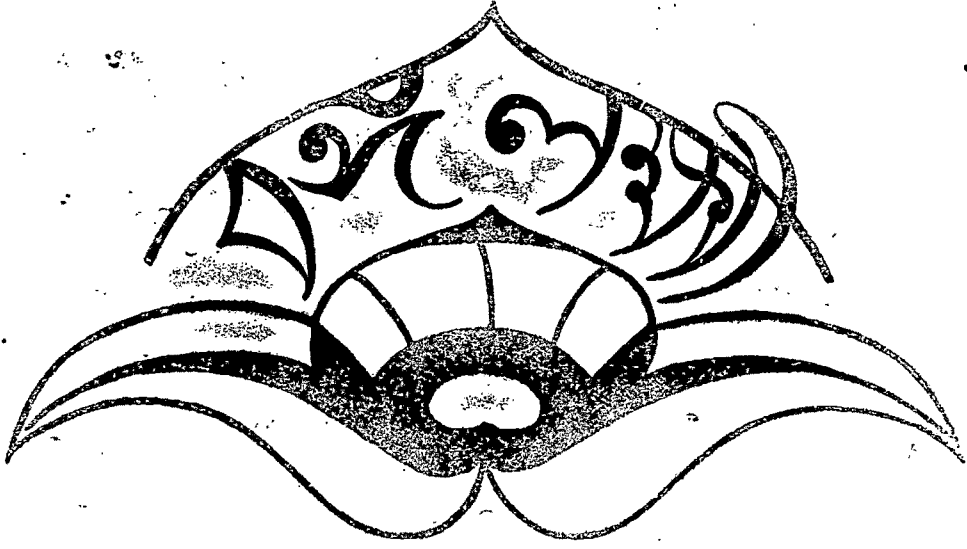
ইহার পর শ্রীমতী স্তম্ভজা হাক্দার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির জন্মের ইতিহাস এবং পরবর্তীকালের কার্যাবলী তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। সরোজ নলিনী দত্ত যখন প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে মেয়েদের মধ্যে প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে যে অনুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা আজ কল্পনা করাও দুঃসহ। সেদিন যাহারা সাহসিকতার সহিত সকল অনুবিধাকে অগ্রাহ্য করিয়া নারী উন্নয়নের কাজে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা অবশ্যই প্রশংস্য। শ্রীমতী হাক্দার আরও বলেন সরোজ নলিনী সমিতির মতো একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে; অন্যান্য প্রদেশেও ইহার শাখা বিস্তৃত হওয়া উচিত। উপসংহারে বলেন, সেদিন আর অধিক দূরে নহে যখন নারীরা শুধু নিজেদের দায়িত্ব আপন স্বক্ষে বহন করিবে না; তাহাদের পিতা, জ্ঞাতা, ও স্বামীর বহু দায়িত্বভারও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

শ্রীযুক্তা মনীষা রায় সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী স্তম্ভজা হাক্দার ও লেডী সিংহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২১শে, শনিবার—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সরোজ নলিনী শিল্প ও ট্রেনিং বিভাগদ্বয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের এক প্রীতি সম্মেলন হয়।

এতদুপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক নৃত্য গান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়।

নিম্নলিখিত সমিতি সমূহ প্রদর্শনীতে শিল্প দ্রব্য ও প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন।



২৫শে বর্ষ

ফাল্গুন—১৩৫৬

৪র্থ সংখ্যা

যুগান্তর শ্রীহেমলতা ঠাকুর

(১)

স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়বে এইখানে
ছুটেবে তারা জগৎজোড়া আলোর সন্ধানে
জ্বলবে মশাল তাদের হাতে, ভরবে আলোয় দিক ;
স্বাধীন তারা, জন্মের তারা জীবন্ত প্রতীক ।
সবার সাথে মিলবে তারা, 'সবার ভালো' পণ,
সকল কাজে মিলবে তাদের সবার সমর্থন ।
মনকে তারা করবে সহজ, সত্য, সরল খাটা
ভালোবাসায় ভিজিয়ে দেবে এই ধরণীর মাটি
ঐক্য যেথা, মধ্য যেথা, লক্ষ্য যেথা থির
মতভূমি স্বর্গ সেথা, আনন্দ গভীর ॥

(২)

চোর ডাকাতে মাটির তলায় চাপা সেথা রয়
গাছপাথরের সঙ্গে তাদের হৃদয় বিনিময়
পাথর তারা, কঠিন তারা, জড়ের জ্যেষ্ঠ ভাই
ফুলফোটারানোর ফলফলানোর শক্তি তাদের নাই ।
মানুষ হওয়ার ভাগ্যে তারা সদাই বিড়ম্বিত
মানুষ তারা নয় কতু নয়—মহা-নির্মিত ॥

(৩)

হিংস্রপশু ঘরের ঘারে হানা দিবে আসি
পদ্মপালে নিঃশেষিবে পাকা শস্তরাশি ।
আগুন শুধু, আগুন শুধু, জলন্ত আগুন
সামনে তাদের ধরবে তুলে বজ্রভরা তুণ ।
বনের পশু আলোক দেখে পালাবে ছুটি,
পতঙ্গদল বাঁপ দিবে তায় তরাসে লুটি ।
আগুন জেলে মানুষ তাদের তাড়াবে সম্বর
জঙ্গলে আর গর্তে তারা রবে অতঃপর ॥

(৪)

মানুষপশুর হানানানি, দুঃসহ দুর্দিন
সারাজগৎ যুচ্ছাগত, মানুষ সংজাহীন
প্রলাপ শুনি প্রমাদ গনি, দুর্বৃত্ত প্রলাপ,
মানব জগৎ বইছে শিরে প্রলয় অভিশাপ ।
রক্ষা কর, হে জননী, রক্ষা কর সবে ।
বিশ্বমানব বাঁপ দিয়েছে তপ্ত মহার্গবে ।
শান্ত বায়ু বহাও যাগো, জগৎ শান্ত কর,
নরক হতে স্বর্গপানে দৃষ্টি তুলি ধর ।
যুগান্তরের শেষে যারা থাকবে এ জগতে,
অমৃত পান করবে তারা আনন্দ সন্তোষে ॥

বাঙলা দেশে নারী আন্দোলনের গতি

অধ্যাপক নির্মলকুমার চক্রবর্তী

বর্তমান যুগে বাঙলা দেশের নারীকল্যাণমূলক অল্পষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে সরোজনলিনী-নারীমঙ্গলসমিতির স্থান অতি উচ্চ। ২৫ বৎসর পূর্বে অসহায় বঙ্গললনার দুঃখে ব্যাফুল-হৃদয়ে সরোজনলিনীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়া তাঁহার সার্থক স্মৃতিসৌধ গড়িয়া তুলিবার মানসে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের উৎসাহে ও চেষ্টায় এই সমিতি স্থাপিত হয়। ইহার রক্ততজস্বী উৎসব বর্তমানে অল্পষ্ঠিত হইতেছে। বাঙলা তথা ভারতের নারীহিতৈষীদিগের নিকট এই উৎসবের মূল্য কম নয়। নারীজাগরণের ইতিহাসে এই সমিতির দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

এই উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষে ও বিশেষভাবে বাঙলা দেশে নারীজাগরণের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করা অত্যন্ত হইবে না। দুঃখের বিষয় প্রাচীনতর যুগে সমাজে ভারতীয় নারীর স্থান এই বিরাট দেশের মহান ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। “স্ত্রীলোক যেখানে পূজিত, সেখানে দেবতার প্রসন্ন থাকেন”, এই মহাবাক্য যে দেশের স্বয়মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, সেই স্বপ্রাচীন ভারতবর্ষে নারী জাতির অবস্থার যে অধঃপতন বর্তমান যুগের অব্যবহিত পূর্বে দেখা গিয়াছিল, তাহা একান্ত ক্লেশকর। এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটাইয়া যে সকল মহাপুরুষ নারীকে পুনরায় তাহার সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা জনসাধারণের গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পাত্র।

বর্তমান যুগে নারীকে পুরুষের সহিত সমপর্যায়ে উন্নীত করিবার চেষ্টার প্রথম সূত্রপাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট কর্মপ্রচেষ্টায়। রামমোহনই এ যুগে প্রথম উপলব্ধি করেন যে, যে সমাজ নারীর মর্যাদারক্ষা করিতে পারে না, তাহার উন্নতি অসম্ভব। তিনি তাই তাঁহার উদার ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ভিত্তিতে জগতিত সমাজের চিত্র দেখিয়াছিলেন ও সেই সমাজব্যবস্থা

গড়িয়া তুলিবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সতী-দাহ নিবারণের জন্য যে প্রবল আন্দোলন তিনি আরম্ভ করেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে সমাজে নারীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দিবার বৃহত্তর আন্দোলনেরই অংশ। তাঁহার ‘প্রবর্তক নিবর্তক’র দ্বিতীয় সংবাদের নিম্নলিখিত অংশ হইতেই ইহা পরিস্ফুট হইবে :—“প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ, বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অল্পভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?...”

রামমোহনের পরে তাঁহার আরম্ভ কর্ম সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সফল পরিণতি লাভ করিতে থাকে। বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এই স্মরণীয় পরিবারের অবদান অনন্তসাধারণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণ সমাজসংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্মের বিভিন্ন বিষয়েই তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, মনীষা ও সাধুতার সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর, তাহাকে নারীকল্যাণ আন্দোলনের পরবর্তী প্রধান স্তম্ভ বলিয়া বর্ণনা করা যায়, জীবনের প্রথম পর্যায়ে মহর্ষি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সনাতন ব্রাহ্মণবংশের বিখ্যাত প্রতিনিধি-পরিচালিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন দেশে প্রগতির জোয়ার আনিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্নরূপ প্রভাবের ফলে দেশে সামাজিক চেতনার এক বিরাট উন্মেষ দেখা দেয়। ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়; পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ডিক্‌শনারি বৈখ্যন প্রভৃতি কতিপয়

মহামতি ইংরেজ সেবাত্রতীর প্রচেষ্টা ও দেশে নূতন ভাষাধারার প্রাধান্যের ফলে নারীজাতির অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাই আমরা দেখি যে, যে দেশের নারীরা অবরোধের অন্তরালে আপন শক্তি ও ক্ষমতাকে নীরবে অপচিত হইতে দিতেছিলেন, সেই দেশে ক্রমশঃ শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজসংস্কার, প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিকে ক্রমশঃ রমণীর আবির্ভাব হইতে থাকে। সাহিত্যে তরু দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রিয়দর্শনা দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, অরুণা দেবী প্রভৃতি সমাজ কল্যাণে কৃষকভাবিনা দাস, সরোজনলিনী দত্ত, মিসেস পি কে রায়, অবলা বসু, রাজকুমারী অমৃত কাউর ইত্যাদি, রাজনীতিতে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, সন্ন্যাসী দেবীচৌধুরাণী ইত্যাদি মহীয়সী নারী দেখা দেন। পুরাতন ক্ষীয়মাণ সভ্যতার ধ্বংসরূপ হইতে প্রগতিশীল সাম্য ও স্বাধীনতাবাদী নবসভ্যতার উদয় হইতে থাকে। বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যেই এই বিশ্বয়কর পরিবর্তন ঘটয়া গিয়াছে। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বালুকাস্তূপ ভেদ করিয়া প্রগতিমূলক ভাবধারা ধীরে ধীরে আপন পথ কাটিয়া লইয়াছে। নীতি হিসাবে নারী স্বাধীনতা এখন একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। নারীকল্যাণ আন্দোলনকারীদের পরম আনন্দের বিষয় যে আজ নূতন শাসনতন্ত্র এই মূল্যবান নীতিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়া ভারতে নারীজাতির মর্যাদার স্বায়ত্ত আদান রচনা করিয়াছে।

এই নারী আন্দোলন ইতিহাসের পটভূমিকায় সরোজনলিনী-নারীমঙ্গলসমিতির কার্যাবলী বিচার্য। পুণ্যাশীল সাধ্বী সরোজনলিনীর পরচুঃখকাতর হৃদয়ের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার জন্ত নারীর সর্বস্বার্থী মুক্তির সংগ্রাম লইয়া ১৯২৫ সালে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই সমিতির জন্ম হয়। গত ২৫ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান বাঙলা দেশে ও প্রতিবেশী প্রদেশসমূহে মহিলাদিগকে স্বাবলম্বী ও শিক্ষিতা করিবার তাহাদের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে কার্য করিয়া আসিতেছে। শুধু কতকগুলি কল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নহে, নারী জাতির মধ্যেই তাহাদের স্বীয় উন্নতি ও শিক্ষার জন্ত আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার দ্বারা তাহাদিগকে স্বাবলম্বী ও

আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া তোলা এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমগ্র দেশে এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত প্রায় এক শত মহিলা সমিতি মূল্যবান কাজ করিতেছে। ইহা ব্যতীত এই সমিতি নিম্নলিখিত কার্য করিতেছে : (১) বিভিন্ন গ্রামে ও নগরে মহিলা সমিতি স্থাপন ও পরিচালনার সাহায্য করা; (২) কলিকাতায় একটি আদর্শ শিল্প-বিদ্যালয় এবং একটি শিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং বিদ্যালয় পরিচালনা; (৩) পুণ্ড্রিতে একটি বিধবাস্রম পরিচালনা; (৪) সমিতির মুখপাত্র হিসাবে মহিলাদিগের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও (৫) দুঃস্থ মহিলাদিগের জন্য একটি শিল্পকেন্দ্র পরিচালনা।

মফঃস্বলের মহিলাসমিতিগুলি সম্পূর্ণ মহিলাদের প্রতিষ্ঠান। এই সকল সমিতি মহিলাদের দ্বারা গঠিত এবং কেন্দ্রীয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। মহিলা সমিতির বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে নানা প্রকার কুটীরশিল্প, বালিকা ও বয়স্কদের শিক্ষা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুচর্যা, স্বাস্থ্যচর্চা জনসেবা, সজীবগান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয় :—(১) সেলাই ও ছাঁটকাটের কার্য, (২) এম্ব্রয়ডারী, (৩) ড্রইং ও আল্পনা, (৪) কারপেট ও সতরঞ্চ বোনা, (৫) ঠকঠকি তাঁতে গামছা, ঝাড়ন, সকল প্রকার ছিট সাড়ী ও ধুতি ইত্যাদি প্রস্তুত, (৬) চামড়ার উপর নক্সার কাজ, (৭) জয়পুরী পিতলের কাজ, (৮) হাতকলে মোজা ও মাফলার প্রভৃতি প্রস্তুত, (৯) সেলাইয়ের কলের সাহায্যে এম্ব্রয়ডারী শিক্ষা (১০) সাধারণ শিক্ষা ও (১১) খেলনা প্রস্তুত। শিল্পশিক্ষা অবৈতনিক, তবে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য সামান্য বেতন লওয়া হয়। দুই বৎসরকাল শিক্ষালাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় পাশ করিলে “ডিপ্লোমা” দেওয়া হয়। অতঃপর আরও এক বৎসর থাকিয়া কোন ছুটি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া “বিশেষ ডিপ্লোমা” পাইবার ব্যবস্থা আছে।

বাঙলাদেশে ও বাংলার বাহিরে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির জীবনকাহিনী বিংশ শতাব্দীতে নারী আন্দোলন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিতেছে। নারীকল্যাণমূলক কার্যে এখনও অনেক অগ্রগতির অবকাশ আছে। এই সমিতির রক্ত-জষন্তী উৎসব বঙ্গনারীকে তাহার সামাজিক মর্যাদা ও উন্নতিলাভের প্রচেষ্টায় অধিকতর উৎসাহিত করুক সমগ্র দেশ অন্তরের সহিত ইহাই কামনা করিবে।

অজন্তা—ইলোরা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, এম, এ

সেকেজাবাদ পৌছেচি সবে মাত্র চৌদ্দ দিন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে বনলীর খবর এল। সেকেজাবাদ ছাড়ার আগে তিন দিনের ছুটি নিয়ে ২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ খৃঃ আমরা অজন্তা ও ইলোরার পথে যাত্রা করি। আওরঙ্গাবাদ সেকেজাবাদ থেকে ষট্টি বার চৌদ্দর রাস্তা। সেখান পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে, তারপর মোটরে অজন্তা ও ইলোরা যেতে হয়। মোটরে যেতে দু'পাশে যত দূর চোখ যায় কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়,—উঁচু আর নীচু—পৃথিবীর বৃকে যেন একসঙ্গে শত-শত টেউ জেগে উঠেছে। কোথাও বা খানিকটা একটানা সমতল জমি, পলাশ আর বাবলার মত একরকম গাছ শুধু চোখে পড়ে। আওরঙ্গাবাদ থেকে মোটরে একদিকে ষাট মাইল গেলে অজন্তার পৌছানো যায়,—আওরঙ্গাবাদ থেকে ভিন্নদিকে বাইশ মাইল গেলে ইলোরা। পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে, মাঝে মাঝে গভীর খাদ, সেখানে উপলব্ধি পাশে পাশে একটুখানি জলের রেখা; বর্ষার আগমনে এই ক্ষীণ জলধারাটিই যে একদিন উন্নত গর্জনে সমস্ত পার্বত্য ভূমিকে কাঁপিয়ে তুলবে আজকের এই নিরাবশুঙ্ক জলরেখাটির দিকে তাকিয়ে সেকথা একেবারেই অবিখ্যাস্য বলে মনে হয়। এরই পাশ দিয়ে আকাশের বৃক চিরে উঠে গেছে পর্বতমালা,—তার বৃক ঘেসে চলেছে আঁকা বাঁকা পথ—বক্ষিম হলেও সুগম,—লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা,—প্রাচীন যুগের পাথরের তৈরী পথের উপর নিজাম সরকারের সিমেন্টের প্রলেপ। অজন্তার বিশ্ববিখ্যাত গুহাগুলির কোলের ওপর এই পথ,—পাহাড়ের বৃক চিরে চিরে কোন্ স্মরণাতীত যুগে তৈরী করা হয়েছিল এই গুহাগুলি,—পর পর চলেছে গুহাঘর—সর্বসমেত ২৮২৯টি হবে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট গভীর, রুক্ষ, কঠোর,—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কঠিন বৈরাগ্যেরই যেন প্রতিচ্ছবি। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে (খৃঃ পূঃ ১ম বা ২য় শতাব্দীতে) ভগবান বুদ্ধের কোন্ শিষ্যের বৃকে জেগে উঠেছিল এই ইচ্ছা—হিংসার উন্নত কোলাহল মুখর পৃথিবীর থেকে দূরে বহুদূরে দুর্গম

নির্জন পর্বতের কন্দরে রচনা করবেন এক আদর্শ বৌদ্ধমন্দির—যার প্রতি গৃহে স্থাপিত হবে বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্তি, যার প্রতি প্রাচীর গায়ে অঙ্কিত থাকবে তথাগতের পুণ্যজীবনের সমস্ত চিত্রাবলী, জাতকের যত কাহিনী—যার প্রতিটি মূর্তির মধ্যে, প্রতি প্রাচীর মধ্যে যতবে ধর্মপ্রাণতা আর সৌন্দর্য, পবিত্রতা আর মাধুর্য, অরূপ আর রূপের অপূর্ব সমাবেশ।

অজন্তার প্রায় প্রতিটি গুহার অভ্যন্তরেই দেখা যায়—একটি চতুষ্কোণ হল ঘর—চারিপাশে নানা কারুকার্য করা পাথরের পিলার—তারি চারিদিক ঘিরে একটু উঁচু ভিত্তির ওপর ঘোরানো বারান্দার মত—সেই বারান্দার পর পাহাড়ের গা খুদে খুদে ছোট ছোট কুঠুরী,—এই কুঠুরীগুলিতে বসে বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা তথাগতের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন। হলঘরটি পার হয়ে সামনের দিকে একটি ছোট ঘরের মত,—তার মধ্যে স্থাপিত আছে ভগবান বুদ্ধের বিরাট মূর্তি—কখনও বা সমাহিত, কখনও বা উপদেশ দিচ্ছেন। অজন্তার অপূর্ব মহিমা গড়ে উঠেছে তার অতুলনীয় Fresco Painting কে ঘিরে। প্রতি গৃহের প্রতিটি প্রাচীর এবং প্রতিটি ছাদের গায়ে কি অপূর্ণ বর্ণের বিন্যাস,—কি স্নেহ শিল্পনিদর্শন—প্রতিটি মূর্তির প্রতিটি চিত্রের কি লালিত্য, কি কমনীয়তা, সজীবতা! আজকাল অনেক চিত্রের অনেক অংশই নষ্ট হয়ে গেছে—পুরোপুরি একটি চিত্র প্রায় নেই বলেই হয়,—ক্রমেই plaster খসে পড়ছে,—আর যা' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা' ঠিক আগের মত গড়ে তুলবার ক্ষমতা আধুনিক শিল্পীদের বোধহয় নেই। গাইডের মুখে শোনা—পাথরের গায়ে প্রথমে শটী, তারপর গোবর এবং তারপর চালের গুড়োর মত একরকম প্রলেপ দিয়ে plaster করা হয়েছিল,—তারই ওপর তুলির রেখায় রেখায় রূপ পেয়েছিল অপূর্ব বর্ণচ্ছটা! হুংহুং হয়, আরও অর্ধশতাব্দী বা এক শতাব্দী পরে অজন্তার এই অল্পমাত্র চিত্রাবলীর বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভাস্কর্যের দিক থেকে ইলোরা অজন্তার অনেক ওপরে। ইলোরায় চৌত্রিশটি ঘর আছে,—স্থাপত্যভঙ্গী প্রায় অজন্তার মতই,—তবে এখানকার মূর্তিগুলি যেন আরও কমনীয় আরও মাধুর্যমণ্ডিত। তিনটি বিভিন্ন যুগে—তিনটি পৃথক পৃথক ধর্মের শিল্পমহিমা স্থান লাভ করেছে ইলোরার বুকে। বৌদ্ধ মন্দিরটি সর্কাপেক্ষা প্রাচীন, গাইডের মুখে শোনা গেল কোন ভেল-রাজা নাকি এর গোড়াপত্তন করেন—স্থানীয় ভাষায় ভেল-অর্থ রাঁশ,—উক্ত রাজার রাজ্যে বোধহয় বাঁশের কিছু প্রাচুর্য্য থেকে থাকবে। এই ইলোরার পাশ দিয়ে অতীত যুগে নাকি মা জাহবীর একটি ধারা প্রবাহিত হ'ত—যাকে নাম দিয়েছিল ভেল-গঙ্গা,—ব্যাপারটা কিন্তু ভৌগলিক তথ্যের দিক থেকে তেমন বিশ্বাস্য নয়। ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যের দিক থেকে আমার বৌদ্ধমন্দিরটি সবচেয়ে ভাল লেগেছে। এরপর রচিত হয় জৈনমন্দিরটি,—জৈনদের সমস্ত তীর্থঙ্করদের মূর্তি পাহাড় খুঁদে খুঁদে রচনা করা হয়েছে,—বৌদ্ধমন্দিরের মত হলঘর—তারই চারিদিক ঘিরে মূর্তির পর মূর্তি সাজানো। তেমনই ছোট ছোট কুঠুরী সম্মাসীদের ধ্যানালয়,—ছাদের গায়ে চিত্রাবলী চোখে পড়ে,—অজন্তার চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—বড় বড় পদ্মের গায়ে উজ্জল বর্ণে প্রলেপ—কালের লাজনায় যার উজ্জল্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। সর্বশেষে রচিত হয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিল্পনিদর্শন—মন্দিরের গায়ে গায়ে কোথাও বা মহিমামন্দিরী উগ্র মূর্তি,

কোথাও বা গণেশজন্মনী বাৎসল্যের মহিমার স্নেহকোমলরূপ ধারণ করেছেন কৈলাসের স্নগদীড়ে কোথাও বা পূর্ববর্তী মহেশ্বরের আলিঙ্গনে আব্রাহারা! মনে হয় বৌদ্ধধর্মের সেই গৌরবময় যুগে,—যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রায় লোপ পেতে বসেছিল—তারই কিছু পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের কালে বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রভাবে এই মন্দিরগুলি গড়ে ওঠে। শিল্পীদের শৈবধর্মাবলম্বী হওয়াই স্বাভাবিক—মন্দির গাত্রে প্রতি মূর্তির মধ্য দিয়ে মহেশ্বরের মহিমাকে বড় করবার প্রয়াস রয়েছে। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্তি কোথাও কোথাও থাকলেও—কোনও কোনও মূর্তিতে দেখান হয়েছে যে তাঁরা শিবেরই অংশমাত্র। আরও আছে রাবণের মূর্তি যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ শৈব। ষোল নম্বর গুহাটি—হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব কীর্তি! সমগ্র পাহাড় কেটে বিরাট এক মন্দির গঠন করা হয়েছে—কী তার অপূর্ব ভাস্কর্য্য আর স্থাপত্যভঙ্গী! একটি বিশাল মন্দিরের সম্মুখে ছোট একটি মন্দির,—তার একদিকের প্রাচীর গাত্রে রামায়ণের যত কাহিনী—সমস্ত খোদিত হয়েছে—অপর প্রাচীর গাত্রে মহাভারতের সমগ্র চিত্র মূর্তিভাষে করেছে। সেই মন্দিরের পাশেই আছে আলোকস্তম্ভ,—খানিকটা ভেঙ্গে পড়েছে। স্থানীয় পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা। এই মন্দিরগুলির গায়ে রঙীন চিত্রাবলী আছে। গাইডের উক্তি এগুলি নাকি রাণী অহল্যাবাই এর আদেশে হয়েছিল।..... অজন্তাও ইলোরা পরিক্রমা শেষ করে আমরা ২৭শে মার্চ সেকেন্দ্রাবাদ ফিরি। সেদিনই সন্ধ্যায় লঙ্গো যাত্রা করি।

বাল-শিক্ষা

শ্রীমুজাতা রায়

বাল্যকাল-প্রথম ভাগের শিক্ষা

বাল্যকালের প্রথম ভাগের মধ্যে ৭ থেকে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের বিষয় গবেষণা করা হবে। প্রগতি হিসেবে ৭ ও ১১ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে তফাৎ অনেক। কিন্তু স্কুলের ভাগ আর বেশী বাড়ানো যায় না বলে এই চারটি বয়সের বালক বালিকাদের এক সঙ্গেই রাখতে হয়। একদিকে নার্সারি স্কুল (Nursery School) এর

এবং অল্পদিকে কিশোর কিশোরীদের শ্রেণীগুলি আলাদা করে দিয়ে, ৭ থেকে ১১ বৎসর বয়স্কদের আলাদা করে একটি ভিন্ন স্কুল করলে সেটা ভাল ভাবে পরিচালনা করা যায়।

আগেককার কালে মনে করা হতো যে এই বয়সটাতে ছেলে মেয়েদের শেখবার শক্তি এত বেশী থাকে এবং স্মৃতি শক্তি এত ভাল থাকে যে বা কিছু মুখস্থ করাবার এবং

অভ্যাস করিয়ে দেবার তা এই বয়সেই করতে হয়। এখন আর লোকে এরকম মনে করে না। এখন বলা হয় যে মনটা কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে না। সব সময়েই সক্রিয়। কাজেই তার ওপরে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নেওয়া চলে না। ছাত্রের মনকে সমস্ত ব্যাপারেই কৌতূহলী করতে হবে। সে নিজের থেকে উৎসুক হয়ে উঠলে তবেই তার বোঝা বহন করবার শক্তি হবে। জগৎটা ছাত্রের মনের কাছে কিভাবে প্রতিভাত হয়, ভাষার ব্যবহার বালক কিভাবে করে, কোন্ সাহিত্য তার চিত্তাকর্ষণ করে, কোন্ ভাব তার মনে বিশেষ করে উদ্ভিত হয়, এগুলি বুঝে তবে তাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। শৈশব-কালের এবং উত্তর বাল্যকালের বালকের মনের ভাব এবং এই বয়সের বালকের মনের ভাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সেগুলি না বুঝতে পারলে ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না।

কেনে কোন্ জিনিষ বাল্যকালে শিখতে হবে তা স্থির করবার সময়ে কোন্ কোন্ জিনিষ সে ব্যক্তিগত ভাবে শিখবার উপযুক্ত ভাবে হবে। তার পরে ভাবতে হবে সমাজের দিক থেকে কোন্ কোন্ জিনিষ সে শেখবার উপযুক্ত। এই দুই দিক থেকে চিন্তা করে তার পরে তার পাঠক্রম স্থির করতে হবে।

“এই বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য”

শারীরিক ও মানসিক ভাবে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত সংস্থিত (Stable)। সাধারণতঃ দেখা যায় এদের মধ্যে অস্থিরতার হার অপেক্ষাকৃত কম। (তা সত্ত্বেও স্থলে ভাল রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা সব সময়েই প্রয়োজন)। এই সময়টাতে ছেলে মেয়েরা শারীরিক কৌশল দেখাতে এবং নৈপুণ্য লাভ করতে বিশেষ চেষ্টা করে। নানা রকম জিজ্ঞাসিক কসরৎ দেখানো, যেমন পা উঁচু করে হাতের উপরে হাঁটা কিংবা রণপা নিয়ে দৌড়ানো এইগুলি করতে ছেলেরা বিশেষ ভালবাসে।

মানসিক দিক দিয়েও সে তার নৈপুণ্য দেখাতে এবং অস্ত্রের থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বিশেষ ব্যস্ত থাকে। শিক্ষক নানা কাজে তাকে উৎসাহিত করবেন এবং সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দেবেন যে একটা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব

লাভ করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, বরং অস্ত্রের মধ্যেও অনেক রকম গুণ আছে এটা বুঝতে পারলে তবেই সে তার নিজের গুণেরও ঠিক মূল্য বুঝবে। বালকের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমেই সে বুঝতে পারে যে তার নিজের মতের মূল্যই সব থেকে বেশী নয়। এ সময় তার সঙ্গীদের সঙ্গে একত্ববোধ বৃদ্ধি পায় এবং আগে সে যে রকম নিজের বিরুদ্ধ মত গুনলেই ক্রুদ্ধ বোধ করতো সে ভাবটা তার কমে যায়। সে অস্ত্রের মতামতের মূল্য বুঝতে শেখে এবং নিজের কাজের মধ্যে নানা রকম ক্রটি দেখতে পায়। তাতে করে হয়তো তার ব্যবহারে আগে যে একটা স্বাভাবিক ক্ষুণ্ণতা ও মনোরমত্ব দেখা যেত, তা দেখা যায় না। এই সময়ে শিক্ষকের খুব ধৈর্য্য সহকারে তাকে সাহায্য করা দরকার এবং তার মানসিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তাকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস পরায়ণ হতে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

এই বয়সে বালকের মধ্যে সংগ্রহ করবার বৃত্তি বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কড়ি, ঝিল্লুক, ছবি, টিকিট ইত্যাদি নানা রকম জিনিষ সে সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে সাজিয়ে রেখেও ঠিক ভাবে সন্নিবিষ্ট করে আনন্দ পায়। শিক্ষকের দেখতে হবে যে বালক এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় এবং শুধু সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট না থেকে এই কাজের থেকে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারে। যেমন ডাকটিকিট সংগ্রহ করার ফলে সে যেন নানা দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ভূগোলের পাঠকে জীবন্ত করতে পারে।

এই সময়টাতে বাঁহীরের জগৎ সম্বন্ধে ছেলে মেয়েদের ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়। শৈশবে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ বলে শিশু মনে করে। এই বয়সে বালক প্রাকৃতিক জগতের কার্য কারণের সম্বন্ধ, ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়াও যে হতে পারে তা বোঝে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের থেকে সে বোঝেই যে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই হয়, এটা ঘটবার জন্তে বিশেষ চেষ্টা করবার দরকার নেই।

শিক্ষার মূল নীতি হচ্ছে অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি করা। প্রকৃতির সম্বন্ধেও একথা যেমন খাটে মানুষের সম্বন্ধেও তাই। বালককে যদি মানুষের মন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হয় তবে তাকে অল্প মানুষের কাজ কর্মের অনুকরণ করতে

দিতে হবে। ইতিহাস ও সাহিত্যের থেকে মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান ছেলেরা লাভ করে তা ঠিক, কিন্তু অন্তর মনের ভাব ভাল করে বুঝতে হলে তাদের জীবনকে অভিনয় করলে তবেই ছেলে মেয়েরা সে সম্বন্ধে ভাল করে জ্ঞান লাভ করবে। নিজেদের ব্যবহার কার্যকলাপ যে অনেক অপরিণত তা তারা এই অভিনয়ের থেকে সহজেই বুঝবে।

সঙ্গীতনৈপুণ্য ও অন্যান্য ও দুই একটি নৈপুণ্য ছাড়া অল্প কোনও বিশেষ নৈপুণ্য এই বয়সে দেখা যায় বলে মনে হয় না। বালকের কোন বৈশিষ্ট্য যেমন—হস্তশিল্প, দেখা গেলে বুঝতে হবে যে সাধারণ ভাবেই বালকটি বিশেষ গুণী। শিক্ষকের মনে রাখতে হবে বালকের জগৎ যদি নানা সুযোগে পূর্ণ থাকে তাহলেই তার শক্তিগুলির ভাল ভাবে বিকাশের সম্ভাবনা হবে।

এই সময়ে ছাত্রদের কাজের বন্দোবস্ত Nursery School এর কাজের থেকে কিছু অল্প রকম হয়ে যাবে, কারণ ছাত্রেরা এখন অনেক সময়েই সম্ভবত্ব ভাবে কাজ করতে আরম্ভ করবে। তবুও ব্যক্তিগত ভাবে কাজ একেবারে বন্ধ করা চলবে না। অল্প কষা, নিজের মনে পড়া, বা আত্মপ্রকাশের কোন রকম প্রচেষ্টা বালককে ব্যক্তিগত ভাবে করতে দিতে হবে। কোন কোন সময় একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ না করে অথবা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কাজ না করে, দুই চারিজন এক সঙ্গে মিলে কাজ করলেও লাভ হয়।

ছেলে ও মেয়েদের এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হবে, না পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তাতে খুব বেশী কিছু আসে যায় না। সমান প্রতিভাশালী ছাত্র ছাত্রী দিয়ে শ্রেণীগুলি ভাগ করা অনেকের মতে সুবিধাজনক। আবার অনেকে বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করা ভাল মনে করেন (Hadow report on the Primary school Ch. V)।

এই বয়সের ছেলেদের দুই একটি বিষয় যেমন—গান, কলাবিদ্যা, ব্যায়াম ইত্যাদি ছাড়া বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের খুব বেশী দরকার হয় না। ক্রমশে ক্রমাগত ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন শিক্ষক আসা বরং এদের পক্ষে অসুবিধাজনক, দিনের বেশীর ভাগ সময় এক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই এই ছাত্রেরা

থাকলে ভাল হয়। তাই বলে স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কেউ থাকলে, এবং তাকে দিয়ে কোনও বিষয় খুব ভাল ভাবে শেখাবার পরিকল্পনা করা গেলে তা বন্ধ করার দরকার নেই।

“আত্মশাসন”

Nursery School এর ছেলেদের জন্ম স্বাধীনতার কথাই বেশী ভাবতে হয়। কিন্তু এখন সেই স্বাধীনতাকে কি ভাবে আত্মশাসনের পথে নিয়ে আসতে পারা যাবে সেই কথা ভাবতে হবে। স্কুলের কার্যক্রম, সকল দিক চিন্তা করে শিক্ষকেরই নির্দেশ করে দিতে হবে। কিন্তু সেই কার্যক্রম যাতে ঠিক ভাবে পালিত হয় তা দেখবার ভার ছাত্রদের উপরে দিয়ে দেওয়া যায়। কিছু সময় থাকবে যখন ছেলেরা শান্ত ভাবে ও মনোযোগ সহকারে কাজ করে যাবে, আবার কিছু সময় থাকবে যখন নানা রকম উৎসাহপূর্ণ কাজ চকল ভাবে করে নিজেদের দৈহিক শক্তির কিছু ব্যবহার ছেলেরা করতে পারবে। শিক্ষকের এতখানি ব্যক্তিত্ব থাকা প্রয়োজন যাতে এই সময়ের ভেতর দিয়েই তিনি ছাত্রদের আত্মসংযম শেখাতে পারেন।

“পাঠক্রম”

প্রাইমারী স্কুল কমিটি তাদের রিপোর্টে লিখেছেন এই বয়সের ছেলেদের পাঠক্রম ঠিক করতে বাইরের দিক থেকে তাদের কি শেখান দরকার তা ভাবলে চলবে না, ছেলেরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতার থেকে কি শেখবার উপযুক্ত সেই কথাই ভাবতে হবে। তাঁরা আরও বলেছেন যে জীবনের বা উদ্দেশ্য তা বালকের জীবনে যতখানি প্রতিভা হয় সেটা বুঝে দেখে তার চিত্তবৃত্তি এবং কল্পনাক্রম এমন ভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে সে আত্মোৎকর্ষ এবং আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শের কাছাকাছি যেতে পারে।

“জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পর্ক”

উপরি উক্ত ভাবে শিক্ষাকার্যকে দেখলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে বালকের প্রতিদিনকার জীবনী থেকে তার পাঠক্রম ঠিক করে নিতে। বালকের নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে যা আছে এবং পড়া ও শোনার মধ্য দিয়ে সে আরও যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে, তার ভেতর থেকেই

তার পাঠক্রম তৈয়ারী হবে। তার পারিপার্শ্বিক, তার পরিবার, তার সমাজ ও স্বদেশ, পৃথিবীর মানব সমাজ—এই সবই তার অভিজ্ঞতার ভেতর আসবে। কিন্তু তাই বলে জ্ঞানের মূল্য কমে যাবে না। যে অভিজ্ঞতার থেকে জ্ঞান লাভ হবে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যের সাহায্য হবে, সে অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই। এই জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে অনেক সময় তার বার বার পুনরাবৃত্তি করবার দরকার হবে; যোগ বিয়োগ ও গুণের নামতা শেখা এর একটি সহজ উদাহরণ।

“ভাষা শিক্ষা”

অভিজ্ঞতার প্রকাশের জন্য ভাষাকে উত্তরোত্তর আয়ত্তে আনা বিশেষ প্রয়োজন হয়। এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর স্থান ও কাল হিসাবে কিংবা কার্য কারণ হিসাবে কি রকম সম্পর্ক বালক যতই তা বুঝতে পারবে ততই তার ভাষার গঠনের নানা উন্নতি হবে। “কখন” “কোথায়” “কেন” “যদিও” “কিন্তু” ইত্যাদির ব্যবহার সে বুঝবে এবং নিজে করতে শিখবে। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বিষয় বস্তু নতুন ভাবে বালকের কাছে প্রতিফলিত হবে। বালকের মনের গতি এত দ্রুত চলতে থাকবে যে তাকে সব সময়েই নিয়মাবলী রাখা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি চেষ্টা করে যাবেন যে যতটা পারেন ভাষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং জীবন্ত করবেন।

“সঙ্গীত ও নৃত্য”

স্কুলের ছোট এবং বড়, সব ছেলে মেয়েদের জন্য সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা প্রয়োজন। প্রথম বাল্যকালেই ছেলে মেয়েরা এই বিদ্যার থেকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পায়, কারণ এখনও তারা বেশী লাজুক হয়নি অথচ খুব ছোট শিশুর থেকে পটুত্ব তাদের বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বয়সে খুব কঠিন কিছু শেখান উচিত নয়। সোজা জিনিষ ভাল করে আয়ত্ত করাই এখন প্রয়োজন। মনের নানা ভাবগুলি বালকেরা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সংঘত ভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং সমবেত ভাবে কাজ করাতে তাদের আনন্দ আরও বাড়ে। এই একই কারণে সমস্ত কবিতা আবৃত্তিও এই বয়সের পক্ষে ভাল।

“শিল্প ও কলা বিদ্যা”

পৃথিবীর অধিবাসীদের নানা রকম বাসগৃহ এবং কাজ কর্মের উপকরণ আংশিক ভাবে সভ্য জগতের মত করে তৈরী করা—এটা এই বয়সের ছেলে মেয়েদের খুব পছন্দের কাজ। অনেক সময়েই দেখা যায় যে তারা খেলার ছলে এই সব জিনিষ তৈরী করেছে। স্কুল ঘরের পরিসর কম, তা সত্ত্বেও বালকেরা ঐ কাজগুলি করবার যাতে সুযোগ পায় তা দেখতে হবে। নানা রকমের ছবি ও মডেল স্কুলে রাখা দরকার। প্রথম প্রথম উৎসাহ ও আগ্রহের পরিমাণ যতটা থাকবে নৈপুণ্য হয়তো ততটা থাকবে না; কিন্তু সময়ে নৈপুণ্য ও পটুতা যাতে বাড়ে সেই চেষ্টা করতে হবে। বালককে স্বাধীন ভাবে কলাবিদ্যা অন্বেষণ করতে দিলে তার বর্ণ, ছন্দ ও আলোচনের জ্ঞান সহজে এবং সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পায় তা ঠিক, কিন্তু নৈপুণ্য লাভও তার অগ্রতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্যের মধ্যে মানব জীবনের বিচিত্র কথা ও কাহিনী এই বালকেরা খুব ভালবাসে। জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, প্রাণীজগতের এবং শিশুজগতের নানা গল্প—এইগুলি খুবই আদৃত হয়। বালকেরা অতিরঞ্জিত বর্ণনা পছন্দ করে বলে ভ্রমিত হবার কারণ নেই। অসম্ভব ঘটনার তুলনার দ্বারা বালকেরা সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মূল্য বুঝতে শেখে। দূর দেশের এবং অতীতের গল্পের থেকেই স্বদেশের ও বর্তমানের ঘটনা তারা বুঝতে পারে।

“বহির্জগতের বৈচিত্র্য”

বাগানের মধ্যে কাজ করতে করতে বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বিশ্বব্যয় ঘটনা সম্বন্ধে বালকেরা বুঝতে শিখবে। সাধারণ জগতে যা ঘটে, যে রকম ফুটন্ত জলের ধোঁয়া, তার সঙ্গে জগতের অত্যাশ্চর্য ঘটনা যেমন আকাশের বিরাট মেঘ, এই সবের তুলনা করে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সব জিনিষের মধ্যেই কি রকম ভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। আমাদের চারিদিকে সব সময়েই অনেক রকম প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে : শিক্ষকের কাজ হবে তার থেকে কতগুলি ঘটনা বেছে নিয়ে বিজ্ঞানের মূল নীতির কতকগুলি শিখিয়ে দেওয়া।

“অঙ্কের জ্ঞান”

বালকের নিজের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে তাকে অঙ্ক শেখাতে হবে। অঙ্কশাস্ত্র একটি বিশ্লেষণ-বাচক শাস্ত্র (abstract)। এই শাস্ত্রের নীতিগুলি যৌক্তিকতা অনুসারে সাজানো থাকে, বালকের মানসিক প্রয়োজন অনুসারে থাকে না। কিন্তু শিক্ষকের কাজ হবে বালকের মনের গতি অনুসারে অঙ্কের নিয়মগুলিকে শিক্ষা দেওয়া। তার নিজস্ব জিনিষগুলির দাম, সে গুলির ভাগ ইত্যাদিতে তার মন সহজেই যাবে। সে নিজে কত দূর ইটিতে পারে, কতখানি লাফাতে পারে, কত ভারি জিনিষ তুলতে পারে ইত্যাদি ব্যাপারের তার কাছে মনে আছে। এই সব দিয়ে অঙ্ক দিলে ক্রমেই অঙ্কের নিয়ম সম্বন্ধেও সে চিন্তা করতে শিখবে এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে নিয়মগুলি আয়ত্তে আনতে তার আপত্তি হবে না।

“বুদ্ধির পরিমাণের তারতম্য”

স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অনেক রকম ছাত্রই পাওয়া যায়। কেউ বা খুব চালাক হয়, কেউ বা সাধারণ, আবার কেউ একেবারেই বোকা। কিন্তু দেখতে হবে যে প্রত্যেকেই তার নিজের শক্তির চরম ব্যবহার করতে শেখে। কেউ কম কাজ পারলেও কিছু আসে যায় না। প্রত্যেকে নিজের যথাসাধ্য কাজ করে যায়, তার থেকে একটুও কম করে না। এইটাই দেখতে হবে। এই জ্ঞান বেশী চালাক ছাত্রের বেশী কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। যে ছাত্র অল্প থেকে কম কাজ পারে তাকে তার কাজ কমিয়ে দিতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে যে সে যেন একটুও নিরুৎসাহ না হয়। ছাত্রের আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য। তাই বলে কাজের মধ্যে অসাবধানতা কোন রকমেই করতে দেওয়া চলবে না। বালক যে কোন কাজই করুক না কেন তার পূর্ণ মনোযোগ ও চেষ্টা দিয়ে করতে হবে। এ রকম ভাবে শেখালে লেখা এবং পড়া, স্বাস্থ্য, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যা সব জিনিষই সাধারণতঃ এখন যা শেখানো হয় তার থেকে বেশী ভাল করে শেখানো হবে।

আগেককার শিক্ষকদের থেকে বর্তমান কালের শিক্ষকদের

একটা বেশী সুবিধা হয়েছে যে তারা ছেলে মেয়েদের শিক্ষার পরিমাণ নানা রকমের টেবিল দিয়ে মাপ করতে পারেন। তাছাড়া নানা রকমের স্থলে নিজেরা গিয়ে এবং নানা প্রদর্শনী দেখে নিজেদের জ্ঞানের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে পারেন। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য শিক্ষকদের জ্ঞান, পাশ্চাত্য জগতের মত, মধ্যে মধ্যে Refresher course এ সব শিক্ষকদের আহ্বান করা।

“সাধারণ জ্ঞানব্যবিসয়ে জ্ঞান দান”

পাঠ্যক্রমের মধ্যে অনেক বিষয় থাকে যা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়—যে রকম শাস্ত্র, বাক্য, পৌরাণিক কাহিনী, ইতিহাসে উল্লিখিত বড় বড় লোকের জীবনী, ভূগোল্যের মূলতত্ত্ব, নিজের দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সকলের জ্ঞান বাতে গভীর হয় তার জন্য শিক্ষক সর্বদাই ছেলে মেয়েদের পৃথক ভাবে এবং দলবদ্ধ ভাবে উৎসাহিত করবেন। এই বয়সে ছেলে মেয়েদের পরীক্ষাতে ভাল ফল করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ছেলের বিশেষ শক্তি কোন দিকে আছে তা ঠিক করে বোঝবার সময় এখনও হয়নি। সেই জ্ঞান কোনও বিশেষ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করানো এখন উচিত না।

প্রত্যেকটা ছাত্রের শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে শিক্ষকের অবহিত হ’তে হবে এবং অল্পবুদ্ধি ছাত্রটির সম্বন্ধে যে রকম ভাবে ভেবে কাজ করতে হবে সে রকম অতিরিক্ত প্রথর বুদ্ধির ছাত্রকেও মানসিক ভাবে অলস হয়ে যেতে দিতে পারবেন না। কারণ তাহলে নিজের শক্তিকে বিকাশ করার সুযোগ পাওয়ার অভাবে তার শুধু মানসিক নয় নৈতিক অবনতিও ঘটবে। ওদিকে আবার অল্পবুদ্ধি ছাত্রটি সম্বন্ধেও শিক্ষককে খুবই সাবধান হ’তে হবে—যেন তার আত্মসম্মান জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তার মনে হ’তাশার ভাব যেন কখনও না আসে। তার কাজ করার এবং ইচ্ছাশক্তি বাড়ানোর জন্য শিক্ষক সর্বদাই সচেষ্ট থাকবেন। এই বয়সে ছেলে মেয়েদের সমস্যা শিশুদের সমস্যা অথবা অপেক্ষাকৃত বড় ছাত্রদের সমস্যার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই কথা মনে রেখে শিক্ষককে কাজ করতে

হবে।

মাতৃশিক্ষা

শ্রীলীলা মজুমদার

শুনেছি পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে চীনাভাষাই সব থেকে কঠিন, এবং চীনা অক্ষর-মালা নিভুল ভাবে লিখতে ও পড়তে শিখতে নাকি সাত বৎসর লাগে। তার কারণ চীনা অক্ষর আমাদের বাংলা বা ইংরাজি অক্ষরের মত এক একটি ধ্বনি বা আওয়াজের সংকেতমাত্র নয়। একটি চীনা অক্ষর ছোট একটি চিত্র এবং সেই চিত্রের একটি স্পষ্ট অর্থও আছে। এমন কি একথা অবধি শুনেছি যে অক্ষর—ছবিগুলির অর্থগুলিও নির্গুণ ও রসময়। এতদূর অবধি শুনেছি যে চীনা ভাষায় বগড়া শব্দটি লিখতে হলে তাঁরা আঁকেন ছোট একটি বাড়ীর ছাদ ও তার নীচে ছুঁজন স্ত্রীলোক। এক বাড়ীতে ছুঁ-স্ত্রীলোকের নিকট-বাস; কে না জানে তারই মানে বগড়া!!

আমাদের দেশের ছোট ছেলে মেয়েদের চৈনিক শব্দচিত্ররস-রহস্যের গভীরতার মধ্যে নামতে হয় না, কিন্তু তাদের পড়ার ঘরের স্থান পেতেছি চিত্রজগতের মাঝখানে। এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রথম পরিচয় হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে। শিশুর তরুণ চোখে সোনালি দিবালোকের আর তুলনা নেই। সবুজ গাছের পাতা, হলুদে প্রজাপতি, লাল জবা ফুল, মায়ের পরণে নীল সাড়ি, সমস্ত তার চিত্তকে লুপ্ত করে। জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টি চোখের পরিচয়, তারপর সময় মত গোটা জগৎটাকে দুই হাতে ধরে নিয়ে নেড়েচেড়ে, চেটে খেয়ে, বাজিয়ে, ঠুকে, বাকী চারিটি অতৃপ্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পরখ করে নেওয়া যায়। কিন্তু চোখ দিয়ে হল প্রথম পরিচয়।

এই প্রাথমিক নিয়মটি আমাদের পড়ার ঘরেও স্থান করে নেয়। “অ” বুলেই পরিচিত একটি অজগরের ছবি মনে পড়ে। “আ” বুলেই মানসচোখ দেখতে পায় গাছের পাতার মাঝে পাকা আম ঝুলে রয়েছে। “ই” শিখেই ইঁহুর ছানার জন্তু করণায় পূর্ণ হই। “ঈ” উচ্চারণ করলেই দেখতে পাই নীল আকাশে বিশাল ডানা প্রসারিত করে

ঈগল পাখী উড়ছে। কেবল প্রথমভাগের প্রথম পাতা থেকে কেন, অক্ষর পরিচয়ের বহু পূর্ব থেকেই যে মুহূর্তে শিশু কথা বুঝতে ও মনের ভাব কথায় প্রকাশ করতে শেখে তার মানস পটের উপর ছবির পর ছবি আঁকা ও মোছা হয়। “বেড়াল” বুলেই শিশু ‘মেনি’র চেহারা দেখতে পায়। ‘বাতি’ বুলেই ঘরের কোণের প্রদীপটির অলোক চিত্তাকাশে রেখাপাত করে। নতুন কথা শুনেই শিশু জিজ্ঞাসা করে “সে কী রকম?” অপরিচিতকে পরিচিতের ছবি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। বলে “মা, উট কী বোড়ার মতন?” অরূপকে ধারণা করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তার মানসলোক রূপ দিয়ে ভরা, তার শিক্ষার প্রথম বাহন তার কোঁতুলনী দৃষ্টি।

রূপ দিয়ে শিক্ষা শুরু হ’ল, কিন্তু এমন সময় আসে যখন শিশুকে তার পাজিপুঁথি নিয়ে গিয়ে অরূপের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। আমি যখন ছোট ছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে “আত্মা” বুলেই মনে হ’ত বড় গোছের একটা মোম-বাতি ধরণের জিনিষ। “ভগবান” বুলেই মনে হ’ত মেঘের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন সৌম্যদর্শন, নীল পোষাক পরা, দাড়ীওয়ালা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মন তখনও আমার অরূপের নাগাল পায়নি।

সে বয়সের ঐ রূপ-সর্বস্ব মানস জগতে মা’র কী কত ব্যা? প্রথম কথা, মা’র সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত রূপ জগতের রূপগুলির যেন বাস্তব-জগতের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে। মাতৃ-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিশুকে এই পৃথিবীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, তার জীবনে তাকে যেন নিজের দেহেরও মনের শক্তি ছাড়া আর কোনও অবলম্বন খুঁজতে না হয়। একথা শিশুপালনের কোনও পর্ধ্যায়েই ভুলে গেলে চলবে না। অতএব কল্পনাকে সংযত করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, কল্পনাশক্তি যেন রূপের কোঠায় এসেই থেমে না যায়। রূপের সীমার বাইরের অনন্তলোকের

মধ্যে যাকে বিচরণ করতে হ'বে, রূপের মোহ তাকে কাটাতে হ'বে। অতি অল্প বয়সেই অঙ্ক কষবার সময় শিশু এই নিদারুণ সত্যটাকে আবিষ্কার করে। নিরবলম্ব সত্যকে ধরতে তাকে বহু সাধনা করতে হয়। কিন্তু অবিলম্বেই রূপ ও অরূপের জগতে মেলা মেশা হয়ে যায়। যাকে চোখে দেখা যায়, আর মা'কে আঁজুলে গুণে তৈরি হয় তা'দের মধ্যে সখ্য স্থাপন হয়ে যায়। মানস জগতের যে যা'র যথাস্থান অধিকার ক'রে নিতে পারে। তখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে চিত্রের মূল্য কমে যায় না বরং বেড়েই যায়। সে তখন হয়ে পড়ে শিক্ষার এক মহাজ্ঞ। ভাষা যতদূর পৌছায় না, যেখানটা বর্ণনার অতীত, চিত্র সেখানে মনকে সহজেই নিয়ে যায়। শিক্ষার এই প্রথম পর্যায়েই চিত্রের এই ব্যবহার, বিশেষতঃ বিজ্ঞানজগতে, শিক্ষাদাতার প্রধান সহায়।

ছবি দিয়ে শেখান এত সহজ কেন? প্রথমতঃ ছবি, ভালো করে আঁকা ছবি, বিশেষতঃ রঙ্গীন ছবি, চিত্তকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে। যে সকল খুঁটিনাটি কেবলমাত্র ভাষার বর্ণনাতে মনকে এড়িয়ে যায়, ছবিতে সেগুলি ধরা পড়ে যায়। শিক্ষণীয় বিষয়টা সরস হয়ে স্বরূপ নেয়। শিক্ষার বস্তু আনন্দের সামগ্রী হ'য়ে দাঁড়ায়।

ছবির সাহায্যে শিক্ষাদানের এইটি হ'ল এক দিক। অপর একটা দিকও আছে। তার মূল্যও অসীম। শিশুর হাতে রঙ্গীন খড়ি ধরিয়ে দিয়ে তাকেও আঁকতে শেখাতে হবে। অনেকের ধারণা যে ছবি আঁকতে পারা একটা প্রকৃতিদত্ত বিশেষ গুণ, কার্যও আছে এবং বেশীর ভাগেরই নেই। কথাটা একেবারে সত্যি নয়। যেমন সকলেই কথা বলতে ও লিখতে পারে, তবে মহাকাব্য রচনা করতে পারে না, তেমনি ছবি আঁকতে সবাই পারে, তবে শিল্পী হওয়া সহজ নয়।

যা'র স্বাভাবিক বুদ্ধি এমন প্রত্যেকটি শিশু ছবি আঁকতে পারে এবং অধিকাংশই খড়ি হাতে পেলেই আফ্লাদে আঁটখানা হয়ে যায়। যাত্রা গোড়াতে আনন্দ পায় না, তাদের মধ্যেও অধিকাংশকেই ছুচারটে পোকামাকড় ও তাদেরও বাচ্চাটাকা আঁকবার পর দারুণ উৎসাহী হয়ে পড়তে দেখা যায়। প্রকৃতি-পরিচয় ব'লে একটা বিষয় আছে

শিশু শিক্ষাতে যা'র স্থান ক্রমশঃ নির্ধারিত হয়ে আসছে। গাছপালা ফুল ফল জীবজগতের সঙ্গে শিশুদের, পরিচয় দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। স্কুলে ছেলে মেয়েরা এই বিষয় চার্ট প্রস্তুত করে থাকে। অর্থাৎ বড় বড় কাগজে, খোপ খোপ টেনে নিয়ে হয় ত আঁকল যত শ্রেণীর ফল হয়, নয় আঁকল মশার জীবনকাহিনী। নয় ত' ভারতবর্ষের একটা প্রকাণ্ড মানচিত্র এঁকে দেওয়া হ'ল, তার মধ্যে আঁকল কোথায় কী জিনিস উৎপন্ন হয়। এই চার্ট প্রস্তুত করতে ছেলে মেয়েদের যেমন অপরিসীম আনন্দ ও উৎসাহ, এই চার্টের বিষয়বস্তুও তেমনি মনের মধ্যে চিরদিনের মত গেঁথে যায়। এমনি ক'রে চিত্র হয় বাস্তব শিক্ষার বাহন।

সব মা'রা পাঁচ ছ' বছরের ছেলে মেয়েদের স্কুলে দেন না, তাঁদের ছেলে মেয়েরা ঘরে বসে রঙ্গীন খড়ি দিয়ে স্বচ্ছন্দে চার্ট তৈরী করতে পারে। খেলা আর পড়া অভিন্ন হয়ে যায়। আঁকতে গেলেই বস্তুর অনাবশ্যক অংশটি বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয়টুকু গ্রহণ করতে শেখা হয়।

অনেকে ব'লে থাকেন আজকালকার শিক্ষা-প্রণালী কোমল শিশু-চিত্তের অল্পবয়সী, এত ছোট বয়সে এত শেখাবার প্রয়োজন কী? সেকালে ত' ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ছাড়া ওয়সে কিছু শেখান হ'ত না ইত্যাদি। কথাটা খানিকটা সত্য। যেই আমরা শিশুকে পু'থিগত বিদ্যা দান করতে শুরু করি, অমনি তাকে অনাবশ্যক শিক্ষার বোঝার নীচে চাপা দেবার আশঙ্কা থাকে। কতখানির প্রয়োজন আছে আর কোথা থেকে নিদ্বন্দ্ব ভাবে বর্জন করব সে একটা সমস্যা বটে। তবে পাঁচ বছরের শিশুর বিষয় একটা নিয়ম কুরা যায়, যে যা'র ছবি আঁকা যায় না এমন কোনও জিনিস শেখাব না।

ভেবে দেখতে গেলে ঐ বয়সের শিশু যেটুকু অঙ্ক শিখ'বে তার পর্যাপ্ত ছবি আঁকা যায়। যদি না যায় সে অঙ্ক শেখাবেন না। আস্তে আস্তে দেখবেন শিশুর মনের যেমন বিকাশ হতে থাকবে ছবি আর শিক্ষার বাহন হয়ে থাকবে না, তার একটা আত্মমুখিক ও সহায় হয়ে, অবশেষে পরিণতবয়স্ক ছাত্রের পড়ার বই থেকে এক ক্রমের দিনে ছবির সব অন্তর্ধান করবে। মন যখন ছবি আঁকতে শেখে হাত তখন ছুটি পায়। মনের যখন দৃষ্টি খুলে যায় চোখের তখন কাজ কমে যায়।

ছবি দিয়ে শিক্ষাদান করা শিক্ষার শেষ নয়, আরম্ভমাত্র। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সূত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে, পৃথিবীর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানেরও সহজ সূত্র ইন্দ্রিয়কেই বাহন করে। কেবলমাত্র শ্রবণ দিয়ে শিক্ষাগ্রহণের চেয়ে, চোখ দিয়ে দেখে, কাণ দিয়ে শুনে, হাত দিয়ে এঁকে শিখলে শিক্ষা কেমন সহজ হয়ে যায়।

পৃথিবীর মা'দের কাজ তখন শেষ হয়ে যায় ছেলেমেয়েরা যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। যে মা ছেলেদের চিরদিন পঙ্কু করে নিজের স্নেহের সেবার উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চায়, সে অযোগ্য মা। ঐ পৃথিবী থেকে নিজের হাতে যেন আমার ছেলে রূপরসস্বাদস্পর্শগন্ধ ও মানস দিয়ে সব সম্পদ আহরণ করে নিতে পারে। নইলে মা হ'লাম কিসে ?

আমার মোনোমামা

শ্রীপুষ্প দেবী

অনেকদিন আগেকার কথা। যখনই আমার বাড়ী যেতুম তখন সেখানকার প্রধান আকর্ষণ ছিল মোনোমামা। সে নাকি আমার নিজের মামা নয় মার পিসতুতো ভাই। কিন্তু তার কথা বলতে গেলে এই বালিকা এমন মুখর হয়ে উঠতো যে ঠাকুরদা একদিন বলেছিলেন, নিজের মামার সঙ্গে খোঁজ নেই, কোথায় মনু মামা মতি মামা তার গল্প শোন।

তখন আমার মায়ের ঠাকুমা বেঁচে ; সেরকম অগ্নিশিখার মত তেজস্বিনী মহিলা আমি আর দেখিনি। আজো আমার মনে তাঁর দেবীমূর্তি অন্মন হয়ে বিরাজ কচ্ছে। জানিনা তিনি শিক্ষিতা ছিলেন কিনা, কিন্তু মনের অমন উদারতা অমন প্রসারতা আজকের দিনে দেখতে পাইনা। পূর্ণ মাতৃস্নেহের দীপ্ত মহিমায় তিনি বিরাজ কর্তেন। তাঁর বিচারে তাঁর পক্ষপাতশূন্য মনের প্রসাদে কারুর মনে বিন্দুমাত্র অভিযোগ ছুঁত ছিলনা। নিজে খাটতেন সবচেয়ে বেশী, চাইতেন সবচেয়ে কম। সংসারে থেকে অমন তপস্বিনী আর চোখে পড়েনি। সেই সময় সেই বিরাট পরিবারের মধ্যে মোনোমামাকে দেখেছি। মোনোমামা আমার চেয়ে দশ বার বছরের বড়ই ছিল। কিন্তু তার প্রতি আমার বাৎসল্যের সীমা ছিল না। আমার তখন শিশু বয়স। একবারও ভাবতুম না আমি যখন বিদেশে বাবার কাছে থাকি তখন মোনোমামাকে কে দেখে ? মামার বাড়ী এলেই তার যাবতীয়

দায়িত্ব নিজের মনে করে কত কষ্ট যে মোনোমামাকে দিয়েছি তার অন্ত নেই। তারা ছিল চার ভাই। বোধহয় বছর খানেকের ছোট বড়। কিন্তু সেই ১৮১৯ বছরের ছেলের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত জিনিষ ছিল যা সচরাচর চোখে পড়ে না। সে যে ভায়েদের চেয়ে বড়, ছোট ভাইদের জন্তে এবং বাড়ীর সকলের জন্তে সবকিছু ছাড়তে সে সর্বদাই প্রস্তুত। তার মনের এই অপূর্ণ সম্পদ আমার শিশুমনকে আকৃষ্ট করেছিল। তার একটা অস্ত্রের ঘর ছিল। নানা রকম বড় বড় জীবজন্তুর ছাল তাতে সাঁজান, বাঘ কুমীর ভালুক নানা রকম। মাঝে মাঝে দেখতুম মোনোমামা একমনে বসে বন্দুক পরিস্কার করছে। কখনো কোন নতুন অস্ত্রের নানা পরীক্ষায় বাস্ত। কিন্তু কোনদিন তার কাছে শিকারের কাহিনী অবধি শুনিনি। বাড়ীর সকলে বলতো ওসব নাকি মোনোমামার শিকার করা।

মস্ত নামকরা জমিদারের ছেলে সে। দৈব দুর্বিপাকে মামার বাড়ীতে শিশুকালে ছিগ, তবে তাঁদের গলগ্রহ হয়ে নয়। এখন বুঝি হয়তো তাঁদেরই ঐখ্যে আমরা মামার বাড়ীর আদর আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেছি। প্রায়ই আসতো তাদের মহল থেকে লোক ভারে ভারে আম ছানা ঘোরাশি ঘাশি নিয়ে। নিরক্ষর সেই প্রজারা গলবস্ত্র হয়ে ঐ কিশোর ছেলেকে প্রণাম করে দাঁড়াতে। অত্যন্ত গভীর

ভাবে মোনোমামা তাদের সব খরচ নিতো। কারুর চোখের জল কারুর হৃৎকোষে মোনোমামা সহিতে পারিত না। তার অন্তর ছিল সত্যই কুসুমকোমল সত্যিকারের বীরের মতন। কখনো দেখতুম নানারকম বস্ত্রপাতি ছড়িয়ে চারভায়ের কাজের আর অন্ত নেই। বাগানের মধ্যে তাদের জালধোয়া ঘরে মোনোমামার হরিণ ময়ুর ভালুক এসব ছিল, একটা গরিলা জাতীয় জীবও ছিল। মোনোমামা আমায় বারেবারে সাবধান করে দিয়েছিলো, “ওর কাছে যেন তুমি যেওনা মায়ী, ও কামড়ে দেবে”। সেই গরিলাটার একদিন কি অসুখ হল। মোনোমামার আহাৰ নিদ্রা নেই সেই খাঁচার মধ্যেই দিন কাটে। পশুদের ডাক্তার এল, এল রাশি রাশি ওষুধ কিন্তু তার পার্জনামি আর থামে না। সে যত আর্জনাদ করে মোনোমামার মুখ তত গভীর হয়ে ওঠে। একদিন সকালে উঠে দেখি কই গরিলাটাতো আর চোঁচাচ্ছে না। নিশ্চয়ই সেরে গেছে। গিয়ে দেখি খাঁচার মধ্যে গরিলাটা মরে পড়ে আছে, পাশে খানিকটা জমা রক্ত। বাড়ীর সবাই বলাবলি করছে মোনোমামা নাকি তাকে গুলি করে মেরেছে। ও মোনোমামা বুঝি এমন করে শিকার করে? মনে একটা অদ্ভুত বিরূপ ভাব নিয়ে মোনোমামার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। গিয়ে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড। মেজ্ঞেতে বন্দুক পড়ে মোনোমামা পিছনায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লুম, কাঁদছো যদি তবে ওকে মাঁবলে কেন? মোনোমামা উত্তর দিলো, ওর যে বড্ড কষ্ট হচ্ছিল, ডাক্তারেরা যে বল্ল ও আর সারবে না। আমি যখন বন্দুক নিয়ে ওর ঘরে ঢুকলুম তখন ও নিশ্চিন্দি, ও ভাবতেই পারেনি যে আমি ওকে মারতে পারি।

ছপুর বারটা বাজলো, সেই একভাবে মোনোমামা চুপচাপ বসে। মার ঠাকুমা নিজে এলেন তাকে খেতে ডাকতে। মোনোমামা উঠে এলো। শুধু একবার বললো, কত বাঘ ভালুক তো মেরেছি দিদিমা, এমন কষ্ট কখনো হয়নি। কিন্তু উপায় কি? অবলো জীব ওর কষ্টটাও তো দেখতে হবে? এই দিনের ঘটনা আমার শিশু মনের মধ্যে একটা গভীর দাগ দিয়েছিল, মনে হয়েছিল আমার মোনোমামা সাধারণ নয়।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। জানিনা কোথা থেকে

একটা মস্ত বার্শিশ করা বাজ্র করে একবার রজনী পেনসিল মোনো মামা এনেছিল। অনেক নাকি দাম, দুর্লভও বটে। কোন দূর দেশ থেকে অর্ডার দিয়ে আনান। কদিন ধরে তার ঘরে দেখলুম অবিশ্রান্ত দলে দলে কিশোর তরুণদের আনাগোনা। সবাই কোতুহল ভরে নেড়ে চেড়ে দেখছে বাজ্রটা। আমরা প্রায়ই স্বল্প দিনের মেয়াদে আমার বাড়ী আসতুম। ফেরার দিনে গিয়ে দেখি মোনোমামা কি একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত। বল্লুম আমরা যাচ্ছি। ও তাই নাকি? বলে মোনোমামা আবার সেই লেখার ওপর হুঁকে পড়লো। মনেগনে বেশ খানিকটা অভিমান নিয়েই গাড়ীতে উঠলুম, পারলে বোধ হয় লেখার কাগজগুলো ছিঁড়েই দিতুম।

দিন কয়েক বাদে আমার নামে একটা পার্সেল এসে হাজির, তার মধ্যে মোনোমামার সেই মস্ত পেনসিলের বাজ্র, তাতে পুষীমায়ী লেখা। বলা বাহুল্য রাগ পড়তে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না—কিন্তু মোনোমামার অত সাধের স্মিথগুন্নির আমার হাতে পড়ে যে কি সদগতি হয়েছিল তা আজ মনে পড়ে না।

এর পরের বার গিয়ে দেখি মোনোমামার বিয়ে হয়েছে। বছর বার চোদ্দর ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে। একমাথা কালো কঁকড়া চুলের ওপর ঘোমটা টেনে নোলক পরা মুখখানি নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো। ছোটোখাটো তার কোতুহল বলকে উঠছে, ঠোঁটের কোনে অব্যাহা হাসি প্রাণ-পাণে দমন করে রেখেছে। দেখে মনে হয়েছিল একটা মাল্লুষের মধ্যে এতখানি প্রাণ প্রাচুর্য যেন দেখা যায় না। সবাই বলেছিল মোনোমামার বৌ নাকি খুব সুন্দর হয়নি। কিন্তু আমার মনে হল এমন সুন্দর আমি আর কোথাও দেখিনি। মামীমার ভীষণ ভাব হয়ে গেলো আমার সঙ্গে। না হয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু সেভাব সখিস্থের নয়। নির্বিকারিত্ব আমার সব দৌরাণ্য মেনে নিয়ে সেই হরন্ত মেয়ে আমার কাছে ধরা দিলো মা মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে। কিজানি কেমন করে হঠাৎ বড় হওয়ার মস্তুর সে শিখেছিল মোনোমামার কাছে। তাই এক এক সময় মনে হত বয়সে বেশী বড় না হলেও সে যেন আমার চেয়ে অনেক বড়। মোনোমামা যাকে ভালোবাসে তাকে না ভালো-

বেসে তারও যেমন উপায় ছিলনা—মোনোমামার বোঁকে না ভুলবাসাও তেমনি শক্ত ছিল আমার পক্ষে। সেযেন অসম্ভবই।

মামীমা ছিল বৈষ্ণব ঘরের মেয়ে, আর মোনোমামার ছিল ভগ্নানক মাছ মাংসে রুচি। এ নিয়ে দুজনে মাঝে মাঝে গভীর্ণতা ঘটতো তবে মতবিরোধ নয়। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা ছাঁতে আমরা ঘোর কলরবে পুতুল খেলতে ব্যস্ত; এমন সময় মোনোমামা এসে দাঁড়ালো হাতে একটা ব্রাউন রঙের ঠোঁড়া। মোনোমামা বললো, কিরে তোরা চপ খাবি নাকি? সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁড়া শেষ। এরপর থেকে প্রায়ই চপ আসতে লাগলো এবং তাতে সবচেয়ে আগ্রহ ছিল মামীমারই। এখনও মনে পড়ে এমনি করে ভুলিয়ে মাংসের চপ খাওয়ান জানতে পেরে মামীমার কি রাগ। মামীমা জানতো চপ মাঝেই মনমোহিনী মোচার চপ। সম্পূর্ণ বিভিন্ন বাড়ীর ছেলেমেয়ে হলেও সত্যকারের ভালো-বাসা তাদের মনে সান্না এনে দিয়েছিল। দুজনের মুখের সে স্নিগ্ধ হাসি একদিনও স্নান হতে দেখিনি।

তারপর আমার বিয়ে হয়ে গেল। আর মোনোমামারা চলে গেল তাদের জমিদারীতে। দেখাশোনা প্রায় বন্ধই বলা চলে। তবু মোনোমামার সে স্নেহ একদিনের জন্তু তিলমাত্র হ্রাস হতে দেখিনি। প্রত্যেক বছর আমার সময় স্ট্রেট ডেলিভারী করে মস্ত মস্ত আমার কাঁকা এসে পৌঁছত আমার শশুর বাড়ীতে। ভালো ভালো আমার ওপর পোটা অক্ষরে মোনোমামার নিজের হাতে নাম লেখা।

তার মনের আর একটা পরিচয় পাই একদিন। রাজ-দ্রোহিতা, অপরাধে তার এক ভাই বছদিন বন্দী ছিল। তার বালিকা বধুর জন্তু মোনোমামার কি ব্যস্ততা। একবার একবার শুনলাম মোনোমামা তার নাকি আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, বলছে ফুলশয্যে হবার আগে যে বন্দী হয়েছে তার আবার বিয়ে নাকি? বৌতো এখনো কুমারী।

শেষে সেই ভাতৃবধুর বোঁকেই সে বিয়ে বন্ধ হল। কিন্তু তাকে ভুলিয়ে রাখতে মোনোমামা যেন প্রাণমন বিসর্জন দিলো। কখনো শুনতুম বকুলের জন্তে ছবি আঁকার সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে। কখনো শুনতুম রাশি রাশি বই যাচ্ছে। সেই ক্ষুদ্র বধূকে বুক দিয়ে ঢেকে তার সবকিছু অভাব পূরণ করার জন্তে মোনোমামার চেষ্টার অবধি ছিল না। বকুল মোনোমামাকে বলতো বড়দা, মোনোমামা বকুলকে বলতো দিদি। দৈবদুর্ভাগ্যকে হৃদযন্ত্রবিকারে বকুল মারা গেলো। মোনোমামার জীবনে এল অদ্ভুত অবসাদ। সে আনন্দময় মূর্তি চিরদিনের মত স্নান হয়ে গেলো। মনে হল একসঙ্গে যেন বিশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে তার।

শুনলুম অদৃষ্টের পরিহাসে এর পরই নাকি মোনোমামার সেই ভাই মুক্তি পেয়েছে। বাড়ীর সবাই চেষ্টা করেছিল তার আবার বিয়ে দেবার। মোনোমামা হতে দেয়নি, বলেছে, নায়ে, আর পারি না। নিজে হাতে করে সে মেয়েটিকে পুড়িয়ে এসেছি, আর শাস্তি তোরা দিসনি আমার।

এরপরই মোনোমামা মারা গেল। বংশের দুঃস্বপ্ন ডার-বেটিস তাকেও ক্ষমা করেনি। তার ওপর বকুল বাবার পর থেকেই ওষুধ বিষুধ নিয়ম সবই সে ছেড়ে দিয়েছিলো। ঐ সময় মামীমার মুখ থেকে একদিন মাত্র অলুযোগ শুনছিলুম, শুধু দুটো মাছ ভাত খাই, তাও কি তোমার সহিছে না? গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মোনোমামা বলে-ছিল, সবইতো আমার জন্তে হাসিমুখে ত্যাগ করেছ। ঐটুকু ছাড়তে এত ভয়?

দীর্ঘ তিনবছর বাদে এবার মামীমাকে দেখলুম। তিরিশ বছর বয়েসেই চুলগুলো ধপধপে সাদা হয়ে গেছে। সেই বিদ্যুৎ চঞ্চলা মেয়ে যেন কী এক মস্ত্র প্রৌঢ়ের প্রাস্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন স্থির শান্ত নির্বীণোন্মুখ। প্রাণপণ বলে নিজেকে দমন করে তাকে প্রণাম করলুম। মনে মনে বললুম এর মধ্যে আমার মোনোমামা মিশে আছে। সেতো আমার হারায়নি।

দৌল পূর্ণিমা

শ্রীশান্তা দেবী

এমন সময়ে এবার দৌলপূর্ণিমা দেখা দিচ্ছে যে উৎসবের কথা বলতেই সঙ্কোচ হয়। তবু দিনটা যখন এতকাল ধরে পালিত হচ্ছে তখন তার বিষয় কিছু একটু বললে খুব অশোভন হবে না। দৌলপূর্ণিমা ভারতের একটি বিশেষ উৎসবের দিন। শীতের শেষে বসন্তের আবির্ভাবে সকল দেশেই মাহুঘের মনে উৎসবের ইচ্ছা স্বভাবতই জাগে। উৎসব যদি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে দেখা না দিত, তাহলে মাহুঘ দৈনিক উপার্জন আর খাওয়া পরার চক্রের বাইরে সহজে আসতে পারত না! উৎসবই সাধারণ মাহুঘকে সংসারের বাইরে পাঁচজনের মধ্যে টেনে আনে, খাওয়া পরা আর ঘরোয়া রোগ শোকের উপরে জগতে যে আর কিছু আছে তা মনে পড়িয়ে দেয়। এই জিনিষটা যখন মাহুঘ বুঝতে শেখে, তখন জীবনে উৎসবের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়ে তোলে। বার মাসে তের পার্বণ তাই দেখা দেয়। অবশ্য সব উৎসব একরকম নয়। কোনো উৎসবে মাহুঘ পাঁচ জনকে দিয়ে আনন্দ পায়, দৌলের মত উৎসবে আজকাল পাঁচজনকে নাকাল করেও মাহুঘ আনন্দ পায়।

দৌলপূর্ণিমা চৈতন্তদেবের জন্মতিথি বলেও এর একটা অগ্র বিশেষত্ব আছে। উন্মত্তভাবে রং খেলার চেয়ে এই বিশেষত্বের দিকে বাঙালীর মন যদি আরও একটু যেত ভাল হত। আমরা বাঙালীরা শ্রীচৈতন্তের জাত ভাই বলে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু তাঁর বিষয় বিশেষ কিছুই জানি না। কিছুকাল আগে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন চৈতন্ত-লীলার নানা ছবি আঁকতেন তখন তবু শিক্ষিত মাহুঘের চোখের সামনে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ছবিরূপে দেখা যেত, আজকাল সে সব ছবিরও আদর নেই।

যাই হোক শ্রীচৈতন্তের জীবনের সামান্য কয়েকটি কথা আজ বলব। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ নৈরায়িক পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু ভক্তিদর্শনের প্রতি সেইসব পণ্ডিতদের বিশেষ অস্বরাগ ছিল না। এই সময়

জগন্নাথ মিশ্র নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীহট্ট হতে নবদ্বীপে এসে বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র ও তাঁহার পত্নী শচী দেবীর আটটি কন্যার শৈশবে মৃত্যুর পর নবম সন্তান বিশ্বরূপের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান। শচীদেবীর দশম সন্তান কান্তন পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রহণের সময় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐর নাম রাখা হয় বিশ্বস্তর। তাঁর ডাক নাম কিন্তু ছিল নিমাই এবং গৌর। তাঁর সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্য ছিল, তাই গৌরান্দ নাম। গৌর অল্প বয়সেই বড় পণ্ডিত হন। এবং সে বিষয়ে তাঁর অহঙ্কারও ছিল যথেষ্ট, তাই অপরকে তিনি ছোট মনে করতেন। প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর তিনি বিফুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে গয়ায় তীর্থে গিয়ে তিনি ঈশ্বর-পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরী যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ছিলেন তাঁরাই সন্ন্যাসীদের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রবর্তন করেন। ঐর শিষ্যত্বে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে গৌর ভক্তি ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তি বিষয়ে বেশী কথা বলার সময় আজ-নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির প্রকাশ দেখে ক্রমে নবদ্বীপের বহু লোকে তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলতে লাগলেন। তিনি দেশে হরিনাম কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনের মিছিল আরম্ভ করলেন। বহু পাষণ্ডী(অবিশ্বাসী)কে নাম গানে দীক্ষিত করতে পারলেও নিমাই পণ্ডিতদের ভক্তি করে তুলতে পারেন নি। এই এই পণ্ডিতদের হৃদয়ে ভক্তি জাগাবার জন্যই নিমাই হতাশ হয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তাঁহার নাম হয় কৃষ্ণচৈতন্ত। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ছয়বৎসর তিনি উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভক্তিদর্শন প্রচার করে বেড়ান। পরে ত্রিশবৎসর বয়সে তিনি পুরীতে বাস আরম্ভ করেন। এখানে বহু ভক্ত ও শিষ্য তাঁর দর্শনে আসত। ভক্তি ধর্মের উদ্ভাদনা জীবনের শেষের দিকে তাঁকে এমন মতিতে রাখত যে নিজের

প্রাণের কথা তাঁর মনেই থাকত না। তিনি কখনও সমুদ্রে বাশপ দিয়ে পড়তেন, কখনও মাটিতে অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ে থাকতেন। এইভাবে প্রেমসাধনার মতো ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ঠিক কি ভাবে যে তাঁর মৃত্যু হয় তা জীবনীলেখকরা স্পষ্ট বলেন নি।

বৈষ্ণবধর্মের প্রচারই শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান কাজ। ভক্তি ও প্রেমই তাঁর জীবনের সাধনা ছিল। সে প্রেম শুধু কৃষ্ণের বা ভগবানের প্রতি প্রেম নয় জীবের প্রতিও প্রেম। সেই প্রেম হ'তে ক্রমে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মত্ত-মাংস ত্যাগ, পশুবলি নিবারণ ইত্যাদি এসেছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে নবদ্বীপে শাক্তপ্রথাই মেবীকে মত্ত-মাংস অর্ঘ্য দেওয়া এবং পরে সেই প্রসাদ গ্রহণ করা মহোৎসাহে চলত।

আজ বাংলাদেশ বৈষ্ণবপ্রধান দেশ শ্রীচৈতন্যের জন্মই। লোকে বলে বাঙালী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বলে প্রেম ও বিনয়কেই সব চেয়ে বড় বলে দেখেছে। সে কথা আজ কতটা সত্য বলা অবশ্য শক্ত। তবে একথা সত্য যে বর্তমান যুগে গান্ধীজির পূর্বে বাংলাদেশই ভারতের সর্বত্র ভগবৎপ্রেম ও অহিংসার কথা শ্রীচৈতন্যের মুখে প্রচার করেছে। বাংলার বৈষ্ণব এবং কবিরাই এই ভাবধারা কিছুদিন রক্ষা করে চলেছিলেন। আধুনিক বৃন্দাবন, তাহার মন্দির ও সংস্কৃত টোল ইত্যাদি বাঙালী বৈষ্ণবদেরই সৃষ্টি।

চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে এই অতি সামান্য কটা কথা বলে আজ আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথাও একটু বলা উচিত।

কারণ দিনটা দোলপূর্ণিমা হলেও আজ দেশে নিরানন্দের দোল, আর কান্নায় রোলই বেশী শোনা যাচ্ছে। সর্ব্বহারার হয়ে কত মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউবা ধন মান প্রাণ সবই হারিয়ে এ জীবনের খেলা শেষ করেছে। মানুষ যেখানে মানুষকে, প্রতিবেশীকে, আশ্রিত বা আশ্রয়দাতাকে বিশ্বাস করে নিজের চিরকালের ঘরে বসবাসটুকু পর্য্যন্ত করতে ভরসা পায় না, সেখানে মানুষের কতখানি অবনতি হয়েছে অল্পমান করা সহজ। হিন্দু-মুসলমান এদেশে বহুকাল পরস্পরের সঙ্গে ঘোঁষা রেখে পাশাপাশি বাস করেছে, হয়ত তখন মানুষের মনে ভ্রাতৃত্বাব বেশী ছিল, অথবা হয়ত যারা অত্যাচারী প্রকৃতির মানুষ তারা ভয়ন ক্ষমতাপালী ছিল না,

ছিল সামান্য লোক। তারপর ক্রমে মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে মারামারি কাটাকাটির সাহায্যে দেশটাকে দুর্ব্বল করে রাখবার ইচ্ছা জাগল আমাদের শাসকদের মধ্যে। তার পর থেকে ক্রমেই এই বিরোধ বেড়ে চলেছে। আমরা চরম ভুল করলাম ভারতকে খণ্ডিত করে। সে ভুলের পরিণামের থেকে ভ্রাতৃপ্রেমের কথা বলে আমরা উদ্ধার পাব কিনা সন্দেহ।

চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে প্রেমে বশীভূত করেছিলেন, আমরা আজ সে জাতীয় প্রেমের কথা বলছি না। প্রেমের যে দিকটা আজ মানুষের সবচেয়ে বড় করে দেখা দরকার সেটা হচ্ছে লাজিত, উৎপীড়িত, ভয়াব্র্ত আশ্রিতজনের প্রতি প্রেম। বলাই বাহুল্য যাদের প্রতি অত্যাচার হয়েছে তাদের কোনোই মঙ্গল হবে না যদি আমরা উত্তেজিত হয়ে অপর কতকগুলি মানুষের উপর অত্যাচার করি। একের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধরূপে অপরের উপর অত্যাচার করে গেলে জিনিষটা উভয় দিকেই বাড়তে বাড়তে কোথায গিয়ে যে দাঁড়াবে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সুতরাং এই ভ্রাতৃত্ব পথের কথা মনের কোণেও না স্থান দিয়ে আমাদের চলতে হবে সোজা পথে। বুদ্ধদেব যে দুর্ভিক্ষের দিনে ভক্তদের বলেছিলেন—

“ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা

তোমরা লইবে বল কেবা।”

সেই রকমই আমাদের ভাবতে হবে বুদ্ধচৈতন্যের অশরীরি বাণী যেন আমাদের ডাক দিয়ে বলছে “কে তোমরা এই দুর্দ্দিনে দুর্গতদের সহায় হবে?” অবশ্য রাষ্ট্রীয়-কারণে-ঘটা আজকের দিনের এই বিরাট সমস্তার একক কারণও সাধ্য নেই যে সমাধান করে, তাই সকলকে সজ্জবদ্ধ হতে হবে ক্যজের জন্ত। আমাদের প্রতিক্ষুদ্র মুষ্টিতে যেটুকু শক্তি বা সঞ্চয় আছে তা আমরা নিয়ে আসি যদি এই প্রেমযজ্ঞে আহুতি দিতে তবেই যজ্ঞ সূক্ষ্ম হবে। রাষ্ট্রের যারা নান্নক আজকের দুর্গতদের প্রতি প্রধান কর্তব্য তাঁদের হলেও আমরা যেন ভুলে না যাই যে তাঁরা আমাদেরই প্রতিনিধি। সুতরাং এই উৎপীড়িত সর্ব্বহারার নরনারীর প্রতি আমাদেরও সমান কর্তব্য রয়েছে। সভাসমিতিতে আমাদের সহানুভূতি-প্রকাশ করা এবং রাষ্ট্রনায়কদের কাছে প্রতিকার দাবীও

প্রার্থনা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সভাসমিতিতে সাময়িক সহ্যভূতি প্রকাশ করেই যদি আমাদের মন থেকে এদের কথা মুছে যায়, যদি ঘরে ফিরে এসেই নিজের সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে আকর্ষণ ডুবে যায়, তবে বুঝতে হবে এই দুঃখ দুর্দশার কাহিনী আমরা কাণে শুনলেও তা আমাদের মনকে সত্য সত্য স্পর্শ করে নি। সভাসমিতিতে বসেই আমাদের মনে মনে সংকল্প করা উচিত আমরা যে যা পারি সেই ভাবে এই দুর্গতি নিবারণ করবার চেষ্টা করব। একলা হাতে করবার কাজ এ নয়, সুতরাং আমাদের নিজ নিজ দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হতে হবে সমস্তার সমাধান খুঁজবার জ্ঞাত।

অন্তঃপুরের আড়ালে যে সব মেয়েরা দিন কাটান, তাঁরা ভাবতে পারেন একাজে তাঁদের সাহায্য করবার কি আছে? ছয়কম সাহায্য তাঁরা করতে পারেন, একটা সাময়িক, আর একটা স্থায়ী। সাময়িক সাহায্যে যাঁদের পক্ষে ক্যাম্প বা টেশনে দুর্গতদের মধ্যে যাওয়া সম্ভব তাঁরা সেখানে অনেক করতে পারেন। যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, তাঁরা বাড়ীতে বসে এদের জ্ঞাত অন্ন বস্ত্র ঔষধ-পথ্য ইত্যাদি দান পক্ষে

যা দেওয়া সম্ভব তা দেবেন বা সংগ্রহ করবেন। যারা সর্বস্বান্ত তাদের স্থায়ী সাহায্য করা অবশ্য সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। তবে নিঃসন্তান মহিলারা অনাথ শিশু দুটি-একটির ভার নিতে পারেন বা অনেকে মিলে একটা অনাথাশ্রম গড়ে তুলতে পারেন। আর দেশ ও জাতিকে নতুন করে গড়ে তোলার যে সাহায্য দেটা হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় সাহায্য। এই বুদ্ধ-চৈতন্যের দেশে মহাত্মা গান্ধী আবার নতুন করে অহিংসাপ্রচার করেছিলেন। ভারতের মহামানবেরা চিরকালই অহিংসার জয়গান করে এসেছেন। কিন্তু এ যুগে নতুন করে গান্ধীজির প্রয়োজন হয়েছিল সেই চিরন্তনবাণীকে দেশের ঘরে ঘরে কোণে কোণে ধ্বনিত করবার জ্ঞাত। মেয়েদের কাজ নেই অহিংসাকে মুখের কথা মাত্রে পর্যাবসিত না করে দেশে এবং দেশান্তরে সত্য করে তোলা। একটা দেশ যদি অহিংস হয় তাতে সভ্যতা গড়ে না এবং টেকেনা বটে, পৃথিবীব্যাপী অহিংসাই সভ্যতার ভিত্তি। কিন্তু একটা দেশ যদি সকলে কায়মনোবাক্যে অহিংসকে ত্যাগ করতে পারে তাহলে সেই দেশেই বিশ্বব্যাপী অহিংসার পাকারাস্তা তৈরী হয়। *

* বালীগঞ্জ মহিলাসভায় পাঠিত।

কনে-বিদায়

শ্রীমতীলাজনা দেবী কর্তৃক অনূদিত

কেটাদিদি মিস্টার রসেটের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল—
অবশ্য ওর পক্ষে যতটা পড়া সম্ভব ঠিক ততটাই।
যে কেটাদিদির চোখরাঙানী আর কড়াহাতের শাসনে
আমরা ‘মাল্লু’ হচ্ছিলাম, তাকে যে এমন ছাঁকাপানায়
ধরবে—পনেরো বছরের হাবা-চোখো মেয়েগুলোর মত—
তা স্বপ্নেও কে ভেবেছিল, বল?

এসব দেখে শুনে বাবারও বিরক্তি ধরে গেছে।
সেটাও কি কম আশ্চর্যের? বাবা তো কদিন ধরে
কত ভাল ভাল ‘পাত্র’ কেটাদিদির ঘাড়ে চাপাবার
চেষ্টা করলেন—সবই আমার মনে পড়ে স্পষ্ট। তবে
সময়মত ফাঁদ কেটে ঠিক পালিয়েছে কেটাদিদি।

মিস্টার রসেটকে বাবা কোনদিন ভাল পাত্র
ভাবেননি। তিনি বলেন—আমি অগুডেন সহরের লোক,
বিরিট সম্পত্তির মালিক আমি সেখানের। এসব কথা
তাঁর মুখেই শুধু শোনা। সংসার পরিবারের ঝগড়া
নেই, গত গ্রীষ্মে আমাদের বাড়ী এলেন ভাড়াটে হয়ে।
বাবার কিন্তু তাঁকে পছন্দ হ’লনা, বলেন—সন্দেহ হয়
লোকটাকে। তাঁর পরণে সহরে পোষাক, গায়ে দামী
আতরের গন্ধ ভুবুঝু করছে। কেটাদিদির তিন ডাকতে শুরু
করলেন ‘শ্রীমতী ক্যাথলীন’ বলে। যদিও সেটা কেটাদিদিরই
নাম তবু আমরা সে নামে তাকে কোন দিনও ডাকিনি।
ও নাম যে তাকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

গোড়ার থেকেই বাবা বলতে শুরু করলেন যে রসেটার নজর পড়েছে কেটার টাকার থলির উপর। কেটার 'টাকার থলি'র কথা আমরা জন্মাবধি শুনে আসছি। জিম্মামা জীবন বীমায় যে পাঁচ হাজার ডলার রেখে গেছেন, তা এখন এই থলিতে। কেটাদিদি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলেই ঠেস দিয়ে বলে যে, তার যে আমাদের সঙ্গে না থাকলেই চলে না এমন নয়—এই মা-মরা ছেলেগুলোকে মানুষ না করেও একলা নিজের পরসায় তার বেশ জীবন চলে। নিতান্ত দায়ে পড়েই মাসির ছেলেদের তার নিতে হয়েছে। অবশ্য তার সঙ্গে এই বিষয়ে বাবার মতের মন্ত অমিল ঘটত।

মা মারা যাবার পর, মা'র বন্ধু বিধবা মিসেস মালিন্স আমাদের ঘর-সংসার দেখবেন বলে জানালেন। কিন্তু কথাটা ঠাট্টামাত্র কেটাদিদি রণগাজে এসে উপস্থিত হ'লেন এবং আমাদের সংসারে জেঁকে বসলেন। কেটাদিদি মিসেস মালিন্সকে বরদাস্ত করতে পারতনা। আমাদের কিন্তু তাঁকে ভারী ভাল লাগত। ঠিক মা'রই মত, হাসিতে, আনন্দে জলজলে মানুষটি। গ্রামে তাঁর একটি মণিহারী দোকান, আমরা গেলেই গুন্তাম হেঁকে বলছেন বাবা, "আজ কেমন আছ সারা"? উত্তর আসত, "উত্তম! খোসমেজাজে আছি!" তারপরেই তাঁর প্রাণ-খোলা মিষ্টি হাসি মিশত এসে বাবার অটুহাসির সঙ্গে, আর টম আর আমি হেঁহে করে উঠতাম দম্পদের মত। মোটাসোটা স্নেহময়ী মিসেস মালিন্সএর কাছে যেতে ভারী ভাল লাগত আমাদের আর বাবারও। বাড়ীতে প্রাণথুলে মজা করতে বাবাকে কখনও দেখিনি। কেটাদিদির কড়া শাসন হাসি হজ্জাকে ঝাঁটা মেরে বিদায় করত।

কেটাদিদির একটা বড় বাতিক সংস্কারক হওয়া। কেটার ভাষায় 'অধঃপাতের চোরাবালি' থেকে ভ্রান্ত জীবনের উদ্ধার করায় ও নিজে যে অপরিমিত একটা আনন্দ পেত, তা আর কিছুতে পেতনা।

বাবাকেও যে সে উদ্ধার করেনি তা নয়। শনিবার সন্ধ্যাবেলা বাবা আর তাস খেলতে জাননা, যেমন যেতেন মা বেঁচে থাকতে। সিগারেট খেতে হ'লেই পিছনের

দালানে যেতে হয়—আর কিছু তো উঠেই গেছে। সব নিয়মই মনের জোরে পালন করতেন বাবা—অশান্তি যাতে না ঘটে। খুব শীতের দিনে একটু অনিয়ম করতেন, তাও পথ্য হিসেবে। কিন্তু সেই একদিনও কেটামাসীর যুখে ফুটে উঠত বেদনার ছাপ, ঠোঁট বিতৃষ্ণার রেখা আর চোখ উঠত কপালে।

সে তুলনায় রসেটা সাহেব ছিলেন আদর্শ। নিখুঁৎ ভদ্রলোক যাকে বলে! রাজে খাবার সময় তিনি কেটাদিদির চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তারপর মহা আড়ম্বর করে বসাতেন তাকে। রসেটাসাহেব খেতে বসবারও আগে আমাদের খালা পাতা আর অল্পেক তরকারী পরিবেশনও হয়ে যেত। ভদ্রলোক কেটাদিদির সঙ্গে এমন করে গল্প জুড়ে দিতেন যেন ঘরের ত্রিসীমানার আর জনপ্রাণী নেই—এক টেবিলে বসে খাওয়া তো দূরের কথা!

চাপা গলায় জোরদিয়ে একটানা বলে যেতেন তাঁর 'টাকাপয়সা' আর 'গল্পর গোয়ালের' কথা।

'শ্রীমতী ক্যাথলিনের' হুঁচোখ জলজল করে উঠত, গালে ফুটে উঠত রঙের আমেজ, হালকাভাবে খাবার নিয়ে সে খুঁটত। গরম কালিয়াটা আনতে যখন দিদি উঠত, রসেটা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তেন, কেটার ফেরা অবধি দাঁড়িয়েই থাকতেন, তারপর আবার সেই চেয়ার নিয়ে সমারোহ!

বাবা কোট খুলে বসতেন টেবিলে আর নীরবে সহ করতেন প্রতি রাতের এই অছষ্ঠানটিকে।

খাবার পর মিঃ রসেটা প্রত্যেকটি রান্নার উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা শুরু করতেন। একদিন সামান্য একটা সজ্জা নিয়ে এমন কবিত্ব ফলাতে আরম্ভ করলেন যে আমরা হাসি আর চাপতে পারলাম না।

কেটাদিদি আমাদের দিকে ফিরে তাকালো, তার আধ-আধ লাজুক হাসিটি মিলিয়ে গিয়ে ভীষণ ক্রফুটি যুখে ফুটে উঠল। কড়া গলায় ছকুম হ'ল—"টম, জিম্—বেরোও এ ঘর থেকে!"

তারপর থেকে ওরা হুঁজনে আলাদা খেত।

মাকে মাঝে, আমাদের খাবার উত্তনের উপর ঢাকা

দিয়ে, কেটীদিদি রসেটির সঙ্গে দৌড় দিত হয় কোন জলসায় নয় গাড়ীচড়ে বেড়াতে। তখনই বাবার ধ্যান ভাঙল। গরম গরম খাবার, ঠিক সময় মত খেতে ভালবাসতেন বাবা—দিদির অবহেলায় দু'টোই তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

অগুডেন সহরের দারোগাসাহেবকে নানা প্রশ্ন করে লম্বা এক চিঠি লিখলেন বাবা। চিঠি শেষ করে সেটাকে খাড়া করে টেবিলের উপর রাখলেন। ডাকে দেবার আগে কেটী নিশ্চয় সেটা পড়েছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা তুলল না। তাছাড়া কি একটা ঘটকালি অপিসের বিজ্ঞাপনের টুকরো মাটিতে কুড়িয়ে পেয়ে আমি কেটীকে দিয়েছিলাম, সে বিষয়েও চুপ করে রইল। তাতে কোন জেলার এক ধনী বিধবার বিষয় লেখা ছিল—“ধনী” কথাটার তলায় পেন্সিলের ঘন দাগ দেওয়া।

কিন্তু তারপর থেকেই দিদির রসেটি সাহেবের প্রতি হৃদয়ের কমতে শুরু করল। যদিও আমরা ছাড়া আর কেউ তখন বুঝতে পারেনি।

এমন সময় মিঃ রসেটি একদিন দিদিকে তার টাকার কথা জিজ্ঞেস করলেন। রাত্রে রান্নাঘরের টেবিলে আমরা পড়াশুনো করছি, হঠাৎ দিদি ঢুকে বাবাকে বলতে লাগল, “ভদ্রলোক জানতে চাইছে আমার টাকা ক'ড়ি কিছু আছে কিনা। ভয় পাবার কিছু নেই এতে। আমি তাকে বলুম—এই পাঁচাহাজার আন্দাজ। ভদ্রলোক জবাব দিল যে—ভালই হ'ল, তোমার টাকা এতই কম যে কেউ বলতে পারবেনা আমি তোমার টাকার জন্তু বিয়ে করছি। তারপর বলল যে আমরা দু'জনের টাকা মিলিয়ে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারি।”

বাবা ফেটে পড়লেন—“আমি ঠিক জানতাম এই হবে।”

কেটী তাঁকে খামিয়ে দিল, “দেখ টেচামেটি আমি মোটে পছন্দ করি না। দু'জনের টাকা এক সঙ্গে কি করে জমা দেওয়া যায়, সেইটে শুধু আমরা বুঝিয়ে দাও।”

বাবা টেচিয়ে উঠলেন, “বুঝিয়ে তো দেবোই। তোমার টাকাটা হাত করবার এটা একটা উপায়। সেটা হয়ে গেলে পর ওই গন্ধগোকুল চোর বেটার টিকির চিহ্ন খুঁজে পাবেনা তুমি।

বাবার আবেগে দিদি একটুও টলল না। মুহূর্ত্তে বলল, “তা ছাড়া ও আমাকে পরিত্রিশ ডলারের একটা চেক কাটতে বলেছিল।”

“আর তুমি সেটা দিয়ে দিলে, ওর ফন্দীটা বুঝলেও না?” বাবা আর্জুনাদ করে উঠলেন।

“ওই ঘটটার ভিতর থেকে পরিত্রিশ ডলার নিয়েছি, তা তোমায় জানিয়ে দিলাম।”

বাবা ঝড়ের বেগে গিয়ে আলমারীর মাথা থেকে মা'র পুরানো ঘটিটা নামালেন; সেটাতে সংসারের খুচরো টাকাপয়সা রাখা হ'ত। হৃদয় দিয়ে বল্লেন, “বাকীটা ও শয়তান পাবার আগে আমি সরিয়ে রাখব।” ঘটি দেখে বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। বাকী টাকাও উধাও, ঘটিটা একেবারে খালি।

খানিক পরে, নিজেকে সামলে নিয়ে বাবা বল্লেন— “ও তোমায় এখান থেকে পরিত্রিশ ডলার নিতে দেখেছে?”

কেটী শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

বাবা একবার মুখ খুললেন, আবার বন্ধ করলেন, তারপর হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। ঘরে একটা থমথমে ভাব, দিদির গলা হঠাৎ কঁাসরের মত বেজে উঠল, “আমি মিঃ রসেটির ভার নিলাম, এ আমার চরম কর্তব্য।” মুখে তার সেই তারিণীমূর্তি আবার ফুটে উঠল।—“হয় ওই ঠগটা এবাড়ী ছাড়া হবে, নয় আমিই যাব। কোনটা চাও বল।” এই বলে হুম করে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে বাবা বেরিয়ে গেলেন।

বাবা যখন ফিরলেন তখন আমরা সবাই শুয়ে পড়েছি। টম ঘুমিয়ে পড়েছে আমার পাশে, আর, কেটীদিদির দরজার তলা দিয়ে যে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটাও উঠানে গাড়ীর ক্যাচকোচ শব্দে নিবে গেল।

বাবা সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। আমাদের দরজার কাছে এসে একবার উঁকি মারলেন। কেটীদিদির দরজার কাছে গিয়ে কি চুপ করে শুনলেন, তারপর সিঁড়ির বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন।

আন্তে আন্তে সব নিরুন্ম হয়ে গেল। বাবার বাতিটাও নিবল। খাটটা কাঁচ করে উঠল, একটা জুতো ধুপ করে পড়ল, তারপর আর একটা, তারপর, হঠাৎ সব চুপ।

আমি যখন ঢুলতে শুরু করেছি তখন বাবার নাক ডেকে উঠল। তার পরেই শুনলাম নাক ডাকার ভালে তালে রসেটীসাহেবের ঘর থেকে পা টিপে টিপে কে নীচে নামছে। আমি লাফিয়ে জেগে উঠলাম, মাথার চুল সব খাড়া হয়ে উঠেছে।

স্টাটেকস হাতে কালো একটা ছায়া কেটীদিদির দরজায় দাঁড়াল, তারপর চটপট সিঁড়ি নামতে লাগল। একটা দরজার কবাট কিঁচ করে উঠল, তারপরে কেটীদিদির রবিবারে পরার সিল্কের গাউন অঙ্ককারে খসখস করে উঠল। দিদি তাড়া করল নাকি ওকে?

বাবার দরজাটা একটু ফাঁক হ'ল, কিন্তু নাক ডাকা চলল সমানে। তারপর আরও ফাঁক হ'ল, বাবা সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এলেন, তখনও নাক ডাকছে। বোবায় ধরল নাকি! আমায় দরজার কাছে দেখে, নাক ডাকা থামিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্লেন—“মেরেটা চলে গেছে?”

আমিও চুপি চুপি বললাম, “গাড়ীটা বোধহয় ওরা নিল, বাবা?”

বাবা বল্লেন, “বেশ বেশ! আমিও তাই ভেবেছিলাম। সব যুতেটুতে, ঠিকঠাক করে, দরজাটা খুলে রেখে দিয়ে এসেছিলাম।”

“কেটীদিদি কোথায় যাবে বাবা?”

“পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে যে?”

“রসেটীসাহেবকে?” আমি চোঁচিয়ে উঠলাম—“সে না ঠগ?”

“না রে বাবা না! অগুডেন শহরের সবচেয়ে বড়লোক ও, কিছু মিথো বলে নি। তা আমি গোড়া থেকেই জানতাম।”

“কিন্তু বাবা, তুমি যে বলেছিলে—”

“না বলে উপায় কি বল? ও পানী, ওকে বাঁচাতেই হ'বে, সেটা কেটীকে বোঝাই কি করে? কেটা ওকে ভালবাসে—কিন্তু এ কথা আমি যদি না বলতুম তা হ'লে ও কোনদিন ওকে বিয়ে করে উঠতে পারত না। তোর কেটীদিদি যে ঘোড়ার ব্যাপারীর মত রে! যদি ভাবে তুই বিক্রী করতে চাস না, তবেই সে কিনবে। আমি ওকে বোঝালুম, যে রসেটীসাহেব বিক্রীর জন্ত নয়।

“কিন্তু ডলারগুলো—”

“আমিই নিয়েছিলাম—তারপর ওর বাইবেলের পাতায় চেপে রেখে দিয়েছি। যেই রসেটীর নামে প্রার্থনা শুরু করবে অমনি সেগুলো খুঁজে পাবে! ঘটকালির কাগজটাও আমি ফেলেছিলাম। আমিই ডাকাত, রসেটীই সাধু রে! এখন যা শুগে যা; কাল ভোরে উঠে যাজার যেতে হ'বে, তোদের জন্তে হুতন একটা ব্যবস্থা করতে।”

সব কি রকম ভালগোল পাকিয়ে গেল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম—“তুমি ভাল আছ তো বাবা?”

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে একচোখ মটকিয়ে বল্লেন—“উত্তম রে উত্তম! খোসমেজাজে আছি!”

তারপর একলাফে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

সংস্কৃতির সঙ্কট

শ্রীমনোজ বসু

লৌহনগরে সাহিত্যোৎসব; ফানেশের সদাজাগ্রৎ
বহুদৃষ্টিভলে রসিকজনেরা মিলিত হয়েছেন। উৎসব-
অতিথি আমরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি সুজলা-সুফলা
বিশেষণে বহু-বিঘোষিত বাংলাদেশ থেকে—হানাহানি ও
বঞ্চনার অভিধানে যে ভূমি অহল্যার মতো অন্তর্ভুক্তিলেশহীন
পাষণ হয়ে উঠল।

বাংলার এই অদ্ভুত অবস্থা কল্পনা করতে পেরেছে কেউ
কখনো? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অথবা প্রথম-শহীদ প্রফুল্ল
চাকি—জীবিত থাকলে তাঁরা কেউ ভারতীয় বলতে
পারতেন না নিজেদের; ভিন্ন রাষ্ট্রবাসী—যে রাষ্ট্র প্রীতির
মধুসম্পর্ক পাতায়নি আমাদের সঙ্গে। বন্দেমাতরমের
প্রবল ও প্রথম উদগাতা বরিশালে বন্দেমাতরম উচ্চারণ
করে পরিত্রাণের উপায় নেই আজ কারও।

খণ্ডিত বাংলা। সাহিত্যের উপজীব্য যে জীবন—তা
সর্বনহিমাচ্যুত। সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক-বাহক মধ্যবিত্ত
সমাজ আজ হতসর্কস্ব। উদ্বাস্ত নামধেয় তাঁদের স্ববৃহৎ
এক অংশ অশন ও পুনর্বাসন ভিক্ষায় পথে পথে ঘুরছেন।
বিদ্যাগার থেকে রবীন্দ্র-শরণ তাঁদের জীবন-সাধনা অকুণ্ঠ
বিশ্বাসে। উত্তরপুরুষদের সমর্পণ করে শেষ-নিশ্বাস মোচন
করেছেন। বাংলা-সাহিত্যের সেই অবাধ ধারাবাহতা ও
প্রাণাবেগ এতকাল পরে নিঃশেষিত হয়ে যায় বুঝি!

মহা বিভীষিকা চতুর্দিকে। দেশকালাতীত শাখত
সাহিত্যের লক্ষণ বিশ্লেষণ বা অনুরূপ কোন ভাষণ আজকের
মানসিক অবস্থায় সম্ভব নয়। আপনারাও নিশ্চয় এরূপ
প্রত্যাশা করেন না। প্রবাসী স্বজনগণের সঙ্গে মাথায় মাথা
ঠেকিয়ে আমরা সঙ্কট-মোচনের উপায় ভাবছি।

বাংলাদেশ সর্বত্র ইংরেজের করায়ত্ত হয়, বাঙালি তাই
সর্বপ্রথম ইউরোপীয় সাহিত্য ও চিন্তার সংস্পর্শে আসে।
অভিধানের অন্তরালে এমনিভাবে মহৎ জাগৃতি লাভ হল
আমাদের; দেশব্যাপ্ত তমসার মধ্যে স্বর্ষ্যোদয়ের অরুণ জাঁভা

প্রকাশিত হল পূর্বপ্রান্তীয় ঐ অঞ্চলে। ভারতের অপরাপর
অংশ বিমুক্ত বিশ্বয়ে নতশিরে দীক্ষা গ্রহণ করল নব্য-বাংলার
কাছে। বাংলার বৈশিষ্ট্য সন্দেহাতীত রূপে সর্বত্র স্বীকৃত
হল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় স্নান করে বাংলা-সাহিত্য ও
ও বঙ্গ-সংস্কৃতি নবীন বীর্ঘবতা লাভ করল; সাহিত্য-
দিক্‌পালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচিত্র অলঙ্করণে অপরূপ
মহিমা দান করলেন বঙ্গ-সরস্বতীর।

প্রাচীন ধর্মীয় ভিত্তির উপর ইউরোপীয় রীতির সমন্বয়ে
সামাজিক সৌধপরিগঠন রামমোহনের অতুলনীয় কীর্তি।
অমন-স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি ও সূদৃঢ় অগ্রবর্তিতা ভারতের অস্বাভাব্য
অংশের দূরতম কল্পনার বাইরে ছিল তখন। বিদ্যাগারের
তালতলার চিহ্ন ও ব্রাহ্মণ্য বাহুরূপের অন্তর্ভুক্তি চিত্ত ও হৃদয়
নিঃসন্দেহ ইউরোপীয়—বোধকরি খুঁটান মধুসূদনের চেয়েও
অধিক। তাঁর আত্মসম্মতবোধ, সময়নিষ্ঠা, সামাজিক
কদাচারের বিরুদ্ধে স্ত্রীত্ব ঘৃণা—সমস্তই তদানীন্তন প্রতীচ্য
রুচিপ্ৰকর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিতান্ত সংস্কৃতভাষাসারী
তাঁর যে সব সাহিত্য-কর্ম তাঁদের মধ্যেও সে যুগের
প্রগতিচিন্তার পরিচয় মেলে।

মধুসূদনের প্রধান সৃষ্টি মেঘনাদ বধ কাব্যের কাঠামো
রামায়ণী, কিন্তু কারুকর্ম পুরোপুরি ইউরোপীয়। রুত্তিবাস
প্রমুখ কবিরা তৎপূর্বে রামায়ণ নিয়ে যথাসম্মতি ভাঙাগড়া
করেছেন—রাম-সীতা ও অযোধ্যা অঞ্চলটি তাঁরা বড় জোর
বহন করে এনেছিলেন বঙ্গ-গৃহস্থালীর মধ্যে। মধুসূদনের
সৃষ্টি প্রচলিত রীতিবিরোধী ও বিপ্লবাত্মক; শুধুমাত্র আঙ্গিকে
নয়, চরিত্র-পরিকল্পনায়ও। রাম-লক্ষণ নির্দিত সেখানে;
রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ ঐশ্বর্ষে, বীর্ঘে, ট্রাজেডির অতি-বিশালত্রে
পাঠক-চৈতন্য আচ্ছন্ন করে থাকে। রামায়ণী ক্ষেত্রের
উপর সমুদ্রপারবর্তী পৌরাণিক বীরবৃন্দের পদধ্বনি যেন
স্বস্পষ্ট শুনতে পাই।

বঙ্কিমের স্বজন-রীতিও এই পরিবেশাভূগ। তৎকাল-

চলিত অত্যাধুনিক ইউরোপীয় আদেশিকতার সঙ্গে তিনি গীতোক্ত নিকাম • কর্মবোধের সংযোগ সাধন করলেন। ত্রীকৃষ্ণ বীরমূর্তিতে পুনরুদ্ভূত হলেন আলো-আধারি পৌরাণিক পঞ্চাংগ পুরিত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও বিরাট মহীকূলের মতো উপনিষদ ইত্যাদি সুমহৎ ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে বাধাবন্ধহীন আকাশে শাখা বিস্তার করেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মানস-সন্তান অধুনাতন সাহিত্যাশ্রয়ী বাঙালি আমাদেরও নয়ন দিগ্দিগন্তে প্রধাবিত হল। জাতীয় জীবনের শতবিধ দৈন্ত ও পরাধীনতার শানির মাঝে অকস্মাৎ বৃহৎ আত্মচৈতন্য আবিষ্কার করে বাঙালি বিশ্বজনীনতা লাভ করল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাঙালির অভিনব বিজয়যাত্রা। সর্বক্ষেত্রে বাঙালির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল—সাহিত্যে, সমাজকৃত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে। ভারতের নানা অঞ্চলে বাঙালি ছড়িয়ে পড়ল—ভারতের বাইরেও। স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র প্রধান হল বাঙালি।

বাঙালির আত্মাভিমানও আকাশচুম্বী হল সেই সঙ্গে। শালীন রুচি ও উন্নত বুদ্ধির অহঙ্কারে চতুর্দিকে আমরা অবহেলার দৃষ্টিতে তাকালাম। বাঙালি সকলের অগ্রবর্তী—এই মানসিকতা বাঙালিকে আলাদা করল সকল থেকে। আমরা নিজ বাসভূমিতে সহজ হৃদয়তায় অন্যের সঙ্গে মিশতে পারিনি, বহিঃপ্রবাসেও স্বাতন্ত্র্যের ভুল ভ্রম্য অবরোধ গড়েছি। সমস্ত ভারতীয় থেকে বাঙালি পৃথক, তার ধ্যান-ধারণা ধান্যপরিধেয় অন্য কারো সঙ্গে মেলে না, একটি বিশেষ আইন দায়ভাগ-স্বারা প্রাচীনকাল থেকে তার জীবন বিধৃত, এমনি ধরণের আত্মপ্রাণ করে এসেছি আমরা চিরদিন। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েও গণীবদ্ধ হয়ে রইল বাঙালি-জীবন।

এর অবশ্রম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় সকলের ঈর্ষার পাত্র হলাম আমরা। কালক্রমে অপর প্রদেশীয়রাও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রবর্তী হলেন, অর্থ-সাম্রাজ্যের দিক দিয়ে এগিয়েও গেলেন অনেকে—স্বভাব বশে আমরা তবু আত্মমুখীনতা ত্যাগ করতে পারলাম না। ঈর্ষা ক্রমশ তীব্র অস্থায়ী পরিণত হল। সবাই প্রাদেশিকতা ছেঁত, বাংলার বেদনায় কারো হৃদয় গলে না—ইত্যাকার অভিযোগের মধ্যে সত্য নিশ্চয়ই

আছে। কিন্তু নিদান-নির্ণয়ে কেবলমাত্র অন্যের উপর দোষারোপ না করে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ আবশ্যক।

পরাধীনতা মোচনকল্পে বাংলার সন্তান অজস্র আত্মহুতি দিয়েছে; তাদের ত্যাগ জাতির গৌরব-ইতিহাস রচনা করল। কিন্তু স্বাধীনতার অমৃতস্বাদ উপলব্ধি করতে পারল না বাঙালি। মহাব্যাথায় আমরা স্তিমমান। বাঙালির ধন-প্রাণ-মর্যাদা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্ত বিপন্ন। বাঙালি জাতির অস্তিত্বই থাকবে কিনা, এই সন্দেহে দোলায়িত সকলে। ভারতবর্ষে বাংলার সমস্যাই আজ সর্বাধিক জরুরি।

বাংলার উভয় খণ্ডের মধ্যে মতান্তরের অন্ত নেই। তা সত্ত্বেও হিন্দু বা মুসলমান পাকিস্তানি বা ভারতীয় বাঙালি মাত্রেই ইতিপূর্বে ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্কটে হৃশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। পূর্ব-পাকিস্থানে ভাষাগত আন্দোলনের যে আগুন জ্বলছিল, নানা সমস্যায় ইদানীং তা ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে আছে। র্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ অল্পসারে জমিজমা ভাগ করে ছোটো পৃথক রাষ্ট্র পরিগঠিত হয়েছে; একটি ঐক্যবন্ধন তবু অটুট—ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধন। উভয় বাংলায়ই এক ভাষা, জীবন-রীতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো মোটামুটি এক।

কিন্তু অবিরত আঘাত পড়ছে এই বন্ধন-সূত্রের উপর। জীবিকা ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে পশ্চিম-বঙ্গের আমরা হিন্দির অনুশীলন করব; পূর্ব-বঙ্গের বাঙালীদের উর্হ চর্চা করতে হলে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্তব্ধ অপ্রয়োজনের সামগ্রী হয়ে পড়বে। ইংরেজ আমলের চেয়েও এই অবস্থা অধিক মারাত্মক। বিপরীত ধর্মী-দুই প্রবল সংস্কৃতির চাপে ঐক্য বন্ধন ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। অর্থনৈতিক ঐক্য অবরুদ্ধ করে ভাঙা হয়েছে ইতিমধ্যেই। মাস কয়েক আগে এই ক্ষত যতটা মর্মান্তিক মনে হয়েছিল, এখন আর তত নেই। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল—এখন ক্রমশঃ তা মন্দীভূত হচ্ছে। ক্ষত যত বিষম হোক, কালক্রমে তার উপর প্রলেপ পড়বেই। এখন বাংলার উভয় খণ্ডেই পারস্পরিক বাণিজ্য-সম্পর্ক পরিহারের প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিচ্ছেদ শেষ পর্যন্ত যদি পুরোপুরি ঘটে, তারপর বাকি থাকবে ভাষা-সাহিত্য। এটা আরো অসম্ভব নয় যে

অচিরে একপক্ষ উচ্চভাষী অপরপক্ষ হিন্দিভাষী—দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জাতি হয়ে উঠবে আমরা। অর্থাৎ ভিন্ন রাষ্ট্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও যে মনস্ববোধ ও প্রতিবেশিত্ব এখনো কিছু বজায় আছে, পরিণতি রূপে নিশ্চিহ্ন হবে সেটা। ভবিষ্যতের ভাষাতাত্ত্বিক হয়তো পুরাণে পুঁথিশালার কীটদষ্ট বই খুঁজে খুঁজে বাংলা ভাষার লুপ্তাবশেষ নিদর্শন বের করবেন। হাসবেন না—ইতিহাসে এমন ভাষা-বিলুপ্তির একাধিক নজির আছে।

একটা ভরসা মনে মনে লালন করতাম, বঙ্গ-সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত আমাদের বাঁচাবে, যদুযন্ত্রকারীদের কৃত্রিম ভেদ-সৃষ্টি বিদূরিত হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক ফেডারেশনের হাঙ্গামায় সে বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে। পরিণাম কতদূর গড়াবে, কেউ আন্দাজ করতে পারছি না। লোকোপসারণ? যুদ্ধ? কামনা করি, কোন কিছুই প্রয়োজন না হয়! মাহুঘের শুভ বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত হোক! তবু যতদূর দৃষ্টি চলে, আশার ক্ষীণতম আলো দেখা যাচ্ছে না।

দুঃখ-বিপদের মধ্যে দূরের আত্মীয়দের মনে পড়ে। জামসেদপুর তো বাংলার প্রত্যন্তবর্তী—সারা ভারত জুড়ে বঙ্গ-সন্তানেরা ছড়িয়ে আছেন। ভারতের বাইরেও আছেন। নিজেদের শিক্ষা, চরিত্র ও কর্মিষ্ঠতার অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁরা। স্থানিক ব্যবধান সত্ত্বেও, তাঁদের সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙালির নিবিড় সম্পর্ক প্রধানত সাহিত্যেরই মাধ্যমে। বাংলা-সাহিত্য অদৃশ্য স্নায়ুতন্ত্রীয় মতো দেশ-বিদেশের বাঙালির মধ্যে আত্মীয়তা বজায় রেখেছে। নিজ ভূমিতে বিপন্ন আমরা বাইরের স্বজনবর্গের দিকে তাকিয়েছি সাংস্কৃতিক মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার আশায়। যে স্বাস্থ্যরোধী বিষক্রিয়ার বাংলার বাঙালি মুহূর্তমান, আপনারা সৌভাগ্যক্রমে তা থেকে বিমুক্ত। যীর হির চিন্তে আপনারা বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিভ্রাণের উপায় চিন্তা করুন।

বৃহৎ ভারতের নানা অংশে আপনারা বসতি স্থাপন করেছেন। কিন্তু যতটা জানি—দীপ রচনা করে আছেন অনেক ক্ষেত্রেই, চারিদিকে সুউচ্চ সাংস্কৃতিক মর্যাদার পাঁচিল

তুলে। উঁচু থেকে অপরের দিকে তাকানো জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আমাদের। একদা যখন নিখিলভারতের নেতৃত্ব করতাম, গর্ব ও ঔদ্ধত্যের তবু খানিকটা সঙ্গতি ছিল। এখন প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙা বেদিতে ছিন্নকঙ্করূত অবস্থা আমাদের। সঙ্কীর্ণ স্বাভাৱ্যভিমান বিচূর্ণিত করে বৃহৎ ভারতীয়তায় মুক্তিলাভের একান্ত প্রয়োজন আজকে। এমন প্রয়োজন জাতির ইতিহাসে আর কখনো আসেনি।

হিন্দির প্রতিযোগীনা হয়ে পরিপূরক হোক মহানৃমুখ আমাদের বাংলাভাষা। মহা-ভারত গঠিত হচ্ছে, তার উপযোগী মহা-ভাষার সৃষ্টি হয়নি এখনো। হিন্দি নামক যা এখন চালু আছে, তার শক্তি নেই আহিমাচল-কুমারিকা ভাব ও চিন্তার পরিবাহক হবার। বাংলা এবং সকল প্রাদেশিক ভাষা পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি নিয়ে আত্মক মহাভাষা সৃষ্টির জন্ম। বাংলাই রাষ্ট্রভাষাকে গ্রাস করুক না কেন তার অন্তর বৈভব ও বিপুল শক্তির সমবায়। লিপি? ভাষার ইতিহাসে যুগে যুগে লিপির চেহারা বদলায়। বৃহৎ প্রয়োজনে অভিমান বিসর্জন দিয়ে নাগরি হরপ মেনেই নিই যদি মহাভাষার লিপি রূপে! রোমান হরপ চালাবার প্রস্তাবও তো হয়েছিল। এবং প্রয়োজনের ভাগিদে অদূর কালে নাগরি ছেড়ে রোমান লিপির প্রবর্তন হবে কি না, তা-ই বা কে বলবে? বাংলা নিজস্ব রূপে যতটা থাকে থাকুক; তা ছাড়াও যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তনের পর হিন্দি রূপে যদি আমাদের ভাষা নবমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়, তাতে ক্ষোভের কি আছে? মোটের উপর, সর্বাঙ্গীণ দেশ-পরিগঠনের দিনে অসহযোগ মনোবৃত্তি কল্যাণপ্রসূ হবে না। ইংরেজ অভ্যাগমে মুসলমানদের এইরূপ মনোবৃত্তির পরিণাম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

কর্মশীলতার মধ্য দিয়েই বর্তমান বিপদ কাটিয়ে উঠব; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে যাব আমরা। অনেকেই আমরা যতখানি বাঙালি ততটা ভারতীয় নই। প্রবাসী আপনারা ও বঙ্গবাসী আমাদের মিলিত-চেষ্ঠায় ভারতবর্ষে বাঙালি দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহ করুক।

মহিলা সমাচার

ত্রিযোতিষ চন্দ্র ঘোষ

বিমান দৌড়ে মহিলা চালকের জন্ম—

স্বাধীন ভারতে বিমান পোতের প্রতিযোগিতা-দৌড় ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের বিমান বন্দরগুলির মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিমান প্রতিযোগীগণের মধ্যে একটি মাত্র মহিলা চালক ছিলেন। কুমারী প্রেম মাথুর ১১জন জঙ্গী, ব্যবসায়ী ও সখের বিমান চালকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বিমান দৌড়ে সর্বপ্রথম হইয়াছেন। তাঁহার এই সফলতার মনে হয় বিমান পোত চালনার কাজে নারীগণের দক্ষতা অর্জন সহজসাধ্য হইবে। দৃশ্যময় হইতে বিভিন্ন বিমানবাচী ছুইয়া জমসেদপুরে এই প্রতিযোগিতা শেষ হয়।

নলিনী নারীশিক্ষা সমিতি, কাশীধাম—

১৯৩৩ সালে, কাশীধামে শ্রীমতী সূবর্ণনলিনী দত্ত (চাটার্জি) নারীদের স্বাবলম্বী হইয়া উপার্জনদক্ষ করিবার নিমিত্ত কারীকার শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীধামে বহু হিন্দু বিধবা বাংলাদেশ হইতে গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আত্মীয় স্বজনের অর্থে জীবন যাপন করিতে হয়। তাঁহারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া জীবিকা অর্জন করিতে চাহেন। সেইজন্য অল্প দিনে এই প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ৫০টি ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। যুক্ত প্রদেশের সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষণ বিভাগ হইতে বার্ষিক ৮৬০৯ সাহায্য পাইতেছে। আসামের প্রদেশপাল শ্রীপ্রকাশজী ইহার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে শ্রীমতী সজ্জন দেবী এম-এ তাঁহার স্থানে সভানেত্রী আছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবনন, দরজার কাজ, গ্লাশের উপর নকসা, পুস্তক-বান্ধন, বেতের কাজ, কাপড়ছাপা, পটারী (পোড়া ও চীন) মাটির বাসন প্রস্তুত শিক্ষা ও শিল্প-সম্ভার উৎপাদন হইয়া থাকে। সম্পাদিকা সূবর্ণনলিনী দেবী এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের উপার্জন পথ সুগম করিবার নিমিত্ত স্থানীয় একটি ছাপাখানা ও একটি বাসন ঢালাইয়ের

কারখানায় নারীদের শিক্ষা ও উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৬টি মহিলা কম্পজিটার ও ৪টি মহিলা ঢালাইয়ের কারখানার —মেশিনে পালিশের কাজ শিক্ষা ও হাতে করিতেছে।

কাশী বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর বৃহত্তম জনপ্রিয় নগর। কাশীতে প্রায় ৫০,০০০ বাঙ্গালী নর-নারী বাস করে। এখানে বহু বিধবা ও অন্ত্যাত্ম মহিলা জীবনের শেষে আসিয়া থাকেন। তথাপি বাঁহারা সক্ষম তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া জীবন যাপন করিলে নিজের ও বাঙ্গালীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। সেইজন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানে সকলের সাহায্য করাই কর্তব্য। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির তত্ত্বাবধানে হাড়ারবাগে শ্রীমতী অশোক ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে একটি শাখা কয়েক বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানে তাহার কার্য্যউত্তম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় বাঙ্গালীরা এই মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলি সংরক্ষণে ও পরিচালনায় সাহায্য করিলে উপকার হয়।

ভারতের বাহিরে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব—

শ্রীমতী শান্তিসুধা কর ১৯৪৭ সালে বার্মিংহামে সোসাল সায়েন্স পড়িতে যান এবং এক বৎসর মধ্যেই সমগ্র ইউরোপে একা ভ্রমণ করিয়া পাঠ্য বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি তথায় পাঠ সমাপন করিয়া এই বিষয়ে আরো অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবার নিমিত্ত 'গ্রেট ডিপার্টমেন্ট অব লেবার' হইতে মনোনীত হইয়া বিশেষ ট্রেনিং লাভেব জ্যু আমেরিকা গমন করিয়াছেন। তিনি এই শিক্ষালাভের জ্যু ৫৬ পাউণ্ড বৃত্তি পাইবেন।

শ্রীমতী শান্তিসুধার স্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোসিপ' লইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার নাম পরিমল কুমার রায়।

পূর্ববঙ্গের পুনর্বাসতি ও-রিলিফে মহিলাদের উত্তম

১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, ফেনী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবলীলা, হিন্দু নর-নারীর নৃশংস হত্যা, গৃহদাহ,

সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারীহরণ ও ধর্মান্তরকরণ চলিয়াছে তাহা যেমন অবর্ণনীয় তেমনই পাপবিক। এই সব ভয়াভয়, অনিষ্টকর নিপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু নরনারী তাহাদের প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব হারাইয়া, আত্মকে পূর্ব বাদলা ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন।

তাহাদের নিদারুণ নিপীড়ন ও দুঃখদৈন্ত পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার ৩৫টি বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে হইয়া কলিকাতায় ৮ই মার্চ লাউপ্রাসাদে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন এবং তাঁহার দলবদ্ধভাবে বলেন যে—বর্তমান পরিস্থিতি পূর্ববঙ্গে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে এমনই ভয়াবহ ও অসহ্য হইয়াছে যে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গলা হইতে হিন্দু নরনারী অবিলম্বে অপসারণ ও ভারতে পুনর্বাসতি ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। সম্মিলিত মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন—

যে, “সমস্তা স্বল্প জটিল এবং ভারত গভর্নমেন্ট যে অসুবিধার সম্মুখীন তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা লোক অপসারণ, উদ্ধার, পুনর্বাসন বা অন্য যে কোনও কাজে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।”

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে স্মারকলিপি দাখিল করা হয়—নিখিল বঙ্গ নারী সঙ্ঘ, নিখিল ভারত নারী সমিতি (কলিকাতা শাখা), আনন্দ আশ্রম, আর্থ-স্ট্রী সমাজ, বালীগঞ্জ মহিলা সঙ্ঘ, বঙ্গীয় পল্লী সংগঠন সমিতি, বেঙ্গল গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল অব উইমেন, বেঙ্গল উইমেন্স এসোসিয়েশন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী কাউন্সিল অব উইমেন, বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগ, মারোয়াড়ী লেডীজ ক্লাব, ক্যালকার্টা উইমেন্স এসোসিয়েশন, কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ, গুজরাটী স্ত্রী

মণ্ডল, কামারহাটী উইমেন্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হোম, কেরলীয় মহিলা সমাজ, মহারাষ্ট্র ভগিনী সনাজ, মহিলা মণ্ডল, মেয়ে-মহল, মিলন মেলা, নারী সংগঠন সভা নারী সেবা সঙ্ঘ, নারী শিক্ষা সমিতি, গ্রামশাল কাউন্সিল অব উইমেন্স ইন ইণ্ডিয়া, সরোজনিনী এসোসিয়েশন, ওয়েষ্টবেঙ্গল উইমেন্স ইমারজেন্সী রিলিফ কমিটি, ইয়ং উইমেন্স রিলিফ সোসাইটি, জোরোয়াস্মিয়ান স্ত্রীমণ্ডল, বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সমিতি, বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, বেনিয়া-পুকুর মহিলা সমিতি, কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ, দক্ষিণেশ্বর উদ্বাস্তু বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র, নোয়াখালি মহিলা সমিতি, সেভ দি চিলড্রেন কমিটি ও টালীগঞ্জ মহিলা সমিতি।

শ্রীযুক্তা চাকলতা মুখার্জি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন এবং শ্রীযুক্তা ফুলরেণু গুহ প্রতিনিধি দলের সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত মহিলাগণ প্রতিনিধি দলে ছিলেন— শ্রীযুক্তা রমলা সিংহ, শ্রীযুক্তা গীরা দত্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্তা মনোরমা বসু, মিসেস হাণ্ডু, শ্রীযুক্তা প্রীতিময়ী কর, শ্রীযুক্তা সজ্জাতা দাশ, মিসেস মমিন, মিসেস গফুর, শ্রীযুক্তা রমা মজুমদার, শ্রীযুক্তা অমলপ্রভা বসু, শ্রীযুক্তা রাজকুমারী সিংহ, শ্রীযুক্তা রাণী ঘোষ, শ্রীযুক্তা ভাগীরথী জালান, শ্রীযুক্তা কমলা অরোরা, শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্তা, শ্রীযুক্তা বিভা চৌধুরী, শ্রীযুক্তা কুসুম শা, শ্রীযুক্তা বীণা দাস, শ্রীযুক্তা আরমিনি মেনন, মিসেস বারকার, শ্রীযুক্তা আরতি মুখার্জি, শ্রীযুক্তা এইচ ভাট্টা, শ্রীযুক্তা শান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্তা অশোকা গুপ্তা, শ্রীযুক্তা এস কাজিলাল, শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্তা আরতি দত্ত, শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু, শ্রীযুক্তা শান্তিলতা মুখার্জি, শ্রীযুক্তা করুণাকনা গুপ্তা, শ্রীযুক্তা ব্রিজ পুরী, শ্রীযুক্তা কিরণ বসু, মিসেস বন্দা, শ্রীযুক্তা কুলদীপ সিংহ ও মিসেস নানাবতী।

বিদেশিনী

ত্রীনলিনী চট্টোপাধ্যায়

মিসেস পল এলিং পরলোকগত রাষ্ট্রদূতের পত্নী কর্তৃক বৈদেশিক রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষাদান ওয়াশিংটন ২০শে ডিসেম্বর—পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রদূত পল এলিংয়ের বিধবা পত্নী স্বামীর সহিত ১৭ বৎসর কাল মরক্কো, বেরুট অ্যাংলো, দামাস্কাস ও পাকিস্তানে কাটাইয়াছেন। এই সকল স্থানের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতা এখন তাঁহার খুব কাজে লাগিতেছে। রাষ্ট্রবিভাগের যে সকল কর্মচারী বৈদেশিক দপ্তরের চাকুরী লইয়া বিদেশে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাহাদের তিনি এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল স্থানের পোষাক পরিচ্ছদাদি সম্পর্কেও মিসেস এলিং তাঁহার ছাত্রছাত্রীগণকে বিশেষ পরামর্শ দিয়া থাকেন।

মিসেস এলিংয়ের এক কন্যা রাষ্ট্রবিভাগে চাকুরী করিতেছেন। অপর কন্যাও কূটনৈতিক বিভাগে চাকুরী করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণারত ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্নকুমারশিল্পে পারদর্শিতার জন্য সহযোগীদের উচ্চপ্রশংসালভ

ওয়াশিংটন ৩রা জানুয়ারী—বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণারত ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ শ্রীপ্রভাত কুমার ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁহার সহকর্মীরা বলেন যে, তিনি যেন বেসরকারীভাবে তাঁহার স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। শ্রীযুত ভট্টাচার্য বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করিয়া ডকটরেট উপাধি লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীযুত ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য

আমেরিকা গিয়াছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এস-সি ডিগ্রীলাভ করিয়া বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে স্নাতকোত্তর গবেষণাকার্যে লিপ্ত আছেন। তাঁহার গবেষণাকার্যে আকৃষ্ট হইয়া ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইনস্টিটিউশন তাঁহাকে পার্থিব চুম্বকত্ব (terrestrial magnetism) সম্পর্কে আরও অধিক গবেষণা করিবার জন্য একটি ফেলোশিপ প্রদান করিয়াছেন। এতদসম্পর্কে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির জর্নেক অধ্যাপক মন্তব্য করেন—“এতদিনে এখানে একটি ছাত্র আসিয়াছে যে কেবলমাত্র একজন ইনজিনিয়ারই হইবে না। তাহার মধ্যে কবিত্ব শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।”

ভারতীয় লোকনৃত্য এবং কবিতার ভাষ্যকার

ওয়াশিংটনে শ্রীযুত ভট্টাচার্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যেমন স্নানাম অর্জন করিয়াছেন, ভারতীয় লোকনৃত্য এবং কবিতা আবৃত্তির জন্যও তাঁহার খ্যাতি সেইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনিই ওয়াশিংটনের অধিবাসীদিগকে রবীন্দ্র নাথের কবিতার সহিত পরিচিত করিয়াছেন; তাঁহারই চেষ্টায় ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে সেখানে একটা নূতন আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য আমেরিকার লোকনৃত্যও শিক্ষা করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যুৎপত্তি

বর্তমানে শ্রীযুত ভট্টাচার্য ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইনস্টিটিউশনের ডাঃ জন গ্রেহাম প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের অধীনে জীবাশ্মের চুম্বকত্ব (fossil magnetism) সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। এই বৈজ্ঞানিকদলটি বর্তমানে পাললিক শিলার (sedimentary rocks) চুম্বকত্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণাকার্যে রত আছেন। ভূগোলকের অন্তর্নিহিত প্রবল চুম্বকশক্তির উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করাই ইহাদের অগ্রতম উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে পুস্তক রচনার জন্য ওয়াশিংটন পুরস্কার প্রদান

বোষ্টন, ৩রা জানুয়ারী—আমেরিকায় ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনা করিবার জন্য আমেরিকান হিষ্টরিক্যাল এসোসিয়েশন মিসেস গারট্রুড এমাসনসেন এবং পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলডেন ফারবারকে ওয়াশিংটন পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পুরস্কারের মূল্য ৫০০ ডলার, উভয় লেখকের মধ্যে উহা বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

মিসেস সেনের পুস্তকখানির নাম 'দি প্যাগ্যান্ট অব ইণ্ডিয়াস হিষ্টরী (The Pageants of India's History—Vol 1) মিসেস সেন বর্তমানে ভারতবর্ষে আছেন এবং ইতিহাসখানির দ্বিতীয়খণ্ড রচনা করিতেছেন। তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার ভগ্নী এডিথ এমাসন উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ফারবারের পুস্তকখানির নাম 'জন কম্পানী অ্যাটওয়ার্ক, এ হিষ্টরী অব ইউরোপীয়ান এক্সপ্যানসন ইন ইণ্ডিয়া ইন দি লেট এইটীনথ সেন্চুরী' (John Company at work, A History of European Expansion in India in the Late Eighteenth Century).

পুরস্কার প্রদান প্রসঙ্গে আরও ২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। একজন হইতেছেন টুমাল্ট ইন ইণ্ডিয়া (Tumult in India) পুস্তকের লেখক, টাইম এবং লাইফ পত্রিকার রোমস্থিত সংবাদদাতা জর্জ ই. জোন্স। অপরজন হইতেছেন হাফ-ওয়ে টু ফ্রিডম (Half-way to Freedom) পুস্তকের লেখিকা লাইফ পত্রিকার মহিলা সংবাদদাতা মার্গারেট বুক-হোয়াইট।

আমেরিকান হিষ্টরিক্যাল এসোসিয়েশনের বিদ্যায়ী সভাপতি, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিরিড কর্তৃক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস সম্পর্কে যাহাদের আগ্রহ আছে তাঁহাদের লইয়া আমেরিকান হিষ্টরিক্যাল এসোসিয়েশন গঠিত। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ওয়াশিংটন ফাউন্ডেশন পুরস্কার দেওয়া হয়।

আমেরিকার মহিলা শ্রমিক—একই কার্যে পুরুষের সমকক্ষ বেতন লাভের প্রচেষ্টা

ওয়াশিংটন ৩রা জানুয়ারী—একই প্রকার কাজের জন্য স্ত্রী শ্রমিকেরা বাহাতে পুরুষ শ্রমিকদের সমকক্ষ বেতন পাইতে পারে এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক জনগণের সমর্থন লাভ করিতেছে বলিয়া ইউনাইটেড স্টেটস ওমেনস বুরো জানাইয়াছেন। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমপ্রতিষ্ঠানের যে বৈঠক হইবে উহাতে বিষয়টি আলোচিত হইবে।



মিসেস ইউজিনা এওয়ারসন।

আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস হইতে প্রথম মহিলা-রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত হইয়া ডেনমার্ক গিয়াছেন।

যুরোপে জানাইতেছেন পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল কাজ পুরুষেরা করিত যুদ্ধের সময়ে এবং উহার পরে মহিলারাও ঐ সকল কার্য করিতে আরম্ভ করে এবং তখন হইতেই স্ত্রী ও পুরুষ কর্মীর বেতনের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতে থাকে। গত যুদ্ধের সময়ে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পায়।

১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলা কর্মীর মোট

সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৪৫ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,৬১০,০০০ ঐ সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ১৭,৫০০,০০০ অর্থাৎ আমেরিকার মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ।

শ্রী পুরুষ নিবিশেষে শ্রমিকদের একই হারে বেতন

দিবার আইন ১২টি স্টেটে গৃহীত হইয়াছে। কতগুলি স্টেট সরকারীকার্বে নিযুক্ত শ্রী শ্রমিকদের বেতনের ব্যাপারে এই নীতি আত্মসরণ করিতেছে। ফেডারেল গবর্নমেন্ট ১৯২৩ সাল হইতে এই নীতি অনুসারে বেতন প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীঅণামিকা

রাশ্মাঘর

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

মাছের মেওনেজ

দেখতে দেখতে গরমের দিন এসে পড়ল। এখন সব সময় বেশী তেল, ঘি খেতে ভালো লাগে না—মশলা দেওয়া খাবারে আনক সময় শরীরের অনিষ্ট হয়।

এবারে যে কটি খাবারের প্রণালী দেওয়া হলো—এগুলি সব কটিই অল্প ব্যায়ে এবং অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়।

মাছ (কাটা পোনা বা বড় ভেট্‌কী) আধসের

ডিম দুটো

আলু (বড়) দুটো

শশা একটা

টমেটো (বড়) দুটো

পেঁয়াজ (বড়) একটা

হুন আন্দাজ মতো

পাতিলেবু একটা

চিনি চায়ের চামচে দু চামচ

বরফ এক সের

প্রণালী :—

মাছের পুরো টুকরোটি হুন জলে সিদ্ধ করুন। পরে তুলে আধখানা পাতিলেবুর রস দিয়ে ভিজিয়ে ঠাণ্ডা

রাখুন। ডিম দুটো ও আলু দুটো সিদ্ধ করে নিন। হয়ে গেলে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন।

Tomato ও শশা ও পেঁয়াজ চাকা চাকা করে কেটে, লেবুর রস ও হুন, চিনি দিয়ে ঠাণ্ডা রাখুন।

মেওনেজ সমূহ :

দুধ	আধপোয়া
রাই (mustard)	দুই তিন চায়ের চামচ
চিনি	দুই চায়ের চামচ
হুন	স্বাদ মতো
Salad oil	চায়ের চামচের দু' চামচ
	(যারা এর স্বাদটি পছন্দ করেন না— তাঁর এটি বাদ দিতে পারেন)

রাইএর সংগে দু চিমটি হুন ও এক চিমটি অথবা কচি মতো চিনি দিয়ে মিশিয়ে নিন—অল্প অল্প করে দুধ ঢেলে মিশান—বেশ ঘন ক্ষীরের মতো হয়ে এলে আর দুধ দেবেন না—ঠাণ্ডা রেখে দেবেন।

খাবার আধ ঘণ্টা আগে মাছ টুকরো করে (লব্ধ) কাটুন। ডিম ও আলু চাকা করে কাটুন। একটা বড় পাত্রে মাঝখানে মাছ রাখুন, তার চারপাশে ডিম ও

আলুগুলি সাজিয়ে দিন—সবশেষে শশা টমেটো প্রভৃতিগুলি চার পাশে সাজিয়ে দিন।

এরপর মাছ ও তরকারী, সবটার উপর সমটা ঢেলে দিন। এক সের বরফ ছোট টুকরো করে কেটে পাত্রের চার পাশে ও সম্ভব হোলে ঢাকনা ঢাপা দিয়ে উপরে ছড়িয়ে দিন খাবার সময় যাতে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। জিনিষটি থেকে ছ' জনকে চার ভাগ করে দিতে পারেন।

ঘুগুনী—শ্রীমঞ্জু নাগ

গ্রীষ্মকালে চায়ের সময়, লুচি বা পরটা দিয়ে ঘুগুনী খেতে কার না ভালো লাগে। খুব কম সময়ে ও কম খরচে এটি বেশ ভালো খেতে হয়।

উপকরণ :—

কাবলি মটর বা ছোলা	ছই আনা।
চিনি	ছই চায়ের চামচ।
আলু (বড়)	চারটি বা পাঁচটি।
তৈতুল	ছ' পয়সা

ঘি
নারকেল
হুন
জিরে
শুকনো লঙ্কা

চায়ের চামচে দুই চামচ
আধ মালা
আলু মতো
চার পয়সা
দুটি

প্রণালী :—

মালাদ পাত্রে আলু ও মটর সিদ্ধ করে নিন। আলু সিদ্ধ হোলে গোলা ছাড়িয়ে খুব ছোট টুকরো করে কাটুন। নারকেল ও ছোট করে কুটে নিন। তৈতুলটা পাখর বা কাঁচের বাসনে ঘন করে গুলে রাখুন। শুকনো লঙ্কা ও জিরে ত্রাওয়ায় গরম করে ভাজা গন্ধ উঠলে নামিয়ে শুকনো শিলে গুঁড়ো করে নিন।

এবার আলু মনিষ্যামের কড়ায় ঘি দিয়ে মটর, আলু ও নারকেল ভাজতে থাকুন একটু ভাজা গন্ধ উঠলেই তৈতুল গোলা ঢেলে দেবেন, ফুটে উঠলে হুন, চিনি ও গুঁড়ো মশলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিন। খাবারটি বেশ মাখামাখা হবে। এই উপকরণে ৭৮ জন খেতে পারে।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

নৈহাটী মহিলা সমিতি

শ্রীযুক্তা পান্না রায় বি, এ, মহাশয়ের প্রচেষ্টার নৈহাটী রেলওয়ে কলোনীতে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে, সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা পান্না রায় সমিতির মাধ্যমে পঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিলে অভ্যক্তি হয় না। ইতি মধ্যেই সমিতিতে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং ২৫০ জন নিরক্ষরা বয়স্ক উক্ত কেন্দ্রে নিয়মিত শিক্ষা লাভ করিতেছেন, নিরক্ষরা ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়। সমিতির সভ্যদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিল্পশিক্ষা যথা কটিং, চামড়ার কাজ, হুচিশিল ইত্যাদির জন্ত একজন শিক্ষায়িত্রী নিযুক্ত আছেন। সমিতির

সকল সভ্যদের ভিতরেই বিশেষ উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। রেল কর্তৃপক্ষ সমিতিকে যথাবিধি আর্থিক সাহায্য করিলে রেলের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদির সেবায় নৈহাটী মহিলা সমিতি বিশেষ কৃতকার্য হইবে। তাহা নিশ্চয় কথিয়া বলা যায়। এই সমিতির আর্থিক দুর্গতি ও সমিতির সভ্যদের সমাজ সেবামূলক কাজের প্রতি রেলকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। রেলকর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের আনন্দ বিনোদন ইত্যাদির জন্ত যথেষ্ট টাকা মঞ্জুর করিয়া থাকেন, সেই অর্থে এই শ্রেণীর মহিলা প্রচেষ্টাকে ও যদি আর্থিক সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করেন তাহা হইলে, সমাজকল্যাণের ভিতর দিয়া রক্ত নিরানন্দ পরিবারে শান্তির পরিবেশ সৃজন করিয়া সেই সাহায্য সার্থক হইয়া উঠিবে। কেন্দ্র সমিতির পচারিকা শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ সমিতিটি একাধিকবার পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

চার পুণ্যস্থান—লেখক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা। সচিত্র। প্রকাশক—রেভাঃ ভিক্টু জিনবতন। মহাবোধি সোসাইটি। ৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

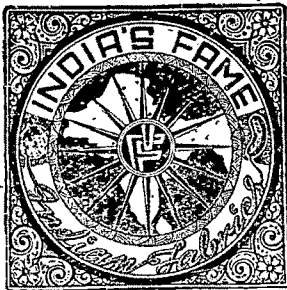
জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাহিত্য জগতে সুপরিচিত লেখক। বিশেষ করে ভ্রমণ সাহিত্যে তাঁর ঝোঁক। ‘চার পুণ্যস্থান’ তাঁর অগ্রতম একটি ভ্রমণ পুস্তক। বছর তিন চারেকের মধ্যে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশই “চার পুণ্যস্থান” যে পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ।

এই পরবর্তী সংস্করণে লেখক বইখানির কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করে পাঠক সমাজের দৃষ্টবান্দাই হয়েছেন। ঘোষ মহাশয়ের লিপি চাতুর্ধর কোশলে ও রচনা ভঙ্গিমার মাধ্যমে “চার পুণ্যস্থান” কেবল সুখ পাঠ্যই হয়নি, আকর্ষণ মূলক হয়েছে। ‘লুম্বিনী’, ‘বুদ্ধগয়া’, ‘সারনাথ’ এবং ‘কুশীনগরের’ চিত্রগুলি যেন জীবন্তরূপে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং বুদ্ধের চরণ

চিহ্নিত পবিত্র স্থানগুলি দর্শনের ব্যাকুলপ্রেরণায় মন স্বতই উৎস্বহ হয়ে ওঠে। এই খানেই জ্যোতিষবাবুর ভ্রমণের এবং ভ্রমণকে লিপিবদ্ধ করার যথার্থ সার্থকতা।

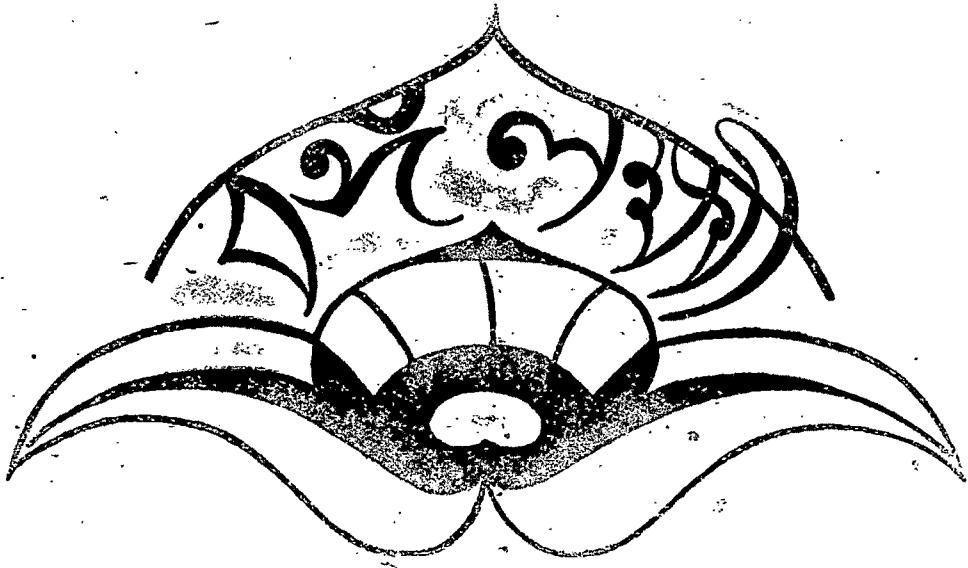
‘চার পুণ্যস্থানের’ অগ্রতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই রচনাবলিতে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধদেবের আদর্শ এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক প্রকাব্যোদ্য সাবলীল প্রকাশভঙ্গিমার মধ্য দিয়া সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

মনে হয় বৌদ্ধদর্শনের সাম্য, মৈত্র ও করুণার আদর্শবাদ প্রচারের দিন আবার এসেছে। দুই শতাব্দীর বিদেশী শাসনের অনাদর অবজ্ঞা ও অহেলা প্রকাশের ফলে এবং দারিদ্রের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে জাতির মেরুদণ্ড জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গেছে। জাতির চরিত্রে শুধু দেখতে পাওয়া যায় হীনতার কলুষতা, নৈশাটিক স্বার্থপরতা—ঐশ্বর্যের প্রতি অমাস্বস্তি চাহিদা, প্রেম, করুণামৈত্রীর স্থান আজ কোথায়? যুগ সঙ্কটকালে যুগোপযোগী গ্রন্থ রচনা করে ঘোষ মহাশয় সমাজে চেতনা বোধের পরিচয় দিয়েছেন।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
BHOWANIPUR & CALCUTTA

ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্‌স্ (মিত্রমুখার্জী জুয়েলারের উপরর তলা) ৩০নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা। ফোন সাউথ ১২৭৮



২৫শ বর্ষ

চৈত্র—১৩৫৬

৫ম সংখ্যা

বাস্তুহারা

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

(১)

বাস্তুহারা পূজার পাত্র
কুপার পাত্র নয়
অশ্রুভরা হৃদয় আজি
এই কথা সে কয়।
সবার বুকে আছেন তিনি
বাস্তুহারা হ'লেন তিনি
জগৎখানি বাস্তু যাহার
সেই যে নিঃশ্ব হয়।
সবার সে যে পূজার পাত্র
কুপার পাত্র নয়।

(২)

ভিখারী সে সবার দ্বারে
কেউ চেনে কেউ চেনে না
বক্ষে তুলি নিলে তারে
বক্ষ মণিময়
মণি কোঠার মণি সে যে
ধূলি কণা নয়
সবার সে যে পূজার পাত্র
কুপার পাত্র নয়।

(৩)

বাস্তুহারা আজ কোথায় যাবে
কোথায় গেলে বাস্তু পাবে

কোন আকাশের তলে গো তার
শয্যা পাতা রয়
কোন মাছঘের বুকের ঘরে
মিলেছে আশ্রয়
কে জানে সে পূজার পাত্র
কুপার পাত্র নয়।

(৪)

বাস্তুহারার অন্নপানি
পূজার শ্রেষ্ঠ অর্থমানি
আপন হাতে দিলে আনি
জীবন ধন্য হয়
সেই জানে এই পূর্ণপূজা
কুপার ভিক্ষা নয়।

(৫)

আছে স্বর্গ নরক আছে
যেওনা নরকের কাছে
উদ্ধৃষ্টি মেলি—বল
হে দীন দয়াময়

(৬)

স্বর্গে যোদের ঠাই ক'বে দাও
নরকভূমি করব জয়
আমরা কজন বাস্তুহারা
নরকমানি করব জয়।

‘যুক্ত করছে সবার সঙ্গে’

শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়

যে মানুষ নিখিলের সঙ্গে আপনার এক্যকে সমস্ত মর্থ দিয়ে উপলব্ধি করেছে নিখিলের ‘হাহাকার’ তার চিত্তকে বিচলিত করে তুলবে। আর মানুষের দুঃখে চিত্ত যার বিচলিত হয়ে উঠেছে সে কখনো বাস্তবের দাবীকে উপেক্ষা করে কল্পনা নিয়ে ডুবে থাকতে পারে না। রোম যখন পোড়ে তখন বাঁশী বাজাতে পারে নীরোর মত হৃদয়হীন মানুষ। হৃদয় যার আছে সে কখনো জলন্ত ঘরের সম্মুখে বাঁশী বাজানোর আনন্দে ডুবে থাকতে পারে না। তাকে বাঁশী নামিয়ে রেখে বালতি হাতে কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হয়। প্রকৃতির লীলা ভুলে চারিদিকের সহস্র সহস্র মানুষের সঙ্গে একেবারে উপলব্ধি রবীন্দ্র নাথের অন্তরে যখন অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠলো তখন পদ্মার চরে চরে চখাচখীর কাকলী বজ্রালের মধ্যে স্বপ্ন নিয়ে ডুবে থাকার তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হোল না। জীবন তুর্ধ্য বাজিয়ে তাঁকে ডাক দিলো কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জ্ঞান। তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো :

কী গাহিবে, কী শুनावে, বলো, মিথ্যা আপনার হৃৎ,
মিথ্যা আপনার হৃৎ। স্বার্থময় যে জন বিমুখ
বুহং জগৎ হোতে, সে কথানা শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্ব জীবনের তৎক্ষেত্রে নাচিতে নাচিতে।

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া প্রবতারা।

এতদিন কবির কারবার চলেছিলো ফুল নিয়ে আর তারার নিয়ে, নদী নিয়ে আর আকাশ নিয়ে। নিপীড়িত মানুষের জগৎ ছিলো দূরে। বাঁশী বাজিয়ে তাঁর স্বপ্ন ভরা দিনগুলি তখন স্রোতের ফুলের মতই ভেসে চলেছিলো—‘এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের একটি নিভৃত কোণে। ‘ছিন্নপত্রের’ পাতায় পাতায় কবির সেই অজ্ঞাত দেশের অভিজ্ঞতার অপক্লপ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কখনো চলেছে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতা পড়া, কখনো সময়কে অধিকার করেছেন কালিদাস। দুপুরবেলা কাটে গল্প রচনার মধ্যে। লিখছেন, “আমার এই সাজানপুরের দুপুর-

বেলা গল্পের দুপুরবেলা।” দিগন্তব্যাপী বালির চর ধুপু করছে—পাশ দিয়ে চলেছে পদ্মা। সেই জনহীন চরে কবির সাক্ষ্য ভ্রমণের একমাত্র সাক্ষী শুক্লসন্ধ্যার চাঁদ। বেড়ানো বেড়ানো কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল মণ্ডিত হয়ে যায়। বেড়ানো শেষ হলে নদীর মাঝখানে জালিবোটে শুয়ে চুপ, চাপ, সময় কাটে। সেই সময়কার কথা লিখতে গিয়ে কবির লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে :—“চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে ওঠে। আমি প্রায় ঝোঁজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জলগ্রহণ করবো? আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তক গোরাই নদীটির উপর বাংলা দেশের এই সুন্দর একটি কোণে এখন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জালিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাবো?”

সেদিনের জীবন নদীতে নদীতে জলে বেড়ানোর আনন্দময় জীবন। “দুইধারে সবুজ চালুঘাট, দীর্ঘঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম” কবির চোখে বারবারই ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে সঙ্গ দিচ্ছে নির্জনের প্রিয়বন্ধু Amiels Journal। সেই নিঃসঙ্গ জীবনের একটা দিন সম্পর্কে ‘ছিন্নপত্রে’ লেখা রয়েছে :

“আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটি মাত্র নাড়ীর মতো আন্তে আন্তে চলছিলুম। আর সকলে ছিলো আর এক পারে, জীবনের পারে—যেখানে ব্রুটিশ্ গবর্ণমেন্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট।”

‘এবার ফিরাও ওরে’ কবিতায় এই রকমের কথাই আছে :

“সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রি দিন ;”

সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে এই নির্জন বাস যে কত আনন্দের ছিলো সে কথা ‘ছিন্নপত্রে’ লেখা আছে :

“আমি প্রায়ই এক এক সময় ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে,

কোনটি সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে রাঙা, কোনটি
ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ শীতল, কোনটি পূর্ণিমার
জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মত প্রফুল্ল; এগুলি কি
আমার কম সৌভাগ্য? এবং এরা কি কম
মূল্যবান?”

দিন যায়-মাস যায়—বৎসর যায়। তারপর এলো ভিতর
থেকে একটা নূতন পথে চলবার প্রবল তাগিদ। এই নূতন
পথ হোলো নিকাম সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মিলিত
হবার পথ। চখাচখীর কাকলী-কল্লোল ডুবে গেল নিখিলের
হাহাকারের মধ্যে। স্বদেশের সহস্র সহস্র চলন্ত নরকঙ্কালের
মধ্যে ছড়িয়ে গেল কবির চেতনা। তিনি দেখলেন, কর্মের
জগৎ থেকে আপনাকে দূরে রেখে ধ্যানের মধ্যে নির্জনে
অনন্তকে উপলব্ধি করার যে আনন্দ—সেই আনন্দের মধ্যে
নেই আগেকার সেই তীব্রতা। উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ
করেন—কিন্তু সে মন্ত্র আগেকার মতো আর প্রেরণা দেয় না।
কর্মের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য একটা
ব্যাকুলতা আপনার মধ্যে তিনি অনুভব করলেন।

“আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে

বিশাল ভবে

প্রাণের রথে বাহির হ’তে

পারব কবে?

প্রবল প্রেমে সবার মাঝে

ফিরবো ধৈর্যে সকল কাজে,

হাটের পথে তোমার সাথে

মিলন হ’বে।

প্রাণের স্বথে বাহির হতে

পারবো কবে?”

অথবা—

“যখন আমি পাবো তোমায়

নিখিল মাঝে

সেইখনে হৃদয়ে পাবো

হৃদয় রাখে।

এই চিন্তা আমার বৃত্ত কেবল,

তারি পরে বিশ্ব কমল,

তারি পরে পূর্ণ প্রকাশ

মেঘাও মোর।”

এইসব কবিতার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মিলনের ভিতর
দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে
উঠেছে।

ভাই তুমি যে ভাইএর মাঝে প্রভু,

তাদের পানে তাকাইনা যে ভবু,

ভাইএর সাথে ভাগ ক’রে মোর ধন

তোমার মুঠা কেন ভরিনে।

ছুটে এসে সবার স্বথে ছুখে

দাঁড়াইনে তো তোমারি সম্মুখে

স’পিয়ে প্রাণ ক্রান্তি বিহীন কাজে

প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে।

নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি—সকলের সঙ্গে প্রেমে
মিলতে পারছিনে—গীতাঞ্জলির বহু কবিতায় এইরকম একটা
স্বতীত বেদনার বারম্বার প্রকাশ।

একা আমি ফিরব না আর

এমন ক’রে—

নিজের মনে কোনে কোনে

মোহের ঘোরে।

তোমায় একলা বাহুর বঁধন দিয়ে

ছোটো ক’রে ঘিরতে গিয়ে

আপনাকে যে বাঁধি কেবল

আগন ডোরে।

এখানে একই বেদনার অভিব্যক্তি কর্মের জগতে যেখানে

ভালো মন্দ ওঠা পড়ায়

বিশ্বশালার ভাঙাগড়ায়

বিশ্বেশ্বরের খেলা চলেছে সেখানে তিনি যে কোন অংশ
গ্রহণ করতে পারছেন না—এই বেদনা তাঁর মনকে অস্থির
ক’রে তুলেছে। তাই তো তাঁর ব্যাধাতুর হৃদয় থেকে
উৎসারিত হয়েছে কাজের জগতে সকলের সঙ্গে মিলবার
জন্ত একটা কামার স্বর।

ভেবেছিলাম বিজন ছায়ায়

নাই যেখানে আনাগোনা

সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমার

সেথায় হবে জানাশোনা।

অন্ধকারে একা একা

সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,

ডাকো তোমার হাটের মাঝে

চলছে যেথায় বেচা কেনা।

বনে নয়, বিজনে নয়, আমার আপন মনেও নয়—যেখানে বিশ্বজনের পায়ের তলার ভূমি ধূলিময় হয়ে আছে—সেই-খানেই তো স্বর্গভূমি, আর সেই স্বর্গভূমিতে কাজের দিনে সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে বিধাতার যে পরিচয় আমরা লাভ করি—সেই হোল তাঁর সত্যিকারের পরিচয়।

বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলিময় যে ভূমি

সেই তো স্বর্গ ভূমি

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছে ভূমি

সেই তো আমার ভূমি।

বৃহৎ মানবসমাজ থেকে দূরে বিজনে আপনার মনের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করবার যে নিষ্ফল প্রয়াস—এই নিষ্ফলতার অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন তাঁর Religion of man নামক গ্রন্থে। সেখানে আছে :

“মানুষের ভিতর দিয়েই যে ভগবানের প্রকাশ—এই সত্যের উপলব্ধি আমার মনের অবচেতন প্রদেশে দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। মানুষের মধ্যেই ভগবান এই ধারণা অবশেষে আমাদের বাধ্য করলো। আমার সাহিত্য জীবনের নির্জনতা থেকে বেরিয়ে এসে কর্মজগতে আমার কাজের অংশ গ্রহণ করতে। অনন্তকে শুধু নিজের মনের মধ্যে ধ্যান করে আমি আর ভূমি পাচ্ছিলাম না, যেসব মন্ত্র আমার নীরব উপাসনার অঙ্গ ছিলো, আমার অজ্ঞাতসারে তারাও আমাকে প্রেরণা দেবার শক্তি কখন হারিয়ে ফেললো। আমি ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারলাম, আমার আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধির জন্ত প্রয়োজন নিষ্কাম সেবাস্বার্থের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। Rabindra nath—'The Religion of man'—P. P. 165, 166. (অনুবাদ)

মানুষের মধ্যেই যে ভগবান এবং দেবতাকে দেখবার চোখ যার অন্ধ হ'য়ে যায়নি সে যে মানুষের সেবাকেই ভগবানের সেবা বলে গ্রহণ করবে—এই সত্যের উপলব্ধিই চতুর্ভুজের জ্যাঠামশাইয়ের উক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে। জ্যাঠামশাই ভাই হরিমোহনকে বলছেন,

“ব্রাহ্মের নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না।

তোমরা সাকারকে মানো তাহাকে কানে শোনা যায় না।

আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।”

“আমার এই চামার মুসলমান দেবতা।” এই কথা বলে জ্যাঠামশাই বিধে যারা বঞ্চিত এবং নিপীড়িত তাদের পায়ের উপর মস্তককে লুটিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে বাদ দিয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না—এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের চিতে যখন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তখনই কল্প জগৎ থেকে মানুষের জগতে ফিরে আসবার জন্ত ব্যাকুলতা জেগেছে তাঁর মনে। তখনই তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'য়েছে :

“এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে

হে কল্লনে, রঙ্গময়ী! ছুলায়ে না সমীরে সমীরে

ভরজে ভরজে-আর। ছুলায়ে না মোহিনী মায়ায়।

রোখানা বসায়।”

তখনই মানুষের সেবা ক'রে আপনার জীবনকে সফল করবার জন্ত তাঁর বাঁশিতে বেজে উঠেছে :

এইসব মুচল্লান মুক মুখে

দিতে হবে ভাষা, এইসব শ্রান্ত গুহু ভগ্নবুকে

ধনিনী তুলিতে হবে আশা”.....

শিলাইদহের কল্পজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে বোলপুরের অব্যবহিত প্রান্তরে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে বাঁপিয়ে পড়ার পিছনে রয়েছে সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার এই পিপাসা। মানুষকে সেবা করবার এই যে প্রয়োজন তিনি বোধ করেছিলেন আত্মোপলব্ধির জন্ত—এই প্রয়োজন বোধ থেকেই শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের জন্ম। কবির জীবন ধারার এই যে বিরাট পরিবর্তন—অভিনব পথে কর্মবাদের ধ্বজা উড়িয়ে এই যে জয়যাত্রা—এও এক রকমের জন্মান্তর আর এই জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা কবির একটা প্রচণ্ড মনোহর আনন্দের আশ্বাদন। পুরাতনের সঙ্গে এই বিচ্ছেদকে কবি সানন্দে বরণ করেছেন। নূতন পথে চলার এই অহুভূতিকে তিনি ভাষা দিতে গিয়ে নৈবেদ্যের একটি কবিতায় লিখেছেন :

প্রকৃতির বুকে

লালন ললিত চিত্ত শিশুসম স্নেহে

ছিহ্ন শুয়ে, প্রভাত শরীরী সন্ধ্যাবধু
নানা পাত্রে আনি দিত্ত নানাবর্ণ মধু
পুস্প গন্ধে মাখা।

আজি সেই ভাবাবেশ,
সেই বিহ্বলতা যদি হ'য়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে.
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হ'তে রাজপুরে
এবার এনেছো মোরে—দাও চিন্তে বল।
দেখাও সত্যের মুক্তি—কঠিন নির্মল!

আর একটি কবিতায় রয়েছে :

কর মোরে সম্মানিত নববীর বেশে,—
দুরূহ কর্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায় পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষত চিহ্ন অলঙ্কার! ধৃত কর দাসে
সফল চেষ্টার আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করে দাও সক্ষম স্বাধীন।

ভাবের ললিত ক্রোড় থেকে কর্মক্ষেত্রের কঠিনতার মধ্যে
জন্মান্তর গ্রহণ করবার জন্ত কবির এই যে ব্যাকুলতা—এ
ব্যাকুলতা কেন? কারণ কর্মের দায়কে স্বীকার করে
আমরা সমাজের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে প্রেমের
উপর প্রতিষ্ঠিত করি। আর দশজনের পরিশ্রমে উৎপন্ন
সামাজিক সম্পদের উপরে ভাগ বসাবো কিন্তু সমাজকে
দেবার বেলায় কড়ে আঙুলটিও নড়াবো না—এমন অলস
মানুষকে শাস্ত্রে তত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজের
সম্পদ সৃষ্টির কার্যে সবাই যদি অংশ গ্রহণ করে তবেই
সমাজের সবাইকে দারিদ্র্যের দুঃখ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।
এইজন্তই বলা হয়েছে—কাজ না করার চেয়ে কাজ করা
ভালো। কাজ না করার মধ্যে রয়েছে বর্বর স্থলভ স্বার্থ-
পরতা—। মানুষের আত্মপ্রকাশের পথ সেখানেই প্রশস্ত
হয়েছে যেখানে মানুষ দারিদ্র্যের অভিলাষ থেকে মুক্তি
পেয়েছে সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে। মানুষ দারিদ্র্যের
অভিলাষ থেকে সেখানেই মুক্তি পেয়েছে যেখানে সম্পদ-
সৃষ্টির কাজে সব মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে
প্রস্তুত হ'য়েছে। বর্বরতার স্তরে যারা রয়েছে আত্মপ্রকাশের
পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হ'য়ে রয়েছে তাদের মারাত্মক

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা। এইদিক থেকে চিন্তা ক'রেই রবীন্দ্রনাথ
The Religion of man—এ লিখেছেন : The
history of the growth of freedom is the
history of perfection of human relation-
ship. মানুষের সম্পর্ক যতই পূর্ণতা লাভ করেছে—ততই
সে আপনাকে মুক্ত করতে পেরেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের
সম্পর্কে পূর্ণতা লাভ করতে দিচ্ছে না। যে সকল কারণ
—তার অন্ততম হচ্ছে নিজের আত্মাকে বাঁচাবার উদগ্র
কামনা। চারিদিকের সহস্র সহস্র মানুষ খেতে পরতে
পাক আর না পাক...সেটা বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা
হ'চ্ছে আমার আত্মার মুক্তি। এই যে আত্মাকে বাঁচাবার
জন্ত বৈরাগীদের ঐকান্তিক প্রযত্ন...এটা হ'চ্ছে টাকার থলিকে
বাঁচাবার জন্ত বেনেদের অতন্ত্র চেষ্টার মতোই স্বার্থপরতার
কলুষিত। Edward Carpenter ঠিকই বলেছেন :

“এমনি ক'রে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার এবং খৃষ্টান ধর্মের দ্বারা
শাসিত সমস্ত আধুনিক যুগটা প্রেমধর্মের বিকাশের পথে
মারাত্মক হয়েছে। এই দুটো দিরাট আন্দোলনই মানুষের
সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করেছে তার ব্যক্তিগত মুক্তির
মাহাত্ম্যের পানে; খৃষ্টানধর্ম জাগিয়েছে আত্মাকে বাঁচাবার
কামনা আর বৈশ্যধর্ম জাগিয়েছে টাকার থলিকে বাঁচাবার
কামনা।”

ধর্মসাধনার নামে এই যে কর্মযজ্ঞে সকলের সঙ্গে
মিলনের আদর্শকে অস্বীকার ক'রে নিজের কল্যাণ চিন্তার
মধ্যে একান্তভাবে নিমগ্ন হ'য়ে যাবার অহুদারতা...এই
অহুদারতার বিরুদ্ধে কার্পেন্টারের মত রবীন্দ্রনাথেরও
অভিধান।

বিশ্ব যদি চলে যায় কাদিতে কাদিতে

একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে...

এই বাণী যে একদা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকেও উৎসারিত
হ'য়েছিলো...তার মূলে ছিলে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয়
ভালোবাসা। সকলের সঙ্গে এই ঐক্যের স্নগভীর অনুভূতিই
তাঁর হস্তে তুলে দিয়েছে কর্মবাদের জয়ধ্বজা।

এই অনুভূতি থেকেই বেরিয়ে এসেছে :

ভজন পূজন সাধন আরাধনা

সমস্ত থাক পড়ে।

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে

কেন আছি স্তব্ধ ?

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে

কাহারে তুই পূজিস্ সন্ধ্যাপনে ;

নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে

দেবতা নাই ঘরে।

বিলেতের একটি স্কুলে কয়েকদিন

শ্রীফুল্লরা রায়

মা বাবার সঙ্গে যেদিন অক্সফোর্ডের একটি প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হতে গেলাম সেদিন কত রকম ভাবনাই না আমার ছেলেমানুষ মনে এসে জুটলো। মেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারবো কি না, তারা কি রকম ব্যবহার করবে, পড়াশুনো সব সমানে করে উঠতে পারবো কিনা সব কিছুই ভাবছিলাম। কিন্তু ভাবনা আমার বেশীক্ষণ রইল না। দু'একদিনের মধ্যেই স্কুল ও আমি দুজনেই দুজনকে একেবারে আপনার করে নিলাম। এতো সুন্দর ব্যবস্থা ছিল সে স্কুলের ও এতো চমৎকার ব্যবহার পেলাম সকলের কাছ থেকে যে খুব আনন্দের সঙ্গেই কাটিয়ে আসতে পারলাম কয়েক মাস। কি ভাবে সব কাজ করছি হতো ও কি ধরনের নিয়ম কানুন ছিল সে স্কুলের তারই আজ সন্ধ্যাপে বর্ণনা দিচ্ছি।

সকাল নটায় প্রার্থনার পরে ক্লাস আরম্ভ হয়ে একটায় ক্লাস শেষ হতো; মধ্যে এগারোটায় কেবল কয়েক মিনিটের ছুটি ছিল। এই সময়ের মধ্যেই বেশার ভাগ পড়া শেষ হতো; তবে উচ্চ ক্লাসে দুপুরে আরো দু'একটা ক্লাস হতো। একটা জিনিস দেখতাম বাড়ীতে করবার জন্ত খুব কমই পড়া দেওয়া হতো। শিক্ষকেরা যতদূর পারতেন ক্লাসেই সব পড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। বাড়ীতে পড়া করতে দিলেও ঠিক করে দিতেন কতো সময়ের মধ্যে সে পড়াটা করা যায়, কাজেই পড়ার বোঝা নিয়ে কোন দিনই বিব্রত হতে হয়নি।

পরীক্ষার বিষয়েও সে দেশের মেয়েদের ও শিক্ষকদের মনের ভাব সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দেখলাম। কিছুদিন স্কুলে পড়বার পরে শুনলাম পরীক্ষা হবে। আমি তো ভেবেই অস্থির; কিন্তু অল্প মেয়েরা দেখলাম কেউ কিছু গ্রাহ্যও করছে না। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—পরীক্ষা আসছে, কিন্তু কই তোমরা তো পরীক্ষার পড়া পড়তে আরম্ভ করছো না? তারা নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিলো “পড়াতো রোজই করছি, পরীক্ষার পড়া আবার আলাদা করে কি করবো?” পরীক্ষার

সময়ও দেখলাম সকলে নিশ্চিন্ত মনে ক্লাসে ঢুকলো, পরীক্ষাও দিলো। পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি কে কি স্থান অধিকার করলো তা বলা হলো না। মোটামুটি কি রকম ফল হয়েছে তাই জানানো হলো। এও দেখলাম যে কেবল পরীক্ষার ফলের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করতো না। প্রত্যেক দিনের কাজের বিষয় মস্তব্য দেওয়া হতো, এবং কে কি মস্তব্য পেলো তা প্রত্যেক মেয়ে নিজের নিজের ছোট খাতার লিখে রাখতো। মাসের শেষে কে কি মস্তব্য পেয়েছে তা শিক্ষকরা দেখতেন ও নিজের খাতায় লিখতেন। তারপরে স্কুলের সব মেয়েরা এক সঙ্গে হতো এবং প্রত্যেক ক্লাসের প্রধান শিক্ষক মেয়েদের নাম করে পড়ে যেতেন কে কি রকম কাজ করেছে।

পাঠ্য বিষয় মেয়েদের সহজ ও সুন্দর ভাবে বোঝাবার জন্ত অনেক সময় মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করানো হতো। ফরাসী ভাষায় লেখা ‘তিনটি লেবু’ গল্পটি আমরা সকলে মিলে অভিনয় করলাম। ‘রবিন হুড’র গল্প পড়ানো হচ্ছিল; তাই তখনই ব্যবস্থা হলো যে ছোট একটি কাঠের মঞ্চ করে তার মধ্যে ছোট ছোট পুতুল তৈরী করে ‘রবিন হুড’ ও তার সঙ্গীদের কীর্তি কলাপ সেই পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে দেখানো হবে। এতে হাতের কাজেরও সাহায্য হলো, পড়াও হলো। পুতুল তৈরী হলো ও তাদের হাতে পায়ে তার লাগিয়ে মঞ্চর ওপর থেকে তার টেনে পুতুল নাচাবার ব্যবস্থা হলো। মেয়েরা নিজেরাও কখনো কখনো নাটক লিখতো এবং তা অভিনয় করা হতো। আমি থাকতে থাকতেই একটি মেয়ে ল্যাটিনে একটি নাটক লিখলো এবং তা অভিনয় করা হলো।

স্কুলের গ্রন্থাগারটি খুব সুন্দর গোছানো ছিল। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম যে, যে যখন আসছে নিজেই বই বের করে নিচ্ছে, পড়ছে ও আবার ঠিক জায়গায় তুলে রাখছে। কোনদিন কোন বই চুরি যেতে বা হারাতে দেখলাম না।

স্কুলে কেবল যে পড়াই হোঁত তা নয়। খেলাধুলো, জিম্জামাটিক সঁতার কাটা সবই হতো। দুপুরে একটায় খাওয়া ও অল্প বিশ্রাম হয়ে গেলে আর দু'একটা মাত্র পড়ার ক্লাস হতো, তার পরেই আরম্ভ হতো হাতের কাজ ও খেলা। হাতের কাজ নানা রকমের হতো—মাটি দিয়ে জিনিষ গড়া থেকে আরম্ভ করে ছুতোরের কাজ পর্যন্ত। স্কুলের যা কিছু দরকার হতো সবই প্রায় মেয়েরা করতো। “See saw” করার কথা হ'লো, স্কুলের মেয়েরাই কাঠ কেটে তা তৈরী করলো এবং সেই বছরের শেষে স্কুলের পত্রিকায় লেখা বেরোলো যে স্কুলের প্রধান ছুতোর এবং অস্ত্রাস্ত্রা এবার একটা See saw তৈরী করেছে।

প্রকৃতি শিক্ষার ক্লাস হতো, কিন্তু শুধু বই পড়িয়েই ছেড়ে দেওয়া হতো না। ছোট ছোট জাল ও বোতল নিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে সকলে রওনা হতাম। টেম্‌স্‌ নদীর ছোট খানাগুলোতে গিয়ে, যে পোকামাকড়ের বিষয় পড়তাম সেই সব পোকামাকড় ধরা হতো। বোতলে জল ভরে পোকা তার মধ্যে ছেড়ে স্কুলের aquarium এ নিয়ে আসা হতো। প্রত্যেক দিন আমরা তাদের খেতে দিতাম আর লক্ষ্য করতাম কোন পোকাটি কি করে ও কি ভাবে থাকে।

প্রত্যেক সোমবার বিকেলে আমাদের নকল হাউস অফ কমন্স বসতো। মেয়েরাই তাতে প্রেসিডেন্ট, স্পিকার ইত্যাদি সাজতো ও হাউস অফ কমন্স-টিক ঘরকম ভাবে কাজ করত। হয় ঠিক সেই রকম ভাবেই সব কাজ করা হতো। Oxford (অক্সফোর্ড) এ সেই সময় একটি নির্বাচন হলো। যেদিন সত্যিকার নির্বাচন হবে তার আগের দিন আমাদের স্কুলেও সেই রকম নির্বাচন হলো। হগ ও লিগুসে কনসারভেটিভ ও লেবার পার্টির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের স্কুলেও দুটি মেয়ে হগ ও লিগুসে সাজলো। পোষ্টার লাগানো হলো। মজার কাণ্ড এই যে আমাদের স্কুলে হগ জিতলেন ও পর দিন নির্বাচনেও হগ জিতলেন।

নিয়মানুবর্তিতা যাতে রক্ষা হয় ও যাতে প্রত্যেক মেয়েরই দায়িত্ব জ্ঞান বোধ হয় সে জন্তও ব্যবস্থা ছিল। মাসের প্রথমে প্রত্যেক মেয়েকে তার ক্লাসের প্রধান শিক্ষক কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরী কিছু নকল পাউণ্ড শিলিং পেন্স দিতেন। প্রত্যেক অপরাধের জন্ত কতো জরিমানা দিতে হবে তা ঠিক

করা ছিল। কোনও মেয়ে অপরাধ করলে তখনই তাকে জরিমানা করা হতো ও সেই জরিমানার রকম সে তার নিজের খাতায় লিখে রাখতো। মাসের শেষে যেমন পড়ার রিপোর্ট পড়া হতো সেই রকম কার কত জরিমানা হ'ল তাও শিক্ষকরা সকলকে জানিয়ে দিতেন। এ ছাড়া ক্লাসে কেবল একটি monitress থাকতো না। প্রত্যেক মেয়ের ওপর এক একটি দায়িত্ব থাকতো। একজন ক্লাস পরিষ্কার রাখতো। একজন ক্লাস ফুল দিয়ে সাজাতো, এক জন কালির দোয়াতে কালি আছে কিনা দেখে রাখতো, আরেকজন মেয়েদের বাড়ীর কাজের খাতা সংগ্রহ করে শিক্ষকের ঘরে দিয়ে আসতো ইত্যাদি। যে মেয়েরা ছোট ছিল, (যেমন আমি) একটি করে বড় মেয়ে তাদের অভিভাবিকা হতো। অভিভাবিকা সব সময় তার মেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, ঠিক মতন খাওয়া দাওয়া করছে কিনা সব দেখাশুনো করতো। এগারোটার সময় যে ছুটি হতো তখন প্রত্যেক অভিভাবিকা তার মেয়েকে হাত মুখ ধুইয়ে চুল আঁচড়িয়ে খাইয়ে ক্লাসে ফেরৎ পাঠাতো। আর একটার খাবার সময় প্রত্যেক অভিভাবিকা তার মেয়েকে পাশে নিয়ে খেতে বসতো ও সে ঠিক ভাবে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে পারছে কিনা দেখতো। খাবার টেবিলের ভব্যতা শিক্ষার ভার তার ওপর ছিল।

শিক্ষকদের খুব সহজ ভাব ছিল। মেয়েদের সঙ্গে তাঁরা যথেষ্ট খেলাশেষা করতেন। মেয়েদের মা বাবাদের সঙ্গেও তাঁরা যথেষ্ট বোগাযোগ রাখতেন। প্রত্যেক মেয়েকে বুঝিয়ে দেওয়া হতো যে সে স্কুলের একটি খুব মূল্যবান অংশ, এবং এই বোধ থাকাতে প্রত্যেকেই তার কাজ ভাল ভাবে করতে চেষ্টা করতো। দুই মিনি অনেক রকম করতো মেয়েরা, কিন্তু তার মধ্যে বেশীর ভাগই দেখতাম নির্দোষ দুই মিনি—আমাদের জন্ত। সব থেকে ভাল লাগতো যে প্রত্যেকটি মেয়ে সজীব স্ফুর্তিবাজ ছিল। আরো ভাল লাগতো এই যে যেমন নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা হতো এক দিকে, অন্য দিকে সেই রকম সহজ ও সুন্দর ভাবে সব কাজ হতো। তাই যখন কিছুদিন পরে সে স্কুল ছেড়ে আমাদের চলে আসতে হলো তখন খুবই কষ্ট হলো। তবে চলে আসতে হলো ও এই যে চমৎকার স্মৃতিটুকু থেকে গেছে মনে সেইটুকু আমাদের চিরজীবন আনন্দ দেবে।

নাস ডেভিস

অনুবাদ: শ্রীশান্তিপ্রী নাগ

দক্ষিণ ওয়েলসের ট্রেজেনী জেলার পার্শ্বত্যা খনিগুলিতে যারা কাজ করতো তাদের নিয়েই এখানে বেশ একটা বড় সড় গ্রাম গড়ে উঠেছিলো। ওলওয়েন্ ডেভিস সত্য হাঁসপাতাল থেকে পাশ করে বেরিয়ে যখন এখানে নাসের কাজ নিয়ে এলো তখন তার বয়েস মোটে বাইশ। তার বাড়ীটা ছিলো গলির মধ্যে। একটা মাত্র ঠাণ্ডা স্যাঁত-স্যাঁতে ঘর নিয়েই সে থাকতো, ঘরে আসবাব প্রায় ছিলনা বলেই হয়।

গ্রামের লোকরা একেবারেই মিশুক ছিলনা। বিবাহাদি ব্যাপারের ক্ষত্রে তারা বহু বছর ধরে কখনও নিজের গ্রামটির গভীর বাইরে যায় নি, কাজেই এই নবাগতকে তারা কোনও রকম সাদর আহ্বান জানালেনা।

গ্রামের লোকের কাছ থেকে এতটা বিরুদ্ধতা সে আশা করেনি—কিন্তু তবুও সে দৃমবার পাত্রী নয়। পরম আগ্রহে, ওলওয়েন্ নিজের নির্দিষ্ট কাজে বাঁপিয়ে পড়ল। ওর কাজ ছিল অস্থস্থদের বাড়ী গিয়ে সেবা করা, কারণ গ্রামে কোনও হাঁসপাতাল ছিলো না।

প্রথম রোদে কনুকে ঠাণ্ডা ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে দিনের পর দিন, এবড়ো খেবড়ো সৰু পাছাডী রাস্তা ধরে, সে কাছের ও দূরের সব রকম রুগীদের সেবা করতে যেতো। গ্রামের স্বাস্থ্য সমিতি থেকে ছোট্ট যে দাতব্য চিকিৎসালয়টি খুলেছিলো সেখানে যে অল্প কজন থাকত তাদের ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থাও সেই করত। কিন্তু তার কাজের পদ্ধতিতে ঐকান্তিকতা থাকলেও সব সময় যে সে ঠিক ডাক্তারী শাস্ত্র মেনে চলতে পারত তা নয়। কে তাকে সাহায্য করবে?

গ্রামের একমাত্র ডাক্তার বলতে, ডাক্তার গ্যালোই ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধ, অত্যন্ত অলস এবং তাঁর পানভাসের মাত্রা বহুদিন হোল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই ডাক্তারী শাস্ত্রটাও যে তাঁর কতটা মনে আছে সে সন্দেহে ঘোর সন্দেহ। অতএব এর কাছ থেকে নাস ডেভিস কোনও সাহায্যই পেতো না।

এই প্রতিকূল আবহাওয়ায়, তরুণী নাস টিকে বারবার কষ্টব্যচ্যতির প্রলোভনের সম্মুখীন হোতে হয়েছে।

সে এখানে আসার অল্প কিছুদিন পর যখন গ্রীষ্মকাল সবে শেষ হয়ে আসছে তখন হঠাৎ ট্রেজেনী জেলার খুব খারাপ রকম আরক্ত জরের মড়ক লাগল। রোগটা কি ভাবে কমানো যায় এবং কতখানি প্রস্তুত হয়ে তার সংগে লড়াই উচিত, এসব বিষয় নির্দেশ পাবার আশায় যখন ওলওয়েন্ ডাক্তার গ্যালোর কাছে এলো, তখন তার সব আশার মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি বিরক্তিপূর্ণ ধমক দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। এ রোগের মড়ক ট্রেজেনীতে প্রথম নয়, কিন্তু ডাক্তারের সাহায্য বিনা ও গ্রামের লোকের সহায়তা ভিন্ন, এর উচ্ছেদ কল্পনাভীত। রোগীর সেবা করা ও রোগের নির্মম আঘাত সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু তরুণী নাস টি পণ করে বসল এই ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন সে হবেই। কুয়োর পানীয় জল, গরুর দুধ প্রভৃতি যেসব জিনিসে বীজাণু জন্মায়, তার নমুনা সংগ্রহ করে সে কাউন্সিল সহরের স্বাস্থ্য বিভাগে সেগুলি পরীক্ষা করতে দিয়ে এলো। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে টেলিগ্রামে খবর এলো, মরগান নামক দুধের ব্যবসায়ীর গরুর দুধে বীজাণু পাওয়া গেছে, কাজেই তার দুধের ব্যবসা সম্প্রতি কিছুদিন একেবারে বন্ধ রাখতে হবে।

খবর আসা মাত্র সারা গ্রামে আবার সাড়া পড়ে গেল “এটা অনধিকার চর্চা!” ইউওয়াল মরগান গ্রামের বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক। বিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি তিনি, গ্রামের সবচেয়ে বড় গির্জার ধর্মযাজকের পদেও তিনিই প্রতিষ্ঠিত, কাজেই তিনি এ ব্যাপারটাকে সন্ধানহানিকর মনে করে নিজের রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। পথে যেদিন প্রথম ওলওয়েনের সংগে দেখা হোল, সেইদিন তিনি ক্রোধান্বিত আশ্ফালনের সংগে তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, স্বাস্থ্য বিভাগের হুকুম অমান্য করে তিনি ট্রেজেনী গ্রামের লোকদের আগেকার মতো দুধ বিক্রী করতে থাকবেন।

এই নিষ্ঠুর ভাগ্য পরীক্ষা আরও কতো অভাবনীয় অবস্থার মধ্যে যে এই তরুণী নাস টিকে টেনে নিয়ে যেতো তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু হঠাৎ মরগান নিজেই এই কঠিন রোগক্রান্ত হয়ে পড়ায় অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। ভদ্রলোক প্রায় প্রৌঢ়ের গাউনে পা দিলেও বিবাহ করেন নি; কাজেই একজন বৃদ্ধ প্রায়-অন্ধ চাকর ছাড়া সেবা করবার আর তাঁর কেউই ছিলো না। প্রাপ্তবয়স্করা এই রোগক্রান্ত হোলে অত্যন্ত সাংঘাতিক ভাবেই আক্রান্ত হ'ন এবং এর বেলাও তাই হোল।

ওল্ডয়েন মরগানের অন্ধকার ঘরটায় ঢুকেই দেখল তিনি নিজের সৰু খাটটার শুয়ে প্রলাপ বকছেন ও যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছেন। সে তৎক্ষণাৎ নিজের কাজ আরম্ভ করে দিল। সে বিছানাটার ময়লা চাদর বদলে নতুন বিছানা পাতল। মরগানের গা মুছিয়ে মুখ ও জিভ পরিষ্কার করে তাঁর জরের তাপ নিয়ে কাগজে লিখে রাখল এবং তাঁকে ওষুধ খাইয়ে বালিশে ঠেঁশান দিয়ে শুইয়ে রাখল। রান্নাঘর থেকে নিজেই খানিকটা দুধ সাগু বানিয়ে এনে খাওয়ালো। সবশেষে বুড়ো চাকরটাকে রোগীর সেবা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কয়েকটা কথা বুঝিয়ে দিয়ে সে তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে অন্ধ আর একজন রুগী দেখতে রওনা হোল।

মরগানকে নিয়ে বেশ কিছুদিন যমে মাছুষে লড়াই চলল; কিন্তু অবশেষে অবস্থাটা ভালোর দিকেই ফিরল। ক্রমশঃ তিনি যখন শক্তি ফিরে পেলেন, তখন থেকে সারাক্ষণই তাঁর দৃষ্টি এই মূর্খিতার সেবার প্রতিটি চলা ফেরা অল্পসরণ করতে থাকতো। মরগান ছিলেন স্বল্পভাষী, কিন্তু ওল্ডয়েন তাঁর কৃতজ্ঞতাটা দৃষ্টির মধ্যে থেকে অল্পভব করতে পারতো এবং যেদিন সে তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে এলো, সেদিন তিনি পরম বন্ধুর মতো তার সঙ্গে করমর্দন করার পর তার হাতে যত্ন চাপ দিয়ে আগেকার অভিজ্ঞতার জন্ত মাপ চাইবার মতো করে আড়ষ্ট ভাবে কি সব বলবার চেষ্টা করলেন। ওল্ডয়েন কথাগুলো বুঝতে পারলনা বটে, কিন্তু তার উৎকল্ল মন বিজয় গর্বে বলে উঠল—মরগানকে আজ থেকে তোমার পরম বন্ধু বলে জেনো।

মরগান যেদিন থেকে সুস্থ মাছুষের মতো আবার চলা ফেরা শুরু করলেন, সেদিন থেকে তিনি মুক্তকণ্ঠে সকলের

কাছে তরুণী নাস টির গুণগান ও তার কাছে তাঁর ঋণের কথা বলে বেড়াতে লাগলেন; সেই সংগে তিনি তাঁর আগেকার সব ভুলত্রুটি ও স্বীকার করলেন। এরপর থেকে ওল্ডয়েন বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করতে শুরু করল যে গ্রামের লোকের তার প্রতি শ্রদ্ধা দিনদিনই একটু একটু করে বেড়ে চলছে। জুকুটিকুটিল অসন্তুষ্ট দৃষ্টি আর তো সে দেখতে পায় না! সে কাছে এলেই আর তো সবাই অদ্ভুত ভাবে হঠাৎ কথা খামিয়ে চুপ করে যায় না। গ্রামের লোকেরা যেন একসঙ্গে তার জন্তে তাদের ঘরের ও মনের দুয়ার প্রশস্ত ভাবে খুলে দিয়েছে। ক্রমশঃ ইকুলের পথে যেতে যেতে ছোট ছেলে মেয়েরা দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে তাকে অভিবাदन জানিয়ে যায়—খনি থেকে কাজ করে ফেরবার পথে সব কর্মীরা তাকে হাসিমুখে সন্তাষণ জানায়; এমনকি এমনও অনেক দিন যায় যখন তাকে, কাজের পথে যাবার মুখে, রাস্তা থেকে ডেকে এনে, বৃদ্ধারা বাড়ীর তৈরী মিষ্টি ও চা হাতে তুলে দিয়ে, চুল্লীর ধারে বসিয়ে তাদের স্বথ হুঃখের কথা শোনান।

তারপর, সেই বছরের শেষে একদিন খুব ঘট্য করে, ইড্‌ওয়াল মরগানের নেতৃত্বে একটা স্থানীয় সমিতি গঠন করে, তাকে একটা খুব দামী বাইসাইকেল উপহার দেওয়া হোল। সাইকেলটি অত্যন্ত দ্রুতগামী, সব রকম আবহাওয়ায় চালাবার উপযুক্ত করে তৈরী। এই জিনিষটি কিনতে গ্রামের লোকদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বিশেষ করে এই উপত্যকার তখন বেশ দুর্দিনই চলছে; অনেকগুলি খনিরই প্রায় অর্ধেক কাজ বন্ধ। কাজেই ছ'চার পেনী করে চাঁদা তুলে যেটুকু অর্থ জমা হয়েছিলো তা থেকে বহকটে সাইকেলের কিছুদাম উঠেছিলো। কিন্তু ওল্ডয়েনের কাছে এই উপহারটি অমূল্য হয়ে উঠল। এটি পাবার পর দৈনিক দশ মাইল হেঁটে রুগী দেখার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেলো।

এই সাইকেলে চড়ে একদিন একটি রুগীর বিষয় আলোচনা করবার জন্ত নাস ডেভিস আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেইদিনই আমি তাকে প্রথম দেখলাম। তার বয়স তখন প্রায় ত্রিশ। লম্বা চওড়া স্বগঠিত দেহ, মুখে ছেলেমাছুষের মতো কোনো ভাব ধরা পড়ে না—কিন্তু তার ধূসর চোখ দুটির স্থির সরলতা ও নিষ্ঠার সম্পষ্ট ছাপ,

যেন তার একনিষ্ঠ উদার মনের কথাই বলছে। আমি তখন গবেমাত্র মেডিক্যাল ইন্সল থেকে পাশ করে ডাক্তার গ্যালোর জায়গায় এসেছি। নিজের অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সব সময়েই আমি সচেতন থাকতাম—কেবলই ভয় করতো এই বুঝি কিছু বিভ্রাট বাধিয়ে বসি। কিন্তু নাস'ডেভিসের সংগে প্রথম সাক্ষাতেই আমি যেন অনেকটা মনে বল পেলাম। ওর বিশেষ কয়েকটি ব্যবহারে আমার মনের ভয়, সংশয় ও দ্বিধা যেন কুয়াসার মতো মিলিতে যেতো। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তার বিশেষভাবে দাঁড়াবার ভঙ্গী; কান্নার ক্ষত বাঁধবার সময় বা অস্ত্রোপচার করবার সময় তার ক্রিপ্র ও দৃঢ় হস্তে যন্ত্রপাতি ও ব্যান্ডেজ নাড়াচাড়া করার ধরণ; আমি যখন কোনো কাজ করতে হঠাৎ নিদারুণ দ্বিধার মধ্যে পড়ি, তখন তার বারংবার আশা দেবার চেষ্টা ও কোনো বিষয়ে আমি কৃতকার্য হোলে তার শান্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার নীরবে উৎসাহ দেওয়া, সবার মধ্যেই আমি আশা, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসের বাণী শুনতে পেতাম।

প্রায়ই মাঝরাাত্রে জীর্ণ পুরাতন কোনো বাড়ীর সফ্রু ছাতের ঘরে যখন কোনো রুগীর জীবন রক্ষা করবার জন্ত আমরা দুজনে প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলেছি—তখন তার অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখে আমি বারংবার বিম্বিত হয়েছি। খনির মধ্যে মাটি ধসে পড়ে যখন সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে তখনও সে তার সেই অপরিহার্য সাইকেলটি চড়ে আমার অনেক আগেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। প্রশান্ত স্মিতমুখে, নির্ভীকভাবে সে স্ট্রেচারবাহকদের পাশে এসে দাঁড়াতো, সময় হোলেই খনির মধ্যে প্রবেশ করবে। নিজের অজ্ঞাতসারে অকুণ্ঠচিত্তে স্বার্থত্যাগ করাই ছিলো তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরহিতব্রতই ছিলো তার জীবনের মূলমন্ত্র। তার সকল চিন্তাই ছিলো অত্মকে ঘিরে। শঙ্কিত, বিষন্ন ও দুঃখভারাক্রান্তকে কয়েকটি সমবেদনা ও আশার কথা বলবার জন্য কোনোদিনই তার সময় কম পড়তো না। যখন কোনও রুগীর বাড়ী থেকে জরুরী ডাক আসত তখন রাত্রির যে কোনও সময়েই শয্যা ত্যাগ করতে তার ক্লান্তি বোধ হত না।

কিন্তু তা বলে যে সে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কঠোর ধার্মিকের জীবন-যাপন করতো তাও নয়। সে কড়া চা বা

কফি পান করতো ও পরের জীবনে ধূমপানও শুরু করেছিলো। গ্রামে অনেকগুলি গির্জা থাকা সত্ত্বেও, তাকে খুব অল্পদিনই গির্জা যেতে দেখা যেতো। জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে কৈফিয়ৎ দিতো—আমি বড় ব্যস্ত। অথচ যতদিন আমি তার সংগে কাজ করেছি—তাকে কখনও কান্নার বিষয় নিন্দা করতে বা কটুকথা বলতে শুনিনি। সে খুব বুদ্ধিমতী ছিলোনা, কিন্তু তার উপস্থিতবুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান যা ছিলো তেমন অনেকের মধ্যেই তুলনীয়।

এই কথা বলতেই একটি অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিন বহু দূরে নিরালা একটি কুঠীতে আমি ডিফুথিরিয়া রোগাক্রান্ত একটি শিশুর গলায় অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হয়েছি। কাজ শুরু করে দিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ বৈজ্ঞানিক আলো দপ করে নিভে গেলো। আমি মসীকৃত অন্ধকারের মাঝে ফণিকের জন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো স্তম্ভিত ও অসহায় ভাবে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখনই নাস'ডেভিস চট করে ঘরের বাইরে গিয়ে তীব্র একটা আলো হাতে ফিরে এলো—সেটার সাহায্যে আমার সেদিনকার অস্ত্রোপচার সুসম্পন্ন করা সম্ভব হোল। পরে জানলাম আলোটা তার সাইকেলের বৈজ্ঞানিক বাতি।

সেই পুরণো কালো সাইকেলটা যেন তার শরীরেরই একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রাত্রিবেলা কোনো জরুরী কাজ সমাপনের পর আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম—সে সর্বদা আমাকে গরম এক পেয়ালো চা বা কফি তৈরী করে দিতো—সেটুকু খেয়ে অনেকাংশে আমার ক্লান্তি নিবারিত হোত। কিন্তু তারপর আর সে এক মুহূর্ত দাঁড়াতো না—তার ছোট মাথাটি নেড়ে ক্ষুদ্র একটি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, সাইকেল চড়ে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে, নিজের বাসা বাড়ীটিতে ফিরে যেতো।

ঐ সাইকেলটা নিয়ে আমি ওকে প্রায়ই ক্যাপাতাম। ওকে বলতাম 'ঐ দুটো চাকার সংগেই শেষে তুমি গাঁটছড়া বাঁধলে। এখন চেষ্টা করলেও ওকে তুমি ফেলে পালাতে পারবে না, সারা জীবন ওর সংগেই ঘর করতে হবে।'

এমনিভাবে দ্রুতগতিতে তিনটে বছর কেটে গেলো। তারপর একদিন আমি লণ্ডন সহরে একটা খুব ভালো কাজের সন্ধান পেলাম। আমার বিশেষ বন্ধু ও সহকর্মী

নাস' ডেভিসের সঙ্গীত হওয়ার কথা ভেবে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু সেই বারবার করে আমার বোঝালো—যে মানুষের জীবনে এমন স্বযোগ হবার আসে না, কাজেই আমি স্বেচ্ছা অবিলম্বে রওনা হই। নাস' ডেভিসও তো এমনি একটা স্বযোগে পদোন্নতি লাভ করতে পারে এই ভেবে আমি মনকে প্রবোধ দিলাম।

বহুদিন পরে অনেক ক্ষতি ও লোকসানের আঘাত খেয়ে অবশেষে ট্রেজেনী কোম্পানীর কয়লার খনিগুলি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ব্যবসা চলছে খুব ভালো ভাবে, লাভও হচ্ছে প্রচুর। এইবার কোম্পানীর অধ্যক্ষরা মিলে ঠিক করলেন শহরটিতে একটি হাঁসপাতাল খুলতে হ'বে এবং তার ভার নিয়ে সেখানে স্থায়ী ভাবে একজন বড় ডাক্তারও থাকবেন। আমি মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ভালোমত এইবার ওলওয়েন নতুন হাঁসপাতালের প্রধান নাস' হয়ে আসবে, তার অবস্থাও স্বচ্ছল হবে।

আমি লগুন যাত্রা করার কিছু আগে ভার্যাক্রান্ত মনে ওলওয়েনের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। অল্প কথাবার্তার পর আমি ওকে বললাম—“আর কি, এবার তো তোমাকে সাইকলটার কাছ থেকেও বিদায় নিতে হ'বে। সমস্ত হাঁসপাতালের ভার পেলে আর তো ওটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না।”

নাস' ডেভিস আমার মুখের উপর তার স্থির দৃষ্টি তুলে বল্লো—“না, হুখের সংগে জানাচ্ছি ওটা আমার এখনও দরকার হ'বে। আমি তো হাঁসপাতালের প্রধান নাস'র কাজটা পাচ্ছি না।”

“কি?”—আমি বিষয়ে চীৎকার করে উঠলাম। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম—“এই জেলাটার জন্ত প্রাণ দিয়ে খেটে তুমি এই পুরস্কার পেলে? কিন্তু কেন? মরগান, গ্রামের লোকরা—সবাই তো তোমাকে চায়।”

ধীর শান্তকণ্ঠে সে উত্তর দিলো—“তা হোতে পারে—কিন্তু নতুন ডাক্তারটি তাঁর প্রধান নাস'কে কার্ডিফ থেকেই সংগে করে আনবেন। মহিলাটি আমার চেয়ে এ বিষয়ে আরও অনেক বেশী শিক্ষালাভ করেছেন। তিনিই কাজটি পাবেন।”

“অসম্ভব,” আমি সজোরে বলে উঠলাম।

নির্মূল উদার হাস্যে মুখটি উদ্ভাসিত করে সে বল্লো : “অসম্ভব কেন হোতে যাবে—কোম্পানী থেকে তাঁর কাজ তো মঞ্জুর হয়ে গেছে।” —কি প্রশান্ত ওর মুখটা, কোথাও কোন হিংসা ঘেঘের লেশমাত্র নেই। সে আবার বল্লো : “আর তাছাড়া ভালোই হোল। ঐরকম বিরাট ব্যাপার সামলানো আমার কোনদিন অভ্যাস নেই। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার নিয়মও যা জানতাম, তা'তেও মরচে পড়ে এসেছে।” স্মিতহাস্যে ওর সারা মুখটা ঝলমল করে উঠলো—“আমি এই ছোটো চাকার উপর ভর করে সারা গ্রামটা চষে বেড়াতে পারলেই সব চেয়ে খুশী থাকবো, নিজের মতো করে কাজও এভাবেই বেশী ভালো পারবো।”

* * *

বহুবছর পরে আবার আমি একবার ট্রেজেনীতে বেড়াতে আসি। অতি পরিচিত খোয়া বাধানো রাস্তা ধরে চলতে চলতে পুরনো দিনের কতো স্মৃতিই মনে ভীড় করে আসতে লাগলো।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার বাড়ীর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইডুওয়াল মরগান। এতগুলো বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সে তেমনি বলিষ্ঠ সবলই আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম সে এখনও হুখের ব্যবসাই করে। আমাদের দেখবামাত্র চিনতে পেরেই সে এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করলো। আমি ব্যগ্রভাবে ওর কাছ থেকে নাস' ডেভিসের খবর বার করবার চেষ্টা করলাম। মরগান ত্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে খানিক পরে বল্লো : “ওর হুখটনার কথা শোননি?”

অমল্ল আশঙ্কায় চমকে উঠে, মাথা নেড়ে শুধু জানালাম—“না”।

ঠোট ছোটোকে প্রাণপণে টিপে মরগান এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো : “প্রায় বছর হয়েক হোল ব্যাপারটা ঘটেছে। একদিন ভীষণ হুখোয়গের রাতে, বুটবুটে আঁধার পথ বেয়ে ও এক কুণীর বাড়ী যাচ্ছিল। পথে একটা বিরাট গাছ পড়েছিলো—ও দেখতে না পেয়ে সোজা এসে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পুথের ওপর পড়ে যায়। সেই ভীষণ বড় বৃষ্টির মধ্যে হুখটা ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকার পর—আমরা ওকে খুঁজে পাই।”

আমি আতঙ্কিত হয়ে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম : “কিন্তু……ও সেরে উঠেছিলো তো ?”

মরগান কোনোও উত্তর দিলো না। অনেকক্ষণ শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর, আমার হাত ধরে নীরবে পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। মরগানের পাশে হাঁটতে হাঁটতে, মাঝে মাঝে আমি ভয়ানক চোখে ওর পাথরের মতো কঠিন, ভাবলেশশূন্য মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ও কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমায় ? তবে কি, শহরের শেষের সেই টিলাটার দিকে আমায় ও নিয়ে যাচ্ছে……বার পিছনে সমাধিগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে?

সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে ও হঠাৎ বলে উঠল, “তুমি বোধহয় জানেনা। আমি ওকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু ও আমাকে গ্রহণ করলো না। ও বড্ড কাজে জড়িয়ে পড়েছিলো কিনা।” মরগান একটু থামলো। “হ্যাঁ, ওর কাজই যে ওর প্রাণ, কাজই যে ওর প্রাণ।”

ওর গলার সুর শুনে আমি আরও নিরাশ হয়ে পড়লাম। কিন্তু হঠাৎ ওর কঠিন মুখটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। আমার দিকে ফিরে, আমার পিঠের উপর সজোরে এক চাপড় মেরে বলল : “ও রকম মুখ করছো কেন হে ডাক্তার, যতটা খারাপ ভাবছ, ব্যাপারটা তোমার তত খারাপ নাও লাগতে পারে।”

হঠাৎ একটা সরু গলি দিয়ে ও আমাকে কোথায় যেন নিয়ে এলো। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি……‘আরে এ যে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি!’ আমি প্রায় অন্ধের মতো মরগানের অহুসরণ করলাম। তারপর বাস্পাচ্ছন্ন দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যা দেখলাম তা’তে আমার হৃৎপিণ্ডটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো।

ঐ তো, একটা রুগীদের ঢাকা লাগানো চেয়ারে বসে আছে আমাদের নাস ডেভিস। আগের চেয়ে অনেক রোগী হয়ে গেছে, সামনের দিকে অল্প একটু হয়েও পড়েছে যেন, মাথার চুলগুলি সাদা, চলৎশক্তির হিত পা ছোটো একটা কবলে ঢাকা, গায়ে কিন্তু সেই আগেকার মতো খোপ ছরশু, খড়খড়ে ইঞ্জি করা নাসের পোষাক। এখনও রুগীরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে……তবে এরা বেশীর ভাগই শিশু। ছোট ছেলেমেয়েদের ও পরম যত্নে ওষুধ পথ্য বলে দিচ্ছে, কাউকে অল্প স্বল্প ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দিচ্ছে। ওর হুঁচকার চেয়ারের হাতল ধরে নিজেই ঘরের এদিক থেকে ওদিক সেটা চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে……চালাবার ধরণ দেখে মনে হয় অনেক দিনের অভ্যাস।

নীরবে, ঘরের কোণের ছায়ার মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষ রুগীটি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই, ওকে এদিকে ফিরবার অবকাশ পর্যন্ত না দিয়ে, দৌড়ে গিয়ে আমি ওর হাত ছোটো চেপে ধরলাম। সেই শীর্ণ, কশ্মনিষ্ঠ হাত ছোটো…… যারা পঞ্চাশ বছর ধরে আর্ন্ত মানবের সেবা করে চলেছে।

“নাস ডেভিস……ওল্ডয়েন্!” আমি আর্ন্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম……“তুমি সেরে উঠেছ।” সে এক মুহূর্তেই আমাকে চিনতে পেরেছে।

“কেন সারব না? দেখতে পাচ্ছনা……আমি এখনও কাজ করছি।” ওর সেই নির্মল, স্নন্দর হাসিতে সারা মুখটা ঝলমল করে উঠল……“ছোটো চাকার সংগে এখনও আমার গাঁটছড়া বাঁধা রয়েছে।”*

* লেখক এ, জে, ক্রনি।

কিশোর শিক্ষা

শ্রীমুজাতা রায়

এই বয়সের আগে পর্যন্ত ছাত্রদের এক রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন তাদের শিক্ষা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। আগেকার মত কেবল মাত্র শ্রেণীকক্ষ থাকলেই চলবে না, ছুই একটি বিশেষ বিষয়ের ঘরও দরকার হবে—যেমন ভূগোল, বিজ্ঞান, কারুশিল্প ইত্যাদি। লাইব্রেরীর জন্তু একটি ঘর আলাদা করে রাখতে হবে। বাগান করা, জীবজন্তু (poultry) পালন করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যায়াম শিক্ষার এবং নানা সামাজিক আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই বয়সের ছাত্রদের শিক্ষকদের বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এখন বিশেষজ্ঞ ছাড়াও কাজ চলবে না।

“কৈশোরের বিশেষত্ব”

ছেলে মেয়েদের এখন আগে থেকে অভিজ্ঞতা অনেক বৃদ্ধি হয়েছে, অতীতের থেকে তারা অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করেছে, বর্তমানকে অনেক বেশী আয়ত্বে এনেছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অল্পমান করতে শিখেছে। কেবল মাত্র ওই নয়, তাদের নিজের চিন্তাশক্তি ভাবধারা এবং কর্মশক্তি এখন আর আগের মত নেই; এগুলি এমন একটা স্থায়িত্ব এবং দৃঢ়তালাভ করেছে যা সম্ভবতঃ তাদের পরবর্তী জীবনের গতি নির্দেশ করবে।

নিজের শক্তিসমূহকে সে এখন অনেকটা আয়ত্বের ভিতরে নিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ ফুটবল খেলাকে নিলে আমরা দেখতে পাই ৭ বছর বয়সের একটি দলের খেলা এবং ১৩ বছর বয়সের দলের একটি খেলা এক রকম নয়। প্রথম দলটি অনেকটা ব্যক্তিগত ভাবে খেলে এবং নিজের আঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় দলটি নিজের সুবিধা অসুবিধার থেকে দলের মঙ্গলের কথাই বেশী ভাবে। মাসপেশীকে ঠিকভাবে আয়ত্বে আনা কেবলমাত্র শারীরিক ব্যাপার নয়, এটা মানসিক ব্যাপারও বটে। বয়স বৃদ্ধি পেলে ছেলে মেয়েরা কেবল মাত্র চোখের সামনের জিনিষটা দেখে না, চারিদিকের ব্যাপার সম্বন্ধেও তারা জন্সিয়ার হয়। পথে

ঘাটের বিপদ অথবা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার বিপদ কিংবা আগুনে পোড়া ইত্যাদি দশ বৎসর বয়সের পর অনেক কম হয়ে যায়।

এখন নানা রকমের তথ্য একত্র করে তার নিগূঢ় অর্থ সে বুঝতে পারে—যেমন একটি ছবি দেখলে বা গল্প শুনে তার সারমর্ম সে বলতে পারে। কোনও বিশেষ অবস্থার সমস্ত ঘটনা না জানা পর্যন্ত সে বিষয়ে সে তার মতামত মূলভূমী রাখতে পারে।

নানারকম সত্ত্বের প্রতি ও বিদ্যালয়ের সঙ্গীদের প্রতি তার অহুরাগ হয়েছে। এই অহুরাগ তার পরবর্তী জীবনে তাকে বড় হওয়ার পথে নিয়ে যাবে। সেই জন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখতে হবে যে বালকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত হয়। তা না হলে বালকের বিপথে চালিত হবার সম্ভাবনা আছে।

পরবর্তী জীবনে যা সাধন করবার আশা বালক করে তা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা এখনই করা প্রয়োজন এবং সেই জন্তুই এখন ছাত্রদের কাজ নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দরকার। এখনকার কাজ দিয়ে তার ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না একথা মনে হলে সে তার বর্তমানের কাজে অমনোযোগী হয়ে যাবে।

কাজ করবার শক্তি এবং নিয়ন্ত্রনের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে তার মনে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা বিজ্ঞানের এই তথ্যটি মনে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অবস্থা অবাধ স্বাধীনতা বালককে দিলে চলবে না, কারণ স্বাধীনতা ঠিক ভাবে ব্যবহার করবার অভিজ্ঞতা অথবা ভরসা তার নিজেরই এখনও হয় নাই। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তার পরিচয় আরম্ভ হয়েছে মাত্র, সে এখনও নিঃসন্দেহে কাজ করতে শেখেনি এবং শিশু মনোভাব ও বয়সের মনোভাবের এবং ব্যবহারের মধ্যে সে দোহুল্যমান। এইজন্তু সে একদিকে নিজের মনের সব কথা লুকিয়ে রাখতে চায় অতদিকে সামান্য সমালোচনাও সহ করতে পারে না। এই সব ছেলে মেয়েদের

কতকগুলি কাজ নিজের ইচ্ছামত করতে দিলেই শুধু হবে না, সেগুলি কেন করতে দেওয়া হচ্ছে তার কারণও বুঝতে দিতে হবে।

এই বয়সে ছেলে ও মেয়েদের বুদ্ধির গতি এক রকম হলেও পরবর্তী জীবনের আদর্শে অনেক পার্থক্য থাকে। সেই-জন্ত অনেক বিষয়ে তাদের শিক্ষা একরকম হলেও কতকগুলি বিষয়ে তফাৎ করা দরকার। শারীরিক শক্তিতেও অনেক প্রভেদ হয়ে যায়। এই সব কারণে যে সকল স্কুলে সহশিক্ষা নেই সেখানে মধ্যে-মধ্যে বালকবালিকাদের এক-সঙ্গে হয়ে কাজ করবার ব্যবস্থা করা দরকার; যেখানে সহশিক্ষা আছে সেখানে আবার সুযোগ দিতে হবে যেন বালক ও বালিকারা তাদের পৃথক আদর্শের কাজ করবারও সুযোগ পায়।

“সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন”

বয়োবুদ্ধির সঙ্গে ছেলে মেয়েদের সমালোচনা করবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের আচরণ সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। সেই জন্ত কর্তৃপক্ষকে একসঙ্গে দৃঢ়, ত্রায়পরায়াণ, বৈধীনীল এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। বিদ্যালয়ের সমাজই হলো বালকের প্রথম সমাজ। এই সমাজের আদর্শ তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এখানে দৃঢ়তা অথবা প্রজ্ঞার আতিশয্য চলবে না। সময় বিশেষে, যেমন আগুনের ড্রিলের সময়ে অবিলম্বিত (ক্ষিপ্ৰ) আদেশ মানতে শেখাতে হবে, কিন্তু আবার অনেক সময়ে বালকের দোষত্রুটি সম্বন্ধে উদারতাও দেখাতে হবে। সমাজের শাসন সম্বন্ধে ছেলেরা অনেক সময়ে বিদ্রোহী হ’লেও নিজেদের একটা সমাজ গড়ে তোলবার ইচ্ছা তাদের মধ্যেও থাকে। এ বিষয়ে তাদের কাজে সাহায্য করতে হবে। ছোটদের উপরে বড়দের আধা কর্তৃত্ব থাকা উচিত নয়। অনেক সময়েই বড়রা নিজেদের অপরিহৃত আকাজক্ষার শোণ ছোটদের উপরে নিয়ে থাকেন। সমান বয়স্ক লোকদের দিয়ে মালুম যে কাজ করতে পারে না সেই সব কাজের চাপ অথবা যে সব আকাজক্ষা অপূর্ণ থেকে গেছে তার জের অনেক সময় ছোটদের সহ্য করতে হয়। যে সকল লোক নিজের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে, অথবা যারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শিখেছে অথচ অতুলোক সম্বন্ধে সহানুভূতি ও উদারতা সম্পন্ন, কেবল তারাই ছেলে মেয়েদের স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে দিতে পারে।

“স্বরাজের সমস্যা”

সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানদান উদ্দেশ্যে ছেলেদের কিছু কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়, তাকেই perfect system বলে। স্কুলের দৈনিক কার্যক্রম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করবার জন্ত কতকগুলি দায়িত্ব ছেলেদের নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। কিছু দায়িত্ব এমন থাকবে যার অংশ প্রত্যেক ছেলেই পাবে; আর কিছু থাকবে যা বিশেষ অধিকার হিসেবে গণ্য হবে এবং যারা যারা তা পাবার উপযুক্ত তাদেরই দেওয়া হবে। কিন্তু অতুলদের শাসন করবার বিশিষ্ট অধিকার ছই চারিটা বালকের উপর দেওয়া উচিত কিনা সন্দেহ। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালকের মনের ভিতরে বিপ্লবকারী পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং সেজন্ত তার মনে সব সময়েই একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব রয়েছে। স্কুলে এত রকমের কাজ আছে যাতে নেতৃত্বের সুযোগ স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত হয়; সহজ সামাজিক ব্যবহারের সঙ্গেই শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এসে যায়; এই সব স্কুলে বিশেষ করে কর্তৃত্ব করবার অধিকার দিয়ে দেওয়া দরকার হয় না।

“নানা রকমের সজ্জা”

নিয়ম করেই হোক বা না করেই হোক স্কুলের মধ্যে একটা আদর্শ থাকবেই; এবং সেই আদর্শের উপরে ভিত্তি করে স্কুলের ভেতরে ছোট ছোট দল গড়ে উঠবে। যেখানে কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী সেখানে নানা রকমের সজ্জা, ক্লাব ইত্যাদি গঠন করবার নির্দেশ দিয়ে করানো হবে। কিন্তু যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সখ্যের ভাব আছে সেখানে এইগুলি নিজের থেকেই গড়ে উঠবে; এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার সঙ্গে হয়তো এমন কতকগুলি সজ্জা গড়ে উঠতে পারে যেগুলির সম্বন্ধে শিক্ষককে সাহায্য এবং সমালোচনাই করতে হবে। এই সব কাজের জন্ত স্কুলে নিয়মিত পাঠের সময় ছাড়া অত্র সময় দরকার হতে পারে এবং সেই জন্ত স্কুল বাড়ীটী বিকালের দিকে অত্র কোনও কাজে ব্যবহার হওয়া উচিত নয়।

“অভিভাবকদের সহায়তা”

উপরি উক্ত ধরনের যে কোনও কাজ করতে হ’লে অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া হতে পারে না। অনেক সময়েই ছেলে মেয়েদের অবসর সময়ের সখ্য কাজের সঙ্গে অভিভাবকরাও যোগ দিয়ে থাকেন এবং সেই জন্তই স্কুলের নানা কাজেও তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে।

“সামাজিকভাবে একত্রে থাওয়া”

যে সকল ক্ষেত্রে স্কুলের ছেলে মেয়েরা অনেক দূর থেকে আসে সে সব স্থানে ছুপ্তের থাওয়াটা স্কুলেই থাওয়া দরকার হয়ে পড়ে এবং এই ব্যাপারে সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়। আদিম যুগ থেকেই একত্রে বসে থাওয়া বন্ধুত্বের নিদর্শন বলে গণ্য হয়েছে। জীবনে লেখাপড়া শেখা যত মূল্যবান সামাজিকতা শেখাও তার থেকে কম নয় এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিলে প্রত্যেক মানুষেই এটা শিখতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলে মেয়ে খাবার সময়ে যখন এক সঙ্গে হয় তখন সকলের প্রতি মনোযোগ দিতে এবং ভদ্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সাধারণ ভাবে অপরিচিত লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে শিক্ষা পায়। মনের শান্তিতে থাওয়া না হলে সব থেকে ভাল খাবারও শরীরকে ভাল করতে পারে না—এই তথ্যটি উপদেশ ছাড়াই ছেলেরা বুঝতে পারবে। মধ্যে মধ্যে সকলে একসঙ্গে বাইরে গিয়ে কয়েকদিন থাকলে ছেলে মেয়েরা খুব ভাল ভাবেই সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে।

“House এবং Teamএর ব্যবস্থা”

বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ছাত্রদের একসঙ্গে করার পক্ষে House-এর ব্যবস্থা খুব ভাল। শ্রেণীর মধ্যে ছোট ছোট সঙ্ঘ তৈয়ারী করলে নিঃস্বার্থপরায়ণতা বৃদ্ধি পায়। সমবেত ভাবে কাজ করলে প্রত্যেকে বুঝতে শেখে যে সে সমাজে একক নয়, তার কাজের উপরে অন্যের মঙ্গল নির্ভর করছে। কিন্তু বিভিন্ন সঙ্ঘের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম আদর্শ হওয়া উচিত নয়, সম্ভব হলে নিঃস্বার্থের স্কুলের কোনও উপকার করতে পারা অথবা স্কুলের বাইরে সমাজের কোনও উপকার করতে পারাই আদর্শ হওয়া উচিত। অতএব কোন উদ্দেশ্যে সম্ভব হতে হবে সেটা ভাবা প্রয়োজন। আরও মনে রাখতে হবে যেমন সঙ্ঘের জ্ঞান প্রত্যেকে তার যথাসাধ্য করতে চেষ্টা করবে তেমনি সঙ্ঘ আবার যেন সকলের ব্যক্তিত্বের দাবী মনে রেখে কাজ করে। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গিয়ে ছেলেরা অনেক সময়েই সমগ্র বিদ্যালয়টার হিত এবং সঙ্ঘের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তির দাবী ভুলে যায়।

“কর্মজীবনে প্রবেশ”

বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হয়ে এলে ছাত্রেরা ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের বিষয় ভাবতে আরম্ভ করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং

কর্মজীবনের মধ্যে কি ভাবে যোগ স্থাপন সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোনও পথ যে খুঁজে বাঁধ করা গিয়েছে তা মনে হয় না। ছাত্রের শরীর এবং মনের মধ্যে যখন বড় রকমের পরিবর্তন চলছে ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ তার জীবনের ধারা যেন এক রাঁত্রেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই দুই রকমের জীবনের মধ্যে যোগসূত্র কি ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সে কথা কর্তৃপক্ষদের বিশেষভাবে ভাবা প্রয়োজন। অনেক স্কুলে প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন এ বিষয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে।

“পাঠ্যক্রম”

কিশোরদের পাঠ্যক্রম তৈরী করার সময় দু'টা কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে এই যে এই বয়সে নানা রকমের শক্তি ও অমুরক্তি প্রকাশ হয়; সেই জন্য ঠিক এক পাঠ্যক্রম সকলের জন্য রাখা চলে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, এখন শিক্ষাদানের জন্য বিশেষজ্ঞের এবং বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমরা শক্তি ও অমুরক্তির বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে সক্ষমতা দেখাতে পারিনি। যদি আমরা ছাত্রদের প্রয়োজন অনুসারে অন্ততঃ পক্ষে পাঠ্যক্রম বিভেদের বহুটুকু করতে পারি, তাহলেও কিছু কাজ হয়।

“ছাত্রদের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া ঠিক নয়”

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের হাতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়াতে একটা সমস্তা আমাদের সামনে আসে তা' হচ্ছে নানা বিষয়ের মধ্যে সমীকরণ (Balance) কি করে করা যায় এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতার গুণীর ভিতরে শিক্ষাদানকে কি করে রাখা যায়। জ্ঞান ভাণ্ডারে এত রকমের বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক বিভাগে এত বেশী জ্ঞাতব্য তথ্য আছে যে ছাত্রের উপরে অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। একজন বিশেষজ্ঞ যে পাঠ্যক্রম নির্দেশ করবেন তা তিনি নিজে যত সহজ বলেই মনে করুন না কেন ছাত্রের পক্ষে তা আয়ত্ত করা খুবই কঠিন কাজ। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সেই-জন্ম ছাত্রের পক্ষে দুর্বল হওয়া অবশ্যস্বাবী। যে ছাত্রদের “খ” শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাদের পাঠ্য সাধারণের থেকে আরও সহজ এবং আরও প্রত্যক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি আরও বিচিত্র এবং ব্যবহারিক হওয়া

দরকার। “গ” শ্রেণীভুক্ত ছাত্রদের যদি এতটা শিক্ষা দেওয়া যায় যে তারা জীবনটা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে, সমাজে মিশতে পারে এবং নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মিটিয়ে আত্মসম্মানের সঙ্গে দিন কাটাতে পারে তাহলেই যথেষ্ট হবে। অবশ্য “ক” শ্রেণীর মধ্যে অনেক ছাত্র আছে যারা সাধারণ পাঠ্যক্রম থেকেও বেশী আশ্রয় করতে পারে; তাদের সংখ্যা নির্ভর করে কি পরিমাণ সুযোগ তারা জীবনে পায় তার উপরে।

ছাত্রের ইঙ্গিত সমূহের সাহায্যে সে জগৎকে বোঝবার চেষ্টা করছে এবং নানা প্রকার কাজ নিজের ইচ্ছামত করে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত কাজে বিভ্রান্তি তাকে সাহায্য করবে এবং তার মানসিক অবস্থার স্তর অনুসারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। ছাত্র যতই বুঝতে পারবে তার স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার জীবনের প্রকৃত যোগ আছে ততই সে স্কুলের এবং নিজের স্বার্থ এক বলে দেখতে শিখবে। পাণ্ডিত্যের দিক থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিচার করে পাঠ্যক্রম ঠিক না করে এই হিসাবে পাঠ্যক্রম ঠিক করা অনেক বেশী দরকার। জীবনের সঙ্গে যোগ না থাকলে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম বালকের কোন কাজে আসবে না। খাতের গুণাগুণ নির্ভর করে হজমের উপরে, হজম করতে না পারলে ভাল খাদ্য দিয়ে লাভ নেই।

“পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন”

পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র্য এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে করে দৈনিক জীবনের নানা আকর্ষক ঘটনাও কাজে লাগিয়ে ফেলা যায়। প্রত্যেক ছাত্রকেই নির্দিষ্ট প্রত্যেক বিষয়ে সমান সময় দিতে হবে, তার কোন মানে নেই। কোনও বিষয়ে যদি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং নৈপুণ্য বৃদ্ধি হয় তাহলে দৈনিক কর্মতালিকার ছোট ছোট ভাগে সেই বিষয়ের জ্ঞানানুসরণের কাজ বাধা পায় এবং তাতে ছাত্রের ক্ষতি হয়। এরকম ভাবে সব কাজ ছোট ছোট ভাগে ভাগ না করে, কোন কোন বিষয়ে ছাত্র যাতে বেশীক্ষণ সময় মনোযোগ সহকারে একটা কাজ করতে পারে সে সুযোগ তাকে দেওয়া উচিত।

এই বিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষামূলক কার্য করা হয়েছে। ইতিহাস এবং ভূগোল জন্ত সময় পৃথক না রেখে কখনও কখনও কিছুদিনের জন্য শুধু একটিতে মন দিয়ে আবার পরে কিছুদিন অগুটি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আবার কখনও ভূগোল শিক্ষা বন্ধ রেখে গণিতের কতকগুলি মূলতত্ত্ব বা ভূগোলেও দরকার হবে তা শিখিয়ে নিয়ে তারপরে আবার ভূগোল শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। এইভাবে কাজ করতে হলে বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে বিশেষ রকমের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং একই শিক্ষকের নিজের বিশেষ বিষয়ের থেকেও আরও কিছু বেশী জানা দরকার।

ডাকাত

শ্রীসুস্মিতা দত্ত।

সকাল বেলায় চায়ের টেবিলে আসিয়া জয়তী সর্বদাই আগ্রহভরে খবরের কাগজটি খুলিয়া বসে,—নূতন নূতন চমকপ্রদ খবর পড়িতে তাহার এত ভাল লাগে! কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই দেশের নেতাদের স্বগভীর ওজ্জ্বল বক্তৃতাই পাতা জুড়িয়া থাকে। আগে এগুলি জয়তী মন দিয়াই পড়িত, কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না—দেশ এবং দেশের নেতাদের উপর তাহার আর আস্থা নেই।

স্বতন্ত্রাৎ বেশীর ভাগ দিনই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অসংখ্য রোমাঞ্চকর হত্যার কাহিনী। চোখ বড় বড় করিয়া এগুলি সে একেবারে গোঁগ্রাসে গিলিতে থাকে। কোথায় ট্রেন হইতে দ্রুতগণ জোর করিয়া এক অসহায় তরুণীকে নামাইয়া হত্যা করিয়াছে,—কোথায় ভদ্রবেশী যুবকের ছদ্মবেশে ট্রেনের কামরার প্রবেশ করিয়া তাহার আরোহীদের সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদের নিহত করিয়াছে। এইসব গল্প পড়িতে পড়িতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পড়িতে ইচ্ছা করেনা, কিন্তু কি এক ছুনিবার আকর্ষণে তাহার চোখ ছুটি বারবার ছুটিয়া গিয়া ইহাদেরই উপর পড়ে। “মানুষ কেন যে মানুষের প্রতি, ধরিয়াকে হেন যমের মূর্তি” ইহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—মানুষের মনুষ্যত্ব কি তাহা হইলে একেবারেই ভুয়ো ও ক্ষণভঙ্গুর বস্তু? সামান্য আঘাতে সামান্য লোভেই আর তাহার কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে না? দয়ামায়া, করুণা, ধর্ম ও নীতিবুদ্ধি তাহা হইলে মানবচিত্তের একটা উপরের আবরণ মাত্র? তাহাদের অন্তরের অন্তরতম স্থানে ইহাদের কোনই আধিপত্য নাই? জয়তীর নিকট পৃথিবী এখন আর মাতৃকোড়ের ত্রায় স্নেহপূর্ণ নিরাপদ স্থান নহে—তাহা হিংস্র ঋপদসঙ্কুল নির্মল অন্ধকার বনভূমি মাত্র।

জগতে আর সে যেন কাহাকেও বিশ্বাস করে না, তাহার সব সন্মুখেই সকল বিষয়েই ভয়। বাড়ীর লোকে তাহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়াই আকুল হয়—ভাইয়া বলে, “তোরা

দশা যে সেই নন্দলালের মত হল, এত ভয় পাসনা, পাগল হয়ে যাবি শেষ পর্যন্ত।”

দিনে বাড়ীর ছেলেরা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাওয়া মাত্র সে থাইয়া দাইয়া শোবার ঘরের দরজাগুলি বন্ধ করে—বন্ধ করিবার আগে খাটের তলায় ঘরের আনাচে কানাচে উকি মারিয়া দেখিয়া লয়, যদিই কেহ লুকাইয়া থাকে।

রাত দশটার পরে কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত পথে বাহির হইতেও তাহার ভয় করে—যদিই কোন দ্রুত আক্রমণ করে! অথবা বাহার সহিত বাইতেছে—তাহাকেই বা সে এত বিশ্বাস করে কি করিয়া?

চাকরদের কোন কারণে নিহতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দেখিলেই তাহার মনে হয় যে তাহারা নিশ্চয় পরস্পর সহিত কোনরূপ চক্রান্ত করিতেছে।

কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বলে, “জগতের লোকের ত আর খেয়েকশ্বে কাজ নেই—সকলে খালি তোমাকে মারবার জন্ত ছুরি শানাচ্ছে! কি যে পাগলামী তোমাকে পেয়ে বসেছে!” জয়তীর জন্ত বাড়ীতে কোন নূতন চাকর প্রবেশাধিকার পায় না—চাকর না পাওয়া গেলে নিজেরা কাজ করিয়া লইবে—কিন্তু তবু অজানা লোক বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে না। রাত্রিবেলা ভাল করিয়া তাহার ঘুম হয় না, অন্ধকারে চক্ষু বিস্তারিত করিয়া সে শুনিতে চেষ্টা করে কেহ জানালার গরাদ কাটিতেছে অথবা দরজার ছিটকিনী খুলিবার চেষ্টা করিতেছে কিনা। এ হেন মানুষকে লইয়া তাহারা কি করিবে বাড়ীর লোকেরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কলিকাতার বাহিরে কোথাও বেড়াইতে বাইতেও তাহার ভয় করে, তাহা হইলে যে ট্রেনে চড়িতে হইবে।

কিন্তু ট্রেনেই তাহাকে বাধ্য হইয়া চড়িতে হইল একদিন। জয়তীর পিতা মনমোহন মানুষ হইয়াছেন পশ্চিমে,—তাহার পিতা সেখানে বড় চাকুরী করিতেন, অবসরপ্রাপ্ত হইয়া সেই-খানেই বাড়ীঘর করিয়া আছেন,—বাংলাদেশ হইতে এস্থানই তাহাদের নিকট অধিকন্তর পরিচিত লাগে।

পুত্র আবার চাকুরীর খাতিরে বাংলাদেশে বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের টানে প্রায়শঃই কলিকাতা হইতে সে দেশে যাতায়াত করিয়া থাকেন,—তাহা ছাড়া পিতামাতা বৎসরান্তে একবার অন্ততঃ একমাত্র পুত্রকে না দেখিয়াও থাকিতে পারেন না।

মনমোহন বাবু অনেক সময় একলাই দেখা করিয়া আসেন, কখনো বা তাঁহার পরিবারও তাঁহার সঙ্গ নেন।

এ বৎসর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের চিন্তা অধিকার করিয়া আছে।

জয়তীর ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার নাতজামাই দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা বহুদিন ধরিয়াই আছে,—তাহার অল্প বয়সে বিবাহ দিবারই তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন—কিন্তু পুত্রের ইচ্ছা ছিল কতাকে লেখাপড়া শিখাইয়া রিডম্বী করিয়া তুলার। পুত্রের ইচ্ছাই বলবতী ছিল এতদিন পর্য্যন্ত—কিন্তু জয়তী বি-এ পাশ করিবার পর তাঁহাদের ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল—ছেলেকে পত্রের পর পত্রাঘাত করিয়া তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বুদ্ধ হইয়াছেন—কবে আছেন কবে নাই, তাঁহাদের এতবড় সাধটা কি অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে?

মনমোহন বাবুও একটু বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন—কিন্তু একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা ত মুখের কথা নয়—অগ্র্য সব ভয় ভাবনাই তুলাইয়া দেয়। সর্কাপেক্ষা বড় কথা হইল মনের মত পাত্র কোথায় পাওয়া যায়? জয়তী সুন্দরী, জয়তী শিক্ষিতা, জয়তী ধনীকন্যা—তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে এরূপ রূপবান, ধনবান ও সর্বাঙ্গাশ্রিত ছেলে কোথায়? তাঁহার এ সমস্যারও সমাধান করিলেন তাঁহার পিতা। এক পত্রে তিনি লিখিলেন যে ঠিক এইরূপই এক ছেলের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন—তাঁহারই এক বন্ধুপুত্র। ছেলেটিকে তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহার সহিত আলাপও করিয়াছেন, এবং খুব পছন্দও হইয়াছে। তাঁহাদের বড় ইচ্ছা এইস্থানেই জয়তীর বিবাহ হয়—জয়তীর পছন্দ অপছন্দের কথা মনমোহন ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা যে জয়তীর ইহাকে পছন্দ না হইয়াই যায় না। ছেলেটি নিজে পশ্চিমের আরেকটা কোন শহরে ভাল কাজ করে।

শ্রীমতী পত্র পড়িয়া বলিল, বহৎ আচ্ছা! জয়তী না হোক শ্রীমতী আছে, এমন পাত্র কি বুখা যাবে?

আমি দিদির চেয়ে অনেক reasonable—রঙ্গীন স্বপ্ন দেখায় আমি বিশ্বাস করি না, বাস্তবটা আমার কাছে অনেক বেশী important।

অনেক ঝগড়াঝাট করিয়া জয়তী শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইল, মনমোহন বাবু পশ্চিমে স্বেচ্ছাবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা লিখিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহারা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, অতদূর গিয়া নাতনীর বিবাহ দেখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহার চাইতে বিবাহ তাঁহাদের ওখানেই হউক, বরও ত পশ্চিমের ছেলে।

মনমোহন বাবু শত অনুরোধ সত্ত্বেও রাজী না হইয়া পারিলেন না—জয়তীর মাথায় কিন্তু আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অতদূর গিয়া তাকে বিবাহ করিতে হইবে? কিছুতেই যাইবে না সে,—শেষকালে বেঘোরে প্রাণটা থাক আর কি! ভীষণ অশান্তি বাধাইয়া দিল। কিন্তু মনমোহন বাবু কতাই অশান্তির কারণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন—তাহাকে এই প্রথম তিস্তমধুর ভাষায় শুনাইয়া দিলেন যে সংসারে চলিতে হইলে, কাঁচের আলমারীর সৌখিন পুতুলের আশ্রয় নিজেই বাঁচাইয়া সারাক্ষণ চলিতে পারা যায় না। এখন মা বাবার কোল ছাড়িবার সময় হইয়াছে, বাহিরের জগতে জয়তীকে অগ্রাগ্র সাধারণ মানুষের আশ্রয় নিজের স্থান রাখিয়া লইতে হইবে, তাহাদেরই মত সকল প্রকার স্বখ-দুঃখ বিপদ-আপদের মধ্যে তাহার জীবনধারা প্রবাহিত হইবে, সকল কিছুর উর্দ্ধে থাকিয়া জীবন ধারণ করিবার আশা সে ছাড়িয়া দিক।

জয়তীর ভীষণ অভিমান হইলেও সে আর প্রকাশে আপত্তি করিল না। তাহা ছাড়া তাহার তরুণ মন গহনা কাপড়ের দ্যুতিতে মাঝে মাঝে এ সকল ভয় ভাবনা ভুলিয়া যাইত, বিয়ের শাড়ী কি রঙের, কিরূপ কাপড়ের হইবে—গহনার প্যাটার্ণ কিরূপ হইবে—আস্বেবপত্র বাসনকোশন কার রুচি অনুযায়ী হইবে ইত্যাদি নানারূপ সমস্যার সমাধান করিতে করিতে তাহার মনে হইত পৃথিবীতে এখনও আনন্দের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়া যায় নাই।

পশ্চিমে যাইবার দিন আসিয়া পড়িল—জয়তী সকাল হইতে শ্রীমতীর কাছে মনের যত রকম ভয় ভাবনা উজাড় করিয়া বলিয়া তাহাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীমতী বলিয়াছে, “মরতে হ’লে একবারই ত মরবি—মার

একদিন না একদিন তোকে মরতেই হবে, কাজেই অত ভয় পাচ্ছি কেন?" জয়ন্তী বলিল, "how symphathetic!" শ্রীমতী বলিল, "তোমার চুখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে sympathy জানাতে হ'লে আমার যেটুকু sanity বাকি আছে, সেটুকুও উড়ে যাবে।"

ট্রেণে উঠিয়াই জয়ন্তী বেকের তলায়, একোণে সেকোণে উকি মারিয়া একবার দেখিয়া লইল—দরজা জানালা ঠিকমত বন্ধ হয় কিনা—Bathroom একেই লুকাইয়া আছে কিনা ইহারও তত্ত্ববিধান করিল। ভ্রাতৃদ্বয় হাসিয়া বলিল, "আরে, আমরা ত আছি—আমাদের কাছে অত চালাকি খাটিবে না।" জয়ন্তী গাল ফুলাইয়া বলিল, "Revolver, ছোৱার কাছে তোমরা কি করবে শুনি?"

রাত্রির ট্রেন! জয়ন্তীর তাহাতে আরও ভয়, অন্তরা যতক্ষণ জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের শোভা দেখিতে ব্যস্ত, সে ততক্ষণ ভাবিতেছে গাড়ীর অস্ত্র সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িবে—সেই সময়ে যদি কেহ জানালা দিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে—কিরূপে সে তাহাকে আটকাইবে? হয়ত তাহাকে মারিয়া গাড়ীতে ঢুকিয়া ঘুমন্ত যাত্রীদের হত্যা করিয়া তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিবে। ভ্রাতাকে বলিল জানালা দরজাগুলি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে। মাতা বলিলেন, "হ্যারে তোমার কি ও ছাড়া আর কোন ভাবনা মাথায় ঘোরে না? এত লোক যাওয়া আসা করে, প্রত্যেক দিনই কি তাদের মারা হচ্ছে?" জয়ন্তী বলিল, "কি জানি—lucky few এর মধ্যেও ত পড়ে যেতে পারি!"

রাত্রি গাড়ীর হইয়া আসিতেছে, কত মাঠ প্রান্তর পার হইয়া ট্রেনটি আপনার গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া চলিতেছে, রাত্রির অন্ধকারে নারিকেল, তালগাছগুলি যেন সজাগ প্রহরীর ত্রায় নিদ্রিতা ধরণীর দ্বারে নিশ্চুপ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রহর গুলিতেছে।
* মাঠের ঘাসে—গাছের পাতায়—ডোবার জলে চলন্ত ট্রেনের আলো ফণিকের জন্ত উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়া আবার তখনই মিলাইয়া যাইতেছে। কোথাও বা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিরা যেন অসংখ্য মশাল জ্বলাইয়া উৎসব নৃত্যে মাতিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতির এ সকল বিচিত্র রূপ উপভোগ করিবার

মত মনের অবস্থা জয়ন্তীর ছিল না, সে তখন জানালাগুলি টানিয়া নামাইয়া দিতে পারিলেই বাচে। গাড়ীতে স্তম্ভরা সবাই তখন নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন। কামরাটি সম্পূর্ণ মনমোহন বাবুর দখলে, স্তম্ভরাং কাহাকেও জয়গা ছাড়িয়া দিবার প্রায় উঠে না। জানালা নামাইয়া দিয়া এবং মরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া সবাই এবার যে যার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, আলো নিবাইয়া দিবার প্রস্তাবও একবার উঠিল, কিন্তু জয়ন্তী হৈহৈ করিয়া উঠাতে সেটা আর করা হইল না। জয়ন্তী ঠিক করিল, যে যতই ঘুমাক, সে কোনমতেই ঘুমাইবে না—স্তম্ভরাং বিছানার উপর পা ছড়াইয়া গাড়ীর দেয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া সে একটা ইংরাজী নভেল খুলিয়া বসিল।

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে—স্টেশনের পর স্টেশন আসিতেছে বাইতেছে, জয়ন্তীর চোখে ঘুম নাই। রাত বাড়িয়া চলিয়াছে, গাড়ীর অস্ত্র আরোহীগণ নিশ্চিন্তে নিদ্রার কোলে চলিয়া পড়িয়াছে।

গাড়ীর গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, দূরে মানবকণ্ঠ উথিত কোলাহল কানে ভাসিয়া আসিতেছে—আকাশের একটা কোণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। বড় কোন স্টেশন আসিয়া গেল বোধ হয়,—বাংলাদেশ ত তাহার অনেকক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছে, ইহা পশ্চিমেরই কোন বড় স্টেশন। জয়ন্তী গাড়ীর জানালার জালের আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, এত রাত্রিরেও স্টেশন জনাকীর্ণ, ফেরীওয়ালারা হাঁকিয়া হাঁকিয়া ফিরিতেছে, হোটেলের বয়রা ব্যস্ত হইয়া ট্রে হাতে লইয়া এদিক ওদিক দৌড়াইতেছে—যাত্রীগণ দৌড়াইতে দৌড়াইতে কামরায় উঠিতেছে। একটি অদ্ভুত লম্বা চওড়া লোক একবার তাহাদের গাড়ীর সামনে দিয়া স্টকেস হাতে করিয়া ওদিকে চলিয়া গেল—একবার মনে হইল যেন জালের আবেষ্টনী ভেদ করিয়া তাহার চক্ষুদ্বয় একবার জয়ন্তীর উপরও আসিয়া পড়িল, কিন্তু মাথার টুপিটা একটা চোখের উপর টানিয়া নামানো ছিল বলিয়া ঠিক ভাল ভাবে বুঝা গেল না।

"ঠিক একটি perfect crook এর মত চেহারা" জয়ন্তী ভাবিল, বাবা—যদি গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবার পর তাহাদের কামরায় উঠিবার চেষ্টা করে! তাহা হইলে কাহাকে কিছু বলিবার আগেই বোধ হয় তাহার ফিট হইয়া যাইবে!

ঠক ঠক ঠক—কামরার দরজাটি নড়িয়া উঠিল, জয়তী একেবারে তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল—দরজার জালের আবরণের ওপারে সেই লম্বা চওড়া মুর্তিটি দাঁড়াইয়া আছে! জয়তী গিয়া তাহার ভ্রাতাকে সজোরে এক ধাক্কা দিল—“দাদা, দেখ কে একটা লোক ওখানে দাঁড়িয়ে আছে!” উত্তেজনায় তাহার গলা তখন কাঁপিতেছে। দাদা নিম্নাজড়িত কণ্ঠে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, “আঃ কি আপদ—কে আবার দাঁড়িয়ে থাকবে? ঘুমো গিয়ে যা” বলিয়া আরেক পাশ ফিরিয়া আবার নিম্নার আয়োজন করিতে লাগিলেন। “শুনুন” লোকটির গভীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, “বড় বিপদে পড়েছি—গাড়ীতে কোথাও জায়গা পাচ্ছি না, আপনার গাড়ীতে যদি একটু জায়গা দেন ত উপকৃত হই”। জয়তী আর একবার তার দাদাকে ধাক্কা দিল—“দাদা ওঠ বলছি শিগগির। কুণ্ডকর্ণের মত ঘুমোতে হবে না—দেখ ও লোকটি কি বলছে”। দাদা এইবারে এপাশ ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলেন—ততক্ষণে জয়তীর তর্জনগর্জনে অস্থির হইয়া ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, পিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও ছইভ্রাতা চুলের ভিতর দিয়া আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে জানালার সামনে গিয়া দাঁড়াইল,—শ্রীমতী ও তাহাদের মাতা বিরক্ত ভাবে এইদিকে তাকাইয়া ছিলেন। বড় ভাই জানালার নীচের দিক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চাই আপনারদের?” যাত্রীটি বিনীত ভাবে হাসিয়া বলিলেন, “Very sorry to disturb you people, কিন্তু দেখুন গাড়ীর কোন কামরাতে একটু পা রাখবারও জায়গা নেই—আপনারা যদি দয়া করে একটু জায়গা দেন, দরকারী কাজে যাচ্ছি”। বড়দার “ও হ্যাঁ-তা.....” ছাপাইয়া হঠাৎ জয়তীর চাপা গলার দ্রুত তর্জন শুনা গেল “কক্ষনো জায়গা দিওনা বড়দা, দেখছ না কিরকম ডাকাতের মত চেহারা—তারপর যদি গুলি ছুঁড়তে সুরু করে তখন কি করবে তোমরা?” জয়তীর ছোটদাদা চাপা গলায় ধমক দিয়া উঠিলেন, “আরে কি সব যাতা বলছি সুচুপ কর।”

যাত্রীটির মুখে একটু কৌতুকপূর্ণ অঞ্চল বিপন্ন হাসি খেলিয়া গেল, “দেখুন আমার চেহারাটা যে ঠিক ভদ্র-লোকোচিত নয় সেটা স্বীকারই করছি, কিন্তু সেটা আমার দোষ নয়, প্রকৃতির—যাই হোক তাহলে জায়গা দিচ্ছেন না?”

উপকার করতেন খুব যদি দিতেন।” বড়দা দরজা খুলিবার উপক্রম করিতেই জয়তী চেঁচাইয়া উঠিল “না না কিছুতেই না”। তাহার কোন কারণে মনে হইয়াছে যে লোকটির হাসিটি বড়ই, ইংরাজীতে যাহাকে বলে, sinister নিশ্চয়ই ডাকাত—চেহারাটা ভাল বলিয়াই কি অমনি তাহাকে জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইবে? এদিকে ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল, যাত্রীটি অগত্যা একটু মুহূর্ত হাসিয়া টুপিটা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া ছ’তিন পা পিছাইয়া গেলেন।

গাড়ীটা চলিতে আরম্ভ করিলে বড়দা বলিলেন “Perfect-gentleman, ওকে বলে কিনা ডাকাত, জয়তীর জালায় তার পারি না” জয়তী বলিল, “অনেক সময় অনেক ডাকাতের perfect gentleman-এর মত চেহারা হয়—তাতে ভুলে গেলে ত চলেনা!” শ্রীমতী বলিল, “দিদি ধরেই নিয়েছে ও ডাকাত, ওকে শুনিয়ে কথাটা না বললেও চলত।”

পিতা বলিলেন “জয়তীর মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছে—যাইহোক গাড়ীতে একটা অজানা লোক উঠলে uneasy লাগত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—তোমাদের মারও ঘুম হ’ত না।” মাতা বলিলেন “হ্যাঁ : এমনভেই আর ঘুম হচ্ছে, যা সব তোমাদের কাণ্ড।—

* * *

জয়তীর পিতামহের বাড়ীটি অতি আধুনিক দেখিতে, বেশ বড় বাড়ী, ও অতি সুন্দর ভাবে সাজানো। কিন্তু অত বড় বাড়ীতে ছই প্রবীণ প্রবীণ ছাড়া আর কেহ থাকেন না। ইহাতে তাহাদের অবশ্য হুঃখের সীমা নাই, পুত্রকে প্রায়ই অনুরোধ করেন বদলি হইয়া এদিকে চলিয়া আসিতে। এখন আশা করিতেছেন যে নাতনী বিবাহ করিয়া এদিকে চলিয়া আসিলে, তাহাকে মাঝে মাঝে আনিয়া এখানে রাখিতে পারিবেন।

জয়তীর মাতার বেশীর ভাগ আসবাব পত্র এ বাড়ীতেই পড়িয়া আছে, বদলির চাকুরী! জিনিষপত্র বড় বেশী নষ্ট হয়, স্তবরাং এগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিবার আর তাহার কোন চেষ্টা করেন না। জয়তীও শিশু অবস্থায় এদের এখানেই মাছুষ হইয়াছিল, সেই শিশুজয়তীর স্মৃতি এদিক ওদিক অনেক ছড়ান আছে।

ট্রেন হইতে নামিয়া সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতে-

ছিলেন—সকলেই স্নানাহারের জন্ত ব্যস্ত! রান্না তখনও হইয়া উঠে নাই বলিয়া ঠাকুরমা সকলকে একটু চা খাইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। সুতরাং চোখেমুখে একটু জল দিয়া সকলে খাবারঘরে আসিয়া জড় হইয়াছিলেন। শ্রীমতী চা ঢালিতেছিল, কাজ করিতে করিতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ ঠাকুরমা, ছেলের কোন ছবি তোমাদের কাছে নেই? সে যে কি রকম দেখতে তাই ত জানলাম না!” শ্রীমতীর ঠাকুরমা বলিলেন, “ছবির জন্ত ত অনেকবার বলেছি, কিন্তু এখন অবধি একটাও জোগাড় করে পাঠাতে পারল না—তবে কর্তা ত বলছেন যে আজকে বিকেলে তার দেখা করতে আসার কথা, তখন না হয় সাধ মিটিয়ে দেখে নিস!”

শ্রীমতী বলিল, “ওমা আজকেই আসছেন নাকি? কি মজা!” জয়তী অত্যন্ত অবহেলা ভরে আঁচল ঘুরাইয়া চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল, ঠাকুরমা পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “বড় গুমোর যে রে। চেহারার একবার দেখলে এত গুমোর আর থাকবে না!” শ্রীমতী বলিল, “খুব সুন্দর বুঝি ঠাকুরমা?” ঠাকুরমা বলিলেন, “দেখিস না তখন সুন্দর কি অসুন্দর!”

কিন্তু বিকেলে বর দেখিবার সৌভাগ্য তাহাদের আর হইল না। জয়তী ও শ্রীমতী বৈকালিক প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া নীচে বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, দিনের আলো ও আস্তে আস্তে স্নান হইয়া আসিল, কিন্তু যাহার আসিবার কথা সে আর আসিল না। জয়তীর ঠাকুরদাদা একবার ব্যস্ত হইয়া নির্দিষ্ট হোটেলটিতে খোঁজও লইতে গেলেন—কিন্তু সেখানেও ওই নামের কেহ আসে নাই।

বরের নাম স্তবীর—ঠাকুরদাদা আসিয়া বলিলেন, “স্তবীরত কই এলনা—ছেলে ছোকরার কাণ্ড! কি আবার মনে হয়েছে, পেছিয়ে গেল!” শ্রীমতী বলিল, “বোধ হয় photo দেখে পছন্দ হয়নি তাই আর এল না!” জয়তী বলিল “হুঁ”।

পরদিন অপরাহ্নে জয়তী পিছনের বারান্দায় বসিয়া বুনিতেছিল, এই বারান্দাটার ভাঙ্গি সুন্দর হাওয়া আসে, সুতরাং জায়গাটি জয়তীর খুব পছন্দ। এদিকে অনেকখানি

জমি আছে—তবে এখানে সৌখিন ফুলের বাগান করিবার আর কোন চেষ্টা করা হয় নাই,—তাহার বদলে, তালগাছ নারিকেলগাছ, নিম, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি বড় বড় গাছ লাগানো হইয়াছে, মাঝখানে একটি পুকুরও আছে পরিষ্কার স্বচ্ছ জল টল্‌টল্‌ করিতেছে, মাঝে মাঝে ছপ্পে জয়তী এখানে গাছের ছায়ায় বসিয়া দূরে যেখানে মাড়শার জালের মত প্রখর রোদ্দে জল থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে সেইদিকে উদাস নেত্রে তাকাইয়া থাকে।

তাহাদের তখনও চা খাওয়া হয় নাই—বৈকালিক প্রসাধনও হয় নাই, এমন সময় তাহার ঠাকুরমা তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, “ওমা তুই এখানে? ওদিকে তোরা শ্রামরায় নীচে এসে বসে আছে যে!” জয়তী চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল, “কে?” ঠাকুরমা বলিলেন, “স্তবীর গো স্তবীর—নীচে এসে বসে আছে—যা শিগ্‌গির, তোরা ঠাকুরদাদা ডাকছেন”। শ্রীমতীও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, বলিল, “দিদি, মা বলছেন একটু ভদ্রস্থ হয়ে নিতে—নতুন লাল শাড়ীটা বের করে পরতে বজ্রেন।” জয়তী বলিল, “তুই সাজবি না?” শ্রীমতী বলিল “না ভাই শেষকালে যদি আমাকে বেশী পছন্দ হয়ে যায়?”

জয়তী একলা কিছুতেই বাইতে রাজী হইল না বড়দাকে টানিয়া নিয়া চলিল, তিনি বলিলেন, “আমাকে আবার কেন? আচ্ছা বেরসিক মেয়ে ত!” শ্রীমতী আড়ি পাতিবার জন্ত পিছন পিছন চলিল।

বসিবার ঘরে ঢুকিয়া জয়তী দেখিল ভদ্রলোক পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জানালা দিয়া বোধ করি রাস্তা দেখিতেছেন, অদ্ভুত লম্বা চওড়া দেখিতে কিন্তু অধিক গবেষণার সুযোগ না দিয়া ভদ্রলোকটি সামনে ফিরিয়া তাকাইলেন,—বড়দা ও জয়তী দুজনে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইলেন,—দেখিলেন কে এ? সেই স্টেশনের লোকটি না? সামনের দেওয়াল ফুঁড়িয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া আসিলেও বোধ হয় তাহারা ইহা হইতে বেশী বিস্মিত হইতেন না, বড়দা বলিলেন “আ-আ-আপনি?” ভদ্রলোক বলিলেন “হ্যাঁ আমিই”। তাহারপর জয়তীর দিকে তাকাইয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বলিলেন “আপনার বোনের sixth senseটি অতি keen বলতে হবে, আমি যে ডাকাতী করতে এসেছি, এবং তা আপনাদের বাড়ীতেই সেটা খুব চট করে ধরে নিয়েছেন—আমি অবশ্য দেখেই চিনেছিলাম—প্রতিমূর্তি একটি আছে কিনা কাছে!” জয়তীর লজ্জানত রক্তিম মুখের দিকে তাকাইয়া ও আগন্তকের কোতুকে উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকাইয়া বড়দা এইবার সজোরে “হাঃ হাঃ” করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

দাদুবাণী *

শ্রীযোগেশ চন্দ্র মজুমদার

জাগিয়া যখন থাক

জগৎপতিরে দেখ

পরম আনন্দ ইহা পরম আনন্দ ।

যুমাবে যখন রাতে

মিলিও স্বামীর সাথে

পরম আনন্দ সে যে পরম আনন্দ ।

যেথায় সেথায় থাকি

চিরসাথী তোমা দেখি

সদাই আনন্দপূর্ণ হৃদয় আমার ।

নয়নে বচনে যিনি

হৃদয়ে আছেন তিনি

আনন্দে হয়েছ পূর্ণ অন্তর আমার ।

যথা রবি আকাশেতে

সব ভরি রয় তাতে

তেমনি সকলি পূর্ণ সত্তায় তাঁহার ।

দশদিকে সেই রবি

আঁকে আলোকের ছবি

পরম জ্যোতির রূপ প্রকাশ আলার ।

চমকিছে চির জ্যোতি

তেজঃপুঞ্জ তাঁর ছাতি

আকাশে বাতাসে তাহা করে বলমল ।

আকাশে অমৃত বরে

পান কর প্রাণ ভরে

উঠিবে তোমার চিত্ত করি টলমল ।

ডুবিয়াছে এ নয়ন

সে জ্যোতিতে অহঙ্কণ

প্রত্যক্ষ রূপেতে পূর্ণ নয়ন কমল ।

নয়ন সম্মুখে যিনি

আত্মার অন্তরে তিনি

তেজঃপুঞ্জ সব ভরি সদা বলমল ।

জাগত জগপতি দেখিয়ে পূরণ পরমানন্দ ।

সোবত ভী সাঁই মিলে দাদু অতি আনন্দ ॥

জই তাঁহ সাথী সঙ্গ হৈ মেরে সদা আনন্দ ।

নৈন বৈল হিরণ্যে রহৈ পূরণ পরমানন্দ ॥

জ্যোতি রবি এক আকাশ হৈ এসে সচল ভরপুর ।

দহ দিশি সুরজ দেখিয়ে অল্লাআলে নূর ॥

জ্যোতি চমকই ঝিলমিলে তেজপুঞ্জ পরকাস ।

অমৃত বরৈ রস পীজিয়ে অমর বেনি আকাশ ।

নৈন হমারে নূরমে সদা রহৈ লব্ধ নাই ।

দাদু উম দীদার কোঁ নিস দিন নিরখত জাই ॥

নৈনছ আগে দেখিয়ে আত্মীয় অন্তরি সোই ।

তেজ পুঞ্জ সব ভরি রহা ঝিলমিলি ঝিলমিলি হোই ॥

পণ্ডিত ক্ষিত্তিমোহন সেন মহাশয় কৃত অনুবাদ :—

“জাগিয়া জাগিয়া দেখ জগৎপতিকে, ইহাই পূর্ণ পরম আনন্দ ; যুমাইয়া যুমাইয়াও স্বামীর সঙ্গে হও মিলিত, তাহাও হে দাদু, অতি আনন্দ ।

যেখানে-সেখানে সাথী সঙ্গী হইয়া তিনি আছেন, আমার সদাই এই আনন্দ ; নয়নে হৃদয়ে তিনি বিরাজিত, এই তো পূর্ণ আনন্দ ।

যেমন এক রবি (সমগ্র) আকাশে বিরাজিত এমন সকলই (তাঁহাতে) ভরপুর, দশদিকেই দেখ এই সূর্য্যকে । পরম জ্যোতি সেই আল্লা ।

সেই তেজপুঞ্জের (সংহত জ্যোতির) প্রকাশই চমকাই-তেছে কম্পমান ঝিলমিল জ্যোতিরূপে; আকাশই অমৃত বলী অমৃত বরিতেছে, সেই রস কর পান ।

আমার নয়ন সেই জ্যোতিতে সদাই রহে প্রেমে ডুবিয়া দাদু সেই প্রত্যক্ষ রূপ নিশিদিন করিয়া চলিয়াছে দর্শন ।

নয়নের সম্মুখের দেখ তিনিই, আত্মার অন্তরেও দেখ তিনিই ; তিনিই তেজঃপুঞ্জ হইয়া সব আছেন পূর্ণ করিয়া, ঝিলমিলি হইয়া তিনিই সবদিকে জাজ্বল্যমান ।”

* ‘জাগত জগপতি দেখিয়ে পূরণ পরমানন্দ’ নামক দাদুর স্বপ্রসিদ্ধ বাণীটির অনুবাদ ।

বিদেশিনী

নিউইয়র্কের নুতন মহিলা বিচারপতি

নিউইয়র্কের মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমতী ডরিস বার্গ সম্প্রতি এই শহরের বিশেষ আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। এই আদালতের জর্নৈক বিচারপতি নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় মেয়র উইলিয়াম ওডায়ার শ্রীমতী বার্গকে তাঁহার শূন্যপদে নিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীমতী বার্গ বিবাহিতা এবং একটি পাঁচবৎসর বয়স্ক কন্তার মাতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্রীরা সম্মান

ভারতীয় ছাত্রী শ্রীযুক্তা রামস্বল পি, দেবদাস ওহায়ো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রী লাভের জন্য পড়াশুনা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি ওহায়ো স্টেট আইন পরিষদে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন; তাঁহার পূর্বে আর কোনও বিদেশী ছাত্র বা ছাত্রী এই সম্মান লাভ করেন নাই। তাঁহার আচার ব্যবহার ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আইন পরিষদে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের পর এই ভারতীয় ছাত্রীটি আরও অনেক সম্মান লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা দেবদাস বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার ২ বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র আছে।

আমেরিকান হোম একনমিকস ইন্টারন্যাশনাল ফেলোসিপ বৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীযুক্তা দেবদাস আমেরিকায় পড়িতে আসেন। গত বৎসর সানফ্রান্সিস্কোতে হোম একনমিকস এশোসিয়েশনের যে ৪০তম বার্ষিক সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মেলনের আলোচনায় বোগদান করেন। প্রতিনিধিগণ তাঁহার গঠনমূলক প্রস্তাবসমূহ আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা দেবদাসের বক্তৃতা শুনিতে সকলে ভালবাসেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানে বহু গার্হস্থ্য অর্থনীতি সংঘে

তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। হুইবৎসরের জন্য সরকারী বৃত্তি পাইয়া তিনি ১৯৪৭ সালে ওহায়ো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ও এম এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হোম একনমিকস এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক বৃত্তিলাভ করিয়া পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্ত পড়াশুনা করিতে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন সভায় মহিলা

সদস্যের সংখ্যা

রিপাব্লিকান পার্টির ন্যাশনাল কমিটির একটি সাম্প্রতিক ঘোষণা হইতে জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯টি বিভিন্ন স্টেটের আইনসভায় মোট ২১৪ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য আছেন। ইহাদের মধ্যে ১২৬ জন রিপাব্লিকান পার্টির, আর ৮৮ জন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনীত সদস্য।

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিভিন্ন স্টেট আইন সভায় মহিলা সদস্যের সংখ্যা ছিল ২১১ জন। তাহারও পূর্বে ১৯২০ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২০। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণযোগ্য যে, ১৯২০ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম মহিলাদের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

আমেরিকায় উদয় শঙ্করের নৃত্য প্রদর্শনী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র সমূহে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও তাঁহার স্ত্রী অমলার সংবাদ বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিতেছে। উদয়শঙ্কর সদলবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল বড় বড় সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে কতটা আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা জানা যায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহাদের চিত্র, তাঁহাদের সম্পর্কে রচিত ও তাঁহাদের সহিত সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ হইতে।

মিলওয়াকী জার্নাল লিখিতেছেন যে মিলওয়াকী সহরের

জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহের সহিত উদয়শঙ্করের নৃত্যকলাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয় উদয়শঙ্কর বয়োধর্মের অতীত বলিয়া মনে হয়। উক্ত হিন্দু নৃত্যশিল্পীটি প্রায় দ্বাদশ কি ততোধিক বৎসর পূর্বে আমেরিকায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন পরেও তাঁহার নৃত্যকলায় কোনও বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বিশেষ ক্ষেত্রে উদয়শঙ্কর ও তাঁহার নৃত্যসম্প্রদায় পশ্চিমের নৃত্যশিল্পীগণের সহিত কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে পারেন।

শ্রীমতী রাধা শ্রীরাম—প্রতিভাসম্পন্ন

নৃত্যশিল্পীর 'দি রিভার' চিত্রে যোগদান

'দি রিভার' নামক যে রঙ্গীন চিত্রখানি একটি ভারত-মার্কিন কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতায় প্রস্তুত করা হইতেছে তাহাতে রাধা শ্রীরাম নামক মাদ্রাজের জর্মনকা প্রতিভাসম্পন্ন নৃত্যশিল্পীনারিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন এবং টমাস ব্রীনের সহিত অভিনয় করিবেন। শ্রীমতী রাধা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত এম, এ, পাশ করিয়াছেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটিরও তিনি একজন সদস্যা।

আমেরিকায় মহিলা সম্প্রদায় ও মার্কিন কংগ্রেস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন সহরে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের পর্যবেক্ষক ও মুখপাত্রগণ অবস্থান করেন। তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকিববাহাল রাখেন এবং প্রস্তাবিত আইন কানুন সম্বন্ধে মার্কিন কংগ্রেসকে নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করেন।

'উয়েমেনস জয়েন্ট কংগ্রেসনাল কমিটির' মধ্য দিয়া ১৭টি মহিলা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ নিজেদের কার্যাবলীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্যসংখ্যা ১ কোটি। জয়েন্ট কংগ্রেসনাল কমিটি একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালে মার্কিন মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। উহার কিছু পরেই উক্ত কমিটি স্থাপিত হয়।

কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাবিত আইন লইয়া আলোচনা চলে কমিটির পরামর্শের উপর ভিত্তি করিয়া মহিলা প্রতিষ্ঠান

গুলি অনেক সময়ে ঐ সকল আইন সমর্থন বা উহাদের বিরোধিতা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে মহিলা সদস্যগণ স্ব স্ব অঞ্চলের নির্বাচিত কংগ্রেস প্রতিনিধির নিকট নিজেদের অভিনত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; শুধু যে মহিলাদের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়েই তাঁহারা মতপ্রদান করেন তাহা নহে, মার্শাল পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীপুত্র ছেলেদের খাদ্য সরবরাহ পর্যন্ত বহু বিষয়ে তাঁহারা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

অনেক সময়ে কংগ্রেসের সমক্ষে অভিমত প্রদানের জন্য বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হয়।

ছাত্রদের আত্মনির্ভরশীলতা

কলেজের কাজকর্ম করিয়া ছাত্রগণ কতৃক অল্প ব্যয়ে শিক্ষার খরচ নির্বাহ

কালিনভিল্ (ইলিনয়েস), গত ২৬ বৎসর যাবৎ এখানকার এক ছোট শহরের কলেজে ছাত্ররা অন্যান্য কলেজ অপেক্ষা অনেক অল্প খরচে যথারীতি শিক্ষালাভ করিতেছেন, কারণ কেবল শিক্ষাদান ব্যতীত কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ ছাত্ররা নিজেরাই সম্পাদন করিয়া থাকেন।

উক্ত কলেজের নাম ব্র্যাকবার্ণ কলেজ, উহাতে মোট ২৫৪ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। ১৯৩৫ সালে প্রেসবিটেরিয়ানপন্থী ধর্মব্রাজক ডাঃ ব্র্যাকবার্ণ-উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন।

নিউইয়র্ক টাইমস এর এক সংবাদ দাতার খবরে প্রকাশ ব্র্যাকবার্ণ কলেজের সমস্ত কাজকর্ম ছাত্ররা নিজেরাই সম্পাদন করেন। প্রত্যেককে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র তাহার কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে কোন নগদ টাকা পায় না, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্য টাকার অঙ্ক খাতায় জমা হয়। এইভাবে বাৎসরিক প্রকৃত ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক অর্থে অর্থাৎ ২০০ ডলারে বাসার খরচ চলিয়া যায়। বেকন লাগে প্রায় তিনশত ডলার।

পাঠ্যপুস্তক, সাজসরঞ্জাম এবং প্রাথমিক খুচরা ব্যয় ৩০ ডলার ধরিয়া, ব্র্যাকবার্ণের ছাত্রদের বাৎসরিক ৫৫০ ডলারের মত পড়ে।

ছাত্রদের করণীয় কার্যকলাপ আটবিভাগে—বভুল,

প্রত্যেক বিভাগ এক একজন তত্ত্বাবধায়কের পরিচালনাধীন। গ্রন্থবিভাগ, গৃহনির্মাণ ও সংস্কার ছাত্রদের কতব্যের অঙ্গীভূত। ছাত্রীরা রান্নাঘরের কাজ, কাপড় চোপড় পরিষ্কার ও অন্যান্য ছোটখাট কাজ করে।

ছাত্রদের সপ্তাহে মোট ১৫ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। উক্ত কলেজে ছাত্রদের প্রবেশ যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, কারণ কলেজের কতরা লক্ষ্য রাখেন যে ছাত্ররা যেন কাজকর্ম ও পড়াশুনা সতর্কভাবে চালাইবার মত সক্ষম হয়। প্রথম প্রথম ব্যয়বাসের জন্য উপরোক্ত ব্যবহার প্রচলন হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে ইহার ফলে ছাত্রদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাবেরও প্রসার হয়।

ভিটামিন বি-১২ এর ব্যবহার দ্বারা শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন পুষ্টিবিজ্ঞানী জানাইয়াছেন যে, পুষ্টির অভাবে যে সমস্ত শিশুর শারীরিক মত বৃদ্ধি পায় না তাহাদিগকে যদি সামান্য পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ খাওয়ানো যায় তবে বিশেষ সফল পাওয়া যায়। বর্তমানে ওহাইও স্টেটের ক্লীভল্যান্ড শহরে একটি শিশু-হাসপাতালে রুগ্ন এবং দুর্বল শিশুদিগকে পরীক্ষামূলকভাবে এই ভিটামিন খাওয়াইয়া তাহার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা হইতেছে।

এই ভিটামিন প্রয়োগের ফলে দেখা গেল যে পূর্বে যে সমস্ত শিশুর খাজের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল তাহাদের খাইবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইল, তাহাদের দেহে এবং মনে নবজীবন ও আনন্দ মূর্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের স্বভাবেরও অনেক পরিবর্তন হইল। কেবল তাহাই নহে তাহাদের শারীরিক বৃদ্ধিও বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। এত দিন পরিমিত আহার, বিশ্রাম এবং ব্যায়ামসঙ্গে এই সমস্ত শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি আশাশ্রুত হয় নাই।

পরীক্ষারত বিজ্ঞানীরা আরও জানাইয়াছেন যে, এই ভিটামিন প্রয়োগ করিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যেরূপ সফল পাওয়া গিয়াছে সাধারণতঃ ভাল খাওয়ানোওয়া

করিয়া এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া তিন হইতে আট মাসের মধ্যে হয়তো ততটা সফল পাওয়া যাইতে পারে।

আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের মুখপত্র সায়েন্স পত্রিকায় ভিটামিন বি-১২ সম্পর্কে উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ওকরিজের পরমাণু গবেষণাগারে এশিয়ার ছাত্রছাত্রী

ওকরিজ টেনেসী ওরা ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি একদিন রুশিয়ার পর্যটনরত কয়েকটি ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে ওকরিজস্থ মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশনের গবেষণাগারটি ছোটখাটো একটি কলেজের ক্লাশে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে এই সকল ছাত্রছাত্রীরা পরমাণু শক্তি সম্পর্কে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছিলেন, আর তথাকার বৈজ্ঞানিকরা সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া চলিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এখানে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিকদের সহিত মিলমিশা করেন। তা'ছাড়া খণ্ড খণ্ড সোমার অন্তরালে রক্ষিত তেজস্বিয় পদার্থ দেখিবার সুযোগও তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই সময় ইহারা যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে রসায়নশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান ও ঔৎসুক্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ওকরিজের হাইস্কুলের এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। সেখানে তাঁহারা এই স্কুলের গ্রন্থাগার এবং কারখানা পরিদর্শন করেন এবং স্কুলের ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'টি-ভি-এ' পরিদর্শনের বিকল্প হিসাবেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে ওকরিজের পরমাণু গবেষণাগারে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অত্যধিক বর্ষা হওয়ায় ইহারা ঐ দিন 'টি-ভি-এ' পরিদর্শন করিতে পারেন নাই।

পরমাণু গবেষণাগারে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু দেখিতে পান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবকল্যাণের জন্য পরমাণুশক্তির সফল প্রয়োগ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানের বৈজ্ঞানিকদের সহিত কিরূপ সহযোগিতা করিতেছেন তাহার অনেক দৃষ্টান্তই তাঁহারা এখানে দেখিতে পান। গবেষণা কেন্দ্রের স্পেশাল ট্রেনিং ডিভিসনের সভাপতি র্যালফাটি,

ওভারম্যান একটি বক্তৃতায় এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীর নিকট মানবকল্যাণার্থে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া সমস্ত বিষয়ে এত বেশী কৌতুহল প্রদর্শন করেন যে পাঁচ মিনিটের স্থলে তাঁহা-
দিগকে আধঘণ্টারও বেশী সময় এখানে থাকিতে দেওয়া হয়।

অতঃপর এই সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমেরিকান মিউজিয়াম অব এটমিক এনার্জি পরিদর্শন করেন এবং পরমাণুর গঠনকৌশল সম্পর্কে বক্তৃতা শ্রবণ ও বহু দর্শনীয় বস্তু দর্শন করেন। এখানে রসায়ন, ইন্জিনিয়ারিং, পদার্থবিদ্যা, ভেষজবিজ্ঞান, জীববিদ্যা এবং ধাতুবিজ্ঞান প্রভৃতিতে আইসোটোপের ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়।

মানবসেবার জন্য মিসেস রুজভেল্টকে স্নাইডেন কর্তৃক পদক প্রদান

স্বদেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অভুলনীয় মানবসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ মিসেস ফ্রান্সলিন ডি রুজভেল্টকে স্নাইডেন নৃপতি গুস্তাফ এই বৎসরের “প্রিন্স বাল” পদক প্রদান করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনস্থ স্নাইডেন রাজদূতাবাস হইতে পদকপ্রদানের কথা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে মিসেস রুজভেল্ট অক্ষয় ও পঙ্খ প্রাক্তন সৈনিকদের ও যুদ্ধবিক্ষত দেশের শরণাগতদের সাহায্যের জন্ত স্বাধীনতা করিয়াছেন। রাষ্ট্র-পুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি হিসাবেও তাঁহার দান সর্বস্বীকৃত।

১৯৪৫ সাল হইতে এই পদক দেওয়া হইতেছে। প্যালেষ্টাইনে নিহত রাষ্ট্রপুঞ্জপ্রেমিত মধ্যস্থ কাউন্ট বার্ণাডোটকে গভুবৎসর মৃত্যুর পর এই পদকটি দেওয়া হয়।

বৈদেশিক ছাত্রছাত্রীদের টি-ভি এর

কার্যকলাপ পরিদর্শন

নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন আলোচনাসভায়

উদ্যোগে আগত এসিয়ার বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীসহ সম্প্রতি টি-ভি-এ পরিকল্পনাধীন বাধ, বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, জলাধার, জলসেচ, ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। শীঘ্রই তাঁহারা ঐরূপ আর কতগুলি স্থান পরিদর্শন করিতে যাইবেন। টি-ভি-এর অফিসারগণ বলেন, টি-ভি-এর সাহায্যে যে সকল সমস্তা তাঁহারা সমাধান করিয়াছেন তদ্রূপ অনেক সমস্তা তাহাদের দেশেও বিদ্যমান। টি-ভি এর একজন প্রধান ইন্জিনিয়ার দর্শকদের নিকট টি-ভি-এ পারকল্পনা ব্যাখ্যা করেন এবং কিভাবে উহার সাহায্যে বস্তা নিয়ন্ত্রণ, শক্তি উৎপাদন, কৃষি উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পন্ন করা হয় তাহা বলেন। তিনি বলেন যে ১৯৩৩ সালে টি-ভি-এ কাজ আরম্ভ করে এবং উহার পর বৈজ্ঞানিকশক্তি ব্যবহারকারী কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা ২০ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ছাত্রগণ ঐ সকল বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন করেন। ম্যালেরিয়া নিবারণে টি-ভি এর সাফল্যের কথাও ছাত্রদের বলা হয়। একথাও তাঁহাদের বলা হয় যে, যে বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে তাহার সাহায্যে এখন প্রতি মাসে ১০ সহস্র করিয়া নূতন নূতন বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। জনসাধারণের সহযোগিতা ও অহুমোদন ছাড়া যে এরূপ কার্য সম্পন্ন হইত না একথাও ছাত্রদের জানাইয়া দেওয়া হয়।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, লেবানন, নেপাল, পাকিস্তান ও সিরিয়ার ছাত্রছাত্রী আছেন। নিউইয়র্কে থাকিবার সময়ে তাঁহারা নিউইয়র্কের নাগরিকদের গৃহে বাস করেন এবং মার্কিন ছাত্রছাত্রীদের সহিত স্কুলে যান। ৪ঠা মার্চ তারিখে তাঁহারা আলোচনা সভায় যোগদান করিবেন এবং ১০ সপ্তাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের পর স্ব স্ব দেশে গমন করিবেন।

মহিলা সমাচার

ত্রিজেয়োতিষ চন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন মহিলা ফেলো

গোথেল মেমোরিয়াল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা শ্রীমতী এস. রাণী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতন শিক্ষাব্রতী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য করা গৌরবের বিষয়।

বর্তমানে সিনেটে মহিলা সভ্য আছেন, শ্রীমতী হৃদয়ী রায়, ডাঃ ষ্টেলা ক্র্যামরিশ, শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত, অধ্যক্ষা তটিনী দাস, ও লীলালতিকা ব্যানার্জি এবং ডাঃ অসীমা চাটার্জি ডি, এস, সি,।

এম্ এ পরীক্ষার কৃতী ছাত্রী

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম, এ, পরীক্ষায় বাংলাদেশে শ্রীমতী সুনন্দা সেন, প্রথম শ্রেণী-১ম হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন।

১৯৪৭এ তিনি বিএ,তে প্রথম হইয়াছিলেন। তিনি পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক, পোষ্ট গ্রাজুয়েট জুবিলী পদক, ডি, সি, আই, স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন।

তিনি রাঁচীর কুমুদকান্ত সেনের কন্যা।

লীলা পুরস্কার

স্বকবি স্বর্গীয়া লীলা দেবীর (চৌধুরী) স্মৃতিতে তাঁহার পিতা রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় মহিলাদের সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ দিবার জন্ত প্রতি দুই বৎসর অন্তর একটি পুরস্কার ১০০/- শত দিবার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি এণ্ডাউমেন্ট করিয়া দিয়াছেন। বৎসরের শ্রেষ্ঠ বঙ্গমহিলা লেখিকাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৫০ সালে এই “লীলা পুরস্কারের” জন্ত নয়জন প্রার্থী মুদ্রিত পুস্তক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। নির্বাচন কমিটি শ্রীমতী আশালতা সিংহকে, বর্তমান বর্ষে “লীলা” পুরস্কার দিবার জন্ত মনোনীত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্তন উৎসব দিনে, “লীলা” পুরস্কার আশালতা দেবীকে প্রদত্ত হইবে। ইতিপূর্বে ১৯৪৪ সালে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর, ১৯৪৬ সালে শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ১৯৪৮ সালে শ্রীমতী সীতা দেবী, “লীলা” পুরস্কার পাইয়াছেন।

কানাডায় অমিয়া ব্যানার্জি

বৎসরাধিক হইল শ্রীমতী অমিয়া ব্যানার্জি কানাডায় গমন করিয়া টরাণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ সেবা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। সেখানে তিনি বেশ কৃতিত্ব সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা কানাডায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের প্রথম সেক্রেটারী শ্রীপূর্ণেন্দু ব্যানার্জির নিকট থাকিয়া নারী সেবায় অনেক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সোমা দেবী ও নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া ভারতের নারীর সেবাপরায়ণতার প্রমাণ দিয়াছেন।

বোলপুর, ত্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন

তিন মহিলা সমিতির

সম্মিলিত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব।

উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৬।

আমরা, বোলপুর, শান্তিনিকেতন ও ত্রীনিকেতন এই তিন সমিতির সম্মিলিত অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করছি :—

(১) পূর্ববঙ্গের ভীষণ অকস্মাৎ অত্যাচারে উৎপীড়িত সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের অভাবনীয় দুর্দশা, বিশেষত আমাদের লাক্ষিত সঙ্গাসিত ভগ্নীগণের প্রতি পাশবিক ব্যবহারের মর্যাদান্তিক কাহিনী শুনে, আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও একান্তবোধ তাঁদের জ্ঞাপন করছি।

(২) এত দূর থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের কোন প্রকার হুংখলাভব করতে না পারলেও তাঁদের মধ্যে যে সকল দেশছাড়া বিপন্ন নারী ভাগ্যবিপর্যয়ে আমাদের ছয়োর গোড়ায় এসে পড়েছেন, আমাদের সামান্য সহায় দিয়ে তাঁদের যৎকিঞ্চিৎ হুংখ দূর করতে আমরা বদ্ধপারিকর হয়েছি।

(৩) যে সকল মুসলমান তাঁদের স্বজাতির পাপকাণ্ডে আপত্তি প্রকাশ ও আক্রান্ত সমস্ত হিন্দুনারীগণকে সাহায্য দান করেছেন শুনতে পাই, সেই অজ্ঞাত মহামনা বন্ধুদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি এবং স্থানীয় মুসলমান ভগ্নীগণকে সাধ্যমত তাঁদের সদ্‌চরিত্র অন্তরঙ্গ করতে স্নিহাশ্রদ্ধা অহরোহ জানাচ্ছি।

এই সম্মেলন সভায় শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর সভানেত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আজ যে অমানুষিক অত্যাচার পূর্ব বঙ্গের নারীদের প্রতি ঘটছে, কাল সেটা পশ্চিম বঙ্গের প্রতি ঘরে প্রত্যেক নারীর প্রতি ঘটতে পারে একথা নিশ্চিত সত্য জেনে এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকল নারীকে এ সম্মেলনে সচেষ্ট হতে হবে। রক্ষার জন্য সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানকে ডাকতে হবে। তাতে অন্তরে বল ও বাহিরে বিপদের সম্মুখে দাঁড়াবার শক্তি লাভ হবে।

২। যে সকল অত্যাচারিতা পশ্চিম বঙ্গের দ্বারে এসে পৌঁছবে, সকল নারী মিলে তাদের কোলে তুলে নিতে হবে, বলতে হবে ভয় নাই ভয় নাই।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

“প্রত্যেকটা মেয়েকে আবলম্বী হতে হবে”

মেয়ে মহলে আজকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হোল, পূর্ববাংলার উৎপাটিত নারী সমাজের অবর্ণনীয় হুংখ কষ্ট ও নানাবিধ সমস্যার কথা। কাজেই আমাদের আসরে, আপনাদের কাছে সেই বিষয়েই সামান্য আলোচনা আজ আমি করবো। ভারতবর্ষের, বিশেষ করে, বাংলা দেশের মেয়েদের সামনে বর্তমান যুগ যেন একটা বিভীষিকা রূপে দেখা দিয়েছে। সেই ভারতবর্ষের পর থেকে এদেশে অল্পাধিক হয়ে চলেছে নারীর অসম্মান ও তার মর্যাদা পদদলিত করার অমানুষিক পর্ব। যে সকল নির্মম নারকীয় ঘটনা ঘটে আসছে তাতে করে মনে হয় যে আমরা কি সত্যিই কোনও সভ্য দেশে বাস করছি না? মানবতার অপমৃত্যু এমন নৃশংস ভাবে আর কোনও যুগে ঘটেছে বলে মনে হয়না। বর্তমানের এই সর্বহারী উদ্ভ্রান্ত মানবসমাজের পানে চেয়ে দেশবাসীর বক্ষ বিদীর্ণ করে, আতর্কিত হতে নির্গত হচ্ছে, একটা মাত্র শব্দ—যার

ইংরাজী অর্থ হোল, Humanity uprooted। অর্থাৎ মানবধর্ম সমূলে উৎপাটিত। এই অপমৃত্যুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবে কে?

যদিও জানি, পাকিস্তানের হিন্দুনারীসমাজের এই চরম দুর্দিনে এখানকার বহু নারী আজ নিজ নিজ স্বর্গের কথা বিস্মৃত হয়ে বহু প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে উক্ত আত্মনারী সমাজের জন্ত সেবাত্রিত গ্রহণ করেছেন তথাপি একথা সত্য সেই সমাজসেবী নারী সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। এখনও আমাদের সমাজে বহু নারী আছেন যারা বাহিরের জগতের নাম শুনে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। এদের পানে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, বাস্তবিক নারী জাতি যে অবলা; সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যথার্থ কি ভাই? মেয়েরা সত্যিই অবলা? হতে পারে দৈহিক শক্তিতে তারা পুরুষের সমকক্ষ নয়। কিন্তু দৈহিক শক্তিই ত সব নয়। মানসিক শক্তিরও একটা প্রয়োজন রয়েছে। সংগঠনকারী শক্তি পুরুষের চেয়ে নারীর মধ্যেই বেশী দর্শায়।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নারীকে অবলা বলে স্বীকার করেননি। তিনি স্বয়ং বলেছেন, “অবলা কেন মা এত বলে” ? তারপর তাঁর দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠে দেবীরাণী ও শান্তির চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে প্রয়োজন হলে, অনুশীলন করলে, এবং সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হলে, নারীও স্বাবলম্বী হয়ে পুরুষের সমতুল্য সকল কার্যই করতে পারে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সুযোগ সুবিধার অভাবে, নারীর আত্মবিকাশের পথ বহুক্ষেত্রে রুদ্ধ হয়ে আছে।

এখন দিন এসেছে, যখন দেশের প্রত্যেকটি মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে হবে, এবং আত্মবিকাশের পথকে উন্মুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে আপন সম্মান, সম্মম, স্বাভাব্য রক্ষার জন্ত তাকে হতে হবে, স্বাবলম্বী। নারী স্বাবলম্বী হলে অবসর সময়ে সে বহু জনহিতকর কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। একটি সুদৃষ্টান্ত সহজেই বহুজন অল্পসংগ করে। এমনি ভাবেই সমাজে সেটির ব্যাপক প্রচলন হয়। স্বাবলম্বী না হলে, আত্মবিশ্বাস জন্মায় না, এবং আত্মনির্ভরশীল না হলে, কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই দেশের এই দুদিনে আজ প্রত্যেকটি মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে হবে।

এই যে পূর্ববঙ্গের উৎখাটিত নারী সমাজ যত তত ছয়ছাড়ার মত জীবন অতিবাহিত করছে এদের ভীত সন্ত্রস্ত ব্যথাবিদীর্ণ অন্তরে আত্মিক বল, আশা, আনন্দ ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ উক্ত সর্বহারা হিন্দুসমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সেবাকার্যে সর্বপ্রথম নারী সমাজকেই হতে হবে অগ্রণী। বাস্তবতার মনে

এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাস্তবহারী নয়। কেননা বাংলাদেশ এক। ভৌগোলিক নির্ধারণের জন্ত তার অল্পচ্ছেদ প্রয়োজনীয় হলেও, সকল অধিবাসীর মর্মচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ব বাংলার হিন্দুরা পশ্চিম বাংলাকে, আপন দেশ বলে যাতে ভালো-বাসতে পারে, তারজন্ত যাবতীয় প্রচারণাকর্ম এখন থেকেই শুরু হওয়া প্রয়োজন। কেননা, এই নষ্টনীড়, ভ্রষ্টআশা বৃহৎ মানব গোষ্ঠী, নিজ নিজ নীড়ের সন্ধান পেলে অচিরে পুনরায় জীবনের সম্মানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তাদের সন্তান সন্ততিগণ উজ্জল ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে পারবে। এই দিশাহারা নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করে তোলা এখন আর অধিক কষ্টসাধ্য কার্য নয়। বাহিরে বাধা বিঘ্ন থাকলেও, গৃহের বিঘ্ন এখন এদের নিকট অতি ক্ষুদ্র রূপে বিবেচিত হবে। কেননা, সকল প্রকার বিপদের সঙ্গে এরা প্রত্যক্ষ পরিচিত। সামান্য বাধা বিঘ্নকে ভয় করার মত মানসিক দুর্বলতাকে এরা জয় করেছে। কাজেই অল্প অশিক্ষিত হলেও, এরা কিঞ্চিৎ পরিমাণে মাত্তিক বল ও সাহস লাভ করেছে বলে মনে হয়।

তাই বর্তমানের স্বাবলম্বী বোনেদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আহুন, আমরা একঘোটে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বাংলার প্রত্যেকটি মেয়েকে স্বাবলম্বী হবার মন্ত্রে মনে প্রাণে উজ্জীবিত করে তুলি। যে মন্ত্রের শক্তিতে তাদের সম্মুখে যে কোনও বাধা উপস্থিত হোক না কেন, তার থেকে রক্ষা পাবার জন্ত অন্ততঃ পক্ষে সংগ্রাম করে জীবন রক্ষা অথবা মৃত্যুবরণ করতে পারে। বাস্তবঘাতে দীর্ঘ বিদীর্ণ হয়ে জীবন ধারণ অপেক্ষা সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু অধিকতরো শ্রেয়ঃ।

কৃষ্ণা ঘোষ দস্তিদার ।

৬ষ্ঠ লাইন—সব উল্টা।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীমুখ্যকান্ত দে

স্বদেশ ও বিদেশ

ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিং, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলায় যে সকল বর্বর ঘটনা ঘটিয়াছে, সেগুলি যেমন মমত্বভূত তেমনি ঘৃণ্য। মানুষ যে বিংশ শতাব্দীতেও মানুষের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারে, ইহা মনে করিতেও প্রত্যেক মানব প্রেমিকের মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া যায়। কলিকাতায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলির সাফাইয়ের জন্ত আমরা কোন চেষ্টা করিতেছি না। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কেহ, বাংলার সরকার, ভারত সরকার, কংগ্রেস এগুলিকে সমর্থন করিয়াছেন, এমন কথা শোনা যায় নাই। কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া এবং ব্যাপক স্থান জুড়িয়া যে নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও অত্যাচার চলিয়াছে পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন জায়গায়, সে সম্বন্ধে কই মুসলমান নেতারা, মোল্লেশ লীগ, পাকিস্থান সরকার বা পূর্ব পাকিস্থান সরকার কোনপ্রকার নিন্দাবাদ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। বাংলা সরকার দৃঢ় হস্তে সকল প্রকার অনাচার দমন করিয়াছেন, শৃংখলা ও আইনভঙ্গকারী কোন হিন্দুকে জ্ঞানত রেহাই দেন নাই। আর পূর্বপাকিস্থানের পুলিশের সম্মুখে তাণ্ডবলীলা ঘটিয়াছে, শহরে ও গ্রামে নরনারী শিশু হত্যা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, নারীদিগের সন্ত্রাস নষ্ট করা হইয়াছে; প্রাণভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারী স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটাছুটি করিয়াছে; তথাপি পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্থান সরকার সেদিকে ভ্রক্ষেপ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্থানে কয়েক দিনের মধ্যে যে মৃত্যু ও ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শুধু বড় ধনিকালের কয়েকদিনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই সমগ্র ব্যাপারের ভীষণতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যুদ্ধ ব্যতিরেকে এরূপ বিপর্যয় দেখা যায় না।

কিন্তু যুদ্ধের সময়ও এরূপভাবে নিরস্ত্র ও অসহায় নর-

নারীকে কেহ হত্যা করে না, সম্পত্তি এরূপ ভাবে লুণ্ঠিত হয় না। যুদ্ধেরও নিয়ম আছে। সত্য বটে, বিগত বিশ্ব-যুদ্ধে উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বোমাবর্ষণ করিয়া বহু নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে বধ করিয়াছে, এবং সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তৎসম্পর্কেও প্রতিবেদ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার স্বেচছা ছিল। এভাবে প্রতিবেদ্যী ভ্রাতৃত্বল্য নরনারীকে হত্যা করা অসভ্য সমাজেও দেখা যায় না, সভ্য সমাজে ত দূরের কথা।

এবারকার কাণ্ডের প্রাধান্যবোধ্য বিষয় : ১ম ইহার আকস্মিকতা। ১০ই ফেব্রুয়ারী অত্যন্ত হঠাৎ ইহা বিভিন্ন শহরের ও গ্রামের অনেক জায়গায় যুগপৎ আরম্ভ হয়। ২য়, ইহার তীব্রতা ও ব্যাপকতা। চেন্দ্রিস্থা প্রভৃতির অত্যাচারের বিবরণে পাঠ করা যায় যে, এক সঙ্গে বহু লোক হত্যা করা হইল বা বহু সম্পত্তি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এবার যা দেখিলাম, তা সেই বিবরণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছুটিয়া ছুটিয়া কলিকাতায় আসিতেছেন। বাংলার দুঃখ ও দুর্দশায় সমগ্র ভারত বিচলিত হইয়াছে, অন্তত এখনকার মত। অনেকে এই সমালোচনা করিয়াছেন, শুধু প্লেনে এইভাবে উড়িয়া আসিয়া পণ্ডিতজি আসল সমস্তার কি প্রকার সমাধান করিবেন? আমরা মনে করি তাঁর এই ভাবে ছুটিয়া আসার প্রয়োজন ছিল। সমগ্র ভারত যে ঐক্যবদ্ধ এবং বাংলার সমস্তা যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্তা, এই বোধ যত বাড়ে তত মঙ্গল। আর হাজার হাজার উদ্বাস্তু ও ইহাতে কতকটা সাহায্য ও শান্তি লাভ করে।

আমরা এবং বাংলার হাজার হাজার লোক যে আশায় বুক বাঁধিয়া পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আজ (১৭/৩/৫০) তাঁর বক্তৃতা পড়িয়া তা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা বুঝিতে পারিলাম,

কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য হয়ত করিবেন, কিন্তু বাংলাকে সম্পূর্ণ নিজের পায়ে উপর দাঁড়াইতে হইবে।

বস্তুত, এবার করাচীর কুটনীতি জয়লাভ করিয়াছে। পাকিস্থান হওয়া অবধি করাচীর ধ্যান জ্ঞান ছিল, পূর্ববাংলাকে এই কথা বুঝান যে পশ্চিম বাংলা তোমার পর এবং পূর্ব বাংলার হিন্দুও তোমার পর, এতদিনে তার স্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে। দিল্লী বাংলার জ্ঞাত সত্য সত্য কতটা

দুঃখ অনুভব করে বলা শক্ত। কিন্তু দিল্লীর ও করাচীর একটা অকারণ ভয় ছিল, দুই বাংলা একত্র হইলে, হিন্দু মুসলমান এক হইলে, সমগ্র ভারত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবে। কারণ ভিন্ন হইলেও এবিষয়ে দুই রাষ্ট্রের চিন্তাধারা প্রায় এক রকম। সুতরাং বাঙ্গালীকে মাথা তিক করিয়া ভাবিতে হইবে, নেতাদের মধ্যে এই ভাবে বিবাদ করিয়া ও শক্তির অপচয় করিয়া আমাদের দিন কাটাইতে হইবে না মুক্তির অগ্র উপায় আছে।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

যাদবপুর উদ্বাস্ত পল্লী মহিলা সমিতি

সমিতির প্রচারক শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ যাদবপুর উদ্বাস্ত শিবিরে ২৬শে ফেব্রুয়ারী মহিলাদের আহ্বত সভায় যোগদান করেন। সভায় মহিলাসমিতির বিষয় তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায়ই এবার মহিলা সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্তা পঙ্কজিনী গুহ রায় উক্ত সমিতির সম্পাদিকা নিযুক্ত হন এবং উক্ত সমিতি কেন্দ্র সমিতির সহিত যুক্ত হয়।

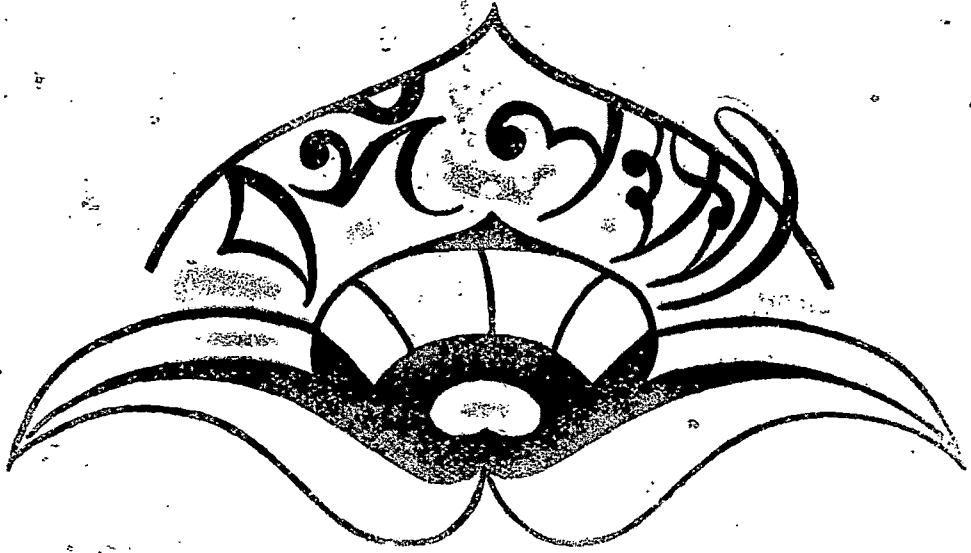
উদ্বাস্ত হইয়াও পূর্ববঙ্গবাসীরা মনের বল যে হারায় নাই উক্ত সভায় মহিলাদের আলোচনায় তাহা প্রকাশ পায়, শত প্রকার লাঞ্ছনা, দৈন্য, হতাশার মধ্যেও নিজেদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার বিপুল আগ্রহ ও চেষ্টা তাহাদের ভিতরে দেখা যায়। আর্থিক দৈন্য অত্যাগ্র স্থানের তুলনায় স্বভাবতই তাহাদের বেশী, গঠনমূলক কাজে সরকার নানাবিধ সাহায্য করিয়া থাকেন, এমতবস্থায় এই উদ্বাস্ত পল্লী সমিতিতে গঠনমূলক কাজে আর্থিক সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিলে, অনেক অসহায়, আত্মীয় স্বজনহারা

অনেক মহিলা জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া গইবার সুযোগ পাইবেন। এই বাস্তবহারী সমিতির ক্রমউন্নতি আমাদের কাম্য।

রাহতা সেবক সঙ্ঘ মহিলা সমিতি

শ্রামবাজারের অন্তর্গত রাহতা সেবক সংঘের অগ্রতম কর্মী শ্রীযুক্তা শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত যোগাযোগ স্থাপন পূর্বক, প্রচারক জিতেনবাবু রাহতা পল্লীতে গত ৫ই মার্চ মহিলাদের এক সভায় যোগদান করেন। সমবেত লাবন্ড মহিলাসমিতি গঠন করেন এবং কেন্দ্র সমিতির সহিত উক্ত সমিতি যুক্ত হয়। শ্রীযুক্তা কুমুদ বাল দেবী উক্ত সমিতির সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাহতা অতি সাধারণ পল্লী, এই পল্লীর যুবকবৃন্দ রাহতা সেবক সংঘের ভিতর দিয়া পল্লী উন্নয়ন মূলক সর্ববিধ কাজ করিয়া থাকে, এই যুবকবৃন্দের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় পল্লীর মহিলা, এবং প্রৌঢ়, বৃদ্ধরাও সজাগ হইয়াছেন। মহিলাগণ স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পল্লীর সংগঠন কাজে নিজেদিগকে নিয়োগ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যে উক্ত মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।



২শে বর্ষ

বৈশাখ—১৩৫৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

যে বিষয়ে মন উত্তেজিত থাকে বা যে বিষয়ে সর্বদা আলোচনা চলে, যে চিন্তা সবলে মনকে আক্রমণ করে, যে কর্মের প্রভাব মনকে তীব্রভাবে আচ্ছন্ন করে তা সেই সময় রচনার বিষয় হতে পারে না। কারণ আবিষ্ট মন সত্যকে বিকৃত দেখে। আজকের দিনে তাই বাঙ্গলা দেশে বা ঘটেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা অনেকখানি—কিন্তু তবুও এমন অবস্থা ঘটে যখন পারিপার্শ্বিক প্রবল হয়ে উঠে কেন্দ্রকে লোপ করে দিতে পারে। যখন সব চিন্তা সব ভাবনা সেই প্রবলতার থর্পরে আবদ্ধ হয়ে যায়। ‘বঙ্গলক্ষ্মী’তে লেখবার অহুরোধ পেয়ে তাই আজ সেই বিষয়েই ছু একটি কথা আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি বা আজ বহু বঙ্গলক্ষ্মীর মনে আন্দোলিত হচ্ছে।

অপদেবতার ভর হয়েছে আমাদের দেহে। মনে চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের জন্ম হয়েছে। সেই আমাদের দেহ ও মন যেখানে ঘটেছে চৈতন্যলীলা, যেখানে সঞ্চারিত অমিতাভ বুদ্ধের জ্ঞানালোক, যেখানে উপলব্ধি রবীন্দ্রসাহিত্যের আনন্দ অমৃত, যেখানে ভ্রমণ করেছেন তীর্থযাত্রী পরিব্রাজক মহাত্মা গান্ধী, সেই মনে ও তার আধার দেহে জন্ম হয়েছে

আওরঙ্গজেবের, তৈমুরলঙ্গের, চেঙ্গিসখাঁর। এত দিনের উপশ্রান্ত ফল তাই অট্টহাস্যে উড়ে যাবে। তারা বলবে বড় বড় বুলি রেখে দাও—প্রতিশোধ না হলে আত্মরক্ষা হবে না। বলবে, ওখানে কি হয়েছে দেখে এসেছ কি, যে এখানে ধর্মকথা বলছ। কিন্তু খুব সম্ভবত ছুরিতে যারা শান দিচ্ছে তারা ওখানে কি হয়েছে দেখে আসে নি। এবং যদি সত্যিই নিরপরাধ নিরস্ত্র সমধর্মীর কল্পন মৃত্যু ও নারীর অপমানে সে অন্তরে ব্যথিত হয় তাহলে তার পক্ষেও ঠিক সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব কী? একটি শাস্ত্র বাক্য আছে—আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জানো। কারণ অজ্ঞানই সকল দুঃখ বিপদের মূল। অন্ধকারে যে নৃশংসতা ঘটে জ্ঞানের আলোক নৈলে তার পরিজ্ঞান নেই। কিন্তু সে যে অত্যন্ত কঠিন কথা। নিজেকে জানবার চেষ্টায় দুঃখ আছে—সত্যকে জানতে গেলে অপ্রিয় সত্যও আলোতে আসবে। আমরা যদি প্রত্যেকে মনের দিকে অহুধাবন করে দৃষ্টিপাত করি, সাহস করে যদি নিজের মনকে নিজের কাছে উদ্ঘাটন করতে চাই তাহলে সেখানে কি দেখি? সেখানে কত অন্তায় কত পাপ কত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা গুহাহিত হয়ে

বসে আছে, যখন তারা পোষাক পরে উপরে উঠে আসে তখন তাদের আমরা নিজেরাও চিনতে পারি না, বা চিনতে চাইনা। তেমনিই ঘটে জাতির জীবনে! জাতিগত ভাবেও আমরা অত্মকে দেখতে চাইনে বা নানা অজুহাত দেখিয়ে থাকি। বহুদিন থেকেই আমাদের আধুনিক সভ্যতা উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে এমন যোগাযোগ কল্পনা করেছে যে উদ্দেশ্যের আবশ্যিকতা ও গুরুত্ব দিয়ে উপায়ের সমস্ত হীনতাকেই সে সর্গোরবে মেনে নেয়। তাই বহুদিন থেকেই চুরি, ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা বড় বড় উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা মনের কাছে সহিয়ে নিয়েছি। কার্যোদ্ধারের খাতিরে রক্ষা করেছে এমন পাপের সঙ্গে যা মহত্বসমাজের সামান্য শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরেও অমান্য করা যায় না। সেই সত্ত্বানর দ্বারা ক্রমে ক্রমে মনটা এমন তৈরী হয়ে এসেছে যে খুন, গৃহদাহ, পরস্বহরণ, লুণ্ঠন এমন কি শিশুহত্যা নারীধর্ষণ ঘটলেও তা আমরা জাতির আত্মরক্ষার খাতিরে, ধর্ম রক্ষার খাতিরে মেনে নিতে, সাফাই দিতে অভ্যস্ত হয়েছি। বলা বাহুল্য ধর্ম কথাটার বহু অর্থ রয়েছে, কিন্তু তার অর্থ সব চেয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায় যখন ধর্মের খাতিরে অত্যাচার চলে। কোন ধর্মটা তখন হত্যাকারীরা বাঁচাতে চান তা উভয় ধর্মের কোনো ধার্মিক জানেন না। কিন্তু যে ধর্মের অর্থ নীতি, যার ফলে কল্যাণ সে কিন্তু উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হতে পারে না। আত্মরক্ষা ও স্বজাতি রক্ষার খাতিরেও তার অর্থ বদলানো যায় না। কারণ সে অর্থে “ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, সে নহে স্বপ্নের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মই ধর্মের শেষ”। এ কথা আজ বিজ্ঞপের বিষয় সন্দেহ নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই। কারণ এটাও সেই বড় বড় কথার অত্যন্তম যা আজ জনসাধারণ শুনতে প্রস্তুত নয়। কারণ সমস্ত মহৎ বাণীই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি তা ভাংপড়াভ্রষ্ট হয়ে বুলি হয়ে দাঁড়ায়। যদি সত্যে তা প্রতিষ্ঠিত না থাকে। যেমন যখন আমরা কথায় কথায় মহাজাতির চিত্র উদ্ঘাটিত করি, দেশ বিদেশে চিতাভস্ম পাঠাই, বক্তৃতা মঞ্চে বার-বার তাঁর বাণী স্মরণ করি, কিন্তু কাজে কালোবাজার পোষণ, পরজাতি বিদ্বেষে উস্কানী, ঘোর স্বার্থ ও ঈর্ষান্বয়ের দ্বারা চালিত হই। একটা কথা মনে রাখতেই হয় যে সব জিনিসেরই সত্তা সংস্করণ চলে না। সব কাজেরই অধিকারী ভেদ আছে। যেমন তেমন ভাবে

সব কাজ চলে না। অহিংসার বুলি বলতে বলতে হিংসার ইন্ধন জোগান চলেছে, তাই সাধারণ লোকের কাছে সে সব কথা অনর্থক হয়ে গিয়েছে। একথা কে না জানে যে নিরপরাধীকে হত্যা করা অত্যাচার? সে কখনো প্রতিশোধ হতে পারে না। কারণ পাপ তো ব্যক্তিবিশেষের। তা না হলে রূপকথার গল্পের মত দেশে চুরী হলে যে কোনো একজন লোককে ধরে শুলে দিলে চলে যায়। একথা কেই বা না বুঝতে পারে যে হত্যাকারী যদি নাগালের বাইরে থাকে তাহলে যে কোনো একজনকে ধরে ফাঁসি দিলেই প্রতিশোধও হয় না বিচারও হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জানা কথাও লোকে ভুলে যাচ্ছে। কারণ পাপ প্রশ্রয় পেতে পেতে অতিকায় মূর্তি ধারণ করেছে—মামুষের দেবদেহে দানব জন্মগ্রহণ করেছে। পাপে যার আনন্দ। নরহত্যা যার বাসন। কোনো একটা ছুতো পেলেই তাই আমরা টাম বাস পুড়িয়ে নিরস্ত্র অসহায় লোককে পিটিয়ে মেরে আনন্দ করে নিই। যদি দাঙ্গার ছুতো হাতের কাছে না থাকে, তবে “ছেলেধরা” অজুহাতে পথচারীকে হত্যা করা চলে।

আমাদের হিন্দুধর্মে যুদ্ধকে কোন দিন পাপ বলে মনে করা হয়নি। সমাজে যারা প্রবল, বলশালী বিভ্রান্তী তাঁরা ক্ষত্রিয়— যুদ্ধ তাঁদের ব্যবসা ও বাসন। যুদ্ধে তাঁদের আনন্দ ও গৌরব। কারণ যুদ্ধে ছিল তাঁদের পৌরুষের লীলা। পুরুষের যে অমিত তেজ ও প্রাণশক্তি নানা কঠিন কর্মে ছরুহ সাধনায় দুর্গম বিপদশঙ্কল পথে যাত্রা করে সেই তেজ ধর্মযুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করত। ক্ষত্রিয়ের ধর্মে তাই বীরত্ব একটা আর্ট হয়ে প্রকাশ পেত। কোনো মতে হনন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। বীরত্ব ছিল আনন্দ—সমস্ত রাজপুত জাতির যুদ্ধ ইতিহাসে তাই বীরত্বের সঙ্গে ক্ষমা এবং কৌশলের চেয়ে সত্য বড় হয়ে উঠেছে। যুদ্ধে তাদের আনন্দ, কিন্তু যুদ্ধ কার সঙ্গে? নারীর সঙ্গে নয় শিশুর সঙ্গে নয়। রথীর সঙ্গে রথীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের, মল্লর সঙ্গে মল্লর। নিরস্ত্রকে আহতকে মুক্তকেশ ও শরণার্থীকে পলায়নপরকে হত্যা করার মত ঘোরপাপ অতিবড় যুদ্ধকামীও করতেন না। যে হুএকটি অত্যাচার যুদ্ধ ইতিহাসে উল্লিখিত তা নিয়মের ব্যতিক্রমের

দৃষ্টান্ত। অপ্রস্তুত কর্ণকে বধ করেছিলেন, মহাবীর অর্জুনের চরিত্রে সেই দুঃপনয়ের কলঙ্ক ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বলতে পারা যায় এখন ধর্মযুদ্ধ কোনো দেশই মানে না—এ ধর্মোপদেশের কাল নয়। সে কথা অত্যন্তই সত্য। বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্রকে রলেছিলেন যুযুৎসুর যেমন ঔষধ রোচে না তোমারও তেমন হিত কথায় রুচি নেই। কিন্তু অরুচিকর হলেও যেমন রুগীর হিতের জন্য বৈদ্য তাকে ঔষধ খাওয়ায় তেমনি তোমায় আমি ধর্ম কথা শোনাব। বিহ্বলের সাহস ছিল, আজকালকার দিন হলে গুলি খেয়ে মরতে হত। এখন কারাই অপরপক্ষের কথা শোনবার ধৈর্য্য নেই। ধর্মকথায় রুচি নেই বটে কিন্তু ধর্মের ভানটি আছে। পাকীস্থানে যখন অসহায় অরক্ষিত হিন্দু নরনারীর উপর অত্যাচার হয় তখন সে ইসলামের খাতিরে—আর ভারতে যখন হত্যা ঘটে সেও হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে। ধর্মরক্ষার খাতিরে মহাত্মা গান্ধীকেও হত্যা করার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু সেই সনাতন হিন্দুধর্মের সামান্য নীতিটাও সকলে ভুলে যাচ্ছে যে “ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতম্।”

যে কারণেই হোক নীতির যেটা সাধারণ নিয়ম তা যেদিন থেকে ভাঙতে শুরু করলুম—আপোষ করলুম পাপের সঙ্গে, সেদিন থেকেই হিন্দুর ধর্মাস্তরিত হওয়া শুরু হয়ে গেছে। অস্ত্রাঘাত ধর্মের মত হিন্দুধর্মের একটা সুনির্দিষ্ট গুণি নেই—নানা মতে নানা উপাসনায় নানা বিশ্বাসে বহু বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন ধারায় তা উৎসারিত—তার অন্তর্হীন বৈচিত্র্যের মধ্যেও তবু একটা ঐক্য আছে—একটি মূল প্রাণশক্তি আছে তাকে হিন্দুধর্ম না বলে হিন্দু সভ্যতা বলা উচিত। সেই সভ্যতা মানুষের মনের সব রকম দিককেই চালিত ও সংহত করেছে—। যেমন হিন্দুও পশু হত্যা করে, বলি দেয়—কিন্তু সে জবাই করে না, তার বলি যদি এক আঘাতে না পড়ে, পশু যদি কষ্ট পায়, তবে তার পূজা ব্যর্থ হয়। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ইতিহাস গুপ্ত হত্যা ও নৃসংশতার ইতিহাস নয়—ধর্ম যুদ্ধের পুণ্যকাহিনী। পঞ্চাশ বছর বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে সে তপস্কার রত হয়—। ভাইএর খড়ম সিংহাসনে রেখে সন্ন্যাসী বেশে সে রাজ্য চালায়। ভাইএর চক্ষু উৎপাটন করা, পিতাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার মূণ্ড উপহার দেওয়া

হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার কাহিনী নয়। তার রাজাকে সে শিখিয়েছে—

তাজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্রবেশ। শিখিয়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে—
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।”

জয় পরাজয়ে সে বিচলিত নয়—প্রয়োজন হলে পরাজয় স্বীকার করেও তাকে শর সংহরণ করতে হবে—আত্ম শরণার্থী ভীত ও পলায়নপরকে সে তো বধ করতে পারবে না। সে ক্ষত্রিয়ের নীতি নয়। হিন্দুর ধর্ম নয়। যদি তার সেই নীতির ধর্মের আজ আর কোনো মূল্য না থাকে তবে এত মারামারির আর প্রয়োজনই বা কি? ধর্মাস্তরিত করণ তো হয়েই গেছে।

আজ এই চিত্ত বিশ্রান্তকারী দুঃখের দিনে এ কথা মনে রাখতেই হবে যে ক্রোধ ও হিংসা তেজ নয়—বীরত্ব নয়—। আল্লায়িতকুন্তলা লাঞ্ছিতা পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরকে বললেন— “ক্রোধহীন ক্ষত্রিয় নাই আপনি একথার ব্যতিক্রম। যথাকালে যে ক্ষত্রিয় তেজপ্রকাশ করে না সকলেই তাকে অবজ্ঞা করে। ক্ষমার উপযুক্ত কালে ক্ষমা যেমন ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম তেমনি সর্বদা ক্ষমাকালীন রাজার বহু দোষ। সে অবজ্ঞার পাত্র, এমনকি তার ভাষ্যাও নষ্ট হয়ে যায়। যুধিষ্ঠির বললেন,—“ধর্মনষ্টকারী ক্রোধ লোকের কর্তব্যজ্ঞান হরণ করে। যিনি বুদ্ধির দ্বারা আপন ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তিনিই যথার্থ তেজস্বী। দক্ষতা উৎসাহ বীরত্ব ক্ষিপ্ৰকারিতা, তৎপরতা তেজের গুণ। কোথাভিভূত ব্যক্তির এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যথাকালে এই সকল গুণসম্পন্নব্যক্তি ক্রোধ ত্যাগ করে যদি তেজ প্রকাশ করেন তবে সে তেজ মূর্খের পক্ষে দুঃসহ হয়। যদি দুঃখোধনের কথা বল তবে সে ক্ষমাদারণের যোগ্য নয় বলেই ক্ষমা তাকে আশ্রয় করেনি।”

তখন প্রিয়া চ দর্শনীয় চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা দ্রৌপদী বললেন—যে বিধাতা আপনার এই মোহ উৎপন্ন করেছেন তাঁকে নমস্কার। ধর্ম ক্ষমা কোমলতা সরলতা এগুলির দ্বারা জগতে সম্পদ লাভ করা যায় না। নতুবা আপনার ভ্রাতারা সকলেই ধার্মিক এবং ধর্মই আপনার প্রাণ সে ক্ষেত্রে ধর্ম

আপনাকে রক্ষা করেনা কেন? আপনি তো কখনো অত্যাচার করেন না, সকলকে সম্মান, ব্রাহ্মণকে দান গমস্ত কর্তব্য যথোচিত পালন করেন তবু আপনার এ দুর্দশা কেন?

‘যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী, তোমার কথাগুলি সুন্দর কিন্তু নাস্তিকের মত। আমি তো ধর্মের বাণিজ্য করি না। ধর্ম আমার সম্পদ উপার্জনের ব্যবসা নয়। ফল অন্বেষণ করে আমি ধর্ম করি না—উচিত যা তা করি। যা কর্তব্য যথাসক্তি তাই করে থাকি—কারণ যারা ধর্মের বাণিজ্য করে তারা অতি হীন।’ এই কথা আজ স্মরণ করবার মনে রাখবার প্রয়োজন হয়েছে যে স্বার্থসিদ্ধি ও ক্রান্ত কার্যসিদ্ধির জন্ত কেবলি উপায়ের সঙ্গে চুক্তি করলে চলবে না। সে

কথা আজ ভুলেছি বলেই দেশের সব রকম কাজে স্বার্থ তাঁর জাল ফেলেছে। আজ দেশের স্বার্থ জাতির স্বার্থের অজুহাতে যে পাপ করি কাল নিজের স্বার্থে তা অনায়াসে করতে পারি। বস্তুত নিজের স্বার্থের প্রেরণা নিশ্চয় অধিকাংশের মধ্যে প্রবল। পতনের মূহুর্ত পথ থেকে নীতির বিবেকের বাধাগুলো তুলে ফেলায় পদস্থলন সোজা হয়েছে। শুনতে পাই এই ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যে পদ্মার ছুপারেই বিস্তালা শক্তিশালী মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থও নানা খেলা করেছে। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় আত্মাকে রক্ষা করা। তা যদি না হয় তা হলে ঋষিবাক্য ফলবে—ঘটবে “স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।”

“গজদন্ত”

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

ইদানীং সবিতার গজদন্তের জৌলুসটা নিভাননীর আক্ষেপের দৃষ্টিতে যেন ক্রমশঃ ফিকে আর ম্লান হইয়া আসে।

তখন সবিতা বছর সাতকের মেয়েটি,— ষুঁইফুলের মত চেহারা, পদ্ম পাপড়ির মত টানা টানা চোখ, সবেমাত্র দ্বিতীয় বার দন্তোদগম স্বরূপ হয়েছে,—এইসময় নিভাননীর শ্রুত বংশের কুল পুরোহিত একদিন বললেন—“মা, তোমার এ মেয়ের দাঁতের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? কী বিশাল এক গজদন্ত বের হচ্ছে,—এ মেয়ে তোমার রাজরাণী না হয়ে যায় না—।”

“রাজরাণী,”—মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে রাজরাণী হতে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বৈকি—

কিন্তু,—একুশ বৎসরটাও যেদিন সবিতার জীবন সীমানাকে অতিক্রম করলো, অথচ ওর ভাগ্যআকাশে রাজপুত্রের সন্ধান রইল সুদূর পরাহতের মতই, সেইদিন থেকে নিভাননীর গজদন্তের প্রতি গভীর বিশ্বাসলুপ্ত মনটা ক্রমশঃ হতাশ হয়ে উঠতে লাগলো।

অথচ রূপ গুণ বাপের প্রতিপত্তি কোনোটারই অভাব

ছিল না সবিতার, ছিল শুধু ওর উৎকট ধরণের এক রুচিবোধ।

তাই বাংলাদেশের সূর্য করোজ্জ্বল পটভূমিতে সে গৌরবর্ণ স্নন্দর এবং সুগঠিত দেহমৌল্য সম্পন্ন জীবন দেবতার সন্ধান করত। সামাজিক বিচারবুদ্ধির স্বল্প হিসাব নিকাশে এ ধরণের রুচিবোধ ওর কিছু খাপছাড়া আর কিছু উৎকট বৈকি! বাপমায়ের বহুকষ্টার্জিত কয়েকটা পাত্রে সে অনায়াসে বর্জন করে ওর বান্ধবী আইভিকে বলেছিল, “রবীন্দ্রনাথের সেই ভুতের মতন চেহারা যেমন, কেটাকে কে বিয়ে করবে? মুখের দিকে তাকাতাই গা যেন শিউরে ওঠে—”

আইভি ওর মেম বন্ধু—ওদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে, রমেন সম্প্রতি বিলাত থেকে সিনেমা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ঘেয়ে ওকে বিয়ে করে এনেছে।

রমেন বিদেশী মেঘের পাণিগ্রহণ করলেও স্বদেশের ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে রাজী নয়, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির পটভূমিতে সে প্রতীচ্যের কৃষ্টি রক্ষা করবে। তাই আইভি ইতিমধ্যে বাঙালীর প্রসাধন আর সৌন্দর্য অনুশীলনে প্রায়

অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ইদানীং সে অধ্যাত্ম আর রন্ধন বিদ্যায় পারদর্শিনী হবার দৃষ্টের আর ছত্রিতক্রমণীয় সাধনা করছে।

সবিতার বিকৃত ঠোঁটের ভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে আইভি উচ্ছসিত হয়ে হেসে উঠে বললো—“এদেশে আর তোর বর জুটেবে না,—কাশ্মীরি ছেলে না হয় সাহেব বিয়ে কর—”

বুকের সংশোধনে একটি গভীর নিশ্বাস অবরুদ্ধ রেখে সবিতা বললো, “সে সব ভাই উপায় নেই, বাবা স্বজাতির পাত্র ছাড়া কন্যা সম্প্রদানই করবেন না—”

“না করলেন সম্প্রদান”—আইভি বিদ্রোহ প্রকাশ করে বললো, “তোরা দুজনে মিলে রেজিষ্টারী করে বিয়ে করে নিবি।”

একটু নিলিষ্ট ভঙ্গিমা সবিতা বললো, “বাপু মার আশীর্বাদ ছাড়া বিয়ে, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়, মনে হয় যেন দৈহিক কামনার আমি জর্জরিত হয়ে উঠেছি।”

ওর অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে রক্ষ কণ্ঠে আইভি জিজ্ঞেস করলো, “একুশ বছর বয়সে তুই কী দৈহিক কিছুই অনুভব করিস্ না?” “করলেও,” শ্রিত হেসে সবিতা বললো, “সংযমকেও অস্বীকার করি না।”

বিজ্ঞপের ফুলিঙ্গ বলসে উঠলো আইভির কটা চোখের নীলাভ উজ্জল দ্ব্যতির মধ্যে, “তোদের দেশে নারী নির্ধ্যাতনের কারণ কেবল পুরুষ নয়, তোরা নিজেরাও।”

আগ্ননা সবিতা নিম্পৃহ কণ্ঠে বললো, “হয়তো তাই, হয়তো বা তা নয়, এ আলোচনা তোমার সঙ্গে আমি আর একদিন করব, কিন্তু একী ভূমি ডান হাতে নোয়া পরেছ কেন? হিন্দু মেয়েরা বিয়ের পর সিঁথিতে সিঁদুর আর বাঁ হাতে নোয়া পরে।”

অপ্রতিভ আইভি সলজ্জ হেসে লৌহ বলয়টা খুলতে খুলতে বললো, “রমেন আমাকে একটা মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলো, তারা এটা আমাকে দিয়েছিল।”

“কালীঘাটে গিয়েছিলে?”

“কী জানি ভাই, তোমাদের কত কোটি দেবতা, আমার কিছু মনে থাকে না।” একটু উদ্বেগের সঙ্গে আইভি বললো,—“রমেন বলেছে, তোমাদের বেদ বেদান্ত সব

আমাকে শেখাবে,—আমি কি করে শিখব, ভাবতে গিয়ে যেন কুল পাই না।”

এই সময় সবিতার জননী নিভাননী এসে কন্যাকে বললেন, “সবিতা, তোমার বাবা তোমাকে টেলিফোনে ডাকছেন, একটি ভালো পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন, তোমার মতামত তিনি জিজ্ঞেস করবেন, শোন আর অমত কোর না, দড়ি বেশী টানলে ছিড়ে যায়।”

মুহূ হেসে সবিতা পিতার কক্ষ অভিমুখে যেতে যেতে বললো “মা লক্ষ্মীটি,—আমি শুধু বাবার কাছে চেহারাটা জেনে নেব—” মা আর কী বলবেন? সবিতা শ্রিত মধুর একটু হেসেছিল, ওর পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে সাদা ধবধবে মুক্তোর সারির মত দাঁতের মধ্যে গজদন্তটা একটু বলসে উঠলো যে প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন। তবু নিভাননী অনুভব করলেন, ওই গজদন্তর জৌলুসটা ক্রমশঃ যেন ফিকে আর ঘানাত হয়ে আসছে।

* * * *

কিন্তু গজদন্তের প্রতিশ্রুতি কী মিথ্যে হতে পারে। হয়ত পারে না। তাই এবার আর ভুতের মত চেহারা কেটা নয়, যেন রূপের অবতার স্বয়ং কার্তিক ঠাকুর পুচ্ছধারী ময়ূর থোক নেমে এল। নীলমেশ শুধু রূপে আর রঙে বিলেতের স্নানাম টুকু অর্জন করেনি, জীবন স্পন্দনের স্নায়ুতে ছন্দে পাশ্চাত্যের পটভূমিকে সর্বদান ভাবে আয়ত্ব করেছিল।

শ্রিতমুখে সগৌরবে হেসে নীরোদবরণ স্ত্রীকে বললেন—“এ ছেলে শুধু রূপের জৌলুসেই সাহেব নয়, মনে প্রাণে বাসভূমিতে কোনও দিক থেকে ইথরেজের তুলনায় ছোট নয়,—বিলিতি এক বড় ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিলেতে বাড়ী আছে, ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে মধ্যে মধ্যে বসে আর কোলকাতা আসে।”

কৈপে উঠলেন খরখরিয়ে নিভাননী, “মা কী বললে, বিলেতে বাড়ী আছে? সবিতাকে যদি পছন্দ করে তবে কী বিলেত নিয়ে চলে যাবে?”

স্বাডডোকেট নীরোদবরণ মুহূ হাসি আবার হাসলেন—“সবিতা যেদিন জন্মেছে,—সেইদিনই তো জানো,—ও আমাদের নয়,—এবার গৌরবদৃষ্ট কণ্ঠে নীরোদবরণ

বলুলেন,—“জানো নিভা, পনেরো বছর এ ছেলেকে বিয়েতে কেউ পশ্মত করতে পারেনি,—এদেশের কত ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, কত প্রলুব্ধ পিতার লোভনীয় আহ্বান কিছুতেই সে টলেনি,—ও দেশের কত মুগ্ধ সমারোহ, কত দুর্নিবার আকর্ষণ—তবু সে ভোলেনি, আমাদের ক্লাবের সে মেসার, আমাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সবিতাকে সে দেখবে, এখন সবিতা যদি শিবের তপস্যা ভাঙতে পারে”—ইতিমধ্যে নিরন্তর নিভাননীর মানসিক প্রতিক্রিয়া স্রু হইছে স্বায়ত্তক্রীতে—সবিতা যেন শিবের তপস্যা ভাঙতে না পারে,—উঃ কতদূর, কতদূর সে চলে যাবে,—আমাদের থেকে সে যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। হে ঐশ্বর্য্য, ওর ওই গজদন্তটা কোনও ভাবে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায় না ?

না,—গজদন্ত আর উপড়ে ফেলা যায় না,—কুল-পুরোহিতের ভবিষ্যৎবাণী যে মিথ্যে হবার নয়,—সবিতার ঋক্মকে সাদা গজদন্তটা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলো হয়তো বা, শিবের তপস্যা ভঙ্গ করলো সবিতা, অপ্রত্যাশিত ভাবে নীলিমেশ সবিতাকে পছন্দ করে ফেললো।

সবিতার বান্ধবী মহলে একটা রীতিমত আলোড়ন উঠলো।

শুধু আলোড়ন নয়, একটু বিক্ষোভ আর পুঞ্জিত নিঃশ্বাস গুমরে উঠলো গুদের মনের অন্তরালে।

কত ব্যারিটার, ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারী দপ্তরের বড় বড় মাহুঘরা, ইন্সপেক্টরের মালিক প্রভৃতি পিতৃগণ নীলিমেশকে জামাইরূপে পেতে অক্লান্ত ক্রটি করেননি, কিন্তু শিবের তপস্যা ভঙ্গ করবার সাধনা বুঝি কোনও মেয়েরই ছিলনা।

স্বতা গাঙ্গুলি একটু বিক্ষোভ প্রকাশ করে বলে ফেললো, “সবিতা, তোর good luck কে আমি congratulations জানাই। তবে তুই রূপে গুণে এমন কিছু exceptional নস যে নীলিমেশের মত ছেলে তোকে পছন্দ করতে পারে,—এ শুধু মেসোমশাইর নামে তোর বরাত খুলে গেল। সাহেবমহলে তাঁর মত নাম যশ খুব কম বাঙালীরই আছে।”

এমনই ধরণের মন্তব্য আরও নানা বান্ধবী প্রকাশ করলো।—সবিতার অত্যাশ্রিত বান্ধবীদের ভীড় একটু পাতলা হয়ে এলে, আইভি অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে বললো “কী

সব ঈর্ষা দেখছিস ? মি বাগচী তোকে নিজে দেখে শুনে পছন্দ করলেন,—ওরা বলছে,—মিঃ তালুকদারের নামে বিয়ে হচ্ছে”—

ওকে বাধা দিয়ে সবিতা একটু চিন্তিত মুখে বললো, “কী জানি ভাই, good luck কিনা জানিনা, আমার তো ভীষণ ভয় করছে—বাগচী বলেছে—“বিলেতে আমার পজিসন যেন ক্ষুন্ন না হয়,—একেবারে আমাকে ইংরেজ মেয়েদের মত স্মার্ট হতে হবে,—জানিস তো কাঁটা চামচেয় খাওয়া আমার ভালো অভ্যাস নেই”—একটু গৌরবের হাসি উজ্জল হয়ে উঠলো আইভির পাতলা রক্তিম ঠোঁটের স্বধমায়, নীল চোখের উজ্জল মণিতে একটু স্মিট কটাক্ষ হেনে সে বললো, “কাঁটা চামচেতে আর কী ? আমার সঙ্গে ক’দিন টেবলে বসিস, অভ্যাস হয়ে যাবে। তোর সঙ্গে বাগচীর এত ভাব হয়েছে রে ? আর কী গল্প করিস বলনা রে ?” “গল্প না করে উপায় আছে ? বাবাকে বলেছে ক’দিন সে এসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হবে। ওর বাঙালীর মেয়ের উপর অদ্ভুত ধরণের প্রীতি আছে, বলে,—স্বধোগ স্বভাবে বাঙালীর মেয়ে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেনা,—তাই ও বলেছে—ও আমার জন্মান্তর ঘটাবে।”

হেসে উঠলো আইভি প্রগল্ভ উচ্চাসে, “এদিকে রমেন আমার জন্মান্তর ঘটাতে হুঁদান্ত হয়ে উঠেছে,—ও আমাকে সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ের আদর্শে গড়ে তুলবে,—সীতা বুঝি যমরাজার কাছে গেছলো স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করতে”—

“দূর কী বলছিস ? সে সাবিত্রী।”

“আমার ভাই কিছু মনে থাকে না।”

“তোমাদের ফরম্যালিটির উনকোটা চৌষটি আমারও কিছুতে মনে থাকতে চায়না,—ওইগুলোই আমার বাগচীর পজিসন কিনা”—“কিছুনা,—সরি, থ্যাংকিউ, নট গ্যাট অল্ এইগুলো কণ্ঠস্থ করতে আর পারি জীবনে ডান্স,—স্মোক্, একটু ড্রিঙ্কে অভ্যস্ত হতে পারলেই আমাদের কার্চারকে তুমি আয়ত্ত করতে পারবে,—তোমাদের কার্চার বড় কঠিন।”

“কিছুনা—পতি পরম গুরু, আর তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম আর বন্দনা আরস্তাধীন করে নাও ব্যস্।”

বিশ্বয়ের সঙ্গে একটু ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আইভি বললো—

“তোমাদের কালচারের সঙ্গে মাতীর স্পর্শ নাকি অবিচ্ছিন্ন। রমেন বলছিল অন্ততঃ দশ বছর সময় নেবে তোমাদের জানতে।”

“মাতীর স্পর্শ ছাড়া সংস্কৃতির রূপ যে একেবারে অসম্পূর্ণ,”—সবিতা এবার একটু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে বললো—মাতী আর মানসের নিরবচ্ছিন্ন ধোঁগাধোঁগই তো সংস্কৃতির আভরণ; আবরণ তার বাইরেরকার বাকমকে জৌলুষ, বা সহজলভ্য আর সরল অলুকারণীয়। মন আর মাতী এক হয়ে মেশেনি বলে মিস্ মেও এক বিকৃত ব্যঙ্গনার মধ্যে আমার দেশের কালচারের রূপ দেখতে গিয়েছিলেন। ঠিক এই কারণে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের বিলেত পাঠিয়ে আমরা শিব গড়তে বাদর তৈরী করে আনি।”

সবিতা আর আইভির মধ্যে এমনই ধরনের আলোচনা প্রায়ই হয়। হুজুরেরই মমীজুতী আর স্নায়ুতে একটা উৎসই প্রবহমান, উদ্বেগ আর শঙ্কা জাগে কম্পিত চেতনা বোধে,—আইভিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় মেয়ে হতে হবে আভরণে আর আবরণে,—বাগচীর পজিসন্ রক্ষা করতে সবিতার নূতন জন্ম নিতে হবে পাশ্চাত্যের পটভূমিতে। দেখতে, দেখতে ওর বিবাহের দিন আসন্ন হয়ে এল।

নিভাননীর অত্যাশ্রয় কল্যাণের মত সাধারণ অলুষ্ঠান নয়, রীতিমত বৈচিত্র্য আর ব্যতিক্রম। দানসামগ্রী আর বরাভরণের বিচিত্র সমাবেশ। চুড়ি, কঙ্কণ, চুড় আর মফচেনের বাহার নয়। পাল আর ডায়মণ্ড সেট, বিলাতের রাত্রের পরিধানের গোল্ডেন আর সিলভার সেট এল থরে থরে, ব্রোকেড আর টিসু, জর্জেট শীফন, সোনালী জুতো আর প্রসাধনের নানা সামগ্রী। নিভাননী কল্যাণ জিনিষ পত্র গোছগাছ করছিলেন, সিক্কের বডিজ আর পেটিকোটগুলি ভাঁজ করতে করতে ভাবলেন,—নীলিমেশ বলেছে—সুতির জামা কাপড় সবিতা আর পরতে পাবে না, খসখসে সূতীতে গায়ের মশণ জৌলুস নাকি বিকৃত হয়ে যায় কিন্তু, কিন্তু সবিতা যখন আমার কাছে আসবে, এখনকার মত আকার

করে আমার একখানা “বঙ্গলক্ষ্মীর” মোটা কাপড় নিয়ে ও কী আর পারবেনা—? কেন কেন সে পরবে না? নিভাননীর শ্রুতিমূলে ঠিক তখন অলুপণিত হয়ে উঠলো, “এ যে গজদন্তের প্রতিশ্রুতি রক্ষা,—তুমি ভুলে যাও কেন? সবিতা এখন তোমার থেকে দূরে, অনেক দূরে চলে যাবে।”

“মাসীমা—”

“কে আইভি? এস, আচ্ছা সবিতার গজদন্তটা কোনও রকমে মাড়ি থেকে উপড়ে ফেলা যায় না।”

“এ সব আপনি কী বলছেন মাসীমা? মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, সে কত স্ত্রুখে আনন্দে নিজের সংসার রচনা করে, আপনি দুঃখ করবেন না।” আইভি জিজ্ঞেস করলো নিভাননীকে—“এ দেশের সব চেয়ে সেরা শাড়ী কী? রমেন আমাকে দুখানা কিনতে বলেছে, একটা নিমন্ত্রণে আমাদের যেতে হবে কিনা।”

“মুশিদাবাদী-কিন্তে পারো তুমি, ঢাকাইও আছে”—মনের সঙ্গোপনে একটা নিশ্বাস অত্যন্ত সন্তর্পণে পরিত্যাগ করে নিভাননী কতকটা আপন মনেই বললেন—“সবিতার কত ঢাকাই, শান্তিপুরী, ফরাসডাঙ্গা শাড়ী রয়েছে,—একখানাও সে আর পরিধান করবে না।” না—না নিভাননী আর দুঃখ করবেন না,—কল্যাণ স্ত্রুখ আর ঐশ্বর্য্যই তো বাপমায়ের আনন্দ আর গৌরব।

“না সবিতা আর দুঃখ করবে না—বাবা মা ভাই বোন আজন্মালীত গৃহনীড় সব কিছু ছেড়ে কত দূরে, দূরান্তরে, অজানা, অচেনা পরিবেশে সে চলে যাবে? তবু সে দুঃখ করবে না,—একটুও কঁাদবে না”—পাশের ঘরে সবিতা ওর এক বাক্সবীকে স্নিয়মাণ কণ্ঠে বলছিল,—“জানিস বাগচী বলে—“তোমরা শ্বশুর বাড়ী যাবার নামে কঁাদ কেন? কই ইংরেজ মেয়েরা তো কঁাদেনা?”

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠে বাক্সবী বললো—“তুই কী বললি রে?” “আমি বললুম, বারে, আমার দুঃখ হলে আমি কঁাদব না?”

* * *

সবিতার গজদন্তের প্রতিশ্রুতিটা নিভাননী নিরন্তর অলুভব করেন সমগ্র স্নায়ুতে আর মমমূলের গভীরে।

বাক্সবীকে সাদা দাঁতের উজ্জল প্রতিশ্রুতিটা নিমর্ম

প্রহসনের প্রতিক্রিয়া কিনা, থেকে থেকে নিভাননীর জিজ্ঞাসু মনে ব্যাকুল প্রশ্ন ওঠে। মাস কয়েক পূর্বে সবিতার বিবাহ সমাধান হয়েছিল। দ্বিরাগমনে আর সে পিতৃগৃহে ফিরতে পারেনি। স্বস্ত্য গৃহ ভাগলপুর থেকে স্বামীর কর্মস্থল বম্বে এবং ইউরোপ চলে গিয়েছে।

পিতৃভালয়ে হয়তো সে আর ফিরতে পারবে না।

অবাক্ত বৃকের তলায় গুমরে ওঠে নিভাননীর অব্যক্ত এক ব্যর্থ নিশ্বাস, অশ্রুসজল চোখটী আঁচলে মুছে নিভাননী স্বামীকে অহুযোগ জানিয়ে বলেন—“নীলিমেশ আমাদের বাড়ী আর সবিতাকেষ্টপাঠাবে না, যদি সে ভেতো বাঙালী হয়ে যায়।”

“আহা, তা কেন” নীরোদ বরণ জীকে মহাছত্ৰী জানিয়ে বললেন,—“পাঠাবে বৈকি ;—বিলেতের কালচারের প্রতি ওর একটা গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে,—সবিতাকে সেই দিক থেকে অভ্যস্ত করে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে”—

“ইলিশমাছের চচ্চড়ী খেতে সবিতা খুব ভালোবাসে। বিয়ের পর একদিনও আর খেলেনা”—

“ওসব কথা ভুলে যাও নিভা”, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে নীরোদবরণ বললেন—“মেয়েকে যাদের হাতে দিয়েছ তাদের মতই ভাবতে হবে,—সবিতা এখন কাঁটা চচ্চড়ী খেতে তোমার বাড়ী আসবে না। জানোই তো নীলিমেশের এ দেশের খাওয়া মোটেই শরীরে সয়না, এবারে ওরা দুজনে এলে গ্রেটইষ্টার্ন থেকে বাবুর্চী আনতে হবে”। সেদিন নিভাননী সবিতার বিলাত থেকে সম্প্রতি যে চিঠিখানা এসেছিল, সেটা আর একবার পড়ছিলেন—“মা, বিলেত আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এ দেশের মেয়েদের কাছে আমাদের শেখবার জানবার অনেক কিছু রয়েছে। পাশ্চাত্য জীবন সম্বন্ধে অভ্যস্ত হবার চিন্তায় আমি যতটা শঙ্কিত হয়েছিলুম এখন দেখছি ততটা কিছু না। বম্বেতে আমার জন্তে যে গভর্ণেস রাখা হয়েছিল, সে আমাদের নাহেবী চাল চলনে একেবারে অভ্যস্ত করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে বন্ড ডান্সে আমি একটু পরিশ্রান্ত অনুভব করি। ভূমি আমার চুল দেখে কিন্তু একটুও রাগ করতে পারবে না,—একদিন চুল না বাঁধলে কী বকুনি না দিতে, প্রত্যেক দিন নিজে হাতে তেল মাখিয়ে দিতে,—এখন আমাকে সব চুল ববড় করে সেট করতে হয়েছে”—

“মাসীমা” এই সময় আইভি ঘরে এসে বললো—“কী তেল মাখলে চুল কালো হয় বলতে পারেন,—রমেন বলেছে, রূপে গুণে আমাদের বাঙ্গালী মেয়ের মত হতে হবে”।

নিভাননী হাতের মুঠির মধ্যে চিঠিটা ভাঁজ করে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে এক বোতল লক্ষ্মীবিলাস তেল আইভির হাতে দিয়ে বললেন,—“এই তেলটা মেথো,—চুল যেমন মসৃণ, তেমনি মিশমিশে কালো হবে”—

“আপনারটা কেন দিচ্ছেন মাসীমা,—নামটা লিখে নি, আমি আনিবো নেব”।

বৃকের মধ্যে আবার অব্যক্ত নিশ্বাসটা ভারী হয়ে এল নিভাননীর, তবুও একটু কৃত্রিম হেসে বললেন—“ও আর আমি কী করব মা? সবিতা এসে তো আর মাখবেনা।”

“সবিতা কবে আসবে? খবর পেয়েছেন মাসীমা”? উৎসাহের উচ্চাসে আইভির চোখের পাতা ঘন ওঠা নামা করতে লাগলো। “টেলিগ্রাম আছে মা”—ভৃত্য এসে জানালো।

“পড়তো আইভি কার টেলিগ্রাম”—

মুহুর্তে হলুদ বর্ণের কাগজ খানায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে স্মিত উজ্জল হেসে আইভি বললো—“সবিতা আর মিঃ বাগ্‌টী, কাল দুপুরে ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারলাইন্স করপোরেশনে কোলকাতা আসছে”—

* * *

দিন দুএকের জন্তে সবিতা পিতৃভালয়ে এসেছে। জননী কন্ঠার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। এক চোখের দৃষ্টিতে তাঁর সুখের গরিমা, আর এক চোখের তটে ব্যথার উৎস আবর্তিত। সবিতা যেন ইন্দ্রাণীর বেশে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, সাগর পারের মেয়ের ও নিখুঁত অহঙ্কৃতি। আহা কী সুন্দর দেখতে হয়েছে ওকে, সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকুক। কিন্তু নিভাননী আর নীরোদবরণের রক্তের স্বাক্ষর যে নিশ্চিহ্নে মুছে গেছে সবিতার প্রাণের প্রবাহে। একুশ বছরের জীবন রাগিনীটা ওর মনের স্পন্দনে থেমে গেছে নিঃশব্দে। কন্ঠার প্রতি আদেশ নয়, একটু অহনয় জানিয়ে নিভাননী বললেন—“কতদিন পর এলি সবিতা,—আর কয়টা দিন থেকে যা—”

জননীর মিনতিকরণ চোখের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর

সবিতা আশ্রয় নিয়ে যায় নিবাক ঠোঁটের ফাঁকে ওর ভায়ার উৎস যেন হারিয়ে যায়।

মা আবার বললেন আশা কম্পিত কণ্ঠে—“নীলিমেশকে আমি বলেছিলুম, সে বললো—সবিতা যদি থাকে তাকে রেখে দিন।” হঠাৎ যেন বাঁধ ভাঙা বজ্রা সবিতার ঠোঁটে উৎসারিত হয়ে উঠলো। ও জিজ্ঞেস করলো—“মা, ঘেয়েদের সত্যিকারের পূর্ণতা কোথায়? আমার একুশ বছরের ফেঁলে আসা জীবনঅধ্যায়ের পরিত্যক্ত পৃষ্ঠাতে না বর্তমানের চলমান পরিচ্ছদের ছত্রে ছত্রেই সীমাবদ্ধ?” গৌরব উজ্জল মুখে জননী বললেন—“জানিসনে আমাদের মজু কী বলেছেন—

“পিতা রক্ষতি কোঁমারে ভর্তা রক্ষতি বোঁবনে।

রক্ষতি স্ববিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যবর্তি ॥

উষ্ণ নিশ্বাসে চঞ্চল অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে সবিতা বললো—“মজুর দিন অতিক্রম করবার দিন কী এখনও আসেনি? আমি বলছি, আমি সবিতা ছাড়া আর কেউ নেই,—আমার নিজের সত্তার স্বীকৃতি আমার স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা কোথায়?”

নিভাননী নিরুত্তর। আয়ুতে তাঁর ভারতীয় প্রাচীন আদর্শের প্রতি গভীর অন্ধাধা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। দৃষ্টিতে বলসে উঠলো ক্ষুদ্র চেতনার মানসিক প্রতিক্রিয়া, সবিতার ঠোঁটের ফাঁকে সাদা মূক্তোর মত বকবক গজদন্তটার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন—“সবিতার লালরঙের মাড়ীর মধ্যে থেকে ওই দাঁতটা কী উপড়ে ফেলা যায় না—”

না, গজদন্তের উজ্জল প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করবার নয় যে, নিভাননী আর একবার গজদন্তের প্রতিশ্রুতিটা মর্মান্তিক আশ্বাদনে অমুভব করলেন। গ্রেট ইষ্টার্নের বাবুচি নীলিমেশ ও সবিতার জন্ত ডাকরোষ্ট, ডেভিল, ফাউল কারী প্রভৃতি প্রস্তুত করেছিল। ওঁর নিভাননী সবিতাকে একবার বললেন—“সবিতা তোমার জন্যে আমি কই মাছের পাতুরী ইলিশের ঝুরো চচ্চড়ী করেছিলুম, খেয়ে দেখবে না—?”

সবিতার মুখটা মুহূর্তে বিবর্ণ হ্রাস হয়ে গেল, নিশ্চিন্ত গলায় বললো, “তুমি যখন রেঁখেছ আমি একটু খাব বইকি

মা। তবে কী জানো? উনি বিশেষ করে বলেছেন—ভাত, ডাল, চচ্চড়ী, ঝোল আমি যেন না খাই, এসব খাদ্যে কোনও পুষ্টি নেই, উপরন্তু হজমের বিঘ্ন করে, আর মেদ বৃদ্ধি করে।—একটু খেমে সবিতা আবার বললো, “তাই না তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলুম,—আমাদের মেয়েদের স্বাতন্ত্র্যের সত্তাবোধ কোথায়?”

সত্তাবোধ হয়তো বা তাদের কোনও এক আদি যুগের নিকরধ্বংস আর শাস্তিমধুর গৃহ প্রাক্কণের পক্ষপুটে সীমাবদ্ধ; হয়তো বা কোনও অনাগত কালের বিপ্লবী অধিনায়িকার বিক্ষুব্ধ বৃকের স্পন্দনে মর্ম্মরিত।

দেখতে দেখতে সবিতার ফেরবার সময় আসন্ন হ’য়ে এল। বসে মেলের এয়ার কন্ডিশন গাড়ীতে ছুপানা গাঁট রিজার্ভ করা হয়েছে।

তখন নীরোদ বরণ আর নিভাননী মেয়ে জামাইকে ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। ফিকে সবুজ রঙের কাঁচে সর্বাঙ্গীণ আবরিত সবিতা আর নীলিমেশের আভিজাত্যে পরিপাটী মুহূর্তোক্ষ কামরা। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশ, মাছের কোলাহল থেকে মুক্ত বিচ্ছিন্ন, একটু উত্তাপ নেই, কোলাহল নেই। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়তে কতটুকু বিদায় আশীর্বাদ জানিয়ে অঁচলে ভিজ়ে চোখ মুছে নিভাননী কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। অশ্রুসজ্জল চোখে সবিতা ফিকে সবুজ জামার কাঁচের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লে গাড়ী পা পা করে চলতে শুরু করলো। অবরুদ্ধ কণ্ঠে নিভাননী কী যেন বলতে ঠোঁট ছুঁটা ফাঁক করলেন। নীরোদবরণ বললেন—“কাঁচে ঢাকা গাড়ী কিছু শুনতে পাবে না—”

আক্ষেপ প্রকাশ করে নিভাননী বললেন—“সবিতা কতদূরে চলে গেল, আমি ভৌগলিক দূরের কথা বলছি না—আমাদের মন থেকে কত দূরে সে সরে গেল।”

বসে মেল দূর হতে দূরান্তরে ছুটে লাগলো, লাইনের একটা পাথর টুকরো হ’য়ে ভেঙ্গে দূরে ছিটকে গেল। নিভাননী প্রত্যক্ষ অমুভব করলেন সবিতার গজদন্তটা টুকরো হয়ে ভাঙছে।

“ফেরিওয়ালা”

শ্রীকল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

কিছু দিন আগে একটি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; এখনও মাঝে মাঝে তার কথা আমার মনে হয়, তার আশ্চর্য্য সৎচরিত্রের কথা আজও মনে করি। সে দিনের ব্যাপারটি ঘটেছিল চৌরঙ্গীতে। ফারপো হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম অনেকগুলি ম্যাগাজিন বিক্রী হচ্ছে; এগিয়ে গেলাম,—হাতে নিয়ে দেখছি এমন সময় একজন ফেরিওয়ালা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার হুড়িতে ছিল কয়েকটা কাপড়ের পুতুল। ওই পুতুলগুলির মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। নানা দেশের মানুষ, নানা রকমের পোশাক পরা,—তাদের মুখের ভাবটি চমৎকার ছুটিয়েছে। যাই হোক একটা চীনে পুতুল তার মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিলাম। বেশ ভাল লাগল, পুতুলটি কিনে নিলাম; তখন ফেরিওয়ালা আমাকে বললে—“আমার অবস্থা খুব খারাপ মা, যদি দয়া করে আরো কয়েকটি কিনে নেন তাহলে বড় উপকার হয়। এগুলি বিক্রী করে যা পাই তাই দিয়েই আমার সংসার চলে। এর মধ্যে থেকেই আরও একটি বুদ্ধাকে আমার অর্জেক পয়সা দিতে হয়, কারণ সে অক্ষম, আমার সঙ্গে বসে পুতুল করে দেয়। বিক্রী করে যা পয়সা পাই হুজনে ভাগ করে নি।”

তার কথা শুনে ভাবলাম আমাদের দেশে এরূপ ভিক্ষা

চাওয়া ত আগে দেখিনি। নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে পয়সা চাওয়াতে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হলো। পছন্দমত কয়েকটি পুতুল নিয়ে একথানা দশ টাকার নোট তার হাতে দিলাম। গাড়ীতে উঠে পড়লাম,—ষ্টার্ট দিল। হঠাৎ সেই লোকটা ছুটে এসে আমার গাড়ী থামাতে বললে। জিজ্ঞেস করলাম, “ব্যাপার কি? কি হলো?” সেই ফেরিওয়ালা আমার হাতে দুটি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে জানালো তার পুতুলের দাম থেকে দু টাকা আমি বেশী দিয়েছি, সেই জন্যই সে ফিরিয়ে দিতে এসেছে। আমি তাকে বললাম, “এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, তোমাকেই দিয়েছি।” কিন্তু সে নিলো না, পরিশ্রমের অধিক সে নিতে চায় না বললাম। মন আমার খুসিতে ভরে উঠলো। ভাবলাম তবে আমার দেশের মধ্যেও সত্যিকায়ের মানুষ মেলে! চেয়ে রইলাম সেই শীর্ণদেহ মলিন কাপড়পরা মহৎ মানুষটির পানে। মনে হোল এই মানুষটির আদর্শই দেশের সকল মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়তা করুক। এইরূপ উচ্চ আদর্শ নিয়েই তারা সর্ব কাৰ্য্যে প্রবিষ্ট হোক। মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখুক। সত্যের পূর্ণালোকে নবীন যাত্রীদের জীবন পথ আলোকিত হোক এই কামনা করি।

কবিপ্রণাম

শ্রীপিনাকী রঞ্জন কর্মকার;

কাল-বৈশাখী এনেছিল বাহি' বাণী শতদল হ'তে

উজল বরণ ছেলে

রেখে গিয়েছিল সেই ছেলেটিরে বড় শ্রদ্ধার সাথে,

বাঙলা মায়ের কোলে।

ধরণী সেদিন অরুণ কিরণ রক্ত বরণ রাগে

আঁকিল মোহন ছবি

জলে আর থলে বালো মলো ফলি সূর্যের আলো লাগে

নাম হলো তাই রবি।

সারা পৃথিবীরে ভালোবেসে রবি আশীটি বছর পরে

তিরোহিত হ'লে যবে

সভ্য জগৎ স্বজন-বিয়োগ-ব্যথায় কাতর স্বরে

কঁদেছিল হাহা রবে।

এই পৃথিবীর পুণ্য দিবসে আমাদের কবি রবি

এসেছিল ধরা ধাম

স্মৃতি জাগে তার অমর গাথায় আঁকা-উজল ছবি

জানাই তাঁরে প্রণাম !!

তৃতীয় শ্রেণী

শ্রীআরতি দত্ত

বেলা তখন প্রায় বারোটা হবে, খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলছে, আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তৃতীয় শ্রেণীর এই কামরাটিতে সাময়িক ভাবে একটা শুদ্ধতা এসেছে; বসে বসে একটানা গাড়ীর চাকার বাক্ বাক্ শব্দ শুনছি আর শুনছি পাশের বিপুলকায় হিন্দুস্থানী ভক্তগোষ্ঠের ক্রমবর্ধমান নাসিকা গর্জন। খানিক আগে মস্ত পেতলের খালায় চাপাটি ডাল সহযোগে তিনি তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করেছেন।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছে। অলস মধ্যাহ্নে ঘরের কাজের চাপ বুঝি কমে এসেছে—তাই কৃষক বধু আঙিনার ধারে দাঁড়িয়ে রেল দেখছে, বসে বসে ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, মাঝে মাঝে কানে আসছে রেল লাইনের ধারে ক্রীড়ারত শিশুকণ্ঠের কগরব।

“চল্লিশ জন বসিবেক” লেখা নোটিশটি সামনের দেওয়ালে ঝুলছে একপাশে। কিন্তু ভেতরের দৃশ্য আদেশটির সম্পূর্ণ বিরোধিতায় সাক্ষ্য দিচ্ছে; কারণ দেখছি অন্ততঃ পক্ষে আশি জন লোক কামরার মধ্যে রয়েছে। তার উপর যত না মায়া তার চেয়ে বেশী লটবহর। এদের দেখলে মনে হয় যেন তাদের পাখিব সব সম্পত্তি নিয়ে তারা পথে বেরিয়েছে। ভিড়ের ঠেলায় নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে, তবে সবাই আশান্ত ভাবে বলাবলি করছে যে সামনের ঠেশনে কিছু লোক নেমে গেলে ভিড় কমবে।

আন্তে আন্তে গাড়ীর গতি কমে একটি ছোট ঠেশনে এসে থামলো। চানচুরওয়ালার ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল; ঠাণ্ডা জল, চা ও পুরীওয়ালার খোঁজ চলতে লাগলো যাত্রীদের মধ্যে। আমাদের কামরার অবস্থার কিন্তু কোনই উন্নতি হল না। গাড়ী থামতেই আরও বহুলোক মালপত্র নিয়ে দরজার নামনে ভিড় করে এলো। ফলে যারা এখানে নামতে চায় তাদের সঙ্গে খুব ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেলো। খানিকক্ষণের জন্ত চারিদিক ‘গাড়ী এসেছে,’ ‘ঠেলবেন না’ আমিও টিকিট কিনেছি পরসী দিয়ে “গাড়ী তোমার বাপের সম্পত্তি নয়” ইত্যাদি কথা ও চীৎকারে ভরে

উঠলো। গাড়ী যখন চলতে শুরু করেছে তখন দেখা গেলো যে, কামরাতে লোক কমার চেয়ে বেড়েই গেছে। উপরন্তু কয়েকজন অপর গাড়ীর পাদানিতে দাঁড়িয়ে চলেছে।

ভেতরে এখন বেশ সাড়া পড়ে গেছে, কারুরি চোখে আর ঘুমের আবেজ নেই। একদিকে খুব সোর গোল করে তাস খেলাও শুরু হয়ে গেল, এক মাঝবয়সী গেকরা পরা ব্যক্তি কয়েকটি শিয়্যা নিয়ে চলেছে বলে মনে হলো; শিয়্যাদের সবাই ছেঁড়া কাপড় পরা দীন-বেশ। তারা এবারে ভজন গান শুরু করলে, বোধহয় তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে বেকির জায়গায় অধিকার নিয়ে গরম কথার আদান প্রদান চলতে লাগলো। কিন্তু বেশিক্ষণ এ ভাব রইলো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব বগড়া গোলমাল থেমে গিয়ে যাত্রীদের মধ্যে এমনভাবে কথা শুরু হলো যেন তারা একজন আরেক জনকে কতদিন ধরে চেনে। আমার পাশেই বসেছে—বিরটিকায় মাঝবয়সী গিরিধারীলাল। কোলকাতায় সে পুলিশে কাজ করে। লোকটি বেশ হাসিখুশি, ফুর্তিবার ও খুব কথা বলে। পুলিশে অনেকদিন ধরে ভালভাবে কাজ করার জন্তে সে মনে মনে বেশ গর্বিত; খানিকক্ষণের মধ্যেই যে তার কর্মজীবনের স্মৃতি কথা আমাকে বলতে আরম্ভ করে দিল, তার স্মৃতি কথা এতই দীর্ঘ হয়ে পড়তে লাগলো সে আমার ভয় হতে লাগলো হয়তো মহাত্মার মত তার পুরো জীবনীই আমাকে শুনতে হবে। সঙ্গে তার স্ত্রী ও ছোট ছেলে রয়েছে। স্ত্রীটি খুব লজ্জাশীলা, মাথায় তার দীর্ঘ ঘোমটাটানা। একটানা সুরে সে কাঁদছে ও মাঝেমাঝে তার কান্নার স্বর বেড়ে উঠছে। যাই হোক তার কান্নাই সম্প্রতি গিরিধারীলালের জীবনী প্রসঙ্গ থেকে আমাকে উদ্ধার করলো। সে কেন কাঁদছে জিজ্ঞাস্য করতে গিরিধারী বললে যে তার স্ত্রী এই প্রথম তার বাবা মাকে ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে কোলকাতায় ঘর করতে চলেছে। “কিন্তু তাতে এত কাঁদবার কি আছে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম। গিরিধারী

লজ্জিত ভাবে চুপ করে রইলো। কিন্তু দামনের বেঞ্চের বুদ্ধ ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে আমাকেই উল্টো প্রশ্ন করলেন, “সে কি মশাই, মেয়েমানুষ খণ্ডরবাড়ী যেতে কীদবে না! আমি এবারে একটু অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেলাম।

আমাদের ট্রেন এবার একটা বড় ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। এখানে টিকিট কলেকটর উঠলো ও খানিকক্ষণের মধ্যে তার সঙ্গে ভজন গায়কের খুব বচসা শুরু হয়ে গেলো। ব্যাপার অবশ্য বিশেষ কিছু নয়, টিকেটবিহীন যাত্রী তারা, অতএব শিষ্যদের নিয়ে ভজনগায়ককে নেমে যেতে হলো। খানিকক্ষণ এই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে নানা অভিমত প্রকাশ ও তর্কবিতর্ক চললো, তবে অনেকেই বললো যে গরীব তীর্থযাত্রীদের এভাবে নামিয়ে দেওয়াটা রেল কোম্পানীর উচিত নয়।

আমার ডানপাশের বেঞ্চখানার অনেকখানি অধিকার করে বসেছে বর্দ্ধমানের তিন ভদ্রলোক, দিল্লীতে তাদের একটা মিষ্টির দোকান আছে। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে তারা গ্রামে ফিরে চলেছে। তারা সমানেই কথা বলে চলেছে, একের পরে এক। ও অনেক সময় আমাকে নীরব শ্রোতা হতে হচ্ছে। তাদের মতে তাদের গ্রামের মত এমন ভাল গ্রাম আর কোথাও নেই। তারা তিনজনেই একমত যে আগেকার দিনই ভাল ছিল, জিনিষ ছিল সস্তা, তাই তাদের পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘজীবী শতজীবী ছিলেন। আজকালকার বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কিছু নতুন জিনিষের হয়তো আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু মানুষের মনে স্থখ নেই। এখন না হয় পণ্ডিত নেহরু ‘হাওয়া জাহাজে’রোরেন তা সেকালেও রামচন্দ্রের পুষ্পক রথ ছিল, তাই তাদের মতে বৈদিক যুগের ধারায় জীবন যাত্রা বদলালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ওদিকে ট্রেনের ভোরের উপর বসে একটি ধর্মকায় অল্পবয়সী ভদ্রলোক এতক্ষণ খবরের কাগজে চোখ রাখার চেষ্টা করছিলেন, এবার তিনিও আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন ও অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর জীবনের অনেক খবর আমাদের জানা হয়ে গেলো।

লোকটি ভাগ্যবান, কারণ অর্শশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পাশ করার পরেই মফঃস্বলের এক কলেজে তিনি অধ্যাপকের কাজ পেয়ে গেছেন। এখন তিন বছর কাজ করার পর—মাগি ভাতা নিয়ে তাঁর মাইনে হয়েছে দেড়শো টাকা। পরিবার

অবশ্য তাঁর ছোট। বাপ আছেন, গ্রামের এক শিক্ষালয়ে তিনি প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। এখন অবশ্য অবসর নিয়েছেন আর আছেন মা ও দুই বোন। এখন দিল্লীতে একটা সরকারী কাজ পাবার জন্ত দেখা করতে যাবার আগে তিনি কোলকাতায় চলেছেন। ভদ্রলোক তারপরে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। চাকুরীর জন্ত দেখা করতে যেতে কি পরা দরকার, হ্যাট না ধুতি? আমি কি সংবাদ পত্রে কাজ করি না উপহাস লিপি? এই রকম নানা কথার পর ক্লান্ত হয়ে ভদ্রলোক আবার কাগজে মন দিলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য, পাকাচুল ভরা মাথা ভদ্রলোকটি ওপরের বেঞ্চে বসে একমনে আমাদের কথা শুনছিলেন; আগের ভদ্রলোকটি চুপ করতেই ইনি তাঁর নিজের জীবনের নানা কথা বলতে শুরু করলেন ও বিবিধ প্রশ্নে আমাকে বিশেষাৱা করে দিলেন। ভদ্রলোকটির বাড়ী পূর্ববঙ্গে, জামাই দিল্লীতে সরকারী দপ্তরের কেরাণী। মেয়েকে দেখতে তাই তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন। জামাই তাঁর তেমন সুবিধার নয়, বেশী সিগারেট খায় আর বড় বেহিসাবী। তারপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, “কোথায় যাবে? তোমার নাম কি? দেশ কোথায়? বাবার নাম কি? কোলকাতায় কি করা হয়, কত মাইনা পাও” ইত্যাদি।

ভদ্রলোক নিজে ঢাকায় এক জমিদারী সেরেস্ভায় কাজ করেন, মাইনা পান ২৫ টাকা আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাষ্টারি করে ১৫ টাকা। কিছু জমি জমাও অবশ্য তাঁর আছে। রাজনৈতিক আলোচনা অর্থাৎ পাকিস্তান, হিন্দু-স্থানের বিষয় শুরু হতেই ভদ্রলোক ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও তাঁর ইতঃস্ততঃ হাত ছোঁড়ার ফলে হাতের কাছের কাগজের বাঙালটা কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেলো। হাওড়া যত কাছে আসতে লাগলো মালপত্রের জন্ত ভদ্রলোকের ভাবনাও তত বাড়তে লাগলো। রেলের মাল-পত্রের গাড়ীতে চোর চোকা সম্ভব কিনা এবং যদি চোরের কিছু চুরি করে নেয় তাহলে রেল কোম্পানী তারজন্ত ক্ষতি পূরণ করবে কিনা? তাঁর দূর সম্পর্কীয় ভায়ের জ্যৈষ্ঠ আত্মীয়ের একবার একটা বাক্সো হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেটা পরে আর পাওয়া যায়নি। ভদ্রলোক ভয়ানকভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

হয়ে পড়লেন, যেন তাঁর জিনিষ ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছে ও আর কখনও তা তিনি চোখে দেখতে পাবেন না এমনি ভাব তাঁর মূখে। আমার কোন আশ্বাস বাক্যই তাঁর দৃষ্টিচ্যুত কমাতে পারলো না। যতক্ষণ না স্টেশনের প্র্যাটফরমে তাঁর রং চটা টিনের বাক্সোটা তিনি দেখতে পেলেন—ততক্ষণ তাঁর ভাবনা গেলোনা।

হাওড়ায় সোরগোল করে সবাই নামতে শুরু করলো। আশে পাশের যাত্রীদের কাছে বিদায় নিলাম। আমাদের আত্মীয় বন্ধুরা নিতে এসেছেন তাঁদের নানা রকম সম্ভাষণ শোনা যেতে লাগলো।

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েক ঘণ্টার ছোট পৃথিবীটা মহানগরীর বিরাটস্থের মাঝে মিলিয়ে গেলো।

“বই পড়া”

শ্রীশীলা চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক অল্ডাস হাক্সলে অনেক সময় প্রেমপূর্ণ ভাবে বলেন যে বই পড়াটা একটা স্বার্থপর বিলাসিতা; বৈচে থেকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার এই যে অবস্থা তাকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। পরলোকের শান্তি ও বিস্মরণ জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় একমাত্র বই এর ভেতর দিয়ে।

অনেক লোকের গল্প শুভব করা বা তাস খেলার চেয়ে বই পড়তে বেশী ভাল লাগে। কিন্তু মিশুক লোকেদের এই বই-এর পোকারের দেখলে ভারি আশ্চর্য লাগে। তারা যেন জগৎ থেকে সম্পর্ক ছাড়া, তৈরি করে নিয়েছে স্বতন্ত্র একটা পৃথিবী নিজেকে আর পা তা ভর্তি ছাপার অক্ষর দিয়ে। নিতান্ত নিঃসঙ্গ, একা, কি বিশ্রী! বাস্তবিক কিন্তু অত সমবেদনা জানাবার কিছু এতে নেই। আমরা জানি যে পড়ুয়ারা দিব্যি মনের আনন্দেই থাকে এবং বোধ হয় অল্প-রকমভাবে অবসর কাটানোর চেয়ে বইয়ের সাহায্য নিলে তারা বেশী তাড়াতাড়ি সংসারের অভাব ঝামেলা ঝঙ্কাট ভুলে একটু জিরিয়ে নিতে পারে।

পরিশ্রমের সঙ্গে অবসর আছে পাশাপাশি। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না পেলে পরিশ্রমের শক্তি থাকে না। বই পড়া যদি বিশ্রামের মত নিছক অবসর কাটানোও হয় তা হলেই যে সেটা আলস্য হবে তা নয়। তবে শুধু বই পড়েই ত’ সংসার চলে না। আরও অনেক রকম কাজের মাঝে হু দণ্ড

এইভাবে জিরিয়ে নেওয়াটা বিলাসিতা নয়, এটাকে প্রয়োজনের পর্যায়ে বরণ ধরা যায়। এই অবসর বিনোদনে যদি শুধু আনন্দের ও বিশ্রামের সঙ্গে কিছু জানা শোনাও যায় তাতে কারো লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

ভালমন্দ নানারকম বই আছে। সব রকম বই পড়াটাই দোষণীয় নয়। যারা নিছক আনন্দের জন্তই অবসর সময়ে দু একখানা হালকা বই পড়েন তাঁরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে মাঝে মাঝে এক আধটা উঁচু দরের বই পড়ে অনেক প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞানগর্ভ জিনিষ জানতে পারেন। দস্য মোহনের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর পর মাহেজোদাগোর ইতিহাস মন্দ লাগবে না। আধুনিক প্রেমের “চাঁদ ও চকোর” ভরা গল্পের পর ভালই লাগবে কালিদাসের শকুন্তলা। পুরাকালের কথা জানতে মজা লাগবে। সমাজের অতীত ও বর্তমানের তুলনা করতে পারবেন। খাবার সময়ে যেমন আমরা অনবরত মিষ্টি বা চাটনি খেতে পারি না, তেমনি নিছক সাময়িক আনন্দ দেবার জন্তে তৈরি লেখা দিনরাত পড়লে অরুচি ধরে যায়। তার সঙ্গে পুরোনো বা আধুনিক নামকরা লোকের লেখা পড়লে ভাল লাগে এবং চিন্তাশীল লোকের লেখা নিজেরও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে।

মাহুষের শরীর নিয়েই ত’ সব কারবার নয়, তার মনের জন্তেও খোরাক লাগে। মাহুষের বৈশিষ্ট্য ত’ ওইখানেই। প্রতি মাহুষের নিজের মনের প্রতি খানিকটা কর্তব্য আছে।

সংসারে থেকে ছেলেপিলে স্বামী আর পাঁচজনের স্বর্থ স্ববিধে দেখাতেই এদেশে মেয়েরা মন প্রাণ ঢেলে দেন। তাঁরা সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে, নিজের কথা ভাবাটাও লজ্জাকর স্বার্থপরতা বলে মনে করেন। কিন্তু সত্যি তা নয়। সংসারের চাকা ঘোরে থাকে কেন্দ্র করে, তাঁর নিজের মানসিক উন্নতি হলে তাঁর পারিপার্শ্বিক সবারও উন্নতি হবে। নিজেকে শিক্ষিত করা স্বার্থপরতা নয়। ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের হাসি দেখে হাসতে শেখে, মায়ের কথা শুনে কথা কহতে শেখে। মায়ের জ্ঞানপিপাসা দেখলে মায়ের শিক্ষায় অল্পপ্রাণিত হলে তারাও বড় হবে।

এদেশে বই কেনাটা বাজে খরচা মনে করেন অনেকে। খরচ কমানো আজকালকার দিনে সবারই দরকার। বই একবার কিনতে আরম্ভ করলে এটা একটা নেশা হয়ে দাঁড়ায়। তবু বই কেনাটা সবদিক দিয়ে অমিতব্যয়িতার পর্য্যায় পড়ে কিনা বলা যায় না। তবে ওই পর্যাটো বাঁচালে এদেশের গৃহিণী মাত্রেই মনে সন্তোষ জন্মাবে নিঃসন্দেহ। আজকাল সহর অঞ্চলে এমন কি অনেক গ্রামেও সাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের কোনও অভাব নেই। মাসিক সামান্য টাঙ্গা দিয়ে গ্রন্থ হাতে পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। এবং বই লেখাই যাদের জীবিকা তাঁদের আয়ের বিষয়ও ভাবা দরকার।

উচ্চ শিক্ষিতাদের বই পড়ার প্রয়োজন সব মিতে গেছে বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা হল কেবল জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করবার পর বিদ্যার মহাসমুদ্রের আভাষ মেলে মাত্র। প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় তারপর থেকে—যখন সত্যিকার জ্ঞানের অল্পসন্ধান মানুষকে প্রেরণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে নাম করার জন্য পড়া নয়।

মানুষ যতদিন নতুন কিছু শিখতে বা জানতে পারে সে

সত্যিকার বঁচে থাকে ততদিনই। নূতনত্বের বা অভিনবত্বের সন্ধানে যাবার সময়, অন্বেষণ বা স্ববিধা ক'জনেরই বা থাকে? ঘরে বসে বই থেকেই সবচেয়ে স্বল্প আয়াসে নূতনত্বের ও ও সজীব জ্ঞানের খোরাক পাওয়া যায়।

বইকে যিনি সঙ্গী ক'রতে পেরেছেন তাঁকে কোনও দিনও সম্পূর্ণ একলা হতে হবে না। ছেলে মেয়ের বিয়ে থা হয়ে যাবার পর এক প্রৌঢ়াকে দেখেছি পরম উৎসাহের সঙ্গে উপনিষৎ পড়তে। তিনি নিজে সংস্কৃত জ্ঞানভেন না, তাঁর এক প্রতিবেশী ছেলের কাছে তার সময় হলে সংস্কৃত থেকে বাঙলা করে শুনতেন। বৃদ্ধ বয়সে নিজে শিখে সংস্কৃত বা ইংরাজি পড়ার দৃষ্টান্তও আছে।

একজনকে দেখেছি বৃদ্ধ বয়সে ইংরেজীতে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতা পড়তে মানের বই দেখে, একটি একটি করে কথা বুঝে। এই পরিশ্রমে কোনও বিরক্তি প্রকাশ পায়নি তাঁর মুখে। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। সংসারের কাজের ভার বয়সের সঙ্গে তাঁর হালকা হয়ে এসেছে, শরীরে শক্তি নেই। এই সময়ে নানান বিরক্তি আসে বেশী অবসর থাকে বলে। ছোটখাটো সংসারের খুঁটিনাটিতে মনে হয় সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি নূতনত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন পড়ার ভেতর, তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে জীবনে তাঁর কোনও তিস্ততা আসেনি।

বাড়াবাড়ি কোনও কিছুই বিষয়েই যেমন ভাল নয় তেমনই সব সময় শুধুমাত্র বই নিয়ে থাকাও ভাল নয়। তবে এটা যে নিছক বাজে সময় কাটানো তা নয় বোধ হয়। ভাল বই পড়লে মনের খোরাক জমতে থাকে। পরবর্তীকালের জন্য। একটা কি দুটো বইএ নয়, অনেক ভালো বই পড়তে পড়তে তৈরি হয় শিক্ষা ও জ্ঞানের একটা ভিত্তি। সেটা ধীরে ধীরেই হয়, পলিমাটি জমে জমে নদীতে চর ওঠার মত। এই ভিত্তির ওপর জন্মায় পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সেই দুস্তাপ্য বহু কষ্টে রোপন করা বীজ—ফল।

ভোরের স্বপন

শ্রীপুষ্প দেবী

ইলার ঘুম ভাঙলো পাশের বাঁড়ুল্লো গিন্নির ভাষণ গলার আওয়াজে। ভোরের আধভাঙ্গা স্বপ্নের মধ্যে কল্পনা তার স্বদূরের প্রিয়তমকে কাছে এনে দেওয়ার যে অসম্ভব সম্ভব করেছিল মুহূর্তে তা ভেঙ্গে গেলো। খড়মড়িয়ে উঠে বসে একরাশ চুলের ঢাল হাতে জড়াতে জড়াতে ভয়চকিত মুখে সে দোতলায় নেমে আসে। তাকে দেখে ভবতারিণী অপ্রসন্ন মুখে বলেন, ‘কিগো ঘুম ভাঙলো? তা বাসি কাপড়ে বাসি মুখে আর কি কাজটা করবে শুনি?’ অপ্রস্তুত হয়ে ইলা ফের ওপরে উঠে যায়।

বাড়ীতে লোক অনেক, অথচ সে অনুপাতে মানের ঘর খুবই কম। এখন মেজদির পালা। বিধবা নিঃসন্তান মহিলা অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত, কাজেই বাথরুম পাবার আশা এখন ছরাশা, তবুও ইলা একবার কড়া নাড়ে। তীব্র কঠে উত্তর আসে, ‘বাপরে বাপ, সন্দেশ নয়, রসগোল্লা নয়, কলের জল, তাওকি চাই পাবার যো আছে? হুড়ো জেলে দাঁও সংসারের মুখে, অমন সংসার উজ্জ্বল যাক।’ অবিশ্রান্ত শাপ শাপান্ত চলতে থাকে। ইলা অপ্রস্তুত হয়ে ভাবে—বাবা, মেজদির কি গলা? কলের তোড়কেও হার মানিয়েছে।

সেজজার ছেলে নটু চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে আসে। ইলাকে দেখে মুখ ফুলিয়ে বলে, মনে আছে কাকীমা, আজ কিন্তু মাছের ডিম আমার। তুমি কেবল দাদাকেই ভালোবাস, কাল বলেছিলে—কালকে দোব। আজ মাছের ডিম না থাকলে অনর্থ ঘটাবার আভাস পেয়েও ইলা আদর করে নটুকে কোলে টেনে নেয়। তার কৌকড়া চুলে ঘেরা পদ্মফুলের মত মুখখানায় চুমো খেয়ে বলে, ‘কিন্তু নটুবাবু, আজকে বেস্পতিবার, আজতো মাছের ডিম খেতে নেই।’ নটু সহস্র বিধিনিষেধের মধ্যে মাছ খে, তাই সঙ্গে সঙ্গে বিজোহী ভাব দমন করে নিয়ে বলে, শুকুর বায়ে তো খেতে আছে, কালকে?’ নিরাপদ উত্তর পাবার আগেই

নীচে থেকে হরপ্রসাদ বাবুর ডাক আসে, নবৌমা! নটুর হাত থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে ইলা নীচে নেমে যায়। ‘হরি বল মন, হরি বল মন,’ বলে হরপ্রসাদ বাবু বলেন, ‘কালকে কে তরকারি কুটেছে? সবাই জানে যত্নের দিনে লাউ খেতে নেই—অনাচার করে কি এমন স্বর্গলাভ হবে যে তা না করেই চলছিল না? এইজন্তে গিন্নিকে বারবার বারণ করেছিলুম ওসব পাশ করা মেয়ে এনো না। তখন তো সে কথা গ্রাহ্য হল না। টকটকে রং দেখে ভুলে গেলো। এখন সব গুটি গুজু যত্নে লাউ খেয়ে মর।’ এখন সায়েবরা পর্যন্ত মানছে যে এক একতিথিতে এক একটা তরকারিতে দোষ হয়, কই এবার বলুক না?’ কথাগুলি সামনে উপস্থিত নাপিতকে উদ্দেশ্য করে বলেন। নাপিত পরম সন্তোষে ঘাড় নাড়ে ও বলে, ‘তাতো নিশ্চয়ই বাবু, ওসব সাহেব স্নেহের কথা ছেড়ে তান। ওঁরা হলেন সাক্ষ্যং ছাবতা।’ এবার হরপ্রসাদ বাবু চটে ওঠেন, বলেন, ‘দূর ব্যাটা মুখ্য, ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে এল। চাকরকে বলেন কিহে নবাব আজ বাজার টাজার যেতে হবে না?’

ইলা এই সুযোগে আবার ওপরে যায়। গিয়ে দেখে কলতলা এর মধ্যে বেদখল হয়েছে। জ্যাঠাইমা তেলের বাটি গামছা রেখে নিজের দখলি সব সাবাস্ত্য করেছেন। কোন রকমে জ্যাঠাইমাকে বারন্দায় তেল মাখতে রাজী করিয়ে ইলা কলঘরে ঢোকে। কলতলার মাথা পেতে মনে হয় চুলখোলা হয়নি, চোখ দুটি অকারণে জলে ভরে আসে। কার ওপর অভিমানে কে জানে? হয়তো বা মায়ের কথা মনে পড়ে, নয়তো সেই স্বদূর প্রবাসী মাহুঘটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভোরের স্বপন আবার জেগে ওঠে। স্পষ্ট মানসের গলা,—চেয়ে দেখ আমি এসেছি। কালই রেজুন থেকে চিঠি পেয়েছে ইলা যে এখন শীঘ্রই আসার তার কোন সম্ভাবনাই নেই। জানেনা কত দীর্ঘদিন এভাবে কাটবে। হঠাৎ চমক ভাজে বিধবা পিসমাসুড়ী আর মাসমাসুড়ী

গলার আওয়াজে। দুজনেই নিরাশ্রয়, দুজনেই বিধবা, তাই আগেই ঐশ্বর্য্যময় দিনের অবতারণা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে চান। পিসীমার ভাস্করপোর বিষয়ে হাতীতে রূপোর হাওলা পরাণ হয়েছিল, সঙ্গে গিছলো সোনার তঞ্চমাজীটা পাইক বরকন্দাজের প্রেসেশান। শুনে দোভার পিচ ফেলার সঙ্গে মুচকে হেসে মাসীমা বলেন, 'তা যদি বলে ভাই, তবে বলি শোন, আমার দেওয়ার বিষয়ে সব সোনার সামাজিক করা হয়েছিল তো! তখন এখানে বিষয় সম্পত্তি সব দেনায় ডুবুডুবু, রোজ একটা করে সম্পত্তি নীলেমে উঠছে। কানায়ুগায় সেই কথা হয়তো শুনে থাকবে। একজন নতুন কুটুম অত ভারিভারি বাসন দেখে মনে করেছিল কঁাসার। শুনে আর হেঁসে বাঁচিনা।' মুখভার করে পিসীমা বলেন, 'কেজানে বাবা, দেনাকরে সোনার সামাজিক দেওয়া আবার কি ঢং!' এমন সময় হারানী বি ভিজে কাপড়ে পিসীমার খাবার জল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। তার কাপড় কোথাও শুখনো আছে কিনা নিরীক্ষণ করার জন্যে পিসীমা উঠে পড়লেন।

ওদিকে রান্নাঘরে তুমুল কোলাহল উঠেছে। মতির মা নাকি কোঁচড়ে করে হলুদ লক্ষা নিয়ে যায়। ঠাকুর বি সব ভীড় করে দাঁড়ায় বাটনার কাছে। মাছ কোটা ফেলে দুর্গা বিও এসে দাঁড়ায়, কাকে একটা কৈমাছ-নিয়ে যায়। পিসীমা মতিরমাকে আর মাসীমা দুর্গাকে বকেন। ভবতারিণী মালা হাতে এসে দাঁড়ান। 'হ্যাঁগা কি হল এখানে?' সকলে এক সঙ্গে বলে ওঠে, মতিরমা হলুদ জিরে সরাজিল। চারদিকে চেয়ে গিমি বলেন, 'ওঃ তাই বল? তা চোর নয় কে? ঠাকুর রোজ ঘোঁরের বাটি সরায় না? না হারানী ঠাকুর ঘরের ফল নেয় না? কারুর গুণের কথাই তো আমার জানতে বাকি নেই?' তারপর মতিরমাকে বলেন, মরণ আরকি? চাইলে কি পাস না, যে চুরি করে মরছিস? স্বভাব মলেও যাবে না।

ইলা শঙ্কিত বিরতভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এ সবের সঙ্গে সে যেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। কাজ করতে করতে মন তার চলে যায় কোন সুদূর দেশে, হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পাশে জারলে ওঠে, কিগো বিরহিনী, তোমার না হয় তাকে ভাবলেই চলবে, কিন্তু

আমাদের ভাত তরকারির ছাঙ্গাম নিত্য। অপ্রস্তুত হয়ে সে আরো তাড়াতাড়ি হাত চালায়। একঝুড়ি পালং শাক ভাজার জন্তে কোটা হয়েছে, এখনো বাঁধা কপি তিনটে মোচা ছ'টা কুটতে বাকি। হঠাৎ মনে পড়ে যায় 'মানস একদিন বলেছিল, হাক্কে এমন দাগ লাগালে কি করে? ইলা বলেছিল, মোচার দাগ। রাগকয়ে মানস সেদিন মোচা খায়নি। ভবতারিণীর প্রশ্নের উত্তরে গভীর মুখ করে বলেছিল, 'বড় তেতো মোচা মা!'

যায়েরা ঠাট্টা করে বলে, 'জানিস নবৌ, ঠাকুরপো আর ফিরবে না। সেখানে বাস্মিজ মেয়ে বিয়ে করে বসবাস শুরু করে দিয়েছে। বর্ষার মেয়েরা কত গুণ তুক জানে।' সারাদিনের কোলাহলের পর শোবার ঘরে ফিরে ইলা তার গোপন সামগ্রী বের করে। মানসের চিঠির তাড়া; কত দিনের কত তুচ্ছ কথা এমন করে মানস মনে রেখেছে, গভীর পুলকে ভরে ওঠে তার মন। আপন মনে বলে, কি যে সব বলে বড়দি মেজদি? জানে না তো ও কী ভীষণ ভালোবাসে আমার?

মনে পড়ে একদিন বড়দি বলেছিল, ওকি নবৌ, চুলবাঁধা নেই সাজগোজ নেই, অমন করলে ঠাকুরপো তোকে খাটে বসতে দেবে না যে। রাগ করে ইলা বলেছিল, চাইনা অমন খাটে বসতে। জেদ করে কদিন চুল বাঁধেনি সে।

সেদিন পূর্ণিমার চাঁদের আলো খাটের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল। ইলার মুখখানা ধরে মানস বলেছিল, "আবাঁধা চুল উড়তেছিল উদাস হাওয়া লেগে।" ইলা খিলখিলে করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, জানো বড়দি বলছিল চুল না বাঁধলে তুমি নাকি খাটে বসতে দেবে না। তাইতো রাগ করে চুল বাঁধি না। মানসও হেসে বলেছিল, তাই নাকি? অত লক্ষ্য করি নি তো। আগে জানলে নাহয় কদিন আমিও খাটে বসতাম না। যখন অমনই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তোমার। তারপর বলে, 'তানয় গো তানয়, যাদের বর ভালো তাদেরই তো বেশী করে সাজগোজ করতে হয়। তাদের তো ওই এক ভিন্ন গতি নেই। তার পর দিন ইলা মনের সাথে মেজেছিল। হঠাৎ বাঁড়ীতে জংলা ঢাকাই পরতে দেখে নন্দ বলে, ব্যাপার কি বৌদি? বড়দি বলে, দেখলি আমার কথা সত্যি কিনা?

এই সংসারঅনভিজ্ঞা মেয়েকে এখানে ছেড়ে যেতে মানসের মনে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু নিষে যাবার উপায় নেই। বাবা মা অসন্তুষ্ট হবেন। একবার বলেছিল তাকে বাপের বাড়ী যাবার কথা। কিন্তু ইলাই বলেছিল, 'না তা হয় না, তুমি থাকবে মা আমি থাকবো না, বাবা মার কষ্ট হবে যে?' মানস ম্লান হেঁসে বলেছিল, কিন্তু আরেক জনের কষ্টের কথাটাও তো ভাবতে হবে। ইলা বলেছিল, 'সে কষ্ট বৃষ্টি বাপের বাড়ী গেলেই থাকবে না?'

কিন্তু আর ইলা পারে না। বড় পরিশ্রান্ত মনে হয় নিজেই। আরো কত দীর্ঘ দিন এভাবে কাটবে কে জানে? মনে মনে মানসকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমার মুখের কথাটাই বড় করে ধরলে তুমি? একবার ভেবেও দেখলে না যে কি নিয়ে দিন কাটবে আমার? আবার মনে হয়, আচ্ছা ঠাকুমা যে বলতো ভোরের স্বপন সত্যি হয়, কই হোলো নাভো?

পরদিন সকালে ঠাকুর ঘরে বসে ইলা চন্দন ঘসছে। এই একটি কাজ যা করতে প্রচুর সময় লাগে। অথচ পাঁচ জনের কথার উত্তর দিতে হয় না। পর পর পাঁচটি বাটিতে পাঁচ ভাগে চন্দন রাখতে হবে। আঙাটার লাল চন্দন, মহাদেবের সাদা চন্দন এমনি ভাগে ভাগে। ইলার চন্দন ঘষা হরপ্রসাদি বাবুর বড় মনোমত। স্বন্দর গাঢ় চন্দন ঘষে সে, দায়সারা কাজ করে না। আজও সে একমনে চন্দন ঘষে যাচ্ছিল, কর্তা পূজো সেরে সদরে গেছেন। হঠাৎ কর্তার খড়মের আওয়াজে ইলা চমকে ওঠে। পূজোর ঘরে বসে ভবতারিণী মালা জপ করছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কর্তা বলেন, শুনছো, মানসের টেলিগ্রাম এসেছে। সে বদলি হয়েছে কলকাতায়, আজ রাতেই এসে পৌঁছবে। ঘোমটার ভেতর ইলার চোখ থেকে ঝরঝর করে জল পড়ে চন্দন পিড়ির ওপর। আজ বোধ হয় প্রথম তার চন্দন পাতলা হয়ে গেল।

আশিষ

ত্ৰিহিমাংশুপ্রকাশ রায়

ফুল যে ফুটে ফুল হয়

আশিষ কোন একের নয়—

ওই যে বনের দীন

যেমন-তেমন ফুল

রূপে হীন বাসে হীন

নাই জানা যার ফুল,

বহর আশিষ শিরে বয়

তবেই ফুটে ফুল হয়।

আশিষ আছে

সারা রাতের

আশিষ আছে

সারা দিনের

আশিষ আছে

রোদ-বাতাসের

মেঘের জলের।

আশিষ আছে

নীল আকাশের

মাটির রসের।

বহর আশিষ শিরে বয়

ফুল না তবেই ফুল হয়।

বিদেশিনী

শ্রীনন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

বিনাব্যয়ে মহিলাদের শিল্পশিক্ষাদান

ওয়াশিংটন, ২ই এপ্রিল—পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আবিহাওয়ার মধ্যে মেয়েদের শিল্পকলা শিক্ষাদানের নিমিত্ত ওয়াশিংটনে একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জুলিয়াস গারফিনকেল নামে ওয়াশিংটনের জরৈনক পরলোক-গত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বীয় মাতার নামে উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে একসঙ্গে ৫০টি মহিলা শিক্ষালাভ করিতে পারেন। নিজেদের পরিচ্ছদের ব্যয় ব্যতীত আর কোনরূপ ব্যয় তাহাদের প্রদান করিতে হয় না। ভর্তি হইবার কোনও নির্ধারিত বয়স নাই। মহিলাগণ একবৎসর পর্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে অবস্থান করিতে পারেন।

অফিস আদালত, হোটেল রেস্টোরা, দর্জির দোকান, বিজ্ঞাপন ও আলোকচিত্র আগার—প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের বহু প্রকার কার্য মহিলাগণ শিক্ষা করিয়া থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি

ওয়াশিংটন, ১০ই এপ্রিল—যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি অর্থনীতি সংক্রান্ত ব্যুরোর এক সংবাদে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ১৯৪৯ সালে বর্ধিত হইয়াছে। তৎপূর্বে পাঁচ বৎসর ধরিয়া উহার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল।

১৯৫০ সালের প্রথম ভাগে যুক্তরাষ্ট্রের মোট গাভীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার, একবৎসর পূর্বে গাভীর সংখ্যা বত ছিল তাহা অপেক্ষা ইহার পরিমাণ শতকরা একভাগ বেশি। গৃহপালিত পশুর আহাৰ্য শস্তের পৰ্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির ফলে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

উক্ত ব্যুরোর অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বলেন যে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ২৫ বৎসরে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বাৎসরিক ১০ লক্ষ করিয়া বর্ধিত হইবে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে বেতার শ্রোতাদের রুচি

নির্ণয়—বেতার ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থ মার্কিন

কম্পানীর প্রচেষ্টা

আমেরিকার “বেতার জগৎ” সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসা হিসাবে বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই প্রত্যেক বেতার প্রতিষ্ঠান সেখানে শ্রোতাদের রুচি এবং তাঁহাদের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। শ্রোতারা যে ধরনের “প্রোগ্রাম” বেশী পছন্দ করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেইভাবেই নিজেদের কর্মসূচী রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।

“বেতার জগতের” বাহিরেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসা সম্পর্কে প্রচার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বেতার অল্পষ্ঠানের আয়োজন করেন। ইহারাই শ্রোতাদের রুচি সম্পর্কে অবহিত হইতে চান। কেবল বেতারকেন্দ্রের মালিক এবং ব্যবসায়ীরাই যে বেতারশ্রোতাদের রুচিপছন্দ জানিতে চান তাহা নহে; বেতারের শিল্পীরাও ইহা জানিতে এবং বুঝিতে চান, কারণ তাহাতে তাঁহাদের কাজেরও বিশেষ সুবিধা হয়।

কোনও একটি বিশেষ বেতার অল্পষ্ঠান কতগুলি শ্রোতা শোনেন এবং কোন্ ধরনের অল্পষ্ঠান তাঁহারা সব চাইতে বেশী পছন্দ করেন—এই জাতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজকাল আমেরিকার একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পাওয়া যায়। ইহারাই একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের অশেষ উপকার করিতেছেন।

বর্তমানে শিকাগোর এ, সি, নীলসন কোম্পানী এই কাজে সর্বাধিক সাকল্য অর্জন করিয়াছেন। অডিমিটার (audimeter) নামক একটি নবাবিস্কৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ইহারাই বেতার শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করিয়া

থাকেন। আমেরিকার দেড় হাজার গৃহে এই যন্ত্র বসানো হইয়াছে। আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বেতারশ্রোতার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এই সমস্ত গৃহে উক্ত যন্ত্র বসানো হইয়াছে।

গৃহের যে কোন স্থানেই এই অভিমিটার যন্ত্র বসানো যায়। বেতার গ্রহণযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত একটি দোলকের (Oscillator) সহিত তারের দ্বারা অভিমিটার যন্ত্রের সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে বোল মিলিমিটারের ফিল্ম লাগানো থাকে। ইহার উপর পূর্বোক্ত দোলকের দোলন-সংকেত চিহ্নিত হইয়া যায়। এই সংকেত-চিহ্ন হইতে শ্রোতারিা কখন কোন কেন্দ্রের কি—কি অস্থান শুনিলার জন্য রেডিও খুলিয়াছেন তাহা বুঝা যায়।

হুই সপ্তাহ অন্তর শ্রোতারিা সাংকেতিক চিহ্নযুক্ত ফিল্ম নীলসন কম্পানীর কেন্দ্রীয় আপিসে পাঠাইয়া দেন। সেখানে বিশেষজ্ঞরা এই চিহ্নের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রাপ্ত সংবাদে একটি নির্দিষ্ট রচনা করেন। এই নির্ঘণ্টের উপর ভিত্তি করিয়া যে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় উক্ত কম্পানী মাসে দুইবার করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এখানে পাঠকদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে এই দেড় হাজার রেডিওর মালিকরা কি নিছক পরোপকার প্রবৃত্তি লইয়াই উক্ত কম্পানীকে সাহায্য করেন। না, তা মোটেই নয়। হুই সপ্তাহ অন্তর তাঁহারা যখন অভিমিটার যন্ত্র হইতে চিহ্নিত ফিল্ম বাহির করেন তখন একটি ছিদ্রপথে কতকগুলি করিয়া মুদ্রা আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে। ইহাই এই গৃহস্বামীদের পারিশ্রমিক।

ব্যবহৃত ফিল্মের স্থানে বসাইবার জন্য যে নূতন ফিল্মের প্রয়োজন, তাহাও সরবরাহ করেন নীলসন কম্পানী। পুরাতন ফিল্মের স্থানে নূতন ফিল্ম বসাইতে যদি কোন গৃহস্বামী ভুল হইয়া যায় তবে আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিকভাবে নূতন ফিল্ম বসানো হইতেছে ততক্ষণ যন্ত্রটির ভিতর হইতে অবিরাম কোঁ কোঁ শব্দ বাহির হইয়া ভদ্রলোককে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। তুলিবার কি উপায় আছে?

বাহিরের কাজ করিবার জন্য কম্পানীর চল্লিশজন কর্মী আছেন। ইহারা মাঝে মাঝে গিয়া যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া আসেন। তবে গৃহস্বামীদের সহযোগিতা ছাড়া কাজটি

সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন। তাই ইহাদের খুশী করিবার জন্য মাঝে মাঝে কম্পানী হইতে ইহাদিগকে নানা রকমের উপহার পাঠানো হয়; মাঝে মাঝে বিনা খরচার ইহাদের বেতার যন্ত্রগুলিও মেরামত করা হয়। এইভাবে এই বিশেষভাবে নির্বাচিত দেড় হাজার শ্রোতার মতামতের উপর নির্ভর করিয়া যে সংবাদ পাওয়া যায় বেতার ব্যবসায়ীদের নিকট তাহা বিশেষ মূল্যবান। মার্কিন বেতার ব্যবসা একটি ক্রমোন্নতিশীল ব্যবসা। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ছাড়িয়া দিলে এখানে পতন অনিবার্য। তাই শ্রোতাদের সম্বন্ধে ব্যবসায়ীরা এমনি সজাগ।

১৯৪৯ সালে আমেরিকায় বিবাহ ও

বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা হ্রাস

ওয়াশিংটন, ১৭ই এপ্রিল—মার্কিন জনস্বাস্থ্য বিভাগের একটি প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৯ সালে আমেরিকায় বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার ঠিক আগের দুই বৎসরও এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে, বিবাহ অপেক্ষা বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাই বেশী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে বিবাহের সংখ্যা শতকরা ৩৬.৭ ভাগ।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের হিসাবে আরও প্রকাশ, ১৯৪৯ সালে ১৫,৮৫,০০০ বিবাহ এবং ৩,৮৬,০০০ বিবাহবিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ১৮,১১,১৫৫ এবং ৪,০৮,০০০।

আলোচ্য পরিসংখ্যাতে আরও বলা হইয়াছে যে ১৯৪৯ সালে জনসংখ্যার অল্পপাতে আমেরিকায় প্রতি হাজারে ১০.৭টি বিবাহ হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের পরে এত কমসংখ্যক বিবাহ আর কখনও হয় নাই। ১৯৪৯ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের আনুপাতিক সংখ্যা হইয়াছিল প্রতিহাজারে ২.৬।

মার্কিন শিশুদের নিরাপদে রাস্তাঘাটে চলিবার রীতি শিক্ষাদান

শিশুদের নিরাপদে পথ চলিবার রীতি শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকায় একটি ক্ষুদ্র নগর আছে। ওহিও প্রদেশের ক্রাম্পফিল্ড শহরে ১৯৩৭ সালে সর্বপ্রথম এই ধরনের

“নিরাপদ নগরে”র পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয়। উক্ত পরিকল্পনামুসারে যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের কেহই অজ্ঞাবধি পথ চলিতে গাড়িঘোড়ার দুর্ঘটনায় পড়ে নাই।

উক্ত নগরে শিশুদের দুই সপ্তাহ ধরিয়া রাত্তাঘাটে চলিবার রীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসে করিয়া শিক্ষার্থী শিশুদের স্ব স্ব গৃহ হইতে হইতে উক্ত “নিরাপদ নগরে” লইয়া যাওয়া হয়। গাড়িঘোড়ার দুর্ঘটনা হইতে কিভাবে রক্ষা পাইতে হয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তিন চাকার সাইকেল চড়িয়া শিক্ষার্থীরা তাহা শিক্ষা করে।

মাতা এবং পুত্রকন্যার একই ক্লাসে যোগদান।

শিক্ষার সহিত মানসিক সম্পর্ক গঠনে

নূতন ব্যবস্থার উপযোগিতা

নিউইয়র্ক শহরে কয়েকটি সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণ করিবার জন্ত পুত্রকন্যার সহিত মায়েরাও ক্লাসে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সংবাদটি পরিবেশন করিবার সময় নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, এখানে শিক্ষালাভ যাহা হয় তাহার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান হইল মাতার সহিত পুত্রকন্যার মধুর সম্পর্ক গঠন। বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদরা বলেন যে খুব অল্প বয়সের বালক বালিকারা ইহাধারগতঃ এই ধরনের শিক্ষার দ্বারা বেশী উপকৃত হয়।

নিউইয়র্ক শহরের বিভিন্ন কলেজ এবং মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত, লোকনৃত্য, অংকন, কুটীরশিল্প এবং ফরাসীভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক নিয়মসম্মত ভাবেই ক্লাস গ্রহণ করা হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাতে কোন কড়াকড়ি নিয়ম রক্ষা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, এইভাবে একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আনন্দ, পড়াশুনা বা গানবাজনা করার ফলে মাতা বা সন্তান পরস্পরকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে শেখে। মাতা তখন আর কেবল “রাধুনী বা শয্যারচয়িত্রী” নন—তিনিও একজন মানুষ, সুখদুঃখেয় সাথী।

মাতার সহিত এখানে বালকবালিকারা গানবাজনা করে,

নৃত্যও করে। যাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স্ক তাহাদের বেলায় দেখা যায় হয়তো মেয়ে একটি বাতায়ন বাজাইতেছে, মা বাজাইতেছেন অথ আবার একটি। ইহার ফলে একই পরিবারের বিভিন্ন সভ্য বিভিন্ন যন্ত্রবাদনে পারদর্শিতা লাভ করে এবং সামগ্রিকভাবে এই পরিবারের সঙ্গীতজ্ঞান বিশেষভাবে উন্নীত হয়।

টাইমস পত্রিকার প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হইয়াছে, যে, শিক্ষালাভের বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন এবং যে যতটুকুই শিক্ষালাভ করুক না কেন তাহাদের মানসিক উন্নতি এই অভিনব ব্যবস্থার ফলে অনেক ত্বরান্বিত হয়।

আমেরিকায় ফুসফুস পরীক্ষার নূতন যন্ত্র

আবিষ্কার

যুক্তরাষ্ট্রে এক নূতন ধরনের ডাক্তারী যন্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কেহ প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে ডাক্তাররা বলিয়া দিতে পারিবেন যে তাহার ফুসফুস ঠিকভাবে কাজ করিতেছে কিনা। যদি ফুসফুসে এমন কোন দোষ থাকে যাহার ফলে পরে খারাপ অসুখ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাও উক্ত যন্ত্রে ধরা পড়ে।

ফুসফুসের গ্যাসের সহিত অক্সিজেন কি গতিতে মিশিতেছে ও সহজভাবে মিশিতেছে কিনা যন্ত্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। যদি ফুসফুস যথাযথ কাজ করে তাহা হইলে অক্সিজেন ফুসফুসের অন্ত্যন্ত গ্যাসের সহিত খুব শীঘ্র ও সহজে মিশিয়া যায়। আর ফুসফুসে যদি কোন বৈকল্য থাকে যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়; উহার আবিষ্কারী বলেন যে, ফুসফুসে কোন রোগের পূর্ণ পরিচয় এই যন্ত্রে ধরা পড়ে না। ইহাতে কেবল ফুসফুসের যে বৈকল্যের ফলে রোগ হইতে পারে সেই বৈকল্যের ইদিশ পাওয়া যায়।

এই যন্ত্রের দাম কিছু বেশী এবং ইহা পরিচালনার জন্ত বিশেষভাবে শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ইহার নির্মাতা ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, যে জাতীয় শিল্পে ধূলাবালির আশংকা সমধিক সেই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য এই যন্ত্র বিশেষ কার্য্যকরী প্রমাণিত হইবে।

মহিলা সমাচার

ত্রিভোজ্যতিষচন্দ্র ঘোষ

শ্রীমতী হেনা সেন—আন্তর্জাতিক সমস্তায়

শ্রীমতী হেনা সেন আন্তর্জাতিক সমস্তায় নারীর স্থান নির্ধারণ জন্ত সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক আহত কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকায় বিমান যোগে যাত্রা করিয়াছেন।

“সত্যগ্রহ” সম্পাদিকা শ্রীমতী আভা মাইতী

শ্রীমতী আভা মাইতী এম, এ. বি এল, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মাননীয় ই.নিকুঞ্জ বিহারী মাইতীর কন্যা। শ্রীমতী মাইতী ‘সত্যগ্রহ’ সপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদিকা, এই পত্রিকা সত্য, চরিত্র, সংসাহস ও বীর সাধনায় শক্তি নিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়াছে। আশা করি মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাখানি বাঙ্গলায় বিশিষ্টতা ও ভাবধারায় বাহক হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজল করিবে এবং স্বাধীন ভারতে যাবতীয় অনাচার দূর করিবার সহায়তা করিবে।

কুস্তমেলায় নারী পকেটমারার প্রাদুর্ভাব

দ্বাদশ বৎসর অন্তর হরিদ্বারে কুস্তমেলা হইয়া থাকে। পুণ্যসলিলা গঙ্গা নদী সেখানে হিমালয় হইতে ভারত-ভূমিতে আগমন করিয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করেন—সেই স্থান ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষতঃ হিন্দু নর-নারীর নিকট অতি পবিত্র তীর্থ। এই কুস্তমেলায় লক্ষ লক্ষ (এমন কি ১২।১৪ লক্ষ) নর-নারী অক্ষয় পুণ্য ও শান্তি কামনায় সমবেত হয়। তাহারা রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল স্থরের ও সুবিধার কথা, পুণ্যের প্রেরণায় তুলিয়া যায়। আর এইরূপে ধর্ম মেলায় ও অল্পটানে নারীগণের আগ্রহই অধিক। এই সব মেলায় সমবেত নর-নারীরা কোনরূপ বিপদ আপদের আশঙ্কা মনে রাখে না।

১৩৫৬ সালের চৈত্র মাসে এই কুস্তমেলা বেশী কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটাইয়াও সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ৮।১০ লক্ষ নর-নারী স্নান ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের এই প্রথম বড় তীর্থযাত্রীদের মেলায় রাষ্ট্র সুব্যবস্থা করেন।

কিন্তু একটি সংবাদে আমরা অতি ব্যথিত হইয়াছি। এই মেলায় সময় বহু নারী পকেট মারিয়া সরল তীর্থযাত্রীগণের ক্ষতি ও ত্রাস উৎপাদন করিয়াছে। সংবাদ-পত্রের সংবাদে জানা যায় নারীর দ্বারা প্রায় ৫০০ শতের অধিক যাত্রী পকেট মারার অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

এ দেশে নারীরাই ধর্ম ও চরিত্রের উচ্চাধর্ষ রক্ষা করিত। এইরূপ নারীদের নৈতিক অবনতি যেমন স্বাধীন রাষ্ট্রের অনিষ্টকর তেমনি লজ্জাকর। এইরূপ নীচ প্রবৃত্তি বাহাতে প্রসার না পায় তাহার জন্য প্রতি নারীকল্যাণ সমিতির চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। নারী পুলিশ স্থিতি বা আইন প্রণয়নের দ্বারা চরিত্র সংশোধন হয় না। চাই জনমত ও নীতির প্রচার।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ‘সাহিত্যে নারী’

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী একজন সুবিখ্যাত কথা সাহিত্যিক। তিনি ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক “লীলা লেকচারার”—নিযুক্ত হইয়া পাঁচ দিন অতি সারবান ও নানা তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া নারীর সাহিত্যে স্থিতি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাহার সেই বক্তৃতামালা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন; স্বাধীন ভারতের স্থিতিত্বের মহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ ও তাহা বহন করিবার দিন সামনে আসিয়াছে। এই সময়ে অনুরূপা দেবী বিশ্বের ও ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গনারীর সাহিত্যে স্থিতি, সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনের শক্তির পরিচয় ও অবদানের নানা তথ্যপূর্ণ পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের ও নারী সমাজের পরম উপকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রয়েল আকারের ৪৩২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, এইরূপ গঠন ও ঐতিহাসিক তথ্যমূলক পুস্তক প্রকাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ-নারীর পরম উপকার করিয়াছেন। মূল্য ছয় টাকা মেয়েদের পক্ষে অধিক হইলেও এই পুস্তক সকলের পড়া ও রাখা প্রয়োজন।

এই পুস্তকে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ যুগে নারীতে অবদানের বিবরণ ও মূল্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। সমাজ ও জাতি গঠনে সমগ্র বিশ্বের নারীর দান স্মরণ করা হইয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে সৃষ্টি ও বিকাশে বঙ্গনারীর দান খুবই বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ হইয়াছে। মহিলা লিখিত প্রায় সকল প্রকার ও সকল মুদ্রিত পুস্তকের আলোচনা হইয়াছে।

অমরুপা দেবী মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে সিদ্ধ— এই পুস্তক তাঁহার গভীর জ্ঞান ও গবেষণার শক্তির পরিচায়ক। ইহা “নীলা” পুরস্কার ও লেকচারার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সার্থক করিয়াছে।

নারী মঙ্গলালয়

আশ্রয়হীনা ও অসহায় নারীদের সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী নার্সিং ও কুটার শিল্প শিক্ষাদান করিয়া স্বাবলম্বিনী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে “নারীমঙ্গল আলয়” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে ধর্মিতা মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। গোবরডাঙ্গা (২৪ প্রব্রুগণার) পল্লিতে, আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে খরচ কম ও নানা সুবিধা হইবে। পল্লিতে পল্লিতে এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এই আশ্রমের আর একটি উদ্দেশ্য বঙ্গ-বিধবা ও ধর্মিতা নারীদের আন্তর্জাতিক ও আন্তরপ্রাদেশিক বিবাহ দিবার পদ্ধতি। তাহা বাঙ্গলার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে।

আজিকার কলিকাতা

শ্রীজিতেন্দ্রলাল ঘোষ

কবি জৈম্বর গুপ্ত কলিকাতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গকরে বলেছিলেন—

“রেতোঃমশা দিনে মাছিঃ।

এ নিয়ে কলকাতায় আছি।”

গুপ্ত কবির সময়ের মশা ও মাছির জ্বালাতন হাস পেয়েছে, এ ধারণার সঙ্গত কোন কারণই নেই, বরং বহুগুণে বংশ বৃদ্ধি করে বর্তমান কলকাতায়ও তারা বহাল-তবিস্বতে রয়েছে। আরও আছে যা গুপ্ত কবি দেখেন নি—ভবিষ্যতে তার আভির্ভাব হবে, তাও তিনি ধারণা করে যান নি। কলকাতার রাজপথে সাহেবী পাড়ায় জ্যাক্ত বাঘ প্রাণঃক্রমণে বের হবে সে কি তিনি জানতেন না ধারণা করতে পেরেছিলেন? পুণার্থী হাঙ্গরের সাক্ষাৎ মিলবে আমাদের এ বালীগঙ্গার জানতেন? তাঁর দুর্ভাগ্য যে এত রং বেরংগের রাজধানী কলকাতায় এতসব দেখতে পান নি, আমরা ভাগ্যবানেরা তা দেখছি। আরও কত না দুর্লভ বস্তু আজ আমাদের নিত্য সহচর হয়ে আসছে। তাবুন না একবার কলেরা বসন্তের কথা। কটি ঘর বাকী আছে যেখানে মা শীতলা রূপা করে আত্মমুগ্ধি প্রকাশ করেন নি, বা কলেরার প্রকোপে প্রতিবেশী সচকিত হয় না? জীবনটাই দুঃখের, আর এ কলেরা বসন্ত জীবনের দুঃখকষ্ট লাঘব করে

সপ্তাহে হাজারো লোককে স্বর্গরাজ্যে যাবার সনদ দিয়ে মানবের কতই না হিতসাধন করছে। আর কৃত্তর আমরা কলেরা বসন্তের বিরুদ্ধে কি বদনামটাই না দিয়ে থাকি।

স্বদেশী যুগের বড়কর্তার কলকাতার রাইটাস বিল্ডিংয়ে বসে আমাদের জন্ত কতই না ঘর্মাক্ত হচ্ছেন। খাত্ত্রব্যে কত বেশী পরিমাণে ভেজাল দেওয়া সম্ভব তার ভাবনা অহিনিশি ভেবে ভেবে মাথা গরম করছেন। আর বদলোকেরা বলে বেড়ায় যে এ মহান ব্যক্তিরাই ইহ জীবনের পাথের সঞ্চয় করে নেবার সুযোগ খুঁজছেন। আর লালবাজারী পুলিশ তাদের কর্মতৎপরতায় কতই না সজাগ। শোভাযাত্রা করে কতিপয় মহিলার ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপচেষ্টা রোধ করতে আমাদের পুলিশ গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে পরলোকে ও কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তবে ছেড়েছেন শুনি। একি কম প্রশংসার কথা! তবে রাস্তায় চলতে গেলে পকেটমার দিবি পকেটে হাত চালিয়ে দিব্য দিবালাকে উধাও হয়ে যায়। ছুঁকিপাকে ধরা পড়লেই বা আর কি! ফিরিওয়ালাদের উপদ্রব কমবার জন্য মাঝে মাঝে রব উঠে। তাদের নাকি অপরাধ যে, তারা সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু বাড়ী বাড়ী মাথায় করে ছড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ ফিরিওয়ালাকে

লালপাগড়ীমাথার পুলিশের পিছু নিতে দেখা যায়। হতভাগ্য ফিরিওয়ালাদের অদৃষ্ট যে দিন নেহাৎ মন্দ সে দিনই এ দুর্ঘটনা ঘটে, তা না হলে চুক্তি করা পয়সা দিয়েই তারা রেহাই পেয়ে থাকে। ফিরিওয়ালারাও ভগবানের নিকট পুলিশের যত্নকামনা করে—এদেরই দয়ায় দু পয়সা রোজগারের সুযোগ পায় বলে। ঘুষ নেবার বে বদনামটা পুলিশের আছে সেটা নেহাৎই ঈর্ষামূদ্রক। বিনা পারিশ্রমিকে কে কার জ্ঞাত করে? পুলিশ কত ভাবে না আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। একজন বিশিষ্ট লোককে পুলিশি ঘুষের বিষয়ে বলতে শুনেছি—মশায়! পুলিশ ঘুষ নেয় বলেই না সাধারণ ঐত সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে থাকে। আর তা না হলে যে সব অচল হয়ে যেত। সরকারী আইন কড়ায়গণ্ডায় মেনে চলায় দিগদারী কত!

ঘুষের দৌলতে সব কিছু যে চলছে তা অস্বীকার করবে কে? মায় চুরি থেকে আশ্রয় করে চোরাকারবার পর্যন্ত।

কলিকাতায় আরও রয়েছে “গৌর প্রতিষ্ঠান”। ইংরেজ আমল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার রয়েছে আমাদের দেশ-প্রেমিকদের হাতে। তাই না আজ ‘তদন্ত কমিশনে’ ‘পুতুর চুরীর’ অলস্ত প্রমাণ বেরিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার স্তুপাকার, ফুটপাথের ধারে মরা কুকুর বিড়ালের পচা দুর্গন্ধে পথ চলা ভার, তাতে আর হয়েছে কি? ধাঙ্গড়দের ধর্মঘটের হুমকি ত প্রমাণ করে দিচ্ছে যে কলিকাতায় ধাঙ্গড় রয়েছে। সমস্ত পদ অলঙ্কৃত করে যারা রয়েছেন তাঁরা আর কি করবেন! নির্বাচনের সময় যে হেঙ্গামাটা এবং যে অর্থের অপচয় করতে হয় সেটা তুলতেই নাকি তাঁদের মেয়াদী সময়

উত্তীর্ণ হয়ে যায়। বড় বড় কর্তৃকর্তাদেরই কি? কম মুস্তল। নির্বাচিত সদস্যদের খুসী করে কতাদায়ের ও ঈর্ষাক্ষে বারানসী যাত্রার পাথের সফার করে নেওয়া কি কম ঝগড়া। তবু লোকেরা “করপোরেশনএর নাম দেয় করাপশান”! এ ছুটমতি ছাড়া আর কি?

জনস্বাস্থ্য বিভাগ? সেত রয়েছেই। নিমতলা, কেওড়াভাটা, কাশীমিত্র বাট, মানিকতলা ও পাক সার্কাসের গোরস্থান তদারক করলেইত স্বাস্থ্যের সব ঝামেলা চুকে যায়। মানব দেহে ব্যাধি ঢুকলে, তার শেষ কৃত্য হওয়াই বড় কথা। বাংলার শাসনভার একজন সুরচিকিৎসকের হাতে রয়েছে। অসুখের প্রকোপটা নাকি তাঁর আমলে বেড়েছে—তাঁত বাড়বেই। প্রবাদে বলে—ঘোড়া দেখলে খোঁড়া। একজন চিকিৎসক পেয়ে আমাদের অসুখ না থাকলেও ঘুটিয়ে ঘুটিয়ে অসুখ বের করি। আর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক পেয়ে দেশভুক্ত লোক যদি ব্যাধির যন্ত্রণায় চিকিৎকার আরম্ভ করে তাতে এমন আর বেশী কি ক্ষতি?

কলিকাতা সব মিলে চমৎকার। নিত্য নূতন সিনেমা। রাস্তায় রাস্তায় হজ্জা, দিনে দুপুরে ডাকাতি, রাস্তায় বাঘ, গঙ্গায় হাঙ্গর আরও কত কি! ‘রাম রাজস্বের’ যে নমুনা দেখা যাচ্ছে ‘রাম রাজস্বের’ তা অনেক গুণে বেড়ে যাক এই প্রার্থনা। অহিংসার প্রভাবে হিংস্র স্বাপদ ও ব্যাধির জীবগুর সহিত মানুষ যেন একসাথে থাকতে পারে। বদনাম দেওয়া যাদের স্বভাব তাদের যেন স্তম্ভিত হয়। চাউলে কাঁকর, আটায় তেঁতুল বীচির গুঁড়া, চিনিতে বালি, চাতে কাঠের গুঁড়া এসব খেতে খেতে ভাবুক বাদলী আমরা যেন আমাদের ঝগড়াটে স্বভাবটা পরিবর্তন করে নিয়ে আশৈশব পরলোকের ভাবনা ভাবতে শিখি।

আমাদের আসর

শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

আজ যে মহিষসৌ মহিলার পুণ্য জীবন কথা আলোচনা করছি, তাঁর নাম আপনারা সকলেই জানেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অর্দ্ধাঙ্গিনী, শ্রীশ্রীসারদা দেবী। তিনি বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রামে, ৮ই পৌষ ১২১০ সালে ও ২২শে ডিসেম্বর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলবার কৃষ্ণসপ্তমী তিথিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম শ্যামসুন্দরী দেবী। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে ঠাকুর পরমহংসদেবের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সে সময় ঠাকুরের বয়স ছিল একুশ বৎসর। বিবাহের কয়েক বৎসর আগে থেকেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তপোবনে কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। বিবাহের পর সন্ন্যাসীর সাধনার গতি আরও প্রবল হয়ে উঠল। এই সময়ে স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে থাকার কোনও সন্ন্যাসীর পক্ষেই অসম্ভব নয়। কিন্তু আজন্ম সন্ন্যাসিনী সারদা দেবী এই অবকাশগুলি অযথা ব্যয় না করে, স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হবার জন্য চিত্ত শুদ্ধি ও আত্মিক তপস্যায় ব্যয় করে সন্ন্যাসিনীর উপযুক্ত চরিত্র গঠন করে তুলেছিলেন। ঠাকুর যখন সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনায় সিন্ধু হয়ে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি শিষ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন, সেই সময় সুদীর্ঘ কাল পর জননী সারদা দেবীও ঠাকুরের শিষ্য গ্রহণের জন্য পিতৃগৃহ হতে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। আপন সাধনার পূণ্যপীঠে স্ত্রীকে দেখে ঠাকুর খুশী হলেন। এবং অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁর সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করে তাঁকে স্বীয় ধর্ম লাভের অধিকারিণী করলেন। পরমহংসদেব বাংলা দেশকে দেখালেন, শুধু দৈহিক সঙ্কল্পের মধ্যে বিবাহিত জীবনের মহিমা ও সার্থকতা নেই। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে, অনন্ত প্রেমস্বরূপ ভগবানকে দেখতে পাওয়া ও একের

সহিত অশ্রুর ঐশ্বরিক সঞ্চককে উপলব্ধি করাতেই বিবাহিত জীবন সার্থক ও ধন্য হয়। শ্রীমাও স্বামীর কাছে চেয়েছিলেন ধর্ম সাধনা শিখতে। কেন না স্বামীর মধ্যে তিনি জগৎ স্বামী শ্রীহরিকে সনাসর্বদা প্রত্যক্ষ করতেন। তাই সাধারণ সংসারী নারীদের মতন প্রবৃত্তিময় জীবন যাপনের জন্য হীন অনুরোধ তিনি কখনও স্বামীকে করেননি। বরং নিজের একনিষ্ট ধর্মপ্রাণতা ও সংযমের পরাকাষ্ঠায় স্বামীর ধর্মজীবনের সকলরকমে পূর্ণ সহযোগিতা করে সহধর্মিণীর জীবন্ত আদর্শ তিনি নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন। সারদা দেবীর বিবাহিত জীবন ছিল দৈহিক কামনা ও আসক্তির সম্পূর্ণ অতীত। এবং সংঘম পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় এবং দিব্যমহিমায় চির সমুজ্জল। এই জন্য স্বামীর অবর্তমানে তিনি কোনও দিন বৈধব্য বেশ ধারণ করেন নি। কেননা, ঠাকুরের ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা অবসানের পর তিনি পুরী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাহাতে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ঠাকুর অবিনাশী ও মৃত্যুহীন। এই সত্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য দেহত্যাগের পর ঠাকুর বহুবার স্ত্রীমাকে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন।

শ্রীমায়ের চেহারাতে বিশ্বমাতৃষের প্রসন্ন গম্ভীরা স্নেহ-পীযুষ সিন্ধু, এমন একটা পবিত্র ভাব বিরাজিত ছিল যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রথম দর্শনে তাঁকে জগৎ জননী জ্ঞানে ভক্তি করতো। এবং তাঁর সরল মধুর হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে নিজ নিজ হৃদয় উন্মুক্ত করে ব্যথা বেদনার ভার উপশম করতো। সারদা দেবী ছিলেন যুগঅবতার রামকৃষ্ণদেবের উপযুক্ত সহধর্মিণী। পরমহংসদেব যেমন শুধু ছিলেন না সন্ন্যাসীর আদর্শ তিনি ছিলেন গৃহীর আদর্শ এবং মানব সমাজ থেকে দূরে থেকে গভীরগতিক ত্যাগধর্ম সাধনা করার উপদেশ তিনি দেননি। সেই রকম সারদা দেবীও আদর্শ সন্ন্যাসিনী হয়েও কখনও সংসার থেকে দূরে গিয়ে অন্যান্য সন্ন্যাসিনীদের মত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন

করেননি। ঠিক বাঙালীয় ঘরের বধূর মত সংসারের সকল কাজকর্ম নিয়ে, পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে বাংলার নর-নারীকে দেখিয়ে গিয়েছেন, সংসারের পরিবেশের মধ্যে থেকেও ধর্ম জীবনে কত উন্নতি করা যায়।

সংসারের শোকে ভীণে, হুঃখে ক্রেশে, লাজ্জায় অত্যাচারে যখন বাংলার নারী সমাজ পীড়িতা ও ভুজুরিতা, সেই সময় তাদের মধ্যে বিলুপ্ত প্রায় ধর্ম ভাব ও ধর্ম সাধনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য সারদা দেবীর এ মর্ত্যধামে আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। তাঁর পুত্র আশীর্বাদে ও উপদেশে কত অস্পৃশ্য নারীর জীবন পবিত্র হয়ে উঠেছে, কত সম্ভ্রানহারা জননী মনে সান্ত্বনা পেয়েছে, কত স্বামীহারা পত্নী সংসারে মনোসংযোগ করেছে তার শেষ নেই।

সাধনার সম্বন্ধে সারদা দেবী বাঙালী মেয়েদের অবস্থা কোনও কঠোর নিয়ম পালন করতে বলতেন না। একজনকে তিনি বলেছিলেন, “নিজের ইষ্টদেবতার উপরে মন রেখো। সব সময় ইষ্টদেবতাকে মনে রাখবার চেষ্টা কোরবে। তোমার সংসার নয়; তাঁরই সংসারে দাসী হয়ে কাজ কোরছো, এটা মনে রাখবে। যাকেই সেবা করো জানবে তার মধ্যে তোমার ইষ্টদেবতা আছেন। সব কাজকেই ভগবানের পূজা বলে মনে করে সে কাজ কোরবে, কারুর দোষ ধরবে না। কাউকে মনে কষ্ট দিও না।” আর এক সময়ে বলেছিলেন শিষ্যদের লক্ষ্য করে, “আমার ছেলেমেয়েরা এত কঠোর ব্রত কেন করবে? যাতে ভক্তি বিশ্বাস বাড়ি শুধু সেইদিকে নজর রাখবে। মনকে পবিত্র রাখাই কাজ। সব সময় ঠাকুরকে মনে রাখাই সাধনা। ভগবানকে সকল কাজে মনে রাখতে পারলেই হোল। অত উপাশ তিরশের দরকার কি?”

বিপুল ধৈর্য ক্ষমা ত্যাগ ও সহিষ্ণুতাই ছিল তাঁর জীবনের

আলোক বর্তিকা। এই আলোকের সাহায্যেই তিনি অতি উচ্চতম সাধনমার্গে অধিরোহণ করেছিলেন এবং তাঁর অগণিত শিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দকে সেই অলৌকিক পথের সন্ধান বলে দিয়েছিলেন।

বিশ্বপুজ্য সন্ন্যাসীগণের (স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ অভৈদানন্দ) অন্তরের অকপট প্রজ্ঞা ও প্রণাম তিনি যেমন মায়ের মত গভীর স্নেহে গ্রহণ করেছেন তেমনি অজ্ঞ, অশিক্ষিত মুখ, ধর্ম বিমুখ প্রতিবেশীদের দুর্ব্যবহারও সেই রকম হাসিমুখে অগ্রাহ করে তাদের ক্ষমা করেছেন।

মায়ের অবর্তমানে তাঁরা কার আশীর্বাদে জীবন ধারণ কোরবেন এই আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে একদা তাঁর এক শিষ্য গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, “আমি তোমাদের কাছে সব সময়ই আছি। (নিজের শরীর দেখিয়ে) এটা গেলেও তাই। মা কি কখনও তার ছেলে যেকোনো ছেড়ে থাকতে পারে? আমি তোমাদের চিরকালের মা, সব সময়ই তোমাদের দেখবো”—এরচেয়ে বড় আশ্বাস বড় আশীর্বাদ কোন সম্ভ্রান আর মায়ের কাছ থেকে আশা করতে পারে?

জীবনের শেষ কয়বছর শ্রীমা কোলকাতায় বাগবাজারের উদ্বোধন অফিসের তিনতলায় বাস করতেন। এই বাড়ীকে ভক্তেরা মায়ের বাড়ী বলে থাকেন। মাত্র সাতষটি বৎসর বয়সে ১৩২৭ সালে ৪ঠা জীবণ, তিনি মৃত লীলা শেষ করে দিব্যধামে চলে গেছেন। দেহত্যাগ করলেও তিনি এখনও চিন্ময় দিব্যদেহে তাঁর ভক্তদের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করছেন। তাঁর অভয়বাণী শরণাগত নর-নারীকে সর্বদা বিপদ হতে পরিত্রাণ করছে।

আজ তিনি নেই; কিন্তু তাঁর আদর্শ বাংলার ভক্তিপ্রাণ নারীদের মধ্যে সমভাবে উজ্জীবিত আছে।

টোটকা চিকিৎসা

ঔপারুলরানী ঘোষ

ঔষধ, প্রভৃতি সব কিছুতেই কৃত্রিমতা আসিয়াছে। কিন্তু গাছগাছড়া, লতাপাতা, মূল, ফল ইত্যাদিতে ঔজ্জ্বল্য কৃত্রিমতা আসে নাই এবং কোন কালেও আসিবে না। সামান্য লতাপাতা প্রয়োগে নানাবিধ পীড়ায়, এমন কি অনেক সময় জটিল পীড়ায়ও বিশেষ সফল পাওয়া যায়; আমরা তাহার ফলের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত আছি। আজ অবশ্য ডাক্তার বস্তির অভাব নাই, কিন্তু দুই পুরুষ পূর্বেও ডাক্তার বস্তির এতটা ছড়াছড়ি ছিল না। তখন বাড়ীর মেয়েরাই নানাবিধ লতাপাতা, ইত্যাদির প্রয়োগ জানিতেন এবং তাহার প্রয়োগে অস্থির প্রথম অবস্থায় রোগীকে অতি সহজে নিরাময় করিয়া তুলিতেন। আজ যদিও তাহার ব্যবহার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভিতর ও প্রাচীনাদের হাতে টোটকা চিকিৎসার সত্ত্বফল দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতে হয়। বর্তমান সংখ্যায় শিরোরোগের কতিপয় বহু পরীক্ষিত টোটকা চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

মাথাধরা, আধকপালে ইত্যাদি রোগের প্রাক্তর্ভাব অনেক সময় দেখা যায়। এলোপ্যাথিক কি হোমিওপ্যাথিক মতে অনেককাল চিকিৎসা করিয়াও এই রোগে ততটা সফল পাওয়া যায় না। কিন্তু এই রোগে সামান্য জিনিষে যে আশ্চর্যজনক সফল পাওয়া যায় তাহা দেখিয়াছি। এই আধকপালে মাথাধরার বিশেষত্ব এই যে কপালের একধারে বিশেষ যন্ত্রণা হয়, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যন্ত্রণা বাড়িতে থাকে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই যন্ত্রণা থাকে। একজন প্রোচা এই রোগে অনেকদিন ভুগিতেছিলেন। পরে একজনের পরামর্শে পাকের মাটি (পুকুরের তলার আধ পচা মাটি) তিনি কপালের আক্রান্ত স্থানে লেপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার যন্ত্রণার উপশম হয়। তিনি ঐ পাকের মাটি কিছুদিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন। পাকের মাটির প্রলেপ পেট

বাধায়ও বিশেষ উপকারী। আমাশাজনিত, খাওয়ার দোষে অথবা দান্ত ও তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেটের যন্ত্রণায় পাকের মাটি নাভিমূল হইতে পেটের তলদেশ পর্যন্ত প্রলেপ দিলে, পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আধ-ঘণ্টার ভিতরে মূত্র নির্গত হইয়া অসহ-যন্ত্রণার উপশম হয়।

শিরোরোগে কতিপয় আশু ফলপ্রদ

টোটকা চিকিৎসা

১। বিড়ল ও কুঁকড়িল সমভাগে পেষণ করত কপালে প্রলেপ দিলে অথবা তদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে আধকপালে মাথাধরা নষ্ট হয়।

২। চিনি ১০ আনা, কুঁকুম ১০ আনা এবং ঘৃত ২ তোলা একত্রে আলোড়িত ও অল্প তপ্ত করিয়া নস্ত লইলে সূর্য্যাবর্ত (যে শিরঃপীড়া সূর্য্যোদয়ের সহিত বাড়িতে থাকে) প্রশমিত হয়।

৩। চূণ ও নিশাদল চূর্ণের জ্ঞান লইলে সর্কবিধ শিরোরোগ নষ্ট হয়।

৪। অপরাঞ্জিতা পুষ্পের বা মূলের রসের নস্ত গ্রহণ করিলে শিরোরোগ নষ্ট হয়।

৫। রক্ত চন্দনের সহিত কাঁটালি কলা মিশ্রিত করিয়া লেপন দিলে শিরোরোগ দূরীভূত হয়।

৬। লাউয়ের ফুল ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া মস্তকে ও কপালে দিলে তৎক্ষণাৎ সূর্য্যাবর্ত আরোগ্য হয়।

৭। ভুঙ্গরাজ পাতার রস ও কুড় একত্রে বাটিয়া ব্রহ্মরাজ প্রলেপ দিলে দুঃসাধ্য শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। মুচুন্দ ফুল, সমুদ্রফণ ও হরিণের শিং একত্রে ঘসিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে বহুকালোৎপন্ন শিরোরোগ ভাল হয়।

রান্নাঘর শ্রীপাপড়ি ভাজুড়ি

রস-কদম্ব

উপকরণ:—এক পোয়া ক্ষীর, দেড় পোয়া ছানা, আধ পোয়া ময়দা, রসের জল চিনি।

প্রণালী:—ক্ষোয়া ক্ষীর ও ছানা ভালো করে বেটে চিনি ও কিছু ছোট এলাচ গুঁড়ো করে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিন। ময়দায় ঘিয়ের ময়দা দিয়ে ওই ছানা ও ক্ষীর বাটা ভালো করে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তারপর ছোট ছোট কদম ফুলের আকারে গুঁড়ে নিয়ে নরম জ্বাচে ঘিয়ে ভাজুন। ভাজা বেশ বাদামী রংএর হ'লে ঘি-ছেঁকে নামিয়ে ফেলুন। এইবার চিনির একটু রস করে তাহাতে দুইতিন ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। জলযোগের সময় খেয়ে দেখবেন খেতে এগুলি কেমন স্বন্দর হয়।

রস মাধুরী

উপকরণ:—চিনি একসের, ঘি আধ-সের বেসম একপোয়া।

প্রণালী—প্রথমে চিনিতে কিছু জল দিয়ে জাল দিন। রস বেশ ঘন হ'লে নামিয়ে নিন। এইবারে বেসমগুলি ঘিএর সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ফেটান খানিকক্ষণ। এইবার বেসমগোলা চিনির রসে ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে খুব নাড়িতে থাকুন। একটু বাদামী রং হ'লে একটা থালাতে সামান্য ঘি মাখিয়ে রান্নাটা ঢেলে দিন। ইচ্ছা করলে বাদাম পেস্তা কুচি ও ছোট এলাচের গুঁড়ো তার উপরে ছড়িয়ে দিতে পারেন। তারপর একটু ঠাণ্ডা হ'লে ছুরি দিয়ে বরফির মত ক'রে কেটে নিন। চায়ের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীমুখাকান্ত দে

বর্ষভার উত্তর বর্ষভা নহে

চৈত্র মাসের বঙ্গলক্ষ্মীতে লিখিরাছিলাম করাচীর কুটনীতি জয়লাভ করিয়াছে এবং “বঙ্গলীকে মাথা ঠিক করিয়া ভাবিতে হইবে মুক্তির অস্ত্র উপায় আছে কি না।” এক মাস গত হইবার পূর্বেই আমাদের কথা যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। করাচীর কুটনীতি শুধু সমগ্র পাকিস্তানে নয় পরন্তু হিন্দুস্তানের উপরেও জয়লাভ করিতে চলিয়াছে। আর দিল্লী ও কলিকাতার পথ যে এক নয়, তা উক্তর খামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ চন্দ্র নিয়োগী উভয়ের ভারত মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগে সূচিত হইয়াছে। গত মাসের ভারতীয় ও পাকিস্তানী ঘটনাপুঞ্জের মূল ধারাটি অল্পসংগ করিবার চেষ্টা পাই।

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী বর্ষভার ফলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছ হুবার বাংলা দেশে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি তাঁর অনবদ্য ভাষায় আমাদের ক্ষতের উপর প্রলেপ দিবার চেষ্টা

করিলেন। আমাদের প্রত্যেকের মনে হইল তিনি আমাদের অত্যন্ত দরদী বন্ধু একজন। এমন কি, তিনি নিজে পূর্ব বঙ্গে সফর করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু পাকিস্তানী কতৃপক্ষ তাতে সায় দিলেন না। নিজেদের কুকীতি সমূহের চিহ্ন তখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকাত আলি খানের দিল্লী আগমন। যে পাক-প্রধানমন্ত্রী দিনের পর দিন পূর্ব বংগের লোমহর্ষণকারী হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করিয়াও, হয়ত সহাস্য বদনে পাঠ করিয়াও বিন্দু মাত্র বিচলিত-বোধ করেন নাই, হঠাৎ তাঁর টনক নড়িল তিনি করাচী হইতে ছুটিয়া দিল্লী আসিলেন। শুধু আসা নয় তারপর আর দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে চান না। চারদিনের জন্ত আসিয়া ৭ দিন কাটাওয়া গেলেন। ইহার কারণ কি? কারণ লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু যে কারণগুলি আমরা সংগত মনে করি তা এই:—

পাক প্রধান মন্ত্রী ঢাকা গিয়াছিলেন ইহা স্বরণ করাইয়া দিতে চাই। বিগত ১৯শে মার্চ হইতে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের ঢাকা যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় তিনিও ঢাকায় ছিলেন। যে দৃশ্য দেখিয়া তাঁর চক্ষুস্থির হইয়াছিল, তা আনন্দের কুচকাওয়াজ বা লীগ নেতাদের বড় বক্তৃতা নয়, কিন্তু ঢাকায় মোহেজরীন বা উদ্বাস্তদের বিপুল সংখ্যায় আগমন। ঢাকা গমনের দু তিন দিন পরে রাত্রিতে তিনি যে বেতার ভাষণ দেন তা উর্দু ও বাংলা অনুবাদে সম্পূর্ণ শুনিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের যুদ্ধের হুমকীকে তাঁরা ভয় করেন না, তাঁরা প্রস্তুত আছেন, এমন সব কথা অবশ্যই তাঁর বক্তৃতায় ছিল, আর প্রচুর পরিমাণে ছিল উদ্বাস্তদের প্রতি স্নেহ বর্ষণ ও সাহায্য দানের আশ্বাস। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উদ্বাস্ত আগমনের প্রোত বন্ধ করা না গেলে দেশের সর্বনাশ হইবে। ইহার আর্থিক এবং হয়ত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বদরুজ্জা প্রভৃতির মিশন ঢাকায় গিয়া সেখানকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু যে কাজকে তাঁরা সমর্থনযোগ্য মনে করিয়াছিলেন তা হইতেছে কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তগণকে বিশেষ কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হইয়াছে। কিন্তু উহার কারণ কি তাঁরা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আমরা সেই সময় স্থানীয় মুসলমানদের গনোভাব তাঁদের প্রতি অমূল্য মনে করিতে পারি নাই।

পাকিস্তান সরকার তাঁদের মুজ্জামূল্য অবনমন করিতে রাজি না হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, সংক্ষেপে তা পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর পাকিস্তানী পাট ও তুলা না কিনায় ও কমলা পাকিস্তানে না পাঠানতে ভারত এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, পাকিস্তানের পক্ষে তাল সামলাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বর্বরতার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে দারুণ অর্থক্লেশতা ভুল আর্থিক নীতি অবলম্বনের জন্ত পাকিস্তানে, বিশেষত পাটের দেশ পাকিস্তানে, দেখা দিয়াছিল তা হইতে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মনকে অত্যদিকে ঘুরাইবার জন্ত পাকিস্তান সরকার প্ল্যান পূর্বক পাকিস্তানিকে হীনকার্যে

লিপ্ত করিয়াছিলেন। এই বিশ্লেষণ সত্য হোক বা না হোক অত্যাচার ও অত্যাচার সমূহ যে পরিকল্পনা প্রস্তুত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোথাও কোথাও এরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে যে, বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর উপর কোন অত্যাচার করে নাই, অবাঙালী মুসলমান করিয়াছে। আমাদের বিভিন্ন জিলায় অহুস্তিত কাথ কলাপ সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। তা হইতে বলিতে পারি ইহা সত্য নয়। মানবতা-ধর্ম দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমান সমভাবেই হিন্দুকে কোথাও কোথাও আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু সাধারণত ঢাকা বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় যে সব নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়াছে সেগুলির জন্ত প্রদেশ নির্বিশেষে বাংলার মুসলমানগণ দায়ী।

১৩ই মার্চ তারিখে নয়। দিল্লীতে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গের সাংপ্রতিক দাঙ্গায় নিহত লোকের সংখ্যা গ্রাম ৩৫০০। লুপ্তিত ভস্মীভূত ও বিধস্ত হিন্দু সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা। এই হিসাবের সহিত আমরা কোন প্রকারেই একমত হইতে পারি না। নিহতের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া মনে করি। আর বিনষ্ট সম্পত্তির মূল্যও অনেক বেশী, সন্দেহ নাই। আর নারীর উপর অত্যাচারের পরিমাণ কে করিবে?

এই সকল ঘটনা পণ্ডিত নেহরু, ভারতের মন্ত্রি সভা এবং ভারতের জনসাধারণকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত তারিখগুলি পূর্ব ঘটনা স্মরণে আমাদের সহায়তা করিতে পারে :—

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ : খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অধীন কয়েকটি গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাবে তপশীলী নরনারীদের উপর পাকিস্তানীরা বর্বর অত্যাচার আরম্ভ করে। পুলিশের যোগসাজসে মুসলমান জনতা কয়েকটি গ্রামে বেপরোয়া নরহত্যা নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজ চালায়।

ইহার পর মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ : ঢাকা সহরে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী দুই বঙ্গ চীফ সেক্রেটারিগণ যখন তাঁদের সন্মেলন শেষ করেন, তখনও হাঙ্গামা চলিতে থাকে।

প্রায় সম-সময়ে কলিকাতা ও অত্যাচার স্থলে মুসলমানদের

সহিত হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতীয় পার্লামেন্টে আবেগপূর্ণ ভাষণ পূর্ব বংগের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন পূর্ব বংগের বহু অংশেই ব্যাপক শোচনীয় ঘটনাবলী লক্ষিত হইয়াছে এবং ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ফকী, রাজসাহি, বরিশাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে গোলযোগ অন্তর্গত হইয়াছে।

৬ই মার্চ পণ্ডিত নেহরু বিমান যোগে কলিকাতায় পৌছেন ও-উদ্বাস্ত শিবির সমূহ পরিদর্শন করিতে থাকেন।

২২ই মার্চ কলিকাতায় তিন দিন থাকিয়া দিল্লী রওনা হন।

১০ই মার্চ বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বোষণ করেন যে পশ্চিম বংগ উদ্বাস্ত পুনর্বাসিত কার্যকে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার ন্যায় অগ্রাধিকার দিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৪ই মার্চ পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় আগমন ও কয়েক দিন ধরিয়া আশ্রয় শিবির পরিদর্শন।

১৭ই মার্চ—প্রধান মন্ত্রী পার্লামেন্টে বলেন, পূর্ববংগের হিন্দুগণ নিরাপত্তা বোধ করুন, ইহা আমাদের নিশ্চয়ই দেখিতে হইবে এং যদি তাঁরা নিরাপত্তা বোধ করিতে না পারেন, তাঁদের মধ্যে সেই নিরাপত্তা বোধ সঞ্চারিত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

তারপর এপ্রিলের আরম্ভে লিয়াকৎ আলিখান দিল্লী আসিয়া সপ্তাহ কাল নেহরুর সহিত পরামর্শে কাটান। আমরা ইঙ্গিতে বলিয়াছি, কেন তিনি এরূপ ব্যগ্র হইলেন পাক-ভারত চুক্তির জন্য। পশ্চিম বংগে মুসলমানদের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তা আমরা একটুও সমর্থন করি না এবং ইতিপূর্বে এই পত্রিকাতেই তা সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছি। তথাপি সত্যের খাতিরে একথা বলিতে বাধ্য যে, কোন সদৃশী ও সহপদেশে যা হয় নাই, লাঠোঁষধি দ্বারা তা সম্পন্ন হইয়াছে।

পাক-ভারত চুক্তি

বিগত ১০ই এপ্রিল তারিখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতীয় পার্লামেন্টে তাঁর ও লিয়াকৎ আলি খানের স্বাক্ষরিত চুক্তি টেবিলে স্থাপন করিয়া গভীর ভাবে একটি বক্তৃতা দেন। যে বিপদ ও অকল্যাণ সমগ্র

দেশকে বিশেষত বাংলাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তার উল্লেখ করিয়া বলেন, যে আদর্শ এতদিন তাঁর চোখের সামনে ছিল তা দূরে সরিয়া যাইতেছে। পণ্ডিত নেহরু জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমরা কি এইজন্য এত পরিশ্রম করিয়াছিলাম? এই জন্য কি জাতির জনকের শিষ্যত্ব করিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল?” নেহরু বলেন, উভয় মন্ত্রী যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণের দায়িত্ব অরণ করিয়াই করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গৃহ লোকপূর্ণ ছিল এবং নেহরুকে বহুবার সাধুবাদ করা হয়।

এখানে চুক্তিটির বিস্তৃত তাৎপৰ্য দেওয়া সম্ভব নহে। আমরা সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কথাগুলি বলিতেছি:—

(ক) উভয় গবর্নমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে উভয় দেশের সংখ্যালঘুগণ জীবন, কৃষ্টি, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মর্যাদা, প্রতিদেশে যথেষ্ট গমনের স্বাধীনতা ও পেশা, বক্তৃতা ও উপাসনার স্বাধীনতা ভোগ করিবেন।

স্ব স্ব দেশের সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিবার, রাষ্ট্রীয় বা অন্তর্গত চাকরী লইবার এবং সামরিক ও বেসামরিক কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্ণ সুযোগ সংখ্যালঘুদেরও থাকিবে।

সংখ্যালঘুগণ যে দেশে বাস করেন তাঁরা সেই দেশের রাষ্ট্রিক এবং তাঁরা নিজ দেশকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দিবেন।

(খ) বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমবংগে, আসাম ও ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল প্রদেশ হইতে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের সম্পর্কে উভয় গবর্নমেন্ট অদ্বীকার করিতেছেন যে,

(১) গমনাগমনের স্বাধীনতা ও যাত্রাপথের নিরাপত্তা রচিত হইবে।

(২) গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ যতদূর পারেন ততদূর অস্থায়ী সম্পত্তি (অলংকার সমেত) লইতে পারিবেন। প্রাপ্তবয়স্করা ১১০ ও শিশুরা ৭৫ টাকা সঙ্গে লইতে পারিবে।

(৩) ব্যক্তিগত অলংকার পত্রাদি বা অর্থাদি সঙ্গে লইতে না পারিলে তা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা চলিবে। ব্যাঙ্ক তার রসিদ দিবে। পরে ঐগুলি নিজ নিজ দেশে পাইবার ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

(৪) শুদ্ধ কর্মচারীরা কোন দিকে কোন প্রকার

হয়্যাণি করিতে পারিবে না। এক এক গবর্ণমেন্ট অল্প গবর্ণমেন্টে যোগাযোগ কর্মচারী মোতামেন রাখিবেন এই উদ্দেশ্যে।

(৫) স্থাবর সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তির অধিকার বিনষ্ট হইবে না। যদি, কাহারও অল্পপস্থিতিতে, তাঁর সম্পত্তি অল্প কর্তৃক অধিকৃত হয়, তবে তা ফেরৎ দিতে হইবে, যদি তিনি ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫০ মধ্যে ফিরিয়া আসেন। সে ব্যক্তি চাষী বা জমির মালিক হইলে, জমি ফেরৎ পাইবেন, যদি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫০ মধ্যে ফিরিয়া আসেন। যদি দেখা যায়, স্থাবর সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়, তা হইলে যথাযোগ্য সংখ্যালঘু কমিশনকে তা গোচর করিতে হইবে। পূর্বোক্ত সময়ে ফিরিয়া আসিলে সেই ব্যক্তির পুনর্বাসতির তার গবর্ণমেন্ট লইবেন।

(৬) যদি কোন উদ্বাস্ত নিজ প্রদেশে ফিরিয়া না আসেন, তা হইলে তাঁর সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি তাঁরই থাকিবে, এবং বিনিময় বা বিক্রয় দ্বারা তার ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য তাঁর থাকিবে। সংখ্যালঘুদের তিনজন প্রতিনিধি এবং গবর্ণমেন্টের একজন প্রতিনিধি সভাপতি লইয়া গঠিত কমিটি সম্পত্তির মালিকের ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করিবেন, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সরকার এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন। সরকার নিজ নিজ জিলা ও অন্য কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ দিবেন। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ এর পূর্বে পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতের যে কোন স্থানে গমনকারী এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা ত্রিপুরা হইতে পাকিস্তানে যে কোন স্থানে গমনকারী উদ্বাস্তর সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হইবে। বিহার হইতে পূর্ববঙ্গে আগত সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য।

(গ) পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান সরকার সম্মত হইতেছেন যে,

১। তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ও বিশৃংখলা যাতে আর না ঘটে তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন।

২। যারা প্রাণ, ধনসম্পত্তি নাশ ও অন্যপ্রকার অপরাধে অপরোধী তাদের শাস্তি দিবেন। দরকার হইলে পাইকারি জরিমানা আদায় হইবে ও বিশেষ আদালত বসান হইবে।

৩। লুণ্ঠিত সম্পত্তি উদ্ধারের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

৪। অপহৃত জীলোকদের উদ্ধারের জন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহ অবিলম্বে সংখ্যা মোতামেন করা হইবে।

৫। জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করণ গ্রাহ্য হইবে না। দাঙ্গার সময়ে ধর্মান্তর গ্রহণ ঐরূপ মনে করা হইবে।

৬। আধুনিক দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ নির্ণয় ও ভবিষ্যতে উহা পুনঃ সংগঠিত না হইবার জন্ত অল্পসম্মান কমিশন নিযুক্ত হইবে। সংখ্যালঘুদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের লইয়া কমিশন গঠিত হইবে। একজন হাইকোর্ট জজ উহার সভাপতি হইবেন।

৭। সংবাদপত্র, রেডিও বা ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত ক্ষতিকারক মতামত বন্ধ করিবার জন্ত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৮। এক দেশে অল্প দেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রচার বা যুদ্ধোৎসাহ দিতে দেওয়া হইবে না। ঐরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ ব্যক্তি বা সংঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

(ঙ) উদ্বাস্তদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্ত এবং তাঁরা যাতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করে সেজন্ত উভয় গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন : (১) দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্ত দুই গবর্ণমেন্ট দুজন মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন; পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ও আমাদের মন্ত্রিসমিতিতে একজন করিয়া সংখ্যালঘু মন্ত্রী নিয়োগ।

(চ) পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে একটি করিয়া সংখ্যা-লঘু কমিশন নিযুক্ত হইবে। ইহাদের গঠন ও কাজ নিম্নরূপ :—

(১) প্রত্যেক কমিশনে সংশ্লিষ্ট সরকারের একজন মন্ত্রী থাকিবেন ও সভাপতিত্ব করিবেন; এবং পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের ব্যবস্থাপক সভা হইতে এক একজন প্রতিনিধি কমিশনে নিয়োগ করা হইবে।

(২) কমিশনের যে কোন সভায় উভয় দেশের মন্ত্রীসভা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। মন্ত্রীরা দরকার বোধ করিলে একটি বা অধিক সংখ্যালঘু কমিশনের বৈঠক হইবে।

(৩) প্রত্যেক কমিশন নিজ কর্মচারী নিয়োগ ও কার্য প্রণালী স্থির করিবে।

(৪) জিলায় জিলায় সংখ্যালঘু বোর্ড স্থাপিত হইবে।

(৫) ১৯৪৮ ডিসেম্বর চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ কমিশন বাতিল হইল। দাখিল করিবেন এবং উহার নকল কেন্দ্রীয় সরকার দ্বয়ের নিকট পাঠাইবেন।

(৬) কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী দুইজন দরকার মত ব্যক্তি ও সংঘের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। (৯) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয় অনুমোদন করিলে ভারত ও পাকিস্তান সরকার এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার মন্তব্য সমূহ কাজে পরিণত করিবেন। উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ ঘটিলে বিষয়টি ভারত ও পাক প্রধান মন্ত্রীর বিবেচনায় আসিবে।

(৭) সংখ্যালঘু কমিশনের কাজ হইবে—

(ক) এই চুক্তি কতদূর কার্যকর হইতেছে এবং ভঙ্গ হইতেছে তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট দান।

(খ) কি কাজ করা দরকার সে সম্বন্ধে পরামর্শ দান।

(৮) প্রত্যেক কমিশনের স্ব সরকারের নিকট রিপোর্ট শীঘ্রই স্থাপন করিবেন। (১০) ত্রিপুরা সম্পর্কে একটি কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

২ই এপ্রিল ১৯৫০, সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৫০-৫১ সালের জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত পৃষ্ঠপোষক, পরিচালকবর্গ ও কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হয়।

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় ডাঃ শ্রীকলাসনাথ কাটজু,

ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারানী শ্রীযুক্তা সূচাক্ষ দেবী।

সভাপতি—শ্রীচাক্রচন্দ্র বিশ্বাস।

সহ-সভাপতি—শ্রীযুক্তা: হেমলতা ঠাকুর,

“ নীরপ্রভা চক্রবর্তী,

“ সূজাতা রায়,

রায় বাহাদুর শ্রীপুরুষোত্তম মুখার্জি,

ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী,

শ্রীকুরেশচন্দ্র রায়।

সাধারণ সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা মণীষা রায়,

সহ-সাধারণ সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা উমা দে,

মহিলা সমিতির সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা আরতি দত্ত,

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

সহ-কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্তা বাণী দাশ,

স্কুল-সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা প্রতিমা রায়।

কার্য-নির্বাহক সভার সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত দীপ্তি চ্যাটার্জি,	শ্রীবীরেন্দ্র সদয় দত্ত,
” সুধীরা মজুমদার,	” ফণীভূষণ দত্ত,
ডাঃ ফুলরেণু গুহ,	” জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ,
শ্রীযুক্ত হিমাংশুবালা ভাট্টা,	ডাঃ জে. সি. মুখার্জি,
” শীলা চ্যাটার্জি,	শ্রী অরবিন্দ সিংহ,
ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু,	” পার্থ চ্যাটার্জি,
শ্রীযুক্ত সুপ্রভা সেন,	” জানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
” সুধা মজুমদার,	” প্রফুল্লকুমার রায়,
” অশোকা গুপ্তা,	” যতীন্দ্রমোহন মজুমদার,
” হেমাদ্রিণী সেন,	” সুধাকান্ত দে,
” ভক্তিলতা চন্দ,	রায়বাহাদুর ডাঃ কে. এন. বাগচি।

পদাধিকার বলে—

শিল্প বিজ্ঞানসম্মেলন অধ্যক্ষ

ট্রেনিং বিজ্ঞানসম্মেলন অধ্যক্ষ

কলিকাতা কর্পোরেশনের ২জন প্রতিনিধি

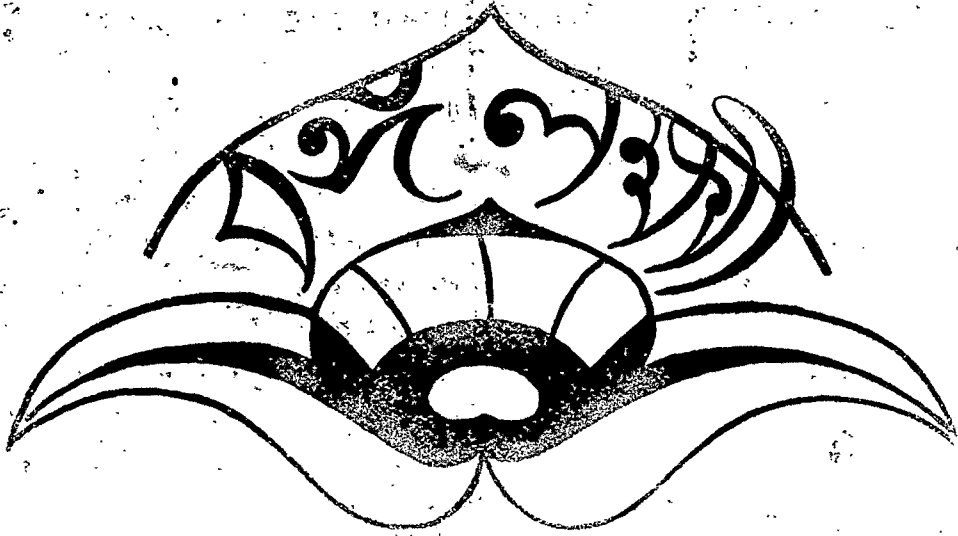
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিভাগের ১জন প্রতিনিধি

পঃ বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের ১জন প্রতিনিধি



Indian Fabrics
 CLASSIC SILK & COTTONS
 • BHOWANIPUR :: CALCUTTA •

ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্স (মিত্রমুখার্জী জুয়েলারের উপর তলা) ৩নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা। ফোন নম্বর ১২৭৮



২৫শ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭

৭ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ সন্তান

শ্রীকালিদাস নাগ

পরিবারে প্রথম জন্ম নিল যে সন্তান—সে ছেলে বা মেয়ে
যাই হোক—সে পেয়ে এসেছে অন্য সন্তানদের তুলনায় একটু
বেশী আদর বড়। এটা আমাদের দেশে সুপরিচিত; কিন্তু
বঙ্গ জননীর সর্ব জ্যৈষ্ঠ ও সব দিক দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান
রামমোহন রায় যে জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মেছিলেন তা কয় জন
মনে রাখে?

সে প্রায় ২০০ বছর আগেকার কথা। বৈষ্ণবদের এক
প্রাচীন তীর্থ খানাকুল কৃষ্ণনগরে (অভিরাম গোস্বামীর
পাঠ স্থান) রামমোহনের পিতা পিতামহদের ভিটা গড়ে
উঠেছিল; লাঙলপাড়া ও রাধানগর গ্রামে কয়েকবার গিয়ে
দেখেছি, কত বড় বড় বাড়ী ঘরের ধ্বংসাবশেষ, সবই যেন
কঙ্কালসার—মাছুষ থেকেও যেন জীবনমৃত! অথচ এই
খানেই প্রায় ১৮০ বছর আগে কৰ্মবীর ঔদ্যোগিক রামমোহন
জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও পিতামহের আমলের
বৈষ্ণব মন্দিরটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। টালীর উপর যে

লিপি খোদিত দেখেছি সেটি প্রায় পলাশী যুদ্ধের সময়কার
(১৭৫৭)। বহুদিন তাঁর আনন্দমঠে যে ভীষণ মনস্তরের বর্ণনা
করেছেন সে প্রায় রামমোহনের জন্ম বৎসরের কাছাকাছি
ঘটে (১৭৭০-৭৪)। জালিয়াৎ ক্লাইব বাঙালা থেকে প্রচুর টাকা
লুটে-ইংলণ্ডে ফিরে আত্মহত্যা করেছেন; ওয়ারেন হেস্টিংস
প্রথম গবর্নর জেনারেল হয়ে ইংরাজের সাম্রাজ্য বিস্তার ও
বহু সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত। অরাজক দেশে জোর
জুলুমই যেন আইনের পর্যায়ে উঠেছে। তার মধ্যে ১৭৮২
সালে ইতিহাস যেন হুসার দিয়ে উঠল ফরাসী বিপ্লবে। ক্রমশঃ
দেখা গেল নেপোলিয়ান ওয়েলিঙটন ও আরো কত যুদ্ধ
দুর্দ্দ-নেতা যাদের প্রচণ্ড প্রতাপে যেন পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল
(১৭৯০-১৮১০)। এই যুগে যার কৈশোর যৌবন কেটেছে
সেই রামমোহন হুগলী জেলার সেই গ্রাম পরিবেশের মধ্যেই
গভীর ভাবে সমাজের দুর্গতি জাতির লাঞ্ছনা সব দেখেছেন।
নিজের বৌদিকে সতীদাহ করেছে জোর করে—তার প্রতিকার

কহতে পারেন নি, শুধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন সত্যদাহ রোধ করতেই হবে। আজীবন সংগ্রাম করে রামমোহন এই বর্বর প্রথা রোধ করেছেন; নারী পেয়েছে তাঁর হাতে বাঁচবার অধিকার। তা ছাড়া নারীর শিক্ষা দীক্ষা ও সমাজ সেবায় সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার থাকা উচিত একথা রামমোহনই প্রথম প্রচার করেছেন। বাঙলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর সে রচনাগুলি পরম সম্পদ। পুত্রের সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত, অথচ তাই ধর্ম-পতীর কোন অধিকার নেই কেন? আইনজ্ঞ রামমোহন এ অস্থায়ের প্রতিবাদ যে সব প্রবন্ধে করেছেন গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী তাঁর জন্ত তৃপ্তি প্রাপ্তি করেছেন।

ধর্মের ক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন সে যুগের প্রথম সমদর্শী। মাতৃষের সাধারণ অধিকার সর্বত্র সমান, সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান; উচ্চ নীচ ভেদ বর্জন করে, নর নারীর ব্যবধান দূর করে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভিত্তিতে তিনি যে সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তা' নিজের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি; ১৮৩৩ সালে তিনি প্রবাসী হয়ে স্বদূর ব্রিষ্টল নগরে দেহ রক্ষা করেন। তার প্রায় ৭ বর্ষ পবে ১২৩৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বখন শতবার্ষিকী সভায় “ভারত পথিক রামমোহন” নামক তাঁর অর্ঘ্য পাঠ করছেন তখন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ প্রখ্যাত নারী-সেবিকাগণ উপস্থিত ছিলেন; এবং মহাত্মা গান্ধী ভারতের নারীশক্তিকে সজ্জবদ্ধ করে যে বিরাট আন্দোলন জাগিয়ে ছিলেন তার ফলেই ভারতে স্বাধীনতা এত শীঘ্র এল। অল্প অনেক সহকারী আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের পূর্ণাঙ্গিত্ব যে আমাদের সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে এটি আমরা এখনও না বসতে পারলেও ইংরাজ স্পষ্ট বুঝে চল এবং তাকে যে শৃঙ্খলমুক্ত করে ভারতকে ছেড়ে যেতে হবে তাও জেনেছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর একটু আগে

রামমোহন ইংলেণ্ডে বসেই দেখে গেলেন তিনি, ভারত মাতার উপযুক্ত সন্তান হয়ে, সত্যদাহ ধর্মযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন এবং যারা সত্যদাহ পুনঃ প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে পার্লামেন্টে আবেদন করেন তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। তাই ভারতের তথা এশিয়ার যাবতীয় নারীসমাজ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান উচিত অমর রামমোহনকে। তাঁর গ্রামবাসীরা রাধানগরে ও সম্প্রতি হুগলী আরামবাগে স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করেছেন। কিন্তু ঋতির শিক্ষায় বিশেষতঃ, নারী শিক্ষায় রামমোহনের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখারার ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁর জীবনী সরল বাংলা ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় রচনা করে বহুল প্রচার করা স্বাধীন ভাষাতত্ত্বের দায়িত্ব। রামমোহনের অপূর্ণ মন্বন্ত ও সাম্যবোধ দিবা আশীর্বাদে মত এদেশে এসেছিল বলেই আজ সর্বক্ষেত্রে ভারতের নব জাগ্রত নারী পুরুষের সঙ্গে একতালে এগিয়ে চলেছে। তাই ভারতের প্রতি ভাষায় তাঁর জীবন চরিত রচিত ও প্রচার হওয়া উচিত। প্রতি প্রদেশের নারী সমাজের এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব আছে এই কথাটি রামমোহনে এ জন্ম-মাসে বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকার ভিতর দিয়ে প্রচার করতে চাই। মহিলাদের পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যাটিতে রামমোহন রায়কে স্মরণ করে কবিতা প্রবন্ধাদি ছাপার ব্যবস্থা করা কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। বাংলা থেকে হিন্দী উড়িয়া প্রভৃতি অল্প দেশের ভাষাতেও রামমোহন-মার্গ ও নারী প্রগতির আলোচনা ক্রমশঃ বাড়তে পারে। বাংলাদেশের লেখিকা ও সমাজ-সেবিকাদের অগ্রণী হয়ে এ কাজে নামতে অহুতাশ করি। বহু নিন্দা উপেক্ষা করে ও নির্যাতন সহ্য করে রামমোহন ভারতের নারীত্বকে স্বকীয় গোরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, এই কথাটির প্রচার করুন স্বাধীন ভারতের নারী সমাজ; প্রতি নারী-শিক্ষালয়ে রামমোহন জীবনীর আলোচনার বন্দোবস্ত করুন এই প্রার্থনা।

“মন যাঁরে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে।

সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দিয়-বিষয় নয়,

যাঁহার বর্ণনে রয় শ্রুতি স্তম্ভভাবে।

ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ

ইচ্ছা মতে রাখে, ইচ্ছা মতে করে নাশ,

সেই সত্য, সব আর অসার এ ভবে॥”

—রাজা রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথের গানের রূপ

শ্রীজয়দেব রায়, এম-এ, বি-কম, বি-এস-সি

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের বাউল গানের সুরের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“কবির বাউলের সুরই একমাত্র গান, যাহা গ্রাম্য কৃষক হইতে অভিজাত কলিকাতা নিবাসিনী সকলেরই ভাল লাগিতে বাধ্য।”

তাহার মত অনুসারে রবীন্দ্রনাথের বাউলকে অত্যন্ত গানের ছায় চারতুকে ভাগ করা সম্ভব না হইলেও, গানের মধ্যে তিনটি পূর্ণক সুরাংশ পাওয়া যায়—আদি-মধ্য এবং অন্ত। এই তিনটি সুর রবীন্দ্র বাউলের বিশেষত্ব।

তাহার বাউল গানেও ভারতীয় বিভিন্ন রাগরাগিণীর ছায়াপাত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে যাহাদেব প্রভাব সহজে সুরের মধ্যে ধরা যায়, তাহারাই ভৈরবী, বেহাগ, ঈশান, ভীমপলশ্রী ভৈরবী, কালাংড়া, পিলু, মল্লার। জাতীয় ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাউলের সঙ্গে তিনি কীর্তনের ভঙ্গিও মিশাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে ‘ভৈরবী’ সিদ্ধ বা ভৈরবী সাধক’ বলা হইয়া থাকে। রাগরাগিণীর মধ্যে ‘ভৈরবী’ ছিল তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সুর, তাহার অধিকাংশ গানেই ভৈরবীর উদাস ভাবের প্রভাব রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা হইতেই রাগসঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু হিন্দী রাগপ্রধান গানের বাণীর হীনতা তাহার কবিরসকে দুঃখ দিয়াছিল। ‘তেলেনা’ প্রভৃতি গানের অর্থহীন প্রলাপের পরিবর্তে তাহার কাব্যময় গানগুলিকে আমরা পাইতেছি। তাহার রাগসঙ্গীতের বিশেষত্ব শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর মতে এইগুলি—

- (১) স্বাধীনতা (গায়কের) অপহরণ
- (২) সুরের মুক্তি
- (৩) বাণীর প্রাধান্য
- (৪) European style এর সমশ্রেণী
- (৫) কাঠামোর পরিবর্তন!

আমি পরে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার এই শ্রেণীর গানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যাহা ওস্তাদী মহলের ক্ষোভের বিষয়, তাহা হইতেছে “পুরাতন নিয়মের ভঙ্গ করিয়া তানের স্বল্পতা!”

ফরাসী সঙ্গীত শিক্ষক ড্যানিয়েল সাহেব পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন “গায়কের স্বাধীনতা”কে; রবীন্দ্র সঙ্গীতে গায়কের এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজে গাহিবার সময় তাহার গানে সুর বিস্তার এবং তান প্রয়োগ করিভেন, এখন তাহার সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে হইলে প্রতিপদে তাহার সুরকে অনুকরণ করা ব্যতীত কোন উপায় নাই।

গানের Practical সুরপরীক্ষা সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। মিশ্র একটি গানের সুরের সঙ্গে অন্য গানের সুর মিশ্রণ হইয়া যাইবে এই ভয়টি তাহার ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের সংমিশ্রণে তাহার গান। কিন্তু এক শ্রেণীর গানে কথাটি তাহার হইলেও সুরটি তাহার সৃষ্ট নয়; প্রচলিত গানের সুরে কথা বসান। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই গানগুলিকে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসঙ্গীত বলিতে চাহেন না। তিনি এইগুলির নামকরণ করিয়াছেন—“অঙ্করবীজ সঙ্গীত”। কাশীর বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য সর্বপ্রথম এই ধারার গানের প্রবর্তনা করেন। নানা রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের গানে একটি বিশেষত্ব; মিশ্ররাগে কোমল রে তাহার বহু গানেই আছে—যেমন, “কত যে তুমি মনোহর” এবং “কোথা যে উধাও হলো” (মল্লার) এই গান দুইটির গাহিবার ভঙ্গিটির সুবিধার জন্য তিনি অতি সুন্দর প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তাহার গান যে বাণীপ্রধান, এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় তাহার গানের নাটকীয়তার অত্যধিক প্রভাব সম্বন্ধেও ইঙ্গিত

করিয়াছেন; তাঁহার ভাষায়—“অনেক কাব্যের আবেগ স্রবের সহযোগিতায় সহজেই ফুটে ওঠে, তাই আবৃত্তি করলে এমন অনেক কবিতাকে হয়ত গান মনে হয় না, যাদেরকে ঠিক মতন সুরে বসালেই গানের রস মিলে। রবীন্দ্রনাথেরই ‘দেশ দেশ নন্দিত করি’ ‘হিংসায় উন্নত পৃথি’, ‘মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন’ প্রভৃতি লঘুগুরু ছন্দের কবিতায় এ কথার বাথার্থ্য প্রমাণ হবে—কেন না স্রবের গুণে এ ‘অর্গান’ বর্গীয় কবিতাগুলিও খাঁটি গান হয়ে উঠেছে। এতেও যদি কারুর

সংশয় না ঘোচে তবে তিনি যেন শুধু রবীন্দ্রনাথের হাল আমলের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাটিকায় গানগুলি পড়ে তাদের স্বরলিপি বাছিয়ে দেখেন। এ গীতি নাটিকার কবিতাগুলি অপেরা সঙ্গীতের চালে রচিত থানিকটা।”

‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’র অভিনয় আংশ গীতি কবিতার ছন্দে রচিত নয়, গানের পংক্তিশেষে মিলও নাই, কিন্তু স্রবময় পরিণত হইলে তাহার এই চূড়ান্ত মোটেই মনে হয় না! যেমন—

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী।

নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।

পূজা করি মোরে রাখিবে উর্দ্ধে

সে নহি নহি,

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে

সে নহি নহি।

যদি পার্থে রাখো মোরে

সঙ্কটে সম্পদে,

সম্মতি দাও যদি কঠিন ত্রুতে

সহায় হোতে

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

আজ শুধু করি নিবেদন

আমি চিত্রাঙ্গদা

রাজেন্দ্রনন্দিনী।

সুর আবেশটি আনিবার জন্ত এই শ্রেণীর গান যত্নকণ্ঠে ‘বিলম্বিত লয়ে’ গাহিতে হইবে, ‘দ্রুত লয়ে’ গাহিলে নাটকীয়তা প্রকাশ পাইবে না।

I [{ সা সা সা - ন | রা - ন - সা রমা | যা - ন - জ্ঞা - ন | - ন - ন ¹¹ (জ্ঞা মা I
আ মি চি . জ্ঞা . জ্ঞ . গ . দা আ মি

I মা পা - ন পা | পা - মা - পা ধা | পা - ন - ন - ন | - ন - ন I মা পা পা
রা জে ন্ দ্র . ন . ন্ দি . নী ন হি দে

-মা | পর্য - পা ধা পা | ধা ধা - পা পা | মপা - ধপা মা - জ্ঞা) } I
. বাঁ . . ন হি সা মা . ত্রা . ন রা .

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের গানগুলিকে আমার বিশেষ নটকীয় বলিয়া মনে হয় না, তবে ‘বান্দ্যকি প্রতিভা’র

কোন কোন গানের মধ্য দিয়া যদিও এই অভিনয় ভঙ্গী প্রকাশিত হইয়াছে। নৃত্যনাট্যের গানগুলি কিন্তু

Dramatic ভঙ্গী। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাণী আজ সার্থক হইয়াছে—“আমাদের দেশে নাট্য সঙ্গীত নাই। যেমন কাব্যের চরমোৎকর্ষ নাটক, তেমনি সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ নাট্যসঙ্গীত। নাট্যসঙ্গীত অতি কঠিন ব্যাপার; ইহাতে সুরের ও স্বভাবের সমীচীন অনুধাবন ও সমূহ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। মানব মনের সমুদায় আবেগ ও বাহ্য জগতের যে সকল শব্দময়ী ঘটনার সহিত মানবীয় কাণ্ডের সম্বন্ধ থাকে, তৎসমূহ সুরে প্রকাশপূর্বক শ্রোতার মনে ভ্রান্তি উৎপাদন করা নাট্য সঙ্গীতের কার্য।”

সঙ্গীতের আলোচনা আমাদের দেশে নূতন নয়। ‘ভারতের নাট্যশাস্ত্র’ হইতে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের আলোচনা রসগ্রহণের সহায়তা করিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, দর্শন, নাট্য, কাব্য, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে বহুতর আলোচনা বহুদিন হইতেই চলিতেছে, কিন্তু আমাদের নিকট তাঁহার যে শ্রেষ্ঠ পরিচয় ‘রবীন্দ্র সঙ্গীত’ সেই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখনও হয় নাই! তাঁহার গানের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বাহা সামান্য দুই এক কথা বলা হইয়াছে তাহাও অসামান্য কথা! “পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র” এই বিষয়ে বড় বড় উক্তি ব্যতীত কিছুই নয়। ইহা আমাদের রসগ্রহণের সহায়তা অপেক্ষা অস্পষ্ট তাই আনে! তাঁহার সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীধুজ্জী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ কুমার রায় শ্রীমণিলাল সেনশর্মা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী অতি সামান্যই লিখিয়াছেন, তাঁহার এবং দিহু ঠাকুরের লেখা আমার নিকট প্রামাণ্য মনে হয়।

ধুজ্জী বাবু বড় পণ্ডিত এবং সঙ্গীতের নাম করা ‘রসিক সমজদার’ বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু হৃৎকের সঙ্গে স্বীকার করিব ‘রবীন্দ্র সঙ্গীত’ রসগ্রহণে তাঁহার মতামত বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে না! তিনি সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব জানিলেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার কোন উক্তিই স্পষ্ট নয় এবং মতামত প্রকাশে তিনি এতই কুণ্ঠিত যে, তাঁহার যুক্তিও গ্রহণ করিতে সাহস হয় না! “কথা ও সুর” নামে তাঁহার প্রসিদ্ধ বইটি কেবল অলস

বাক্যজাল এবং বাগাড়ম্বরে পূর্ণ। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রযোগে তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অল্প সারস্ব আছে! এই পত্রালোচনায় অবশ্য ধুজ্জী বাবুর অংশ সামান্যই!

শ্রীযুক্ত দিলীপ বাবুর কথা স্বতন্ত্র; সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সর্বজন খ্যাত এবং রবীন্দ্রনাথের তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের প্রতি তাঁহার অন্ধ ভক্তি আমাদের পক্ষে তাঁহার আলোচনার অন্তরঙ্গ। তাঁহার সঙ্গীতিকী বই খানি সম্পূর্ণ কথা ও সুরের স্বগোত্র, অলস বাক্যজালে পরিপূর্ণ; এমন কি তিনি নিজেই কি বলিতে সুরু করিয়াছিলেন, তাহাও মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধে তাঁহার বিক্ষিপ্ত মতামত গুলি নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিলে অবশ্য তাহা মূল্যবান হইবে! তাঁহাকে অনুবোধ করি রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্ত!

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ শান্তি নিকেতনে বাল্য বয়স হইতে রচনাছেন, তাঁহার রবীন্দ্র সঙ্গীত বইটি নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু পঙ্কভাষা এবং সূক্ষ্ম সূত্রগ্রহি তাঁহার আলোচনাকে আভিধানিক Catalogue এ পরিণত করিয়াছে!

তাঁহার গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের যে সকল মতামত নানা পত্রে প্রবন্ধে গানে এবং কথা সাহিত্যে ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত আছে সেইগুলিই রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ পরিচয়! কবি নিজের মনোভাব এবং সুরাকৃতির সম্বন্ধে নিজেই যে কথা বলিয়াছেন, অল্প কেহ নিশ্চয় তাহা বলিতে পারিবেন না!

ধুজ্জী বাবুর সঙ্গে পত্রালোচনায় কবি বলিতেছেন “যে সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই লিখিনি, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মাষ্টার পীস্টা সেই অলিখিত রচনা রত্ন-ভাণ্ডারগারে রহে গেল! আমার সব মত যদি নিজেই স্পষ্ট করে লিখে দিইয়া যাই তবে যারা থীসিস্ লিখে খ্যাতি অর্জন করবে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে।

সেই সব অনাগত কালের থীসিস্ রচয়িতার কল্পছবি আমার মনের সামনে ভাসছে তারা একাগ্রচিত্তে অতীতের আবর্জনারুণ্ড থেকে জীর্ণ বাণীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের করে তার ঘণ্ট তৈরি করছে, যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না, সেইটেতেই

তাদের মহোন্মাদ। আমি, তাদের আশীর্বাদ ভাঙন
হোতে চাই।

‘গীতাঞ্জলি’র যুগ হইতে তিনি তাঁহার গানে খুব রাগিনী
এবং ছন্দ নির্দেশ করিতেন না। তাঁহার মনে হইয়াছিল
তাঁহার স্বর তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি, প্রচলিত রাগ রাগিনী
অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এই ধারণা তাঁহার ভুল।

ইহার ফলে তাঁহার গানে যথেষ্টাচারের স্বযোগ
হইয়াছে। সামান্যের বিশ্বাস হইয়াছে তাঁহার এই যুগের
গানে বিশেষ স্বর নাই; গায়ক সমাজের বিপদ হইয়াছে মূল
রাগিনীর অন্তরগণ, সঙ্গতকারীর ছন্দ সৃষ্টিতে বাধা হইয়াছে;
ওস্তাদগণ তাঁহার গান সম্বন্ধে কটুক্তি করিবার স্বযোগ
পাইয়াছেন।

“সব শেষে নিজের গান সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।
মায়ের মায়ের গান রচনার নেশায় যখন আমি কৈ পেয়েছি তখন
আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে ডুবিয়া গেছি। আমি যদি
ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল
দ্রুত গানের আলাপ করতে পারতুম তাহা হইত নিশ্চয়ই সুখ
পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে
সৃষ্টি দেবার যে আনন্দ সে তাঁর চেয়ে গভীর।

সে গান শ্রেষ্ঠতায় পূর্ণ। যুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়,
কিন্তু আপন সত্যার্থ্য সে সমাদরের যোগ্য। নৈমিত্তিক যুগের
মধ্যে দিয়ে এই আশ্রয় সত্য প্রকাশের আনন্দধারণ যেন
প্রবাহিত হতে থাকে এইটাই বাস্তবীয়।
গানের স্বর ব্যতীত যে Mute Expression মনকে
অনুভূতি দেয় সেই উচ্ছ্বাসকে সুস্পষ্ট করে বাণী অংশ।
Sentiment প্রকাশই যখন সলিত অলার প্রথম এবং প্রধান
উপায় তখন বাণীর প্রয়োজন হয় না, একা স্বরই স্বয়ং প্রকাশ
করিতে পারে। বাণীর প্রয়োজন সেইখানেই যখন
Abstract Concrete shape লইয়া অনুভূতি অতীত
চিরস্থায়ী রূপলাভ করিয়া রম্যোত্তীর্ণ হইবে।

যুগ সঙ্গীতে এই Mute Music আমাদের অভিজ্ঞত করে,
কিন্তু শেষ হইবার মাত্র তাঁহার সম্পূর্ণতা। কিন্তু গানের বেশ
অনেকক্ষণ মনে বাজিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রধান
সঙ্গীতের সহিত হিন্দী মূল রাগ রাগিনীর ও ঠিক সেই
ই পার্থক্য।

“প্রথম বয়সে আমি ছন্দ ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা

করো। আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পণ্ডিত
বয়সের গান ভাব বাংলাবার জন্তে নয় রূপ দেবার জন্ত।
তৎসংল্লিখিত কাব্যগুলিও ‘অধিকাংশই’ রূপের বাহন। ‘কেন
বাজাও কাঁকণ কন কন কত ছল ভরে’ এতে বা প্রকাশ
পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা।

ভাব প্রকাশে ব্যর্থত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে রূপ প্রকাশ
অহৈতুক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কারা
হাসির সম্পর্ক দেখিনে, তাতে দেখি গীতরূপের গভীরতা।
যে বিলাসীরা টপ্পা, তুংরী বা মনোহর সাহী কীর্তনের
অশ্রু-অজ্ঞ অতিমিত্ততার চিহ্ন বিগলিত করতেন ‘চাঁপ’ এ গান
তাদের জন্ত নয়। আটের প্রধান আর্নন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ
তা ব্যক্তিগত রাগদ্বৈষ হর্ব শোক থেকে মুক্তি দেবার জন্তে।
সঙ্গীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরবোতে, তোড়িতে,
কল্যাণে কানিড়ায়।

রবীন্দ্র স্বরমানসের কাটা মাটিতে বাহার তাঁহাদের
প্রভাব বীজ স্থাপন করিয়াছিলেন পরবর্তী যুগের স্বর অরণ্য
তাঁহাদের নাম সম্পূর্ণ চারাইয়া যায় নাই; যখননা ‘ভট্টাচার্য্য
মহাশয় তাঁহারই একজন। তিনি ছিলেন জোড়পানি
ঠাকুর বাড়ীর গায়ক; রাগ রাগিনীর মূলভাবটি বিশ্লেষণের জন্ত
তিনি হিন্দীতে যে সকল গান রচনা করিতেন রবীন্দ্রনাথ
এবং তাঁহার অত্যাশ্রয় হইয়া সেই গানেরই বাংলায় অন্তরবাদ
করিতেন। এই প্রকারের একটি প্রসিদ্ধ গান (বাহার তৈত্তরী)

যত তট রচিত—আজু বহত সুগন্ধ পবন
রবীন্দ্র সঙ্গীত—আজি বহিছে বসন্ত পবন স্তম্ভন
যতনাথ ভট্টাচার্য্যের একটি বিখ্যাত গান (ভৈরবী;
সুরকান্তা) “নাদ পরম বিদ্যা” রচনায় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—
নাদ পরম বিদ্যা দেহি ভবানী নিশি দিয় মাক তুথে
রাগ তাল বাণী।

সুতরানুগ ভূজের রঙ্গ যুগল বাণী গাবে বাজারে
জয় জয় শিবরানী।
আগম নিগম গণেশ নারদ শূলপাণি বিরিকি,

আদি মুনি জন পূজে জোড়পানি।
ইয়ে নাহি অস্ত কোহিল জাবে ভবানী আপনি এ যশ
রূপা কীল্লো মুঢ়ে করো জ্ঞানী॥
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের ‘সুখ বেলাওল’ রাগিনী
কাঁপতালে রচিত একটি ব্রহ্ম সঙ্গীতের মূল ও যত ভট্টের একটি

গান হইতে। গানটিতে জ্যোতিষ্কাকর একমাত্র একগুণার
কথাটি ব্যতীত আর কোন সম্পূর্ণ বাংলা ভিত্তিক ও ব্যবহার
করেন নাই।

জয় পরম শুভ, সদন ব্রহ্ম সনাতন।

করুণার সাগর কলুষ নিবারণ।

জয় বিশ্বপাতা অনন্ত বিধাতা

জয় জয় দেব দেবেশ জীবের জীবন।

বাঙ্গালীর গতঃ ফুটিল সর্বল স্বরঃ অটাই হিন্দুস্থানীর
অগ্রকরণে বাংলা গান রচনা করিতেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতের
অধিকাংশ গানেই জঙ্ক এই ভাষা বাঙ্গালীর নিজস্ব
সঙ্গীত ছিল কীৰ্ত্তন-রূপ প্রভৃতি লোক সঙ্গীত; অভিজাত
স্বর রসিকগণের নিকটতঃ ছিল অন্ত্যজ; সুতরাং সঙ্গীত
বলিতে হিন্দুস্থানী গানকে ব্রহ্মসঙ্গীত বলা হইত।

হিন্দুস্থানী গানে ছিল স্বরের একাধিপত্য; স্বরের নিজস্ব
রূপ প্রকাশ ব্যতীত তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না।
কিন্তু শালা স্বরের আড়ালের ভাবটিকে না দেখিতে পাইলে
রসভূষণ হইত না; এই তাগিদে ফলেই হিন্দী গানের বাংলা
রূপ গ্রহণের সময় স্বর অটারা তাঁহাদের কবিশক্তির প্রয়োগ
করিতে লাগিলেন। বঙ্গবাসী স্বর রসিক নয়, তাঁহাদের
প্রিয় কাব্য রস; স্বরের নিজস্ব প্রকাশ উক্তি তাঁহাদের নিকট
বিশেষ সমাদর কখনও পায় নাই, কাব্যকে সজ্জিত করিতে
যতটুকু গীতি কলার প্রয়োজন, তাঁহারা ততটুকুই গ্রহণ
করিতে আগ্রহী।

“হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সংগীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু
বঙ্গভ্রমক কলরু ও সংগীতের স্থানলন ঘটিয়াছে। গানের
যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য একটি স্বাধীন পরিণতি, তাহা এদেশে
স্থান প্রায় নাই। কাব্যকে অঙ্গুরের মধ্যে ভালো করিয়া

ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এ দেশে সংগীতের অবতারণা
হইয়াছিল। কবি কর্তৃক চণ্ডী অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বড়ো বড়ো
কাব্য ও স্বর সহকারে সব সাধারণের নিকট পঠিত হইত।

বৈষ্ণব কবিরিগের গান গুলিও কাব্য, কেবল চারিদিকে
উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার জন্য স্বরগুলি তাহাদের ডানাস্বরূপ
হইয়াছিল। কবিরিগের কাব্য রচনা করিয়াছেন স্বর তাহাই
ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

বাঙ্গালী শ্রোতারিগের পদ খেয়ালের স্বর রস কখনও গ্রহণ
করিতে পারে নাই। তাহাদের নিকট সমাদর পাইয়াছে
একমাত্র শোরীর টপ্পা। হিন্দুস্থানী গানের অবোধা বাণী
ভারি হয় বোধ হয় বঙ্গবাসীর রস গ্রহণের অস্বস্তি অস্তুরায়;
ভারতীয় সঙ্গীত কখনও স্বরের পায়ে বেড়ি দেয় নাই; স্বর
চিরকালই নিজস্ব খেয়ালে প্রবাহিত; সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত
যেকোনো তাহাই শ্রোতাকে মুগ্ধ করিবে এই ছিল আদর্শ।
বিবিধ ভাষায়—

হিন্দুস্থানী গানে কথা এতটুকু যুগ সামান্য যে তাহাতে
আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না—নন্দিয়া গগরিয়া
চুনকিয়া আমরা কানে শুনিয়া যাই মাত্র; কিন্তু সংগীতের
সহস্র বাহিনী নির্যাসিগে সেই সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলব্ধির
বৃত্তে পরিণত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ণ
সৌন্দর্য্য বেগ; এক অনির্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার
করিয়া দেয়। সামান্যত পাথরের হুড়ি বাগকের খেলনা
মাত্র। হিন্দী গানের কথাও সেইরূপ ছেলে খেলা, কিন্তু
নির্যাসের তলে সেই হুড়িগুলি ঘাতে প্রতিঘাতে জলস্রোতকে
মুগ্ধিত করিয়া তোলে, বেগবান প্রবাহকে বিবিধ বাধা দ্বারা
উচ্ছ্বসিত করিয়া অপরূপ বৈচিত্র্য দান করে।”

লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক মণ্ডলী দায়ী নহেন।

১৯৬ ১৯৭১ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০ ১০০১ ১০০২ ১০০৩ ১০০৪ ১০০৫ ১০০৬ ১০০৭ ১০০৮ ১০০৯ ১০১০ ১০১১ ১০১২ ১০১৩ ১০১৪ ১০১৫ ১০১৬ ১০১৭ ১০১৮ ১০১৯ ১০২০ ১০২১ ১০২২ ১০২৩ ১০২৪ ১০২৫ ১০২৬ ১০২৭ ১০২৮ ১০২৯ ১০৩০ ১০৩১ ১০৩২ ১০৩৩ ১০৩৪ ১০৩৫ ১০৩৬ ১০৩৭ ১০৩৮ ১০৩৯ ১০৪০ ১০৪১ ১০৪২ ১০৪৩ ১০৪৪ ১০৪৫ ১০৪৬ ১০৪৭ ১০৪৮ ১০৪৯ ১০৫০ ১০৫১ ১০৫২ ১০৫৩ ১০৫৪ ১০৫৫ ১০৫৬ ১০৫৭ ১০৫৮ ১০৫৯ ১০৬০ ১০৬১ ১০৬২ ১০৬৩ ১০৬৪ ১০৬৫ ১০৬৬ ১০৬৭ ১০৬৮ ১০৬৯ ১০৭০ ১০৭১ ১০৭২ ১০৭৩ ১০৭৪ ১০৭৫ ১০৭৬ ১০৭৭ ১০৭৮ ১০৭৯ ১০৮০ ১০৮১ ১০৮২ ১০৮৩ ১০৮৪ ১০৮৫ ১০৮৬ ১০৮৭ ১০৮৮ ১০৮৯ ১০৯০ ১০৯১ ১০৯২ ১০৯৩ ১০৯৪ ১০৯৫ ১০৯৬ ১০৯৭ ১০৯৮ ১০৯৯ ১১০০ ১১০১ ১১০২ ১১০৩ ১১০৪ ১১০৫ ১১০৬ ১১০৭ ১১০৮ ১১০৯ ১১১০ ১১১১ ১১১২ ১১১৩ ১১১৪ ১১১৫ ১১১৬ ১১১৭ ১১১৮ ১১১৯ ১১২০ ১১২১ ১১২২ ১১২৩ ১১২৪ ১১২৫ ১১২৬ ১১২৭ ১১২৮ ১১২৯ ১১৩০ ১১৩১ ১১৩২ ১১৩৩ ১১৩৪ ১১৩৫ ১১৩৬ ১১৩৭ ১১৩৮ ১১৩৯ ১১৪০ ১১৪১ ১১৪২ ১১৪৩ ১১৪৪ ১১৪৫ ১১৪৬ ১১৪৭ ১১৪৮ ১১৪৯ ১১৫০ ১১৫১ ১১৫২ ১১৫৩ ১১৫৪ ১১৫৫ ১১৫৬ ১১৫৭ ১১৫৮ ১১৫৯ ১১৬০ ১১৬১ ১১৬২ ১১৬৩ ১১৬৪ ১১৬৫ ১১৬৬ ১১৬৭ ১১৬৮ ১১৬৯ ১১৭০ ১১৭১ ১১৭২ ১১৭৩ ১১৭৪ ১১৭৫ ১১৭৬ ১১৭৭ ১১৭৮ ১১৭৯ ১১৮০ ১১৮১ ১১৮২ ১১৮৩ ১১৮৪ ১১৮৫ ১১৮৬ ১১৮৭ ১১৮৮ ১১৮৯ ১১৯০ ১১৯১ ১১৯২ ১১৯৩ ১১৯৪ ১১৯৫ ১১৯৬ ১১৯৭ ১১৯৮ ১১৯৯ ১২০০ ১২০১ ১২০২ ১২০৩ ১২০৪ ১২০৫ ১২০৬ ১২০৭ ১২০৮ ১২০৯ ১২১০ ১২১১ ১২১২ ১২১৩ ১২১৪ ১২১৫ ১২১৬ ১২১৭ ১২১৮ ১২১৯ ১২২০ ১২২১ ১২২২ ১২২৩ ১২২৪ ১২২৫ ১২২৬ ১২২৭ ১২২৮ ১২২৯ ১২৩০ ১২৩১ ১২৩২ ১২৩৩ ১২৩৪ ১২৩৫ ১২৩৬ ১২৩৭ ১২৩৮ ১২৩৯ ১২৪০ ১২৪১ ১২৪২ ১২৪৩ ১২৪৪ ১২৪৫ ১২৪৬ ১২৪৭ ১২৪৮ ১২৪৯ ১২৫০ ১২৫১ ১২৫২ ১২৫৩ ১২৫৪ ১২৫৫ ১২৫৬ ১২৫৭ ১২৫৮ ১২৫৯ ১২৬০ ১২৬১ ১২৬২ ১২৬৩ ১২৬৪ ১২৬৫ ১২৬৬ ১২৬৭ ১২৬৮ ১২৬৯ ১২৭০ ১২৭১ ১২৭২ ১২৭৩ ১২৭৪ ১২৭৫ ১২৭৬ ১২৭৭ ১২৭৮ ১২৭৯ ১২৮০ ১২৮১ ১২৮২ ১২৮৩ ১২৮৪ ১২৮৫ ১২৮৬ ১২৮৭ ১২৮৮ ১২৮৯ ১২৯০ ১২৯১ ১২৯২ ১২৯৩ ১২৯৪ ১২৯৫ ১২৯৬ ১২৯৭ ১২৯৮ ১২৯৯ ১৩০০ ১৩০১ ১৩০২ ১৩০৩ ১৩০৪ ১৩০৫ ১৩০৬ ১৩০৭ ১৩০৮ ১৩০৯ ১৩১০ ১৩১১ ১৩১২ ১৩১৩ ১৩১৪ ১৩১৫ ১৩১৬ ১৩১৭ ১৩১৮ ১৩১৯ ১৩২০ ১৩২১ ১৩২২ ১৩২৩ ১৩২৪ ১৩২৫ ১৩২৬ ১৩২৭ ১৩২৮ ১৩২৯ ১৩৩০ ১৩৩১ ১৩৩২ ১৩৩৩ ১৩৩৪ ১৩৩৫ ১৩৩৬ ১৩৩৭ ১৩৩৮ ১৩৩৯ ১৩৪০ ১৩৪১ ১৩৪২ ১৩৪৩ ১৩৪৪ ১৩৪৫ ১৩৪৬ ১৩৪৭ ১৩৪৮ ১৩৪৯ ১৩৫০ ১৩৫১ ১৩৫২ ১৩৫৩ ১৩৫৪ ১৩৫৫ ১৩৫৬ ১৩৫৭ ১৩৫৮ ১৩৫৯ ১৩৬০ ১৩৬১ ১৩৬২ ১৩৬৩ ১৩৬৪ ১৩৬৫ ১৩৬৬ ১৩৬৭ ১৩৬৮ ১৩৬৯ ১৩৭০ ১৩৭১ ১৩৭২ ১৩৭৩ ১৩৭৪ ১৩৭৫ ১৩৭৬ ১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৩৭৯ ১৩৮০ ১৩৮১ ১৩৮২ ১৩৮৩ ১৩৮৪ ১৩৮৫ ১৩৮৬ ১৩৮৭ ১৩৮৮ ১৩৮৯ ১৩৯০ ১৩৯১ ১৩৯২ ১৩৯৩ ১৩৯৪ ১৩৯৫ ১৩৯৬ ১৩৯৭ ১৩৯৮ ১৩৯৯ ১৪০০ ১৪০১ ১৪০২ ১৪০৩ ১৪০৪ ১৪০৫ ১৪০৬ ১৪০৭ ১৪০৮ ১৪০৯ ১৪১০ ১৪১১ ১৪১২ ১৪১৩ ১৪১৪ ১৪১৫ ১৪১৬ ১৪১৭ ১৪১৮ ১৪১৯ ১৪২০ ১৪২১ ১৪২২ ১৪২৩ ১৪২৪ ১৪২৫ ১৪২৬ ১৪২৭ ১৪২৮ ১৪২৯ ১৪৩০ ১৪৩১ ১৪৩২ ১৪৩৩ ১৪৩৪ ১৪৩৫ ১৪৩৬ ১৪৩৭ ১৪৩৮ ১৪৩৯ ১৪৪০ ১৪৪১ ১৪৪২ ১৪৪৩ ১৪৪৪ ১৪৪৫ ১৪৪৬ ১৪৪৭ ১৪৪৮ ১৪৪৯ ১৪৫০ ১৪৫১ ১৪৫২ ১৪৫৩ ১৪৫৪ ১৪৫৫ ১৪৫৬ ১৪৫৭ ১৪৫৮ ১৪৫৯ ১৪৬০ ১৪৬১ ১৪৬২ ১৪৬৩ ১৪৬৪ ১৪৬৫ ১৪৬৬ ১৪৬৭ ১৪৬৮ ১৪৬৯ ১৪৭০ ১৪৭১ ১৪৭২ ১৪৭৩ ১৪৭৪ ১৪৭৫ ১৪৭৬ ১৪৭৭ ১৪৭৮ ১৪৭৯ ১৪৮০ ১৪৮১ ১৪৮২ ১৪৮৩ ১৪৮৪ ১৪৮৫ ১৪৮৬ ১৪৮৭ ১৪৮৮ ১৪৮৯ ১৪৯০ ১৪৯১ ১৪৯২ ১৪৯৩ ১৪৯৪ ১৪৯৫ ১৪৯৬ ১৪৯৭ ১৪৯৮ ১৪৯৯ ১৫০০ ১৫০১ ১৫০২ ১৫০৩ ১৫০৪ ১৫০৫ ১৫০৬ ১৫০৭ ১৫০৮ ১৫০৯ ১৫১০ ১৫১১ ১৫১২ ১৫১৩ ১৫১৪ ১৫১৫ ১৫১৬ ১৫১৭ ১৫১৮ ১৫১৯ ১৫২০ ১৫২১ ১৫২২ ১৫২৩ ১৫২৪ ১৫২৫ ১৫২৬ ১৫২৭ ১৫২৮ ১৫২৯ ১৫৩০ ১৫৩১ ১৫৩২ ১৫৩৩ ১৫৩৪ ১৫৩

রাজ-সন্মান

শ্রীবাণী দাস

উঃ! কতক্ষণ তাকে দাঁড়িয়ে থাকাতে হচ্ছিল, আর কি কষ্টকর সেই দাঁড়ান।

পুরো আধঘণ্টা সে তার হৃদয়ের মোকার উপর পায়চারী করল, আর প্রত্যেকবারই ঘোরবার সময় শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন রকম সাড়াশব্দই সে পেল না। আবার সেই ঘরের মধ্যে একঘেয়ে পায়চারী আরম্ভ হল। সেই ছোট দরজার সামনে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আওয়াজ শোনবার চেষ্টা—আর মুখে স্বপ্ন উদ্বেগের চিহ্ন। কিন্তু কোন আওয়াজই পাওয়া গেল না; এবার তার অসহ্য বোধ হ'তে লাগল।

সে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। দিনটা ছিল পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্তের প্রভাত। পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছিল। নদীর জল রৌদ্রের আলোর চক্ চক্ বক্ বক্ করছিল। শীত শেষ হ'য়ে গেছে; জমাট বরফ তখনও সব গলেনি। সেই টুকরো টুকরো বরফ নদীর স্রোতের সঙ্গে ব্রীজের তলা দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। "সুখের আলো পড়ে সেগুলো থেকে থেকে জ্বলে উঠছে। সমুদ্রের পাখী উপরে উড়তে উড়তে হঠাৎ চীৎকার করে নেমে এসে নদীর মাছ মুখে করে তুলে নিয়ে আবার উড়তে শুরু করছিল।

শিল্পীরা এই স্বয়ংগ "ছাডতে" পারেনি, বসন্তের এই আনন্দ উজ্জল ছবি আঁকতে বসে গিয়েছে। মাঝিরা যে যে যার কাজে ব্যস্ত। বসন্ত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নৌকার পাল ঠিক করতে শুরু করেছে। কাজ শেষ হ'লেই সুদূরে দেবে পাড়ি। তারা নতুন আনন্দ উৎসাহে কাজে লেগে গিয়েছে; সুখের বকঝকানির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিনিষও বক্ বক্ তক্তকে হয়ে উঠছে।

তরুণাঙ্গীরা জানালাটা খুলে দিল—আর খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ভাবল,—কি সুন্দর এই প্রভাতের

নির্মল বাতাস। তার মুখের উদ্বেগের চিহ্ন দূরে সরে গেল। তার অস্থিরতা গেল কমে।

নদীর অপর পাড় থেকে বিউগলের আওয়াজ এল; তার সেই স্বর বসন্তের সুনির্মল বাতাসের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার ভেসে এল। রাস্তার গোলমাল ক্রমে ক্রমে বিউগলের আওয়াজকে দিল ঢেকে। সে জানালাটা আবার বন্ধ করে দিল।

এবার সে খাবার ঘরে গিয়ে ভাল করে খাবার টেবিলটা দেখল—তার ডাক্তার বন্ধুর সব কাজ শেষ হ'য়ে গেলে তার খাবার ব্যবস্থাটা ভাল করে নিশ্চয় করতে হবে।

সে তার পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করল, টেবিলের উপর রাখা ডিক্যাণ্টরের দিকে দেখিয়ে—"এটা সব চেয়ে পুরানো রোভল থেকে আনা হয়েছে?—ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, মহাশয়।"

"বেশ যাও, এবার খুব ভাল করে খাবার তৈরী করতে বলে এস, আর খুব কড়া কফি। আর তুমি নিজে দেখ, রেন-সভ্য ভাল কফি ডাঃ ভেটাবলিঙ পান।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়"। পরিচারিকা বিদায় নিলে।

সে খাবার টেবিলটা আর একবার ঠিক করে পানীয়ের বোতলটা আলোর দিকে তুলে ধরল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, যে এটা তার জ্বর খুব প্রিয়। সে রাত্রে খাবার সময় এটাকে নিয়ে জ্বর সঙ্গে খুব রসিকতা করত আর তারা দুজনে এটার নতুন নতুন মজার নামকরণ করেছিল। কিন্তু আজ? সে আর ডাক্তার—তারা দুজনে এটা উপভোগ করবে—আর তার স্বী?

দ্রুফোটা বড় বড় চোখের জল তার গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

"চুলোয় থাকগে—আমি কেন মিছামিছি এত মন খারাপ করছি?" সে গেল আবার সেই ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে, আর ডাক্তারের জন্ত অপেক্ষা করতে।

আবার সেই ভয়, সেই ব্যথাজনক চিন্তা তার মনকে তোলপাড় করতে লাগল—এ ঘরের মধ্যে এক আপ্রাণ চেষ্টা চলছে, যদিও সে নিজে এ কষ্ট ভোগ করেছে না, কিন্তু এসবই তো তার জন্তে।

তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে এই অসহ্য যাতনা ভোগ করতে হচ্ছে। একটা কথাই তার বার বার মনে পড়তে লাগল যে প্রেম ভালবাসা যেমন আনন্দদায়ক তেমনি আবার দায়িত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন তার স্ত্রীর কাছে হয় জীবন নয় মৃত্যু।

“জীবন! হায় ভগবান, যদি জীবনই হারাতে হয়!” সে আর ভাবতে পারলে না। কী গভীর ভাবে সে তার স্ত্রী আস্ত্রি ভালবাসে। দেখা হওয়ার প্রথম দিনটা থেকেই কি গভীর ভাবেই না ভালবেসেছিল। তাদের প্রণয়-মধুর দিনগুলি কি ভাড়াভাড়াই না কেটে গিয়েছিল। ভালবাসা ছিল অনন্ত। তারপর তাদের বিবাহ হ’ল। মধু-চন্দ্রিমার সময় তাদের ভালবাসা সবচেয়ে গভীর পরিণতি লাভ করল। এই স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের মত, আর কিছু কি মধুর থাকতে পারে? তখন সে এই সব কথাই ভাবত, কিন্তু আজ তার স্ত্রীর ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষমান অবস্থায় থাকতে থাকতে অল্পভব করলে, সেই মধুর জীবনের চেয়েও আরো কিছু পবিত্র, বৃহৎ, মহান তার জীবনে প্রবেশ করেছে। তার মনে হ’ল তার হৃদয়ের তন্ত্রী যেন এক এক করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ’য়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও তাকে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তার স্ত্রীর কাছে যাবার উন্মুক্ততা রোধ করে, যদি সে একবার আস্ত্রির কাছে গিয়ে তার ছোট সুন্দর হাতের উপর তার অল্পরাগ জানিয়ে আসতে পারত!—এ হাতের অধিকারিণীই এখন তার কাছে সব চেয়ে অধিক প্রিয়, তার নিজের জীবনের চেয়েও, পৃথিবীর সব কিছুর চেয়েও।

ভক্তার বলেছে—“ঐধ্য ধরতে!” ঐধ্য? কিন্তু কি করে সম্ভব হয়, যখন এত কিছু ভাববার রয়েছে? সব কিছু জেনে শুনে ঐধ্য ধরবার ঐধ্য কোথায়? বিশেষ করে যখন সে জানছে যে তার স্ত্রী কি রকম যন্ত্রণা ভোগ করছে—এবং একটা জীবন দেবার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে কি রকম যুদ্ধে! আর সে কিনা একেজোর মত শুধু

বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে? এই নিদারুণ কষ্ট থেকে সে তার স্ত্রীকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারল না।

“ঐধ্য—কষ্টের সঙ্গেই তোমরা সন্তানদের জন্ম দেবে।” সে মনে মনে চির প্রচলিত প্রবাদটা আউড়ে গেল। কথাটা স্থলে থাকতেই সে কতবার পড়েছে। তখন তার কাছে এ কথাটার কোন মানেই ছিল না; নেহাৎ পড়তে হবে বলেই পড়ে এসেছে। এখন, এই কথাটার অর্থ আজ কি সম্যকভাবে উপলব্ধি করল—তার স্ত্রীর কষ্টের চরম পরিণতি, তার শাভুকের প্রথম আশ্বাদন, আর তার আনন্দ যেটা সে কষ্টের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে। ভগবান যখন প্রথম এই অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেন, তখনই তিনি করেছিলেন পুরুষকে নারীর জন্ত দায়ী।

এই সব চিন্তার মধ্যে সে আবার ঘরের ভিতর পাশচরী স্বরু করল। হঠাৎ একটা হৃদয়-বিদারক চীৎকার এল তার কানে, তারপর আর একটা,—একটা করুণ গোঙানির আওয়াজ—তারপর সব চুপ।

ভয়ে স্তম্ভিত, মূর্তের মত পাংশু হ’য়ে সে কোন রকমে আস্ত্রির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করল। তার তখন দেখবার, শোনবার ও অল্পভব করার শক্তি চলে গিয়েছিল। সামান্য আওয়াজও তার কানে যেন বাজ পড়ার আওয়াজ বলে বোধ হচ্ছিল। সে স্তন্যতে পেল তার ডাক্তার বন্ধুর নির্দেশ দেওয়া, তার চলাফেরা ও নাসের দু’একটা প্রশ্ন। এই সবের মধ্যেও সে তার স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর অশ্রুট গলার আওয়াজ পাচ্ছিল।

“আস্ত্রি! আস্ত্রি!” চাপাশব্দে বলে উঠল। আর সে সহ্য করতে পারছিল না। কষ্টে ও অবসাদে জর্জরিত হ’য়ে তার ঘরের ডিভানের উপর আছড়ে পড়ল।

“হে ভগবান, তাকে বাঁচতে দাও; আমি তোমার অন্তিম সর্বতোভাবে বিশ্বাস করব, যদি তুমি এবারের মত দয়ালু হও।”

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস, যেন সমস্ত বেদনার মধ্যে থেকে উন্মুক্ত হ’য়ে বেরিয়ে এল—

তারপরই তার কাণে এল নবজাত শিশুর কান্না। এবার সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। “এতক্ষণে!” সে বলে উঠল—“আমাদের সন্তান! আমাদের প্রিয়তমা স্ত্রী আস্ত্রির

আর আমার !” সেই নিদারুণ হৃৎকম্প ও অবসাদের পবই এই অসাধারণ আনন্দ, তার অসহ্য মনে হ’ল। সে চেয়ারেতে বসে শিশুর মত কঁাদতে লাগল, মুখ হাতের মধ্যে ঢেকে নিয়ে, যেন তার জ্ঞান স্তব্ধে না পায়। অনির্বচনীয় আশীর্বাদে তার মন ভরে উঠল। তার সেই ক্লান্ত দেহ মন আর কিছু বইতে যেন পারছিল না। সে হাজার মত বসে রইল, মনে হোল তাকে যেন মাদকদ্রব্য পান করিয়ে তার চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; তার মাথাও ঝিম ঝিম করছিল।

সামনের দরজা খুলে গেল, ডাক্তার এ ঘরে প্রবেশ করলেন। ডাক্তারকে দেখেই সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পদে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—“কেমন আছে সে।”

“ভাল তার কিন্তু অফুরন্ত বিষাম চাই।”

“ছেলে না মেয়ে আমায় শীঘ্র বল।”

ডাক্তার তখনও তার কাজের পরিশ্রমে ঘামছেন। তার ব্যস্ততা দেখে হাঁসলেন আর উত্তর দিতে সামান্য বিধা করলেন; একটু পরে বললেন—“ছেলে—ছেলে ছাড়া আর কি হ’তে পারে ?

“সত্যি, তুমি সত্যি বলছ ?”

সে ডাক্তারের কঁধের উপর দিয়ে আস্ত্রির ঘরের দরজটা দেখতে পেল। ছোট অসহায় শিশুর মত কাতর অস্থির জিজ্ঞাসা করল—“আমি এখন ও ঘরে যেতে পারি ? মাত্র এক মিনিটের মধ্যে ?”

ডাক্তার একটু ঠাট্টা করে বললেন—“হ্যাঁ শুধু একটু থানি দেখে আসতে পার।”

সে দরজা খুলে, দরজার চৌকাটে গিয়ে দাঁড়াল। একটা চওড়া সাদা বিছানার উপর পাংশু, অবসন্ন মত তার জ্ঞান শুয়ে; আর ছোট্টা তার পাশে নরম কবলে জড়ান ছিল। বিমূঢ়ের মত এক দৃষ্টিতে সে তার জ্ঞান দিকে চেয়ে রইল, কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বার হ’ল না। কিন্তু বড় বড় ফোঁটা তার গাল দিয়ে বেয়ে এসে তার মনোভাব প্রকাশ করে দিল।

আস্ত্রি একবার চোপ খুলল, সেই অল্প আলোতে তার চোখ দুটা যেন আগের চেয়ে বেশী কালো আর বড় মনে হ’ল, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ছিল স্নেহ ও আশীষ, তার দুর্বল, কাপা

হাত দিয়ে পাশে নিদ্রারত শিশুর দিকে দেখিয়ে দিল, মুখ তখন তার অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত।

“গোরান।”

“আস্ত্রি।”

গোরান তার ব্যাকুল দুটা বাহ বাড়িয়ে দিল। এমন ভাবে যেন সে তার জ্ঞানকে আর ঐ শিশুকে একই সঙ্গে তার বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করবে। আস্ত্রির বিছানার পাশে সে হাঁটু গেড়ে বসে আস্ত্রির হাত ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে তার উপর একটা চুমা দিল। নতুন মা যেন সাত্বিত, গোরান তার মাথাটা বিছানার ধারে রাখল যেন সে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

“গোরান”—সে আবার মৃদুস্বরে ডাকল। সে তার দুর্বল কম্পিত হাত গোরানের গালের উপর চাপ দিয়ে আস্ত্রিগুলো তার মাথার কোঁকড়া বাদামী চুলের উপর রেখে চুপ করে রইল।

“আস্ত্রি তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?—”

কোন উত্তর না পেয়ে সে চোখ তুলে দেখল।

আস্ত্রি ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্ক মধ্যে ধরা নরম হাতটির উপর একটা চুমা দিয়ে নীল রঙের সিল্কের চাদরের উপর রেখে দিল। অনেকক্ষণ সে তার দিকে চেয়ে রইল। খুব শান্তভাবেই সে ঘুমাচ্ছিল, শুধু ঠোঁটের কোন দুটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। ছেলেটাকে আস্ত্রি-ভাবে আদর করে যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেল।

দরজার কাছে ডাঃ ভেটারলিঙ্ক দাঁড়িয়েছিলেন—“কিহে সব ঠিক আছে তো ?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

“সে ঘুমাচ্ছে।”

“উত্তম, তাহলে আমি এখন যেতে পারি, ওঁর এখন খালি ঘুমান দরকার। আর দেখ যেন কোন কারণে উত্তেজিত না হয়ে উঠেন। আচ্ছা, এবার বল দেখি তোমার ছেলেটা কেমন হয়েছে ? বেশ ভালই হয়েছে—না ?”

“হ্যাঁ, ঠিক ওর মায়ের মত।”

“সে কথা সব বাবাবাহি বলে, এ সময় তারা আবার খুব বেশীরকম বিনম্র হ’য়ে পড়ে কিনা।”

“হ্যাঁ ! বাজে কথা বল না”—গোরান বার্গ ডাক্তারকে

খাবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল,—“চল, এখন কিছু খাওয়া যাক। খাওয়া এবার নেহাৎই দরকার হ’য়ে পড়েছে।”

“কেন, তোমার তো কিছু করবার ছিল না? তুমি তো শুধু অপেক্ষাই করছিলে?”

“সেটাই যথেষ্ট হয়েছে। জীবনে আমি বোধ হয় কখনও এরবম উৎকর্ষায় সময় কাটাইনি।”

“জানতো—সব জিনিষেরই একবার প্রথমবার আছে?”

তার টেবিলে খেতে বসল। ডাঃ ভেটারলিঙ তার ঘড়িটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগলেন। বার্গ তখন গেলাসে পানীয় ঢালুছে। ডাক্তার খেতে খেতে জননীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতে লাগলেন—না যদিও সে খুব ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েনি, তবুও তার যত্ন খুব দরকার। ঠুকে কি জলের ধারের কোন জায়গার হাওয়া বদলাতে নিয়ে যেতে হবে? —না না তার চেমন কোন কিছু দরকার নেই। ষ্টুহোমের কাছাকাছি দ্বীপগুলো বেশ ভাল, আর তাছাড়া কাছাকাছি কোন জায়গায় হ’লে আস্ত্রির স্বামীও তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবেন।

ডাঃ ভেটারলিঙ তাঁর ঘড়িটা তুলে নিলেন, এবং যাবার জন্ত প্রস্তুত হ’লেন, বার্গ অভিবাদন জানিয়ে বলল “নমস্কার, আর অশেষ ধন্যবাদ।”

“যদি হঠাৎ কিছু দরকার হয়, আমায় ডেকে পাঠিও;” ডাক্তার এবার বিদায় নিলেন।

বার্গ জানালার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হ’ল। তখন সবে ছপুর হয়েছে। বসন্তের সূর্য্য কাঁচের ভিতর দিয়েও উদ্ভাপ পাঠাচ্ছিল; মুক্ত বাতাস তার সারা সকালের অবসন্ন ভাব দূর করে দিল। ছোট জাহাজগুলো নদীর বুকে এপার ওপার করছে।

ওপারের একটা দুর্গ থেকে হঠাৎ এল একটা আলোয় ঝিলিক। তারপরই ভেসে এল খানিকটা ধোঁয়া আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুরুগভীর আওয়াজ বাড়ীর সব জানালা-গুলোকে কাঁপিয়ে। বার্গ একটু চমকে উঠল; তারপরই তার মনে পড়ল তার স্ত্রীর কথা।

আবার জানালার কাঁচগুলো সব খরখর করে কেঁপে উঠল। নদীর ওপার থেকে রাজকীয় ভোপধ্বনি শ্রুত হয়েহে। সে তাড়াতাড়ি তার মুখের সিগারটা ফেলে, তার স্ত্রীর ঘরের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল।

আস্ত্রি তখন ভেগে উঠে অস্থিরভাবে ছটফট করছিল। নার্স তাকে শান্ত করে রাখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রত্যেক ভোপের সঙ্গে সঙ্গেই সে জোর করে উঠে পড়ছিল।

“ওঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করুন”—নার্স বার্গকে দেখে অধীর ভাবে বলে উঠল—“ওঁকে শান্ত করতে না পারলে—” আস্ত্রি! আস্ত্রি!—লম্বীটি, একটু নিজেকে স্থির কর।”

সে আস্ত্রিকে দুই বাতর মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করে শান্ত করবার চেষ্টা করল।

“আমার ছেলে? আমার ছেলেকে আমার কাছে দাও।” আস্ত্রি ভয়ানক ব্যস্ত হ’য়ে উঠল।

বার্গ আস্ত্রির উত্তেজনা ও ব্যাকুলতা দেখে নিজের ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—“শীঘ্র ডাক্তারকে ডাক্তে পাঠাও; ডাঃ ভেটারলিঙের কাছে দুজন লোক এখনি যাক।”

সে নিজেকে কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ভয়েতে তখন সে পাংশু, বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভোপের আওয়াজ ক্রমাগতই আসছে। সে জানালার সব ভারী পর্দাগুলো টেনে দিল, বালিশ আর কুশান দিয়ে সব জানালা চাপা দিতে লাগল, যদি জানালার কাঁপুনি কিছু কমে। কিন্তু আওয়াজ কমান গেল না। বার্গ নিরুপায় হ’য়ে রাগে হ’ হাত মুঠো পাকিয়ে শূন্যে নেড়ে ঐ অসহ বিকট আওয়াজকে অভিসম্পাত করতে লাগল।

যখন সে একটু স্থির হ’য়ে আস্ত্রির ঘরে আবার প্রবেশ করলে, তখন ঘরের মধ্যে তুমুল কাণ্ড। নবজাত শিশু পরিত্রাণি চীৎকার করছে, আর নার্স শ্রাণপণ চেষ্টা করছিল আস্ত্রিকে বিছানায় ধরে রাখতে। গোরাণ কি করবে ভেবে না পেয়ে অশ্রুট আওয়াজ করে ঘরের এদিক ওদিক করতে লাগল।

নার্স তাকে বিচলিত দেখে কঠোর শাসনের সুরে

বলল—“এ আপনি কি করছেন? নিজের মাথা ঠাণ্ডা করুন।”

আসক্তি বললে “গোরান, ছিঃ কীদে না—এখন সব ঠিক হ’য়ে যাবে।” গোরানের চোখের জল সে দেখতে পেয়েছিল।

একটু পরেই আবার সে অস্থির হ’য়ে পড়ল। এবার সে বালিশে-ঠেস দিয়ে উচু হ’য়ে বসবে বললে, নইলে যেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। গোরান আদর করে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিলে আসক্তি রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এবার সে অস্থিরভাবে বলতে লাগল—গোরান তাকে ভালবাসে-না, সে ভয়ানক নিষ্ঠুর, নির্দয়। এখন সে এসেছে তাকে নির্ধ্যাতন করতে; তার ছেলেকে গোরান চুরী করে নিয়ে গেছে। গোরান একটা নরাধম, পশু।

একমুহূর্তের জন্ত আসক্তি যেন থামল। গোরান সেই অবসরে তাকে তার দুই বাহুর মধ্যে স্থির করে ধরে রইল।

হঠাৎ আসক্তি তার দুই হাত শূন্য ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠল। পরমুহূর্তে তার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হ’য়ে উঠল। তারপরেই গড়িয়ে বিছানায় পড়ে গেল। বাইরে আবার একটা তোপ গুরুগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হ’ল। এটা একটা রাজকীয় তোপধ্বনি, বার্গের কাছে মনে হ’ল, সত্যিই এটা রাজ তোপধ্বনি,—এটা যেন বিশেষ করে এই রাণীর জন্ত, যে আজ তার দেশকে একটা নতুন জীবন, একটা নতুন প্রাণ উপহার দিয়েছে, তার নিজের জীবনের বিনিময়ে।

* হুইডিশ লেখক ড্যানিয়েল কল্টর্ম এর “The Royal Salute” গল্প অবলম্বনে।

যে ফুল না ফুটিতে

ক্রীআরতি দত্ত

(Cronin হইতে অনূবাদ)

গত গ্রীষ্মকালে আমি আবার আয়ারল্যান্ড গিয়েছিলাম, সবুজ প্রান্তরের অপূর্ণ শোভা মণ্ডিত এই দেশ। পুরোণা দিনের মতই কর্তব্য ও শ্রমের টানে আমার সেই বিশেষ তীখটিতে অর্থ্য দিতে আমি গিয়েছিলাম।

অনেক বছর আগে, ডাবলিনে রোটাণ্ডা হাঁসপাতালে আমি তখন ডাক্তারি পড়তে ছাত্র হয়ে আসি। সহরের একটি অতি দরিদ্র পল্লীর স্বাস্থ্যপরীক্ষার ভার আমার উপর ছিল। সেই পল্লীতেই একদিন কাজের ভিড়ে ঘুরতে ঘুরতে রোস ডনিগনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

একটি আট, নয় মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে রোজ সে রাস্তার কলে জল নিতে আসতো। রোগা মেয়েটি, গায়ের কাপড়খানি নানা জায়গায় রিপু করা; কোলের ছেলেটি কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যবান, তার ভারে মেয়েটি যেন হুয়ে পড়তো। রোসএর বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ বছর, তার গাঢ় নীল রঙের চোখদুটি তার গম্ভীর ছোট মুখখানির

উপর খুব বড় দেখাতো। পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সের মধ্যের আরও তিনটি মেয়ে তার সঙ্গে থাকতো। তার সঙ্গে তাদের মুখের সাদৃশ্য দেখেই বোঝা যেতো যে তারা ডনিগন পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত।

চারদিকের নোংরা বিষন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তার উজ্জল চোখের দৃষ্টি আমাকে তার দৃষ্টিতে উৎসুক করে তুললো। প্রথম দিকে আমি তাকে সুপ্রভাত জানালে উত্তরে কেবল তার লজ্জাবনত মুখে হাসি ফুটে উঠতো। ক্রমে তার লজ্জা অল্প অল্প করে ভাঙতে লাগলো ও আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়ে উঠলো।

রোসের মুখেই শুনলাম, তারা পাঁচটি ভাইবোন। শিশুটির নাম মাইকেল। আট মাস আগে তাদের মায়ের মৃত্যু হয়েছে। বাবা ডেনি ডনিগনের সঙ্গে তারা সেই রাস্তারই কোণের একটা বাড়ীর একতলাতে থাকে। ডেনি ডকে কাজ করে; অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের ও ভালো মানুষ

প্রকৃতির লোকসে। কথাবার্তায় ভদ্র ও মনে সং ইচ্ছা আছে কিন্তু সে ভয়ানক মদ খায়, ফলে তার অধিকাংশ সময় ও অর্থ নেশার পেছনেই খরচ হয়। বোসের উপরই তাই সংসারের সব দায়িত্ব পড়েছে; নেশাখোর বাপের দেখাশোনা করা, অল্প আয়ে সংসার চালাও, রান্না করা ও ভাইবোনদের দেখা সবই তাকে একা করতে হয়।

যদিও রোস ভাইবোনদের সবাইকেই স্নেহ করতো, তবুও শিশু মাইকেলের জন্ম তার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেই পল্লীর প্রান্তে, খেলার মাঠে মাঝে মাঝে বিকেলবেলা, সব কাজের মধ্যেও মাইকেলকে নিয়ে তাকে যেতে দেখতাম। কখনও মুখে তার ক্লাতির ছায়া পড়তো না। মাঝে মাঝে বাজারের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখতাম; হাতে বাজারের ছোট থলিটি নিয়ে রুটির দোকানে হরতো সে দরদরি করছে কিংবা মাংসের দোকানে পরমা দিতে দেরি হবার ঝঁকিয়ে জানাচ্ছে। সব কাজেই তার অদম্য উৎসাহ দেখে আমার আশ্চর্য লাগতো। চারিদিকের পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সে সজাগ ছিল কিন্তু সংসারের কোন স্নানভাট যেন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। দরিদ্র পল্লীর অত্যাগ ছেলেমেয়েদের মতই সাংসারিক জটিলতার প্রাথমিক জ্ঞান তার মনে স্পষ্ট ছিল কিন্তু তারই সঙ্গে একটা নিম্পূহ, নিম্পাপ ভাব তাকে অপূর্ণ করে তুলেছিল। তার বড় বড় ভাবপূর্ণ চোখদুটিতে যেমন সাংসারিক জ্ঞানের ছাপ পড়েছিল, তেমনি পড়েছিল এক অতল ভালবাসার ছায়া।

এই ছোট মেয়েটির সম্বন্ধে আমার সাধারণ উৎসুক্য ক্রমে চিন্তায় পরিণত হলো। তার সম্বন্ধে কিছু করবার জ্ঞান আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তাকে কোন উপায়ে সাহায্য করার যখন পথ খুঁজছিলাম, তখন একদিন কথায় কথায় তার জন্মদিন কবে জেনে নিলাম। রোসের জন্মদিনে সহরের এক দোকান থেকে এক প্রস্থ পোষাক, জুতো, মোজা ইত্যাদি কিনে তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। কয়েক দিন আর রোসের সঙ্গে ইচ্ছে করেই দেখা করলাম না। নতুন পোষাক পরে রোস এর ঘরে বেড়ানোর ছবিটি কল্পনা নেত্রে দেখতে লাগলাম। ভাবতে খুব আনন্দ হচ্ছিল সে এবারে রবিবার দিন গীর্জা যেতে কাপড়ের দৈন্ত্য ঢাকবার জ্ঞান তাকে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু পরের

সোমবারে যখন আবার দেখা হলো তখন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে সেই পুথো রিপু করা পোষাক পরে মাইকেলকে কোলে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, “তোমার নতুন পোষাক কোথায় গেলো?”

লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেলো, সে বললো, “ও, তাহলে আপনি সেগুলি পাঠিয়েছিলেন?” তারপর একটা থেমে সে সহজ ভাবে বললো, “সেগুলি বন্ধক রেখেছি, মাইকের দুধ কেনবার জন্য ঘরে কিছু ভিলনা।”

আমি চূপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, বুঝতে পারলাম যে সে এমনি ভাবেই আত্মত্যাগ করে চলবে; ছোট ভাইটির জন্য সে তিলে তিলে নিঃশ্বাস দান করবে চির জীবন। তাকে এত রোগা দেখাচ্ছিল যে আমার বড় কষ্ট হতে লাগলো। পরের দিন আমি স্থানীয় গীর্জায় পাদ্রির সঙ্গে দেখা করলাম।

রোস এর নাম শুনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং আমার বক্তব্য শেষ হলে, খানিক চূপ করে থেকে আমার কথায় রাজি হয়ে তিনি বললেন, “রোসকে সম্মত করাতে তোমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। সে ছোট একটি মা। এই ভালবাসাই তার জীবনকে পূর্ণ করে রেখেছে।”

এক সপ্তাহ পরে, সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে আমি তাদের বাড়ি গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, একটা টেবিল ঘিরে তার ভাই ও বোনেরা বসেছিল আর রোস কাছে দাঁড়িয়ে রুটি কাটছিল। আমি বললাম, “বোস—তুমি শিষি এখান থেকে চলে যাচ্ছে।” অল্পমনুষ্যভাবে কপালের উপর থেকে চুলের গোছা সন্নিবে দিয়ে, আশ্চর্য হয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি আবার কথায় জোর দিয়ে বললাম, “হ্যাঁ, তুমি যাবে এক মাসের জন্য গেলগয়েতে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে তোমার কোন কাজ থাকবে না—খালি আসর সময়ে মুরগীদের খাওয়াবে, নয়তো খোলা মাঠে ছোটোছুট করে বেড়াবে ও প্রচুর পরিমাণে দুধ খাবে।” আমার কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য তার মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কিন্তু আবার তখনি স্নান হয়ে গেলো।

সে মাথা নেড়ে বললো, “তা হয়না, আমার ভাইবোনেদের, বাবাকে কে দেখবে?”

“সে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ওরা নিজেরাই নিজেনের দেখবে—তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে, নয়তো তুমি ভেঙে পড়বে একদিন।”

“না আমি পরবো না, মাইকেলকে ছেড়ে যেতে পারবো না।” এইবারে আমি হেসে বললাম, “আচ্ছা, তাকে না হয় নিয়েই যেয়ো।”

এইবারে তার মুখ সত্যিই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পরের দিন তাকে যখন ট্রেনে তুলে দিতে গেলাম, তখন তাকে খুব খুসী দেখাচ্ছিল, এত খুসী তাকে আগে কখনও দেখিনি। গাড়ী যখন চাড়লো, তখন দোলা দিয়ে ভাইকে সে বলছিল,

“খোলা মাঠ, গরু, আর মুরগী……

আমার বন্ধুর কাছ থেকে রোস এর খবর নিয়মিত পেতাম। রোস স্বখে আছে, ওজনে বাড়ছে শুনে খুব আনন্দ হতো। রোস এর কাছ থেকেও ভুল বানানে ভরা চিঠি মাঝে মাঝে পেতাম। মাইকেলের নানা খবরে তার চিঠি ভরা থাকতো আর সারা চিঠিতে একটা আনন্দের অল্পভূতির স্পর্শ পেতাম, যে অল্পভূতি তার জীবনে আগে কখনও আসেনি।

এক মাস কেটে গেল ও তাদের ফেরবার দিন যখন কাছে এসেছে তখন একটা খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বন্ধু ও তার স্ত্রী মাইকেলকে পোষ্য নিতে চায়। তাদের দু জনেরি বয়স হয়েছে; তারা অবস্থাপন্ন ও নিঃসন্তান। মাইকেলের ওপর তাদের একটা মায়া পড়েছে ও তাকে তারা যে স্বখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মগ্ন করবে পারবে তা সে নিজের ঘরে কখনও পাবে না।

তাদের বাবা এমন সুযোগ ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করলো, কিন্তু রোস এর দিকটাও ভাবতে হবে। তাই তার উপরেই এর চরম সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া হলো। আমরা কেউই জানতাম না কি সিদ্ধান্তে সে পৌঁছেছিল ও কি তাকে হাফাতে হয়েছিল, যতক্ষণ না সে আবার ফিরে এলো—একা।

বোনেদের ও বাবাকে দেখে রোস খুসী হলো কিন্তু টেবন

থেকে বাড়ী আসার সারা পথ সে চূপ করে রইলো যেন কোন বিষাদ স্বপ্ন তার মনকে ঘিরে রেখেছিল। ক্রমে ক্রমে পুনো দিনের মতই সে ঘরের কাছে আবার মন দিল। সে যেন আগের চেয়েও অনেক বেশি কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখতো। তার কথা মতই তার বাবা শেষ পর্যন্ত মাইকেলকে পোষ্য দানের কাগজ আইন সম্মত ভাবে সই করে দিল।

তাদের দিন আগের মতই কাটতে লাগলো। কখনও কখনও তাদের কষ্টে চলতো আবার যখন তাদের বাবা নেশা না করে ভালভাবে কাজ করতো তখন আবার তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিন ফিরে আসতো। রোস তখন বন্ধকরাখা জিনিষগুলো ফিরিয়ে এনে আবার সংসার সাজিয়ে তুলতো।

তাদের দিন যখন ভালই কাটছে, এমন সময় এক দিন সন্ধ্যাবেলা খবর নিতে তাদের বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখি তখনও কেউ বাড়ী ফেরেনি, চারিদিক নিস্তব্ধ কেবল রান্নাঘরের টেবিলের উপর মাথা রেখে রোস কাঁদছে। আমার পায়ের শব্দে মাথা তুলেই তার মুখ চোখের জলে ভরে উঠলো। আমি তার শোকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করলাম না, কেবল তার ঠাণ্ডা শীর্ণ হাতখানি আমার নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। তাকে সামান্য দেবার মতো কোন কথা আমার জানা ছিল না। থানিক পরে সংঘত হয়ে সে নিজেই বললো, “মা হবার মাইকেলের ভালর জন্তই হয়েছে, আমি তার স্বখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না কোন দিন।”

মাইকেলের পালক পিতামাতার কাছ থেকে প্রায়ই তার খবর আসতো। তারা তাকে খুব ভালবাসে ও ইতিমধ্যেই সে তাদের নিজের ছেলের মত হয়ে উঠেছিল। তার স্বখ সুবিধার উপাদানের কোন অভাব তারা রাখেনি।

তারপর—কিছুদিন পরে এক শীতের সকাল বেলা এক নিদারুণ বিপদের খবর এসে পৌঁছলো। মাইকেলের নিউমেনিয়া হয়েছে।

অনেকক্ষণ শুদ্ধ হয়ে চিঠিখানার দিকে চেয়ে রোস বসে রইলো। তার মুখ রক্তহীন দেখাচ্ছিল। তারপর উঠে গিয়ে তার সামান্য সঞ্চিত অর্থ গুণে নিয়ে সে বললো “আমি ভাইটির কাছে যাচ্ছি।” কার কোন আপত্তির কথা সে

শুনলো না। লোকে কি জানে যে সে শিশুর সব কথা কেবল রোসই বোঝে। রোগের বজ্রগার মধ্যে পথ্য খাওয়াতে একা রোসই পারবে; যখন ওষুধ খেতে সে চাইবে না তখন তাকে ভুলতে পারবে এক সে নিজে। কপালে হাত বুলিয়ে শত কষ্টের মধ্যেও তাকে সে ঘুম পর্যন্ত পাড়াতে পারবে।

মন স্থির করে সে যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলো। পাড়া পড়শিনী একজনের উপর বোনেদের ও সংসারের ভার দিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। মাইকেলের পালক পিতামাতার ঘরেও কারও কথা না শুনে তার সম্পূর্ণ শুশ্রূষার ভার সে নিজের হাতে তুলে নিল। মাইকেলএর অসুখ খুব কঠিন হয়ে উঠলো। যখন মাঝে মাঝে শিশুর শ্বাস গ্রন্থাসের কষ্ট বেড়ে উঠতো তখন সে বেদনার চিহ্ন রোসের মুখেও স্পষ্ট ফুটে উঠতো। কখনও কখনও কাশতে কাশতে যখন শিশুর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতো তখন রোস নিজের হাতের মধ্যে তার ছোট্ট মাথাখানি সযত্নে তুলে ধরতো যতক্ষণ না বিপদ কেটে যেতো। ব্যাধি যে সংক্রামক ও তাকেও আক্রমণ করতে পারে, এ সম্ভাবনা বোধ হয় কখনও তার মনে হোত না।

অবশেষে বিপদ কেটে গেলো। ডাক্তার যখন দেখে বললেন, যে এইবারে মাইকেল সুস্থ হয়ে উঠবে, আর কোন ভয় নাই, তখন রোস টনতে টলতে উঠে দাঁড়ালো; কপালে

আঙ্গুল দুটো চেপে ধরে সে বললো, “এইবারে আমি বিশ্রাম নিতে পারি।” তারপর একটু ক্ষীণ হেসে সে যোগ দিল, আমার বড় মাথায় কষ্ট হচ্ছে।”

মাইকেলের ব্যাধির বীজাণু তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ব্যাধির বীজ তার ফুসফুসকে আক্রমণ না করে মস্তিস্কে আক্রমণ করেছিল। ফলে যে কয়দিন সে বেঁচেছিল, তার একবারের জন্যেও জ্ঞান ফিরে আসেনি। আমি আগেই বলেছি বোধ হয়, সবচেয়ে বড় তার ব্যয় ছিল।

গত বছর গ্রীষ্মকালে আমি আবার সেখানে গিয়েছিলাম। গ্রামের এক প্রান্তে নির্জন, নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে একটি ছোট গীর্জা, তার এককোণে সমাধিগুলি রয়েছে। সেখানে দাঁড়ালে দেখা যায় যতদূর চোখ যায় উঁচু নীচু খোলা প্রান্তর। দূরে সমুদ্রের মোহনা থেকে মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া গ্রামের ওপর দিয়ে, সমাধিগুলির ওপর দিয়ে বয়ে যায় আচমকা। সেই হাওয়াতে ঝরে পড়ে শুকনো পাতার রাশি। বড় বড় ঘাসের মধ্যে প্রায় লুপ্তপ্রায় ছোট সমাধিটির ওপর কোন ফুলের মালা ছিল না, ছিল না কোন পাথরের মূর্তি বা উচ্ছসিত প্রশংসার বাণী। কেবল সবুজ ঘাসের মধ্যে সমাধিটির প্রান্তে ফুটে ছস একটি সাদা বুনা গোলাপ। হঠাৎ কখন মেঘ সরে গিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছিল সেই সাদা গোলাপটির ওপর যেখানে ‘রোস’ এর নাম লেখা ছিল।

“সমাদর বিভ্রাট”

ত্ৰীপুপদেবী

নেড়া তো বাড়ীতে ভাড়াটে বসাইয়াই খালাস। কিন্তু প্রাণান্ত হইল আমার। গ্রাম্য জমিদারদের সঙ্গে ইহার পূর্বেও বহু জায়গায় মিশিয়াছি কিন্তু ইহাদের দেখিয়া নতুন অভিজ্ঞতাই হইল। কিছুই অভাব নাই অভাব শুধু রুচির। দুগ্ধ ফেননিভ শব্দ্য হঠাৎ ধূমপানে শুইয়া পড়ার মত সেগুলি মনকে পীড়া দেয়। শিশুদের ভোর বেলা বোতলে করিয়া চা খাওয়ানর ঘটী, কর্তার বটি পাতিয়া মাছ কোটার ভজি, গৃহিণীর বাড়ীর ভিতর হিলতোলা

জুতার ব্যবহার দেখিতে সত্যি আমাদের চোখ অভ্যস্ত নয়।

ঘটনাচক্রে কিছুদিন ইহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইল, পদে পদে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া যদিবা চলি আমার শিশুকন্যা অপূর অবস্থা প্রায় অচল। ইহাদের শিশুদের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। রূপার বাটিতে খোলা শুদ্ধ পোপে মুকোজে চটকাইয়া তাহাকে খাইতে দিলে সে তাহা খাইতে পারে না। ১১।১২ বৎসরের

নগ্ন বালক বালিকা দেখিলে তাহার কুষ্ঠার সীমা থাকে না। আবার তাহার জীবনের মধ্যে সে সিনেমা দেখে নাই, এই অনভিজ্ঞতায় তাকে ওই শিশুর দল অত্যন্ত অবজ্ঞা ও কুপার চক্ষে দেখে। ফলে সে, ইহাদের আসরে স্থান পায় না—তাহার অবস্থা সত্য সত্যই কষ্টকর।

আমাদের উভয় পরিবারের পারস্পরিক স্বভাব বৈষম্যের দরুণ একত্র থাকিয়াও আমরা একটু দূরে পড়িয়া গেলাম। সেদিন সন্ধ্যায় বাগানের দিকের বারন্দায় উজিচেয়ারে আমরা দুজন বসিয়া আছি। চমৎকার ফুরফুরে হাওয়ায় বেশ তন্দ্রার আবির্ভাব হইয়াছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেখি পাশের যে চেয়ারে উনি বসিয়াছিলেন সেখানে কে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। ওঁর ধূমপানের অভ্যাস নাই। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি জমিদারদের চাকর নিধিরাম দ্বিধা আরামে শুইয়া আছে। মেয়েদের সঙ্গে এইভাবেই মিশিতে সে অভ্যস্ত। আমরা যে ইহাতে অসম্মান বোধ করি তাহা বুঝিবার সাধ্য তাহাদের নাই।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। জমিদার বধূর বাপের বাড়ীতে দুর্গাপূজা। বজ্র দিন রাত্রে শুইয়া আছি এমন সময় চাকর নিধিরাম জানলায় মুখ বাড়াইল, মা ঘুমুচ্ছেন নাকি? ঠিক অস্থগম্পশ্চাৎ নাইলেও শুইবার ঘরে পুরুষ চাকরের উঁকি খুঁকি সহ্য করার অভ্যাস ও নাই। ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ ভাবে উঠিয়া দরজা খুলিলাম। নিধিরাম বলিল, আজ্ঞে আমাদের ছোট বৌএর বাপের বাড়ীর গাড়ী এসেছেন, তা বাবু বসেন আমাদেরকেও সেখানে যেতে হবেক। ছোট বৌএর ভাইও এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। দেখি পিছনে একটি কিশোর ছেলে গোলাপী বেনারসীর পাঞ্জাবী ও প্যারাসুট শিকের হলদে পায়জামা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গলায় মোটা সোনার হার। হাতে লাল শিকের রুমাল পায়ে শিকের মোজার সঙ্গে বাণিশ করা পামসু। তাবুল রাগে রঞ্জিত দস্ত পংক্তি বাহির করিয়া সে আমাদের ঘাইতে বলিল। আমাদের অক্ষমতা জানাইয়া কোন প্রকারে তাহাকে বিদায় দিয়া আবার শুইলাম। এমন সময় নিধিরামের পুনরাবির্ভাব, “মা ঠাকরেন ঘুমুলেন নাকি?” এবার বিরক্ত কণ্ঠেই জবাব দিলাম যে, না ঘুমাইবার উপায় কই? বল

কি বলছো? আমাকে ভালো করিয়া জাগাইবার উদ্দেশ্যে জানলা দিয়া হাত বাড়াইয়া মশারিটা সঙ্গে করে নাড়া দিয়া নিধিরাম বলিল আজ্ঞে আপনার কাছে ছোট বৌএর গয়নার বাস্কাটা রাখতে হবে। আমি বলি, আচ্ছা, দাও। দরজা খোলার পর নিধিরাম বলে আজ্ঞা এখনতো আমি নাই যাবার সময় দিয়ে যাবেক। আবার দরজা বন্ধ করিয়া শুই, এমন সময় ঠাকুর হরেকৃষ্ণ আসিয়া ডাকে, মা আপনার দা খানা একবার দেখি? ঘুমের আশা জলাঞ্জলি দিয়া ভাঁড়ার হইতে দা বাহির করিয়া দিই। হাতে ধার পরীক্ষা করিয়া হরেকৃষ্ণের মুখ উজ্জসিত হইয়া উঠে; বলে, ঠিক হবেক। আমি বলি, কি ঠিক হবে?

তার উত্তরে শুনি পরশু হাটে কেনা ছাগলটি এই রাত্রে ইহার কাটিয়া কুটুম বাড়ীর ভেটের কাছে লইয়া যাইবে। খানিক পরেই নিরীহ ছাগলিশুর আন্তরবে নিশিথ রজনী মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার শিশুকণ্ঠার সঙ্গে কয়দিন ধরিয়া এই ছাগলিশুর ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। মনটায় বেদনা অল্পভব করি। ঘুমের ঘোরে অপু আমার জড়াইয়া বলে, মা বাচ্চ, অমন ডাকলো কেন? তাহাকে কোন উত্তর দিইনা। কিইবা দিব? ইহার পর হৈ হৈ ও পাককরার ঠকঠক আওয়াজে মনে হয় যেন হাঙড়া ষ্টেশনে শুইয়া আছি।

খানিক পরে আবার নিধিরাম আসে, মা দাদাবাবু টর্চটা চাইলেন। বালিসের তলা হইতে টর্চটা বাহির করিয়া দিই। অল্পপরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলে, এটা লয়, গরম জলের টর্চ, চা ভরে নিয়ে যাবেন পথে খেতে। তখন বুঝি থাম্মোফ্লাস্ক কথাটি নিধিরামের দ্বারা টর্চে পরিণত হইয়াছে।

যাহা হউক রাত দুইটায় দুইখানি মটোর বোঝাই হইয়া তাহারা তৌ রওনা হইল। তিনদিন বাদে বিজয়ার দিনে এখানে একটি মেলা হয়। সকাল সকাল কাজ কর্ম সারিয়া আমরা মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। রাধুনীও রান্না সারিয়া বোধহয় কাছাকাছি কোথায় গিয়াছিল।

রাত ৮টায় বাড়ী ফিরিয়া দেখি রান্নাঘরের শিকল খোলা। আমাদের তিনজনোর স্বপ্ন রান্না ও দুধ শিশু তিনটিকে খাওয়াইয়া জমিদার বধু নিশ্চিন্ত হইয়া বারন্দায় বসিয়া আছে। উছন নিবিয়া গিয়াছে। শুনিলাম জমিদার

মহাশয় রাত্রে লোকজন সহ ট্রেনে আসিবেন। গৃহিণী শিশুদের লইয়া মটোরে আগে আসিয়াছে। আমার দেখিয়া একগাল হাসিয়া বধুটি আগত জানাইয়া বলিল, বাস এসে দেখি দিদি বাড়ী নাই। কিন্তু পাকঘরে সবটি ঠিক আছে। উঃ ছেলাগুলি কী কাদনই জুড়েছিল ভাই, খেতে দাও ফিদা লাগছে করে।”

উত্তর দিব কি? এই পাণ্ডববর্জিত দেশে রাতে সকলকে কিখে থাইতে দিব সে এক সমস্যা? কোন

রকমে মুড়ী চিড়া দিয়া খাওয়া দাওয়া সারিয়া সবে শুইয়াছি। এমন সময় নিদ্রারাম প্রকাণ্ড একমাছ লইয়া হাজির। মাছটি রীতিমত পচিয়াছে। দুর্গন্ধে গা গুলাইয়া উঠিল। একগাল হাসিয়া সে বলিল, যা ঠাকরোণ ঘুমালেন নাকি? মাছটা একটু রসে গিয়েছেন রাতেই রেঁখে রাখবেন। আজ্ঞা আমরা এই এসে পৌছানাম। রাত তখন দশটা।

ঐ মাঝরাতে ঐ বৃহৎ পচা মাছ লইয়া কিবে করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বৌদিদি

শ্রীকালিদাস রায়

বধূর মাধুরী দিদির আদর জননীর ভালবাসা
কাণে মন্ত্রণা প্রাণে সন্তুনা ভয়ে ভাবনায় আশা
করুণা মমতা ক্ষমার ক্ষমতা সকলি মিলায়ে বিধি
এই বঙ্গের ঘরে ঘরে তোমা পাঠায়েছে বৌদিদি।

স্রাত্তভবন ছেড়ে চলে এসে ভাই ক’রে লও যারে,
নির্ভাবনায় রও পর ঘরে প্রহরী করিয়া তারে।
রাখালেরা হয় স্ববোধ গোপাল তোমার ভাষণ শুনে,
দাদা ভাবে ভাই সুশীল হয়েছে তাহারি শাসনগুণে।

দেবরের দ্বখে ব্যথা তব বৃকে বারে তব চোখে জল।
তার গৌরব গর্বেও তব আঁখি করে ছল ছল।
ভগিনী হীনের তুমিই ভগিনী সঙ্গিনী একাধারে।
শুভ কাস্তিক দ্বিতীয়ার ফোটা মনে মনে দাও তারে;

যুগে যুগে তুমি ভরতে গড়িছ ঘরে ঘরে লক্ষণে,
তোমার লাগিয়া ধরিতেছে জটা তাহার ভবনে বনে।
দিদি হ’য়ে তুমি চির মেহবতী বধুরূপে তুমি সতী,
বৌদিদি রূপে বঙ্গের গৃহে সন হ’তে গুণবতী।

কত আবদার সহ বার বার ঢাকো তার শত দোষ
নিজশিরে বহি লাকনা সহি সাধো তার সন্তোষ।
পতিপুত্রেরো ভাগ হ’তে লয়ে দেবরে তুষ্ট রাখো,
রোগশয্যার শিয়রে তাহার সারারাত জেগে থাক।

তোমার শ্রবণে কি ভূষণ বাজে দেখেনি সে চোখ-তুলে,
চিনে ভালো ক’রে আলতার দাগ তোমার চরণ মূলে।
তোমার সঙ্গে আচরণে চিনে মহিলার মর্যাদা,
নিখিল নারীরে শ্রদ্ধা স’গিতে হয় না তাহার বাধা।

তোমার চরণে দেবরের শিরে মধুর মিলন ভবে,
উভয় পরশে উভয়ে পাবন স্বর্গীয় গৌরবে।
তব চরণে ধস্ত করেছে দেবরের কেশগুলি,
ধস্ত করেছে দেবরের শির তোমার চরণ ধূলি।

সংসারের আদর্শ

শ্রীশান্তা দেবী

সমাজ রাষ্ট্র স্কুল কলেজ সকল জিনিষেরই যেমন আদর্শ আছে সংসারেরও তেমনি আদর্শ আছে। কিন্তু সংসারের আদর্শের কথা মানুষ বড় ভাবে না। সংসারে জন্ম হ'ল, বাপ মায়ের সংসারে বড় হলাম, তারপর নির্জেও একটা নতুন সংসার পাতলাম, কিন্তু কোনটাতেই কি ভাবে চললে সংসারে ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতি চায়-বিচার করা হয় এবং তারা স্মৃতি ও আনন্দে থাকে এ কথা আমরা খুব কম লোকেই ভাবি। যারা পাঠ্যপুস্তক লেখেন তাঁরা পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রেম পাতিব্রতা ইত্যাদি বিষয়ে লিখে থাকেন, কিন্তু কার্যত হয়ত দেখা যায় তাঁরাও ঠিক এসব নীতিগুলি সকলে পালন করে চলতে পারেন না। যারা বক্তা বা উপদেষ্টা তাঁরাও ভাবোচ্চাসের মুখে অনেক আদর্শের কথা বলেন কিন্তু জীবনে চলার পথে অনেকে তা সম্পূর্ণ ভুলে যান। এই ভোলা ছ' রকম হতে পারে। একদল ভোলেন নিজেদের স্বত্বশক্তি ও ক্ষমতার অভাবে। আর একদল ভোলেন টেচ্ছা করেই, তাঁরা মনে করেন বক্তৃতা ও উপদেশ পোষাকী জিনিস। আটপোরে জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রাখবার দরকার নেই। স্বত্ব শক্তি ও ক্ষমতার অভাবে যারা ভোলেন তাঁদের চেয়ে স্বেচ্ছায় যারা ভোলেন তাঁদের সংস্কার করা অবশ্য দেশী শক্তি; তবু মানুষ চেষ্ठा করে দেখলে ভাল। পৃথিবীতে মানুষের ক্রটি ও দুর্নীতিকে যত হালছাড়া ভাবে সহ্য করা যায় মানুষের দুর্গতি যে ততই বেড়ে চলে এত আমরা সর্বদাই দেখতে পাই।

স্বামী স্বী ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। কিন্তু এ দেশের সংসারে এখনও গ্রামে তিন চার ভাই বিবাহ করেও পিতা মাতার সঙ্গে ব শুধু নিজেগেই এত্রে বাস করছেন দেখা যায়। বড় বড় সহরে এটা কমে এসেছে, তবু ঠাংশিক ভাবে অনেক জায়গাতেই আছে। এইরূপ সংসারে মানুষের কতকগুলো বর্জ্য আছে যা সে ভালবাসার তাগিদেই

সুসম্পন্ন করে, আর কতকগুলো আছে যা সে বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে করে। ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে পরস্পরের প্রতি সকলেই ঠিক উচিত কর্তব্য করে বলা যায় না, তবে অল্পচিত যেগুলো করে সেগুলো ভুল বোঝার জন্মই করে। কিন্তু ভালবাসা যেখানে নেই, সেখানে উচিত কর্তব্য করা বিশেষ বিবেচক লোকের পক্ষেই সম্ভব। অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা শৈশব উত্তীর্ণ হলে পিতা মাতার প্রতি অনুরাগ হারিয়ে ফেলে। কেহ মাকে যদি বা ভালবাসে পিতাকে একেবারেই পছন্দ করে না, কেহ বা ঠিক তার উল্টা। আবার অনেকে নিজের সংসার স্ত্রী পুত্র কন্যা না হওয়া পর্যন্ত পিতৃমাতৃঅনুরাগ গভীর ভাবে দেখালেও পবে সম্পূর্ণ বদলে যায়। কত ভাই ভাই বা ভাই বোন কৈশোরে যৌবনে অভিন্নহৃদয়ের মত দিন কাটিয়েছে, কত কঠিন সাংসারিক পরীক্ষাও তাদের ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করতে পারে নি। কিন্তু মেধা গিয়েছে তেমন গভীর অনুরাগও নিজেদের বিবাহাদির পর কত জায়গায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থখ বা চরম দুঃখের দিনেও তারা পরস্পরকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয় না, হয়ত সামাজিক প্রথায় একবার খবর দেয়, অথবা তাও দেয় না। একই দেশে একই সহরে বাস করে কিন্তু কেউ কারুর খোঁজ করে না এমন ভাই বোনও আছে প্রচুর।

যেটা অফিস আদালতের কাজ সেখানে যার যার আর কাজ হয় না তাকে ছাড়িয়ে মানুষ সেই কাজে অল্প লোককে ভক্তি করে। কিন্তু যেটা অফিস নয়, গৃহ বা সংসার, সেখানে সেটা ঠিক সেভাবে চলতে পারে না বলেই সংসারে সমস্তা ও ট্রাজেডি। ভাই যখন আর ভাইকে ভালবাসে না তখন সে মনের সেই স্থান অল্প কোন বন্ধুকে হয়ত দেয়। কিন্তু হতে পারে যে দুই ভাইএর এক ভাই পূর্বে সম্পর্ক রক্ষার জন্য ব্যাকুল, দুঃখটা বা অপমানটা তাকেই আবাহত করে বেশী। এই অবহেলা বাইরের লোকের কাছে সে ঢেকে রাখতে

চায়, পাছে পরজিজ্ঞাসেবী মানুষের তারা একটা গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে। অবশ্য পরের গল্পের বিষয় হওয়াটাই যে মানুষের হৃৎকের একমাত্র কারণ তা নয়। শ্লোক আছে—

উৎসবে ব্যসনে চৈব হৃৎক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লব

রাজদ্বারে শ্মশানে চ য় তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

উৎসব বেশী না থাক, মানুষের জীবনে এই রকম ছোট বড় শত পরীক্ষা ত লেগেই আছে। ভাই বোন আত্মীয় ত সেই, যে সে সময় এসে তোমার বোঝার ভার খানিকটা হালকা করে দিতে হাত বাড়াবে। কিন্তু তাই কি সর্বত্র দেখা যায়? যেখানে একজন নানা বিড়ম্বনায় ক্লিষ্ট হয়েও “একলা চল রে” বলে এগিয়ে যাবার জন্য তারন্যাক্ষ দেহে চেষ্টা করছে, সেখানেই হয়ত দেখবে তারই হাতে করে মানুষকরা ভাই বোন নবলব্ধ ঐশ্বর্যমত্ত বন্ধুবান্ধব নিয়ে পুরাতন সম্পর্কগুলির অস্তিত্ব অপরকেও ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

যারা একই গৃহে বাস করে সেই পিতা মাতা ও সন্তানের সম্পর্কও কত শিথিল ও মমতাহীন হতে পারে তাও বহু স্থলে দেখা যায়। হাসপাতালে ডাক্তার কি নার্সের কাজ নিলে অক্ষম রোগীদের সাধ্যমত সেবা শুশ্রূষা করতে হয় একথা সকলেই জানে, বোডিং স্থলে চাকরী নিলে ছেলে মেয়েদের খাওয়া দাওয়া, অনুষং বিস্তৃৎ ও অন্ত্যস্ত প্রয়োজন দেখা শুনা করতে হয় ইহাও লোকে জানে। কিন্তু যে পিতামাতা বাল্য ও কৈশোরে অর্থ সামান্যাদি দ্বারা পালন করেছেন তাঁহারা পীড়িত বা অক্ষম বৃদ্ধ হলে সন্তানেরই যে তাঁদের পিতৃমাতৃস্থানীয় হতে হয় একথা অনেকের মনে থাকে না। তাই বাংলা দেশে অনেক উপযুক্ত পুত্রের জননী “ভাপের মা হয়ে উঠে গঙ্গা পান না।” অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা যথাকালে খাদ্য পানীয় পান না, কাহারও বা বাড়ীতে ঐশ্বর্য বিলাসের ছড়াছড়ি থাকলেও বৃদ্ধ পিতা মাতার ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ শয্যা, অপরিষ্কার ও আলো বাতাস হীন ঘর দেখলে বিস্মিত হতে হয়। রোগে পড়ে মাকে না ডাকে এমন সন্তান কম আছে, কিন্তু মা রোগে পড়লে মায়ের মত করে তাঁর সেবা করে এমন ছেলে মেয়ে বেশী দেখা যায় না।

মানুষের অফিস, বি চাকর, বন্ধু বান্ধব বদল করা যায়

কিন্তু পিতা মাতা ভাই বোন বদল করা যায় না। এই জন্তই যেখানে আত্মীয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা লুপ্ত হয়ে যায় সেখানে কর্তব্যবোধের দ্বারা তাকে জাগ্রত করা দরকার। মনে হতে পারে ভালবাসাই যদি না থাকে তবে কেন মিথ্যা কর্তব্যবোধের তাগদ? এক বাড়ীতে জন্মান ত আকস্মিক ব্যাপার মাত্র, প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের প্রতি কেন অকারণ কর্তব্যবোধ থাকবে? পারিবারিক বন্ধনই যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মূল এটা বুঝলেই এ কথা ঠিক জবাব দেওয়া যায়। রাষ্ট্র ও তার প্রজার যে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব আজীবন থাকে, তা ত পরিবার থেকেই উদ্ভূত। মানুষ যে জীবনবীমা করে সুখে দুখে সাহায্য পাবার জন্য সে জীবনবীমার একটা গোড়াপত্তন এই পারিবারিক ব্যবস্থাতেই হয়েছিল। টাকার প্রিমিয়ম দিয়ে তা করতে হয় নি, আত্মীয়তার বন্ধনের প্রিমিয়মেই কাজ চলত; আমি বলছি না যে প্রাচীন যৌথ পরিবারের মত বিরাট পরিবার গড়ার প্রথা আবার চালাতে হবে। নানা কারণেই তা এখন চালান শক্ত এবং অহুচিতও বটে। তবে যে সময় মানুষ স্বরাষ্ট্র স্বদেশ স্বজাতি ইত্যাদির প্রতি প্রীতি নতন করে কপট্যাচ্ছে, সে সময় নিজ গোষ্ঠির প্রতি অবহেলাটা তার মিথ্যা ভাষণের মতই শোনায। মনে রাখতে হবে প্রকৃতি ও বিধাতা যার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন তাকে ছাড়া যায় না। দেশকে ভোলা যদি অত্যাঁহ হয় তবে নিজের লোককে ভোলা তো আরও বড় অত্যাঁহ।

রক্তের সম্পর্ক যেখানে নেই, সেখানকার সব চেয়ে বড় সম্পর্ক স্বামী ও জ্বর। এ সম্পর্কের বন্ধন স্বেচ্ছায় গড়ে তোলা। যদিও ভালবাসা একে অনেক ক্ষেত্রেই সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করে তোলে, তবু তার বিপরীত জিনিষটিও সমানই দেখা যায়। বিবাহ বহু দিন পরে ধেরূপই ধারণ করুক না কেন প্রথমত এটা থাকে একটা চুক্তি। এই চুক্তি সাধ্যমত পালন কর্ত্তন করে? আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা এই চুক্তিকে একটা উচ্চ স্তরের সম্বন্ধ করে তুলতে চাই এবং চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেটা সেরূপ হয় না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় জ্বর প্রতি স্বামীর এবং কখনও স্বামীর প্রতি জ্বর কোন অনুরাগ বা আকর্ষণ নেই, গৃহের একটা চলন্ত আসবাবের মতই তাঁদের ধরা হয়। সে

ক্ষেত্রে আর কিছু না হোক উভয় পক্ষ নিজের কর্তব্যটুকু করলেও শোভন হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখি যদি গৃহকর্তার অর্থ না থাকে অথবা যদি গৃহকর্তা কৃপণ হন তবে স্ত্রীকেই বেশীর ভাগ স্থলে সকল রকম দাসত্ব করতে হয় এবং সব সমুদায়ই সহ্য করতে হয়। যার অর্থ নেই তাকে স্ত্রীকে রাজসমারোহে রাখতে বলা যায় না। কিন্তু যেখানে স্ত্রী ঘুটে দেওয়া, উলুন ধরানো, কয়লা ভাঙ্গা, ঘর মোছা ইত্যাদি সকল প্রকার কষ্টসাধ্য কাজ বার মাস ত্রিশ দিন করে সেখানে স্বামীর পক্ষে বাড়ি ভাড়াটা খেয়ে শুধু অফিস যাওয়া শোভন নয়। লোকে বলতে পারে স্ত্রীর কাজ আর স্বামীর কাজ পৃথক পৃথক। একথা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক ভাবে সত্য। যাদের স্বামীরা অফিসে হিসাব রক্ষার কাজ করেন তাঁদের অনেককেই সংসারের হিসাব রক্ষা করতে হয়, স্বামী মাষ্টারী করেন এমন শিক্ষিতা মহিলাদের অনেককেই সন্তানদের মাষ্টারী করতে হয়, চিকিৎসকের স্ত্রীরা চিকিৎসা না করুন রোগীর সেবা সর্বদাই করেন, আজকাল যারা রোজগারী স্ত্রী তাঁরা ত পুরুষের সব কাজই প্রায় করেন, সুতরাং স্ত্রী পুরুষের প্রাত্যহিক কাজে সর্বদাই আকাশ পাতাল তফাৎ থাকে না। তার উপর নিজস্ব ব্যবসায় যার নাই এমন প্রায় সব শিক্ষিত পুরুষই সপ্তাহে এক দিন এবং বৎসরে এক মাস হতে ৪৫ মাস পর্যন্ত ছুটি পায়। কিন্তু সংসারের কাজে ছায়নিষ্ঠা গৃহিণীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোন ছুটি নেই, যদি না তিনি স্বার্থপর হয়ে হাত গুটিয়ে থাকেন অথবা বধু কি কন্যা তাঁর কাজের ভার গ্রহণ করেন।

স্ত্রীলোকের সংসারের কাজ এক বেলা নয় চার বেলা। সাধারণত যারা চাকর বাবর একেবারেই রাখেন না তাঁদের দিনে অন্তত বারোঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয় এবং সেই পরিশ্রম কোন দিন একবেলাও বাদ যায় না। যারা ভারী কাজের জন্ত একট লোক রাখেন তাঁদেরও দৈনিক আট ঘণ্টা অন্তত পরিশ্রম না করলে রন্ধন পরিবেশন স্বামী পুত্রের পরিচর্যা ও সংসারের সুব্যবস্থা রক্ষার আনান্য কাজ হয় না। অধিকন্তু ছুটির দিনে পুরুষেরা ভাল খাওয়া আশা করেন বলে মেয়েদের কাজ বেড়ে যায়। এরকম জায়গায় বিবেচক স্বামীদের উচিত অর্ধেক ছুটির দিন নিজের আনন্দের জন্যে রেখে বাকি অর্ধেক ছুটির দিনে স্ত্রীকে ছুটি দিয়ে তার কাজ করে দেওয়া। কোনো

পুরুষই যে তা করে না তা নয়। এমন অনেক পুরুষ আছে যারা নিজের কাজের পর উদ্বৃত্ত সমস্ত সময়ই স্ত্রীকে সাহায্য করে, এমন কি মোটের উপর স্ত্রীর চেয়ে সংসারে বেশী পরিশ্রম করে। কিন্তু এটা আমাদের দেশের চলিত নিয়ম নয়। এগুলি ব্যক্তি বিশেষের গুণ কখনও বা দুর্লভতা।

সাধারণত বড় সংসারে কাজ ভাগ করে দেওয়া উচিত। বাড়ীতে যতজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা থাকেন তাঁরা যদি সকলে সমান ভাবে কাজ ভাগ করে নেন এবং ছোট ছেলে মেয়েদেরও বয়স অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ভার দেন তাহলে সকলেরই পরিশ্রম কম হয়। এ ছাড়া বয়স্ক পুরুষদেরও যথাসাধ্য মেয়েদের কাজের সাহায্য করে তাদের অঙ্গর বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু অধিকাংশ যায়গায় এটা হয় না। যে সব মানুষ স্বভাবত কর্ণিষ্ঠ তাঁরা, স্ত্রী কি পুরুষ বাই হোক, কাজ করে যায়, অল্পদের সাহায্য চায় না। এর ফলে আর সকলের আলাস্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আবার একদল মানুষ থাকে যারা কুলি খাটানো প্রকৃতির। তাঁরা বিছানায় শুয়ে বা আরাম কেদারায় বসে উদয়াস্ত হুকুম করে যায় : যারা হুকুম পালন করবে তাঁদেরও যে বিশ্রাম দরকার এ কথা ভাবে না। “নীচে কে কড়া নাড়ছে,” কর্তা চীৎকার করে উঠলেন আরাম কেদারায় বসে ; যতক্ষণ না হাতের কাজ ফেলে কেউ দেখে এল তিনি নড়লেন না। গৃহিণীও এমন থাকেন যিনি খাটে বসে ‘ওরে, আলমারী খুলে বাজারের পয়সাটা বার করে দিয়ে যা’ বলে তিনতলা থেকে একতলায় ছেলে মেয়েকে ডাকেন অথবা বসে বসে ‘ওরে দেখ্ দেখ্, ছেলেটা পড়ে গেল’ বলে চোঁচাতে চোঁচাতে যার ছেলেটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মাথা ফাটায়।

অনেক সংসারেই এমন কয়েকজন লোক থাকে যারা কর্তা বা গৃহিণী নয়, তাদের পিতা মাতা বা ছেলে মেয়েও নয়। এদের সঙ্গে কাকুর বা রক্তের সম্পর্ক, কাকুর বা বৈবাহিক সম্পর্ক। অনেক জায়গায় সমস্তা কঠিনতর হয় এদের নিয়ে। কোনো কর্তা বা গৃহিণী গৃহবাসী আত্মীয়কে যানির বলদের মত উদয়াস্ত ঘোরান, যেন গৃহে বাস করতে পাওয়ায় তারা দাসত্ব লিখে দিয়েছে, কেহ মনে করেন একরূপ আত্মীয়কে কোন কাজ করতে বললে তার মনে আঘাত লাগতে পারে, আবার কেহবা মনে করেন আমার গৃহে

বাস করে এরা আমার মধ্যাদা বাড়িয়েছে, এদের কাছে বিনীত হয়ে আমরাই চলব। তার ফলে আলস্ত্র দিবা নিদ্রায় ও পর চর্চায় এদের দিন বেশ কেটে যায় পরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। স্বার্থপরতা বা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে যদি গৃহকর্তা বা গৃহিণী যুক্তিপূর্ণত বিবেচনা দ্বারা চালিত হন, তবে এই সব মানুষের দ্বারা আশ্রয় পর সকলেরই উপকার হয়। গৃহে যে কেহ বাস করবে প্রত্যেকেরই গৃহস্থের প্রতি সমান কর্তব্য আছে এবং দায়িত্ব বোধ থাকবে এটি গৃহবাসী সকলকে ধরে নিতে হবে। তাতে লজ্জা অপমানও নেই, গৌরবই নেই, তা অবশ্যকর্তব্য। এই ভাবে বুঝে চললে নষ্ট সম্পর্কের তিক্ততা, মান অভিমান, রগড়াখাটী সকলের হাত হতে নিস্তার পাওয়া যায়।

স্বামী জীবন বিবাহের যে চুক্তি তাতে পরস্পরের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় সহায় হওয়া চাড়াও যে বড় জিনিষটী আছে তা প্রেম ও নীতি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নৈতিক আশ্রয় পুরুষ যতখানি সহজে নিকৃতি পায় স্ত্রী তার শতাংশের একাংশও পায় না অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

কিন্তু এ বিষয়ে নিষ্ঠুর আলোচনা করতে গেলে অনেক কথা ওঠে, তার স্থান আজ নেই। শুধু একটা কথা বলি— অনাস্থীয় মানুষের সঙ্গে ব্যবসাসম্পর্কিত চুক্তি ভদ্রপুরুষ যত ভাঙে, নিজের চিরসঙ্গী ও অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ স্বহৃদ জীবন সঙ্গে বিবাহের প্রতিজ্ঞার চুক্তি ভঙ্গ তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ভদ্র পুরুষ কেন করে বোঝা যায় না। বোধ হয় বিবাহের প্রতিজ্ঞা তাদের কাছে একটা মিথ্যা অনুষ্ঠান মাত্র। বিবাহের চেয়ে ব্যবসায় তাদের কাছে বড়। ভরণ পোষণের প্রতিজ্ঞাটা যতক্ষণ সে লজ্জন না করে ততক্ষণ সে নিজেকে সাধুপুরুষই মনে করে হয়ত।

সাংসারিক আদর্শ বিষয়ে খাপছাড়া ভাবে এই কয়েকটা কথা বলে সংসার যাত্রার সমস্যা যে সহজ করতে পারব তা মনে করছি না। কিন্তু মানুষ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং সেই চিন্তার ফলে ছোট ছোট সংসারে মানুষ গড়ার কাজটী একটু নিখুঁত ভাবে করার চেষ্টা অন্তত করে, এটুকুও আশা করা যায় যদি বহু জনে বহুবার আলোচনায় নামে।

বিদেশিনী

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়

যোগ্যভূমের সম্মান—ছয়জন মার্কিন মহিলা পুরস্কৃত

নিজ নিজ ক্ষেত্রে চরমোৎকর্ষের জন্য ছয়জন মার্কিন রাষ্ট্রবাসী নারীকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। 'উইমেনস আশনাল প্রেস ক্লাব' ইহাদের নির্বাচিত করিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্বহস্তে তাঁহাদের পারিতোষিক পত্র দান করিয়াছেন।

চলচ্চিত্রাভিনয়ে উৎকর্ষের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, শ্রীমতী অলিভিয়া ডি হেভিল্যান্ডকে। সম্প্রতি ইনি ১৯৪২ সনের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার পাইয়াছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরস্কার পাইয়াছেন, ৩১ বৎসর বয়স্কা ডাঃ মিলড্রেড রেবটক। পেনিসিলিন, ট্রেপটোমাইসিন, ইত্যাদির সমতুল্য একটি রোগবীজনাশক ঔষধ-ক্লোরোমাইসেটিন ইনি যৌগিক পন্থায় প্রস্তুত করিতে

সমর্থ হইয়াছেন। পাল ওয়ানামেকার পুরস্কার পাইয়াছেন শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশ্বরাষ্ট্রসভার শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি শাখায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিদ্যালয়সমূহের পরিচালন পরিষদের তিনি প্রথম মহিলা-প্রেসিডেন্ট। মার্কিন মহিলাদের জন্য খাটি মার্কিনী পোষাকের স্বশোভন পরিকল্পনার জন্য পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে শ্রীমতী ক্লেয়ার ম্যাককার্ডেলকে। নাচের পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীমতী মার্থা সগাহাম এবং সরকারী চাকুরিতে দায়িত্বশীল, উচ্চপদ লাভের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন ডাঃ হ্যারি এমার্সন কসডিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি প্র্যানিং কমিটির তিনি একজন সদস্য।

মৃত্যুঞ্জয়

চার বছরের দুঃস্বপ্ন ছেলে মাইক রেকটর। দুঃস্বপ্ননার

তার অন্ত নেই। দেশলাই-এর বাক্স নিয়ে খেলছে সংগী সাখীদের সাথে। তার অংগবাসে আঙুল লেগে গেল কেমন করে খেলতে খেলতে। তার মা ছুটে এসে যখন তার পরিষেয় ছিঁড়ে ফেলে দিল তখন তার দেহের প্রায় সমগ্র অংশই পুড়ে গেছে। পায়ের গোঁড়ালী থেকে হাতের কজী পর্যন্ত কোন অংশই অক্ষত নেই। তাড়াতাড়ি ওয়াশিংটনের এক হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হোলো। চিকিৎসা শুরু হোলো ততোধিক তৎপরতায়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তার জীবন সম্বন্ধে কোন ভরসাই দিতে পারলেন না। শরীরের এতখানি অংশ দহ্ন হয়ে যাবার পর কোন দিন কেউ বেঁচেছিল বলে তাঁদের জ্ঞান নেই।

কিন্তু জগতে বিশ্বয়ের অতীতও বিশ্বয় আছে। অভূতপূর্ব এবং কল্পনা বহির্ভূত বহু ঘটনাই হুনিয়ায় ঘটে থাকে।

দশের চিকিৎসার দিক দিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভূত উন্নতিই সাধন করেছে—তার অগ্রগমন আজো অব্যাহত। কে জানে হয়ত পর্যাপ্ত পরিমাণ নূতন রক্তসঞ্চারে ও নূতন চর্ম জোড়া দিয়ে এহেন রোগীকে দিয়ে একটা নূতন পরীক্ষা চলতে পারে। একটা অভিনব যুগান্তর ঘটতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞান।

খবরের কাগজে ও বেতারে ছেলেটির মর্মান্তিক কাহিনীটা প্রচার করা হোলো। যদি কিছু জীবন্ত মহুশ্যরক্ত ও মলুষ্যচর্ম পাওয়া যায় তবে ছেলেটিকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে। সংগে সংগে বিভিন্ন দিক থেকে রক্তদান ও চর্মদান আসতে লাগলো। বাপ মা আত্মীয়েরা তো দিলই আরো দিল প্রতিবেশীরা, অপরিচিতেরা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান এলো।

প্রদাহবিশেষজ্ঞদের সমাবেশ হল। দিনরাত তাঁরা খাটলেন। নূতন রক্ত, নূতন ওষুধ নিষিক্ত হোলো। সর্ব ব্যবস্থাই করা হোলো, বালকটিকে হাস্যোজ্জ্বল্যে মাতিয়ে রাখতে। এমনি করে একদিন সে দুর্ঘটনার আকস্মিক আঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করল। তারপর তার দেহে নবচর্মের আবরণ লাগানোর অস্ত্রোপচার শুরু হোলো। ছেলেটা অবিখ্যাসারকমের আনন্দোৎফুল্ল ছিল আদ্যোপান্ত অস্ত্রোপচার পর্যন্ত।

অবশেষে সতের মাস পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে বাড়ী ফিরে গেল। সমগ্র আমেরিকাবাসী এই সংবাদপাঠে আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল। একটা মাংসপেশীর সাধারণ সংকোচের জন্তে সে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে। একটা সামান্য অস্ত্রোপচারে এটুকুনও নিরাময় হয়ে যাবে—ডাক্তারদের তাই অভিমত।

যুড়ার সংগে সংগ্রাম করে জিতল পাঁচ বছরের ছেলেটি।

জীবনের সার্থকতার অর্থ কি

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের মতামত সংগ্রহ

অত্যন্ত দেশের ছাত্রগণ জীবনের সার্থকতা বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রগণও কি সার্থকতা বলিতে তাহাই বুঝিয়া থাকে? এই প্রশ্নটির মীমাংসা করিবার জন্ত আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ১১টি দেশের এক সহস্র ছাত্রের মতামত সংগ্রহের কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি হইতেছে ম্যাসাচুসেটসের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। মিশর, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, জাপান, মেক্সিকো, পোল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রগণের মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হইয়াছে।

ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হইবে জীবিকা হিসাবে তাহারা কিরূপ কার্য পছন্দ করে, কত বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে চাহে, বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তাহারা কিরূপ আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং বিবাহিত নারীদের কি ধরণের চাকুরী করা উচিত। ‘জীবনে কি করিতে পারিলে তুমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে-করিতে পার,’ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কি আর কোনও যুগ হইবে বলিয়া তুমি মনে কর’—প্রভৃতি প্রশ্নও ছাত্রদের করা হইবে। উহা ছাড়া জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে প্রতি ছাত্রকে একটি করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

এক বৎসরের পূর্বে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জানিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির লোকের মনোভাব কি এই ব্যাপারে তাহাও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। মনস্তত্ত্ববিদগণও এই

ধরণের তথ্যসংগ্রহের ফলে বহু বিষয় জানিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

বতমান বৎসরের বিশেষ সম্মানিতা মার্কিন মহিলা

ওয়াশিংটন, ২রা মে—মিসেস হেনরী রো, ক্লাউডকে এবৎসরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাদার অব দি ইয়ার (Mother of the Year) নির্বাচিত করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর এইভাবে আমেরিকার একজন করিয়া মহিলাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিতা করা হয়। মিসেস ক্লাউডের স্বামী ছিলেন একজন ইণ্ডিয়ান (আমেরিকার আদিম অধিবাসী); তিনি স্বয়ং মিশ্রজাতি উৎপন্ন।

৪৮টি স্টেটের ৫২টি মহিলা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন—তন্মধ্যে মিসেস ক্লাউড নির্বাচিতা হন। আগামী ১২ই মে নিউইয়র্কের ওয়ালডফ এষ্টোরিয়া হোটেলের একটি ভোজসভায় মিসেস ক্লাউডকে বিশেষভাবে সম্মানিতা করা হইবে।

মিসেস ক্লাউডের পূর্বে আরও ২৫জন মার্কিন মহিলাকে এইভাবে সম্মানিতা করা হয়।

মিসেস ক্লাউড চারিটি কন্যার জননী। তাঁহারা সকলেই শিক্ষালাভের জন্ত বৃত্তি পাইয়াছেন।

মার্কিন সমাজজীবনে নারীর স্থান

আমেরিকার বিশিষ্ট নরনারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞাপক পুস্তকের ১৯৪৮-৪৯ সালের সংস্করণে ২৪০২ জন বিশিষ্ট মহিলার পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মহিলা খ্যাতিলাভ করেন শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

অল্প বয়স্কানের ফলে দেখা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ২৩টা নারী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। উহাদের মধ্যে আছেন ৩ জন কলেজের প্রেসিডেন্ট, ১০৫ জন কলেজের ডীন, ২২ জন অধ্যাপক এবং ৮৩ জন শিক্ষক। স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীদেরই প্রধানতঃ শিক্ষক তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

মহিলা গ্রন্থকার ও লেখিকার সংখ্যা হইতেছে মোট সংখ্যার ২২ ভাগেরও অধিক। গল্প, প্রবন্ধ কবিতা ও নাটক প্রভৃতি লিখিয়া তাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সংবাদ পত্রের সম্পাদিকা, রিপোর্টার ও লেখিকার সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬ ভাগেরও অধিক, সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ। সমাজ কল্যাণ মূলক কার্যে নিযুক্ত আছেন শতকরা ২ ভাগেরও অধিক, নর্তকী ও অভিনেত্রীর সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৫ ভাগ।

অবশিষ্ট ২২ শতাংশে নিম্ন লিখিত রূপে ভাগ করা যায় :

সমাজ কল্যাণ কর্মী ৪ শতাংশ, রাজনৈতিক কর্মী ৩ শতাংশ, ব্যবসায় কর্মী ৩ শতাংশ, গ্রন্থাগারিক ২ শতাংশ, ধর্মপ্রচার কর্মী ২ শতাংশ, বক্তা ১ শতাংশ, চিকিৎসক ও শল্য চিকিৎসক ১ শতাংশ, উকীল ও বিচারপতি ১ শতাংশের কম, বিবিধ ৫ শতাংশ।

আলোচ্য মহিলাদের মধ্যে অর্ধেকেরও অধিক মহিলা গ্রাজুয়েট অথবা তদতিরিক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। অর্ধেকেরও অধিক মহিলাদের বয়স ৪৫ হইতে ৬৪ এর মধ্যে। শতকরা ১ জনের বয়স ৩০ এর নীচে। উহাদের মধ্যে বিবাহিতা নারীর সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

ডাঃ অসীমা মুখার্জি

কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডাঃ অসীমা মুখার্জি ডি, এম, সি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। ইনি ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি লইয়া আমেরিকা ও ইউরোপে নানা বিদ্যাপীঠে গবেষণা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া

সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত হইবার জন্ত ও বিদেশের বৈজ্ঞানিকবিদগণের সহিত আলাপ ও আলোচনার নিমিত্ত বাঙ্গলায় মনীষীগণের পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দাসগুপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহারীলাল মিত্র ফেলো। শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দাসগুপ্ত এম-এ, বি-টি, ডিপ-এড (লীডস)। কয়েক মাস আমেরিকায় নানা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোম্ব ট্রাভেলিং বৃত্তি লইয়া গিয়াছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক সহরে নানা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছেন। মিস্ দাসগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য কারিকরী বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সঞ্চরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষা; তিনি বিদেশে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন তাহার দ্বারা স্বাধীন ভারতের নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বহু কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হইবে।

ম্যাডাম রোমা রোলান্ড ও রবীন্দ্র পত্রাবলী

শান্তি নিকেতনে উত্তরাংশে (রবীন্দ্র নাথের আবাসে) কাবর স্মৃতিজড়িত নানা প্রকার দ্রব্য, হাতের লেখা, চিত্র, পত্র পুস্তক সংগৃহীত হইয়া বিরাট সংগ্রহালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রোমা রোলান্ড পত্নী ম্যাডাম রোমা রোলা তাহার স্বামীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কতগুলি পত্রের মাইক্রোফিল্ম করিয়া বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। রবীন্দ্র সংগ্রহের মূল্য এই পত্রাবলীর দানে বৃদ্ধি হইল।

পূর্ববঙ্গে ধর্মিতা নারী প্রত্যর্পণ

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে নূহন দিল্লীতে নেহেরু-লিষাকত আলির যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার অনেক গুলি সত্ত্বের মধ্যে ধর্মিতা ও ধর্মাস্তরকারিণী নারীদের উদ্ধার ও প্রত্যর্পণ ছুটি। প্রায় দুই মাস হইয়া গেল তথাপি দেরূপ একটি নারীও উদ্ধার হয় নাই এবং একটি মহিলাও প্রত্যর্পিত হয় নাই।

এই চুক্তির সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া মাননীয় ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখার্জি ও মাননীয় ক্ষিতীশ নিয়োগী ভারত সরকারের মন্ত্রীপদ একযোগে ত্যাগ করিয়া বাংলার মধ্যদা বুদ্ধি করিয়াছেন। ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখার্জি ২১শে মে দেশপ্রিয় পার্কে তাহার সঞ্চর্জনার সময় এক লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বলেন যখন একটি মাত্র সত্ত্ব অর্থাৎ বলপূর্বক

ধর্মিতা বা ধর্মাস্তরিতা নারীগণকে প্রত্যর্পণ করিবে তখনই চুক্তি সফল হইবে।

এই সমস্ত দুর্ভাগিনী নারীদের উদ্ধার না হইলে পূর্ববঙ্গে কোন নারীকে আত্ম-সম্মান ও মধ্যদা রাখিয়া বাস করিতে বলা যায় না।

তিনটি রাজকুমারীর বিবাহ সঙ্কট

বিশ্ব হইতে রাজবংশ ত এক রকম লোপ পাইতে বসিয়াছে। তথাপি রাজোচিত গর্ব ও মধ্যদা রক্ষার জন্ত এখনও অনেক রাজবংশ আগ্রহান্বিত।

সম্প্রতি তিনটি বিশিষ্ট রাজবংশের (জাপান, ইরান ও মিশরের) কত রাজবংশের বাহিরে সাধারণ লোককে বিবাহ করিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার জন্ত তাঁহাদের ক্ষতি ও নিন্দা ভোগ করতে হইয়াছে।

একজন মিশরের রাজা ফরুকের ভগ্নী রাজকুমারী ফাতিয়া তাহার মাতার কন্যাস্বামীকে বিবাহ করিয়াছেন। রাজা তাঁহাকে সর্ব রাজ সম্মান ও অর্থ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় জাপান সাম্রাজ্য হিরোহিতোর চুহিতা। ইনি ১৯ বৎসর বয়সে ২৭ বৎসর বয়স্ক একজন জাপানী সাধারণ পুরুষকে বিবাহ করিয়াছেন। তৃতীয়া পারস্যের শাহের ভগিনী। ইনি একজন আমেরিকান ক্যাথলিককে বিবাহ করিয়াছেন।

এণ্ডামানে হিন্দী শিক্ষায় বঙ্গরমণী

নানা অভ্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিয়া ভিটা মাটি ত্যাগ করিয়া নিপীড়িত বাদ্গালী প্রাণ ও মান বাঁচাইবার জন্ত এণ্ডামান দ্বীপ পুঞ্জে বাস করিতে গিয়াছেন। তাহার। তাঁহাদের ধর্ম সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে রক্ষা করিবার জন্ত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিপদ শঙ্কল আন্দামান গিয়াছেন।

তাঁহাদের নিজস্ব শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা সরকার করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাষা ভুলাইবার জন্ত হিন্দী ভাষার অভিযান সেখানে গিয়াছে। অন্ততাপের বিষয় একজন বঙ্গ রমণী শ্রীমতী মল্লিকা দেবী হিন্দী শিক্ষাইবার ভার লইয়া আন্দামান ঘাইতেছেন। বাদ্গালী জাতি এইরূপেই পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে যদি নারীর ও বাদ্গালী লোপ করান হয়। মল্লিকা ঘোষ ওয়াদ্দার কন্যাস্বামী।

১৪৯ বৎসরের নারীর মৃত্যু

আমরা প্রায় কামনা করি শতাব্দী হন। কিন্তু ১০০ শত বৎসরের অধিক বাহারা বাঁচেন তাঁহারা প্রকৃত পুণ্যরান। সম্প্রতি ১৪৯ বৎসর বয়স্কা অফ্রিকান নারীর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দুই দিন পূর্বে ভারতেও এক শত নর (১০০) বৎসরের এক নারীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছি। অধিক দিন বাঁচিলে অনেক শোক পাইতে হয়, কিন্তু এই দুলভ মানব জন্ম যত দিন থাকে ততই মঙ্গল।

পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের জীবন কাল বেশী হইয়া থাকে। পুরুষ মানুষ এক শত বৎসরের উপর জীবিত থাকিতে দুইজনকে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একজন ১১০ বৎসরের উপর স্বামী ভোলানন্দ গিরি গুরু মহারাজ ও অল্পজন বৈষ্ণব চুড়ামণি রসিক বিদ্যাবূষণ (১০০) মহাশয়। তাঁহাদের পুত্র চরিত্রই তাঁহাদের দীর্ঘায়ু করিয়াছিল।

ইন্দিরা দেবীর সম্বন্ধনা

ঘোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জ্ঞানী মহিলা ইন্দিরা দেবী “বীরবলে”র সহধর্মিণী। তাঁহার সম্বন্ধনা আয়োজন কলিকাতার নারী সমাজ করিয়া অত্যন্ত সং কাধ্য করিয়াছেন। এই অস্থানে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী চারুলতা মুখার্জি, বাংলার নারী শিক্ষার এক বিশিষ্ট সাধিকা মিসেস পি. কে. রায় এর কন্যা। সম্বন্ধনা সভা বসিয়াছিল গোথেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে।

নিঃ ভাঃ নারী মহাসমেলনের কলিকাতা প্রতিষ্ঠান চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শন করেন। শ্রীমতী সুধা মজুমদার ইন্দিরা দেবীকে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত আলোয়ান উপহার প্রদান করেন। অস্থানের সহিত সঙ্গীত, অভিনয় ও নানা চারুকলা বাহা ইন্দিরা দেবী চির সাধানার বিষয় তাহার প্রদর্শন হয়। নীলিমা দাসের পরিচালনায় শকুন্তলা গুপ্ত

ভারত নাট্যম নৃত্য ছন্দ প্রদর্শন করেন। কেবল সমাজের স্রোজিনী নায়েদের বীণা বাদ্য মহিলাদেরই তবলা সঙ্গতের সহিত হয়। ইহা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, শ্রীমতী ললিতার রবীন্দ্র সঙ্গীত, গান্ধারী মহিলাদের ঢোলক সঙ্গীত, মধুলেখা, ও মায়াব নৃত্য, শীলা ও ললিতার ভাষ্ক সিংহ পদাবলীর গান ইন্দুরাণী-গোবিন্দীর রাজপুত্র বীরঙ্গনা নৃত্য-খুবই মনোরম ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

ইন্দিরা দেবী ভাষণে বলেন-মহিলাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অভিযানে কোনরূপ প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা তাঁহাদের সময় ছিল না, এখন সে দোষে নারী সমাজকে কলুষিত না করিতে তিনি সাহসে নিবেদন জানান।

নিঃ ভাঃ নারী শিক্ষা মন্দির

১৯৩৫ সালে বাবীপীঠ নাম দিয়া শ্রীমতী শ্রীমমোহিনী দেবী যে প্রতিষ্ঠান পত্তন করেন তাহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় আজ নিখিল ভারত নারী শিক্ষা মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। ২০১২ ক্যানলে ওয়েস্ট রোডে (মাণিক ওলার কাছে) ৫১ কাঠা জমির উপর প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যে গৃহ উঠিয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা শ্যামামোহিনী দেবী এই প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন। এই গৃহ নির্মাণ শেষ হইলে প্রায় ১০০০ হাজার ছাত্রী এই বাড়ীতে বাস করিয়া অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। সরকার এই প্রতিষ্ঠানে ১৫,০০০ দিয়াছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমতী অমরুপা দেবী সহঃ সভানেত্রী মিসেস পান্নালাল বসু এবং সম্পাদিকা শ্রীমমোহিনী দেবী (৫৭৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা)। বর্তমানে ইহা বাস্তবহারী ছাত্রীদের বিনা খরচে ও পড়ার ব্যবস্থা করিতেছে। এই মহিলার দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী একান্ত প্রার্থনীয়।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি ।

শোক সংবাদ

সমিতির আজীবন সভা ও ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী গত ৫ই জুন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ছায় একজন শিক্ষাব্রতী ও অক্লান্ত কর্মী হারাইয়া সমিতির যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। ১৯৩৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি সাধারণ সম্পাদক রূপে সমিতি পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভিতরে সমিতিতে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব, আন্তরিক প্রয়াস, ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমিতিতে দ্রুত উন্নতির পথে আগাইয়া দিয়াছেন। ১৯৪৭ সন হইতে তিনি সমিতির সহ-সভাপতিরূপে কাজ করিতেছিলেন। সমিতির কাজে যখনই তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে, অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বেই হাওড়া রেলওয়ে মহিলা সমিতির রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে অসুস্থ শরীর লইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। অসুস্থ বলিয়া সেই সমিতির ডাক এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার পরলোক গমনের সময়ে, তাঁহার শোক সন্তপ্ত

পরিবারের সহিত সরোজনলিনী সমিতি সমবেদনা জানাইতেছে।

তিনি যে শুধু সরোজনলিনী এসোসিয়েশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা নয়। আরও অনেক জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত কাষাত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁহার ছায় বাগ্মী ও সুপণ্ডিত অতি বিরল। তিনি রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক-রূপে ২৭ বৎসর কাজ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর যে পুস্তক রহিয়াছে, তাহা সুদীর্ঘ সময়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। তিনি বিজ্ঞানের পূজারীই একমাত্র ছিলেন না, রসাল সাহিত্যও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। সরোজনলিনী সমিতির মূখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজে বিজ্ঞান বিষয়ক ও নারী-সমাজের উন্নতি মূলক অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি যে, সরোজনলিনী সমিতির সাহায্যে তিনি মাতৃ জাতির সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, এবং সেজন্য তিনি ধন্য।

তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করা যাইতেছে। আগামী সংখ্যায় বাংলার এই কৃতী সন্তানের বিষয়ে আলোচনা করিবার আশা রহিল।

স্বদেশ ও বিদেশ

মন্ত্রিরূপে চারুচন্দ্র বিশ্বাস

আমাদের শ্রেষ্ঠ সভাপতি মহাশয় মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণে ও অহুরোধে রাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর কাজ হইবে সংখ্যা লঘুদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র-সচিবরূপে তিনি পুরাপুরি মন্ত্রি-সমিতির একজন নহেন। তাঁর আগিস কলিকাতাতেই রহিল। তিনি সন্ন্যাসি প্রধান মন্ত্রীর নিকট সমস্ত বিষয় গোচর করিবেন এবং

এই নির্দিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রি-সমিতি তাঁর পরামর্শ অহুসারে চলিবেন ও নীতি নির্ধারণ করিবেন, ইহাই আশা করা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁর সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইয়াছে, ইহাতে আমরা দুঃখিত। আশা করি, তিনি অন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত আছেন, সেগুলিকে ত্যাগ করিবেন না।

বিশ্বাস মহাশয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায়, বিশেষতঃ ডঃ শ্রীমা-

প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মন্ত্রি-পদে ইতৎক দিবস অব্যবহিত পরেই করায়, অল্প বিস্তর সমালোচনা হইয়াছে। তার চেয়েও বেশী সমালোচনা হইয়াছে, তিনি পূরা-মন্ত্রী না হওয়ায় অথবা ঐ পদ তাঁকে না দেওয়ায়। উৎসব নানারূপ অপব্যয়্যও হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাস পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রি-রূপে মনোনীত হইলে আমরা আনন্দিত হইতাম। কারণ, পূরা ক্ষমতা-শুধালা বিভিন্ন মন্ত্রীর নাম বার বার পাঠ করিয়াও আমরা একথা বিশ্বাস করিতে অক্ষম যে তাঁর চাইতে যোগ্যতর লোক মন্ত্রি-সমিতিতে বেশী আছে। যদি কংগ্রেস-দলের না হওয়াতে, তাঁর এই পদত্যাগ হইয়া থাকে, তা হইলে বলিতে হয় ডক্টর জামা প্রসাদ, ডক্টর ম্যাথাই কংগ্রেস দলীয় ছিলেন না। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের পরে নিযুক্ত সার চিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ কংগ্রেস দলের নহেন। আমাদের বিবেচনায়, এই সব ক্ষেত্রে যোগ্যতা একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত। আমাদের মনে এইরূপ একটি সন্দেহ জাগিতেছে যে, বিশ্বাস মহাশয় বাঙ্গালী হইয়া জন্মিবার রূপরাশ বতক্ষণ স্থলেন না করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

অল্প দিকে আমরা বলিব, এই সংকট মুহূর্তে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস যদি মনে করিয়া থাকেন দেশ-সেবা তাঁর পরিজ্ঞ কৰ্ত্তব্য এবং তজ্জন্য মান-অভিমানের প্রশ্ন তুচ্ছ, তা হইলে তিনি মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালীশূন্য মন্ত্রি-সমিতিতে তিনি বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি-রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁর কাজের ফলাফল যাই হোক, এজন্য বাঙ্গালী সমাজ তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে; ডঃ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিয়োগীর পদত্যাগের সঙ্গে তাঁর পদ-গ্রহণের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁদের ত্যক্ত কোন পদের জন্য বা বাঙ্গালীর জায়গায় বাঙ্গালী লওয়া হয় নাই। বস্তুত, আমরা মনে করি না—কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সমিতিতে অল্পপাত করিয়া প্রদেশ অল্পদূরে মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হইবে; আমরা মনে করি, সব ভারতীয় শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে প্রদেশ-নিবিশেষে মনোনীত করা উচিত। তাতে একজন বাঙ্গালীও না ছোটে তা না জুটিল।

বিশ্বাস মহাশয় উৎসাহ ও উদীপনা লইয়া কাজে

নামিয়াছেন। তাঁর ছোট মন্ত্রী পদ গ্রহণ করায় যে সকল বন্ধু ও হিতৈষী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাঁদের পূর্বতন প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের জীবনের একটা ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ যখন ডার্ডেনেলিস্ যাত্রা করিল না এবং গ্যালিপোলি ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, তখন মন্ত্রি সমিতির চার্চিল পদ-ত্যাগ করিয়া সামান্য মেজর রূপে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করেন। তথাপি বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই।

পদত্যাগের বাহুল্য

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক গগনে গত ৫৬ মাস ধরিয়া এত ক্ষতবেগে দৃষ্টি পরিবর্তন হইতেছে যে, তার সহিত তাল রাখা দায়। ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র পূর্ববঙ্গে জুড়িয়া এবং পশ্চিম বংগের কোথাও কোথাও (সেজন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি) ববরতার চবম দৃষ্টাবলী প্রকটিত হইল; তারপর দরদী পশ্চিম নেহরুর পশ্চিম বংগে আগমন ও ভ্রমণ; লিয়াকৎ আলি খানের দিল্লী আগমন ও নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি, লিয়াকৎ আলির আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন ও ভ্রমণ; মন্ত্রি-সমিতির বিভিন্ন সদস্যের পর পর পদত্যাগ; ডক্টর জামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুক্তির বিরোধিতা ও বংগের নানাস্থান পরিভ্রমণ; ডালমিয়া-প্যাটেল ও ডালমিয়া-নেহরু বিতর্ক; আরও কত কি।

ডঃ মুখার্জি ও শ্রীযুক্ত নিয়োগীর পদ-ত্যাগকে নূতন করিয়া মন্ত্রি সমিতি নিয়োগ ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের সহিত গুলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। নূতন মন্ত্রি-সমিতি গঠনের আগেই চলিয়া আসন বা পরে তাঁদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হউক, পদত্যাগী মন্ত্রীরা হইতেছেন ডঃ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত নিয়োগী, ডঃ ম্যাথাই, শ্রীযুক্ত সাকসেনা। ইহারা সকলে একই কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন মনে করিলে ভুল হইবে। প্রত্যেকের সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং প্রত্যেককেই পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে অহরোধ জানাইয়াছেন। কোন কল হয় নাই।

• ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ডঃ মুখার্জি ও ডঃ ম্যাথাই কংগ্রেস-দলীয় নহেন, শ্রীযুক্ত নিয়োগীকেও কংগ্রেসী

মাপকাঠিতে খাটো দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁদের একজনেরও পদ-ত্যাগের কারণ দলের দাবী নহে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রি-সমিতি সম্বন্ধে এখানে দু' একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মন্ত্রি-সমিতি গঠিত হইবার পর উহা একটি অবিস্তারিত শক্তি, উহার মধ্যকার বিভিন্ন মন্ত্রীদেব তখন আলাদা অস্তিত্ব, আলাদা অভিপ্রায়, আলাদা উদ্দেশ্য প্রভৃতি কিছুই থাকে না। আমাদের ইহা বলা অভিপ্রেত নহে যে, তাঁরা সমস্ত ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া সর্বদা প্রধান-মন্ত্রী বা শক্তিশালী উপদলকে সমর্থন করিবেন। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, বৃটিশের অন্তর্য্যয়ে আমরা যে মন্ত্রি-সমিতির শাসন কায়েম করিয়াছি, তার মূল কথা এই যে, মন্ত্রি-সমিতির মধ্যে আলোচনা কালে প্রত্যেক ব্যক্তির স্ব স্ব স্বাধীন অতিমত ব্যক্ত করিবার ও তার জন্য লড়াই করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু হারিয়া গেলে, সমগ্র মন্ত্রি-সমিতি বা নীতি বলিয়া গ্রহণ করিবে, দেশের সর্বত্র তা সমর্থন করা তাঁদের কর্তব্য। এই কর্তব্য অবহেলা করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়।

কিন্তু মন্ত্রি-সমিতির অন্তর্গত মন্ত্রীর জীবনে এমন সময় আসিতে পারে যখন তাঁর পক্ষে আর কোনক্রমেই মন্ত্রি-সমিতির নীতি সমর্থন করা চলে না। তখন উহার পোষক-রূপে মন্ত্রি-সমিতিতে থাকা তাঁর পক্ষে ভগ্নামি স্বরূপ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পদ-ত্যাগ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর কি? একমাত্র পদত্যাগ করিলেই তিনি দেশের লোককে বুঝাইবার অবসর পান, নেতাদের ভুল দেখাইবার ও নিজের সপক্ষে লোকমত গঠন করিবার। যারা তাঁকে নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁদের প্রকৃত প্রতিনিধি থাকিতে হইলে তাঁকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

মন্ত্রি-চতুষ্টয়ের মধ্যে সাক্ষেনার পক্ষে পদত্যাগ করিবার এরূপ কোন কারণ ঘটে নাই, তা তাঁর ঘোষণা হইতেই জানা যায়। তিনি যখন এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পূর্বসতি সম্পর্কে যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেগুলি যথাযথ সম্পাদন করিতে না পারায় তিনি সরিয়া যাইতেছেন, এই যুক্তি আমাদের কাছে ছেলেমানুষি বোধ হয়।

অর্থ সচিব জন ম্যাথাই

অর্থ সচিবরূপে ডাঃ জন ম্যাথাইকে দেশের লোকের

বহু অশ্রীতিকর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যার হাতে টাকার ক্ষমতা তাঁকে দু'কথা শুনিতেই হয়। তার উপর অকংগ্রেসী হওয়ার অপরাধে তাঁর প্রবণতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নহে। ইদানীং তিনি কতক কতক উদ্বা প্রকাশ দ্বারাও তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি অর্থ-সচিবের পদের জন্য লালসিত নহেন। পদ-ত্যাগের কালে তিনি মনের কথা খোলসা করিয়া বলেন নাই। আমাদের কাছে ইহাই বুঝিতে হইয়াছিল যে প্রধান-মন্ত্রীর সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি পদ-ত্যাগ করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া যাত্রার প্রাক্কালে জিবাঙ্কামে পণ্ডিত নেহেরু যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি এই কথা বলেন, প্র্যানিং কমিশন সম্বন্ধে তাঁর সহিত মতের মিলনা হওয়ায় ডাঃ ম্যাথাই কাজ ছাড়িয়াছেন। এই অমিল নীতিগত নয়, পরস্পর খুঁটিনাটি লইয়া।

কিন্তু উত্তরে উক্ত ম্যাথাই-য়া বলিয়াছেন তাঁতে আমরা নির্বাক হইয়া গিয়াছি। অর্থ-সচিবের পদ-ত্যাগের কারণগুলি তিনি যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তা সংক্ষেপে এই :—

(১) অর্থ-সচিবরূপে সর্বদা তাঁর মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। তাঁর অমত সম্বন্ধে অর্থ-ব্যয় হইয়াছে। স্ট্যান্ডিং ফিন্যান্স কমিটি যে সকল ব্যয় সংস্কারের পরামর্শ দিয়াছে, সেগুলি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর দপ্তর সর্বাপেক্ষা অপরাধী। প্রধান মন্ত্রীর এই দুঃস্বস্ত দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক।

(২) প্র্যানিং কমিশন দ্বারা কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা যোগ্য লোকদের দ্বারা গঠিত নয়। প্রধান মন্ত্রী উহার সভাপতি, কিন্তু একজন অবৈতনিক সরকারী কর্মচারী উহার সহকারী সভাপতি। সুতরাং অর্থ-সচিবকে এই কমিশনে একজন সামান্য সদস্যরূপে রাখিয়া নিম্নতর পদ দেওয়া হইয়াছে। কমিশনের প্রত্যেক সদস্য মন্ত্রীদের সমান বেতন পাইতেছেন। অথচ তাঁদের দ্বারা কোন কাজ হইতেছে না।

(৩) নেহেরু-লিঙ্কিং চুক্তি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। ইহা শুধু পাকিস্তানকে তোষণ করিবার একটা ব্যর্থ-প্রচেষ্টা মাত্র।

ডক্টর ম্যাথাই পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রিরূপে দেশের স্বার্থ তাঁর হাতে নিরাপদ নহে। কারণ একটা ছোট আদেশের জন্ত, যেমন পাকিস্তান ত্যাগ, তিনি ভারতের কল্যাণরূপ বৃহৎ স্বার্থকে পদ দলিত করিতেছেন। যে কোন কারণেই হোক ডাঃ ম্যাথাই মনে এত গভীর ব্যথা পাইয়াছেন যে তিনি পালিমেণ্ট হইতে পদ-ত্যাগ করিয়াছেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিয়োগী

ডক্টর শ্রীমশ্রীমাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন।

বর্তমান চুক্তি পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির অনুরূপ ইহা উভয় মন্ত্রীই বলিয়াছেন। ঠিক পূর্বকার চুক্তিটায় ভারত সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নিয়োগী স্বাক্ষর করিয়াছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন যে, বর্তমান চুক্তির ফল পূর্বকার চুক্তিগুলি হইতে অধিকতর কল্যাণ প্রসূ হইবে।

পণ্ডিত নেহরু এবং কলিকাতার বক্তৃতাতে সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান যে সকল অপকর্ম করিয়াছে সেগুলিকে ছোট করিয়া দেখিতেছি না। কিন্তু এই চুক্তি ছাড়া অন্য-দ্বিতীয় কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, জানি না। যুদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা যুদ্ধ করিব না। তাহাতে লোকক্ষয় ও বিপর্যয় ঘটবে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় পদ-ত্যাগ পত্র দাখিল করার পর হইতে চূপ করিয়া বসিয়া নাই। তিনি বাংলা দেশের সবত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মত-সংগ্রহ করিতেছেন এবং উদ্যোগদিককে আশা ও উৎসাহ দিতেছেন। তিনি দ্বিতীয় এক-ব্যবস্থার নির্দেশও দিতেছেন। তা হইতেছে, সুপরিকল্পিত উপায়ে লোক বিনিময় অথবা পূর্ব-বঙ্গে সংখ্যালঘুর অল্পপাতে ঐ প্রদেশের এক অংশ সংখ্যালঘুদের জন্ত রাখা। বঙ্গা বাহুলা কোনটাই ভারত সরকারের মনঃপূর্ব নহে।

নিয়োগী মহাশয়ের পদ-ত্যাগের কারণ নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি হইলেও কোন কোন সংবাদ পত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আর একটি গুরুতর কারণ হইতেছে, তাঁর বিভাগীয় অধস্তন কর্মচারী তাঁর আদেশ না পাইয়াও সরাসরি পণ্ডিত নেহরুর নির্দেশে কাজ করিতেছেন এবং তাতে দেশের ক্ষতি হইয়াছে। যেমন পাকিস্তান হইতে পাট কেনা সেখানে কলা পাঠান ইত্যাদি। পাকিস্তানের পাট কেনা সম্বন্ধে অবলম্বিত নীতির বোর সমালোচনা দেশের লোক

করিয়াছে। কিন্তু তাঁর জন্ত স্বয়ং বাণিজ্য সচিবের দায়িত্ব কতখানি বলা শক্ত।

লিয়াকৎ আলীর আমেরিকা সফর

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী যে মাসের ২৩ দিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, তাঁর বেগমসহ সফরে কাটাইয়াছেন। এই সফরের উদ্দেশ্য তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তা তাঁর ভাষায় এক কথায় বলা যাইতে পারে আমেরিকাবাসীর নিকট পাকিস্তান-আবিষ্কার। কি রূপে যে পণ্ডিত নেহরু তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' বই লিখিয়াছিলেন, অমনি চারিদিকে আবিষ্কারের ছড়াছড়ি হইতেছে।

লিয়াকৎ আলী খান অবশ্য আরও বলিয়াছেন, বারংবার বলিয়াছেন তিনি শান্তিবাদী, তিনি শান্তি চান। কাশ্মীর সমস্যা মিটিয়া গেলে অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে সম্ভোষণক ভাবে মিটিয়া গেলে পাক-ভারত শান্তি অবিচলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে ইত্যাদি।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর সফর-কালে একটি মাত্র ঘটনার প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেছি। তা হইতেছে এশ্বর (নিউজাসি) হৃষটনা। বিস্ফোরণের ফলে বহু শত কোটি টাকার মারণাস্ত্র নষ্ট হইয়াছে। এগুলির অনেকাংশ পাকিস্তানে প্রেরিত হইতেছিল। পাকিস্তান যে শত্রু মারিবার জন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এত সাহায্য লাভ করিতেছিল, আমরা তা মনেও ভাবিতে পারি নাই। আমরা আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছি, শান্তি প্রিয়তার ইহা পরিচয় না কি?

এশ্বরের তাৎপর্য

আমাদের মনে হয়, এশ্বর ঘটনার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। করা হইলে আমাদের বর্তমান স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইত। গণতান্ত্রিক রিপাবলিক অথবা অন্য যে নামেই আমরা নিজেদিগকে অভিহিত করিয়া গৌরব বোধ করি না কেন, বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমরা হীনবল উচ্চাকঙ্ক্ষী অ-স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা কোন প্রকারেই আত্ম রক্ষণে সমর্থ নই, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বাধীন রাষ্ট্রের তুল্য হওয়া ত দূরের কথা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ও মধ্য প্রাচ্যে ঘাঁটি আগলাইতেছে, ইংরেজ ও আমেরিকা। আমাদের সাধ্য কি আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করি। ইঙ্গ-আমেরিকার মনোমত কাজ না করিলে সেই মুহূর্ত্ত আমাদের স্বাধীনতার প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা মনে রাখিলে, ভারত সরকার তথা সমগ্র এশিয়ার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বার্থ তাৎপর্য স্বদৃষ্টম করা যাইবে।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

শ্রীঅঞ্জলি সরকার এম-এ,

চিরকল্যাণময়ী ভূমি ধন্য

ভারত তার দীর্ঘকালের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করেছে, কিন্তু দাসত্বজনিত অবসাদ আর জড়তা আজও চলার পথে তার পা জড়িয়ে ধরে, দৃষ্টিকে দেয় ধোঁয়াটে করে। তাই দেখি—ভারতের মেয়েদের চেতনা আজ সক্রিয় হয়ে উঠেছে, প্রেরণা স্পন্দিত করছে প্রাণকে,—কিন্তু কেমন করে এগোতে হবে, চাইতে হবে সামনে কি ডাইনে কি বাঁ, আশা করতে হবে কতখানি, ছাড়তে হবে কতটা সে কথা তাদের জানা নেই জানবার আগ্রহও নেই। এত দিনের নির্ভীকতা হঠাৎ গতানুগতিকতাকে ভেদ করে অভিনবত্বের উদ্ভাবনের বিজয় অভিযানে নিজেকে সঁপে দিতে পারেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা আজ নিঃসঙ্কোচে আপন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু চলার ছন্দ তাদের নেহাৎ মামুলি, ছন্দপতন করার চুঁসাহসও নেই, নতুন ছন্দ গেঁথে তোলার উদ্যোগও নেই। শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, সেবা, গৃহকর্ম—কোনো জগতেই মেয়েরা পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়—তবু সকলের চলাপথেই তারা চলে, সকলের বলা-ভাষাই কণ্ঠে বহন করে।

ভারতের স্বাধীনতাকে সজীব রাখতে চলে, তাকে নতুন রূপ দিতে হলে খুঁড়তে হবে না-চলা সড়ক, সৃষ্টি করতে হবে না-বলা ভাষা।

এমনি কটি মেয়ের কথা বলতে ইচ্ছে করছে, যারা নিজের দেশের ও জাতির স্বার্থক্ষাকে উপলক্ষ্য করে আপন স্ব স্বাধীনতা গরীবনী করেছে, পৃথিবীর নারীসমাজকে সম্মানিত করেছে, স্বদেশকে ঐশ্বর্যশালী করেছে।

নারী চিকিৎসকের সংখ্যা আমাদের দেশের প্রয়োজনীয়-পাতে অকিঞ্চিৎকর হলেও, শিক্ষিতা মহিলাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণতঃ মেয়েদের চিকিৎসার, কচিং শিশু-চিকিৎসার

ভার নিয়ে থাকেন—অস্ত্রচিকিৎসা এখনও একমাত্র পুরুষ চিকিৎসকের এলাকারই অন্তর্গত রয়েছে বোধ হয়।

এর পাশাপাশি বসিয়ে দেখা যায় বিগত বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার কয়েকজন মহিলা চিকিৎসক কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে যেয়ে অসমসাহসিকতা, অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রচিকিৎসার কাজ চালিয়েছিলেন, সৈন্যদলের অল্পসঙ্গী চিকিৎসক হয়ে, সামরিক হাসপাতালের পরিচালিকা হয়ে, অগ্নিবর্ণের মধ্যে, অরণ্যে লুকিয়ে থেকে পুরুষ চিকিৎসকের দক্ষতার সঙ্গে নারীর স্বভাব মাধুর্য আর আন্তরিকতা যুক্ত হয়ে এইসব মহিলা অস্ত্র-চিকিৎসকদের আহত, ক্ষতবিক্ষত রোগীদের কাছে করে তুলত করুণার প্রতিমূর্তি।

এই মহীয়সীদের অন্ততমা স্বনামধন্য অধ্যাপিকা ভ্যালেন্টিনা গরিনেনভস্কায়া। বার্লিনের প্রবেশদ্বার ইনি অতিক্রম করেছেন। প্রাক-বিপ্লব রুশ রণাঙ্গনে প্রথম এবং একমাত্র মহিলা অস্ত্রচিকিৎসকের সম্মান এঁকে গৌরবান্বিতা করেছে। চিকিৎসক জীবনের প্রথম বছরেই এঁর কাছে একটি কঠিন অবস্থার রোগী আসে। ভ্যালেন্টিনার শিক্ষকরা পর্যাপ্ত কেউ সে রোগীর অস্ত্রোপচার করতে সাহস পেলেন না। কেউ বললেন,—পরে হবে—কেউ বললেন—করেই কাজ নেই। ভ্যালেন্টিনা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে সে অস্ত্রোপচারের ভার নিলেন। সকলকে মুগ্ধ করলেন তাঁর অত্যাশ্চর্য সাফল্যে, বিশ্বাস দৃঢ় হোলো নিজের শক্তিতে।

গরিনেনভস্কায়ার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অগণিত। তরুণ চিকিৎসক, সেবাব্রতী, শিক্ষার্থী সব সময়ে তাঁকে ঘিরে থাকে। শান্তির যুগে শিক্ষাদান আর বিশিষ্ট গবেষণা তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত করে থাকে।

কিন্তু তাঁর দক্ষতার মূল্য অসীম। তাই ১৯৩৯এর মহাযুদ্ধে আবার তাঁর সমরাজ্ঞে ডাক পড়ল। আহা

নিজা ভ্যাগ করে, দিবারাত্রের ভেদ ভুলে আবার তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে বুকে পড়তে দেখা গেল অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপর—যার চারদিকে জ্বলছে আগুন, উঠছে আহতের আর্তনাদ।

যুদ্ধকালেই গরিনেভস্কায়ার সাময়িক বয়স পেরিয়ে যায়। কিন্তু নিজের কক্ষক্ষেত্র ছেড়ে তিনি দূরে সরে যেতে পারলেন না। বিভিন্ন সাময়িক চিকিৎসকের পদসম্মান লাভ করে তিনি রাশিয়ার সব কটি ফ্রন্ট পরিদর্শন করে বেড়িয়েছেন। সকলক্ষেত্রে দেখা পেয়েছেন প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের—অস্ত্রোপচারক, চিকিৎসক, নাসরূপে সকলের কাছে তিনি প্রিয়, বরণীয় স্বাগত।

অধ্যাপিকা গরিনেভস্কায়ার বৈচিত্র্যোজ্জ্বল জীবনের কক্ষস্থচীর অন্ত করা যায় না। অসংখ্য অস্ত্রোপচার ইনি সুসম্পন্ন করেছেন। স্বংপিণ্ডে, মস্তকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাসিটিক অপারেশনে—তাঁর ক্ষুদ্র দুখানি হাত সবজায়গায় নিপুণতার পরিচয় দিয়েছে। মানব দেহে তিনি যাত্রর খেলা দেখিয়েছেন। সহস্র মুহূর্তে প্রাণদান করেছেন। স্বার্থহীন চিন্তে নিভীক পদক্ষেপে নিজের পথে এগিয়ে চলেছেন এই মহিমাঘিষ্ঠা রমণী। আপন অন্তরের সব সৌন্দর্য, সব পবিত্রতা ঢেলে দিয়েছেন তিনি অপারের যন্ত্রণাকাতর জীবনে শান্তি আনতে।

এমনি ভ্যাগময় তপস্তার জীবনে আরও কত মানব প্রেমিকী আত্মোৎসর্গ করেছেন। মেজর এলেনা স্তাফোজানিকোভা তাঁদের আর একজন। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে এলেনা তাঁর শিশুকন্যাটিকে মায়ের কাছে রেখে ফ্রন্টে অস্ত্রোপচারক হয়ে যাবার জ্ঞান নাম লেখান। এমন দিনও তাঁর গেছে যখন এদিকে তিনি অস্ত্রোপচারের কাজে নিমগ্ন, ওদিকে বোমার আঘাতে ঘর ভূয়ার ধ্বংস পড়েছে—অভূত উদ্গারে রোগীসহ এলেনা কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছেন এবং তারপরেও আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও কুশলতার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের কাজ শেষ করেছেন। ফ্রন্টলাইনে থাকাকালে তিনি কয়েক শত অতি দুঃস্থ অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন—যা চিকিৎসাবিদদের শুভিত্ত করতে পারে। এত আন্তরিকতার সঙ্গে এলেনা তাঁর কাজ সমাধা করতেন যে

প্রতিটি রোগী তাঁর নাম উচ্চারণ করত অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বোধে। একজায়গা থেকে আর একজায়গায় যখন সৈন্তদলের সঙ্গে তাঁকেও মেডিকেল ইউনিট নিয়ে বদলী হতে হতো তখন যে কি সব অসম্ভব প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি পেরোতে হতো যারা রাশিয়ার মানচিত্রের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সহজেই তা বুঝতে পারবেন। নদীপর্বত অরণ্য তুমার সারা পথ জুড়ে থাকতো এমনি এক কঠিন পথ অতিক্রম করার সময় একবার কর্তৃপক্ষ তাঁকে সঙ্গে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন—ভয়, এত কষ্ট তাঁর সহ্য হবে না; সমগ্র সৈন্তদল তাতে বৈকে বসল—“আমরা ওঁকে কোলে করে নিয়ে যাব—কিন্তু যতদিন আমরা বৈচে আছি ততদিন আমাদের সঙ্গে ওঁকে থাকতেই হবে।”

এমনি নাম করা যায় বরিসেস্কো-মিকল্যাসের। তিনি যে শুধু সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে অস্ত্রচিকিৎসার কাজই চালিয়ে গেছেন তা নয়—যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ড আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে বসে নিজের জটিল গবেষণার কাজও চালিয়েছেন অনন্তমনা হয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রেই ইনি প্রাণবিসর্জন দেন। এর আরক্কা কার্য্য সম্পূর্ণ করার ভার নেন উত্তরাধিকারীরা।

এঁদেরই যোগ্য সহকর্মিনী ছিলেন এবং আছেন আরও কত রুশ মহিলা—যাদের সংখ্যা রাশিয়ার পুরুষ চিকিৎসকদেরই সমান—যাদের দান শুধু রুশজাতিরই গর্বের বস্তু নয়, সমগ্র নারীজাতির গৌরব—যারা শান্তির যুগে দেশের সম্পদবৃদ্ধিকারিণী, রণোন্মত্ততার সময়ে জাতির আশার আলো। কোনো মনীষী বলেছেন—“অস্ত্রচিকিৎসকের হৃদয় হবে সিংহের মত, দৃষ্টি কৈগলের মত, হাত নারীর মত।” এই সব মহিলা চিকিৎসকদের কক্ষবহুল জীবনের কথা পর্যাশ্রোচনা করলে এই উজ্জ্বল সত্যতা স্বতঃপ্রমাণিত হয়। ভ্যালেন্টিনা গরিনেভস্কায়া বলেন—যুদ্ধে আমাদের কত জনের পিতামাতা স্বামী সন্তান অত্যাচারিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের এই ব্যক্তিগত দুঃখ আর অভাব বোধ আমাদের চিত্তপার্শ্বে যারা আছে তাদের দুঃখযজ্ঞা অমুভব করতেই শিখিয়েছে।

আমাদের দেশে সেবিকা যারা, মহিলা চিকিৎসক যারা যেন নিজের আশাআকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত দেখতে পান। তাঁরাও অচিরে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন—মানবতার প্রেরণা যেন তাঁদের উদ্বুদ্ধ করবে। সমগ্র দেশ এই আশা প্রতিনিয়ত করি। নিজের দুঃখ দিয়ে যেন সাগ্রহে তাঁদের গতিপথের দিকে চেয়ে থাকবে। তাঁরা পরের দুঃখ বুঝতে শেখেন—জাতির আশাআকাঙ্ক্ষা

বান্নাঘর

শ্রীমতী ছন্দা ভাট্টা

ছানার সুগন্ধি পোলাও

উপকরণ—ছানা দেড় সের, চাল এক সের, ঘি দেড় পো, এলাচদানা আধ পো, পেস্তা দুই ছটাক, সামরিচ আধ তোলা, আদা দুই তোলা, ডালচিনি আধ তোলা, জল তিন সের, কুমকুম চার আনা, তেজপাতা সতেরো খানা।

প্রস্তুত প্রণালী—বেশ টাটকা এবং শক্ত ছানা এই পোলাও তৈরী করতে দরকার হয়। প্রথমে শিলের নীচে চেপে রেখে ছানার জল বার করে নিতে হবে। তারপর সেগুলি টুকুরো করে কেটে রাখবেন। আদা খেঁতো করে নিয়ে ও সমস্ত মশলাগুলি একসঙ্গে তাকড়ায় বেঁধে তিন সের জলে জাল দিয়ে এক সের করে নামিয়ে নিচে আখনির জল তৈরী করুন। এবার ছানার টুকরোগুলো ঘিয়ে ভাজুন। তারপর চাল ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে তাতে বাদাম পেস্তা কিসমিস এলাচ ছাড়িয়ে ও কুমকুম দুধের সঙ্গে গুলে নিয়ে বেশ ভাল করে মেখে নিন। এবার হাঁড়িতে একটু ঘি এবং তেজপাতা গুলি দিয়ে উত্থান চড়ান। ঘি হয়ে গেলে তাতে চাল ছেড়ে দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করে আখনির জল নুন ও খানিকটা ঘি দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে মুহূর্ত্ত আচে জাল দিন। জল ফুটলে তাতে ছানার টুকরোগুলো

ছেড়ে দিন। চাল সেক হয়ে গেলে আন্দাজমত একটু চিনি দিয়ে এবং বাকী ঘি দিয়ে খুব আশ্তে করে বাঁজরা দিয়ে নেড়ে দিন। জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে কিছুক্ষণ মুখ বন্ধ দিন। তারপর খাবার সময় দেখবেন স্বাদে ও সুগন্ধে ইহা অতুলনীয়।

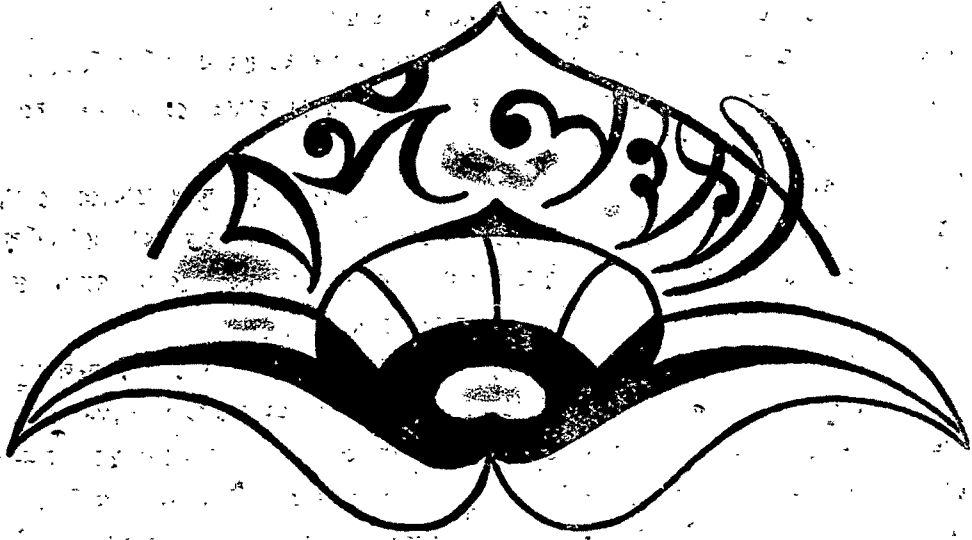
আম ফীর

উপকরণ—দুটি মাঝারি মাপের কাঁচা আম। বেশী বড় হলে মধ্যে আঁটি বেঁধে যাবে। তাইতে কাঁচা আমের স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে; তিন সের দুধ, এক পোয়া চিনি, এক ছটাক কিসমিস।

প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে কাঁচা আম দুটি বেশ ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার শিলে মিহি করে গেটে রাখুন। এবার সমস্ত দুধের ফীর তৈরী করুন। ফীর নামাবার আগে তাইতে চিনি ও কিসমিসগুলি ছেড়ে দিন। তারপর নামিয়ে কাঁচের অথবা পাথরের পাত্রে ঢেলে রাখুন। ফীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বাটা আমটা তার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে পাত্রের মুখটা একটা কিছু দিয়ে ঢেকে রাখুন। শেষপাতে লুচির সঙ্গে এ জিনিষটি খুবই উপাদেয় হয়।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
BHOWANIPUR • CALCUTTA •



২৫শ বর্ষ

আষাঢ়—১৩৫৭

৮ম সংখ্যা

মৃত্যুঞ্জয়ী

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

ঝড় উঠেছিল অরণ্যের বুকে।

উন্নত হিংস্র ঝড়। উন্মাদিনী কালবৈশাখীর প্রলয়
মৃত্যু। নিবিড় অরণ্যানীর মৌন মহিমার উপর আছড়ে
পড়লো তার ছরস্তু আঘাত। ধূলো উড়লো, উড়লো বালি
আর ধড়কুটো। তাব সঙ্গে এলোমেলো ছুটোছুটি করলো
অসহায় স্বরাপাতার রাশি।

ছায়াস্তরাল বনভূমির নিরাপদ আশ্রয় থেকে উৎপাটিত
হয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে। যারা নিশ্চিহ্ন
হয়ে গেল, হয়তো তারাই গেল বেঁচে। ধূলিধূসর বিবর্ণ যে
স্বরাপাতার রাশি ঝড়ের শেষে স্তূপীকৃত হয়ে রইল এখানে
সেখানে, তাদের জন্ত থাকলো অনন্ত হর্গতি।

হুভাগের আগুনে বলসানো সেইতুপ থেকে আলাদা করে
স্মার চেনা যায়নী কে কোন জাতের। কি তাদের
সংজ্ঞা ছিল—শাল সেগুন, আম কাঠাল, না চালিতা
ইন্দার।

অভিজাত্যের রং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অভিজাতদের
চেহারা থেকে।

সবাইকে এক করে নিয়ে নতুন এক নামকরণ হয়েছে—
“শরণার্থী”।

ওদের জন্তে বাংলাভাষার অভিধানে ধোগ হচ্ছে নতুন
নতুন সব শব্দ।

‘উদাস্ত উপনিবেশ’, আর ‘শরণার্থী শিবির’, ‘বাস্ত-
হারা ব্যারাক’, আর ‘বাস্তত্যাগী কলোনি’—এ সব শব্দ কবে
কার চোখে পড়েছে এর আগে?

সমাজ জীবনে—কবে ছিল “আশ্রয়প্রার্থী” সমস্তা?

কিন্তু সবিস্ময়ে অধু শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই
তো কষ্টব্যের শেষ হলো না? শব্দের রূপও তো কিছু দেখে
রাখা উচিত?

সেই উচিতবোধের তাড়নাতেই একদিন বন্ধুকে কাতারী

করে চললাম বিদ্যুটে নামওয়ালা ওই রকম একটা—শিবির পরিদর্শনে।

নানান মানমসলার উদ্ভূত জঞ্জাল দিয়ে তৈরি অদ্ভুত সেই আচ্ছাদন থেকে যারা বেরিয়ে এলো—তাদের দেখলে, যে ভাব আসে সেটা আর যাই হোক মমতাও নয় করুণাও নয়।

যদি একটা জমকালো শব্দ ব্যবহার করতে দেন—হয় তো বলতে পারি “অ বিখ্যাত বিস্ময়ের স্তব্ধতা”।

এদের দেখে যদি কারুর চোখের জলে বুক ভেসে যায়, তাহলে—না বলে উপায় নেই যে, তারা বুকভাসাবার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল।

মরুভূমির উত্তপ্ততাসে চোখের স্নায়ুশিরাই যে শুকিয়ে ওঠে, জল জমবে কোথায়?

শিবিরের আশে পাশে খোলা মাঠে সারি সারি উল্লন জলছে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে। স্পর্শদোষের আশঙ্কায় কটাকিত হবে—এতো সূক্ষ্ম অনুভূতি কারুরই আর অবশিষ্ট নেই।

জাত নেই, তাই ভাতেরও কোলিন্যা গেছে।

যে আগে দখল নিতে পারছে সেই দিচ্ছে হাঁড়ি চাপিয়ে। আরো অনেকে বসে আছে আপন আপন হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে, পূর্বতনের কাজ শেষ হবার প্রত্যাশায়। উপকরণের বাহুল্য নেই তাই রক্ষা। মিটে যাবে চট করে।

না গেলেই বা উপায় কি? প্রত্যেকটি পরিবার আলাদা একটা উল্লন পাবে, পাবে রান্নাঘর, এতাবড়ো ছুরাশী কেউই করে না।

অল্প যে নিতান্তই জীবন দায়িনী, এই নিষ্ঠুর সত্যটা যেন আজ নির্ভেজাল ধরা পড়ে গেছে এদের কাছে।

এক একটা হাঁড়িকে কেন্দ্র করে বসে আছে এক একটা দল। ক্ষুধার্ত লোলুপ দৃষ্টিমেলে, অধৈর্য্য প্রতীক্ষার হিসাব করছে ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ডের।

ভুকনো চাল ক’টি কখন রূপান্তরিত হয়ে উঠবে সঞ্জীবনীর সৃষ্টিতে সেই অপূর্ণ দৃশ্যটা দেখবার আশায় এই অনলস তপস্বী।

এ দলের মধ্যে ভ্রূণী বিচার দেখলাম না। বয়সের মর্যাদা রক্ষার্থেও কিছুটা সংযম আবশ্যক এ বোধটা বোধকরি ফেলে চলে এসেছে ছেড়ে আসা ভিটের মাটিতে।

এখানে নাড়ির যোগ নেই, তাই হাঁড়িকাকে নিশ্চিত ভেবে

নিশ্চিত হ’তে পারছে না। কে জানে—হয়তো আবার কোন দিক থেকে আসবে ঝড়, মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যাবে সঞ্জীবনী ভাঙ।

বয়সের মর্যাদা বজায় রাখবার মিথ্যা বিভ্রমনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণটা বজায় রাখার চেষ্টাই সত্য বলে বুঝেছে এখন এরা।

আমাদের দেখে মুখ তুলে তাকালো কেউ, কেউ তাকালো না। ‘এ রকম নিছক কৌতুহলী’ দর্শকের নমুনা দেখতে দেখতে চোখ ফেরে গেছে ওদের, সেটা ভাব দেখলেই বোঝা যায়।

ঘুরতে ঘুরতে এক বুকের কাছে গিয়ে বসলাম।

কিন্তু—আলাপ জমাবার চেষ্টা বিভ্রমনা হলো। বাংলা ভাষাও যে বাঙালীর কাছে কতো দুর্কৌণ্ড্য হতে পারে, আগে কোনোদিন এতো ভালো করে জানা ছিল না।

তবু ভরসা—বন্ধুর ওপারের লোক।

সুদূর গ্রামাঞ্চলের এই চাষী বুকের ভাষা সম্পূর্ণ না বুঝতে পারলেও—ভাবটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন মনে হলো।

ভাবটা এই—‘বাবু আমাদের দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, শেষ দিন অবধি জন্মভূমি, আর ভূমিলক্ষ্মীকে আঁকড়ে পড়ে থাকবার ইচ্ছে ছিল, তাই দেশ ভাগ হবার সময় থেকে, এতোদিন পর্যন্ত কারো পরামর্শে কান দিইনি। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে আলাদা। বাস্তব দেবতা মাথা নাড়া দিয়েছেন তাই বাস্তবীতে ত্যাগ করে চলে আসতে হলো। কারুর দোষ নয় বাবু, এ আমাদেরই পাপের ফল।.....যোলো আনা পাপ পূর্ণ না হলে কি আর ভিটেছাড়া হ’তে হয়? বাস্তব দেবতার রোধ না হ’লে সাধা আছে কারুর তাড়াতে?’

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম তোমাদের পাপটা কি?

উত্তরে জানলাম—পুরুষাঙ্কুরে সঞ্চিত পাপের বোঝা নাকি পাহাড় হয়ে উঠেছে, তার হিসেব দেওয়া শক্ত সুদূর দেবতার রোষে যে কিছুই আর থাকবেনা এ সত্যটা ওরা নিশ্চিত ভেবে দিয়েছে।

আশা আর আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলাম, কাজ হলো না।

বুঝে যে রকম অবিচলিত নিশ্চিত ভদ্রীতে মাথা নাড়তে

লাগলো, বোঝা গেল আশ্বাস দেওয়া বৃথা। ভবিষ্যৎ
সম্বন্ধে ওদের আর কোনো অলীক ধারণা নেই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মন ভালো করবার জন্তে এখানে আসিনি অবশ্যই, তবু
একটু যেন বেশীই খারাপ হয়ে গেল।

প্রশ্ন করবার আগে আশা করেছিলাম, শুনতে পারো—
অত্যাচারীর উদ্দেশ্যে ঘৃণা অগ্নিগর্ভ অভিশাপ, আর উপকারীর
বিরুদ্ধে অসন্তোষ মুখর তীব্র সমালোচনা।

সেটাই স্বাভাবিক।

তার মধ্যে তবু জীবনের চিহ্ন মেলে।...কিন্তু এতো তা'
নয়। এই যে নির্জীব হতাশা—এর বাড়া শত্রু আর নেই।
সমস্ত লাজনা, সমস্ত হৃদয়শার জন্ত নিজেদের যারা দায়ী করে
রেখেছে, তাদের সম্বন্ধে আর আশা কোথায়?

—“নাহি নির্দে দেবতারে—নাহি ভৎসে অদৃষ্টের
স্মরি—”

সত্যই বটে।

—বাঙালীর অস্তিত্ব আর বেশী দিন নয়—

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করলেন বন্ধু।

সার দিলাম। ঠিক ওই কথাটাই মনে তোলাপাড়া
করছিলাম—বাঙালীর অস্তিত্ব আর কদিন? “সারা
ভারতের পথ প্রদর্শক বাঙালী”—নিজেই আজ পথ
হারিয়েছে। অতীতের গৌরব ধূয়ে ধূয়ে জল খেয়ে—আর
কতোদিন চলবে? না: সত্যিই আর বেশীদিন নয়, বাঙালী
তার কুণ্ঠি আর ঐতিহ্যের দড়ি গলায় বেঁধে ডুবলো বলে।

ঘুরছি...ইতস্ততঃ প্রশ্ন করছি একে ওকে তাকে।

আশ্চর্য! কারুর মুখে নেই অভিযোগের তীব্র ভাষা,
কারুর মনে নেই রাগের দাহ।—“এই ছিল কপালে—”
এইটাই শেষ কথা। শিক্ষিত অশিক্ষিত চেনবারও উপায়
নেই, ওরা যে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এ সত্যটো এতো
সার বুঝে নিয়েছে যে, শিক্ষিত ভদ্রজীবনের দায়িত্ব বহন
করবার দায়ও আর কারো নেই।

ঘুরছি.....

উলঙ্গ শিশু, অর্দ্ধলঙ্গ বালক বালিকা, আর চীরধারী
ক্লান্ত শ্রীপুরুষের দল দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি ক্রমশঃ।
কোথাও নেই প্রাণের স্পন্দন।

ওদের সঙ্গে ঘটিবাটি, পোটলা পুঁটলি, মরলা বিহানা,
ছেঁড়া কাঁথার মতো নির্বিচার ওরা নিজেরাও। যেন ছেঁড়া
শালপাতা অথবা ভাঙা শান্ধিতে ঢেলে রাখা ওই মোটা
মোটা কদর্যা চালের ভাত কটি খাওয়া ছাড়া জীবনের আর
কোনো উদ্দেশ্য নেই। করবার নেই কিছু।

চোখে দেখে সহ্য করা কঠিন।

বললাম—চলো ভাই যথেষ্ট হয়েছে। প্রাণ হাঁকিয়ে
উঠছে।

—ভুল বলোনি— বন্ধু উত্তর দেন—চলো শিবিরের
ভেতর গুলো একটু উঁকি দিয়ে চলে যাই।

—আর কেন? কি লাভ?

—লাভ কিছু নেই, এসেছো যখন, সবটা দেখে যাও—
এই আর কি?

* * *

উঁকি মেরে দেখছি।

বেড়া আর দরমার গারে ছোট ছোট একটু কাটা ফাঁক
থাকে ‘জানলা’ আখ্যা দিয়ে গৌরব বাড়ানো হয়েছে, তার
ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—‘সর্ব্ব হারা’ মাহুষের শেষ
সর্ব্বস্ব।

একটু অভিনব বটে।

মাহুষগুলোকে ঘেমন আলাদা করে চেনবার উপা
নেই, তেমনি নেই জিনিষ গুলোকেও। বিছানা বাস, জুতো ছাতা, জামা কাপড়, ঘুটে কাঠ সব একত্রে ডাঁই
করা, তার রন্ধাখানো মাঝখানে হঠাৎ চোখে পড়ে রং করা
মাটির পুতুল, কাঁচের ফুলদানী, বাধানো ফটো, বাঁচানো
পোষা পাখী। এগুলো আশা করিনি।

খুঁজলে—এখানে কি মিলবে প্রাণের ছিটে ফোটা।

যে ব্যক্তি লক্ষ অস্থবিধে আর অপার দুর্গতির মধ্যে থেকে
বাঁচিয়ে ওই কাঁচের ফুলদানী দুটো বয়ে এনেছে, সে কি
এখনো স্বপ্ন দেখছে একখানি সাফানো বয়ের? স্বপ্ন দেখছে—
প্রিয় ব্যক্তির ফটো ঝুলিয়ে রাখবার জন্তে সত্যিকার
দেয়ালের? বাঁশ আর টাচের তৈরি দেয়ালের ভেঙেচামি
নয়, সত্যিকার সালা দেয়াল।

* * *

—অদ্ভুত! আশ্চর্য!

স্বল্পভাবী বন্ধুটী হঠাৎ এই ভাষাটা উচ্চারণ করেন।

বন্ধুর মন্তব্যে চমকে উঠলাম।

একটু বোধ হয় অস্বস্তিকর হয়ে গিয়েছিলাম। কোথা থেকে আসছে একটা একটানা যুঁহু গুঞ্জন ধ্বনি, অসিছে একটা পরিচিত মিষ্ট সুবাস। অথচ এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ঠিক বুঝতে পারছি না সুবাসটা কিসের।

আন্দাজ করবার চেষ্টায় অস্বস্তি হয়ে পড়েছিলাম, বন্ধুর কথায় চমক ভেঙে বললাম—কি অদ্ভুত? কাঁচের ফুলদানী? না পোয়া টিয়া।

—না, বাংলার মেয়ে! দেখো সত্যি বলছি কি না।

বন্ধুর দৃষ্টির নির্দেশে পরবর্তী জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ও: তাই বটে, যুঁহুর গন্ধ!

লক্ষ্মীপূজা হচ্ছে। ঘট ও পট নিয়ে।

আশ্চর্য্যই বটে, অপ্ৰত্যাশিত কয়েকখানা খান ইঁট সাজিয়ে চৌকীর যে অনুবরণ গড়া হয়েছে তার উপর আলপনার ছাপ। পিটুলির পথের উপর পাতা হয়েছে লক্ষ্মীর ঘট। ঘটের মুখে আশ্রয় পল্লব, পল্লবের গারে সিঁহুরের রেখা।... হুঁপাশে—ছোট ছোট ছুটি মাটির খুঁটিতে কয়েক ছুটি—বোধহয় কচি শশা। নৈবেদ্য নয়—নৈবেদ্যের নমুনা।

যুঁহু গুঁগুন্ডলের ধোঁয়ার ভারাক্রান্ত ঘর নয়, সুধু ছুটি সুপ জলছে মহিমাঘ্রিত গাভীধোঁ।... ধোঁয়া যেটুকু বা আছে জ্বালাতে নিজেকে ঘোষণা করবার প্রচেষ্টা নেই।

লক্ষ্মীর পট আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি সে ধোঁয়ায়।

হাস্তোজ্জ্বল প্রসন্ন মুখ। চিরদিনের পটের ছবি।

কিন্তু বাংলার লক্ষ্মী কি সুধু পটের ছবিতেই প্রতিষ্ঠিত? সুধু শাড়ী পরা, হাতে শাখা মাত্র সার, কয়ষোড়ে যারা বসেছে ভক্তি নম্রমুখে লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনে, তাদের তো চিনতে শুল হয় না।... তাই বুঝি তারাও এখনো ভুলতে পারেনি—এই অবর্ণনীয় লাক্ষনা দুর্দশার মধ্যে থেকেও না—বাংলার লক্ষ্মীর ধারাকে, যুগ হতে যুগান্তরের পথে বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাদেরই।

—অতঃপর কন লক্ষ্মী—আমার বচন,

গৃহস্থের যতো নারী শুনে দিয়া মন।

এক চিন্তে বৈস সব শুদ্ধ শাস্ত হৈয়ে—

পান গুয়া রস্তা আর মিষ্ট দ্রব্য লৈয়ে—”

* * *

—“হায় গো কপাল! পান গুয়া লৈয়ে লক্ষ্মীর পাঁচালি শুহুম! এ জনমে না।”

এই খেলোড়িটি শুনে পাওয়া গেল।

পান গুয়া বিহীন শূন্য করতল জোড় করে যাঁরা শুনে বসেছেন ভক্তিভরে, তাঁদেরই মধ্যে কেউ একজন উচ্চারণ করলেন কথাটা।

পরক্ষণেই যা শোনা গেল, সেটা পাঠিকার কণ্ঠ হতেই সম্ভবত—“অইব, অইব, নিচয় অইব। মায়ের দয়া হলি হব, অতি পারে। কি পাপভা অইল আমাগোর, তাই হনি? নষ্ট হুটলোক কোন যুগে নাই, কও তো? রাবণ রাজা রইল না? হুঁধ্যোখন? হুঁয়াসন? কংস? পিথিমির সকল মানুষ গুলারে একেবারে মাইয়া ফেলায়ে শেষ করবার হাদি অইল? কও না? শেষ অইল আপন্যারাই।”

—“হুদিন ফিরম তবে কমলের মা?”

—“ফিরম, ফিরম, পাঁচালিতে শোন দেহি এহন।”

—“আমার মাহাত্ম্য কথা শুনিতে বিস্তর,

কিঞ্চিৎ শুনহ নারী হৈয়া তৎপর—

গৃহস্থের বধু সদা লক্ষ্মী বক্রপিনী,

নাহি কভু উচ্চ বোল, উচ্চ হাস্ত ধ্বনি।

ব্রত উপবাস আদি কুলের নিয়মে—”

—ধারণাটা বদলাচ্ছে—

—তাই ভাবছি।

—চলো—ফেরা থাক!

—চলো।

পথে এ নিয়ে আলোচনা করিনি, লক্ষ্মী চণ্ডা কিছু যে চিন্তা করেছি তাও নয়, সুধু ফেরার পথে হঠাৎ মনে হলো, মনটা যেন আর খারাপ নেই। মনে হচ্ছে—

সমস্ত আলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে নিভে যায়নি, কোথায় যেন জলছে একটা মাটির প্রদীপ, সে আলো লক্ষ্মী প্রদীপের শিখার সঞ্চারি হয়ে উঠবে একদিন। অন্ধকার কাটবে।

দুঃশাসনের দিন ফুরোবেই, ফুরোবে রাবণ আর কংসের।

মানুষের অধিকার

বন্দেআলী মিয়া

বুটিশের রাজনৈতিক চক্রান্তে আজ সমগ্র ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য রুদ্রমূর্তিতে দেখা দিয়েছে। এর জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মাটি উভয় সম্প্রদায়ের রক্তে বারবার কলঙ্কিত হয়ে গেল। কত নারী হারালো পতি আর পুত্র, কত স্বামী হারালো স্ত্রী, কারো গেল মাতা ও ভগিনী। এ শোণিত-ষজ্জ হতে শিশুরা অবধি রক্ষা পেলো না।

কিন্তু এমন হিংসা তো চিরকাল এদের মধ্যে ছিল না। এরা দুটি জাতি পরস্পর বাস করেছে পাশাপাশি দুটি সহোদরের মত। হিন্দুর দোল দুর্গোৎসবে মুসলমানেরা আনন্দ করেছে—মুসলমানের মহরমের মিছিলে হিন্দুরা স্বতঃপ্রসূত হয়ে যোগদান করেছে। তখন এদের গোলাভরা ছিলো ধান আর গলায় গলায় ছিলো গান। আজ তাদের ঠোঁটের হাসি গেছে মিলিয়ে—গলার গান গেছে থেমে, গোলায় আর নাই একমুঠো ধান—ক্ষেতে নাই ফসল, বিল বাঙরে নাই মাছ।

প্রায় বৎসর দশ বারো পূর্বের একটি কাহিনী এখানে বিবৃত করবো। ঢাকা জেলায় গোপালিয়া গ্রামে পণ্ডিত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস ছিল। অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ—শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ঠাকুর দেবতার পূজার্কনায় দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁর অতিবাহিত হয়। পূর্বাধি সন্ধ্যা ছিলো মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। সময় এবং সুযোগের অভাবে অভিলাস কার্যে পরিণত করে উঠতে পারেন নাই। এবারে অবসর পেয়েছেন, স্বতঃপ্রসূত কল্পনাকে রূপদান প্রয়োজন। বসন্তবাতির সংলগ্ন উত্তানে মন্দিরের স্থান নির্বাচন করে রাজমিস্ত্রীদের আহ্বান করলেন। কাদের ওস্তাগর সে অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য—মিস্ত্রী—তারই ওপরে মন্দির নির্মাণের ভার পড়লো।

অর্থব্যয়ের অপ্রতুলতা নাই। যেখানে যাহা প্রয়োজন পরিকল্পনা অমুখ্য ভিতরে ও বাহিরে কারুকাঁচ ও রঙের

কাজ হয়ে দীর্ঘ দিনে মন্দির শেষ হলো। সকলে একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগলো।

অতঃপর ষথা দিনে মন্দিরে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা হলো। স্নানাহারের সময়টুকু ব্যতীত গাঙ্গুলি মহাশয় প্রায় সর্বক্ষণ মন্দিরেই থাকেন। বিগ্রহের পূজার্কনা ও শাস্ত্রপাঠে তিনি দিব্যরাত্রি যয়।

বেলা অল্পমান দশটা। গাঙ্গুলি মহাশয় পূজা সমাপ্ত করে মন্দিরাভ্যন্তরে গীতা পাঠ করছিলেন। কাদের এসে মন্দিরের আউনিয় প্রবেশ করলে। বললেন : ক'দিন ধরে মনে করছি পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো—কিন্তু নানান ব্যস্তাটে আসতে পারি না। পণ্ডিত মহাশয় তো এখন ব্যস্ত আছেন—অল্প সময়ে নয় আসবো।

গাঙ্গুলি মহাশয় গ্রন্থ থেকে মুখ তুললেন। বললেন : ওস্তাগর নাকি—এসো—এসো। কি খবর?

কাদের হাসিমুখে জবাব দিলে : আপনার পড়ার ব্যাবাস্ত করলুম পণ্ডিত মহাশয়। বিকেলের দিকে আসবো।

গাঙ্গুলি বললেন : না, এসো। অধ্যায়টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এবারে উঠবো মনে করছিলাম। তুমি এসো।

কাদের দাঁড়িয়ে রইলো। বললো : আপনি কাজ সেরে আছেন—আমি অপেক্ষা করছি। বলে উঠানের একধারে উবু হয়ে বসলো।

গাঙ্গুলি চীৎকার করে বললেন : ওখানে কেন কাদের, উঠে এসে বসো।

কাদের কুণ্ঠিত হয়ে বললো : মন্দিরের বারান্দায় কি আমার উঠে আসা হবে?

গাঙ্গুলি হাসিমুখে বললেন : নিশ্চয়ই। তুমি কি একা এসেছো, না, সঙ্গে কেহ আছে?

কাদের প্রত্যুত্তর করলে : আছে। রহিম আর কুদুস

আমার সঙ্গে এসেছে। তারা আমার সঙ্গে এই মন্দিরের কাজ করেছিল।

গাঙ্গুলি বললেন : তাদের ডেকে আনো।

কাদেরের আহ্বানে তারা ছুঁজনে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। গাঙ্গুলি বললেন : তোমরা উঠে এসে বসো।

কাদের ও তাদের সঙ্গী ছুঁজনে ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

গাঙ্গুলি তাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন : তোমরা নির্ভয়ে উঠে এসো।

কাদের, রহিম ও কুদ্দুস বারান্দায় উঠে সজ্জিত হয়ে বসলো।

গাঙ্গুলি বললেন : ওখানে নয় কাদের ঠিক আমার কাছে এসে বসো।

কাদের ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে : ওখানে যে ঠাকুর দেবতা রয়েছেন পণ্ডিত মশায়।

গাঙ্গুলি হেসে বললেন : সেই জগ্গেই তো তোমাদের আসতে বলছি কাদের। আমার ঠাকুর দেবতা এত ছোটো নয় যে তোমরা এলে তাঁর জাত যাবে। একটা কথা তোমাদের বলি, এই ঠাকুর দেবতা রয়েছেন যে মন্দিরে—সে মন্দির তৈরী করেছো তোমরা। তোমাদের তৈরী মন্দিরে বাস করতে তাঁর যদি আপত্তি না হয় তবে তোমরা মন্দিরে প্রবেশ করলেও তিনি অশুচি হবেন না।

জাতের নামে বজ্জাতি সব—জাত-জলিয়াং খেলছে জুয়া, ছুঁলেই তোমার জাত যাবে। জাত ছেলের হাতের

নয়কো মোরা।

কাদের ও তার সঙ্গীগণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের কথা শুনে অধাক। এমন সত্য-নিষ্ঠ, পক্ষপাত হীন ও হৃদয়বান ক'জন হতে পারে। অতঃপর গাঙ্গুলি মহাশয়ের নির্দেশক্রমে তারা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর সন্মুখে গিয়ে বসলো।

আষাঢ়

ঐতিহ্যিতা দেবী

‘আবার এসেছে আষাঢ় ভূবন ভরে,’ যুগযুগান্তর পার হয়ে শতাব্দীর পথ বেয়ে ‘আষাঢ়ের’ ঘনঘটা আবার ঘনিয়ে এল আকাশে। নিরাময়ের প্রচণ্ড সন্তাপে তাপিতা ভূমিতা ধরিত্রী এতদিন দেহলীদন্তপুষ্প। হয়ে দিন-ওপাছিলেম-বার আশায় আজ ঐ পূর্ব দিগন্তের পুঞ্জপুঞ্জ, মেঘচ্ছায়ায় তারই আগমনীর সূচনা। মেঘ গজ্জনে জয়শঙ্খ বাজিয়ে বিদ্যুতালোকোদ্ভাসিত পথে সে এসে দাঁড়ায় ধূলিধূসরিতা আত্মপীড়নের ক্ষোভ জালাময়ী পৃথিবীর শিয়রে। বিরহিনীর অবস্থা দেখে গভীর করুণায় তার চোখ ছল ছল করে ওঠে, আর তার হৃদয়ের অপার দাক্ষিণ্য ঝঝ ঝঝ বর্ষাধারায় নৈমে আসে ধরণীর দেহে, প্রেমের মত, তার তুষাতপ হৃদয়কে করে শান্ত। দেখতে দেখতে শুকনো ধূলা নরম হয়ে আসে বৃষ্টি ধারার স্পর্শে। তার ধূসর অঙ্গ ঢাকা পড়ে যায় নিকট সবুজ অকুরে। তার গাছে গাছে নব-আবির্ভাবের জয়-পতাকা, আর তার অঙ্গকারে ভূমিগর্ভে নবসৃষ্টির প্রেরণ।

কবিত্বের মত স্তনতে হলেও কথাগুলি সত্য। বৈশাখে আত্মঘাতিনী ধরিত্রীর যে শুষ্ক কঠিনরূপে মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসে, বর্ষায় তারই নিকট সজল শ্রামলিমায়, নদী-কলোচ্ছ্বাসিত বর বর বৃষ্টি ধারার আহ্বানে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তাঁর প্রাণ। আর তার বোঁবা মনের গহনে, সুপ্ত আনন্দ, বেদনার মত বাজতে থাকে,—কবি বলেন, “অকারণ করুণায় জ্বলি করে ছল ছল,”—কিন্তু কেন করে? সেকি ‘জন্মান্তর সৌন্দর্য’ স্মরণ করে। কি সেই জন্মান্তরের স্মৃতি? সেকি পূর্ব জন্মের কোন মিলনের স্মৃতি, কোন বিরহের ব্যথা? কোন সেই পূর্ব জন্ম? কোটি কোটি বছর আগে, অসীমকালের কোন এক শুভ মুহূর্তে, স্বর্গাগত হতে যখন পৃথিবীর জন্ম হয়, যখন সেই প্রজ্জ্বলিত স্বর্গাংশের প্রচণ্ড সূর্যনের মধ্যে আত্মপীড়নের তগন্তায়, বহু ছুঁবে ধরিত্রী আপনাকে রচনা করে তুলেছিলেন,—তখন সেই সৃষ্টির বেদনা, তার চারি

পাশের আকাশকে আচ্ছন্ন করে ঝরে ঝরে পড়ত। তার সেই জলন্ত জগপিণ্ডের পরমাণুস্পন্দনের মধ্যে, ছিল নাকি লুকিয়ে এই আজকের দিনের পৃথিবী, এই আজকের দিনের মানুষ, স্তম্ভভারে? সত্তপ্রসূতা ধরণীর সেই শৈশবক্রন্দনের আভাস বয়ে আনে কি আষাঢ়? আর সেই শব্দের রিম-রিম বাঁধারে, জননী-জঠর হতে বিচ্ছেদের বিস্মৃত বেদনার আমাদের মন কি কেমন করে ওঠে?

সূর্য্য পূজায় প্রদক্ষিণের পথে, ঋতুতে ঋতুতে, এই যে সাজ বদলের পালা, একি কোন গৃঢ় ইঙ্গিত বয়ে আনে? প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পরে নামে বর্ষার ঢল। নবীন পত্র সজ্জায় ধরণী সাজে কদম্বকেশরাকর্ষণ বিচিত্র সবুজ বসনে। তারপরে আসে শরৎ, অবিচ্ছিন্ন বর্ষাধারায় ছেদ পড়ে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় রৌদ্রবর্ণ পীত আভা। সোনার ধানের শীর্ষের মত, ধরণীতে ছুটে ওঠে বিচিত্র প্রাণের অঙ্গুর। ক্রমশ যখন ফসল হয় ভরা, একরকম ভাবে পূর্ণ করে আসে পৃথিবীর প্রাণ সৃষ্টি, তখন হঠাৎ একদিন কঠিন শীতের ভূহিন স্রোতে লুপ্ত হয় এতদিনের আয়োজন। তুষার মরুর নীচে চাপা পড়ে কোমল প্রাণের সংস্পন্দন, পৃথিবীতে স্তব্ধ হয় তুষার রাজ্য। আমাদের এই শীত ঋতু কি সেই তুষারের বার্তা বহন করে আনে মানুষের কাছে। কিন্তু মৃত্যুতো এ বিশ্বের শেষ কথা নয়—সে তো শুধু পদক্ষেপের ফাঁকটুকু মাত্র। অজ্ঞেয় প্রাণের বার্তা তাই রইল না গোপন, তুষার মরুর নীচে। মৃত্যুস্নানে দ্বিগুণ উজ্জল হয়ে সে দেখা দিল, নবযৌবন। ধরিত্রীর দেহভট প্রাণিত করে। নতুন দেশে নতুন প্রকৃতি উঠল-সেজে। বসন্তের বিচিত্র পুষ্প সজ্জার মত ঢেলে দিল দেশে দেশে নব নব পূর্ণতর প্রাণের অঞ্জলি।

দিনে দিনে পরীক্ষার পালা শেষ হয়েছে ধরণীর।

প্রাণলীলার বিকৃত অতিকায় রূপ নিশ্চিহ্নে গেছে মুছে। এসেছে মানুষ, ধরণীর বিচিত্র প্রাণস্পন্দনে মিশিয়েছে আপন নাড়ীর স্পন্দন। মূঢ় চেতন বিশ্ব দেখতে পেয়েছে আপন রূপ মানব চেতনার মুকুরে। তাই ধীরে ধীরে শাস্ত হয়ে এসেছে, না পাওয়ার বিক্ষোভ। ধরিত্রীর শ্রানল অরণ্যের নিবিড় ভঙ্গিমায় শুদ্ধ হয়েছে ধূগ্ধসৃষ্টির বহি। থেমে এসেছে ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে নবোদগত ফলয়ের পাগলামী। আজকে এই শ্রামছায়াপ্রতিত, বর্ষণমুখর, ধূমী-গন্ধ সুরভিত, মন কেমন করা, প্রভাতটী যে তার ঋতু দুঃখের ধন, সে কথা আজ ধরণী নিজেও ভুলেছে সার্বকতার আনন্দে, শিশু মুখ দেখে জননী যেমন ভোলে প্রসবের বেদনা। তবু কি তার মমের গৃঢ় চেতনা আচ্ছন্ন হয়েছে সেই বেদনার ছায়ায়। তাই কি তার অবচেতন মন প্রতি বৎসর মেলে ধরে আপন জীবনতিহাসের ইঙ্গিত বিভিন্ন ঋতুর পধ্যায়ে। তাই কি ঋতুতে ঋতুতে নর নব ভাবের স্মরণে আমরা আকুল হয়ে উঠি। আমাদের মন, মূঢ় ভাবে সাড়া দেয় পৃথিবীর আহ্বানে। কারণ তার সঙ্গে যে আমাদের নাড়ীর বন্ধন। তারই অল্পপরমাণুত গড়া এই দেহ, তারই স্রজনী শক্তির লীলা আমার রক্তের ছন্দে, তারই আলো বাতাসে পুষ্ট এই প্রাণ। স্তম্ভদায়িনী মায়ের চেয়ে সে তো কম নয়। তাই তার ঋতুর ইঙ্গিতে আমাদের সেই যুগযুগান্তরের স্তম্ভ অস্তিত্বের আনন্দ বেদনার স্মৃতি দৌলা দেয় আমাদের মনে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড জ্বলনে তপ্ত হয়ে, বর্ষার ঘনঘটায় তাই কি আমাদের বিরহ উদ্বেগ হয়ে ওঠে। শরতের প্রাণের খুসীতে ছুটে যাই নবীন উৎসাহে। শীতে স্তব্ধ হয়ে যাই, আর বসন্তে আবার বিজয়িনী ধরণীর জয় পতাকা বহন করে বিচিত্র কুসুমাকর্ষণ বসনে ভূষণে সেজে-বেড়াই আনন্দে।

শিক্ষা জীবনযাত্রার সহায় ।

ত্রিশান্তা দেবী

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে কর্মক্ষম, দেহে মনে সুন্দর ও মজিত করে তোলা—যাহাতে সে নিজের, আত্মীয় স্বজনদের, দেশের এবং মনুষ্যজাতির জীবনযাত্রার সহায় হতে পারে, তাছাড়া তাদের আনন্দও দিতে পারে। জীবন-যাত্রার সহায় হওয়া অর্থে সচরাচর লোকে বোঝে টাকা রোজগার করা; কিন্তু টাকা ত মানুষ অর্জন পায় না। অপর, মানুষের এবং কতকটা নিজেদেরও কোন কোন কাজ করে বলেই রোজগারী মানুষ টাকা পায়। যে ডাক্তার সে উপার্জন করে, কিন্তু রোগীকে সেরে উঠতে সাহায্য করে বলেই তার রোজগার, যে বাড়িদার সেও রোজগার করে, কিন্তু পথচারীদের পথচলা একটু সহজ করে বলেই তার রোজগার। সকল রকম বিছাই মানুষের জীবন-যাত্রার সহায় বা জীবনের আনন্দপরিবেশক বলেই তার পরিবর্তে অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু শিক্ষার অর্থ এ নয় যে, যে ডাক্তার সে ডাক্তারী ছাড়া আর সব বিষয়ে অজ্ঞ এবং অমানুষ থাকবে, যে গণিতশিক্ষক সে গণিত-শাস্ত্র ছাড়া আর সব শাস্ত্র-গ্রন্থ দেখলেই চোখ বুজে থাকবে। আমার মনে হয় শিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত এক-শিক্ষার অর্থও এমন বোঝা উচিত যাতে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে লোকে মনুষ্যজাতির সবল গুণ এবং সকল বিদ্যাই অল্পবিস্তর দেখতে আশী করতে পারে।

আজকালকার জটিল জীবনযাত্রায় কিছু একটা শিক্ষার করে এনে কাঁচা কি পোড়া মাংস খেয়ে ঘুমোলেই চলে না। মানুষের জীবন ক্রমশ সভ্য ও সুন্দর করে তোলার নামে তার কাজ পরিমাণে এবং রকমারিতে এত বেড়ে গিয়েছে যে মনে হয়, এই সংসার-চক্রের পরিচর্যা করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের সেবার জন্য সংসার-চক্রের সৃষ্টি নয়। কেউ হয়ত বলবেন—শিক্ষার করে খাওয়ার চেয়ে বাজার থেকে কিনে খাওয়া অনেক সহজ, সুতরাং সত্যতা জীবন-যাত্রা সহজই করেছে। কথাটা মিথ্যা নয়

বটে; কিন্তু বাজার করার জিনিষ একটা নয়, কাঠকয়লা, তেল, মশলা, চালডাল, মাছ, মাংস কত কি। তার উপর বাসন কোসন চেয়ার টেবিল, ছুরি কাঁটা, হাপকিন, পানমশলা কত কি সভ্য মানুষের দরকার। এই সব সংগ্রহ করতে এবং যথাযথ ভাবে মানুষের সেবার লাগাতে সময় অর্থ এবং নৈপুণ্য ইত্যাদি অনেক জিনিষ দরকার। বাসগৃহেরও আজকাল বৈদ্যুতিক কল-কারখানা, বৈজ্ঞানিক নদীমা ইত্যাদি কত কিছু দরকার। জীবন সরস ও সুন্দর রাখতে হলে ভদ্রতা, নম্রতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ চর্চা করা প্রয়োজন। সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পকলাও জানা থাকলে খুব ভাল।

আমি নানা জিনিষের ফর্দ দেব না, উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা দিয়ে বলতে চাই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আপন-ও পরের জীবন সহজ ও আনন্দময় করা হয়, তাহলে তার জন্য আজকালকার দিনের শিক্ষিতদের ক্রটিগুলি লক্ষ্য করে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কতকটা সর্বদুঃসুন্দর করবার চেষ্টা করতে হবে।

ছাত্রদের শিক্ষা যাদের কাছ থেকে তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক প্রথম। সুতরাং সর্বাগ্রে দেখতে হবে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক সুন্দর কিনা। আমরা আজকাল এই সম্পর্কের মধ্যে অনেক গ্লানি দেখতে পাই। ছাত্র যার সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শে আসে তাঁর সঙ্গে যদি শোভন ব্যবহার করতে না শেখে তবে ভবিষ্যতে পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর কি করে আদর্শজনোচিত হবে? সুতরাং দেবী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে পুরাকালের কবির যেমন কাব্য রচনায় নামতেন তেমনি পাঠ-চর্চা শুরু করবার প্রথমেই ছাত্রদের গুরুকে ভ্রাতৃত্বের নমস্কার করতে শেখানো দরকার। পড়াশুনার সময় অবশ্য সহপাঠীদের সকলকে অভিযাদন করা চলে না। কিন্তু পড়ার সময়ের পরে সর্বদা সর্বত্র সহপাঠীদের অভিযাদন করাও শিক্ষার একটা অঙ্গ বলে

ধরা উচিত। এতে মানুষের বহু মানুষের সঙ্গে ভ্রম ব্যবহার করার অভ্যাস হয়।

আজকাল স্কাউটদের এবং গার্ল গাইডদের কতগুলি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেগুলি ঠিক কি কি তা আমি জানি না। তবে আমার মতটা মনে হয় সেগুলি মানুষের জীবন যাত্রার সহায় হওয়াই শিক্ষা। স্কাউট সব ছেলেরা না হতে পারে। কিন্তু স্থলে কলেজে, কিছু সামর্থ্য থাকলে, মা বাবা সব ছেলেমেয়েদেরই পাঠান। সুতরাং এই জাতীয় শিক্ষা স্থলের ও কলেজের শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। শুনেছি জাপানের স্থলে সহবয় শিক্ষার ক্লাস হয়। আমাদের দেশে ছেলেদের মধ্যে এ জিনিষটার অভাব অত্যন্ত বেশী।

পথে ঘাটে শিশু কি বৃদ্ধকে কেহ সাহায্য করে না, মেয়েদের নিঃসঙ্গ দেখলে অনেক তথাকথিত ভ্রম ছেলেও ঠাট্টা তোমাসা বা অত্যাচারকর্ম অভিজ্ঞতা করাকে দোষণীয় মনে করে না। যদি রাজ্যে বিপজ্জনক স্থানে কোন মেয়েকে ছেলেরা সাহায্য করতে আসে তবে মেয়েদের মনে সাহসের চেয়ে ভয়ই বেশী হয়। তারা মনে করে যে এরা এই সুযোগে কিছু একটা অভিজ্ঞতা করার মতলবে আছে। এই বহুমূল ধারণা মেয়েদের মন থেকে দূর করার জন্য শৈশব থেকে ছেলেদের জীজ্ঞাতকে সম্মান করতে শেখানো দরকার। স্বাধীন দেশের শিক্ষা ও আইন এমন হওয়া উচিত যাতে দেশে কখনও কোন জীলোক পথে ঘাটে অকারণ লাঞ্ছিত ও অপমানিত না হয়। শিক্ষিত ছেলেরা শুধু যে মেয়েদের সম্মান করবে তা নয়, তারা অপর লোককেও এইরূপ ভ্রম হতে বাধ্য করবে।

শুনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম মন্ত্র 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।' বুনিয়াদী শিক্ষা কতদূর বিস্তৃত হয়েছে এবং শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে এই মন্ত্র কতটা পালিত হয়েছে তা আমি জানি না। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত লোকেরা বিশেষত ছেলেরা কতদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমরা সর্বদাই দেখতে পাই। একেবারে শিশুবয়সের থেকেই যদি ধরা যায় দেখতে পাই, শিশুদের যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করতে বিশেষত রাস্তা নোংরা করতে বহু লোকরাই শেখান। শৈশব থেকে যদি নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া মলমূত্র ত্যাগ করানো না হয়, তবে পরে এই

শিক্ষা বিষয়ে স্থলে আরও কড়া হওয়া সহজ হয়। তারপর পরের দরজায় বাড়ীর আবর্জনা ঢালা, বাড়ীর উপর থেকে রাস্তার নোংরা ফেলা, মানের ঘর অপরিষ্কার রাখা, প্রত্যহ্ন নান না করা, নিজের কাপড় প্রতিদিন না কাটা, রাস্তার জুতা পায়ে পরিষ্কার ঘরে ঢোকা ইত্যাদি কতরকম অপরিচ্ছন্নতাই ত আমরা দেখতে পাই। স্থলে যদি ময়লা কাপড় চোপড় পরে ঢোকা বারণ হয় এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা একটা অবশ্য শিক্ষণীয় জিনিস হয় তবে উত্তর জীবনে এই সব ছাত্রদের অনেক উন্নতি হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের এমনই শিক্ষা যে অনেক নামজাদা লোককেও ময়লা কাপড় পরে পথে ঘাটে বাহির হতে দেখা যায়।

নিজের বাড়ীর বরদোর জিনিষপত্র বাড়তি জমি সব কিছু সুন্দর করে রাখতে প্রত্যেক শিশুর ছেলেবেলা থেকে যদি শিক্ষা হয় তবে ইহা ক্রমে তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে উঠবে।

তারপর ভাবতে হবে কর্মক্ষমতার বিষয়। নিজের সমস্ত কাজ এমন কি বন্ধন পর্যন্ত নিজে করতে শিখলে মানুষ যতটা স্বাবলম্বী ও সুস্থ হতে পারে এমন আর কিছুতেই পারে না। যারা একটু অবস্থাপন্ন লোক আজকাল তাঁদের ভৃত্য সমস্তা একটা মস্ত সমস্তা। তার উপর আছে ভেজাল খাতের উৎপাত। এই দুটি জিনিষের বিপদ থেকেই অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায় নিজেরা সব কাজ করতে শিখলে। এগুলি সাময়িক সমস্তা হলেও মানুষ যদি তেমন ভাবে তৈরী হয়, তাহলে সাময়িক সমস্তা মানুষকে দীর্ঘকালের জন্য কাবু করতে পারে না।

আমি যে সমস্ত শিক্ষার কথা বলছি বুনিয়াদী শিক্ষাতেও কতকটা সেই রকম প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং এগুলিকে কোন কোন দিকে পুনরুজ্জীবিত মনে হবে। কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য যে, গ্রামীন শিক্ষার জন্য মহাশয় এইরূপ শিক্ষার প্রস্তাব করলেও বহু মানুষ সহরেই থাকবে। সহরে যারা থাকবে তারা উচ্চশিক্ষার পথে অনেক ছেলে মেয়েকেই দেবে। ছেলেমেয়েদের ডাক্তার উকিল, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি করার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু এই সব পথে যারা যাবে তারা কেবল সেই সব বিদ্যাই শিখবে এবং দৈনিক জীবনযাত্রাকে সহজ ও শোভন করার জিনিষগুলো

শিখবে না, এ হতে পারে না। সুতরাং এই সকল শিক্ষা বিভাগয়ের নিয়তম ক্লাশ থেকেই দেওয়া উচিত।

উচ্চতর শ্রেণীতে যখন ছেলেমেয়েদের হাত ও বুদ্ধি আর একটু নিপুণ হয় তখন সহরের স্কুলে ছুতারমিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, দ্রাঘার, ধোপা, দরজি প্রভৃতির সহজ কাজগুলি শেখালে সহরের জীবন যাত্রা আর একটু সহজ হতে পারে। অনেক মেয়েদের স্কুলেই রন্ধন, সেলাই, কাপড় কাচা শেখান হয়, তাতে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি কিছু হয় না। সুতরাং ছেলেদেরও এগুলি শেখালে তাদের কিছু বিত্তা ক্রম হয়ে যাবে না।

চিকিৎসার প্রাথমিক জিনিষগুলি সব স্কুলেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। চিকিৎসার সঙ্গে রন্ধন বিদ্যারও কিছু জ্ঞান না থাকলে রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে ঠিক পরামর্শ দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে কোন কোন ডাক্তারকে পথ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, “এটা কি রকম করে রাখবে?” তাতে ডাক্তার জবাব দিয়েছেন, “সে ত আপনিই আমার চেয়ে ভাল জানেন।” এই রকম জবাব কিন্তু ডাক্তারের দেওয়া উচিত নয়। বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় নীলরতন সরকার পথ্য প্রস্তুত প্রণালী অনেক সময় বলে দিতেন। চিকিৎসক নয় এমন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরও কয়েকটি পথ্য রাখতে জানা অবশ্য ক্তব্য।

মাছুষ গ্রামেই থাকুক আর সহরেই থাকুক আনন্দই তাদের জীবনশক্তি ও মানসিক উন্নতির সহায়। শুধু কাজ করলাম, আনন্দের ধোঁরাক একেবারেই পেলাম না, এতে অধিকাংশ মাছুষেরই জীবন দুর্বল হয়ে ওঠে। এমন মাছুষ অবশ্য আছে কাজেই যার আনন্দ। কিন্তু অধিকাংশ মাছুষের কাছে কাজ ও আনন্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতের জিনিষ। এই যে আনন্দ এর উৎস গানবাজনা, খেলা, ছবি আঁকা, ঘর সাজানো, কাব্যচর্চা, নৃত্য প্রভৃতি অনেক জিনিষই হতে পারে। খেলা জিনিষটার আঙ্গকাল প্রায় সব বিভাগেরই স্থান হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীত মেয়েদের স্কুলে যতটা আদর পায় ছেলেদের স্কুলে ততটা পায় না। সম্ভবত ছেলেদের অনেক স্কুলে গান শেখানোই হয় না। অথচ তাদের যে কোন অস্থানই গান ছাড়া অসহন হয়। তাছাড়া মাছুষের মনকে সাংসারিক তুচ্ছতার উর্ধে নিয়ে

যেতে গান যতটা সাহায্য করে মনে হয় অল্প জিনিষ তা করে না। ছবিও মানসিক বিকাশের ও উন্নতির একটি বড় সহায়। সাধারণ-মাছুষ চোখ থাকতেও বাস্তব জগতে যে সৌন্দর্যকে খুঁজে পায়না, শিল্পী মাছুষের চোখের সামনে সেই সৌন্দর্যকে তুলে ধরেন। মাছুষ বিস্মিত হয়ে ভাবে, ‘এ তো পৃথিবীতেই আছে, তবে আমরা কেন দেখতে পাইনি?’ ছবি বা অঙ্কনজাতীয় অগাধ্য শিল্প নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিষকেও নয়নাভিরাম করে তোলে। কাপড় সবাই পরে, কিন্তু পোষাক দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় এমন পোষাক করতে হলে পরসার চেয়ে সৌন্দর্যবোধ বেশী প্রয়োজন। লক্ষপতি বণিক যে অট্টালিকায় বাস করেন তার চেয়ে অনেক সাঁওতালের মাটির ঘরও সুন্দর দেখায়। সেখানে বসলে মনটা তৃপ্তি পায় কেন? সাঁওতাল মেয়ে তার ঘরের মেঝে নিকিয়ে দেয়ালে রং দিয়ে মাখায় জবা ফুল-গুঁজে, চকচকে করে চুল-হাত পা পালিশ করে এমন করে রাখে যে অনেক ছীরা জ্বরভেও সে সৌন্দর্য দেখা যায় না।

পৃথিবীতে চিরকালই একদল মাছুষ ধনী হবে। ধনকে লোহার সিল্লিকে বা সোনার তালে বন্ধনা রেখে মাছুষের জীবনকে সুন্দর করার কাজে যদি লাগানো যায় তাহলে পৃথিবীর অনেক উপকার হয়। নিজের ঐর্ষ্য দেখাবার জন্য অনেক ধনী হয়ত পরসী ধরচ করেন। কিন্তু পরসার পরিবর্তে যে জিনিষ তাঁরা আমদানি করেন তাঁর রূপ দেখলে শিল্পীর চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছা করে; অথবা যদি কখন সত্যিই ভাল জিনিষ আনি হয় তবে তাঁর ব্যবহার না জানার জন্য ধনী ছদ্মিানেই তাঁকে আবর্জনা পয় পরিণত করেন। চুলের তেলমাখা বেনারসী শাড়ী, ঘাম ও তৈলসিক্ত সোফা কোচ, বাথটাইল লাগানো ড্রয়িংরুমের দেয়াল, ডালতরকারি মাথা রেশমী পর্দা আমরা অনেক দেখেছি আরও ফদ রেওয়া যায়; কিন্তু মাছুষ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই অনেক খুঁজে বের করতে পারবে। শৈশব থেকে শিল্পচর্চা কিছু কিছু যদি প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে করানো হয় এবং সৌন্দর্যজ্ঞান বুদ্ধির জন্য সুন্দর ছবি ও সুন্দর আসবাব ও আবেষ্টনীর মধ্যে তাদের রাখা হয় তাহলে আপনা হতেই তাদের মনে শিল্পাহ্লাস আগবে। আসবাব সুন্দর মনেই

মূল্যবান নয়। মাছ, মোড়া, পাটি, কাঁথা, সিন্ধুক, জলচৌকি, হাতপাখা, এগুলিও কত স্বন্দর হয় গ্রাম্যশিল্পে তার নিদর্শন আমরা দেখেছি।

গ্রামে বা মহরে যেখানেই মাছ স্বাভাবিক ভাবেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, স্থলের ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকে সে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত। শিল্পচর্চা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম; অস্বাভাবিক আবেষ্টনে তা আজকাল অনেক জায়গায় শিশুদের মধ্যে বিকশিত হয় না, সেটা

জাগিয়ে তোলা দরকার। শিক্ষণীয় বিষয়ের ফর্দ করা সহজ, তবে শৈশব থেকে বাল্যকালের মধ্যে এত রকম চাপ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে দুর্বল হয় কিনা সেটা ভাবাও দরকার। দেখা যায়, বিদ্যালয়ে শিক্ষা না দিলেও অনেক ছেলে মেয়েই বাড়ীতে আপনা হতে আগ্রহ করে এসব জিনিস শিখে নেয়। যেটা দশজন নিজের আগ্রহে শেখে, সেটা শতজন শিখতে পারে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা সক্ষম বিদ্যালয়েই থাকে।

('শিক্ষা' হইতে উদ্ধৃত)

স্বাধীনতার দান

ত্রিযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রথম প্রস্তাব

বাংলাদেশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্ম যে ভাগ ও মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহা ইতিহাস চিরদিন স্মরণ করিবে। বাঙ্গালী কি না করিয়াছে তাহার দেশের জন্ম? কান্দী কাঠে ঝুলিয়াছে, গুলির ঘায়ে প্রাণ দিয়াছে, কারাবরণ করিয়াছে—সে যে কত বড় দুঃখ কষ্টের ইতিহাস তাহা ভারতবাসীমাত্রেই জানা আছে। স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গলার সৃষ্টি। অসহযোগ আন্দোলন আগষ্ট বিপ্লব প্রভৃতি সেদিনকার ঘটনাগুলিও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষের স্বরাজ বা স্বাধীনতালাভের বিরোধী ইংরেজরা পর্যন্ত ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা এখন বাঙ্গলার সেই সব কথা ভুলিতে বসিয়াছেন। এদিকে দেখিতে পাই বাঙ্গলা দেশের যে সব নেতারা এক সময়ে ইংরাজের কারাগারে গিয়াছিলেন হয় রাজদ্রোহী বক্তৃতা দ্বারা, সংবাদপত্রে ইংরাজ বিরোধী বাণী প্রচার করিয়া বা অন্য কোনরূপ কাণ্ডে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরাগভাজন হইয়া, তাঁহারা তাঁহাদে সেই বেদগুণে তাহার পুরস্কারের মূল্য হুদে আসলে আদায় করিতেছেন। ভারতরাস্ত্রীয় শাসনক্ষেত্রে বাঙ্গালীর নৈ একরূপ নাই বলিলেই চলে, বাঙ্গলার মন্ত্রী, বাঙ্গলার রাজপুরুষ এই স্বাধীন রাষ্ট্রের বাহারা দেশের

শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রণী, এখন তাহাদের মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা লক্ষ্যের বিষয় বলিতেই হইবে। আমরা দেখিয়াছি পূর্বে কোন লাট বড় লাট ভ্রমণে বাহির হইলে কিংবা কোন রাজপুরুষের অভ্যর্থনা উপলক্ষে অর্থ ব্যয় হইলে দেশের সংবাদ পত্রে তীব্র সমালোচনা বাহির হইত—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিন্দাবাদ করিতেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখিতে পাই ঐরূপ ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য কোনরূপেই কম হইতেছে না। প্রতিদিনকার কাগজের পৃষ্ঠা উন্টাইলেই দেখিতে পাই অমুক মন্ত্রী অমুক গ্রাম পর্যটনে গিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এই সব সফরের দূরত্ব কম নয়। সেকালে ছিল জল পথে ও স্থল পথে রেল স্টামারে সরকারী সফর আবদ্ধ, এখন আকাশে উড়িয়া সফর হইতেছে নিত্যকার ব্যাপার—বিলাস ব্যসন বাড়িয়াছে, বেতনের হার হ্রাস পায় নাই। কোন দিকেই ব্যয়ের দিক হ্রাস পাইয়া সফরের দিকে বা বাড়তির দিকে কিছুই দেখা যায় না।

আমরা যে ভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি সে স্বাধীনতা লাভ যুদ্ধ দ্বারা নহে, বীর্ঘ্য দ্বারা নহে, রক্ত স্রোতের দ্বারা দ্বারা পৃথিবী প্রাণিত করিয়া নহে, ইংরাজ চলিয়া

গিয়াছেন—চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাই আমাদের হাতে ভারতবর্ষকে দিয়া গেলেন, স্বাধীনতার নামে। আমরা তাহাকে পাইলাম অর্থহীন, দুর্ভিক্ষপীড়িত একান্ত নীরস ও দারিদ্র্যের মধ্যে; শুধু কি তাই?—যে বিদ্রোহ ও অশান্তি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতকে কলুষিত করিতেছিল, তাহার বৃদ্ধির পথ আরও পরিষ্কার করিয়া পাইলাম। অথও ভারতকে দ্বিখণ্ড করিয়া চিরদিনের জন্য অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দহনে ও পীড়নে পুড়িয়া মরিবার জন্য, তাই ভারতীয় নেতারা ‘পাকিস্তান’ মানিয়া লইলেন। যদি আরও তিন চারি মাস অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা দাঁড়াইত বলা কঠিন। গান্ধীজী কোন দিনই খণ্ডিত ভারতবর্ষকে চাহেন নাই, কিন্তু পরে তিনি তাহা মানিয়া লইয়া শুধু একটি কথা বলিয়াছিলেন—ইহার পরিণাম ভাল হইতে পারে না। তাহাই হইল। শ্রীরাজগোপালাচারী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন—বাংলাদেশকে ও পশ্চিম পাঞ্জাবকে বিসর্জন দিয়া কতকটা ব্রিটিশরাজ শাসন-পরিষদের ক্রিপস্ সাহেবের প্রস্তাবের অনুরণে; কেশরী ক্রিপস্ সাহেবের প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক ভূখণ্ডগুলির (territorial units) যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার অধিকারও ছিল। কংগ্রেস সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করার পরে সেই আদর্শে গঠিত রাজাজীর ফরমুলা কংগ্রেস গ্রহণ করেন। “রাজাজী ক্রিপস্ প্রস্তাবের দুর্ভিক্ষের পরিপোষক ছিলেন। রাজাজীর ফরমুলাতে বলা হইয়াছিল যে জেলা হিসাবে সাবালক ভোট (Plebeian) লওয়া হইবে এবং বাংলাদেশে নিম্নলিখিত অংশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য আছে, :—ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ (জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং বাদে) এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ (খুলনা, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা বাদে)। এই বিভাগগুলি আধুনিক বাঙ্গলা প্রদেশের চার ভাগের তিন ভাগ। ১৯৪১ সালের আদম শুমারি অনুসারে বাংলা প্রদেশের লোক সংখ্যা ছয় কোটি তিন লক্ষের কিছু বেশী। বাংলার পাকিস্তান অংশে শতকরা ৭০ জন মুসলমান। সুতরাং সেখানে গণভোট লইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভৌগোলিক বাংলার এই

বিরাট অংশকে বাদ দিলে থাকিবে বর্ধমান বিভাগ, কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও খুলনা। এই অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য বটে, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা মাত্র, ১,০৮,৭৫,৪৬৪। বর্ধমান বিভাগ, খুলনা, ও ২৪ পরগণা লইয়া যে হিন্দু বাংলা, রাজাজীর ‘ফরমুলা’ অনুসারে তাহাকে কেন্দ্রীয় ভারত কিংবা পাকিস্তানী ভারতের সহিত মিলিত হইবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে এই অঞ্চলকে বিশেষ বিপদে ফেলা হয়। ক্রিপস্ প্রস্তাবের মধ্যে আর একটি প্রস্তাব ছিল, এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দুই বিবাদমান সম্প্রদায়ের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া সমগ্র বাংলা দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খাস মহল করিয়া রাখিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতেও যে পারেন, তাহার প্রস্তাব ঐ ক্রিপস্ প্রস্তাবের মধ্যেই রহিয়াছে। এইরূপ একটি অর্থহীন ভারতবর্ষের (Vivisected India) সম্ভাবনা স্বরণ করিলেও মহাত্মাজী যে অস্থখী হইবেন, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং মহাত্মাজীকে এই সমস্যার পূর্ব রূপটা বাংলাইয়া দেওয়া জাতীয়তাবাদী হিন্দু মুসলমানদেরই কর্তব্য।”*

ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইবার পূর্বে এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতা শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ রাজাজীর ফরমুলা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে গান্ধীজীও রাজাজীর ফরমুলাকেই মানিয়া লইলেন বলিতে হইবে—নতুবা তিনি এইরূপ খণ্ডিত ভারতবর্ষ মানিয়া লইবেন কেন? এই খণ্ডিত ভারতবর্ষের পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা আজ কি আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে? এজ্ঞাই একটু পূর্ব কথা বলিলাম।

গান্ধীজী বছবার Himalayan Blunders করিয়াছেন। সে সব কথা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু খণ্ডিত ভারতবর্ষ মানিয়া লইয়া শেষবারের মত যে ভুল করিয়াছেন—রাজাজীর ফরমুলাকেই গ্রহণ করিয়া তাহার ফলে ভারতবর্ষ চিরদিন বাবণের চিত্তানলের হ্রায় জলিয়া পুড়িয়া মরিবে। ভবিষ্যৎদৃষ্টীর রাজাজীর নাম ক্ষোভে ও দুঃখে স্বরণ করিবে। তাঁহার কুটবুদ্ধিই তাঁহার উন্নতির কারণ হইতে

• রাজাজীর ফরমুলা—ভাদ্র, ১৩৫১—শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ

পারে, কিন্তু বাঙ্গলার শাসনে বা ভারতের শাসন কর্তৃত্বও শুধু বক্তৃতা ছাড়া কোন গঠনমূলক কার্য তিনি করেন নাই।

লর্ড মার্টিনবেটন খাদ্যের জাতির একজন খাদ্যকর। তিনি খাদ্যবাল্য অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া গেলেন—আমাদের নেতারা তাহা ‘খো হকুম সাব’ বলিয়া মানিয়া লইলেন। পূর্ব বাঙ্গলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব হইল তাহার বলি। নেতাদের লাভ হইল প্রভুত্ব—অথের ছিনিমিনির সহজ লাভ আনন্দ। আমাদের বাংলা দেশের নেতারা জানেন শুধু দল গড়িতে আর ভিন্ন প্রদেশের নেতাদের অনুসরণ করিতে, অনেক দিন হইতেই তাহার। নিজেদের কর্তৃত্ব এবং বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর ভাবে কোন চিন্তা করেন নাই—এবং কিরূপ স্বাধীনতা তাহাদের কাম্য তাহারও একটা বিশদ পরিচয় দিতে পারেন নাই।

আমাদের পূর্ববর্তী নেতাদের মধ্যে কেঁহ কেঁহ এই মতবাদ পোষণ করিতেন, এবং বলিতেন,—ও হে ইংরাজ, তোমরা একবার ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাও, আমরা আমাদের সাম্প্রদায়িক মতভেদ হিন্দু মুসলমানের বগড়া বিবাদ নিজেরাই মিটমাট করিয়া লইতে পারিব। পূর্ণ স্বরাজ যদি আমরা পাই, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের সহিত মুসলমান হিন্দুর সহিত বোঝাপড়া মিটমাট সহজেই করিতে পারিবে।—কিন্তু হিন্দুর এই মনোবৃত্তির সহিত মুসলমানের মনোবৃত্তির যে কতখানি প্রভেদ, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত মুসলমান নেতাদের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯০৮ সালের নিখিলভারত মোসলেম লিগের অধিবেশনে মুহম্মদ আলি বলিয়াছিলেন, ‘We are the representatives of our Coreligionists in various parts of this Empire.’ আমরা যে সাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক স্বরাজ চাহিয়াছিলাম, যে স্বরাজে ধনিক, অধিক, লিখন পঠনক্ষম নিরক্ষর, নারী ও পুরুষদের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতম ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় কার্য নিৰ্বাহ করিবেন এবং দেশে সকলের সমান আদর ও মর্যাদা থাকিবে, আমাদের সে স্বরাজের স্বপ্ন যে বুধা হইয়াছে, তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ইংরাজের আমলে পরপদানত রহিয়া যত না উৎপীড়িত

হইয়াছি এখন তাহা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছি। মানবজীবনের বাহা কিছু কাম্য, বাহা কিছু শ্রেয়: ও শ্রেয়: আমরা সে সমুদয় বর্বর দস্যাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি। স্বাধীনতার আনন্দের সমস্ত গৌরব ধূলিমাৎ করিয়া দিতে হইয়াছে। চাষীর চাষ গেল, গৃহস্থের ঘরবাড়ী গেল, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বাণিজ্য গেল, মানীর মান-সম্মত ও নারীর মর্যাদা গেল—দেশের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইল। শুধু দু’মুঠো ভাতের জন্ত—একখানি পরিবার কাপড়ের জন্ত, এক টুকরা জমিতে বাস্তুগৃহ নির্মাণ করিবার জন্ত ঘরে ঘরে কোন্ দেশের লোক ভিক্ষা করে, ভিক্ষা করিয়াও লাঞ্ছিত হয়, সে কি বাঙ্গালী নয়! উদাস্ত—এই নামধারী যাহারা তাহাদের কথা একবার ভাবুন!

বিক্রমচন্দ্র ‘আনন্দমঠে’ ভবানন্দের মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন:—‘মহেন্দ্র সিংহ! তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বেধি ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সুবাইয়া, তুমিও তা। কেবল দুধ ঘিয়ের ঘম, দৈহ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি নাই, সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই বৈধ্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ—আজ, মগধ, মিথিলা, কাশী, কাশী, দিল্লী, কাশ্মীর কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে মরি খায়? কাঁচা খায়, উইমাটি খায়, বনের লতা খায়? কোন্ দেশের মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে কি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, কি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে নাই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, এখনও প্রাণ শাস্তি চায়।’

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমের এই উক্তিগুলি আজ বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার যুগেও কি সত্য নয়!

বাঙ্গলা দেশের এই দারুণ শঙ্কাময় মুহূর্তের কথা ভাবিলে মনে হয়, বাঙ্গালীর প্রাণকেই সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা বলিতে মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল যে স্বাধীন ভাষিতে উভয় রাষ্ট্রই সংখ্যাগুরুদের প্রতি এমন

ব্যবহার করিবেন, বাহার দ্বারা শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়া উভয় রাষ্ট্রকেই পৃথিবীর সর্বজাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিবে। কোনরূপ অহুদার মতবাদ তাহাতে থাকিবে না, হিন্দু-মুসলমান দুই ভাইয়ের মত পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হইয়া চলিবেন। ভারতে সৃষ্ট হইবে এক মঙ্গলজনক সাম্রাজ্য। ইংরাজ আদিবার পূর্বেও পরে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কলহ ও অশান্তি ছিল না। বাঙ্গলার স্বাধীন স্বলতানেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিতেন, সেই চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া—ইলিয়াস শাহের বংশধরদের রাজত্বকালে দীর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসর কাল—বাঙ্গলা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, দিল্লীর প্রভুত্ব সে মানিয়া নেয় নাই। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ছিল প্রেম ও প্রীতি, গ্রাম বিচার, সাক্ষিত্যের উৎকর্ষ-বিধান, সর্ববিষয়েই তাঁহারা হিন্দুর প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। বাঙ্গলার জমিদারেরা একরূপ স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ জমিদারী শাসন করিতেন। মুসলমান নবাব ও জমিদারদের মন্ত্রী, কর্মচারী, অধিকাংশই ছিল হিন্দু।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দুজাতির পুনরুত্থান হইয়াছিল। রাজা গণেশ ও দহুজমুদ্দিনের কথা বলিতেছি। বাঙ্গলার স্বাধীন হিন্দুরাজগণের মধ্যে দহুজমুদ্দিনদেব মহেন্দ্রদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বলতান হোসেন শাহের গ্রাম-পরায়ণতার কথা বাঙ্গলাদেশে সুবিদিত। কবীজ্ঞ পরমেশ্বরের মহাভারতে হোসেন শাহের সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

নৃপতি হুসেন শাহ হয় মতি।

পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।

অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত মহিমা অপার।

কলি কালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার।

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের দৈবর।

তানু হুকু সেনাপতি হওও লঙ্কর।

হুসেন শাহের সময়ে গৌড় বঙ্গে ছিল প্রাচুর্য—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অশান্তি ও কলহ ছিল না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব * এক নূতন ভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করেন। “বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে এই নূতন সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

ইহার কারণ এই সম্প্রদায়ে সকল জাতির সমান অধিকার এবং তুর্য্যোধ্য জটিল দার্শনিকতার অভাব। ১৪০৭ শতাব্দীর ফাজলী পূর্ণিমাতে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গলার স্বলতান জালাল উদ্দীন ফতেশাহের রাজ্যকালে চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছিল। হোসেন শাহের বংশের রাজত্বকালে গৌড়ীয় চৈতন্যদেব যে নবদর্শন প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নব প্রচারিত দর্শন উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথের গৌড়ীয় গোষ্ঠীমাগণকে পূজনীয় করিয়াছিল।”

বাঙ্গলার স্বলতানদের শাসনকালে হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ না হইয়াছে, এমন কথা নহে, তবে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহা ত সেকালে হয় নাই। এমন নৃশংস হত্যা, এত লুণ্ঠন, এত অবিচার, হিন্দুদলন কোন কালে হয় নাই। ঝড়ের মত বেগে তৈমুর, নাদির সব আসিয়াছেন—নূতনরাজ এবং রক্তের প্রাবল্য আনিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেই হত্যার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমান ভাবেই নির্যাত্ত হইয়াছে। কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাবে গড়িবার চেষ্টা সেকালে হয় নাই। পার্থান ও মোগল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুজাতিকে উৎসাদিত করিতে হইবে—নিমূল করিতে হইবে এইরূপ হিংস্র কল্পনা তাঁহারা করেন নাই। বাঙ্গলার আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে বাঙ্গলাদেশ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কত বৃহৎ ও সুন্দর নগর-নগরী মঠ-মন্দির চতুষ্পাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান একই মৌলভীর কাছে ওস্তাদজীর কাছে পড়াশুনা করিত—সে ছিল সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। তারপর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শের খাঁর গ্রাম রাষ্ট্রনীতিকুশল ও রণনীতিকুশল নেতা গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া—গ্রামপরায়ণতার মহান আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বল্পকাল শাসন ভারতের গৌরবস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা শেরশাহের সম্বন্ধে বলেন :—

“Sher Shah was not only a great conqueror, but he also showed greater qualities as an

* বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণেতা।

administrator. Appearing like a bright comet in the sky of Indo-Moslem history for a period all too short, he yet brought with him wise and beneficent reforms in every conceivable branch of administration, which have influenced many of the famous administrators of India in succeeding ages. Mr. Keene has affirmed that "no government—not even the British—has shown so much wisdom as this Pathan. He wanted to build his greatness on the happiness and contentment of his subjects and not by oppressing them. Among the Muslim rulers of India, Sher Shah was the first who attempted to found an empire broadly based upon the people's will."

অর্থাৎ শের শাহ কেবল যে একজন রণনীতিকুশল বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা নহে, শাসন কার্যে তিনি অনন্ত-

সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। উজ্জল ধুমকেতুর তায় অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের মোস্তেম জগতে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ কল্যাণকর সংস্কার, বিবিধ শাসনকার্যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। মিঃ কীন্ সাহেব বলেন—কোন রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষই—এমন কি ব্রিটিশ শাসকেরাও—এই পাঠান শাসনকর্তার তায় রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। শের শাহই সর্বপ্রথম গণমতের উপর নির্ভর করিয়া রাজ্যশাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমাদের পাকিস্তানী মন্ত্রিরা একবার যদি এই সব শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শাসকগণের শাসন নীতি অহসরণ করিতেন—তাহা হইলে কি এমন দুর্দিন আসিতে পারিত ?

মা

শ্রীকল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

আমার মা কি হারায় কখন
লুকিয়ে আছে গোপনে,
মা'র সে আঁখি যায় কি ভোলা
মনের মাঝে জাগায় দোলা,
মিলিয়ে আছে সেই চাহনি
নীল আকাশের অঙ্গনে।
আকাশ মাঝে দেখিতে পাই
মা'য়ের নয়নতারা।
সেই চাহনি দেখি আজি বিশ্ব ভুবন ভরা
আলতা পরা চরণ দুটি
দেখিতে পাই স্বপনে।
মা কি আমার হারায় কভু
লুকিয়ে আছে গোপনে।

মা'র সিমস্তের সিঁদুর রেখা
গোধূলীতে আঁকা।
বৈশাখের এই ঘন আঁধার
মা'রের চোখের অঙ্গনে।
ঘুম ভেঙ্গে যায় গভীর রাতে,
নিদ আসেনা আঁখিপাতে।
মা জাগে মোর শিয়রেতে
হাস্ত মধুর বদ্যানে।
মা কখনও হারায় না কে
রয়েছে মোর নয়নে।
যখন পাই ছুঁখ ব্যথা,
মনে পড়ে মা'য়ের কথা,
তো'র চরণেই জানাই মাগো
আমার ব্যথা গোপনে।

পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়

ত্রিভোজ্য চন্দ্র ঘোষ

গত শতাব্দীর বহু বাঙালী সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নর্শন আদি সকল সাংস্কৃতিক বিভাগে যে স্বজনীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অপূর্ব। ওই যুগের যে সব মনীষীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে আত্মত্যাগ ও কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তাহাই স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গঠনের শক্তির উৎস। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণে বাংলাকে নব কলেবরে সজ্জিত করিবার জন্য আগ্রহাবৃত বাঙ্গলার নর-নারী তখনও পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া বিধে প্রতিষ্ঠানত

অসাধ্য সাধনে রত, দেশের মান ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ও তাঁহার জীবন সেই মহান ধারায় গঠিত করিতে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাই তিনি বিজ্ঞানজ্ঞানে, বিজ্ঞানের সাধনায়, দেশের প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সমাজে বরণীয় স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানার্জনের পথে নানা বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও অধ্যবসায় যোগে তাহা অতিক্রম করিয়া সমাজে স্মরণীয় হইয়াছেন।



স্বর্গীয় ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী

করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সাধনা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা প্রত্যেক স্বাধীন জাতির প্রজা লাভের যোগ্য।

পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সেই সব সাধকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহারই যুগে বাঙালী নব জাগরণ মন্ত্রে উদ্ভূত

তাঁহার জন্ম হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বাঙ্গলার ঝামল ছায়া সমিতিষ্ট এক নিভৃত পল্লীতে। গ্রামধানির নাম হোয়েড়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত গ্রামের মতনই সে যুগের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় এই গ্রাম পূর্ণ। ছোট হইলেও গ্রামধানি প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে যেমন মনোরম, সামাজিক প্রতিষ্ঠারও তেমনই গরীবান ছিলে। শিশুকাল হইতে পঞ্চানন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

৩০।৪০ বৎসর পূর্বে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিবার আগ্রহ ও সাধনা প্রবল ছিল। গত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে আমরা শত শত বাঙালী জীবন লক্ষ্য করিলে সেই সাধনার বহু প্রমাণ পাই। এই ছাত্ররাই বাঙালীকে ভারতে স্বাধীন ও প্রতিষ্ঠার আসনে স্থাপিত করিয়াছিল। তাই অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, বাংলা আজ যা করে ভারত-সুপ্ৰাস্তে তাই করে। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গোখল ভারতের আইন সভায় ১৯০৮ সালে বলিয়াছিলেন—বাংলা আজ যা ভাবে বাকি ভারত পর দিন সেই বিষয়ই চিন্তা করে। সেই মর্যাদা ও পারদর্শিতা পঞ্চাননের ছাত্র জীবনে পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার পিতা শশীভূষণ নিয়োগী সামান্য বেতনে ভারত ১৯২৩ ও ১৯২৪ করিতে—তাঁহার এই স্বপ্ন আয়েত

তিনি পুত্রের শিক্ষায় জ্ঞান-ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তবে পঞ্চানন বালক অবস্থা হইতেই নিজের অধ্যবসায় ও চেষ্টায় স্বলক্ষী হইয়া তাঁহার শিক্ষার ব্যয় নিজেই অনেক অংশ বহন করিতেন। তিনি সকল পরীক্ষাতেই বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে তিনি স্বগ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। প্রত্যেক ক্লাসের উন্নয়নের সময় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতেন। মাইনর পাশ করিয়া এগার বৎসর বয়সে কলিকাতায় আইসেন এবং আর্থামিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তথা হইতে ১৮৯৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৫৯ পনের টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৯০১ সালে ডাফ কলেজ হইতে এফ এ পাশ করিয়া ২০৯ টাকা জলপানি পান। তিনি বি-এ পাঠ শেষ করেন মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে। তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ বি-এ, বি কোর্সের ক্লাশে ভর্তি হইয়া বিজ্ঞান বিভাগে পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সার পি, সি, বায় ও স্যার জগদীশ বসুর পাদপ্রাপ্তে বসিয়া বিজ্ঞানের আলোক দেখিবেন এবং বিজ্ঞানের রশ্মি জগতে বিতরণ করিবেন। সে স্বযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি মেট্রোপলিটান (বিজ্ঞানাগার) কলেজ হইতে ১৯০৩ সালে, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনারস্ পাইয়া বি-এ পাশ করেন। তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উড়ো বৃত্তি গঙ্গাপ্রসাদ সুবর্ণ পদক ও নানা পুরস্কার লাভ করেন।

পর বৎসরই ১৯০৪ সালে এম-এ পরীক্ষাতেও রসায়ন শাস্ত্রে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উজ্জীর্ণ হন। এ যুগের মতন তখন বিজ্ঞান চর্চার জন্য সু-সজ্জিত ল্যাবরেটরী পাওয়া যায়িত না। তথাপি তিনি প্রাকটিক্যাল ও গবেষণায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া ছিলেন তাঁহার সাধনার বলে।

তখনকার দিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা সমগ্র উত্তর ভারত ব্রহ্ম, সিংহল ও এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং ভারতে পি, আর, এস বৃত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান ছিল। প্রতি বৎসর দশ হাজার টাকা বৃত্তি অর্জন করিয়া বহু বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাকে গৌরবান্বিত

করিয়াছিলেন। পঞ্চানন ও ১৯০৬ সালে এই বৃত্তি পাইয়া নিয়োগী বংশের মুখ উজ্জল করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল রসায়ন। তিনি মাউন্ট পদকও পান।

তিনি এম-এ পাশ করিবার পর রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণার জন্য সরকারের নিকট হইতে ১০০ শত টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া স্তর পি, সি, বায়ের অধীনে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯০৬ সালে গবেষণার জন্য গ্রিফিথস্ প্রাইজ পান।

তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল পঞ্চানন আইন পড়েন এবং ওকালতি করেন। কিন্তু পঞ্চাননের স্বাভাবিক জ্ঞানের ক্ষুধা বিজ্ঞানের দিকেই বহিয়া চলিয়াছিল, তাই তিনি আইন পড়া বন্ধ করিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন খুব কম বাঙ্গালী বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইত। এ প্রসঙ্গে ছাত্র জীবনে তাঁহার যে সততা প্রকাশ পায় তাহার একটি উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক নহে। তাঁহার পিতা আইন পড়াইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তিনি আইন কলেজে ভর্তি হন কিন্তু তিনি ক্লাশে যাইতেন না। পিতা মাসের পর মাস মাহিনা যোগাইতেন, যুবা পঞ্চানন তাহা কলেজে জমা দিতেন না, নিজের কাছে রাখিতেন। যখন পিতার নিকট আইন পড়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইল তখন সেই সমস্ত টাকা তাঁহার পিতার হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন। যৌবনের লালসা পরিতৃপ্তির জন্য এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না।

রসায়নের গবেষণার সময় তিনি তাঁহারে স্নেহময় পিতাকে হারান। সংসারের গুরুভার মস্তকে পড়িল। অর্থোপার্জন না করিলে এক দিনও সংসার চলিবে না। এমন অবস্থায় চাকুরী গ্রহণের চেষ্টা করিলেন, মেধাবী ছাত্রের কাজের অভাব হইল না। শিক্ষা বিভাগে ১৫০৯ মাহিনার চাকুরী আসিল, কিন্তু একজন পি, আর, এস এর পক্ষে ১৫০৯ টাকা মাহিনার চাকুরী করাটা অসম্মানের বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, যদিও তখন তিনি অর্থাভাবে বিশেষ জর্জরিত।

১৯০৭ সালে তিনি রাজসাহী কলেজে ২৫০ টাকা মাহিনার রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে এক বৎসরের জন্য রাজসাহী কলেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হন।

ইতিপূর্বে তিনি ১৯১৮ সালে গবেষণার জন্তু পি, এচ, ডি ডিগ্রীলাভ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে। তখন কলিকাতায় ডি, এস, সি, ডিগ্রীর প্রচলন হয় নাই।

১৯২০ সালে কয়েকজন ভারতীয় অধ্যাপককে আ, ই, এসে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন তিনি এই গৌরবময় পদে উন্নীত হন। তখন পর্য্যন্ত শিক্ষা বিভাগের এই ইম্পিরিয়াল সার্ভিস গ্রেড ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রায় একচেটিয়া ছিল, স্যার জগদীশ প্রভৃতি পূর্বেই ইম্পিরিয়াল সার্ভিস পান।

সেই জন্তু স্যার পি, সি, রায় তাঁহাকে সহাস্যে বলিয়া ছিলেন—“পঞ্চানন, আমি-সাত বৎসর এডিনবরায় গুরু খাইয়া আসিলাম, আই, ই, এস পাইলান না; আর তুমি এখানে থেকেই আই, ই, এস পাইলে।”

১৯২১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হন। এবং কয়েক মাস পরে তাঁহাকে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৭ সালে তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থায়ী ভাবে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। পরে ১৯৩০ সালে ডাঃ নিয়োগী তাঁহার জীবনের চরম আকাজ্জিত স্যার পি, সি, রায়এর দ্বারা গৌরবান্বিত রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া পরম গৌরব ও তৃপ্তি অম্লভব করেন। স্বদীর্ঘ কাল আচার্য্য দেবের পদান্বেষণ করিয়া নানা গবেষণায় কুতিহ ও সুনাম অর্জন করেন। শত শত ছাত্রকে রসায়ন বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভে সুযোগ দিয়া ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে সৈনিক তৈয়ার করিয়াছেন।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩১ বৎসর শিক্ষা প্রদান কার্যে ব্রতী থাকিবার পর সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেও তিনি অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কর্মশক্তি লইয়া তাঁহার চিরপ্রিয় জ্ঞান বিতরণ কার্য হইতে বিরত হইলেন না। তিনি শিক্ষা বিভাগেয় অম্লমতি লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অষ্টমতনিক গবেষক হিসাবে কার্য চালাইতে লাগিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি ক্লাশে রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারার পদ রাখিয়া দেন।

তাঁহাকে বন্ধুবর্গ আমরা যখন বিশ্রাম লইতে বলি

তখন তিনি হাসিয়া বলিতেন—“শ্রামান ঘাটের এপারে বিশ্রামের কোনও অবকাশ নাই।” তাহাই হইয়াছিল তাঁহার জীবনে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি কার্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হয় সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ১২টায়, শনিবার দিবস তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় উপস্থিত। পল্লীউন্নয়ন কার্যের প্রাথমিকনীতি এবং জাতিগঠনের প্রধান উপাদান বিষয়ে ভারত সভাকে উদ্বুদ্ধ করিবার কত পরামর্শ দেন। তাঁহাকে অম্লম্ব দেখিয়া যখন বলিলাম ‘এই গরমে কেন আসিলেন, তিনি বলিলেন, ‘আসিয়াছি তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা হইল। সেই সময়েই তিনি তর্কচর্চা হইয়া পড়েন, এবং শিরে রক্তক্ষরণও কিঞ্চিৎ হয়। অর্দ্ধঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে এম্বুলেন্স করে, বাটীতে পাঠান হয়। বাটীতে যাইবার পর কিছু স্থস্থ হইলেও পুনরায় তাঁহার হেমায়েজ হওয়াতে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হন।

তিনি মরণের কয়েক বৎসর পূর্বে মনীন্দ্রচন্দ্র কলোজের গঠন ও শিক্ষা প্রদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ সেবায় নিজে নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন।

ডাঃ নিয়োগী বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী, কিন্তু দেশকে বড় করিবার ও দেশের নর-নারীকে প্রত্যেক স্বাধীন দেশের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী করিবার তাঁহার আকাজক্ষা ও প্রচেষ্টা বাল্যকাল হইতে ছিল। ২৫ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত কন্ম ও আলোচনা করিবার সৌভাগ্য লেখকের হয়। সকল সময় তিনি বলিতেন দেশের কাজকে এককভাবে দেখিবেন না (not isolated or compartmental) সব কার্যের মধ্যে পরস্পর সংযোগ না রাখিলে কোন জাতি বড় হয় না। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার কর্মশক্তি নিঃশেষ না করিয়া সাহিত্যে, নারী মঙ্গল কার্যে, সমাজ সেবায়, কৃষি কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠভাবে কার্য করিবার সুযোগ হইয়াছে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অম্লঠানে।

এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ হইতেছেন গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয়। ডাঃ নিয়োগী তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। একদিন নারীমঙ্গলসমিতির এক সভায় যখন তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন তখন তদাশ্রয়ীভূত সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশ ব্যানার্জি বলিলেন যে

“ডাঃ নিয়োগীকে একজন ভাল বক্তা বলিয়া আনিতাম কিন্তু তিনি যে দেখছি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী—ইংরাজিতে যাহাকে বলে ‘ওরেটার’।” বাস্তবিক তিনি একজন ভাল বাগ্মী ছিলেন।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ছিলেন মানুষের গুণ ধরবার জহরী। তিনি তখনই বলিলেন—দেখুন ডাঃ নিয়োগীকে আমাদের কাজে লাগাইতেই হইবে, করিলেনও তাহাই। আত্মভোলা পঞ্চানন আই-গি-এস চালে ধরা পড়িলেন—তিনি বলিলেন, মেয়েরা বড় না হইলে জাত বড় হবে না—তোমার কাজে আমার প্রাণে সাড়া দেয়।

তদবধি ডাঃ নিয়োগী সেরোজ নলিনী সমিতির কার্যে তাঁহার সময় ও শক্তি অকাতরে ব্যয় করিতেন। কখনও তাঁহাকে বিরক্ত দেখিনি। আমাদের মধ্যে কত মতবিরোধ হইয়াছে, মান অভিমানের পালাও চলিয়াছে, তথাপি তিনি কখনও সেটা মনে রাখেন নাই। কত ঠাট্টা তামাসা করিয়াছি, তথাপি তিনি আমাদের সঙ্গে মুহূর্ত্ত পরে স্নেহ ও সহজ মনে বাক্যালাপ করিতেন। ইহাই ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব, স্বমত প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিব এ প্রবৃত্তি কখনও তাঁহার চিতে স্থান পায় নাই।

প্রথমে তিনি পাঁচ বৎসর সহঃ সভাপতি ছিলেন, তারপর অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ সম্পাদক পদ হইতে যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়কে সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়—তিনি সহঃ সভাপতির মান ত্যাগ করিয়া সম্পাদক হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

১৯৩৯ সালে সাধারণ সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ করিয়া প্রায় ২ বৎসর সেই কার্য করেন।

আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য, বোমা ও যুদ্ধকালীন বিপদ ভুক্তি, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাদি সকল দুর্দ্দিনে তিনি সেরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতিতে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান গর্ভেও অনুরূপ করিতেন। বোমা পড়ার সময় নারীমঙ্গল সমিতির শিল্পায়তন কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা হয় ১৯৪২।৪৩ সালে। তখনও তিনি নানা বিপদ মাথায় করিয়া কৃষ্ণনগরে গিয়া সমিতির কার্য অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং কৃষ্ণনগরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করিয়া

তোলেন। বার্ষিক সভা ও প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য দিহনের পর দিন কৃষ্ণনগরে অবস্থান করেন।

তিনি বয়স্কাদের ভিতর মহিলা সমিতি পত্তন ও প্রসারের কার্যে তাঁহার শক্তি নিয়োগ করিতেন। বলিতেন—গ্রামের মেয়েদের আগে মানুষ করুন। তাঁহার সহিত কয়েক স্থানে বিশেষতঃ রেলের উপনিবেস মহিলা সমিতি পরিদর্শনে গিয়া তাঁহার উৎসাহে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কয়েক বৎসর বার্ষিক উৎসবের সময় মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণের যে সম্মেলন হইত তাহাতে ডাঃ নিয়োগী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন।

তাঁহারই সম্পাদকতার সময় সেরোজ নলিনী সমিতির নবগৃহ পত্তন ও নিৰ্ম্মাণ কার্য শেষ হয়। যখন গৃহ নিৰ্ম্মাণ কার্য সমাপ্ত হয় তখন তিনি অপূর আনন্দে আমাদের সন্দেশ খাওয়াইয়া দিলেন। এই নারী মঙ্গল সমিতি তাঁহার স্মৃতি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিলে তাঁহার কার্যের গুণ গ্রহণ করা হইবে।

তিনি বিজ্ঞানের এক জন প্রধান সাধক থাকিলেও মাতৃভাষার সাধনায় তাঁহার চিত্ত সদাই উদগ্রীব ছিল। তাঁহার সহিত একযোগে কার্য করিয়া তাঁহার বঙ্গভাষার প্রতি দরদের পত্রিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি রামেন্দ্র সন্দর ত্রিবেদীয় ঞায় বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন—আমাদের বাংলা ভাষায় যখন মৌলিক গবেষণা বাহির হইবে তখনই বাংলা ভাষা শিখিবার আগ্রহ বিশ্ব পণ্ডিতদের মধ্যে জন্মাইবে। তিনি ১৩৪৬ সালের ১ম সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় “গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন ধৌগিক” নামক একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১৯১০ সালে শত পুটিত ও সহস্র পুটিত লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া এবং আয়ুর্ক্রেমে প্রচলিত বহু ষাণ্ডুটিত ঔষধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় ‘প্রাঙ্গণী’ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি “বৈজ্ঞানিক জীবনী” নামে একখানি বাঙ্গলা পুস্তক মূলিত করিয়াছিলেন।

তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে ও বলিতে সমভাবে দক্ষ ছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় তিনি বৈজ্ঞানিক হইয়াও, রসাল সাহিত্য রচনা দ্বারা পাঠককে আশ্চর্য্যবিত করিয়াছিলেন। তিনি

তুফান নামে একখানি বাংলা পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যস্থিত 'নাম', গীতা ব্যাখ্যায় প্রলাপ 'প্রফেসর ও অধ্যাপক' 'ডাক বরের আশ্রয় কাহিনী' হাস্য রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া চিত্ত নিখিল আনন্দে ভরিয়া দেয়।

তাঁহার সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণ গুলি 'নূতন নূতন' তথ্যের পরিচয় দেয়। তিনি কয়েক বৎসর 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া 'বঙ্গলক্ষ্মী'র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত "ভুলধর স্থিতি" প্রবন্ধটী বঙ্গলক্ষ্মীতে বাহির হয়। সেই প্রবন্ধ পাঠ পড়াননের উদার মনোভাব সাহিত্যিকদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ পায়।

১৯২৪ সালে মুন্সীগঞ্জ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কালই বাদলা ভাষার বিজ্ঞান পড়াইবার রীতি গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি Roscoe ও Schorlemmer-এর রসায়নশাস্ত্রের মত অত বড় গ্রন্থ কয়েক মাসের মধ্যেই বাদলা ভাষায় মায় পরিভাষা সমেত প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থের অভাবে এক দিনও পড়াশুনা বন্ধ হইবে না। সে বিশ্বাস বাদলী রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে থাকিলে আজ বাংলা ভাষা কত সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবান্বিত হইত।

১৯৩৯ সালে তাঁহাকে কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি পদে যখন বরণ করিতে যাই তখন তাঁহার আগ্রহ ও আনন্দ দেখিয়া মুগ্ধ হই। পরিণত বয়সে ভ্রমণ কষ্টের প্রতি ভ্রক্ষেপ বা চিন্তামাত্র না করিয়া সম্মতি দেন। এক সঙ্গে একই রেল ও ষ্টীমারে আমরা যাই। তিনি বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানের বাহন করিবার কত পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তাঁহার এই মিশন (কল্পনা) সফল করিবার জন্য আমরা বার বার অনুপ্রেরিত করিয়াছিলাম। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির কার্যে তিনি সর্বদা আমায় উৎসাহ দিতেন। অর্থও দিয়াছিলেন কয়েক বার। কুমিল্লা অধিবেশনের পর আমরা কয়েকজন ডাঃ নিরোগী, স্বরলা দেবী সমেত ত্রিপুরাধিপতির আমন্ত্রণে আগড়তলায় গমন করিয়াছিলাম। সেখানে সঞ্চরনা সভায় তিনি যে অপূর্ণ

বক্তৃতায় ত্রিপুরা রাজপরিবারের বাংলা সাহিত্য সাধনা ও রাষ্ট্র কার্যে বাংলা ব্যবহারের জন্য স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন তাহাতে ত্রিপুরা রাজবংশ হইতে জনসাধারণ পর্যন্ত মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন। মহারাজা বাহাজুর ত্রিপুরা রাজবংশের বিরাট ইতিহাস গ্রন্থ ও আর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেন।

কুমিল্লা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সম্মিলনের যাত্রাতে বছর বছর অধিবেশন হয় তাহার জন্য সম্মিলনকে জনপ্রিয় করিবার জন্য লেখককে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিতেন। স্বয়ং সম্মিলনের আজীবন সভ্য হন এবং সায়েন্স কংগ্রেসের মত ইহা যাত্রাতে কার্য্যকরী ও স্থায়ী হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তবে এই কোষাধ্যক্ষের কাজে তিনি অবসর পান নাই।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহঃ সভাপতি ছিলেন পাঁচ বৎসর। তিনি ১৯৩৭ সালে পরিষদের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন। তিনি পরিষদে বিজ্ঞানের চর্চা ও ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রবর্তন করেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় ১৯৩৯ সালে পরিষদে একটি এপিডায়স্কোপ ক্রয় করা হয়। ইহার দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা ভাষায় বক্তৃতাগুলি জনপ্রিয় হয়।

উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নবম অধিবেশন যখন রংপুরে হয় তখন তিনি বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালে তামতলা লাইব্রেরীর উদ্যোগে যে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন হয় তাহারও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি রূপে তিনি ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োজন সম্বন্ধে অতি সারবান অভিভাষণ দেন। তাঁহার অভিভাষণগুলি তদানীন্তন মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইত। তাঁহার লেখাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, দেশপ্রীতি ও বাদলা ভাষা লিখিবার প্রভূত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি সায়েন্স কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সায়েন্স কংগ্রেসের সহিত লিপ্ত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে পাটনায় যখন রসায়ন শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন তখন তিনি Optical isomerism of Co-ordinated in organic compounds সম্বন্ধে বক্তৃতা পড়েন। তাহাতে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এই সায়েন্স কংগ্রেসের মাস্তাজ অধিবেশনে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। একটি Iron in Ancient India অপরটি Growth of Synthetic Chemistry, বক্তৃতা দুইটি বিজ্ঞান সমাজে খুব আদরীয় হইয়াছিল।

তাহার Iron in Ancient India এবং Copper in Ancient India পুস্তকদ্বয় ভারতের অতীত গৌরব কাহিনীর উজ্জল নিদর্শন। ১৯১৬ ও ১৯১৮ সালে Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠান হইতে মুদ্রিত হয়। অজৈব রসায়ন শাস্ত্রে তাহার অনেক আবিষ্কার তাহার অনেক প্রবন্ধে প্রকাশ হইয়াছে। তিনি ইঞ্জিনিয়ার কেমিক্যাল সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে তাহার সহঃ সভাপতি হন। ১৯৩৬ সালে তিনি National Institute of Science of India সদস্য ও ১৯৩৯ সালে রসায়ন বিভাগের সহকারী এডিটর হন।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ভড়িত ছিলেন। মিলনী ক্লাব ও রোটারী ক্লাবে তিনি বক্তৃতা দিয়া সভ্যদের জ্ঞান ও আনন্দ দিতেন।

তিনি বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের সকল প্রকার শিক্ষার ও স্বাস্থ্যে বড় করিবার জন্ত সতত চেষ্টা করিতেন। তাহার একটি কার্যের উল্লেখ না করিলে তাহার দূরদর্শিতার বিষয়

অবগত হওয়া যায় না। তিনি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করিতেন তখন তিনি এক বার্ষিক উৎসব সভায় দেখিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইউরোপীয় ও এশিয়া ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রের একটি দল সভাপতি লাট সাহেবকে সামরিক কুচকাওয়াজ করিয়া অভিবাদন করিতেছে। ভারতীয় ছাত্রেরা এইরূপ কাজে অংশ গ্রহণ না করায় বড় ব্যথা পান। প্রিন্সিপাল রিচার্ডসন সাহেবকে ধরিয়া তিনি ভারতীয় ছাত্রদের একটি Military Training Corps প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং পর বৎসর বার্ষিক সভায় আগত লাট সাহেবকে বাঙ্গালী ছেলের দল সামরিক কায়দায় অভিবাদন করেন ইউরোপীয়গণের সঙ্গে। ইহাই University Military Training Corps গোড়ার কথা। ডাঃ নিয়োগী একজন প্রকৃত স্বজাতি বৎসল ও জনসেবক ছিলেন। সেইজন্ত বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহু সভা সমিতিতে তাহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইত তাহার উদ্যম পরিলক্ষিত হইত। তাহার অভাবে দেশের ও বিদেশের প্রকৃত ক্ষতি হইবে। তাহার তিরোথানে বঙ্গদেশ একজন একনিষ্ঠ দয়াদী সেবক হারাইল।

বাঙ্গালী মেয়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভরকরী ও বাঘিনী বাঙ্গালী মেয়ে,
প্রতিহিংসায় নিদারুণ সব চেয়ে।
ভুবনেশ্বরী বক্ষে কমল-মালিকা,
রক্তবীজের বধে তারা হয় কালিকা।
রূপসী কোমলা গড়া দিয়ে যেন নবনী,
অশনিভরা ও মেঘমালা চেনে অবনী।
ওরা সীতা, সতী, ওরাই বাজসেনীরে,
হুঃশাসনের ঋষিরে বানায় বেণীরে।
অবজ্ঞা করা লাজনা করা তাদিকে,
ধ্বংসোন্মুখ করা আপনার জাতিকে।
তারা কপিলের নেত্রবহ্নি শরীরী,
ভস্ম করিয়া চিহ্ন রাখে না অরিমহী।
রক্ত লুটায় তাদের চরণ সরোজে,
দীর্ঘশ্বাসে অমৃত বজ্র গরজে।

বাঙ্গালী ছেলে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অতি অদ্ভুত মোদের বাঙালী বটু,
প্রতিভা প্রচুর অম্লকরণেও পটু।
মোগল পাটান সেজেছে তা জানো তুমি,
আঙড়াতো সদা 'সাদি' ও 'হাফেজ' 'কমি'।
সেজেছে সাহেব লভিয়াছে 'পিয়ারেজ',
বক্তা লেখক সবেই সমান তেজ।
যাহারা বলিত তারা তীক্ষ্ণ কাপুরুষ—
স্তম্ভিত হেরি অচিন্ত্য পৌরুষ।
কাগজ কলমে ভাবিত যা দিকে দড়,
ছোঁরা ছুরিতেও নিপুণ অধিকতর।
যত মিঠে তারা, তাহার অধিক কড়া,
বাঙ্গালীর ছেলে বিষাদ দিয়ে গড়া।
আত্যাচার যে করিবেই তারা রোধ,
চক্রে বুদ্ধি হারে দিবে প্রতিশোধ।

তঁাকে যেমন দেখছি

ত্রিভিত্ত লাল ঘোষ

আপিসে পা দিতেই বেয়ারা বলে উঠল—বাবু আপিস ছুটি। ডাক্তার নিয়োগী মারা গেছেন। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলাম না, বেয়ারাটার কথার ত্রিই এমনতর। তিনি যদি তেমন অস্থস্থই হ'তেন তা'হলে নিশ্চয়ই সংবাদ পাওয়া যেত।

একটু পরেই জানলাম সংবাদ মিথ্যা নয়। এক সভায় বক্তৃতা কালে তিনি সংজ্ঞা হারান এবং কিছু পরে ইহলোকের আয়া মমতা ভ্যাগ করে এই জুন পরলোক গমন করেন।

হাতে অনেক কাজ কিন্তু কোন কাজেই মন বসে না। পর পর তাঁর মুখ, তাঁর কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, বাগ্মী, সাহিত্যিক, গুণগ্রাহী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধক। তাঁর পাণ্ডিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে যাওয়া আমার হ্রায় অজের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। আর জানি বা তাঁর কতটুকু! তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সেটুকু জানা তাও চার পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। বহু কর্মময় জীবন তাঁর, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন নিজেকে বাংলার সুখী সমাজে, তাঁর শেষের চার পাঁচ বৎসর কতটুকুই না অক্লিষ্টকর!

তবু যেটুকু জেনেছি তাঁর জীবনের কর্মধারার তুলনায় সামান্য হতে পারে; কিন্তু যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তা গৌরবময়। তাঁকে জেনেছি সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি বাংলার নানা স্থানে মহিলা সমিতির সংগঠন দ্বারা মহিলা সমাজের উন্নতি ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ করে আসছে দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ। তিনি ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক। ৭ বৎসরেরও অধিককাল ১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সমিতির সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন।

মহিলা সমাজের উন্নতি সাধনে তাঁকে বরাবর সচেষ্ট থাকতে দেখেছি। তাঁর চেষ্টার ভিতরে কোন কৃত্রিমতা ছিল না, বাইরের বাহাদুরী লাভ করবার প্রলোভনও ছিল না। বরং দেখেছি, অহেতুক, মিথ্যা অপবাদ ও শ্লেষপূর্ণ উক্তি তাঁকে শুনতে হয়েছে অনেক সময় তাতে তিনি ক্রক্ষেপ করেন নি। কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলেছেন—দেশের কাজের মূল্যই হল এই।

মহিলা সমিতির কাজে যখনই ডাক এসেছে তখনই

তিনি প্রস্তুত হয়েছেন, যাবার জন্তে। বার্ষিক্য, সাংসারিক কার্য, কি পথের ক্লেশ কোনটাই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। যদি কেউ তাঁকে বলতেন—আপনার শরীর ত তত ভাল নেই, যাবেন কি করে? তখন তিনি বলেছেন—মাজ ও যেটুকু ভাল আছে, পরে তাও থাকবে না, যেটুকু পারি করে যেতে হবে। যত্ন আর কিছুদিন পূর্বেও হাওড়া রেলওয়ে মহিলা সমিতি হতে তাঁকে ডাকা হয়। তিনি মাননীয় যোগদান করেন। তাতে, এবং সেই তাঁর শেষ যোগদান।

সমিতির কাজে তাঁর সঙ্গে বাইরে যাবার সুযোগ হয়েছে, কয়েকবার। পথে ২১৩ দিন কেটেছে। পথের ক্লেশ মোটেই বোধ হয় নি, তিনি হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে সবাইকে সতেজ রেখেছেন। যখনই কোন বিরক্তিকর কার্য উপস্থিত হয়েছে, তিনি সকলকে কাছে ডেকে নিতেন। আর এমন সব গল্প আরম্ভ করতেন, যাতে না হেসে পারতাম না। মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গান ধরতেন। তিনি মোটেই গায়ক ছিলেন না, তাঁর স্বর ছিল মোটা পৌরুষ দীপ্ত। তিনি গান ধরলেই আমরা হাসতাম লুকিয়ে। তিনি বলতেন—এই অমন লুকিয়ে হাসছ কেন! হাসবে বলেই ত গান করছি। তাঁর সহজ ও সরল প্রকৃতির কি সুন্দরই না সন্ধান মিলেছে এর ভিতর।

পণ্ডিত মূর্খকে, ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে প্রায়ই দেখা যায়। তাঁর ভিতর এই বর্ণ বৈষম্য একেবারে যে ছিল না, তা বলি না; তবে অতি সামান্যই তাঁর আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। পথে চলার সময় চাকর বাকরদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। সাধারণতঃ উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা ধনীর গৃহেই আমরা অতিথি হতাম। চাকর বাকর যেখানে অনাদৃত হয়েছে সেখানে তিনি বড়ই বিরক্ত হয়েছেন এবং তিনি তাদের সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। প্রায়ই তিনি তাদেরকে পয়সা দিতেন যাতে তাদের স্বাধীন ভাবে চলা ফেরার কোন বিঘ্ন না হয়।

তাঁর চেহারার ভিতর নারী স্থলত কোমলতা ছিল না, বরং অতি মাত্রায় পৌরুষ দীপ্তি ছিল। কণ্ঠ স্বরও ছিল তাই। তিনি যখনই কথা বলতেন, অতিমাত্রায় জোর দিয়ে বলতেন, তাই শুনতে ককঁশ বলে ভ্রম হত। তাই কোন কোন আগন্তুক তাঁর কথা বা আচরণে ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু

তার সম্পর্কে আসলেই বুঝতে পারতেন যে তিনি আচরণ বা ব্যবহারে কর্কশত ছিলেনই না বরং অতি নম্র ও স্তম্ভোচিত ছিলেন।

আসাম অঞ্চলে মহিলা সমিতি পরিদর্শন ও সংগঠন করতে ডক্টর নিয়োগী সহ আমরা যাই। টুর প্রোগ্রাম ছিল বদরপুর পর্যন্ত। তারই কয়েক স্টেশন দূরে হাইলাকান্দি গ্রামে যে মহিলা সমিতি রয়েছে তার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী ও তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত অবিলাস চন্দ্র রায়ের বরাবরই ইচ্ছা যে ডক্টর নিয়োগী তাঁদের সমিতিতে যান। বদরপুর যখন আমরা পৌঁছি, তখনই কলিকাতা হতে সাম্প্রদায়িকতার হাঙ্গামার নতুন উৎপাতের সংবাদ পাই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আশুন থেকে থেকে কলিকাতার বৃক্কে তখনও জলছিল। এতে ডক্টর নিয়োগী ফেরার জ্ঞপ্তি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন, কিন্তু আমাদের একান্ত ইচ্ছা তিনি হাইলাকান্দি মহিলা সমিতিতে যান। আমাদের কথায় কোন কাজ নাও হতে পারে ভেবে, শ্রীযুক্ত রায়কে সংবাদ দিই। সংবাদ পেয়েই শ্রীযুক্ত রায় সঙ্গীক তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে তাঁর সহিত সব বন্দোবস্ত করে নেন। এতে তিনি আমার উপর কৃতজ্ঞ রাগ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে যদি পথে থাকার কোন কষ্ট হয় তা হলে আমাকে ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। পথে যে কোন ক্রেশই হবে না এবং থাকা খাওয়ায় যে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হবে, তার একটা কাল্পনিক বিবরণ দেই। তাতে তিনি বললেন—সুনলাম ত সব, পাখার কি হবে, পাখা?

বল্গাম—তাও হবে।

—মশা ডানা ছড়িয়ে হাওয়া করতে আসবে, না?

হাইলাকান্দি যাবার পথে গাড়িতে তিনি জ্বর করে বলতে থাকলেন—“হায়ল কান্দি, হায়ল কান্দি”...

হাইলাকান্দি মহিলা সমিতি দেখে তিনি বিশেষ প্রীত হন, বিষয়ও বোধকরলেন, ছোট একটু গ্রামে এমন উন্নততর সমিতি রয়েছে বলে।

মহিলা সমিতির সভার পুরুষেরও তিনি আহ্বান জানাতেন! তিনি বলতেন—Women's work is man's work। মেয়েদের কাজে পুরুষদের সাহায্য করতে বিশেষ অনুরোধ জানাতেন, তিনি নিজেকে দেখিয়ে বলতেন—শিক্ষতা করে জীবনের ২৭ বৎসর কাটাবার পর, বিবাহ বা দ্বিতীয় চিন্তায় বার্কাকাটা কাটাবারই কথা ছিল কিন্তু তা পারলাম কৈ? সরকারী শিক্ষানিকেতন ছেড়ে এসে বুঝতে পারলাম আমাদের মা বোনদের শিক্ষারই

সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন—নয় জাতি মানুষ হবে না, দেশের অন্ধকার ঘুচেবে না। তাই বুঝ বয়সে মা বোনদের কাছে আবেদন করে বেড়াচ্ছি, তোমরা যাগো, জড়ের স্রায় আর থেকে না—তোমরা বীরের জননী হও, দেশকে গৌরবান্বিত করো। দেশমাতা তোমাদের দিকেই যে তাকিয়ে আছে, তার মালিগ ঘুচাও।

তিনি ছিলেন সত্যিকারের বক্তা, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Orator. তিনি যখন সভার বক্তৃতা করতেন, সভাস্থ সকল দিক কল্পিত হয়ে উঠত, তাঁর পৌরষনীপ্ত গভীর কণ্ঠে।

তিনি ছিলেন ছাত্র-বৎসল, তিনি যেখানেই যেতেন, একাধিক গুণযুক্ত ছাত্র তাঁকে প্রণাম জানাতে ছুটে আসত। তাঁদের তিনি কী গভীর স্নেহের সহিত বক্ষে চেপে ধরতেন, তা দেখে অবাক হতে হয়েছিল। তিনি বলতেন—তুমি এরা আমার ছাত্র ছিল, কী ভাবস্বারই যে এদের করেছি—আজ এরা মানুষ হয়েছে, কী আনন্দ হয় এদের দেখে! বছর তিনেক পূর্বে একটি দরিদ্র ছাত্রকে নিয়ে তাঁর নিকট যাই, কোন কনসেশনে তাঁর কলেজে ভর্তি করে দেবার জ্ঞপ্তি। সকাল বেলা, অনাবৃত দেহে নীচে নেমে এসে বললেন—কি হে কি চাই। বল্গাম সব, শুনে তিনি বললেন—না হে, ওপর হবে না। আজকালকার ছেলেরা বড় শরতান। ওদের দয়ামায়া দেখাতে আর ইচ্ছে করে না। বিষম হয়ে চলে আসছি, এমন সময় ডেকে বললেন—শোন সত্যি ত হে, ও গরীব? আচ্ছা, ওষুদি প্রতিজ্ঞা করে যে ঠিকমত লেখাপড়া করবে, তা হলে ওকে নিতে পারি। ছেলেটি যথারোক্তি প্রতিজ্ঞা করল। তার ২ বৎসর পরে সেই ছেলেটি যখন বি. কম্ পাশ করল, তাকে নিয়ে তাঁর নিকট যাই। তিনি হেসে বললেন—আমি খুব খুশী হয়েছি, তোমার আচরণ ও ব্যবহার দেখে। তোমার মত ছেলেরের কত যে ভাগ লাগে! যখনি কোন দরকার হয়, আসবে বুঝলে?

আজীবন শিক্ষাব্রতী ডাঃ নিয়োগী একপ্রকার শিক্ষকজগত ভিতর দিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বুঝ বয়সে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহারাজা মনোজ্ঞ নন্দী কলেজ তাঁর স্মৃতি বহন করে চলবে, কালের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে।

বড়ই অশুভ মুহূর্তে ডাঃ নিয়োগীর স্ত্রায় একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতীকে দেশ হারাল। কৃষিকার আরম্ভ, অশিক্ষার অন্ধকার হতে দেশকে সমাজকে মুক্ত করতে তাঁর স্ত্রায় আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন। হিন্দু আমরা, জম্মান্তর বিশ্বাস করি। তাঁর বিদেহী আত্মার যদি পুনর্জন্ম হয়, তা হলে তিনি যেন এই হতভাগ্য দেশেই জন্মগ্রহণ করেন, অশিক্ষা ও কৃষিকার কুজাটকা হতে দেশকে, সমাজকে ঠিক পথে পরিচালিত করার জীমোঘ শক্তি নিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য প্রজ্ঞাঙ্গী জানাই।

মহিলা সমাচার

ত্রিভোতিষ চন্দ্র ঘোষ

দিল্লীতে নূতন মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট

সর্কারণী নাও নিহাল সিংহ এম, এ, এল, এল, বি, নূতন দিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি লক্ষ্মী বিশ্ব-বিদ্যালয়এর কৃতি ছাত্রী। রাজধানীতে তিনিই দ্বিতীয় মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। এইরূপ একজন আইনজ্ঞ শাস্ত্রী মহিলাকে ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করিয়া ভারত সরকার অতি সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

মার্কিন ব্রাহ্ম প্রাপ্তা ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক

আমেরিকা অনুসন্ধান বিভাগের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৫০ জন চিকিৎসককে চিকিৎসা বিষয় উচ্চ শিক্ষালাভ ও গবেষণার জন্য বৃত্তি দিয়া ওয়াশিংটনে প্রেরণ করা সম্প্রতি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভারতের কোটা প্রদেশের ডাঃ শ্রীমতী মঙ্গল দেবী তলওয়ার অন্যতম। ইনি বৃত্তিলাভ করিয়া বালটিমোরে জন হুপার্স বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া স্নান অর্জন করিয়াছেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে ডাঃ মঙ্গলা দেবী প্রস্তুতি চিকিৎসা ও নাসিং কার্যেতে অজ্ঞতা লাভের জন্য আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিবেন।

এলাহাবাদে কুড়ী বাঙ্গালী ছাত্রী

বর্তমান বর্ষে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় শ্রীমতী ছায়া ঘোষ ডিপ্লোমাসি ও ইন্টার ক্লাসগুলি একেবারে বিষয়ে সর্ব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী ছায়া কলিকাতার 'উইমকো ফ্যাকল্টী'র শ্রী জে, সি, ঘোষ মহাশয়ে কন্যা। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর মেয়ের এই প্রকার কৃতিত্ব গৌরবের বিষয়। আশা করা যায় তিনি আন্তর্জাতিক কার্যে ও রাষ্ট্রদূত দপ্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলার দান

প্রিন্সিপ্যাল হুমিরাব বসু'র স্ত্রী শ্রীমতী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে ৩০০০, দান করিয়াছেন। এই অর্থের স্বল্প হইতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিবেন। মহিলার এ প্রকার দান চর স্মরণীয় ও অমূল্যবোধীয়।

পুনর্বাসতির জন্য নগর নির্মাণে মহিলাদের উত্তম

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসতির জন্য ছোট ছোট সহর বা পল্লী গঠনের সরকারী পরিকল্পনার আদর্শে বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি ছোট নগর গঠনের প্রচেষ্টা কথ্য। সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী রমা মজুমদার জানাইতেছেন যে শিল্প প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তুদের জন্য একটি ছোট নগর পত্তনের ব্যবস্থা হাত দিয়াছেন। কলিকাতার নিকটে ২০০০ দুই হাজার বিঘা জমি খরিদ করিবার জন্য কথাবার্তা চলিয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা চাই। শ্রীবক্তা রমা মজুমদার এই নগর পত্তনের অর্ধেক ব্যয় প্রতিষ্ঠান বহন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, বাকী অর্ধেক সরকারকে দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রকার গঠনমূলক কার্যেই বাস্তুহারা'দের প্রকৃত উপকার করিবে। সরকারের ও জনসাধারণের এই পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য অর্থ যোগাইতেই হইবে।

সাঁতার ইলা ঘোষ

বিখ্যাত সাঁতার শ্রীবক্তা প্রফুল্ল ঘোষ ও তাঁহার স্ত্রী ইলা ঘোষ হেডুয়ার পুষ্করিণীতে (কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে) সস্তরণ কৌশল প্রদর্শন করিয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাঁতার যেমন শক্তি ও অভিজ্ঞতা আছে তেমনি ভাবে বাঙ্গালীর এই দুদ্দিনে বাঙ্গালী লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন রক্ষা ও উপার্জনের ব্যবস্থার সাহায্য করাই কর্তব্য। এ কথা নিশ্চিত নিজের পক্ষে দাঁড়াইবার উদ্যম না করিলে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি বড় হয় না। মেয়েদের এই সব কার্যে উদ্যম আশাপ্রদ ও উপকারী।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের আমেরিকায় পুরস্কার লাভ

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় চিকাগো সহরে রবার্ট এবোট স্মৃতি পুরস্কার অতি সম্মানের পদ। বিশেষ মৈত্রী ও শান্তির জন্য সাঁতার কার্য করিয়া থাকেন তাঁহারই এই পুরস্কার লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্যান, চিকাগো নগরের মেয়র কেলী, যক্ষানিবারণী সভায় সভাপতি গ্রাহাম-ম্যাকাথীর এই পুরস্কার পূর্বে পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে এই পুরস্কার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পাইলেন।
ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা।

হরিজন মহিলা আইন ব্যবসায়ী

মাদ্রাজের হরিজন শ্রেণীর কৃতি মহিলা শ্রীমতী জগদম্বল বি. এ. বর্তমান বর্ষে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সন্নিহিত এল এল বি. পাশ করিয়াছেন। তিনি হরিজন মহিলাদের মধ্যে প্রথম এল এল বি পাশ করিলেন। 'সবার উপর মানুষ সত্য' চণ্ডীদাস কবির বাক্য সার্থক। মনুষ্যত্বের ক্ষরণে জাতি ভেদ নাই।

পূর্ববঙ্গে নারী নির্যাতনে মুসলমান নারীর ওদাসীন

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত যে পূর্ববঙ্গের নারীহরণ, নারী নির্যাতন, নারীর স্ত্রীলতা হানী, বলপূর্বক নারীকে মুসলমান করণের পাশবিক কার্য সম্পাদিত হইতেছে তাহা বিশ্বের মানব সমাজেব কলঙ্ক। নারীর মর্যাদা রক্ষা করা যে মানব ধর্ম তাহা পরদর্শ্য অসহিষ্ণু মুসলমানগণ ভুলিয়া গিয়াছেন।

এই নারী নির্যাতনে মুসলমান নারী সমাজকে ব্যথিত বা বিচলিত করে নাই বলিয়া কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আনন্দবাজার, যুগান্তর আদি সংবাদ পত্রে যে আলোচনা হইতেছে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। এই নারী নির্যাতন ব্যাপারের বিরুদ্ধে মুসলমান নারী সমাজ কেন বিচলিত হন নাই, তাহার কৈফিয়তে এক মুসলমান বিদুষী যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা প্রশংসাযোগ্য। অপহৃত নারীদের প্রত্যর্পণ, ধর্মান্তরিত নারীদের স্বসমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা, নারীহরণকারীদের প্রকাজ্ঞা-শাস্তি প্রদান যতক্ষণ না পূর্ববঙ্গ সরকার করিতেছেন আন্ত-রিকতার সহিত ততক্ষণ নেহেরু-লিঙ্গকং আইন চুক্তি প্রভার-

শালী শত শত বক্তৃতায় বা আখ্যাস বাণীতে হইবে না। এখনও মর্শাস্তিক সংবাদ নিত্য প্রকাশ পাইতেছে।

মুসলমান নারী সমাজেও এই গণচৈতন্য উদ্ভূত হওয়া প্রয়োজন। নারীর নির্যাতনে নারীর হৃদয় কাঁদা উচিত। এতৎ উদ্দেশ্যে শ্রীমতী সূজাতা রায় সম্প্রতি ঢাকা গিয়া হিন্দু-মুসলমান শান্তি-সভা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তেমন আশা পান নাই। মুসলমান রমণীগণ কিছু অঘটন ঘটাইছে বলিয়া স্বীকারও পর্যাপ্ত করিতে চান নাই। এখন হিন্দু নারীকে তাঁহার মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকেই উপায় গ্রহণ করিতে হইবে।

শিয়ালদহে নারীঘটিত কেলঙ্কারী—

সম্প্রতি ২৮শে জ্যৈষ্ঠ 'যুগান্তর' ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ 'পাদাতিকে' উদ্বাস্ত অসহায় নারীদের লইয়া যে পাপ ব্যবসার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা মুসলমানদের নারী নির্যাতন অপেক্ষা পাপ ও কলঙ্কের কথা। বাঙ্গালী নর-নারী এই পাপ ব্যবসা সমূলে উৎপাটিত না করিলে এ বাঙ্গালী জাতি ধরা হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। আরো বিশেষ ক্ষোভের কথা এই পাপ কার্যে বহু নারী ও কোন কোন নারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট।

সুপ্রতিষ্ঠিত নারী প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বোপরে এই পাপ কার্য বন্ধ করার ও পাপীদের জনসমাজে স্বরূপ প্রকাশ করা কর্তব্য। উদ্বাস্ত নারীদেরও সাহায্য দান করার পূর্বে তাহাদের বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ডাঃ শ্রীমতী ফুল-রেণু গুহ ও শ্রীমতী লীলা রায়ের এই অভিযানে অগ্রণী হওয়া খুবই কলাণকর। শ্রীমতী রেণুকা রায় ভারত সরকারের নিকট হইতে উদ্বাস্তদের সাহায্য আদায় করিবার পূর্বে সরকারের নিকট এই পাপ দমন করিবার দাবী করিলে ভাল হয়।

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি

স্বর্গত গুরুসদয় দত্তের নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২৫শে জুন রবিবার প্রাতে সমিতি ভবনে এক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মনোবা রায় তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। শিল্প ও ট্রেনিং বিভাগের কতিপয় ছাত্রী প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন।

'গুরুজীর' প্রতিষ্ঠাতি পুষ্পশোভিত করতঃ মাগ্যার্পণ করা হয়।

অপরূপে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এতদুপলক্ষে একটি স্মৃতি-সভা হয়। ডাঃ রাধাবিনোদ পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তা 'গুরুজীর' ও তাঁহার সহধর্মিনীর সংগঠনী প্রতিভা এবং আজিকার পরিস্থিতিতে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ন সভার পূর্বে কয়েকখানি ব্রতচারী নৃত্যের একটি মনোজ্ঞ অভিনয়দর্শনী হয়।

ব্রতচারী আন্দোলনের স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল বলেন যে, ব্রতচারী প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝিতে হইলে পশ্চিমী খেলাধুলার কি ফল আজ পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে আলডুস হাক্সলীর ব্যক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন যে, পশ্চিমী খেলাধুলায় যদিও ধৈর্য্য, সাহস ও সহযোগিতা প্রভৃতি ভাল গুণ শিক্ষা দেয়, তথাপি ইহাতে যুদ্ধবাদী মনোভাবের স্রষ্টি হয়। তাই এই সকল দেশের পক্ষে শান্তিপ্রিয় জাতি গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। ব্রতচারীতে পশ্চিমী খেলাধুলার সমস্ত গুণ আছে, কিন্তু হৃদয়প্রিয়তার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। আমরা যদি ব্রতচারী আন্দোলনের এই প্রকৃত মমটুকু অহুতব করিয়া উহাকে জাগাইয়া তুলিতে পারি ও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইহার আবেদন পৌছায় তাহা হইলেই সম্ভবতঃ পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ সুগম হইতে পারে।

সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস বলেন যে, গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁহার সমগ্র জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গ করেন। বাঙ্গলার লুপ্তশ্রী এবং লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি অসামান্য চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের আদর্শ নাগরিক করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্র ও বনসচিব শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর বলেন যে, সর্বোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি দত্ত মহাশয়ের অপূর্ব কীর্তি। এতদ্বারা তিনি দেশের নারী সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বামদেব চোখানী বলেন যে, গুরুসদয় দত্ত যে আন্দোলন করেন, উহা বাঙ্গলা দেশে আরম্ভ হইলেও সমগ্র ভারতের উন্নতি সাধনই ছিল তাঁহার কাম।

শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ (মৌমাছি) বলেন যে,—তিনি বাঙ্গালীকে ব্যক্তিত্বের শিক্ষা দিয়াছেন। বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুনীতিবালা গুপ্তা বলেন যে, গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সত্যিকারের বাঙ্গালী ছিলেন। অন্তরের গভীর ভালবাসা দিয়া তিনি বাঙ্গলা মায়ের সেবা করিয়াছেন।

সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্নজাতা ঝায় গুরুসদয় দত্ত মহিলা সমাজের উন্নতিকল্পে যে কাজ করিয়া

গিয়াছেন বক্তৃতা কালে তাহা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তাঁহার স্ত্রীর নামে পরিচালিত সর্বোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কলিকাতায় প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বাংলা ও বাংলার বহিরে মহিলা সমিতি স্থাপন পূর্বক অগণিত অসহায় জীবনে আশা ও আলোর সন্ধান দিয়া আসিতেছে।

মিঃ ডি জে কোহেন, শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসুও সভায় বক্তৃতা করেন।

বহু বিশিষ্ট নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

গত ২৬শে জুন “বিশেষ সাধারণ সভায়” (Special General Meeting) ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগীর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। সভায় পোরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস।

সভায় ডাঃ নিয়োগীর প্রাকৃতিক্তির আবরণ উন্মোচন ও মালা ভূষিত করা হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সমবেত গীত দ্বারা সভার কার্য আরম্ভ হয়। সমিতির সহ সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্তী সমিতির উন্নতি কল্পে ডাঃ নিয়োগী যে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে বাক্ত করেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ডাঃ নিয়োগীর কর্মবহুল জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলির সংক্ষেপে আলোচনা করেন (বর্তমান সংখ্যায়ই অত্র উহা প্রকাশিত হইয়াছে)। সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মনোষা রায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দ ডাঃ নিয়োগীর আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া, আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ডাঃ নিয়োগীর আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের বিশেষতঃ এই সমিতির যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। মাতৃজাতির সেবা করার স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রেরণা তাঁহার ভিতর ছিল, তাহা সত্যই বিরল। তিনি তাঁর কর্মের ভিতর দিয়া যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অহুতবর্ণীয়। সমিতির পক্ষ হইতে ডাঃ নিয়োগীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সাহায্য ও স্বর্গতঃ আত্মার শান্তি কামনা করিয়া শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীমুখাপাধ্যায় দে

নওগাঁ ও কলিকাতা

ডক্টর শ্রীমুখাপাধ্যায় মহাশয় নিজের স্বাস্থ্য ও স্বপ্নের দিকে জ্ঞানপূর্ণ না করিয়া বহুদিন পূর্ববঙ্গ চাইতে আগন্তদের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু সহিত পরিচিত হন। তাদের অনেকের দুর্গত জীবনের কাহিনী তাঁর নিকট প্রতিভাত হয়। আজিকার দিনে ইচ্ছা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারী নির্বাচনের দিকে চাহিয়া নয়। কিন্তু সমগ্র ভারতের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া। প্রয়োজন ছিল, দল নির্বিশেষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্বাস্তুদেব অত্যন্ত কাছে গিয়া দাঁড়ান, তাদের জন্ত কিছু করিতে না পারিলেও দুটা মুখের সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করা। তারা কি খায়, কি পরে, কি ভাবে থাকে, ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যের কি ব্যবস্থা করিয়াছে, তাদের অভাব কি, সে সম্বন্ধে একটু খোঁজ করা, যাতে তারা মনে করিতে পারে তারা নিতান্ত নিঃসহায় নয়, সমগ্র ভারত ইউনিয়ন তাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। শুধু মুখে বলিলে কি চাইবে? কাগজে শতাংশের একাংশ দেখাইলেও অনেক ফল হয়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুধু বাংলাব জেলায় জিলায় ভ্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বাঙ্গালী ও অসমীয়ার মধ্যে মৈত্রী বৃদ্ধি করণের মানসে আসাম প্রদেশও সফর করিয়াছেন। শিলং, গোহাটি, তেজপুর, নওগাঁ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও কথাবার্তার দ্বারা এই দুই প্রদেশের অধিবাসীকে কাছাকাছি আনিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধ্যে নওগাঁতে তাঁর প্রতি বিশেষ অশিষ্ট আচরণ করিয়াছে। তেজপুরে তাঁর প্রতি সম্মানার্থ যে সভামণ্ডপ তৈরী হইয়াছিল, তা ভস্মীভূত হয়, কিন্তু তাঁকে কেহ অসৌজন্তু দেখায় নাই। কিন্তু নওগাঁতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকেরা, ইহাদের সংখ্যা অল্প বা অনেক বলিতে পারি না, তাঁর প্রতি অভদ্র আচরণ ও সভা পণ্ড করিবার জন্ত গিয়াছিল। জাতীয় সংগাত

‘জ্ঞানগণ মন’ বা ‘বন্দে মাতরম্’ পর্যন্ত তাদের স্তব্ধ রাখিতে পারে নাই। আমরা ইহাতে খুব বিস্মিত হই নাই। কারণ আমরা আগেই জানিতাম যে নওগাঁ বহুদিন হইতে উগ্র প্রাদেশিকতার বাণী প্রচার করিতেছে। অহোম জাতীয় মহাসভা কি বস্তু এবং উহা কি কাজে বাস্তব আমরা তা জানি। ‘বঙ্গাল খেদা’ আন্দোলন অর্থাৎ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার ও বাঙ্গালীকে আসাম হইতে বহিস্কার করা যাদের মূলমন্ত্র ছিল তারাই আর একরূপে আসামের পটভূমিকায় দেখা দিয়াছে। নওগাঁতে প্রাদেশিকতার তাগুব বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে। বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, আসাম সরকার ইহা দমন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বিস্মিত হইয়াছি যে, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ তালিকা হইতে নওগাঁকে বাদ দেওয়া হয় নাই।

বর্তমান লেখকের জন্মস্থল আসামে, এবং শৈশব ও কৈশোর সেখানেই কাটিয়াছে। সেই সময়ে আসামের সর্বত্র বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। বাঙ্গালীর সহিত ভেদ-বুদ্ধি ইংরেজই প্রথম অসমীয়াদের মনে ঢুকাইয়া দেয় এবং উহাতে নানাভাবে ইন্ধন যোগায়। বস্তুত, ইংরেজ প্রান করিয়া এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, হে অসমীয়া! ছুনিয়াতে বাঙ্গালীর চাইতে বড় শত্রু তোমাদের আর কেহ নাই। যতকাল এই পরদেশী তোমাদের প্রদেশের বুক জুড়িয়া থাকিবে, তত কাল তোমাদের শান্তি নাই। চাহিয়া দেখ, বড় চাকুরে সব বাঙ্গালী, বড় উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি বাঙ্গালী। তোমাদের দেশ দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই ইহা অসমীয়ার দেশ। নিজের দেশকে কেন এমন করিয়া পারের হাতে তুলিয়া দিতেছ?

‘আসামের উন্নতির মূলে বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও শ্রম অনেক খানি কাজ করিয়াছে, এবং তাই তার পক্ষে কালস্বল্পপ-

হইয়াছে। ইংরেজের কূটনীতি জয়লাভ করিয়াছে। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্টকে উত্তরাধিকার স্বত্বে আসামে বর্ধমান বাঙ্গালী বিদ্রোহ দিয়া গিয়াছে। কোথাও বাঙ্গালীরা ভুল করে নাই, এমন বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। বাঙ্গালীর কোথাও কোন দোষ নাই, একথাও আমরা বলিতেছি না। কিন্তু একথা আমরা জোর করিয়া বলিব, বাঙ্গালীর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিবার অনেক কারণ অসমীয়ার আছে, এবং সম্ভবত মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে সেজন্ত বাঙ্গালী তার কাছে আরও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ কোন প্রদেশে বঙ্গাল খেদা আন্দোলন নামে কোন প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে, ইহা কল্লনার অতীত।

নওগাঁতে যা দেখা গিয়াছে তা ছোট করিয়া দেখিতে আমরা এইজন্য প্রস্তুত নই যে, উহা সমগ্র আসামের অনেক লোকের ভাব প্রকাশ ব্যঙ্গক। উহা অসমীয়া বহু নেতৃগণের নিকট প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং আসামের কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট হইতে গোপন সমর্থন পাইয়া পুষ্ট হইতেছে। আমাদের এই মত ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমাদের অপেক্ষা সুখী আর কেহ হইবে না। কিন্তু ভারত হইতে শ্রীহট্টের মত একটা স্থানকে হারাইবার জালা আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। শ্রীহট্টের পাকিস্থান ভুক্তির রহস্য হইতেছে, বরদলৈ মন্ত্রি সভার প্রকাশ্য গাফিলতি ও অপর পক্ষকে গোপন সহায়তা। শ্রীহট্টবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও বিবিধ সদগুণসম্পন্ন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি হইবার পর আসামের সর্বত্র তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ তাদের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমীয়ারা আঁটিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীহট্ট যদি আসামভুক্ত হইত, তা হইলে আবার সমগ্র আসামের শ্রীহট্টবাসীদের হাতে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। বরদলৈ রাজা সেই সম্ভাবনাকে পরিহার করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, গোড়া থেকে বাংলা সরকারের হাতে ভার দিলে কখনও শ্রীহট্ট হাতছাড়া হইত না।

বাংলা দেশকে প্রাদেশিকতাপূর্ণ বলিয়া অনেকে স্বত্ব বোধ করেন। কিন্তু বাংলার চেয়ে কম প্রাদেশিকতাপূর্ণ প্রদেশ আব আছে কি না সন্দেহ। বস্তুত, আমাদের

মনের গঠনই আন্তর্জাতিক, এবং অন্য প্রদেশের নিকট দুর্ব্যবহার না পাইলে আমাদের মনে কখনও প্রাদেশিকতা বোধ জাগিত না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা কি ভারতের সকল প্রদেশের নরনারীর জন্য উন্মুক্ত স্থান নয়? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উহার অন্তর্গত মেডিকেল কলেজ, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি ত সকল প্রদেশের জন দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, অধিকন্তু অসমীয়া, উড়িয়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ সীটের বন্দোবস্ত করিয়াছে। বাংলাদেশের সরকারী চাকরিতে, ব্যবসা বাণিজ্যে, আইন আদালতে কোন প্রদেশের লোকের পক্ষে কোন বাধা নাই, এবং সম্ভবত বাংলার মত আর কোথাও অন্য প্রদেশবাসীর সংখ্যা এত বেশী নয়। আমাদের মনে হয় সরকারী প্রচার বিভাগের এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া ভারতের সর্বত্র বিলি করা উচিত, যাতে বাঙ্গালীর প্রাদেশিকতা সযত্নে ভুল ধারণা দূরীভূত হয়।

আমরা প্রাদেশিকতার বিরোধী, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব ভারতীয়তার নামে নিজেদের স্বার্থ পদদলিত করিতে প্রস্তুত নই। আমরা মনে করি, যেহেতু ডাঃ মুখোপাধ্যায় আজ ভারত-পাক-চুক্তির বিরোধিতা করিতেছেন সেই হেতু আমাদের উগ্র প্রাদেশিকতাকে শাসন ও দমন করিবার প্রয়োজন নাই। ভারত সরকার এই ধারণা করিলে ভুল করিবেন। অনেক দেৱী হইয়া গিয়াছে, আর কাল/বলয় না করিয়া ভারত সরকার এই দুই ক্ষতকে চিরিয়া দিউন ও দূর করুন, নাহিলে ইহা সমগ্র সমাজ দ্বেহকে দূষিত করিবে। বিশেষত আসাম অন্ততম প্রান্তীয় প্রদেশ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নওগাঁর ব্যাপারকে আমরা দোষাবহ মনে করি, সেইজন্য এই সোদন কালকাতায় যা ঘটিয়াছে তার জন্য বাঙ্গালী হইয়া আমরা লজ্জা অনুভব করি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ দেও ও ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া তাঁদের লক্ষ্য অভিজ্ঞতা হইতে পাক-ভারত চুক্তি সযত্নে বলিতে ইচ্ছুক হওয়ার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি হইতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক সভা আহত হয়। একদল লোক, হয়ত তাঁদের সংখ্যা নগণ্য নয়, এই সভা পণ্ড করিবার জন্য

নানাপ্রকার অশোভন চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেঁচামেচি, গাঙগোল, চেয়ার ছোড়াছুড়ি, হাতাহাতি কিছুই বাকি থাকে নাই। আমরা এই আচরণের তীব্র নিন্দা করি। আমরা মনে করি পরমত সহিষ্ণুতা প্রাদেশিকতার অল্প পিঠ। কোন ব্যক্তি বা দল এই আচরণ দ্বারা প্রতিপক্ষকে চূপ করাইতে পারিবেন না এবং যে গণতন্ত্র ও উহার স্বাভাবিক ক্ষণাবলী ব্যক্তির স্বাধীনতা বক্তৃতার স্বাধীনতা প্রভৃতিকে আমরা উচ্চ গলায় প্রচার করিতেছি, তা নিতান্ত মুখের কথামাত্র থাকিয়া যায়।

এক হিসাবে, পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের অন্ততম ভিত্তি। কোন কোন সময়ে এমন হইতে পারে যে, পরমতটা এমন যে আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। যেমন, যখন আমার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তখন যদি কেহ আসিয়া বলে একটি গান গাও, তা হইলে আমি যত বড় সঙ্গীতজ্ঞ হই না কেন, আমার সে প্রবৃত্তি হইবে না, বরঞ্চ অগ্নিরোধকারীকে গালাগালি দিয়া মারিতে ঘাইতে পারি। কিন্তু সত্যদেশসমূহে এই এক দৃষ্টান্ত প্রবর্তিত হইয়াছে যে, সাধারণত পরমত যতই অপ্রিয় বা মিথ্যা বলিয়া মনে হোক, সে সম্বন্ধে উদ্ভা প্রকাশ না করিয়া বা বাহু আচরণকে সংযত রাখিয়া বাক্যের দ্বারা বোর প্রতিবাদ, এমন কি, উদ্ভা প্রকাশ করা। যদি সেখানে স্বযোগ না পাওয়া যায়, অল্পত প্রচার দ্বারা স্বপক্ষে আনয়ন করিবার অধিকার প্রত্যেক লোকের আছে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অশিষ্ট আচরণের প্রয়োজন কচিৎ হয়।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আসন্ন নির্বাচন সমূহের কথা মনে রাখিয়া আমরা বলিতেছি, মাথা ফাটাফাটি না হয়। যে পক্ষই জয়ী হোক শান্ত ও নিরীহভাবে নির্বাচন সমাপ্ত হয়, ইহাই আমরা এখন হইতে কামনা করিতেছি। সেই জন্ত নির্বাচক সাধারণকে এখন হইতেই সাবধানে শীলতা অভ্যাস করিতে হইবে।

পাক-ভারত চুক্তি

ভারতের ও পাকিস্তানের দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে চুক্তির পর দুই মাসের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। জাতির জীবন লইয়া যেখানে পরীক্ষা সেখানে দুই সাম সময় আমরা যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কখন কখন এমন অবস্থা

আসে যাতে মন ধৈর্য্য মানে না। আমরা ভাড়াভাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—শেষ পর্যন্ত তা ভুল সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

পাক-ভারত চুক্তির শেষ ফল সম্বন্ধে আমাদের এখন চূপ করিয়া থাকিতে হইবে। আমরা ইহার কতকগুলি মোটা প্রবণতা এখানে দেখাইবার চেষ্টা করিব এবং তা ফল কি হইতে পারে আন্দাজ করিব।

গত বৎসর মহরমের অব্যবহিত পরে আমাদের ঢাক যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন গিয়া দেখি,—মহরম কলিকাতার মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইয়াছে, দশ হাজার মুসলমান নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে,—ইত্যাদি রটনা পক্ষে ঘাটে সর্বত্র। কিন্তু গেলার যাত্রা প্রচার করিয়াছিল, তখন কাশ্মীরে ‘যুদ্ধ’ চলিতেছে, তারা বেশী স্তুবিধা করিতে পাঠে নাই। কারণ অনেক বাঙ্গালি আবদালি মুসলমান আশংকা গ্রস্ত হইলেও এবং কলিকাতা হইতে নতুন আগন্ত আমাদের নানা প্রশ্ন করিলেও শহরে শান্তি ভংগের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ছিল, অন্তত শান্তি ভঙ্গকারীরা এই মনে করিয়াছিল। এবং তখন বুঝান সম্ভব হইয়াছিল যে, কলিকাতার সম্বন্ধে যা রটিত হইয়াছে, তা মিথ্যা। সরকার মুসলমানদের রক্ষা ও নিরাপত্তা করিবার জন্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এমন কি, দরকার হইলে হিন্দুকেও গুলি করিয়াছেন, এই খবর পাকিস্তানীদিগকে অনেকটা আশস্ত করিয়াছিল।

ঢাকা অবস্থান কালে সে সময়ে আমাদের অনেক দিন কার্ণোপলক্ষে মুসলমান বহুল পাড়ার মধ্য দিয়া গভীর রাত্রিতেও (১০টার পর) যাতায়াত করিতে হইয়াছে। রাস্তা চলিতে চলিতে অনেক বার মনে হইয়াছে, ‘দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে’, রক্ষা করিবার বন্ধু কোথায়। কিন্তু আমাদের মনে একটুও ভয় হয় নাই। পাকিস্তান সরকার অল্প যে কোন সভ্য সরকারের মত যে উহার অধিবাসীদের জনপ্রাণ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে রক্ষা করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল ছিল। এমন কি, একদিন রাস্তার আসিতে আসিতে এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীর রেডিওতে পণ্ডিত জহুরুলালের কাশ্মীর সম্পর্কে বিখ্যাত বক্তৃতা, “আমরা কাশ্মীরকে আশ্রয় দিয়াছি, ছাড়িব না,” অনেকে শুনিতেছিল এবং গালাগালি দিয়া বলিতেছিল, “দেখিতেছি সর্দার প্যাটেল

ও পণ্ডিত জহরলালে কোন পার্থক্য নাই। দুজনেই সমান খারাপ। তখন মুসলমান জনসাধারণের মন অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল। এবং তাদের মধ্যে জোর প্রচার-কার্য চলিতেছিল। আমরা আশংকা করিতেছিলাম, যে কোন সময়ে অগ্ন্যাশ্রিত হইতে পারেন। কিন্তু হয় নাই। এবং চারিদিকে অবাধে চলাফেরা করিয়া আমরাও ভয়ের কারণ পাই নাই।

ইহার কারণ কি? আর এক বৎসর পরে গত কের্ণওয়ালি মাসে হঠাৎ এক তরফা আক্রমণ শুরু হইল, ইহারই বা কারণ কি?

আমাদের মনে হয় ইহার মূল কারণ খুজিতে হইবে পূর্ব বংগের মুসলমান সাধারণের মনোভাবের মধ্যে। এখানে দু'একটা সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সামান্য হইলে ও সেগুলির ভাৎপর্ব সামান্য নহে। গত বৎসরেই মাকে লুইয়া আমাদের গ্রামদেশে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। গ্রামে গিয়া দেখি, যারা পারিয়াছে তারাই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ ইতস্তত করিতেছে, যাইবে কি না। কোন কোন গ্রামে মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে 'তাও শুনিলাম। 'সৈবীর' ও 'এক চুক্তি' হইয়াছিল। সকলেই বলিল, 'চুক্তির' পর অবস্থা ভাল হইয়াছে। 'প্রত্যেক বারই চুক্তির' পর অবস্থা কিছুদিন ভাল থাকে। কতদিন ভাল থাকে, বলা মুশ্কিল। কিন্তু তারপর? তারপর আরও জোরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'মাই হোক' গ্রামের মুসলমানরা ভাল ব্যবহার করিয়াছিল এবং আমরা সাহস করিয়া গ্রামে বসিয়াতে খুসী হইয়াছিল। তারপর কিরিয়া আসিলাম।

ঢাকার শৌছিয়া মুসলমানের ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের খবর কি? খুব নম্রভাবে জানাইল ঢাকার 'বিদেশীরা আসিয়া' বাজার খরিপ করিয়া দিতেছে। বিদেশী বলিতে অল্প প্রদেশের মুসলমান (হিন্দু ও বটে) বুঝায়। বলিল, 'কিন্তু বাবু ভাবিবেন না। ঢাকা শহরে সহজে বিদেশী স্থান পাইবে না।' বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা আমরা রাখিব। সহজে না যায়, মারিয়া তাড়াইব। বাঙ্গালী মুসলমান তরকারী ওয়াল, দুধ ওয়াল, কুটি ওয়াল, প্রত্যেকের মুখেই এক কথা। বিদেশী ঢাকা ওয়াল

এখানে আসিয়া বড় বড় ব্যবসা কাঁদিয়া বসিয়াছে। বড় চাকুরী করিতেছে বিদেশী, এমন কি পুলিশের চাকুরীতে পর্যন্ত বাঙ্গালী স্থান পায় না। ইত্যাদি।

বাঙ্গালীর মনের এই অবস্থার কথা তার অভিযোগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার জানিতেন না তখন। ভালো করিয়া জানিতেন। দেশজ্ঞ তবই তারা সরকারি টাকাকষক উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বাঙ্গালী মুসলমান যুবকদের উদ্দেশ্যে বিকেল আন্দোলন অল্পের বিনষ্ট করিলেন। মুসলমান মাঝকেই শিখাইলেন, 'তুমি পাকিস্তানী বাঙ্গালী' নও। যে মনে প্রাণে পাকিস্তানী নয়।

সে দেশের শত্রু। তারপর চলিতে লাগিল পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ছোট বড় বিভিন্ন কাজে পাকিস্তানী আন্দোলন। আজ পূর্ববংগের মুসলমান নিজ বসিভূমে পরিবাসী হইলেও কিন্তু এই কাজটি এরূপ চতুরতা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে যে, পূর্ববংগের বাঙ্গালী মুসলমান এক বা দুই বৎসরের শিক্ষানবিশির ফলে তার সকল স্বাভাব্য বিসর্জন দিতেছে। শুধু তাই নয়। এক ধরনের রাজনীতিবিদ আছেন, তাঁরা মনে করেন, সমুখের সর্বনা সমুখান অক্ষর একথা না ভাবিবে দেশ বড় হয় না। হিটলার এই শ্রেণীর ছিলেন। আজ পাকিস্তানের কর্ণধারগণ এই শ্রেণীর লোক। তাঁদের সকলে মুখে না বলুন, (অনেকে মুখে 'পট' ভাষায় বলিয়াছেন) কাজে দেখাইতেছেন, মুসলমানের বড় হওয়ার পথে একমাত্র বাধা হিন্দু আর কোন জাত নয়। অরকালের মধ্যে এই হিন্দু বিবেচ্যকরূপ বিস্তৃত হইয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে মুসলমান হিন্দু ঘেঁষা নয় সেও দেশপ্রেমী নহে।

সাধারণ মুসলমানের হিন্দু ঘেঁষা হওয়ার লাভ আছে। সৌভাগ্যবশত পাকিস্তানে কমিউনিস্টরা আর কোন প্রচার বিদ্যোদগ্ধ নাই। অতীতের সকল প্রকার রাষ্ট্র বিরোধী কাজের সজ্জা হিন্দুকে দায়ী করা সহজ। তার চেয়েও সহজ মুসলমান নেতাদের সব ভুলচুক ঢাকা। পাকিস্তানে মারিয়া ও কুটের জন্ত দায়ী কে? হিন্দু, হিন্দু। পাকিস্তান কেন আজ হিন্দুস্তানের মত কাজ ও কল্যাণ করিতে পারিতেছে না? সরকার হিন্দু।

এই বিষয়বস্তুর দ্বারা জগত ছাড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বের সমস্ত এই প্রবল হিন্দু বিদ্বেষের প্রয়োজন

আছে। বুদ্ধিমান শিক্ষিত মুসলমান ভারতের অগ্রগতি দেখিয়া
হিন্দু ভাবে—তাই ত ভারতের সহিত মিলিত থাকিবার কি বাধা
ছিল, তা হইলে তাকে বলিতে হইবে, খবরদার খবরদার, এমন
কথা মুখে আনিও না। আনিলে পাপ হইবে। কারণ
হিন্দু এক জাতি। মুসলমান অষ্ট জাতি। দুয়ের মিলন
কখন সম্ভব? পাকিস্তানের শত্রু ছাড়া কেহ এ মিলন আশা
করিতে পারে না।

সুতরাং বলিব ঢাকার উপর করাচী সম্পূর্ণ জয়লাভ
করিয়াছে এবং সমগ্র পাকিস্তানকে এ ভাবে এক স্তরে গাঁথা
কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

উদ্বাস্ত সমস্যা

এই অবস্থায় শুধু চুক্তি দ্বারা উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধান
হইবে, অর্থাৎ হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে কিরিয়া যাইবে বা তথা হইতে
আর আসিবে না, আমাদের মতে, এমন মনে করা ভুল।
পণ্ডিত জহরলালের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি কিংবা তাঁর মন্ত্রী-
সমিতি একথা বলেন না, আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই।

ভারত-রাষ্ট্রে অনেক মুসলমানের ফিরিয়া আসিবার
সম্ভাবনা আছে। আমরা চাই, তাঁরা ফিরিয়া আসুন।
বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমানের অন্যায় ও অত্যাচারে
আমরা মতই রাগ করি, পশ্চিম বংগের নির্দোষ মুসলমানদের
প্রতি আমাদের কোন রাগ করি নাই। মুসলমান-তরকারী-
ওয়ালী, হুণওয়ালী, মাংসওয়ালী আজও আমাদের জিনিষ
যোগাইতেছে। মুসলমানরা সত্যকার ভারতীয় এবং
ভারতের প্রতি বশতাপন্ন, তাঁদের আমরা ভাই-বলিয়া মনে
করিব ও রক্ষা করিব। ভারতের ৪৮ কোটি মুসলমান কি
সবাই পর?

কিন্তু সংগে-সংগে আমরা ইহাই চাই যে, পূর্ব-বাংলার
সমুদয় হিন্দু চলিয়া আসেন। সাত পুরুষের ভিটার প্রতি
মায়া করিলে চলিবে না। আমাদের মনে সন্দেহ নাই যে,
চুক্তির কল-ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য। কারণ, চুক্তির দ্বারা

মাহুষের শব্দের পরিবর্তন হয় না। আমরা বলিতেছি না
পূর্ব বংগের মুসলমানের বর্তমান হিন্দু-রিষেবের মূলে কোথাও
হিন্দুর কোন দোষ নাই। যে সব দোষ-গুণের কথা এখন
আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। পাকিস্তানী মনে
করে বিদেশী যদি কেহ থাকে ত সে হিন্দু। কোন আধুনিক

রাষ্ট্রে অত্যধিক বিদেশীকে সহ্য করা হয় না। পূর্ব-পাকিস্তান
তার বুকের উপর কেন এতগুলি বিদেশীকে পুষিবে?
পাকিস্তানে পাকিস্তানী হইবার উপায় শুধু রাষ্ট্রের প্রতি
আনুগত্য স্বীকার নয়। উপরন্তু মুসলমান ধর্ম অবলম্বন
করা। মুসলমান ছাড়া কেহ পাকিস্তানী হইতে পারে না।

ভারত-রাষ্ট্রের সে বাংলাই নাই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ,
খ্রীষ্টান সকলেই এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক হইবার অধিকারী। সুতরাং
আমাদের মুসলমান ভাইদের তাড়াইবার কথা চিন্তা না করিয়া
হিন্দু সকলকে পূর্ব পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিবার
সাদর নিয়ন্ত্রণ জানান উচিত।

আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতারা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন,
তা জানি। কারণ আমাদের পশ্চিম বংশ ছোট দেশ,
ইহাতে যত লোক আটে তার চেয়ে বেশী ৩০ লক্ষ বা
অধিক উদ্বাস্ত আসিয়া জুটিয়াছে। আরও লোক আসিলে
তাঁরা দাঁড়াইবে কোথা? আগে ত উদ্বাস্তদের লইয়াই
বাংলা গভর্নমেন্ট হিম্মিস ধাইতেছেন। আবার আহ্বান?

হাঁ! কারণ সমগ্র ভারত ইউনিয়নকে আমরা একটি
রাষ্ট্র বলিয়া ধরিতেছি। আমরা বলিতেছি না,
বাঙ্গালী, হিন্দুস্তানী সব একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে।
কিন্তু আমরা জোর-দিয়া একথা বলিতেছি যে, আজ উদ্বাস্ত
সমস্যা-শুধু ভারত সরকারের ভীকতার জন্য এত বড় সমস্যা
হইয়া দেখা দিয়াছে। তাঁরা যদি আসাম ও বিহার
সরকারের নীচ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় না দেন, তা হইলে
আসামের ভূভাগে কমপক্ষে ১ কোটি উদ্বাস্ত বসবাস সম্ভব
হয়। তাঁরা যদি, প্রকৃতই বাংলার অংশ কিন্তু রাজনৈতিক
কারণে ইংরেজ কর্তৃক বিচ্ছিন্ন মানভূম, ধগাভূম, ছোট নাগপুর
এবং গোয়ালপাড়া ও কাছাড় এবং মণিপুর ও ত্রিপুরা,
বাংলাকে ফিরাইয়া দেন, তা হলে বাংলা আপনায় সমস্ত
আপনি সমাধানের চেষ্টা করিতে পারে।

ভারত সরকারের সোজা পথে চলিতে ইতস্তত কেন?
আসামের ভয়-বেশী সংখ্যায় বাঙ্গালী আসিলে উহা আর
অসমীয়ার প্রদেশ থাকিবে না। বঙ্গত, আজও উহা গারো
জোরে অসমীয়ার প্রদেশ। সমগ্র লোক-সংখ্যায় অধিক
অসমীয়া নয়। সুতরাং এই মুক্তির সারসভা কেন ভারত-
সরকার স্বীকার করেন? আর প্রকৃতই যে সকল অঞ্চল

বাংলা ভাষাভাষীর সেগুলি হইতে বঞ্চিত রাখিয়া বাংলাকে
জীবল করিবার হেতু কি হইতে পারে ?

স্বাগত জহুরলাল

ইন্দোনেশিয়ায় ২২ দিনের শফর শেষ করিয়া ভারতের
প্রধান মন্ত্রী কলিকাতায় দুই দিন অবস্থানের পর উড়িষ্যা চলিয়া
গেলেন। কেহ কেহ দেশের বর্তমান অবস্থায় তাঁর বিদেশ
গমনের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিতজি তাদের
উত্তর কলিকাতায় এই বলিয়া দিয়াছেন যে, কখন কখন দূর
হইতে দেশ ও দেশের সমস্যা বুঝা যত সহজ হয় সামনে থেকে
তা হয় না।

তা ছাড়া, এ ভাবে নব নব দেশ নতুন করিয়া
আবিষ্কারের সার্থকতাও আছে। বিশ্বের যত অধিক সংখ্যক

দেশের সহিত আমরা রাষ্ট্র-নৈতিক মৈত্রী ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ
স্থাপন করিতে পারিব, ততই আমাদের দেশ মনেও সম্পদে
সমৃদ্ধ হইবে।

ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির আজন্ম স্বয়ং-
সেবক পঞ্চানন নিয়োগীর মৃত্যুতে দেশ একজন যোগ্য সন্তানকে
হারাইল। তিনি বহু বৎসর আমাদের সমাজের সম্পাদক
রূপে কাজ করিয়া সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন।
কলেজের অধ্যক্ষরূপে, বৈজ্ঞানিক রূপে, নিজ স্বাধীন মত
প্রকাশে সাহসী যোদ্ধারূপে তিনি বহু লোকের প্রশংসা অর্জন
করিয়াছিলেন। আমরা তাঁর শোকে সন্তপ্ত পরিবারকে
সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

“একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা”

শ্রীমীরা মৈত্র বি, এ,

(লেডি অফ ফ্রতিমা)

অত্যন্ত অভূতপূর্ব ঘটনা। মহাভারতের যুগে, কুরু
পাণ্ডবের রণ ক্ষেত্রে ধর্ম ও সত্য রক্ষার জন্য একদা সূর্যদেবকে
ত্রিকূক্ষের ইন্দ্রিতে অসময়ে অন্ত্রচলে যেতে হয়েছিল। তারই
পুনঃসংঘটন আবার আমরা দেখতে পাই, ১৯১৭ সালে যুদ্ধ
বিধ্বস্ত ইয়োরোপের উদ্ভ্রান্ত পটভূমিকায় (Dancing
Sun) অর্থাৎ নৃত্যশীল সূর্যের অভূত আবর্তনের মধ্যে।
সকাল বেলা খবর পেলুম “লেডি অফ ফ্রতিমা” বঙ্গে আসছেন।
যে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহিষাসী রমণী পৃথিবীতে সূর্যের
রক্ত নৃত্য সংঘটন করেছিলেন, তারই প্রতিমূর্তি বহন করে,
তাঁর ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের এখন পৃথিবী পর্ষটনে বেরিয়েছে।
তারাই আজ আসছে বঙ্গেতে।

ভাঙুপে, আমার স্বামীর ফ্যাক্টরীর “Sankeys Bleo-
trical Stamping” প্রাঙ্গনে তারা কিছুক্ষণের জন্ত অবস্থান

কোরবে, খুঁটি জাতি এবং জনতার মনে শান্তি ও সাধন
দানের জন্ত।

হাতের উপর এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে আনন্দে মন
নৃত্য করে উঠল। সেদিন ছিল রবিবার সকলের অর্ধ-
অবসর। কাশালা হিল থেকে ভাস্কর দীর্ঘ আঠারো মাইল
পথ। ছুটির সকালে সন্দের একটা ট্রিপ দেওয়া যাবে।
ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা তৈরী হয়ে নিলুম। চারজনে মিলে,
আমাদের গাড়ীতে করে রওনা হলুম, আনন্দের মধ্যে দিয়ে
অভূতপূর্ব কোনও জ্ঞান অর্জন করার জন্ত।

অতি পরিচিত পথ। আমার স্বামীর সঙ্গে বহুবার
এ পথে যাতায়াত করেছি, বহু আনন্দের আর বিশ্বাসের মধুর
স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই পথের দৃশ্যাবলীর মধ্যে। অতীতের
সমস্ত মধুরতাকে অতিক্রম করে আজ আমার মনে

শুধু জেগে উঠতে লাগল একটি আশ্চর্য অদ্ভুত অকপট মানুষের মন থেকে জন্ম অহমিকা দূর করে হিংসাত্মক ব্যাকুলতা। পাপ, আর পুণ্য। এই দুইয়ের সংঘর্ষে, পৃথিবীর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯১৭ সালে, নিত্য আবর্তিত ও প্রবর্তিত হচ্ছে। এর মধ্যে কিছুকালে পত্নীগণে লীসবন থেকে সাত মাইল দূরে, ফতিমা নামক জগদিশ্বর, নিত্য তরঙ্গিত আয়তন ক্ষুদ্র জীবনের প্রাণাধিকারী। সেই প্রাণাধিকারী আজ এক রহস্যময় সম্ভাবনার উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তাইতে চকল হয়ে উঠেছে আমাদের মন, প্রবল হয়ে উঠেছে তার অসংখ্য অদ্ভুত প্রশ্ন মানুষের আশা বিশ্বাস ও ভালোবাসা, যখন পদে পদে বাহ্যিক ও প্রতীহিত হয়, তখন তাকে অব্যাহত রাখার জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ, ঈশ্বর এবং অলৌকিক কেনও যুগে যুগে সংঘটিত হয়েছে। এক একটা স্থাপত্য অলৌকিক শক্তির উপর ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। কাজেই দৈবী ঘটনার। এই দৈব, ও ঐশ্বরিক প্রভাবকে অস্বীকার করার মধ্যে কোনও গোরব নেই। বিজ্ঞান মানুষকে উন্নতির অভ্যন্তরীণ শিখরে আরোহণ করিয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে দৈবশক্তির কোনও প্রভাব ঘটে নি। পৃথিবীতে একদল মানুষ বিজ্ঞানের অহঙ্কারে, ঈশ্বরে অবিশ্বাস করাই মানব ধর্ম বলে মনে করে; এবং তাই থেকেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন নতুন দুঃখ কষ্ট, অবরোধ ও উৎপীড়নের। আসলে সংস্কারমুক্ত হও। তার মধ্যে মজলের কোনও স্থান নেই। সভ্যতার উপাসনা করো। তার মধ্যে স্বন্দরের আবির্ভাব ঘটবে। সেই মানুষের ধর্ম। এই ধর্মই যুগে যুগে মানুষের মহত্বকে মহিমায় করেছে। সমগ্র বিশ্ব তার চরণে অবনত করেছে নিজ গর্বে রক্ত শির।

তারি আহ্বান শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

“শুনিয়াছি তারি লাগি—

রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকলস বিষয়ে বিলাপী
পথের ভিক্ষুক.....

শুধু জানি তাহারি মহান,

গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি, শুনা যায় সমস্ত সমীরে,

তাহারই অঞ্চল প্রাপ্ত লুটাইছে নীলাশ্বর বিরে;

তারি বিশ্ব বিজয়িনী, পরিপূর্ণ প্রেমমূর্তি থানি,
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে,.....

তাহারে অন্তরে রাখি,

জীবন কটক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
স্বথে হুখে ধৈর্য ধরি বিরলে মুছিয়া অশ্রু জাঁখি”...

মানুষের মন থেকে জন্ম অহমিকা দূর করে হিংসাত্মক ব্যাকুলতা। পাপ, আর পুণ্য। এই দুইয়ের সংঘর্ষে, পৃথিবীর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯১৭ সালে, নিত্য আবর্তিত ও প্রবর্তিত হচ্ছে। এর মধ্যে কিছুকালে পত্নীগণে লীসবন থেকে সাত মাইল দূরে, ফতিমা নামক জগদিশ্বর, নিত্য তরঙ্গিত আয়তন ক্ষুদ্র জীবনের প্রাণাধিকারী। সেই প্রাণাধিকারী আজ এক রহস্যময় সম্ভাবনার উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তাইতে চকল হয়ে উঠেছে আমাদের মন, প্রবল হয়ে উঠেছে তার অসংখ্য অদ্ভুত প্রশ্ন মানুষের আশা বিশ্বাস ও ভালোবাসা, যখন পদে পদে বাহ্যিক ও প্রতীহিত হয়, তখন তাকে অব্যাহত রাখার জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ, ঈশ্বর এবং অলৌকিক কেনও যুগে যুগে সংঘটিত হয়েছে। এক একটা স্থাপত্য অলৌকিক শক্তির উপর ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। কাজেই দৈবী ঘটনার। এই দৈব, ও ঐশ্বরিক প্রভাবকে অস্বীকার করার মধ্যে কোনও গোরব নেই। বিজ্ঞান মানুষকে উন্নতির অভ্যন্তরীণ শিখরে আরোহণ করিয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে দৈবশক্তির কোনও প্রভাব ঘটে নি। পৃথিবীতে একদল মানুষ বিজ্ঞানের অহঙ্কারে, ঈশ্বরে অবিশ্বাস করাই মানব ধর্ম বলে মনে করে; এবং তাই থেকেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন নতুন দুঃখ কষ্ট, অবরোধ ও উৎপীড়নের। আসলে সংস্কারমুক্ত হও। তার মধ্যে মজলের কোনও স্থান নেই। সভ্যতার উপাসনা করো। তার মধ্যে স্বন্দরের আবির্ভাব ঘটবে। সেই মানুষের ধর্ম। এই ধর্মই যুগে যুগে মানুষের মহত্বকে মহিমায় করেছে। সমগ্র বিশ্ব তার চরণে অবনত করেছে নিজ গর্বে রক্ত শির।

তার পরের মাসে তেরো তারিখে, খেলার মাঠে বহু কোটলী, জনতার সমাবেশ হোল। যথাসময়ে সেই তিনটি বালক বালিকা, দেখলো সেই অলৌকিক নারী মূর্তিকে। এবার সেই মূর্তি বললো, “আগামী মাসের তেরো তারিখে তোমাদের বলবো, আমি কে, এবং আমি কি চাই”—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনটি বালক বালিকা ছাড়া, আর কেহই দেখতে পেলো না সেই ছায়ামূর্তি, এবং শুনতে পেলো না তার বাণী।

তার পরের মাসে তেরো তারিখে সেই মাঠে প্রায় সত্তর ভাজাব লোক এসে জমা হোল, অলৌকিক কোনও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। যথাসময়ে সেই ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হয়ে বললো, “আমি হচ্ছি “লেডি অফ দি রোজারী, আমি চাই, প্রত্যেক মানুষ সংভাবে তার জীবন নিয়ন্ত্রণ কোরবে। এবং কৃত অপরাধের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরবে। তারা কখনও ঈশ্বর বিরোধী হবে না।” সেই বিরাট জনতা বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলো সেই অপূর্ণ নার

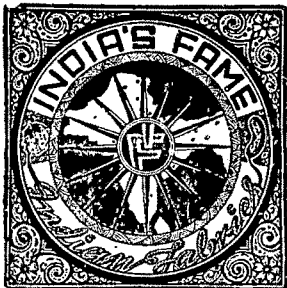
মূর্তি। মুগ্ধ হয়ে গুনলো সেই সুমধুর বাণী। জীশ্বর অবি-
শ্বাসীদের মনের মধ্যে উঠল তুমুল ঝড়। তারপরই সেই
বিরাট জনতা প্রায় বারো মিনিট ধাবৎ ভয়ে বিস্ময়ে শুক
হয়ে দেখলো, স্বর্ণকান্তি স্বর্ষ্য রূপালী গোলাকারে পরিণত
হোল, এবং চতুর্দিকে উজ্জল রশ্মি বিকীর্ণ করে একটি
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সেটা ঘুরতে লাগল; সেই রশ্মি থেকে
লাল, নীল, সবুজ, ভায়োলেট ইত্যাদি রং নির্গত হয়ে,
পৃথিবীকে অপূর্ব বর্ণ মাধুর্যে রঞ্জিত করে তুললো। তারপর
চার মিনিট স্বর্ষ্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এবং আবার
চার মিনিট পর স্বর্ষ্য সেই অলৌকিক রশ্মির মধ্যে নৃত্য
করতে লাগল। তারপর সেই রহস্যময় অগ্নি নৃত্যের পর
স্বর্ষ্য তার গতিবেগ স্বল্প করল, এবং একটি চক্রের মত
সে ক্রমশঃ আকাশ থেকে মাটির দিকে নেমে আসতে
লাগল। ক্রমশঃ এত নিকটবর্তী হোল যে মনে হতে লাগল
বৃষ্টি এই অগ্নি তাণ্ডবে পৃথিবী এখনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তখন
সেই বিরাট জনতা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নতজানু হয়ে
ভগবানের কাছে রূপা প্রার্থনা করতে লাগল। তার
কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বর্ষ্যের অবতরণ বন্ধ হোল, এবং সে
স্বস্থানে প্রত্যাগমন করল। এবং ধীরে ধীরে আকাশ আবার
স্বর্ষ্যালোকে পূর্ণ হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এক
অলৌকিক ঘটনা। বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল জনসাধারণের
অন্তরে ও বাহিরে। সঙ্গে সঙ্গে লেডী ফতিমার বাণী বিধে
প্রচারিত হোল, “আমরা আমাদের কৃতকার্যের জন্য প্রার্থনাসিদ্ধ
কোরবো,” “ভবিষ্যৎ জীবন স্তন্যযুক্তিত কোরবো,” “পাপ
হতে বিরত থাকবো”—আশা, “প্রার্থনা” “শান্তি”—ছড়িয়ে
পড়ল চতুর্দিকে। সকলে অজ্ঞানত চিত্তে এই বাণী শ্রবণ
করলো। জীবনে পালন করতে উৎসাহী হোল। কিন্তু
ওই যে স্বর্ষ্য নৃত্য : সেটা কেন হোল, এবং কি ভাবে হোল,
কোন বিজ্ঞানের দ্বারা আজও তাহা প্রমাণিত হোল না।

“Dancing Sun” আজও পৃথিবীর মানুষের কাছে রহস্য
হয়েই রইল।

লেডী ফতিমার আলৌকিক আবির্ভাব প্রথম যে তিনটা বালক
বালিকা অবলোকন করেছিল, তার মধ্যে দুইজন সেই
ঘটনার পরই মারা গিয়েছিল। একজন বালিকা যে ছিল
সে আজও বেঁচে আছে; তার নাম লুসি। তারই সুপরি-
কল্পিত নির্দেশে, লেডী ফতিমার এই মর্মর মূর্তি গঠন করা
হয়েছে। সেই মূর্তি বিশ্ব ভ্রমণ পরিক্রমান্বয়ে আজ এসে
উপস্থিত হয়েছে বঙ্গোত্তে।

ফ্যাক্টরীতে পৌঁছাবার আগে পথে আমরা দেখতে
পেলুম এক বিরাট মিছিল। পথের দুধাবে সার বেঁধে
দাঁড়িয়ে আছে অগণিত ভক্তিপ্রাণ নরনারী। যেকোনো
তাকাও শুধু দেখা যায় এক উদ্বেলিত জন সমুদ্রের উত্তাল
তরঙ্গ। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে কে বলবে আজকের মানুষ
জীশ্বরে অবিশ্বাসী, শুধু আত্মস্থত সর্বস্ব। তাই যদি হয় তবে
এই প্রচণ্ড ভৌতের মধ্যে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল
বয়সের নরনারী পথের ধারে কোন অভীষ্টসিদ্ধ লাভের জন্য
দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে? এইতেই বোঝা যাচ্ছে এখনও
পৃথিবী পূর্ণ পাপে নির্মজ্জিত হয়নি।

যথা সময়ে মিছিলের শীর্ষদেশে আমরা দেখলুম লেডী
ফতিমার শ্বেত শুভ্র মর্মর প্রতিমূর্তি। মুখখানিতে বিশ্বের
শান্তি মাখা। চোখদুটা করুণায় ভরা। প্রার্থনার ভঙ্গীতে
সুন্দর বাহুদ্বয়ানি বুকের উপর ক্রান্ত রয়েছে।
যেন প্রেম আর করুণার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আমরা কোতু-
হলের বশবর্তী হয়ে দেখতে এসেছিলুম। কিন্তু দেখে মনে
হলো এসে ভালোই করেছি। বর্তমান মানব সমাজের নানা
সমস্যা জড়িত জীবনের অবরুদ্ধ প্রাণ প্রবাহের একটা
স্বতন্ত্র দ্বারা আমার চোখের সামনে মুক্তরূপে দেখা
দিল। যে দৃশ্য আমি কোন দিনই দেখিনি। যার সম্বন্ধে
আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আজ লেডী ফতিমার
প্রতিমূর্তি দর্শন করতে এসে আমার জীবনের সেই অস্পষ্ট
ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটল। মনে এক বিচিত্র আনন্দের
অনুভূতি নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরলুম।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
• BHOWANIPUR • CALCUTTA •



২৫শ বর্ষ

শ্রাবণ—১৩৫৭

৯ম সংখ্যা

স্বাধীনতার দান

দ্বিতীয় প্রস্তাব

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সেরশাহ অসাধারণ প্রতিভা বলে ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে যে এক নতুন আদর্শ ও উদারনীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে আদর্শ—সেই শাসন-রীতি যোগল সম্রাটদের মধ্যে কেহ কেহ অবলম্বন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এমনি তুর্ভাগা যে আমরা যতই গৌরব করিনা কেন, যতই ভারতবর্ষের মহামিলনের বাণী প্রচার করিনা কেন—ভারতের জনগণের পরম্পরের প্রতি পরম্পরের বিদ্বেষ, জাতিগত সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা ও অনৈক্য পদে পদে ভারতকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া গভীর ভাবে আমরা যখন দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি, তখনই দেখিতে পাই—জাতিতে জাতিতে প্রদেশে প্রদেশে বিদ্বেষের বহি প্রধুমিত। এমন কি শত্রুকে

আহ্বান করিয়া নিজ দেশের সর্কনাশ করিতেও হিন্দুরা পরাজুথ হয় নাই। কেবল আত্মকলহ, জাতিগত অভিমান শত্রুকে কোল দিয়া রাজ্য, মান-সম্মত সব হারাইয়াছে—তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়ার ফলে হিন্দু আপনার স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিরাট ভারতবর্ষকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনৈক্য, প্রাকৃতিক ব্যবধান, সর্বতোভাবে ভারতকে খণ্ড, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু বীরদের যেখানে অভ্যাস হইয়াছে সেখানেই দেখিতে পাই ভাই ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙাইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস শোণিত-কলঙ্কিত ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারত যুদ্ধের কাব্য—ভাই ভাই বিদ্বেষের ফল—রণে ভাই ভাইয়ের রক্তে স্নান। সেই রক্ত—রক্তবীজের রক্তের মত, আমাদের সমাজে

ছড়াইয়া পড়িয়া পরস্পরের মধ্যে যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের আশ্রয় জ্বালাইয়া দিয়াছে তাহা এখনও নিবে নাট। কবে নিবিবে জানিনা।

হিন্দু—হিন্দুর শত্রু। তাহারই ফলে জাতি ও সমাজ আজ বিপন্ন। দোষ কাহার? হিন্দুর নিজের! অশোক যে ভাবে ভারতবর্ষের ‘ধর্মবিজয়’ দ্বারা একোয় সাহায্যে বৃহত্তর ভারতের সংগঠন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্তী কালে উত্তরাধিকারীগণের দৌর্ভাগ্যে বিনষ্ট হইল। ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয় আরম্ভ হইল,— দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যায় হইতে,—কাবুল, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশ বাদ দিলেও দেখা যায়, সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক যখন দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, তখন—চক্ষিগণি প্রদেশ দিল্লীর সুলতানের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। দক্ষিণাত্য, মালাবারের কিয়দংশও করোমণ্ডল তীর পর্য্যন্ত উড়িয়াছিল ইসলামের অর্ধচন্দ্র পতাকা। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে দিল্লীর সুলতানেরা অতি দ্রুত অনেক নতুন দেশ জয় করিলেন। উত্তর ভারত অতি সহজেই মুসলমানের কবলে পড়িল, পড়িলনা—দক্ষিণ ভারত, সেখানে বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্য অপূর্ণ বীরত্ব সহকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেজন্য দক্ষিণ-ভারতে মুসলমানপ্রাধান্ত তেমন ভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ কাল পর্য্যন্ত আকবরের সিংহাসনে আসীন হওয়ার সময়েও কয়েকজন হিন্দুরাজা অসাধারণ প্রতাপ দ্বারা দেশকে মুসলমানদের হাত হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাখিয়াছিলেন।

আকবর ও তাঁহার পরবর্তী মোগল বাদশাহেরা ১৬২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন,—তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপলী, দূর দক্ষিণ ভারতের এই দুইটা প্রদেশে পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেবের রণদক্ষ সেনাপতির। হিন্দু রাজাদের নিকট হইতে একটা কর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,— কিন্তু সে বিজয় অতি অল্পকালই স্থায়ী হইয়াছিল। মারাঠার অসাধারণ বীরত্ব প্রভাবে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

বরীজনাথ ‘শিবাজী-উৎসব’ উপলক্ষে শিবাজীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন :

“কোন দূর শতাব্দের কোন এক অখ্যাত দিবসে

নাহি জানি আজি,

মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে—

হে রাজা শিবাজি,

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ

এসেছিল নামি’

“এক ধর্ম রাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত

বৈধে দিব আমি।”

“এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে

‘এ মহাবচন করিব সম্বল’ বলিয়া কবি যে আশা করিয়াছিলেন—তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। যে কথা বলিতে-ছিলাম,—ক্রমে মারাঠা শক্তি বিলুপ্ত হইল, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে ইংরাজ নবাব সিরাজকে পরাজিত করিয়া ১৭৫৭—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলা ও বিহারের আধিপত্য লাভ করিলেন। মুসলমান জাতির অত্যাচার, অবনতি ও পতনের ইতিহাস। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত নামমাত্র বাদশাহী ছিল মোগল বংশের।

ভারতবর্ষের কথা যেমন সংক্ষেপে বলিয়া লইলাম, তেমনি বাঙ্গলার কথাও সংক্ষেপে বলিতেছি। ১১২৯ সালে মুহম্মদ খিলজী বখতিয়ার খিলজীর পুত্র নবদ্বীপ বিজয় করেন। অষ্টাদশ অখ্যারোহী লইয়া মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী নবদ্বীপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় নাই। “নবদ্বীপ কি কখনও বাঙ্গলার রাজধানী হইয়াছিল? তাহার প্রমাণ কোথায়!” উদগুপুরের সজ্জারাম ভূরঙ্গ সেনারা আক্রমণ করিলে, মুষ্টিমেয় সেনার দ্বারা আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় “অশ্বপতি-গজপতি নরপতি রাজদ্রাঘিপতি বিবিধ বিজা বিচার বাচস্পতি—সেনকুল—কমল-বিকাশ ভাস্কর—সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ—সত্যব্রত গান্ধেয় শরণাগত বজ্র পঙ্কর—পরমেশ্বর পরমভট্টারক—মহারাজাধিরাজ—গৌড়েশ্বর কি তখন যুদ্ধ ব্যবসায় বিন্মত হইয়াছিলেন?

বিনা যুদ্ধে অথবা অল্পায়াসে গোড়মণ্ডলের একমাত্র তোরণ পথ অধিকৃত হইয়াছিল, মুসলমান সেনা গোড়মণ্ডলে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের কুলাঙ্গার পুত্রের বোধ হয় তখন আত্মদ্রোহে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশ স্বধর্ম ও স্বজনের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোড় রামাবতী লক্ষ্মণাবতী কি বিনা যুদ্ধে বিনায়াসে মুসলমানগণের পদানত হইয়াছিল? মুসলমানেরা কি উপায়ে প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল? হিন্দুর ইতিহাস নাই, মুসলমানের ইতিহাস এ বিষয় নীরব।

হিজরা ৬২৪—৬৮১—১২২৬—৮২ এসময়ে

৭ বাঙ্গালার ইতিহাস রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮—২ পৃষ্ঠা, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত “বিক্রমপুরের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ—দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গলা দেশ—গোড়দেশ মুসলমান শাসনাধীনে আসে। তখন রাঢ় ও বরিশা বা বরেন্দ্র দুইটি প্রদেশ গোড়ীয় মুসলমানদের অধিকারে ছিল। সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইউয়েজের পর রাজধানী-লক্ষ্মণাবতীর চারিদিকে যে সমুদয় রাজ্য ছিল, সে সব দেশের রাজারা সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর দিতেন। সুলতান ইউয়েজের পর গোড়মণ্ডল দিল্লীর সম্রাটের শাসনাধীনে আসে। এইভাবে দিল্লীর শাসনকর্তাদের শাসনের পরে—বাঙ্গলার স্বাধীনতা আসিল; বলবনের বংশধরগণের হাতে, তাঁহার ১২৮২ হইতে ১৩১২ পর্যন্ত রাজত্ব করিলেন; তোগলক বংশের শাসনকালে বাঙ্গলাদেশে বিদ্রোহ হইল, ফলে বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন সুলতানগণের শাসনাধীনে আসিল। পূর্ববঙ্গ বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চল স্বাধীন ছিল। ইতিহাসিকেরা বলেন :—“The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahamedans did not comprise the Eastern District. The Bangadesh was still under Bullul's descendants till the end of the 13th century when Sonargaue was occupied by the second son of the Emperor Bulbon. [Blockman's History and Geography of Bengal.]

মুসলমান সুলতানেরা গোড়নগরী বা লক্ষ্মণাবতীতেই

তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে রাজ্যের সর্বত্র মসজিদ, মক্তব ও অস্ত্রাস্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। বাঙ্গলা দেশ অতি সহজেই মুসলমান শাসনাধীনে আসিয়াছিল। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, “Bengal never escaped from the rule of Muhamedans for any considerable time until they were superseded in the eighteenth century by the British, whose victory at Plassey was gained nearly as cheaply as that of Muhamad Khiliji” (History of India by V. A. Smith, Page 221.)

ভাগ্যবান ইংরাজ—বণিক ইংরাজ, অতি সহজেই বাঙ্গলার ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্যে বাঙ্গলা জয় করিলেন। সেই ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ দুইটি ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন :

“সে দিন এ বঙ্গ প্রান্তে পণ্য বিপণির একধারে

নিঃশব্দ চরণ

আনিল বণিক লক্ষ্মী স্তম্ভ পথের অন্ধকারে

রাজসিংহাসন।

বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গাদকে অভিষিক্ত করি

নিচ চুপে চুপে।

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শরীরী

রাজদণ্ড রূপে।”

ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে বলিলাম—দেখা যাইতেছে যে মুসলমানেরা যে দীর্ঘকাল ভারতে রাজত্ব করিল, তাহার মূলে ছিল হিন্দু জাতির অনৈক্য ও ধর্মদ্বেষ—তাহারই ফলে সে চলিয়াছে অবনতির পথে। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে—মাত্র ধর্মে, জ্ঞানে, শক্তিতে যদি উন্নত হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বাধীনতা আসিলেও স্বাধীনতা সে রাখিতে পারে না। আমাদের দেশে বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস ভাল করিয়া সংগ্রহ ও লেখা হয় নাই, লেখা হইলে দেখা যাইত সাধারণের ধর্ম বিশ্বাস, বিবিধ ধর্মসাধন প্রণালী, সামাজিক প্রভেদ, দিনের পর দিন নূতন নূতন আচার ও অনুষ্ঠান পরস্পরকে পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। উদার মন—উদার ভাব পোষণ করা এবং পৃথিবীর সব

মুখ্যক্ৰমেই আপনার করিয়া তোলা কাব্যর কথা, বস্তুতঃ তাহা হয় না। কিন্তু আমাদের সামাজিক ইতিহাস, পূর্ব পূর্ব যুগ হইতেই ক্ষমতাপ্রিয় নৃপতি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভৃতি পুতুল করিয়া রাখিয়াছিল। সুস্থ সবল মানুষ গড়িয়া তুলিবার সাহায্য ধর্ম ও সমাজ করে নাই। তাহারই ফলে বাঙ্গলায় লোকেরা অল্পমত শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।

আমরা ইতিহাস হইতে এই সত্য জানিতে পারি যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দিক হইতেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই হিসাবে উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলিতেই মুসলমানের সংখ্যা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের জনবিবরণী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অল্পপাতে বাঙ্গলা দেশ মুসলমানের সংখ্যাবেশী। আদম স্মারীতে দেখা যায়, নদীয়া, চব্বিশপদগণা প্রভৃতি জেলা অপেক্ষা ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক। অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মুসলমানেরা রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তারপর কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ মুসলমান নৃপতিদের অধিকারভুক্ত হইতে যে অনেকদিন লাগিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যেমন বাঙ্গলাদেশ তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল, তেমনি তাহার উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বৌদ্ধতত্ত্ব অক্ষর ভূখণ্ড অপেক্ষা বাঙ্গলার দ্বারা উত্তর প্রদেশকেই অধিকতর বাসোপযোগী স্থান বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এজন্তই ক্রমশঃ বেগুড়া, মালদহ, রোজধানী গোঁড়ের নিকটবর্তী স্থান (সমূহ) প্রভৃতি স্থানে তাহাদের বসতি বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। একদিকে উপনিবেশ স্থাপন, অতীতকালে ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষগণের উদার মত এবং মুসলমানধর্মের সাম্য নীতি প্রচার মুসলমানাধিকার অত্যন্ত কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মুসলমান ধর্ম প্রচারধর্মী। শ্রীহট্টের মহাপুরুষ সাহজালাল ৩৬০ জন আউলিয়া লইয়া আসিয়া শ্রীহট্টের নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করেন। কেবল শ্রীহট্ট জেলার মধ্যেই তাহাদের প্রভাব

সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; সমগ্র পূর্ববঙ্গে ক্রমশঃ তাহাদের দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের সাহজালালের দ্বারা বিক্রমপুরে পূর্ববঙ্গে বায়া আদম বা বাবা আদম প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণ সহজেই ইসলাম ধর্ম বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ইসলাম ধর্মে নানা প্রকার সাম্য ভাব দেখিয়াও এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সামাজিক নীতি বড়ই অনুকূল, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের অনেকেরই সাংগেই এই ধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তারপর কেবল অধিক পরিমাণে সম্মানোৎপাদন হইলেই যে বংশ বিস্তার হয় এমন নহে, পুষ্টির নিমিত্ত খাদ্যাদিরও প্রাচুর্য চাই এবং তৎকালে নতুন উপনিবেশের স্থানও আবশ্যক। পূর্ববঙ্গে তাহার অপ্রতুল ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে নতুন আবাদের নিমিত্ত ভূমি অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল; কিন্তু পূর্ববঙ্গে জঙ্গল ও চরা ভূমি অধিক। তখন অধিক পরিমাণে অনধিকৃত ছিল। মুসলমানগণ এসকল স্থান অধিকার করিয়া লইতে লাগিল।

উপনিবেশ স্থাপন বিষয়েও মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ পদ্ধতি অনুকূল। প্রথমতঃ বিবাহাদিতে হিন্দুসমাজে যেরূপ বহু বিচার, মুসলমানদের মধ্যে তাহা নাই। নানা অনুকূল অবস্থা ও সাম্যভাব দেখিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান হইলেন। মুসলমান সমাজে মৃত্যু ব্যতীত ক্ষয়ের কারণ ছিল না। কোনও নৈতিক বা সামাজিক অপরাধেও তাহাকে মুসলমান আখ্যা পরিত্যাগ করিতে হয় না। এদিকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে নানা ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান ছিল। কথায় কথায় সামাজিক নির্ঘাতন চলিত। এই সব নানা কারণে পূর্ববঙ্গ, উত্তর বঙ্গ শ্রীহট্ট অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় অল্পমত শ্রেণীর হিন্দুরা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করেন নাই, তিনি নিম্নশ্রেণীর জগৎপবিত্র হরিনামর কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই পূর্ববঙ্গ হিন্দুজাতির অস্তিত্ব এত দিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, নতুবা ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশের দ্বারা মুসলমানের সংখ্যা কালে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত।

পশ্চিমবঙ্গে এইরূপভাবে ইসলাম ধর্মের প্রচার সম্বন্ধে বাধা চট্টয়াছিল, তাহার কারণও ছিল এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন।

এখানে প্রথমতঃ ঢাকার কথা একটু বলিব। ঢাকা সহরের কথাই বলিব, জেলার কথা নহে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার আদমশুমারী হয় নাই, সে সময়ে ঢাকা ও ফরিদপুরের কালেক্টার ছিলেন—মঃ ডগলাস্। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সম্মিলিত জনসংখ্যা ছিল—২,৩৮,৭১২ ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৩,০৭, ১৪৪ জন এবং ৩১০, ৬০৮ জন ছিল স্ত্রী, ১,৭৫,৭৫২ ছিল বালক এবং কন্যার সংখ্যা ছিল ১,৪৫,২০৮ জন। ঢাকা সহরের জন সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিতরূপ :—

হিন্দু	মুসলমান
পুরুষ...১৫,৭৩৫	১৫,৬৮৭
স্ত্রী.....১২,৪১২	১৬,৭৭৬
২৮,১৫৪	৩২,৪৬৩

এই জনসংখ্যার মধ্যে ১৭,৬৭৫ জন ছিল ১৫ বৎসর বয়সের নীচে। ক্রমশঃ কেমন করিয়া মুসলমান জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল সে কথা এখানে বলা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের কথা বলিতে হইলে এই সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ বাঙ্গালার সম্বন্ধে। বাঙ্গালী রাজনৈতিকদের অনেক ভুলের ফলে স্বাধীনতার দান যাহা বাঙ্গালী লাভ করিল তাহা বাঙ্গালার হৃদিশার শোচনীয় কাহিনী। সে

কাহিনী আমরা প্রমাণ প্রয়োগ সহ বলিব। বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্বৃষ্টির অভাব, স্বার্থপরতা, হীনতা, দলাদলি প্রভৃতির দরুণ বাঙ্গালী এই গুরুতর দণ্ড পাইল। এ পাপের মুক্তি তাহার নাই। ইংরাজের রাষ্ট্রশাসন নীতির চাতুর্য্যে বাঙ্গালী হিন্দু আপনাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, হিন্দু-মুসলমানদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হইল বিচ্ছেদের স্রষ্টি। সেই আশুনে পুড়িল হিন্দু—সেই কোশলে মুসলমান অথও ভারতের মর্যাদা তুলিল—ভারতবর্ষের এইরূপ বিভাগ কোন কালে হয় নাই। পাকিস্তান চাহিল, —দুইজাতি সমস্যার কথা তুলিল।

মুসলমান ধর্ম যে যে দেশে প্রচলিত—সে দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়,—মুসলমানদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা, সভ্যতা, সাম্যভাব, উদারতা—অবশ্য নিজসমাজের লোকদের মধ্যে। তাহা হইলেও একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে মুসলমান ধর্ম মানুষকে একরকমের করে, মহামানবজাতি গঠনের সাহায্য করে—হাণ্টার The Indian Musalmans নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু বর্জন করে, করিয়াছে—এখনও করিতেছে। মুসলমান বিদেশী স্বধর্মের মুসলমানকেও আপনাব বলিয়া গ্রহণ করে—কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদেরও এক দেশবাসী হিন্দু শিখ জৈন প্রভৃতির সঙ্গে যোগ নাই—যোগ যে ছিল না এবং নাই তাহা দ্বিখণ্ডিত ভারতই প্রমাণ করিয়াছে।

বাদল দিনে

পিনাকী রঞ্জন কর্ণকার কবি-শ্রী

মেঘের মাদল বাজিয়ে এলো
বর্ষা ধারা রে !
ঝাউয়ের বনে নূপুর বাজে
পাগল পাঁরা রে !
শনু শনিয়ে সজল হাওয়া
বইছে তারি সনে,
বঁশের আগা থর থরিয়ে
কাঁপছে ক্ষণে ক্ষণে !
কিষণ গুলি লাঙ্গল কাঁধে
চলছে সোজা স্রুজি,
ঝড়-বাদলে ভিন্ গোঁয়ারী
পথ পায়না খুঁজি।

দিগন্তে ওই কদম ফুলের
গন্ধ ভেসে যায়,
কাজলা দীঘির ধারে ধারে
ব্যাঙেরা গান গায়।
সূর্যি মামার রাঙা হাসি
লুপ্ত মেঘের তলে,
সবুজ স্বপন জাগলো শুধু
নবীন দুর্বাদলে।
কড় কড়িয়ে মেঘের কোলে
বজ্র দেখি হানে,
শ্রাবণ বুঝি গুড়গুড়িয়ে
বর্ষা সাড়া আনে ॥

‘কালমৃগয়া’

শ্রীজয়দেব রায়, এম, এ।

‘কালমৃগয়া’ রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গীতিনাট্য। বাল্মীকি প্রতিভা’র যাহার সূত্রপাত এবং ‘মায়ার খেলা’র যাহার পূর্ণ-পরিণতি, কালমৃগয়া তাহারই মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। কবি নিজেই তাঁহার জীবিতকালেই ‘কালমৃগয়া’কে বর্জন করিয়াছেন, গানগুলিও অপ্রচলিত থাকায় স্বরসিকগণও এই নাটকের সুরাংশের সহিত কোনদিনই বিশেষ পরিচিত হইতে পাবেন নাই! কিন্তু নানা কারণেই নাটকখানি, বিশেষতঃ গানগুলি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্রমবিকাশে অরলী।

১২৮৭ সালে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ আত্মপ্রকাশ করে; ইহার দুই বৎসর পরে ১২৮৯ সালে ‘কালমৃগয়া’ অভিনীত হইয়াছিল। সূত্ররূপ প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্যের দোষগুলির সম্বন্ধে এই সময়ের মধ্যে তিনি সতর্ক হইতে পারিয়াছিলেন! ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ আমাদের গানের ধারায় নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্যজগতের বিহারীলালের ‘সারদা মঙ্গল’র ভাব ও ভাষার অনুকরণে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র সৃষ্টি বলিয়া কথিতও আছে! কবি নিজেই তাঁহার প্রথম নাটকটির কাব্য সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন; “এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যক্ষেত্রে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য!” পরে সম্পূর্ণ সংশোধিত ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র কালমৃগয়ায় নানা অংশ সংযোজিত হয়!

‘কালমৃগয়া’ নাট্যখানি পরে আর মজ্জিত হয় নাই! আমরা আজকাল যে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ পাই, তাহার সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত নাট্যকার বিশেষ কোনই মিল নাই! কবি জীবনস্মৃতিতে এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—“পরে এই গীতিনাট্যের (কালমৃগয়া) অনেকটা অংশ বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।”

‘বাল্মীকি প্রতিভা’ এবং ‘কালমৃগয়া’ যখন মূলতঃ একই রীতিতে রচিত, তখন কবির প্রথম নাটকটির সম্বন্ধে উক্তিগুলি ‘কালমৃগয়া’র প্রসঙ্গেও উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই

নাটক দুইটির সৃষ্টি সম্বন্ধে কবি তাঁহার ‘জীবন স্মৃতি’তে নানা কথাই বলিয়াছেন। কবির এই নবউন্মেষের যে বিস্তারিত ভূমিকার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ‘জীবনস্মৃতি’ হইতে অনুমান করা যায়।

“আমাদের বাড়ীতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা কবি মারের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। অক্ষয় বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির যুগ্ম আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লণ্ডের একটি পুরাতন মাথালোক সঞ্জন করিয়াছিল। তখন এই কবিতার সুরগুলি শুনি নাই—তাহা আমার কল্পনার মধ্যেই ছিল। এই আইরিশ মেলডীজ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয় বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। আইরিশ মেলডীজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম।”

বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়ে ভারতীয় সঙ্গীত শিখিবার বিশেষ স্বেযোগ ছিল; বহু গুণী ওস্তাদ ব্রাহ্ম সমাজের সূত্রে তাঁহাদের বাড়ীতে গাহিতে আসিতেন! জ্যোতিবিন্দু নাথ এবং অক্ষয় চৌধুরী ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতের বিশেষ উৎসাহী ছিলেন! তবে কবি যে কোনদিনই নিয়মিত গান শিখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না! সুরজ্ঞান ছিল তাঁহার নিজস্ব, জন্মগত; ভারতীয় এবং ইংরাজী উভয় ধারার গানের বিশেষ চর্চা তখন ঠাকুর বাড়ীতে ছিল।

“এই দিশি ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলির অধিকাংশই দিশী। কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্তর্ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চল্য যাহার ব্যবসা তাহাকে মাটিতে দোড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশাকরি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপই নাট্যক্ষেত্রে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের

ইহাই বিশেষত্ব। সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।”

তবে কালমুগয়া অথবা অপার নাটকটির গানগুলিই কবির প্রধান লক্ষ্য নয়, গানগুলির সমাবেশে যে কাহিনীটি রূপ পাইতেছে, তাহাই মুখ্য বিষয়; গানগুলি যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিজেদের স্বভাবগুণেই! অবশ্য নাটকের বাহিরে গানগুলির অধিকাংশেরই বৈশিষ্ট্য নাই! কবির ভাষায়—“বস্তুতঃ, ইহা পাঠাযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নয়। যুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে ইহা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।”

অর্থাৎ কালমুগয়ার কাহিনী যেমন সূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে, গানগুলিও মূলকাহিনীর ধারার উপর প্রবাহিত! এই শ্রেণীর গীতিনাট্যের অভিনয় আমাদের দেশে বহুদিন ধরিয়াই প্রচলিত আছে! আমাদের গ্রাম অঞ্চলের যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী গানের ধারা প্রকৃতি এই প্রকারেরই। কথকতা অথবা পাঁচালীর পালা গানের সঙ্গেই এই গীতিনাট্যের অধিক মিল দেখিতে পাইব। যদি বলা হয় রবীন্দ্রনাথ বাংলার পুরাতন যাত্রাগানের পালার অনুকরণে তাঁহার গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় অত্যাঁহ হইবে না। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিনাট্যে যে দুইটা কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন, যাত্রা গানের পালার মধ্যে তাহারাও রহিয়াছে। অক্ষ মুনির পুত্র হত্যার এই করুণ কাহিনীটি আমাদের যাত্রা থিয়েটারের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল; দলে দলে নরনারী সারারাত্রি জাগিয়া এই পালা শুনিতে আর চোখের জল ফেলিত, পর দিনও সারাদিনের নানা কাজের মাঝে, সংসারের বহু বাদ-বিসংবাদেও সেই মনভার সমানে দুঃখ দিত।

আজ যে ‘রঘুপতি রাঘবের’ নামগানে স্বদূর পল্লীপ্রান্ত হইতে রাষ্ট্রনায়কগণ পূর্ণাঙ্গ গদগদ, তাঁহারই পিতার ঐ দুঃখের স্থিতি পুত্রের সুখের সঙ্গে সঙ্গে বহু যুগ ধরিয়া

নরনারী স্মরণ করিয়া আসিতেছে। তৃষ্ণার্ত অন্ধ পিতার জন্ত জল আনিতে যাইয়া দশরথের অন্ত্রাঘাতে তাপসকুমারের মৃত্যু ইহাই কাহিনীর বিষয়।

এই করুণ কাহিনী নানা রাগরাগিণীর গানের সূত্রে রূপায়িত হইয়াছে; নাটকের পাত্র পাত্রীর বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশের জন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সুর ও ছন্দ অবলম্বন করা হইয়াছে, নাটকের পরিণতি সব সময়ে গানের লক্ষ্য; মূল গল্পটি সুরগুলির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। হৃদয়বেগকে শুদ্ধ কথার বা অভিনয়ের পরিবর্তে সুরে প্রকাশ করা হইয়াছে। কবির কথায়—“হৃৎ স্পন্দনের একটি লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়বেগের সঞ্চার হয়, সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ, রাগ দুঃখ আনন্দ বিষময় আমবা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না—কথার সঙ্গে সুর থাকে, এই কথা বার্তার আনুষঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে।—সাহেবের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল।” ভাবিয়াছিলাম এত মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতার মধ্যে কবিতা এই চেষ্টা আছে। তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ ভাল মান-সঙ্গত রীতিমত সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ, ইহাতে তালের কড়াঙ্কড় বঁধন নাই—একটি লয়ের মাত্রা আছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিষ্কৃত করিয়া তোলা, কোন বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বান্ধীকি প্রতিভার গানের বঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, ভবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাঙ্গিক দৃষ্টি দেখে না। বান্ধীকি প্রতিভার গান সযত্নে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমুগয়া।”

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় গীতিনাট্য ‘মায়ার খেলা’র রীতি পদ্ধতি ‘কাল মুগয়া’ হইতে ভিন্ন প্রকারের। ‘মায়ার খেলা’য়

কাহিনী বিশেষ কিছুই নাই, রবীন্দ্রনাথের গানের ক্রম-বিকাশে ‘মায়া’র খেলা’র গানগুলিই তাঁহার প্রথম সার্থক সৃষ্টি।

“ইহার অনেককাল পরে মায়া’র খেলা বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গতই মুখ্য। বাস্তবিক প্রতিভা ও কালমুগ্ধা যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়া’র খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুতঃ মায়া’র খেলা যখন লিখিয়াছিলাম, তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিযুক্ত হইয়াছিল।”

১৮৮২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তেতলায় ষ্টেজ বাঁধিয়া কবির পরিবারস্থ নবীন নবীনারা কাল মৃগয়ার প্রথম অভিনয় করেন। ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’ নামক সাহিত্য সভার সদস্যগণ কাল মৃগয়ার প্রথম অভিনয় রঙ্গনীতে উপস্থিত ছিলেন।

‘কাল মৃগয়া’ নাটকের সৃষ্টির মূল ছিলেন কবির দাদা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বিলাতী ভঙ্গিমার সুরের দীক্ষা তাঁহার এই দাদার নিকট হইতেই প্রথম পাইয়াছিলেন, বোধ হয় সুর সংযোজনে জ্যোতি ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাও ছিল।

“বাস্তবিক প্রতিভা ও কাল মৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উদ্বেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদী গানগুলিকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট মনন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত।”

সত্যই কবি ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্যে সুরবিপ্লব উপস্থিত

করিয়াছিলেন, গানগুলির প্রত্যেকটিই প্রাচীন রাগিণী অবলম্বনে রচিত; কিন্তু গাহিবার রীতিতে কোনটিই পূর্ব পরিচিত নয়! ভারতীয় রাগিণী, ভাবপ্রকাশক নাটকীয় কথার মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানো যন্ত্রের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ বিলাতী পোষাকে বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন—

“এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম। আমার দুইপার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেশিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুররচনা করিলাম, অমনি ইহারা সেই সুরের সঙ্গে কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইহাদিগকে শুনাইতাম। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অল্পকাল গান তৈরি হইত। সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়া গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।”

জ্যোতিবাবুর উক্তি হইতে সন্দেহ হয়, এই দুইটি নাটকের সুর-সৃষ্টি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের কিনা? শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারেন! অভিনয়ই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন গানের সুরের কৌলিঙ্গ রক্ষার প্রয়োজন কবি স্বীকার করেন নাই। তাই, বাহাকে পাইয়াছেন, তাহাকেই ভাবপ্রকাশে নিয়োগ করিয়াছেন! “এইরূপ একটা দস্তুর-ভাঙা গীতি বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাটক লেখা। এই জ্ঞাত উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরাজি বাংলার বাছবিচার নাই।”

মূল কাহিনীটি রামায়ণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে ক্রম পরিণতি গানের বিষয় সংযুক্ত করিয়া চলিবার ফলে অতিমম্বর হইয়াছে। ‘কালমৃগয়া’র উপর কবিরও বিশেষ মমতা ছিল বলিয়া মনে হয় না, বোধ হয় প্রথম গীতিনাট্যের অল্পকালে সার্থক সৃষ্টি করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইবার ফলেই নাটকটিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলেন! প্রথম দৃষ্টে তপোবনে

ঋষিকুমার ও লীলার কথোপকথন রবীন্দ্রনাথের অন্ত একটা নাটকের কথা স্মরণে আনে। লেখার মধ্যে অপরিপক্বতা হুঃখ দেয়, কাব্যাংশ যে রবীন্দ্রনাথেরই রচিত মনে করিতেও হুঃখ হয়। এই দৃশ্যে চারিটি গান আছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বনদেবীগণের আনন্দ উৎসব, এই দৃশ্যে তিনটি গান। ‘কালমৃগয়া’র এই বনদেবীগণের আগমন নাট্যাংশের উৎকর্ষতার জন্ত নয়, গানের প্রয়োজনেই তাঁহাদিগকে আনয়ন করা হইয়াছে। বিলাতী নাটকে যেমন ‘কোরাস্ গালের’ দল থাকে, কালমৃগয়ার বনদেবীগণের গমনাগমন তাহাদেরই অনুরূপে রচিত। বনদেবীগণ নাটকের সূত্রধার বা ধারারক্ষকের কাজও করিতেছে। এই গীতিভূমিকা রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি বিশেষত্ব, পরবর্তীকালে অতি serious নাটকেও রবীন্দ্রনাথ এই গানের দলকে নানাস্থলে আনিয়াছেন। তৃতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে বেদপাঠ—

অন্তরীক্ষোদরঃ কোশো ভূমি বুধো ন জীর্ঘ্যতি দিশোহস্য
স্রজ যৌ দৌরস্যোত্তরং যিলং স এব কোশো বসুধানন্তশ্মিন।

বিশ্বমিদং শ্রিতং তস্য প্রাচীদিগি কুর্হণাম সহমানা নাম
দক্ষিণ। রাজ্ঞীনাম প্রতীচী স্তভূতা না মোদীচী তাসাং বায়ু
কুংসং স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদন পুত্ররোদং
রোদিতি সৌহহমেতমেব বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা
পুত্ররোদং রুদং ॥

বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে চণ্ডালিকা, নটীর
পূজার বৌদ্ধমন্ত্র পাঠগুলি এই ধারায় সংযোজিত।

চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবীগণ ঋষিকুমারকে সতর্ক করিয়া
দিলেন। পঞ্চম দৃশ্যে শিকারীগণের এবং দশরথের গানে
বীরভাবের উদ্দীপনা প্রকাশ পাইয়াছে; বিদূষকের চরিত্র
চিত্রণের প্রশংসা করা যায় না। প্রচলিত যাত্রার অনুরূপে
এই চিত্র রবীন্দ্র প্রতিভার শোভা পায় না। এই দৃশ্যে
বনদেবীদের গান—

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে (মিশ্রমঙ্গার)

বিদ্যাগতির “এ সুখি হমারি হুঃখের নাহি ওর, ভরা
বাদর মাহ ভাদরের” অনুরূপে রচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও
বিদ্যাগতির এই বিখ্যাত পদটির সুরযোজনে এই সুরটিই
ব্যবহার করিয়াছেন।

তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী থির বিজুরি পাতিয়া।
বিজাপতি কহ কৈছে গোড়ায়বি হরি বিনে দিন-রাতিয়া ॥
কালমৃগয়া’য়—

তিমির দিগ্ভরি ঘোর যামিনী বিপস ঘনছায়া ছাইয়া।

কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে তরাসে প্রাণ ওঠে

কাঁপিয়া ॥

এই গানগুলির মধ্যে কতকগুলির সুর সম্পূর্ণ বিলাতী
গানের সুরের অনুরূপে রচিত। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই
গুলির শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

“কালমৃগয়ার অনেক গানই ইংরাজী বা স্কট ও আয়ারিশ
সুরভাঙা। God where glory waits thee—সুরটি
Tom Moore এর Irish Melodies এর অন্তর্গত।
কবীন্দ্রের জীবনীকারেরা জানেন, তাঁর অল্প বয়সে তাঁদের
দলে মুর-এর কবিতার একসময় খুব চল ছিল। এই গানটির
সুর আমার বড় মিষ্টি ও করুণ লাগে। তাঁরও নিশ্চয় তাই
লেগেছিল, কারণ বাগ্ম্যিক প্রতিভা ও কালমৃগয়া দুই নাটোই
বনদেবীদের করুণ ভাবাত্মক ছুটি গানে এই সুর দিয়াছেন।
আর একটি ধর্ম সঙ্গীতে দিয়েছেন—“ওহে দয়াময়,”—যা
হয়ত এখনকার লোকে তত জানে না। এই সুরটি আমার
তো মোটে বিদেশী লাগে না।”

এই বিলাতী গানগুলির মধ্যে—

প্রথম দৃশ্যের—

“তুই আঘরে কাছে আয়

আমি তোরে সাজিয়ে দি ;

তোর হাতে মুণাল বাল্য,

তোর কানে চাপার ছল।” গানটির মূল

“The British Grenadiers” নামে একটি ইংরাজী গান।

ও, দেখবি রে ভাই আঘরে ছুটে

মোদের বকুল গাছে—গানটির মূল

“Lonely, too Lonely” নামে একটি ইংরাজী গান।

দ্বিতীয় দৃশ্যের—

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা যুহু বায় ;

তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।

পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহ কুহ কুহ গায়,

কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়।

—এই গানটির স্বর একটি স্কটিশ্ গান হইতে লওয়া ;
গানটি “Ye banks and braes of Bonie Doon.”
চতুর্থ দৃশ্যের—

মানা না মানিলি তবুও চলিলি

কি জানি কি ঘটে,

অমঙ্গল হেন, প্রাণে জাগে কেন ;

থেকে থেকে যেন, প্রাণ কেঁদে ওঠে ।

গানটি টমাস মুরের বিখ্যাত আইরিশ গান “Go where
glory waits thee”র স্বর ! শেষ দৃশ্যের—

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়

কোথা সে লুকাল, কোথা সে হায় ! গানটির মূল
Robin Adair ! দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ঠিক এই গানগুলির
অল্পরূপেই স্বর রচনা করিয়াছিলেন ।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী আরও বলিতেছেন—“কবি প্রথম
জীবনে বিলাত প্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তাই
তাঁর প্রথমদিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলাতী প্রভাব
লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক । যথা, “বান্ধাকি প্রতিভায় ও
কালমুগয়ায় । “কালী কালী কালী বল রে আজ” নামক
ভাকাতদের কালী বন্দনার স্বর একেবারে সশরীরে একটি
ইংরেজী গান থেকে তোলা, সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee
এবং তাতে একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান
করছেন ।”

‘কালমুগয়া’র লৌকিক রীতির কোনই গান নাই,
পঞ্চমদৃশ্যে বিদূষক এবং শিকারীগণের কথোপকথনের গানে
কৌতুকরস পরিবেশনের জন্য কঠে অতিরিক্ত Dramatic
ভাব আনিবার চেষ্টা হইয়াছে ;—

দেশ ; থেমটা—প্রাণ নিয়ে ত সটকেছি রে

(ওরে বরা) করবি এখন কি ?

শঙ্করা—ঠাকুর মশায়, দেরি না সয়

তোমার আশায়, সবাই ব’সে ।

মিশ্র সিদ্ধু—বাঃ বেঁচেছি এখন

শ্রদ্ধা ওদিকে আর নন ।

শিকারীদিগের গানে বীররস উদ্দীপক স্বর ব্যবহৃত
হইয়াছে । ইমন কল্যাণে ‘বনে বনে সবে মিলে চল হো !
চল হো,’ বাহারে ‘গহনে গহনে যারে তোরা’ ; অহংসে

“চল, চল যাই”, মিশ্রসিদ্ধিতে “এনেছি মোরা এনেছি মোরা”
বেশ জোরালো গান ! করুণ স্বরের গানের মধ্যে পঞ্চমদৃশ্যে
‘থটে’র স্বরে “কি দোষ করেছি তোমার” এবং শেষদৃশ্যের
সব-কয়টির গানের স্বরই করুণ অল্পভূতির গান ।

উল্লাসের স্বরে বনদেবীগণের দুইটি গানের উল্লেখ করিতে
হয়—মল্লারে “আয়লো সজনি, সবে মিলে” এবং ছায়ানটে
“নেহার’লো সহচরি, কানন আধার করি ।”

অতি গম্ভীর Serious ভাব প্রকাশ করিবার জন্য দুইটি
গান ব্যবহৃত হইয়াছে । চতুর্থ দৃশ্যের গৌড়মল্লারে “সবন
ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া”

‘স্তিমিত দশ দিশি, স্তম্ভিত কানন ।’ (কাওয়ালী) এবং
শেষ দৃশ্যে ‘যাও রে অনন্ত ধামে, মায়া মোহ পাসরি’
(প্রভাতী) ।

‘কাল মুগয়া’ এই গানগুলি ‘বান্ধাকি প্রতিভা’র
সংশোধিত সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে ।

রিম্ রিম্ ঘন ঘন রে বরষে (মল্লার)

এই বেলা সবে মিলে চলহো (ইমন কল্যাণ)

গহনে গহনে যারে তোরা (বাহার)

চল চল ভাই, তরা করে মোরা (অহং)

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে (মিশ্র মল্লার)

প্রাণ নিয়ে ত সটকেছি রে (দেশ)

আঃ, বেঁচেছি এখন (মিশ্র সিদ্ধু)

এনেছি মোরা এনেছি মোরা (মিশ্র বি’বিটি)

সুন্দর গান অনেকগুলি বর্জিত হইয়াছে ।

স্বরের ব্যবহারে অধিকাংশ গানেই মিশ্র রাগিণী অবলম্বন
করা হইয়াছে । মিশ্র খান্ধাজ, মিশ্র সিদ্ধু, মিশ্র ভূপালী,
মিশ্র কেদারা এবং শ্রিশ্র মল্লার অনেকগুলি গানেই আছে ।
রবাজ্ঞানাথ এই শৈশব হইতেই যে মিশ্র রাগিণীর পক্ষপাতী
ছিলেন তাঁহার নিজস্ব স্বর সৃষ্টির ইঙ্গিত তাহাই নির্দেশ
করে । একটি গানের উল্লেখ করি—“সমুখেতে বহিছে
তটিনী ।”—গানটিতে সিদ্ধু এবং বি’বিটি উভয় রাগিণী
ব্যবহার করা হইয়াছে, তবে সিদ্ধুর প্রভাবই বেশি । বি’বিটি
এবং খান্ধাজের মিশ্রণ হইয়াছে—“আমার প্রাণ যে ব্যাকুল
হয়েছে” এবং “সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়” গানে । অচলিত

মধ্যে ‘রাজ বিজয়ী’ এবং ‘গারা ভৈরবী’তে কাল যুগয়ায় দুইটি গান আছে।

কি ঘোর নিশীথে, নীরব ধরা (গারা ভৈরবী)

অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা, তাত ধরি চরণে (রাজবিজয়ী)

গানের ছন্দের (তালের) ক্ষেত্রে নাটকীয় অবস্থা অনুসারে দ্রুত অথবা বিলম্বিত উভয়ই ব্যবহার করা হইয়াছে। একমাত্র পঞ্চম দৃশ্যের climax ব্যতীত নাটকের অস্তিত্ব অংশের ‘লয়’ একরূপ ‘চিমা’ই। রবীন্দ্র সঙ্গীতে অপ্রচলিত ছন্দ দুই একটি ‘কাল যুগয়া’য় আছে, যেমন

আধবা—

নেহার,লো সহচরী কানন আঁধার করি

পৌনে চার মাত্রায় পোস্ত

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে

আট মাত্রায় মধ্যমান

আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে

‘কাল যুগয়া’র গানগুলির স্বরলিপি করিয়াছিলেন স্বর্গীয়

প্রতিভা দেবী। ১২২২ সালের ‘বালক’ মাসিক পত্রিকায় স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হয়। আজ গানগুলির অধিকাংশের স্বর বিস্মৃত। রবীন্দ্র সঙ্গীতের অমূল্যগৌণ যদি মাঝে মাঝে গানগুলি গাইতে পারেন, তাহা হইলে হয়ত এইগুলির উদ্ধার সম্ভব হয়। তবে সে যুগ আর নাই, আমাদের মনের গতিও পরিবর্তিত হইতেছে। সময় চলিয়া গিয়াছে—“তখন আমার বয়স অল্প, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লাস্তি বা বাধামাত্র ছিল না;—তখন বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত স্বরনা বরিয়া তাহার নীকর বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নব-যৌবন নব নব উত্তম নূতন নূতন কোতুহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিষই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুর ভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেইকুড়ি বছরের বয়সটাকে এমন করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি।”

ফুল ফুটেবে

শ্রীদীপ্তি দেবী

একটি অন্ধকার গলির ভিতর একখানি ছোট-ঘর। “ঘর” বলে এর পদমর্যাদাটা একটু বেশী বাড়ান হয়। একে একটি পায়রার খোপ বলে বর্ণনাটা অতিরঞ্জিত হয় না। ষা-হ’ক এই ঘরের একটি কোণে একখানা তক্তপোতের উপর শুয়ে ছিলেন একজন বৃদ্ধ। বৃদ্ধের শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল একটি সুন্দরী তরুণী। বৃদ্ধ মেয়েটির দিকে চেয়ে বলেন—“অনিন্দিতা মা, আজ তো আমার পেনসনের টাকা আনবার দিন। কিন্তু এই পা নিয়ে কি করে যাই বল দিকি।” বৃদ্ধ তাঁর ব্যাণ্ডেজ করা পায়ের দিকে চাইলেন। মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল—“সে কি করে হ’বোদাছ? ঐ পা নিয়ে তোমাকে এক

পাও নড়তে দেব না—”বৃদ্ধ হেসে বলেন—“তা’তো মানি মা, তুমি আমাকে পা নাড়াতেই দিচ্ছ না তা আর ট্রামে চড়তে দেবে কি? কিন্তু টাকা কটা তো আনা চাই?” মেয়েটি হেসে বলল—“তার জন্ত ভাবছ কেন দাছ? আমার পা তো ভাঙে নি? তুমি একখানা চিঠি লিখে দাও, আমি সেটা নিয়ে অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসছি।” মেয়েটির যে হাতখানা বৃদ্ধের কপালের উপর ছিল তার উপর একটু হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ বললেন—“অফিস খুঁজে পাবে মা?” মেয়েটি আবার হেসে বলল—“রোজ স্কুলে যাবার পথে মস্ত বড় প্রকাণ্ডখানা দেখি—“নদীয়া লাইফ ইনসুর্যান্স কোম্পানী”, তা’ও আবার চিনে নিতে শক্ত

হ'বে?" বুদ্ধ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস, ফেলে বলেন—“তবে তাই যাও মা, টাকা কষ্ট নিয়ে এস! এই পায়ের জন্ত লিলিমেন্ট তুলা, ইত্যাদি কত কি কিনতে হচ্ছে। ঐ টাকা ক'টা পেলে তাই থেকেই কেনা কাটা করতে পারবে—” বাধা দিয়ে মেয়েটি বল—“ওর জন্ত ভাবছ কেন দাছ? আমি এখনই তোমার টাকা এনে দিচ্ছি, তুমি একটা চিঠি লিখে দাও।” বুদ্ধ কোন রকমে উঠে বসে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিখানা অনিন্দিতা হাত ব্যাগের ভিতর তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

প্রকাণ্ড বড় আপিস। ঘরে ঘরে কেরানীরা টাইপ রাইটার সামনে নিয়ে টক্ টক্ করে টাইপ করে যাচ্ছে। অনিন্দিতা যাকৈই চিঠি দেখায় সেই বলে—“এ ডিপার্টমেন্ট নয়, অগ্র ডিপার্টমেন্টে যান”—শেষে বিরক্ত হয়ে অনিন্দিতা একজন বেয়ারাকে বল তাকে বড় সাহেবের ঘরে পৌঁছে দিতে। বড় সাহেবের ঘরের সামনে তাঁর চাপরাশী দাঁড়িয়েছিল। সে একটা স্লিপ কাগজে অনিন্দিতার নাম ও প্রয়োজন লিখে দিতে বল। অনিন্দিতা তার দাছর চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বল—“চিঠিটা সা'ব কো দেখ্‌লাও।” চাপরাশী চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল। একটু পরে বেরিয়ে এসে বল—“আপু ভিতর যাইয়ে।” অনিন্দিতা হুইং ডোর ঠেলে বড় সাহেবের কামরায় প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে অনিন্দিতা দেখে বড় সাহেবের চেয়ারে বসে মাথা নীচু করে একটা কাগজ দেখছেন একজন যুবক। অনিন্দিতা টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতে যুবকটি মাথা তুলে তার দিকে চাইলেন। কিন্তু চোখ সঙ্গ না মালেন না। চেয়েই রইলেন। অনিন্দিতা মনে মনে অশোয়স্তি বোধ করতে লাগল। এ কোথায় তা'কে চাপরাশী এনে ফেল? সে তো চেয়েছিল দেখা করতে বড় সাহেবের সঙ্গে। অনিন্দিতার মনের অবস্থা বোধ হয় তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। যুবকটি এবার চোখ নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অনিন্দিতাকে বসবার হুঁত্রে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। অনিন্দিতা বসলে পর যুবকটি নিজের চেয়ারে বসল। অনিন্দিতার দাছর চিঠিখানা তুলে নিয়ে, তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বল—“বিপিনচন্দ্র সেন আপনাকে কেন হন?” অনিন্দিতা সংক্ষেপে

বল—“দাছ হ'ন।” যুবকটি আবার চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল—“বিপিন বাবু লিখেছেন—“শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জীর হাতে টাকাটা দিতে। আপনি কি শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জী?” অনিন্দিতা শুধু বল—“হ্যাঁ।” যুবকটি আর একবার ভাল করে চাইল অনিন্দিতার দিকে। তারপর বল—“আপনি দেখছি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু বিপিন বাবু বোধ হয় বৈষ্ণব কিম্বা কায়স্থ। উনি তবে কি করে আপনার দাছ হলেন?” অনিন্দিতার রাগ হ'ল। এত প্রশ্ন করবার মানে কি? একবার ইচ্ছা হল বলতে—“এত Cross Examination এর দরকার আছে কি? আপনি কি মনে করেন আমি জুয়াচোর?” কিন্তু একজন অজানা পুরুষ মাছবের সামনে রাগ দেখান অভদ্রতা হ'বে মনে করে সে বলে—“বিপিন বাবু গ্রাম সম্পর্কে আমার বাবার খুড় ছিলেন, তাই আমি ওঁকে ‘দাছ’ বলে ডাকি।” অনিন্দিতা মনে করল লোকটির বোধ হয় প্রশ্ন করা এবার শেষ হ'ল। কিন্তু যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল—“অনেক প্রশ্ন করছি বলে কিছু মনে করবেন না। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে এমন অভদ্রভাবে আপনাকে জেরা করতাম না।” অনিন্দিতা মনে মনে বল—“এতক্ষণে নিজের অভদ্র আচরণটির দিকে নজর পড়েছে?” কিন্তু মুখে সে বল—“আপনি আর কি জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন? একটা নয়, দু'টো নয়, কুড়ি কুড়িটা টাকা, সেটা কি এক কথায় ছেড়ে দেওয়া চলে?” যুবকটি অনিন্দিতার দিকে চাইল, তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মোছবার ভান করে ঠোঁটের হাসিটা চাপা দিল। কিন্তু চোখের হাসিখানা ঢাকতে পারল না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বল—“আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। শুধু টাকার জন্ত প্রশ্ন করছি না। আমি অগ্র কারণে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। যদি শেষ পর্যন্ত অকারণ হয় তবে সবিনয়ে মার্জনা চাইব।” অনিন্দিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল যুবকের দিকে। যুবকটি গলা খাঁকড়িয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—“আপনার মা বাবার মধ্যে কেউ কি বেঁচে আছেন?” অনিন্দিতার ছোট্ট উত্তর এল “না।” “আচ্ছা, আপনার মা কোন গ্রামের মেয়ে ছিলেন বোলতে পারেন কি?” জিজ্ঞাসা করল যুবকটি।

অনিন্দিতা পরিষ্কার গলায় উত্তর করল—“নদে জেলার “বাঘমারা” গ্রামের মেয়ে ছিলেন আমার মা।” যুবকের মুখের ভাব বদলিয়ে গেল। হঠাৎ সে যেন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। প্রকাণ্ড বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ডান দিকের শেষ ড্রয়ারটা টেনে একটা কাগজের বাঙালি বার করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর আবার অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বলল—“আপনার দাদামশাইয়ের নাম বলতে পারবেন?” অনিন্দিতা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—“জমিদার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার মাতামহ।” অনিন্দিতার উত্তর শেষ হ’তে না হ’তে যুবকটি বলল—“আমিও তাই মনে করেছিলাম।” এইবার সেই কাগজের ভাড়ার ভিতর থেকে একখানা পুরান ফোটোগ্রাফ বার করে অনিন্দিতার সামনে রেখে বলল—“এই ছবির লোকদের আপনি চিন্তে পারছেন?” অনিন্দিতা একবার ছবির দিকে চাইল, তারপর চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল—“এ ছবি আপনি কোথা থেকে পেলেন?” যুবকটি হেসে বলল—“ছবির লোকদের আগে চিনিই দিন তারপর বলছি।” ছবির মধ্যে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর দিকে দেখিয়ে বলল অনিন্দিতা—“এই ভদ্রলোক হলেন—উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার মাতামহ। ভদ্রলোকের ডান পাশে যে মহিলাটি আছেন তিনি হলেন আমার মার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী—হেমাদ্বিনী দেবী। বা পাশে যে মহিলাটি আছেন তিনি আমার মা—স্বর্গীয়। খেতাদ্বিনী দেবী। পিছনে যে ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হলেন আমার মার একমাত্র ভ্রাতা বিনোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।” অনিন্দিতার কথা শেষ হ’তে না হ’তে যুবকটি বলল—“বিনোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আমার বাবা ও তোমার মামা, অনিন্দিতা।” অনিন্দিতা অবাক হয়ে যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুই বলতে পারল না। যুবকটি ফের একবার গলা সাফ করে নিয়ে বলল—“আমার নাম স্বরেশচন্দ্র। আমি তোমার দাদা। আমার বাবাই এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্প্রতি স্বর্গলাভ করায় আমিই এই অফিসের ‘বড় সাহেব’ হয়েছি।” স্বরেশ হেসে চাইল অনিন্দিতার দিকে। অনিন্দিতা এইবার আস্তে আস্তে উঠে স্বরেশকে প্রণাম করবার জন্ত নত হ’ল। স্বরেশ “থাক থাক” বলে অনিন্দিতাকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল—“ঠাকুদার অমতে ছোট পিসিমা একজন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী যুবককে বিবাহ করার জন্ত তিনি তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু মারা যাবার সময় তিনি অল্পতপ্ত হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পিসিমা ও পিশেমশাইয়ের কোন খোঁজ খবর কেউ দিতে পারে নি। শেষে তিনি মারা যাবার সময় তোমাদের খুঁজে বার করবার ভার আমার উপর দিয়ে যান। আমি একটা সন্ধান পেয়ে এক যায়গায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে অস্ত্রাস্ত্র ভাড়াটেদের মুখে শুনলাম যে বাড়ী ভাড়ার টাকা না দিতে পারার দরুণ বাড়ীওয়ালার তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই শুনে আমার কি কষ্ট হয়েছিল বলতে পারি না। আমি তোমাদের খুঁজে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। শেষে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা পেলাম তোমার।” একটু থেমে ফের বলল স্বরেশ “তোমার সঙ্গে পিসিমার এত আদল আছে যে আমি তোমার মুখের উপর থেকে চোখ সরাতো পারিনি। ঠিক মনে হ’ল ছবির পিসিমা যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।” একটু হেসে অনিন্দিতা বলল—“হ্যাঁ, সকলেই বলে আমায় ঠিক আমার মার মত দেখতে।” “আমাকে অমন হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে তুমি বোধ হয় মনে মনে ভাবছিলে—এ কোথাকার জ্ঞানোয়ার। না, অন্ততঃ তোমার মুখের ভাব তো ঐ রকমই হয়েছিল।” বলে হাসতে লাগল স্বরেশ। অনিন্দিতাও হেসে বলল—“ঐ রকম একটা কিছু ভেবে-ছিলাম।” এবার হু’জনেই হাসল। তারপর স্বরেশ বলল—“আচ্ছা, তোমার দাদু তো মাত্র এই কুড়িটা টাকা পান, এতে তোমাদের হু’জনের চলে?” একটা নিখাস ফেলে বলল অনিন্দিতা—“মার চিকিৎসা করাতে বাবার যা কিছু ছিল সব চলে যায়। বাবা মারা যাবার পর বোলতে গেলে দাদুর ঐ ২০ টাকাই ছিল আমাদের সম্বল। অবশ্য এখন আমি স্কুলে কাজ করি। আমার মাইনের ৫০ টাকা আর দাদুর এই পেন্সনের টাকাতে আমাদের চলে যায় এক রকম করে।” তারপর একটা স্নান হাসি হেসে বলল—“অন্ততঃ বাড়ী ভাড়া বাকি পড়ার দরুণ বাড়ীওয়ালার আঁতড়াতে পারে না। খেতে পাই না পাই ১০টি টাকা বাড়ীওয়ালার হাতে আগে তুলে দিই—” এবার স্বরেশ একটা নিখাস ফেলে বলল—“তোমার মার নামে লক্ষ টাকা জমা আছে। স্বদে আসলে সে টাকা এখন আরও বেড়ে গিয়েছে—অথচ তুমি কত কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছ।” তারপর দাঁড়িয়ে উঠে স্বরেশ বলল—“চল, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই। আমারত মা বাবা কেউই জীবিত নেই; তবে আমার বড় পিসিমা—তোমার মাসিমা—হেমাদ্বিনী দেবীই

এখন আমার সংসারের গৃহিণী। তিনি তোমায় দেখে যারপরনাই আনন্দিত হ'বেন।" "দাছ?" ধীরে ধীরে বল্ল অনিন্দিতা। হেসে বল্ল স্বরেশ—"দাত্তর জন্ত ভেব না। তার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

হেমাঙ্গিনী দেবী তখন সব মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করছিলেন, এমন সময় স্বরেশ হৈকে বল্ল—"বড় পিসিমা, দেখ কে এসেছে?" স্বরেশের গলা শুনে হেমাঙ্গিনী দেবী নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। তারপর তিনি চেয়ে দেখলেন অনিন্দিতার দিকে। ধীরে ধীরে বল্লেন—"খেতা!" স্বরেশ হেসে বল্ল—"না, পিসিমা, এ তোমার বোন নয়, তোমার বোনের মেয়ে অনিন্দিতা—" স্বরেশের কথা শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনী দেবী এসে পড়েছিলেন অনিন্দিতার কাছে। অনিন্দিতা এবার নত হয়ে তাঁর পায়ে ধলা মাথায় নিল। হেমাঙ্গিনী দেবী তাকে বুকে টেনে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্লেন—"আমার ১১ বছরের মেয়ে অনিন্দিতা যখন মারা যায়, খেতা বলেছিল—"দিদি, আমার যদি কোন দিন মেয়ে হয় তখন তার নাম রাখব অনিন্দিতা।" ও তখন তোমারই অনিন্দিতা হয়ে থাকবে—" তারপর অনিন্দিতার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্লেন—"চোখের জল ফেলে খেতা যখন বাড়ী থেকে চলে গেল তখন আমার বুক একেবারে ফেটে গিয়েছিল। নারায়ণ এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।" তারপর স্বরেশের দিকে চেয়ে বল্লেন—"কি করে একে খুঁজে পেলি স্বরেশ?" স্বরেশ বল্ল—"সে অনেক কথা। পরে তুমি শুন অনিন্দিতার কাছ থেকে। আমি চল্লম অফিসে।"

অনিন্দিতা স্বরেশের সংসারে বেশ গুছিয়ে বসেছে। মাসিমার হারান মেয়ের স্থান পূর্ণ করেছে সে। অনেক দিন পরে সে মায়ের মত আবার যত্ন পেয়ে কৃতার্থ হ'ল। স্বরেশের ভাই বোন কেউ ছিল না। সে বরাবর একটি বোনের অভাব বোধ করত। অনিন্দিতাকে পেয়ে তারও সে অভাব ঘুচল। অনিন্দিতা কিন্তু বড় লোকের আদরের বোন হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। সে চাইল তার স্কুলের চাকরী বজায় রাখতে। স্বরেশ ও হেমাঙ্গিনী দেবী ঘোরতর আপত্তি তুলেন। ভেবে ঠিক হ'ল স্বরেশের বাবা অনিন্দিতার মার নামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করে গিয়েছেন সেই "খেতাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ের" সেক্রেটারীর পদ নেবে অনিন্দিতা। সে প্রাণ ঢেলে খাটিতে লাগল এই স্কুলের জন্তে। প্রতিদিন সে নিজে স্কুলে যেত। তার উপস্থিতির দরুণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী চাকর বাকর সকলেই সজাগ থাকত। কেউ আর কীকি

দেবার সুযোগ পেত না। দেখতে দেখতে অনেক দিক দিয়ে স্কুলের উন্নতি হতে লাগল। ছাত্রী সংখ্যা বাড়ল। স্কুলে স্বশাসন দেখা দিল। পড়া শোনার উন্নতি বেশ দ্রুত গতিতেই হতে লাগল। তরুণীকে প্রাথমিক দিয়ে কাজ করতে দেখে স্কুলের সব কর্মীরাই অল্পপ্রাণিত হয়ে স্কুলের জন্তে সখাসাধ্য করতে চেষ্টা করল। অনিন্দিতাকে এ ভাবে স্কুলে ডুবে থাকতে দেখে তার মাসিমা কিন্তু সম্মত হ'তে পারেন নি। তিনি আড়ালে স্বরেশকে বল্লেন—"বাবা, তুই কি এটা ভাল করলি? অনিন্দিতাকে এ স্কুলের কাজে মাতিয়ে দিলি, এখন ও কি আর বিয়ে খাওয়া করতে চাইবে?" স্বরেশ গম্ভীর হয়ে বল্ল—"খাচ্ পিসিমা, ও সব বিয়ে খাওয়াতে কাজ নেই? ওর নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে তো করবে নয় তো নাই করবে। ওর মার যা—" স্বরেশের কথা শেষ হ'বার আগেই ওর পিসিমা বল্লেন—"খাচ্ বাবা, যা বলেছ। বিয়ে খাওয়া সম্বন্ধে কোন জোর করে কাজ নেই।"

অনিন্দিতার হাব ভাব দেখে মাসিমা বুঝলেন জামাই দেখা নেই তাঁর ভাগ্যে। একদিন তিনি বল্লেন স্বরেশকে—"বোনটি তো তোমার বিয়ে খাওয়া করবে বলে মনে হয় না। নিজেও যে একটা বৌ আনবে ঘরে তারও তো কোন চেষ্টা দেখি না। আমি মেয়ে খোঁজা খুঁজি করতে গেলেই তুমি আমায় থামিয়ে দাও। আর কতদিন তোমার এই সংসার আগুনিয় খাচ্? দেশের বাড়ী ঘর দোর সব খাচ্ করছে। গ্রামের খোলা আলো বাতাসের জন্ত আমারও প্রাণটা হ হ করছে। আমায় এবার দাও পাঠিয়ে দেশে।" স্বরেশ হেসে বল্ল—"বউ ঘরে আসুক আর নাই আসুক, জাপানীরা বুঝি এল ঘরে। গ্রামেই বোধ হয় ফিরতে হ'বে সবাইকে।" পিসিমা আহলাদিত হয়ে বল্লেন—"বাবি বাবা দেশে? এই কোলকাতার মায় কাটিয়ে দেশে গিয়ে থাকবি তোরা?" স্বরেশ আবার হেসে বল্ল—"কোলকাতার মায় কাটাতে পারি আর নাই পারি; জাপানীদের তো আর মাথায় করে রাখতে পারি না? যুদ্ধের গতি যে রুকম দেখছি কোন দিন হুড়মুড় করে না তারা যাড়ে এসে পড়ে।" পিসিমা ভীত হয়ে বল্লেন—"তাই নাকি? তবে চল বাবা সবাই মিলে দেশে ফিরে যাই। যদি তারা আসে আমাদের ধরতে, তবে অনিন্দিতাকে নিয়ে আমি জহরত্নত রুবব বলে রাখলাম—" পুনরায় হেসে বল্ল স্বরেশ—"অত তাড়াতাড়ি নয় পিসিমা, একটু ভেবে দেখি। যদি সিদ্ধাপুর জাপানীরা দখল করে তবে তোমাকে আর অনিন্দিতাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।"

শিক্ষা দেবার নানা ধারা

শ্রীআরতি দত্ত

(বিদেশী পত্রিকা হইতে)

তখন আমার বয়স বছর বারো হবে। একদিন আমার মা আমার উপর আমার নিজের ও বাবার ছপুয়ের খাবার তৈরী ও দেবার ভার দিয়ে বাইরে গেলেন। বাবাকে খুশী করার জন্তে ঘর সাজানো, টেবিল সাজানো ইত্যাদি কাজে এত সময় গেল যে রান্নার সময় আর বিশেষ রইলো না। ফলে বাবার যখন আসার সময় হলো, তখন টেবিলের উপর সুন্দর করে ফুল সাজানো রয়েছে, প্লেট, ছুরি, কাঁটা প্রভৃতি পরিপাটি ভাবে গোছানো আছে, কিন্তু খাবার তৈরী হতে তখনও বহু দেরী।

এমন সময় তাড়াতাড়িতে আমার হাত থেকে মাছ ও তরকারি ভর্তি পাত্রটা উল্টে পড়ে সব কিছু রান্নাঘরের মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়লো। দুঃখে, লজ্জায়, হতাশায় তখন আমার চোখ জলে ভরে উঠেছে। বাবাও এমন সময় এসে পড়লেন। ঘরে ঢুকেই তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ও হেসে আমাকে সাব্বনা দিয়ে বললেন, “ব্যস্ত হয়ে না তুমি, আমরা দুজনে মিলে এখনি সব ঠিক করে ফেলবো; রান্নার চেয়েও দরকারী কাজ তো তুমি করে রেখেছো। খাবারের চেয়ে টেবিলের উপরের স্বগন্ধি গোলাপ ফুলগুলির মূল্য কিছু কম নয়।”

আমরা ফুলসাজানো টেবিলে বসে রুট আর ফল খেললাম, কিন্তু সেই বয়সেও বাবার প্রশংসার ফলে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম সে যা কর্তব্য তার চেয়েও বেশী কিছু আন্তরিকতার সঙ্গে করার মূল্য আছে।

আমার স্বামী আইনের অধ্যাপক। তিনি আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া কমাবার জন্ত একটি অভিনব উপায় বের করেছেন, যার ফল সত্যি আশ্চর্য্যরকম কার্য্যকরী হয়েছে।

আদালতে যেমন বাদী তার অভিযোগ লিখে জানায় ও প্রতিবাদী তার উত্তর লিখে পেশ করে ও উভয়ের

আলোচনার শেষে বিচার হয়, ঠিক তেমনি ভাবে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কোন ঝগড়া হলে তারাও নিজের নিজের অভিযোগ কাগজে লিখে রাখে ও আমার স্বামী রাত্রিতে বাড়ী ফিরলে তারা জানায় যে কে সে রাত্রিরে বিচারপ্রার্থী। খাওয়ার পরে আমার স্বামী প্রত্যেককে তার অভিযোগ পড়ে শোনাতে বলেন ও পরে তার উত্তর শোনেন ও সবশেষে নিজের রায় দেন। এর ফল আশ্চর্য্য রকম হয়েছে। অভিযোগ ও তার উত্তর ভালভাবে তৈরী করা ও লেখা নিয়ে তারা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে ঘটকণ্ণে বিচার শেষ হয়, ততক্ষণে তাদের আর রাগ থাকে না। আমার অনেক সময় অভিযোগ লিখতে গিয়ে তারা নিজেরাই দেখে যে ঝগড়ার বিষয় এতই তুচ্ছ যে তা নিয়ে বিচারপ্রার্থী হয়ে বাবার সময় নষ্ট করা চলে না। এইভাবে তাদের মধ্য থেকে ঝগড়ার ভাব সম্পূর্ণ ভাবেই চলে গেছে।

আমরা তিন ভাই ছিলাম। আমাদের বয়সের তফাৎ ছিল মোটে এক বছর করে। আমরা প্রায়ই নিজেরদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি করতাম। আমাদের মা বলতেন, “কখনও রাগ নিয়ে ঘুমতে নেই।” তিনি আমাদের ঘরে একটা ছোট “ব্ল্যাক বোর্ড” রেখে দিলেন ও তাতে আমাদের মনের কথা লিখে রাখতে বললেন যা আমরা একজন আর একজনকে মুখে বলতে চাই না বা পারি না।

এণ্ডির হয়তো রেমণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। ছেলে-মাল্লুখী গর্কের ফলে কেউ কারুর কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু ঘুমোবার আগে একজন হয়ত লিখে রাখলো, “আমি দুঃখিত” বা “হঠাৎ মেজাজ খারাপ করেছি বলে ক্ষমা করো” অথবা একজনের আরেক জনের প্রতি ভালবাসার কথা। এর ফলে আমরা তিনজনেই অনেকটা মানসিক শান্তি পেতাম ও আমাদের মধ্যে কলহের ভাব কমে গেল।

প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। এমন সময় এগারো বছরের খোকার হাতে কালির বোতল উল্টে গেলো। সে চোঁচাতে শুরু করলো, “দেখো মা, কি হয়েছে। কি করি আমি? তাড়াতাড়ি এসো। কোথায় কাপড় পাই, কাউকে বলো মেঝে মুছে দিতে। দেখোনা, আমার সার্টটার কি দশা হয়েছে ইত্যাদি।” খোকার চোঁচামিচি শুনে ভদ্রমহিলা গল্প করার আশা ছেড়ে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

দ্বৈধের সঙ্গে মা খোকােকে পরিকার করে দিয়ে তাকে বললেন, “কালির দাগ ভঠার ব্যবস্থা তো করে দিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।” তারপর মা তাকে বুঝিয়ে বললেন যে কোন ঘটনার জন্য তা যত অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিকই হোক না কেন, এ রকম গোলমালের সৃষ্টি করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। ভুল সংশোধন করে নিতে হয় নিঃশব্দে, তারপরে তিনি বললেন, “আচ্ছা, শিগ্ৰি একদিন তোমাকে আমি পরীক্ষা করে দেখবো যে তুমি আমার কথা মেনে চলো কিনা।”

পরের সপ্তাহে, তখন খাবার ঘর মেরামত হচ্ছিল, তাই রান্নাঘরের টেবিলে সবাই খেতে বসেছে রান্ধিরে। কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে সবাই সেদিন ভাল কাপড় পরেছে; খোকা চেয়ারে বসেই সোজা হয়ে গেল। তার চেয়ারে জল ঢালা রয়েছে। প্রার্থনার শেষে চোখ তুলতেই সে তার মায়ের হাসিমুখ দেখতে পেলো। সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে শাস্তভাবে বললো, “আমি এখন আসছি।” অল্প সন্ধ্যার খাওয়া চলতে লাগলো। খোকা তার পরীক্ষা পাশ করেছে।

আমি বড় অগোছালো ছিলাম। আমার কোন জিনিষ কখনও আমি পরিকার করে গুছিয়ে রাখতাম না। আমার যখন তেরো বছর বয়স, তখন আমার এক বন্ধু একদিন আমাকে একটা কুকুর বাচ্চা দিতে চাইলো। মা কিন্তু কিছুতেই আমাকে নিতে দিলেন না, বললেন এত কাজের উপর আবার কুকুর দেখা শোনার দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না।

আমি খুবই নিরাশ ছিলাম। সেদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে দেখলাম আমার বালিশের তলায় বাবার হাতে লেখা একটা ছোট চিঠি রয়েছে; কিন্তু নাম নই করা আছে ‘পপি’ বলে। তাতে লেখা ছিল, “আমি তোমাকে দেখতে এসেছিলাম আজ। তোমার স্বন্দর পোষাক ও জিনিষগুলির হৃদশা দেখে বুঝলাম যে তুমি আমার মোটেই যত্ন করবে না।”

পরের দিন সকালে স্কুলে যাবার আগে আমি আমার ঘর পরিকার করে গুছিয়ে রাখলাম ও চিঠি লিখে গেলাম, “প্রিয় পপি, আমার অপরিহার্য ঘর তোমার পছন্দ হয়নি বলে দুঃখিত। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তুমি আস তাহলে তুমি প্রতিদিনই দেখবে যে আমার ঘর ও জিনিষপত্র কেমন পরিকার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে গোছানো আছে।”

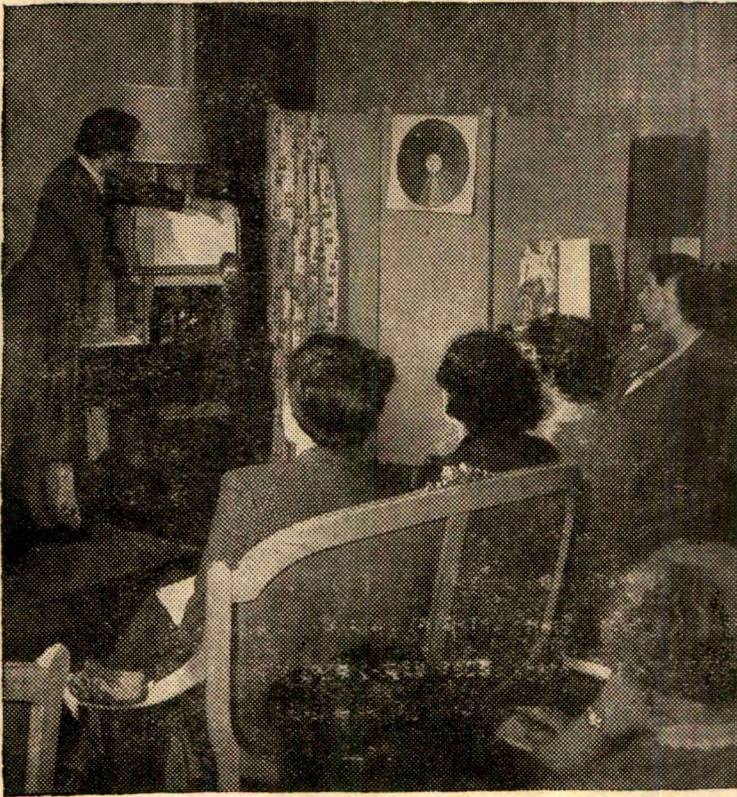
এই রকম ভাবে কিছুদিন ধরে প্রতিদিনই আমার ও ‘পপি’র মধ্যে চিঠি লেখালেখি চললো ও যখন আমার বাবা মা বুঝলেন যে আমি প্রকৃতপক্ষেই আমার নিজের জিনিষের যত্ন নিতে শিখেছি তখন একদিন স্কুলে যাবার সময় মা বললেন যে বাবার আগে বাইরের ঘরে আমার ‘পপি’কে যেন আমি আদর করে যাই।

গ্রামের মেয়েদের কলেজ

প্রতিবৎসর প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের বিভিন্ন যায়গা থেকে বহু মেয়ের দল এসে— প্রত্যেক দলে থাকে ৫০ জন—বার্কশায়ারের একটা বাড়ীতে জমায়েৎ হয়। তারা প্রধানত গ্রামাঞ্চল বা ছোট ছোট সহর থেকেই এসে থাকে। এরা সকলেই ব্রুটেনের সর্ব-

নামেই এর নামকরণ হয়। ১৯৪৮ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এটি একটি সামাজিক মিলন এবং শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে এই শিক্ষা কেন্দ্রের সভ্য সংখ্যা ৪,৩৮,০০০।

ক্যানাডার পর ব্রুটেনে ১৯১৫ সালে মেয়েরা প্রথম



ব্রুটেনের একটা গ্রামাঞ্চল কলেজে গ্রামের মেয়েদের ঘরদোর সাজানো শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

প্রধান নারীসমিতি National Federation of Women's Institute-এর সভ্য। এখানে তারা "ছাত্রী" হিসাবে গৃহস্থালী সম্পর্কে নানা রকমের কাজ শিক্ষা করে। এই বাড়ীটাই হল তাদের কলেজ, নাম ডেনম্যান কলেজ—প্রথম চেয়ারম্যান লেডি ডেনম্যানের

নারী সমিতি গঠনের আন্দোলন শুরু করে। এই সমিতির উদ্দেশ্য হল যে সব মেয়েরা দূর গ্রামাঞ্চলে বাস করে তাদের একত্রিত করা এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ দান করা, যাতে তারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের উন্নতির কথা চিন্তা করতে শেখে। ১৯১৮ সালে সরকার এই সমিতি গঠনের পরিকল্পনা সমর্থন করেন এবং অর্থ সাহায্য করেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সমিতি স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত এই সাহায্য নিয়মিত ভাবে পাওয়া যায়। বর্তমানে ব্রুটেনে স্বতন্ত্র নারী সমিতির সংখ্যা হল ৭,৩১০, প্রত্যেকটিতে ২৫ বা ততোধিক সভ্য আছে। প্রত্যেক সভ্যকে বাৎসরিক টাকার হিসাবে দিতে হয় ২১/০,তার

মধ্যে ১৮/০ আনা যায় গ্রামাঞ্চল ফেডারেশনের তহবিলে, ১ টাকা যায় কাউন্টি ফেডারেশনে এবং বাকী পয়সাটা যায় বিভিন্ন নারী সমিতির নিজস্ব তহবিলে।

• ডেনম্যান কলেজে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, যথা—হস্তশিল্প, রন্ধন, খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা

ইত্যাদি। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের অধীনে, সভাদের হাতে তৈরী জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্ত আছে দোকানপত্র। মাঝে মাঝে এখানে সামাজিক সম্মেলনও হয়ে থাকে, তা ছাড়া নাটকভিনয় এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও এখানে আছে। সভ্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে কোথায় কোন্ অনুবিধা আছে তা স্থির করেন। জল সরবরাহ ঠিকমত না হলে বা যানবাহন এবং টেলিফোন ব্যবস্থার ক্ষতি থাকলে তা স্থাশান্তাল ফেডারেশন মারফত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালে কলেজটি বিশেষ কতকগুলি কোর্স স্থির করে প্রথম কাজ আরম্ভ করে। কোর্সের শিক্ষা কাজ প্রায় ৪ দিন। এর টুইসান ৩/০, এবং খাওয়া দাওয়া থাকার জন্ত



বুটেনের গ্রামাঞ্চল কলেজে গ্রামের মেয়েদের রন্ধন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।



বুটেনের গ্রামাঞ্চল কলেজে মেয়েদে ফুল সাজানো শিখানো হইতেছে।

ফী হল দৈনিক ১০ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের স্ক্রুতে প্রথম ১২ মাসে প্রায় ১,৫০০ সভ্য নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, এদের মধ্যে বাইরের মেয়েই ছিল ৫০, যারা বিদেশের উইমেনস ইন্স-টিটিউটস গ্যাংকাকী, উইমেনস গ্যাপোসিয়েসনের তরফ থেকে এসেছিল। এরা সকলেই আচার তৈয়ারী, আচার সংরক্ষণ, বাগান করা, খাদ্য পরিবেশন গৃহস্থালীর কাজ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই হাতে কলমে শিক্ষা করে। এতে মেয়েদের সকলেরই অপরিচীত উৎসাহ দেখা গিয়েছিল।

দিদির ব্যথা

শ্রীউম্মিলা দেবী

অপর্ণার আজ বড় আনন্দের দিন—সকালে খবর পেয়েছে তার ভায়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে। শশুরবাড়ীতে নানা কাজের মধ্যে এই কথাটি তার মনে আনন্দের সুর তুলছে। তার কত সাধের ভাইটি, তার বউ আসবে—কেমন বউ হচ্ছে কে জানে? যেমনই হোক সে তার অমলের বউ, তাকে ভালো না লেগে কি উগায় আছে? অপর্ণা উলুনে ছুধের কড়া চাপিয়ে কী যে ভাবে তার ঠিক নেই, ছোট বড় কত কথাই আজ মনে ভীড় করে আসে—

অমল তখন ছোটটি, হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে যেতে, বাড়ী ফিরে দিদি কাছে না বসলে তার খাওয়াই হ'ত না। হাসি পায় ভাবলে, তখন মনে হ'ত ছোট ভাইটিকে ছেড়ে সে একদিনও থাকতে পারবে না। আর আজ কতদিন সে তার শ্বশুর ভাইটিকে দেখেনি তার ঠিক নেই। তার মনে হয় কিই বা ব্যেস অমলের, তার আবার বিয়ে।

কাজ কর্ম্য সেরে অপর্ণা ঘরে আসে—অমরেশ কোর্ট থেকে ফিরেছে। চাকর তার জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছে—অপর্ণা বলে—“ওগো জানো আমাদের অমলের যে বিয়ে—” অমরেশ গলার টাই খুলতে খুলতে বলে, “কবে? কোথায়?”

অপর্ণা বলে—“কোথায় তা জানি না—সামনের সোমবার বিয়ে। কাল বা পরশু নিশ্চয়ই ওখান থেকে নেমন্তন্ন করতে আসবে, তখন সব জানা যাবে।” আনন্দে অপর্ণা অনেক কথাই বলতে যায়, বাধা দিয়ে অমরেশ বলে—“তা তোমার ভায়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেলো, তোমায় একবার মেয়েও দেখালো না? ছিঃ ছিঃ—” শুনে অপর্ণার মনের কোন নিভৃত কোণে যা দিলেও মুখে সে স্বীকার করে না—বলে “বড়রা দেখেছে, অমল নিজে দেখে পছন্দ করেছে, আমি বিয়ের পরই দেখবো এখন, আগে দেখলে পুরোনো হয়ে যায়।”

রাতে, অনেক রাত অন্ধি অপর্ণা জল্পনা কল্পনা করে অমরেশের সঙ্গে—“কদিন গিয়ে আমাদের থাকতে হবে ত?”

অমরেশ বলে “আমি কিন্তু থাকতে পারবো না। আমার কোর্ট কামাই হবে।” অপর্ণা অনেক করে বলেও যখন অমরেশকে রাজী করাতে পারে না তখন হতাশ হয়ে বলে, “তাহলে তো আমারও থাকা হবে না।” অপর্ণার চোখ ছল ছল করে আসে—অমরেশ বলে, “না গো না—আমার জেছে তোমায় আসতে হবে না, ছু'টার দিন বই তো নয়? না হয় একটু অস্থবিরেই হ'ল—অত স্বাখপর আমি নই।” অপর্ণা এবার একটু বেশ খুসী হয়ে ওঠে, বলে, “আচ্ছা অমলের বৌকে কি দেওয়া যায় বলতো।” চুড়ী, হার, ব্রেসলেট, সিঁথী ইত্যাদি অনেক রকম অনেক বারই ঠিক হ'ল, কিছুই যেন অপর্ণার মনোমত হল না—অমলের বউ অপর্ণার কত আদরের জিনিস, তাকে দেবার মত জিনিস অপর্ণা খুঁজেই পায় না—অমরেশ বলে, “আজ ঘুম টুম হবে? না অমলের বৌকে ভাবতে ভাবতেই রাত ভোর হবে?”

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে অপর্ণার আর ঘুম আসে না—উঠে বারান্দায় বসে ভাবতে থাকে অমলেরই কথা—দেবার যখন টাইফয়েড হয়েছিল অমলের কি ভয়ই না পেয়েছিল সবাই, বাঁচবে বলে ভাবেনি কেউ—ভগবানের কৃপায় যে সেরে উঠেছে এই-ই পরম ভাগ্য—অপর্ণা দুই হাত জোড় করে প্রণাম জানায় ভগবানের উদ্দেশ্যে। পূ' দিক রাঙা হয়ে উঠলো, সূর্য্য উঠবে এখনি। অপর্ণা ভাবে অমলের মনের আকাশও আজ এই রকম রঙীন হয়ে উঠেছে। তার মাঝে মাঝে এক একবার মনে হচ্ছে দিদির কথা। তার ছেলে বেলার স্তব্ধ চুপে সাথী দিদির কি সে ভুলে থাকতে পারে? সব প্রথমেই তো মনে পড়বে দিদির।

অমরেশের ডাকে চমকে ওঠে অপর্ণা, “তোমায় কি আজ ভুতে পেলো? হিমু উঠে কানছে, খেতে টেতে দেবে না নাকি?” আবার নিত্য নৈমিত্তিক কাজে লেগে যায় অপর্ণা। সারাদিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে হয় আজই

নিশ্চয় ওখান থেকে বলতে আসবে—রাশ্ত্রীয় গাড়ীর
আওয়াজ হলেই ছুটে যায় বারান্দায়—

বিকেল অমরেশ আসে বলে, “কি গো, ভায়ের বিয়ের
নেমস্তম্ব করতে এলো?” অপর্ণা বলে, “আজ আর এলো না,
তবে কাল নিশ্চই আসবে, মাঝে তো আর তিনটি দিন
মাত্র সময়।”

ক্রমে ক্রমে একটি একটি দিন কাটিতে লাগলো আর
অপর্ণা ক্রমশঃই অধৈর্য হতে থাকে—মনে হয় এতি সন্তান?
অমল তার কোলে পিঠে করে মাঝুধ করা ভাই, সে তার
দ্বিধিকে ভুলে যাবে? এ কখনই সম্ভব নয়।” হায়রে
অপর্ণা এখনও বড়ই ছেলে মানুষ, বোঝে না এই পৃথিবীতে
সবই সম্ভব।

সোমবার সকাল থেকে অপর্ণার মনের যা অবস্থা চল
তা অবর্ণনীয়। কোনও কাজেই মন লাগে না—কথা কহিতে
গেলেই চোখ ভরে আসে জলে। অমরেশ বলে, “আপন ভাই
তো নয় ভাই বোধ হয় আর তোমায় বললো না। আজ
কাল জানো তো বেশী লোক নিমন্ত্রণ করা বেআইনী।”
অপর্ণা আর শুনতে পারে না, স্নেহ ভালোবাসাও কি আইন
মেনে চলে? কোনও রকমে কাজের মধ্যে নিজেকে
অগ্রসর রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু বুধা হয় তার সব চেষ্টা।
অনবরতই চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়ে, অব্যাহত চোখ দুটি
কিছুতেই বশ মানতে চায় না। কিছুই তার আজ ভালো
লাগে না—এমন কি অত আদরের হিমু সোনা তাকেও
আজ তার ভালো লাগছে না। মার কাছে বার বার বকুনি
থেকে ছোট্ট হিমু আপন মনে খেলা করছে আর মাঝে
মাঝে আড় চোখে মায়ের মুখখানা দেখে নিচ্ছে। ছোট্ট
হলেও সে বুঝতে পেরেছে আজ তার মার কি ধেন
হয়েছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে, অমল এখন বোধ হয় বিয়ে
করতে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখনও কি তার মনে পড়ছে না
দ্বিধিকে? সে তো জানে তার দ্বিধির বড় সাধ ছিল তার
ছোট ভাইটিকে বিয়ে করিতে পাঠাবার সময় নিজে হাতে
করে চন্দন পরিবেশাঞ্জিয়ে দেবে। আর একটি সাধ ছিল
সে নিজে হাতে আল্লাদী দিয়ে বউছত্রে একে দেবে একটি

মস্ত খেতপদ্ম, আর তার ওপোর ছোট্ট দুখানি সুন্দর আলতা
পর পা দিয়ে দাঁড়াবে অমলের বউ এসে।

হিমুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে অপর্ণার ঘুম এসে যায়।
সারাদিন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে সে ক্লান্ত
হয়ে পড়েছে।—রাত্রে অমরেশ এসে দেখে অপর্ণার চোখের
জলে হিমুর মাথাটার আধখানা ভিজে গিয়েছে—অমরেশ
ভাবে এতো স্নেহ কি কেউ ভুলতে পারে?

ঘুমের ঘোরে অপর্ণা অস্পষ্ট স্বরে কি ঘেন বলে। অমরেশ
কান পেতে শোনে বলছে—“অমল। আশা নিতে এসেছিল
ভাই? কপালে চন্দন। গায়ে চেলির জোড়, এই পরেই
ছুটে এসেছিল দ্বিধিকে নিতে, আমি জানি দ্বিধিকে কি সে
ভুলতে পারে?”

বর এসেছে—বর এসেছে—বাড়ী শুদ্ধ লোক টেচামেচি
করে ওঠে। কণ্ঠাকর্তী এসে গাড়ী থেকে নামান অমলকে।
তারপরেই একটা প্রচণ্ড হুড়ো হুড়ি—সানাই, শাঁখ, উলু,
ফুলের মালা ও গোলাপ জলের বৃষ্টি সব মিলে অমলকে
খানিক অভিভূত করে দেয়। একটা বড় হলে সুন্দর করে
সাজানো ফুলের চেয়ারে অমলকে বসিয়ে দেওয়া হয়। লম্বা
অনেক রাতে, প্রথমটার কিছুক্ষণ বন্ধুদের হাসি ঠাট্টা ও
ছোট ছোট শালী শালাদের আলাপে কাটলো—পরে কণের
বাগ এসে বরযাত্রীদের খাওয়াতে নিয়ে গেলেন।

অমল এবার একটু নিরিবিলা পায়—হাত উল্টে দেখে
নের ঘড়িতে কটা বেজেছে—এখনও অনেক দেবী আছে
লগ্নের—তার সন্দেশ হয় ঘড়িটা চলছে তো? কানের কাছে
হাতটা নিয়ে শোনে ঘড়ির টিক্ টিক্, টিক্ সেই ভাবেই
তার বুকের মাঝেও চলছে টিপ্ টিপ্। চূপচাপ বসে থাকতে
নানা কথা মনের মধ্যে আসা যাওয়া করে—তার একটা
মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে—তার মা তার ওপোর তার দিধে
বলেছিলেন, “অমল, অপর্ণাকে নেমস্তম্বটা তুই গিয়ে করিস।
তোকে সে বড় ভালোবাসে, অনেক দিন তো যাগনি, তুই
গেলেই সে বেশী খুশী হবে।” অমল যে সে কথাটা
একদম ভুলে গিয়েছে সেটা তার মা ভাবতেই পারেন নি।
ভাই আসার সময় চন্দন পরাতে পরাতে মা বললেন, “হ্যাঁরে
অণু এলোনা কেন বলতো?” অমল চমকে উঠে বলে, “ওঃ,

একদম ভুলে গেছি তো। দিদিকে যে বলাই হয়নি। এতো ছাপ্পামার মধ্যে কি সকলের কথা মনে থাকে?" মা খুবই দুঃখিত হয়ে বলেন—"ছিঃ ছিঃ, ভারী অশ্রায় হয়ে গিয়েছে সে কি ভাববে বলতো? সে যে তোকে নিজের ভাইএর তুল্য ভালোবাসে—আর আমিই বা তাকে কি বলবো? তোর ওপোর ভার দেয়াই আমার ভুল হয়েছে। আর বড় ঠাকুর হয়তো মনে করবেন আজ দিদি নেই বলে তার মেয়েকে আমরা অগ্রাহ্য করলাম।" এমন সময় বাইরে

থেকে হাঁক ডাক আরম্ভ হল—"বরাহুগমনের সময় হয়ে এলো অমল! শিগ্গির শিগ্গির নাও।" অমল তাড়াতাড়ি মাকে প্রণাম করে নেয় বলে—"কাল সকালেই না হয় পরিমলকে পাঠিয়ে দিও দিদিকে আনতে। বলে দিও অমল ভুলে গিয়েছিল—আমার ঘাড়েই ধোষ থাক।" কথাটা অমল খুব হাল্কা ভাবেই বলে। কিন্তু ঐ কথাটা তার দিদির বুকে কতটা আঘাত দেবে সেটা ভেবেও দেখে না।

আনার কলি

শ্রীপুষ্প দেবী

আনার কলি! আনার কলি! সাগর ছেঁচা অপ্সরী।
প্রিয়ের তরে জীবন দিলে কোমল প্রাণা স্তন্দরী।
তোমায় জনম দিয়ে তোমার মা গেলবে স্বর্গতে,
বাপের বুকে বাড়লে তুমি ভায়ের স্নেহ অঙ্কেতে।
গোলাপ জিনি বরণ তোমার কৃষ্ণ ভ্রমর চুলগুলি
খেলে ও মুখপদ্ম ঘিরি তরঙ্গেরি চেউ তুলি।
অরুণ তোমার তরুণ অধর নিকষ কালো চোখ দুটি
অমল শুভ্র চরণ তোমার মরু মাঝে রয় ফুটি।
জীর্ণ কুটার ফুল হল তোমার লীলা চঞ্চলে
খেলেতে লয়ে হরিণ শিশু ফুল কুড়াতে অঞ্চলে।
সারাটা দিন ছুটে ছুটে পাহাড় পরে ঘুরতে গো,
সন্ধ্যা হলেই বাপের কোলে লুটিয়ে ঘুমে পড়তে গো।

হঠাৎ দেশে উঠলো তুমুল কোলাহলের ব্যঞ্জন।
ঘিরলো মোগল সৈন্য এসে বাজলো সময় বাঞ্ছনা।
পিতা তোমার স্বদেশ ভক্ত সরল পাঠান মহাপ্রাণ
দেশের তরে জীবন দিলো, দিলো ছেলের জীবন দান।
ভাঙলো স্বথের কুটার তোমার দারুণ দুখে ভরল বুক,
নিরাশ্রয়তো হলেই তুমি ঘুরলো স্বথের হাসিটুক।
যুদ্ধ যখন শেষ হল গো মোগল সৈন্য ফিরলো দেশ
যাবার পথে সেনাপতি দেখল অতুল তোমার বেশ।

দেখল অতুল রূপের ভাতি দেখল করুণ সরল মুখ
শুনলো তোমার দুখের কথা করুণাতে ভরল বুক।
পিতার স্নেহ দিলো তোমায় তোমার সকল দুখ জানি,
উঠলে এসে তাহার সাথে মোগল দেশে রূপরাণী!

বাদশা ছিলেন দরবারেতে রাজ্য জয়ে মেজাজ খোস
সেনাপতির গলায় দিলেন মতির মালা পরাণতোষ।
তখন আনেন সেনাপতি সেখায় তোমার হাত ধরে
বলেন রাজা সোনার কমল এনেছি দেশ জয় করে।
বাদশা অবাক মুগ্ধ চোখে দেখেন ভুবন মোহন রূপ
নীরব নিখর সভাগৃহ বিশ্বয়েতে সবাই চূপ।
বাদশা কহেন মায়ের কাছে থাকো মা মোর অন্তরে
রাজার কথায় ভরসা পেয়ে সাহস পেলে অন্তরে।

সেদিন মহা ধুম লেগেছে মণিমালায় যৌতুকে
শুণ আতরের হড়াছড়ি ফুলবাসরের কোঁতুকে।
হাজার ঝাড়ের আলায় আলায় উঠলো জলে উজ্জলবেশ
নৃত্য গীতে সানাই স্বরে ভরল মহল মাতলো দেশ।
রং মহলে বাদজীরা সব ঠুংরী তালে নাচছিল,
প্রাসাদ জুড়ে সেতার বীণা মোহন স্বরে বাজছিল।
বেগমেরা ফুলের সাজে সাজছিল সব ফুলপরী

গভায় দেছে পদ্মমালা বেলকুঁড়িকে ছলকরি ।
কুন্দ ফুলের মালার সাথে শিখিলবেণী জড়িয়েছে
অপরাজিতার সুপূর গাঁথে গুল চরণ ভরিয়েছে ।
স্নিগ্ধ সুনীলবরণ শাড়ী অঙ্গে কারুর ঢেউ তোলে
বাসন্তী রং ওড়নাখানি লুটিয়ে পথে কেউ চলে ।

* * *

দাসীর সাথে রং মহলে চলে তুমি ফুলপরী,
পথে যেতে দেখলো সেলিম উঠলো তাহার বুক ভরি ।
আঁধার হৃদয় উজল করে আনার কলি ফুটলো কি
সেও বিজয়ী দস্যু সম হৃদয় তোমার লুটলো কি ?

* * *

সেলিম ছিল ভাবুক করি স্নায় পরায়ণ কোমল-প্রাণ
সাধ ছিল না একটুও তার কর্তে যুদ্ধ অভিযান ।
কঠিন হয়ে দণ্ড দিতে পরাণ তাহার কাঁদতো যে
তাহার চেয়ে গরীব হয়ে থাকতে ভালো বাসতো সে ।
বাদশা তাহার বিয়ে দিলেন যোধ্যাবায়ের সঙ্গেতে
বাজলো বাঁশী রোশন চৌকি ভরল পুরী রঙ্গেতে ।
বাদশাজাদার হৃদয় কিন্তু তাহার স্বরে ফিরলো না
কঠিন হৃদয় রাজপুতানীর সাথে পরাণ মিলল না ।
পাষণ দেশের রাজপুতানী কঠিন তাহার হৃদয়খান,
কোমল পরাণ অশ্রু ভরা কবির সেখা নাইত স্থান ।
পরাণ তাহার আকুল হয়ে ব্যথার ব্যথী চাহিল
কবির চোখে উজল তোমার করুণ হৃদয় পাইল ।
দৌহে পেলে ব্যথার ব্যথী নামল বুকের পাষণ ভার
সে মিলন মধুর অভুল রাতের তুলনা দেয় সাধ্য কার ?

* * *

লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেলো গোপন সে কোন রাত্রেতে
খবর পেয়ে যোধ্যাবায়ের আশ্রয় জলে গাত্রেতে ।
ধারে চেয়ে পাই না আমি তাঁহারে পায় কোন বাদী
প্রতিশোধ এর নেবই আমি স্বথের পথে বাদ সাধি ।

* * *

মুখ ওরে মুখ নারী এটুকু তুই বুলি না
জোর জুলুমের জিনিষ এ নয় তাইত মানিক তুলি না ।
দাবী থাকলে তুচ্ছ ধনের নালিশ দাবী চলে তার
প্রাণের দাবীর নাইরে নালিশ শুধুই মিছে হাহাকার ।

* * *

খবর পেয়ে বাদশা এলেন গভীর রাতে গা ঢেকে
আশ্রয় হয়ে ওঠেন জলে সেখায় তোমাদের দেশে
বাদশা কহেন এ কি সরম সেলিম বাদশাজাদ হয়ে
বাদীর সাথে বেঈজ্জতী ? কারে দেব রাজ্য এ ?
বাদীর ছেলে বাদশা হয়ে বসবে ময়ূর তথতিতে
হুজনেই দণ্ড দেব কথব সরম শক্তিতে—

* * *

বিনয় নম্র শাস্ত্র স্বরে সেলিম কহে পিতা মোর
দণ্ড দিলে মাধায় নেব কণাও দোষ নাইক ওর ।
বিশাল তোমার রাজ্য পরে নাইক আমার কণাও লোভ
যোগ্য হাতে দাওগে সে ভার তাহাতে মোর
নাইত ক্ষোভ ।

আনার কলি সাথে লয়ে চলে যাব অন্ধ দেশ
বনের মাঝে কুতীর বেঁধে তাতেই মোদের চলবে বেশ ”
বাদশা বলেন “লজ্জা নাই ? মিনতি আজ চলবে না ।
আনার কলির জ্যাস্ত কবর, হকুম আমার টলবে না ।
তোমার যদি সাধ হয়ত রাজ্য ছেড়ে যাও চলে,
আমার শাসন কঠিন অমোঘ ক্ষমা করে ছুঁকলে

* * *

বাদশা চলে গেলেন ঘরে লুটিয়ে সেলিম কাঁদে গো
শিশুর মত আত্মহারা কি করে প্রাণ বাধ গো ।
তুমিই তখন বুঝলে তায় ভুলে গিয়ে আপন হুধ
মুছালে তার অশ্রু ধারা সান্ধনাতে বাধলে বুক ।
কইলে প্রিয় জনম জনম আমিই তোমার তুমি মোর,
মৃত্যু পারাবায়ের পারে বাধবো মোদের প্রেমের ডোর
কদিন বা এ এই বিরহে এত অধীর এত শোক ?
শাস্ত্র হওগো পরাণপ্রিয় ওঠো তুমি মুছো চোখ ।”

* * *

প্রভাত হল অরুণ আলোয় আবার ভরে উঠে দিক
তখনোতো সেলিম চেয়ে তোমার পাণে নির্গম্বিধ ।
বাদশা এলেন ঘাতক সাথে নিলেন তোমায় সঙ্গেতে
শ্রুতি দিলো দীপ্তি অমর তোমার সারা-অঙ্গেতে ।
বছর কাটে ব্যথা কাতর শাজাদা রোগ শয্যাতে
ক্ষুধ নবাব-পুত্র তরে দারুণ রোষের লজ্জাতে ।
ভুলতো আপন বুঝলো নবাব কিন্তু আনার নাইরে হয়,
ক্ষণের তরে জ্ঞান হলে যে সেলিম শুধু তোমায় চায় ।
অনাজাতা-পুঙ্গু তুমি আনার কলি মঞ্জরী,

চিত্র জীবন সেলিমের তো তুমিই ছিলে মন ভরি।
 হুজুহানের রূপতো ছিল অরুণছটা দীপ্তি তার
 ঘুচলো নাত আনার বিহীন সেলিম হৃদয় অন্ধকার।
 প্রথম তরুণ জীবনে তার প্রেমের গহন মন্দিরে।
 প্রিয়ের পূজার অর্ঘ্য দিলো তাহার হৃদয় বন্দীরে
 তরুণ পরাগ যাহার পায়ে নিঃস্ব হয়ে যায়গো দেওয়া
 প্রণয়ের সে প্রথম পদ্য ফিরিয়ে কতু যায় কি নেওয়া?
 বাদল কঁত মেঘলা রাতে তোমার তরে জাহাঙ্গীর
 কাদতো লুটে ধুলার পরে লুটিয়ে তাহার বিজয় শির।

* * *

কতই যুগের কতই কবি স্মরি কত স্মন্দরী
 কতই মোহন মধুর গাথা গেঁথেছে ত মন ভরি।
 অনাহতা উপেক্ষিতা সেথায় তোমার নাইত স্থান
 দুঃখ ভরা জীবন তরে করেনি কেউ অশ্রু দান।
 নাইক কবর সোধ তোমার আকাশ ভেদী মিনার তাজ
 নাইক স্মৃতি প্রাসাদ তোরণ লুপ্ত তোমার সকল সাজ।
 শিউলী ফুলের মতন ফুটে ভোরের বেলাই ঝরলে গো
 ইরাণ দেশের আনারকলি মোগলে গ্রাস করলো গো।
 আজকে তুমি জুড়িয়ে গেছ সকল ব্যথা বিস্মরি
 অমর তোমার প্রেমের গাথা সেলিম হৃদয় ঈশ্বরী।*

* শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা অবলম্বনে।

বয়স্কর শিক্ষা

শ্রীলীলা মজুমদার

যখন ছোট ছিলাম গুরুজনদের মুখে প্রায়ই শুনতাম
 যে নদীর প্রান্তের মতন সময় চলে যায়, আর তার সঙ্গে
 যে সকল স্বর্ণ স্বয়ংগ আমরা হারিয়ে ফেলি সেগুলিও
 চিরদিনের মতন চলে যায়; আর তাদের ফিরে পাবার
 উপায় থাকে না। তাঁরা আরও বলতেন যে ছোট বেলাই
 হচ্ছে যা কিছু শিখে নেবার সময়। এখন যা শিখলে না
 আর কখনও তা শিখবার সুযোগ পাবে না। ছোট
 বেলা থেকে নিজেকে গড়ে পিটে শিখিয়ে পড়িয়ে যে
 মানুষটা তৈরী করবে, বড় হয়ে তাকে আর চেষ্টা করলেও
 বদলাতে পারবে না।

কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্যি আছে। বসন্ত
 কালের পাতার কুঁড়ি দেখেছি শীত চলে গেলেই গুলির
 মতন দেখা দেয়। আস্তে আস্তে কুঁড়ি খুলে যায়, কচি
 সবুজ পাতা রোদে ডানা মেলে ধরে। আস্তে আস্তে
 সে বড় হয়; শক্ত হয়; যাতে ফল ধরার সময় কচি
 ফলকে আড়াল করে রোদের তেজ আর ঝড়ের ঝাপটা
 থেকে রক্ষা করতে পারে।

এ পাতা ফোটার নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কাজ
 আছে। তার দেবী করবার যা নেই; তা হলে তার
 বিকশিত হয়ে ওঠারই কোনও প্রয়োজন থাকবে না।
 মানুষের জীবনেও তেমনি একটা সময় আছে যখন
 তাকে ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। দেবী
 করে ফেললে এ কাজের ক্ষতি হ'বে, কারণ সময় চঞ্চল
 পদক্ষেপে চলে যায়, কারু তৈরী হবার জন্য বসে থাকে
 না। কাজের সময় যদি কাজের লোক প্রস্তুত না থাকে
 তাকে দিয়ে আর সে কাজ হয় না।

পরে যখন আরও বড় হ'লাম, তখন দেখলাম যে
 যদিও মানব জীবনের পরিস্ফুট হবার মোটামুটি সময়
 নির্দিষ্ট আছে, তবুও পৃথিবীতে কাজের অন্ত নেই অথচ
 কাজ করবার লোকের প্রাচুর্য নেই বলে, খুব অল্প
 লোকই আছে যাকে একেজো বলে পরিভাগ করা যায়।

সব মানুষেরই হাত, পা, চোখ, কাণ, মুখ ও বুদ্ধি
 আছে। কারু বেশী শক্তি আছে, কারু কম আছে।
 কেউ কাজের উপযুক্ত হয়েই আছে। কেউ অপর্যাপ্ত;

তাকে তৈরী করে নিতে হবে। কিন্তু শুধু মূর্থ বলে কাউকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। ছোট বেলায় যদি তাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা না দেওয়া হয়ে থাকে, বড় হয়ে গেলেও সে ভুলটা সংশোধন করবার যথেষ্ট সময় আছে। সম্ভবতঃ এই রকম মূর্থ লোককে একেবারে পণ্ডিত বানান যাবে না। কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত সে এগুতে পারবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা বলে একটা কথা আজ কাল প্রায়ই শোনা যায়। তার মানে—বয়স্কদের শিক্ষাদান। অনেক সময় এই সকল বয়স্কদের অ-আ-থেকে শিক্ষা আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু তাতে নিরাশ হবার কিছু নেই, কারণ এই বয়স্কদের অধিকাংশের এত আগ্রহ থাকে শিক্ষা লাভ করবার, যে পাঁচটা অনিচ্ছুক স্কুলের ছাত্রের চেয়ে তারা এক একজনই বেশী যত্ন নেয়। তা ছাড়া তাদের মাথার পিছনে সর্বদা এই চিন্তা ঘোরাফেরা করে যে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, এখন যেটুকু বাকী আছে সেটুকু থেকে যত খানি শিক্ষা নিংড়ে নেওয়া যায় তাই নিতে হবে। এর ফলে এই সব বয়স্ক ছাত্রেরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। একটা সাত বছরের ছেলে এক বছরে যতখানি এগোতে পারে, একজন বয়স্ক ছাত্র ছ' মাসে সেটুকু আয়ত্ত করতে পারে।

কেবল আগ্রহের জ্ঞানও নয়। স্বাভাবিক মানুষের একটু বয়স হ'লেই লেখাপড়া না জানলেও একটা স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ হয়। যে জিনিষটা ছোট ছেলের কচি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয়, বয়স্ক ছাত্র অনায়াসে সেটা বুঝে নিতে পারে।

আমি কয়েকজন রাসিয়ান মেয়েদের জীবনী পড়েছি যাদের ৩০।৩৫ বছর বয়স অবধি একেবারে অক্ষর পরিচয়ই হয় নি। তাদের অল্প বয়সে বিয়ে থা হয়ে গিয়েছিল, রাধাবাড়া ছেলেপুলে নিয়েই তাদের জীবন কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর রাসিয়ান শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন হল। স্বাভাবিক বণিতা, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলের উপর আদেশ হ'ল যে যতশীঘ্র সম্ভব নিরক্ষরতা দূর করতে হবে।

গুনেছি তখন এক অপূর্ব ব্যাপার সুরু হ'ল। দিদিমা

নাতনী পাশাপাশি বসে বই ভাগাভাগি করে অক্ষর চিন্তে সুরু ক'রে দিল; এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দেশ থেকে মূর্থতার অঙ্ককার একেবারে ঘুচে গেলো।

একে বলে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, বুড়োদের লেখাপড়া শেখান। আমাদের দেশেও এর যেমনি অতীব প্রয়োজন আছে, তেমনি উজ্জল ভবিষ্যৎ আছে। এই রকম শিক্ষা দেবার প্রণালীটা শিশুশিক্ষার প্রণালী থেকে আবশ্যিক মতন ভিন্ন হ'তে পারে।

এ যে সব আধাবয়সী রাসিয়ান গিন্নীদের কথা বলছিলাম, তাদের মধ্যে অনেকে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সব কীর্তি করেছে। বুড়োবয়সে অক্ষর চিন্তে শিখে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ও মনে অমাত্রব্যব উচ্চাশা নিয়ে, তারা সব এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বড় বড় আপিশের কর্মচারী হয়েছে। অনেক সময় বৃথা নষ্ট হ'য়েছে বলে কাজ করবার আগ্রহ ও ক্ষমতা সাধারণ মেয়েদের চেয়ে এদের ঢের বেশী।

কেবল একটা দেশে কেন, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চেষ্টা করলে পাঁচ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করে দেওয়া যায়। আমাদের দেশ ত তা' হ'লে বেঁচে যায়। দু বছর আগেকার দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কলকাতার সব মহিলা সমিতির দরজায় দলে দলে মেয়েরা এসেছিল যাদের এক পয়সা রোজগার নেই। রাধাবাড়া ছাড়া তারা কেউ কিছু শেখে নি। তখন আমাদের সমস্তা ছিল এদের দিয়ে কি করা যায়? এরা কি কিছু শিখতে পারবে? সাধারণ হিসাবের শিখবার বয়স এদের বহুদিন পার হয়ে গেছে।

তারপর দেখা গেলো চেষ্টা করলে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু হাতের কাজ করতে পারে, সেলাই, কাগজ তৈরী, তাঁতের কাজ, পুতুল তৈরী, মাহুর বোনা একটানা একটা কিছু অভ্যাস করলে হাতে এসেই যায়। একেবারে কিছু পারে না এমনও দেখা গেছে। কিন্তু তাদেরও মনে হয় আরও সময় দিলে আরও ধৈর্য্য ধরে শেখালে শেষ অবধি কিছু উন্নতি হ'বে।

এই যে বুড়োদের হাতের কাজ শেখানো, এও বয়স্ক শিক্ষার একটা অঙ্গ।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে এই দুই রকম শিক্ষা, লেখাপড়া শেখানো আর হাতের কাজ শেখানো, একত্র করা হয়েছে।

একদম ভুলে গেছি তো। দিদিকে যে বলাই হয়নি। এতো ছাদামার মধ্যে কি সকলের কথা মনে থাকে?” মা খুবই হুঃখিত হয়ে বলেন—“ছিঃ ছিঃ, ভারী অত্যাচার হয়ে গিয়েছে। সে কি ভাববে বলতো? সে যে তোকে নিজের ভাইএর তুল্য ভালোবাসে—আর আমিই বা তাকে কি বলবো? তোর ওপোর ভার দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। আর বড় ঠাকুর হয়তো মনে করবেন আজ দিদি নেই বলে তার মেয়েকে আমরা অগ্রাহ্য করলাম।” এমন সময় বাইরে

থেকে হাঁক ডাক আরম্ভ হ’ল—“বরাহুগমনের সময় হয়ে এলো অমল। শিগ্গির শিগ্গির নাও।” অমল তাড়াতাড়ি মাকে প্রণাম করে নেয় বলে—“কাল সকালেই না হয় পরিমলকে পাঠিয়ে দিও দিদিকে আনতে। বলে দিও অমল ভুলে গিয়েছিল—আমার ঘাড়েই দোষ থাক।” কথাটা অমল খুব হাল্কা ভাবেই বলে। কিন্তু ঐ কথাটাই তার দিদির বুক কতটা আঘাত দেবে সেটা ভেবেও দেখে না।

আনার কলি

শ্রীপুষ্প দেবী

আনার কলি! আনার কলি! সাগর ছেঁচা অপসরী।
শ্রিয়ের তরে জীবন দিলে কোমল প্রাণা স্তম্বরী।
তোমায় জনয় দিয়ে তোমার মা গেল যে স্বর্গেতে,
বাপের বুক বাড়লে তুমি ভায়ের স্নেহ অঙ্কেতে।
গোলাপ জিনি বরণ তোমার কৃষ্ণ ভ্রমর চুলগুলি
খেলে ও মুখপদ্ম ঘিরি তরঙ্গেরি ঢেউ তুলি।
অরুণ তোমার তরুণ অধর নিকষ কালো চোখ দুটি
অমল শুভ্র চরণ তোমার মরু মাঝে রয় ফুটি।
জীর্ণ কুটার ফুল হল তোমার লীলা চঞ্চলে
খেলেতে লয়ে হরিণ শিশু ফুল কুড়াতে অঞ্চলে।
সারাটা দিন ছুটে ছুটে, পাহাড় পরে ঘুরতে গো,
সন্ধ্যা হলেই বাপের কোলে লুটিয়ে ঘুমে পড়তে গো।

হঠাৎ দেশে উঠলো তুমুল কোলাহলের ব্যঞ্জন।
ঘিরলো মোগল সৈন্য এসে বাজলো সমর বঙ্কনা।
পিতা তোমার স্বদেশ ভক্ত সরল পাঠান মহাপ্রাণ
দেশের তরে জীবন দিলো, দিলো ছেলের জীবন দান।
ভাঙলো স্বথের কুটার তোমার দারুণ হুখে ভরল বুক,
নিরাশ্রয়তো হলেই তুমি ঘুটলো স্বথের হাসিটুক।
যুদ্ধ যখন শেষ হল গো মোগল সৈন্য ফিরলো দেশ
বাঁবার পথে সেনাপতি দেখল অতুল তোমার বেশ।

দেখল অতুল রূপের ভাতি দেখল করুণ সরল মুখ
শুনলো তোমার দুখের কথা করুণাতে ভরল বুক।
পিতার স্নেহ দিলো তোমায় তোমার সকল দুখ জানি,
উঠলে এসে তাহার সাথে মোগল দেশে রূপরাণী!

বাদশা ছিলেন দরবারেতে রাজ্য জয়ে মেজাজ খোস
সেনাপতির গলায় দিলেন মতির মালা পরাণতোষ।
তখন আনেন সেনাপতি সেথায় তোমার হাত ধরে
বলেন রাজা সোনার কমল এনেছি দেশ জয় করে।
বাদশা অবাক মুগ্ধ চোখে দেখেন ভুবন মোহন রূপ
নীরব নিখর সভাগৃহ বিস্ময়েতে সবাই চুপ।
বাদশা কহেন মায়ের কাছে থাকো মা মোর অন্দের
রাজার কথায় ভরসা পেয়ে সাহস পেলে অন্তরে।

সেদিন মহা ধুম লেগেছে মণিমালায় যৌতুকে
গুল আতরের হুড়াছড়ি ফুলবাসরের কৌতুকে।
হাজার ঝাড়ের আলোয় আলোয় উঠলো জলে উজ্জলবেশ
নৃত্য গীতে সানাই স্বরে ভরল মহল মাতলো দেশ।
রং মহলে বাদ্দিজীরা সব ঠুংরী তালে নাচছিল,
প্রাসাদ জুড়ে সেতার বীণা মোহন স্বরে বাজছিল।
বেগমেরা ফুলের সাজে সাজছিল সব ফুলপরী

গুলায় দেছে পদ্মমালা বেলকুঁড়িকে তুলকরি ।
কুন্দ ফুলের মালার সাথে শিখিলবেণী জড়িয়েছে
অপরাজিতার সুপূর গণ্ডে শুভ চরণ ভরিয়েছে ।
স্নিগ্ধ সুনীলবরণ শাড়ী অঙ্গে কারুর ঢেউ তোলে
বাসন্তী রং ওড়নাখানি লুটিয়ে পথে কেউ চলে ।

* * *

দাদীর সাথে রং মহলে চলে তুমি ফুলপরী,
পথে যেতে দেখলো সেলিম উঠলো তাহার বুক ভরি ।
আধার হৃদয় উজল করে আনার কলি ফুটলো কি
সেও বিজয়ী দৃশ্য সম হৃদয় তোমার লুটলো কি ?

* * *

সেলিম ছিল ভাবুক করি ত্রায় পরায়ণ কোমল প্রাণ
সাধ ছিল না একটুও তার কর্তে যুদ্ধ অভিধান ।
কঠিন হয়ে দণ্ড দিতে পরাণ তাহার কাঁদতো যে
তাহার চেয়ে গরীব হয়ে থাকতে ভালো বাসতো সে ।
বাদশা তাহার বিয়ে দিলেন যোধাবায়ের সঙ্গেতে
বাজলো বাঁশী রোশন চোকি ভরল পুরী রঙ্গেতে ।
বাদশাজাদার হৃদয় কিন্তু তাহার সুরে ফিরলো না
কঠিন হৃদয় রাজপুতানীর সাথে পরাণ মিলল না ।
পাষণ দেশের রাজপুতানী কঠিন তাহার হৃদয়খান,
কোমল পরাণ অশ্রু ভরা কবির সেথা নাইত স্থান ।
পরাণ তাহার আকুল হয়ে ব্যথার ব্যথী চাহিল
কবির চোখে উজল তোমার করুণ হৃদয় পাইল ।
দৌড়ে পেলে ব্যথার ব্যথী নামল বুকের পাষণ ভার
সে মিলন মধুর অতুল রাতের তুলনা দেয় সাধ্য কার ?

* * *

লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেলো গোপন সে কোন রাত্রেতে
খবর পেয়ে যোধাবায়ের আশুন জলে গাত্রেতে ।
যারে চেয়ে পাই না আমি তাহারে পায় কোন বাদী
প্রতিশোধ এর নেবই আমি স্থথের পথে বাদ সাধি ।

* * *

মূর্খ ওরে মূর্খ নারী এটুকু তুই বুঝলি না
জ্ঞোর জুলুমের জিনিষ এ নয় তাইত মাণিক তুললি না ।
দাবী থাকলে তুচ্ছ ধনের নালিশ দাবী চলে তার
প্রাণের দাবী নাইরে নালিশ শুধুই মিছে হাহাকার ।

* * *

খবর পেয়ে বাদশা এলেন গভীর রাতে গা ঢেকে
আশুন হয়ে ওঠেন জলে সেখায় তোমাদের দেখে
বাদশা কহেন এ কি সরম সেলিম বাদশাজাদ হয়ে
বাদীর সাথে বেঈজ্জতী ? কারে দেব রাজ্য এ ?
বাদীর ছেলে বাদশা হয়ে বসবে ময়ূর তথতিতে
হুজনেরেই দণ্ড দেব রুধব সরম শক্তিতে—

* * *

বিনয় নম্র শাস্ত্র স্বরে সেলিম কহে পিতা মোর
দণ্ড দিলে মাথায় নেব কণাও দোষ নাইক ওর ।
বিশাল তোমার রাজ্য পরে নাইক আমার কণাও লোভ
যোগ্য হাতে দাওগে সে ভার তাহাতে মোর
নাইত ক্ষোভ ।

আনার কলি সাথে লয়ে চলে যাব অস্ত্র দেশ
বনের মাঝে কুটীর বেঁধে তাতেই মোদের চলবে বেশ ”
বাদশা বলেন “লজ্জা নাই ? মিনতি আজ চলবে না ।
আনার কলির জ্যাস্ত কবর, হুকুম আমার টলবে না ।
তোমার যদি সাধ হয়ত রাজ্য ছেড়ে যাও চলে,
আমার শাসন কঠিন অমোঘ ক্ষমা করে হুকুমে

* * *

বাদশা চলে গেলেন ঘরে লুটিয়ে সেলিম কাঁদে গো
শিশুর মত আত্মহারা কি করে প্রাণ বাঁধ গো ।
তুমিই তখন বুঝালে তায় ভুলে গিয়ে আপন দুঃখ
মুছালে তার অশ্রু ধারা সান্ত্বনাতে বাঁধলে বুক ।
কইলে প্রিয় জনম জনম আমিই তোমার তুমি মোর,
মৃত্যু পারাবারের পারে বাঁধবো মোদের প্রেমের ডোর
কদিন বা এ এই বিরহে এত অধীর এত শোক ?
শাস্ত্র হওগো পরাণপ্রিয় ওঠো তুমি মুছো চোখ ।”

* * *

প্রভাত হল অরুণ আলোয় আবার ভরে উঠে দিক
তখনোতো সেলিম চেয়ে তোমার পাণে নিগিমিখ ।
বাদশা এলেন ঘাতক সাথে নিলেন তোমায় সঙ্গেতে
মৃত্যু দিলো দীপ্তি অমর তোমার সারা অঙ্গেতে ।
বছর কাটে ব্যথা কাতর শাজাদা রোগ শয্যাতে
স্কন্ধ নবাব পুত্র তরে দারুণ রোধের লজ্জাতে ।
তুলতো আপন বুঝলো নবাব কিন্তু আনার নাইরে হায়,
ক্ষণের ভরে জ্ঞান হলে যে সেলিম শুধু তোমায় চায় ।
অনাম্রাতা পুষ্প তুমি আনার কলি মঞ্জরী,

চির জীবন সেলিমের তো তুমিই ছিলে মন ভরি।
 হুবজাহানের রূপতো ছিল অরুণছটা দীপ্তি তার,
 যুচলো নাত আনার বিহীন সেলিম হৃদয় অন্ধকার।
 প্রথম তরুণ জীবনে তার প্রেমের গহন মন্দিরে।
 প্রিয়ের পূজার অর্ঘ্য দিলো তাহার হৃদয় বন্দীরে
 তরুণ পরাণ যাহার পায়ৈ নিঃস্ব হয়ে যায়গো দেওয়া
 প্রণয়ের সে প্রথম পদ ফিরিয়ে কভু যায় কি নেওয়া?
 বাদল কত মেঘলা রাতে তোমার তরে জাহাঙ্গীর
 কাদতো লুটে ধুলার পরে লুটিয়ে তাহার বিজয় শির।

* * *

কতই যুগের কতই কবি স্মরি কত স্মন্দরী
 কতই মোহন মধুর গাথা গেঁথেছে ত মন ভরি।
 অনাহতা উপেক্ষিতা সেথায় তোমার নাইত স্থান
 দুঃখ ভরা জীবন তরে করেনি কেউ অশ্রু দান।
 নাইক কবর সোধ তোমার আকাশ ভেদী মিনার তাজ
 নাইক স্মৃতি প্রাসাদ তোরণ লুপ্ত তোমার সকল সাজ।
 শিউলী ফুলের মতন ফুটে ভোরের বেলাই ঝরলে গো
 ইরাণ দেশের আনারকলি মোগলে গ্রাস করলো গো।
 আজকে তুমি জুড়িয়ে গেছ সকল ব্যথা বিস্মরি
 অমর তোমার প্রেমের গাথা সেলিম হৃদয় ঝুঁখরী।*

* শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা অবলম্বনে।

বয়স্কের শিক্ষা

শ্রীলীলা মজুমদার

যখন ছোট ছিলাম গুরুজনদের মুখে প্রায়ই শুনতাম যে নদীর স্রোতের মতন সময় চলে যায়, আর তার সঙ্গে যে সকল স্বর্ণ স্নযোগ আমরা হারিয়ে ফেলি সেগুলিও চিরদিনের মতন চলে যায়; আর তাদের ফিরে পাবার উপায় থাকে না। তাঁরা আরও বলতেন যে ছোট বেলাই হচ্ছে যা কিছু শিখে নেবার সময়। এখন যা শিখলে না আর কখনও তা শিখবার সুযোগ পাবে না। ছোট বেলা থেকে নিজেকে গড়ে পিটে শিখিয়ে পড়িয়ে যে মানুষটা তৈরী করবে, বড় হয়ে তাকে আর চেষ্টা করলেও বদলাতে পারবে না।

কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্যি আছে। বসন্ত কালের পাতার কুঁড়ি দেখেছি শীত চলে গেলেই গুটার মতন দেখা দেয়। আস্তে আস্তে কুঁড়ি খুলে যায়, কচি সবুজ পাতা বোদে ডানা মেলে ধরে! আস্তে আস্তে সে বড় হয়; শক্ত হয়; যাতে ফল ধরার সময় কচি ফলকে আড়াল করে বোদের তেজ আর ঝড়ের ঝাপটা থেকে রক্ষা করতে পারে।

ঐ পাতা ফোটার নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কাজ আছে। তার দেবী করবার যো নেই; তা হলে তার বিকশিত হয়ে ওঠারই কোনও প্রয়োজন থাকবে না। মানুষের জীবনেও তেমনি একটা সময় আছে যখন তাকে ভবিষ্যতের কাজের জগৎ প্রস্তুত হ'তে হয়। দেবী করে ফেললে ঐ কাজের ক্ষতি হ'বে, কারণ সময় চঞ্চল পদক্ষেপে চলে যায়, কারু তৈরী হবার জগৎ বসে থাকে না। কাজের সময় যদি কাজের লোক প্রস্তুত না থাকে, তাকে দিয়ে আর সে কাজ হয় না।

পরে যখন আরও বড় হ'লাম, তখন দেখলাম যে যদিও মানব জীবনের পরিষ্কৃত হবার মোটামুটি সময় নির্দিষ্ট আছে, তবুও পৃথিবীতে কাজের অন্ত নেই অথচ কাজ করবার লোকের প্রাচুর্য নেই ব'লে, খুব অল্প লোকই আছে যাকে একেজো বলে পরিত্যগ করা যায়।

সব মানুষেরই হাত, পা, চোখ, কাণ, মুখ ও বুদ্ধি আছে। কারু বেশী শক্তি আছে, কারু কম আছে। কেউ কাজের উপযুক্ত হয়েই আছে। কেউ অল্পযুক্ত;

তাকে তৈরী করে নিতে হবে। কিন্তু শুধু মূৰ্খ বলে কাউকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। ছোট বেলায় যদি তাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা না দেওয়া হয়ে থাকে, বড় হয়ে গেলেও সে ভুলটা সংশোধন করবার যথেষ্ট সময় আছে। সম্ভবতঃ এই রকম মূৰ্খ লোককে একেবারে পণ্ডিত বানান যাবে না। কিন্তু অনেক দূর পধ্যন্ত সে এগুতে পারবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা বলে একটা কথা আজ কাল প্রায়ই শোনা যায়। তার মানে: বয়স্কদের শিক্ষাদান। অনেক সময় এই সকল বয়স্কদের অ-আ-থেকে শিক্ষা আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু তাতে নিরাশ হবার কিছু নেই, কারণ এই বয়স্কদের অধিকাংশের এত আগ্রহ থাকে শিক্ষা লাভ করবার, যে পাঁচটা অনিচ্ছুক স্থলের ছাত্রের চেয়ে তারা এক একজনই বেশী যত্ন নেয়। তা ছাড়া তাদের মাথার পিছনে সর্বদা এই চিন্তা ঘোরাফেরা করে যে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, এখন যেটুকু বাকী আছে সেটুকু থেকে যত খানি শিক্ষা নিংড়ে নেওয়া যায় তাই নিতে হবে। এর ফলেই সব বয়স্ক ছাত্রেরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। একটা সাত বছরের ছেলে এক বছরে যতখানি এগোতে পারে, একজন বয়স্ক ছাত্র দু' মাসে সেটুকু আয়ত্ত করতে পারে।

কেবল আগ্রহের জ্ঞান নয়। স্বাভাবিক মানুষের একটু বয়স হ'লেই লেখাপড়া না জানলেও একটা স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ হয়। যে জিনিষটা ছোট ছেলের কচি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয়, বয়স্ক ছাত্র অনায়াসে সেটা বুঝে নিতে পারে।

আমি কয়েকজন রাসিয়ান মেয়েদের জীবনী পড়েছি যাদের ৩০।৩৫ বছর বয়স অবধি একেবারে অক্ষর পঠিচয়ই হয় নি। তাদের অল্প বয়সে বিয়ে থা হয়ে গিয়েছিল, রাখাবাড়া ছেলেপুলে নিয়েই তাদের জীবন কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর রাসিয়ান শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন হল। আবালবৃদ্ধ বণিতা, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ছেলে বড়ো সকলের উপর আদেশ হ'ল যে যতশীঘ্র সম্ভব নিরক্ষরতা দূর করতে হবে।

গুনেছি তখন এক অপূর্ব ব্যাপার সুরু হ'ল। দিদিমা

নাতনী পাশাপাশি বসে বই ভাগাভাগি করে অক্ষর চিন্তে সুরু ক'রে দিল; এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দেশ থেকে মূৰ্খতার অন্ধকার একেবারে ঘুচে গেলো।

একে বলে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, বড়োদের লেখাপড়া শেখান। আমাদের দেশেও এর যেমনি অতীত প্রয়োজন আছে, তেমনি উজ্জল ভবিষ্যৎ আছে। এই রকম শিক্ষা দেবার প্রণালীটা শিশুশিক্ষার প্রণালী থেকে আবশ্যিক মতন ভিন্ন হ'তে পারে।

এ যে সব আধাবয়সী রাসিয়ান গিল্লীদের কথা বলছিলাম, তাদের মধ্যে অনেকে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সব কীর্তি করেছে। বড়োবয়সে অক্ষর চিন্তে শিখে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ও মনে অমানুষিক উচ্চাশা নিয়ে, তারা সব এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বড় বড় আপিশের কর্মচারী হয়েছে। অনেক সময় বুথা নষ্ট হ'য়েছে বলে কাজ করবার আগ্রহ ও ক্ষমতা সাধারণ মেয়েদের চেয়ে এদের ঢের বেশী।

কেবল একটা দেশে কেন, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চেষ্টা করলে পাঁচ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করে দেওয়া যায়। আমাদের দেশ তা হ'লে বেঁচে যায়। দু' বছর আগেকার দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কলকাতার সব মহিলা সমিতির দরজায় দলে দলে মেয়েরা এসেছিল যাদের এক পয়সা রোজগার নেই। রাখাবাড়া ছাড়া তারা কেউ কিছু শেখে নি। তখন আমাদের সমস্যা ছিল এদের দিয়ে কি করা যায়? এরা কি কিছু শিখতে পারবে? সাধারণ হিসাবের শিখবার বয়স এদের বহুদিন পার হয়ে গেছে।

তারপর দেখা গেলো চেষ্টা করলে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু হাতের কাজ করতে পারে, সেসাই, কাগজ তৈরী, তাঁতের কাজ, পুতুল তৈরী, মাহুর বোন একটা না একটা কিছু অভ্যাস করলে হাতে এসেই যায়। একেবারে কিছু পারেনা এমনও দেখা গেছে। কিন্তু তাদেরও মনে হয় আরও সময় দিলে আরও ধৈর্য ধরে শেখালে শেষ অবধি কিছু উন্নতি হ'বে।

এই যে বড়োদের হাতের কাজ শেখানো, এও বয়স্ক শিক্ষার একটা অঙ্গ।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে এই দুই রকম শিক্ষা, লেখাপড়া শেখানো আর হাতের কাজ শেখানো, একত্র করা হয়েছে।

তার নাম তাঁরা" বুনেদী অর্থাৎ হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাদান করবার মৌলিক শিক্ষা।

কাজটা এখনও সম্পূর্ণ আকার নেই নি, এখনও নানান রকম পরীক্ষা চলছে, কিন্তু যতদূর দেখা গেছে মনে হয় অপ্রত্যাশিত রকম সফল পাওয়া যাবে। এই রকম শিক্ষা দান করবার জ্ঞান ও শিক্ষক তৈরী করবার চেষ্টা চলছে।

প্রণালীটা একেবারে নতুন না। বহুকাল আগে পাশ্চাত্য দেশের গ্যারি স্কুলের কথা শুনেছিলাম যেখানে নানারকম খেলাধুলো আমোদ আহলাদ এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যাদান করা হয়।

এই গ্যারী স্কুলের প্রণালীর সঙ্গে বুনেদি শিক্ষার বেশ একটা মিল আছে। প্রভেদ এই যে গ্যারি স্কুলে খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে ছোট ছেলেদের শিক্ষাদান চলতো আর এখানে শুধু ছোট কেন বিশেষ করে বড়দেরও হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদান চলবে। ছোট ছেলে খেলনা থেকে যে আনন্দ পায়, বড়রা মনের মতন হাতের কাজ থেকে তার অনুরূপ আনন্দ পায়। বড়দের এই ক্লাশগুলো বোধ হয় অনেকটা এই ধরনের হবে। সব যেন তাঁত চালাতে শিখছে। খটা ষ্ট করে তাঁত চলছে, যন্ত্রের মতন হাত চলছে, এদিকে চিন্তা করবার পরম সুযোগ হয়েছে। শিক্ষক যিনি তিনি তাঁত তৈরীর কথা তুলে তাঁতের ইতিহাস, ও যন্ত্র শিল্পের ইতিহাস শেখালেন। কিংবা পৃথিবীর কোথায় কি রকম তাঁতের কাজ হয় এই সব আলোচনা করে থানিকটা ভূগোল শিখিয়ে দিলেন। তাঁতের জ্ঞান কি রকম কাঠ দরকার হয় সেই কথা বলতে গিয়ে অনেকখানি প্রকৃতির কথা বলে ফেললেন। ছাত্ররা পরে হয় ত ঐ সব কথাগুলি নোটবইএ লিখে রাখল। কারণ এ কথা সত্যি যে যতদিন না নিজের মনের কথা কাগজ কলমে প্রকাশ করতে পারছে এবং পরের মনের কথা কাগজ কলমের সাহায্যে লেখা থেকে কি ছাপা বই থেকে বুঝতে পারছে ততদিন পর্যন্ত হাজার হাতের কাজ সম্বন্ধে যৌথিক জ্ঞান থাকুক না কেন ছাত্রদের লেখাপড়া শিখিয়েছি এ কথা বলা যায় না।

বড়দের দ্বারা লেখাপড়া শেখাবার ভার নেবেন তাঁদের

কতগুলি বিষয়ে সাবধান হ'তে হ'বে। প্রথমতঃ অবাস্তব কথা বলে সময় নষ্ট করা চলবে না, কারণ সময় সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা নিভুল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই, কারণ ভুল সংশোধন করবার জ্ঞান সামনে বছরের পর বছর ব্যাপী ছাত্রজীবন পড়ে নেই। তারপর এ কথাও মনে রাখা উচিত যে বড়দের যখন শিশুদের চেয়ে বুঝবার ক্ষমতা বেশী তখন শিশুপাঠ্য এইএর থেকে জটিল জিনিষও তারা সহজে ও শীঘ্র বুঝে নেবে।

অনেক বড় সহরে নাইট স্কুল আছে। এই স্কুলের অধিকাংশই গরীবদের জ্ঞান, যাদের দিনের বেলা চাকরি বাকুরি করতে হয়, কাজেই লেখাপড়ার জ্ঞান রাতে ছাড়া সময় থাকে না। এই সব স্কুলেও যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা'কে এক রকম বয়স্ক শিক্ষা বলা চলে, কারণ ছাত্রদের অধিকাংশের শৈশব পার হয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রও চোখে পড়ে যারা স্বযোগের ও শিক্ষার অভাবে হয়ত ছাপাখানায় চাকুরি করেই জীবন কাটাতে।

এই Adult Education এর ক্ষেত্রে ভেবে দেখ প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষ, ক্লাশ ফাইবের উপরের প্রত্যেকটি স্কুলের ছাত্র, কত সাহায্য করতে পারে। মনে করে দেখ যে প্রত্যেক বছর কলকাতায় ত্রিশহাজার বত্রিশহাজার কি আরও বেশী ছেলে মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়; এদের প্রত্যেকে যদি একজন করে নিরক্ষরকে লিখতে পড়তে শিখিয়ে দেয় তা' হ'লে প্রতি বছর এই একটা সহরের শিক্ষিত লোকসংখ্যা ত্রিশ-বত্রিশ হাজার করে বেড়ে যাবে। তা' হলে দশ বছরে কত লোকের লেখাপড়া শেখা সম্ভব কল্পনা করে দেখ।*

নানান জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন একজন লোক যদি মূর্খ হয় তা' হ'লে সে চিরদিনের মতন হাত পা বাঁধা থাকে। কারণ যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সঞ্চিত বিদ্যাবাশির সঙ্গে তার কোনও যোগ থাকে না। নিজে যদি কিছু উদ্ভাবন করে সেও যতক্ষণ না পর্যন্ত আরেকজনের সাহায্য নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভবিষ্যতের জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হবে না। অতএব প্রত্যেককে লেখাপড়া শিখতে হবে।

প্রতিটি "আজ" রাত্রিশেষে গড়িয়ে গিয়ে "কাল"র কোলে লয় পাচ্ছে। আজকের প্রত্যেকটি ছোট বড়

কাজের ফললাভ হবে কাল, কি পশু, কি অনাগত ভবিষ্যতে। যেমনি বর্তমান অতীতের ফলধারণ করে, তেমন ভবিষ্যতে বর্তমানের পরিণতি হবে। আমরা যদি যা কিছু করি ও যা কিছু ভাবি সমস্ত ভবিষ্যতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তা' হ'লে সোণার তৈরী হ'বে। প্রত্যেকে একটি মাত্র লোককে যদি বিদ্যাদান করতে পারি, প্রত্যেকে তবে ভবিষ্যতের দেশসেবার জন্য একটি ক'রে লোককে যোগ্যতর ক'রে দিই।

আমাদের মধ্যে ক'জনাই বা প্রতিভা নিয়ে জন্মাই;

কিন্তু প্রত্যেকেই যেটুকু সামর্থ্য নিয়ে আসি আর নিজেরা লেখা পড়া শিখ'বার যে সুযোগ পাই, তার সমাবেশে প্রতিভাবানের প্রতিভার চেয়ে কিছু কম হলেও যথেষ্ট দেশের কাজ করতে পারি। শিক্ষাবিস্তারের মতন ব্রত আর নেই। পাত্র নির্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার সব সেবার উপরে স্থান নেয়।

• ছাত্রদের সাহায্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ে ৬৮মানন্দ চট্টোপাধ্যায় বহু বৎসর 'প্রবাসী' প্রভৃতিতে লিখতেন।

কুত্তা

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

“কুত্তা আমার মাণিক,
আদর পেলে নাচে খানিক খানিক।
কুত্তা আমার সোনা—”

আমার ছয় বৎসরের কুত্তা তার সাঁথের কুত্তার গায়ে হাত ব্লাইতে ব্লাইতে উপরের কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিল। কুকুরটা আদরে গলিয়া গেল। গিন্নী তার ভাবগতিক দেখিয়া বলিলেন, “দেখ, দেখ, ঠিক যেন মাছের মত ও সব বুঝতে পারে।”

খুকী বলিল, “পারেই ত মা।”

আমি বলিলাম, “কুকুর বুদ্ধিমান জন্তু।”

খুকীর মা হাসিল: “শুধু কি বুদ্ধি? ওর হৃদয়টাও কি দেখা যাচ্ছে না?”

বাস্তবিক, কুকুরের মত প্রভুত্ব জন্তু জগতে দুলভ। আমি ছেলে বেলা হইতেই কুকুর পুষি, এবং তাদের নানা প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়া বিস্মিত হই। কিন্তু আমার হৃদয়বশত আমার কোন কুকুরই বেশি দিন বাঁচে না। বাপের মত কঠোরও কুকুরপ্রীতি হইবে, আশ্চর্য্য কি।

কিন্তু কতাকে লইয়া সোহাগ করিবার বা কতোর প্রতি কুকুরের ভালবাসা (মায়ের কথা ছাড়িয়াই দিলাম) উপভোগ

করিবার সময় আমার নাই। আমি ট্রেন ধরিবার জন্য দৌড়িলাম। ১০টার মধ্যে কলিকাতায় পৌছিয়া আপিস করিতে হইবে। স্ততরাং আমায় ৭-৫৫ মিনিটের ট্রেন ধরিতেই হইবে। শনিবারে গৃহে আসিয়া মনে হয়, সপ্তাহে একবার পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলন—এর চেয়ে স্থখ কোথায়? আর সোমবার সকালে উঠি পড়ি করিয়া ছুটিতে ছুটিতে মনে হয়, কেরণী জীবনে স্থখ কোথায়?

ট্রেনের যে কামরায় উঠিলাম, অতি কষ্টে তাতে বসিবার স্থান হইল। পরে ধান্দা আসিলেন, তাঁদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। একজনের পায়ে গোড়ালির দিকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চুকিয়া তিনি সকাভেরে বলিলেন, “ভাই, দয়া করে বসতে একটু জায়গা দিন। দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ্য আমার নাই।”

ভদ্রলোকের প্রতি সকলের মহানুভূতি হইল। একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “বহন, আপনি বহন এখানে।”

• জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হয়েছে আপনার পায়ে?”

“আর বলেন কেন, মশাই?” ভদ্রলোক সকাভেরে বলিলেন। “কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।”

“এ্যা?” আমি চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল, এমন অবিশ্বাস্য কথা যেন আর কেহ বলে নাই।

সকলে সম্মুখে বলিয়া উঠিলেন, “সে কি রকম মশাই, সে কি রকম মশাই?”

ভক্তলোক কষ্টে বসিলেন ও একটু দম লইয়া বলিলেন, “বলছি, শুনুন। এ ধরণের প্রতিশোধ-পরায়ণ কুকুর আপনারা আর কখনও দেখেছেন কি না জানি না। আমি জীবনে দেখি নি। সেদিন আমি ষ্টেশনে বেড়াতে এসেছিলাম—আপনাদের মত ১০টায় কলকাতায় পৌছে রোজ আপিস করতে হয় না, এজ্ঞ ভগবানকে ধন্যবাদ! ষ্টেশনে এসে দেখি, প্রায় জনশূন্য। ভাবছি, এর মানে কি। এমন সময় একটা কুলি ছুটতে ছুটতে বলে গেল, ‘বাবু পালিয়ে যান, পালিয়ে যান।’

“কেন পালিয়ে যাব?”

“সে শুধু বলে, ‘পাগলা কুকুর’।

“বোঝা গেল, কাছে কোথাও একটা পাগলা কুকুর রয়েছে। তারই ভয়ে সবাই সমস্ত। সামান্য একটা কুকুর, তাকে এত ভয়? হলই বা পাগলা। বাঘ নয়, সাপ নয়, কুকুর মাত্র। তাকে লাঠির ঘায়ে মারতে কতক্ষণ লাগে? আর আমার লাঠিরও দরকার নাই। ছুবেলা নিত্য মুণ্ডর ভাঁজি। আমি এক ঘুসিতে তাকে চেপ্টা করে দিতে পারি।”

আমাদের ছোড়া ছোড়া চোখ ভক্তলোকের উপর পড়িল। হাঁ, চেহার। বটে। নিটোল গড়ন। স্বাস্থ্য যেন সর্বাঙ্গ দিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। সুন্দর বলা চলে না, তথাপি অনবদ্য স্বাস্থ্য একটা তুলিত সৌন্দর্য দান করিয়াছে। একবার তাকাইলে চোখ ফেরান যায় না।

আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টির উত্তরে ভক্তলোক একটুখানি হাসিলেন মাত্র।

তিনি আবার বলিতে শুরু করিলেন, কিন্তু মশাই, কুকুর যে এত হিংস্র হতে পারে আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি এখনও তার সেই জল্জলে চোখ দুটি যেন দেখতে পাচ্ছি। বাপু! সে কি চোখ? সে চোখে বিশ্বের সমস্ত হিংসা, সমস্ত ক্রোধ যেন জমা হয়েছে। ভয়ংকর, অথচ—অথচ—অপূর্ব সুন্দর।”

আমরা কোলাহল করিয়া উঠিলাম। “সুন্দর? সুন্দর বলছেন?”

“সুন্দর।”

“ভয়ংকর আবার সুন্দর হয় কি করে, মশাই?”

“তা জানি না। আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। যার অভিরুচি হয়, বিশ্বাস করুন। যার হয় না, তিনি অবিশ্বাস করুন। কিন্তু সে দৃষ্টি আমি কোন দিন ভুলব না। পশু, পশু-শক্তি বলতে কি বুঝায়, যদিও আমি তা প্রথম ভাল করে বুঝলাম।

“সে আমাকে দেখে প্রথমটা একটু থমকে দাঁড়াল। ভাবলোনা যেন এই: আরে, আরে, সবাই পালিয়ে গেল, আর তুই একা দাঁড়িয়ে আছিস? মরতে চাস?”

“আমিও বুক ফুলিয়ে যেন চোখের ভাষায় জবাব দিলাম, মরব কেন? তোকে অত ভয় কিসের বা? আমার সঙ্গে লড়তে আসলে সহজে নিস্তার পাবি না।

“সে একবার মাত্র মাথা ঝাড়া দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে, ঠিক মশায় বিদ্যুতের মত, আমি কিছু বুঝবার আগেই আমার গোড়ালিতে তার দাঁত বসিয়ে দিল। আমার পা বেয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

“কিন্তু আমি ত ছাড়বার পাত্র নই। সে কিছু বুঝে উঠবার আগে আমিও তার পিছনে তাড়া করে তার নাকে দড়াম করে এক ঘুসি লাগলাম।

“সে চলে যাচ্ছিল। ঘুসি খেয়ে ঠিকরে পড়ল। কিন্তু উঠেই আবার তীরবেগে এসে আমায় আগের জায়গার পাশে কামড়িয়ে দিল। আমিও তাকে আর এক ঘুসি তার দাঁতের উপর বসিয়ে দিলাম।

“তখন ত র যা চেহার।, দেখবার মত। ছুটে এল এবং আবার আমার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিল। দুটো প্রচণ্ড ঘুসি খেয়েও যে কুকুর আবার ফিরে এসে কামড়ায়, সে কি রকম প্রতিহিংসা-পরায়ণ সহজেই বুঝতে পারবেন।

না, আর ক্ষমা নাই। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে তার মুখ দুই হাত দিয়ে চিরে ফেললাম। সে আতর্নাদ করতে করতে মরে গেল। চারিদিক থেকে লোক ছুটে এল ও আমায় বাঁহবা দিতে লাগল, যেন আমি কত বড় বীর। কুকুরটা রক্তের মধ্যে পড়ে রইল।”

“এদিকে পা ফলে ঢোল। কলকাতায় গিয়ে মেডিকেল কলেজে দেখাই। রোজ একটা করে ইন্জেকশন নিতে হচ্ছে।”

যাত্রীদের মধ্যে একজন বিস্তৃতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কুকুরটাকে মেরে ফেলেন মশাই?”

“মারব না? না—মারলে ও আরও অনেকের ক্ষতি করত।”

“কিন্তু আপনার নিজের জীবন এমন ভাবে বিপন্ন করা ঠিক হয় নি।”

“হাঁ, খানিকটা গোয়াতুমি করেছি, তা আর অস্বীকার করি কি করে?”

“আমি তা বলছি না।”

“তবে?”

“কুকুরটাকে মারা ঠিক হয় নাই।”

“কেন?”

“কুকুরটাকে কয়েক দিন—দিন দশেক—আপনার দেখা উচিত ছিল। দশ দিন পরে মরে গেলে বুঝতেন ওটা পাগল; সেই রকম চিকিৎসা চলত। এখনত বুঝবার উপায় রইল না।”

ভদ্রলোকের মুখ একটু ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কিন্তু তিনি নিজেকেই যেন আমোল না দিয়া বলিলেন, “আমি ও সব কুসংস্কার মানি না। আর রোজ রোজ দাঙ্গায় কত লোক মারা গেছে। আমিও না হয় মারাই যাব।” বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই গল্প শুনিয়া আমি সেদিন ও সমস্ত সপ্তাহ

রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই। যখনই ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার ছয় বৎসরের কণ্ঠ্যর কুত্তার মুখ আমার মনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ওটাও ত পাগল হইতে পারে। তখন? তখন কি উপায় হইবে?

শনিবার দিন গিয়া দেখি একটা মাদুরের উপর কণ্ঠ্য ও কুত্তা গায়ে-গা লাগাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। গিন্নীকে বলিলাম, “কুত্তাটাকে বিদায় করে দাও।”

“কেন?”

ট্রেনে যা শুনিয়াছিলাম বলিলাম। বলিল, “তাইত, কিন্তু খুকী কি বুঝবে?”

খুকী বুঝিবার মেয়ে নয়। আর যতবার তার কুকুরটার দিকে তাকাই, ওর গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া যাই। ইতর জীব বটে; কিন্তু সন্দেহ মাত্র থাকে না, আমার খুকীকে ও কি গভীর ভালবাসে।

মনে মনে ভাবি, হা ঈশ্বর, এই জীব, যে এক মুহূর্ত আমার মেয়েকে না দেখিলে অস্থির হইয়া যায়, যে কত না ভাবে ও ভদ্রীতে তার গভীর অহুসার জানায়, সে কেমন করিয়া এমন পশুতে পরিণত হয় যে, কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়াও সঙ্গিনীর কুসুম পেলব স্বকে তার দাঁত বসাইয়া দিতে পারে? নেহাৎ পশু বলিয়াই বোধ হয় তা সম্ভব।



স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীমুখার্জী দে

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। আই এ তে শতকরা ২৯ জন ও আই এম সি তে শতকরা ৩১ জন ছেলে পাশ করিয়াছে। আমাদের জ্ঞান হওয়া অবধি পাশের সংখ্যা এত কম হইতে দেখি নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত কড়া লোক, এবং তিনি কোন প্রকার অত্যাচার প্রদর্শন দিবেন না, এইরূপ একটা রব চারিদিকে শোনা যাইতেছে। স্বতরাং, পূর্ব পূর্ব বৎসরের নম্বর বাড়ান লইয়া গলদসমূহ দূরীভূত হইয়াছে, এবং “অনুগ্রহ” নম্বরের ছড়াছড়ি হয় নাই, এবং কাহাকেও আগে থেকে নম্বর বলিয়া দেওয়া হয় নাই, এবং আরও অনেক কিছু।

এই নূতন ধারা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথমত একটা অবাস্তব কথা বলি। নম্বর বাড়ান লইয়া যে তদন্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তার রিপোর্টের কোন কোন অংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাগজে ছাপা হইয়াছে। বাংলার সংবাদ পত্রগুলিও প্রকাশ করিয়াছে। উহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থলে—সারা ভারতে—বাঙ্গালীর ছেলেকে না কি মাথা হেঁট করিতে হইয়াছে। আমাদের শিক্ষক ও ছাত্রদের মত এমন অপকীর্তি না কি আর কোন দেশে কখনও কেহ করে নাই। ইহা লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের কাগজে টিটকারি, ব্যঙ্গ পর্বন্ত হইয়া গিয়াছে। অল্প দেশের লোকেরা বলিয়াছে : ও ! তোমাদের ছেলেরা এই রকম। তাহলে তারা আমাদের ছেলের সংগে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে কেন ? সেইজন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন প্রদেশবাসীর এই আত্মপ্রসাদ ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য। এবং যারা সত্যকার গুণগ্রাহী, তাঁরা বাঙ্গালীর

ছেলেদের সম্বন্ধে নিশ্চয় উচ্চ মতি পোষণ করিবেন। পরীক্ষার ব্যাপারে মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে কি অনাচার ঘটিয়াছে, তার উল্লেখ না হয় নাই করিলাম। বর্তমান লেখকের সমগ্র উত্তর ভারত পর্যটন করিবার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইয়াছে। তাতে দেখা গিয়াছে যে, বুদ্ধির মাপকাঠিতে বাঙ্গালীর ছেলে অল্প ছেলেদের চাইতে বহু অগ্রগামী।

কিন্তু আমাদের বুদ্ধির গর্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। এক দিক দিয়া বলা চলে ‘অতি বুদ্ধি’ আমাদের পক্ষে ‘গলার দড়ি’ স্বরূপ হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেই বলি আর শিক্ষার ক্ষেত্রেই বলি বাঙ্গালীর বুদ্ধির অহংকার তাকে পরিশ্রম-বিমুখ অবজ্ঞা-পরায়ণ ও নিম্নদৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। সে বিপথগামী হইয়াছে। প্রত্যেকে নিজেকে বড় করিয়া দেখি বলিয়া আমরা স্ব স্ব স্বাধীন, নেতা মানিতে চাই না, প্রত্যেকে নেতা হইতে চাই। আমাদের এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন না হইলে জাতির কল্যাণ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাট্রেই ইহা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন।

বস্তুত আমরা যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে পারি না, অল্প প্রদেশবাসীর চাইতে বুদ্ধিতে নান না হইয়াও ঐক্যবদ্ধ অল্পদের নিকট পরাজিত হই, তার গোড়ায় রহিয়াছে আমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে অহংকার। স্বতরাং আমরা দেশের ছাত্র-ছাত্রীকে এই কথা বলিব, বুদ্ধির অহংকার ছাড়িয়া দিয়া তোমার সত্য সত্য গভীর ভাবে পড়াশোনা কর। শতকরা পাশের সংখ্যা কম হওয়া তোমাদের পক্ষে শাপে বর হইবে, যদি তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও যে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তোমরা আরও বেশি-বেশি সংখ্যায় পাশ করিবে।

অল্প দিকে যারা হঠাৎ এরূপ কড়াকড়ির প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁদের বলি, ইহার অন্তর্নিহিত ত্রায়-বিচারের অভাবের কথাটা যেন তাঁরা একবার ভাবিয়া দেখেন।

যে প্রকার গুণবিশিষ্ট ছেলে গতবার পাশ করিয়াছে, এবৎসর তারা ফেল করিয়াছে। এ যেন, হঠাৎ আই সি এম পরীক্ষা বন্ধ হইলে বহু গুণবান ছেলের যেরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার স্বযোগ নষ্ট হইত। সেইরূপ এক বৎসর এই পরীক্ষায় পাশ করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে যে চাকুরি জুটিত, সেই পরীক্ষা রহিত হওয়ায় সেই পদ অল্প বৎসরের ছেলের পক্ষে সারা জীবনেও লাভ করা সম্ভব হইল না। তাকে বলিতে পারা যায় এবং আমাদের বর্তমান বছরের ফেল করা ছেলেকেও বলিতে পারা যায়, এ তোমার ভাগ্যের দোষ। তুমি করিবে কি? গত বৎসর পরীক্ষা দিলে অন্যায়সে পাশ করিয়া যাইতে পারিতে। কিন্তু এ বৎসর পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে তোমার পাশ করা হইল না। বলা বাহুল্য, ইহা সামান্যের কথা নয়, গ্রাম-বিচারও নয়।

ভাবিবার মত আরও একটা কথা আছে। তা হইতেছে, পরীক্ষার ঘরে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে আটকাইয়া রাখিয়া তাদের জীবনকে বিফল করিবার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিতেন, ফেল করিলেই জীবন নষ্ট হয় না।—এই নজীর দেখাইলেও অভিভাবক ও পড়ুয়া বরাবর মনে করিবেন, পরীক্ষায় পাশ না হওয়ায় অর্থ জীবন ব্যর্থ হওয়া। আর পরীক্ষায় ফেল করিয়া যারা বাংলার যুবক-যুবতীদিগকে জীবনের অগ্রাগ্রা ক্ষেত্রে চালনা করিতে চান, তাঁরা পরীক্ষায় পাশ করাইয়াও তা করিতে পারেন।

আমাদের মনে হয়, পরীক্ষায়, বিশেষত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যত অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাশ করে ততই দেশের মংগল। এই নিম্নতম শিক্ষার ছাপটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দিবার চেষ্টা করা উচিত।

অত্যন্ত নীচু হারে পরীক্ষায় পাশ করাইলে কলেজগুলির দুর্বস্থা হইতে বাধ্য। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে, পড়ুয়ার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা করিবার জন্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে তার প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিবার ক্ষমতার উপর এত জোর দিবার কি সার্থকতা আছে? আমাদের বিবেচনায় পড়ুয়াদের সমগ্র বৎসর ধরিয়া বুদ্ধির পরীক্ষায় যাচাই করিয়া দেখা দরকার, এবং বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালীর আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। ইহা হইতে

বুঝা যাইবে, আমরা বিদ্যা অর্জনে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী, কিন্তু তার পথ কম সংখ্যককে পাশ করাইয়া হয় বলিয়া মনে করিনা।

মন্ত্রী ডক্টর আর আমেদ

পশ্চিম বংগের মন্ত্রী-সভায় ডক্টর আমেদ মনোনীত হওয়ায় আমরা তাঁকে আমাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁকে বহুদিন হইতে জানিবার স্বযোগ আমাদের হইয়াছে। তিনি সেই জাতীয় মুসলমান যার হাতে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হইবে বলিয়া মনে করি। বস্তুত, একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, সাহায্য ও পুনর্বাসতি, তাঁর হাতে গ্রস্ত করা হইয়াছে। পুনর্বাসতি বলিতে আমরা পূর্ব বংগ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসতিও বুঝি। যদি আমরা ঠিক বুঝিয়া থাকি, তা হইলে রায় মন্ত্রি-সভা ডক্টর আমেদের উপর কতখানি বিশ্বাস রাখেন, তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কিছুদিন পূর্বে ডক্টর আমেদ কেন্দ্রীয় আইন সভায় পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, আইন-সভার মধ্য দিয়া তিনি দেশ সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় মহাসমিতির সভাগণ সৈয়দ নৌসের আলিকে মনোনয়ন করায় তাঁর সে স্বযোগ ঘটে নাই। আমরা আশা করি, এখন যখন নির্বাচিত হইলেন, তিনি তাঁর যোগ্যতা দেখাইতে সমর্থ হইবেন।

কোন কোন স্থানে এরূপ সমালোচনা হইয়াছে যে, ডক্টর আমেদের মনোনয়ন নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফল। স্বতবাং পশ্চিম বংগের অহিন্দুদের আস্থাভাজন কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রি-সভায় লওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ ডক্টর আমেদ এরূপ আস্থাভাজন ব্যক্তি নন। আমরা এ বিষয়ে সম্যক অবগত নহি। কিন্তু দায়িত্বশীল মন্ত্রি-প্রথা যদি আমাদের কাম্য হয়, তা হইলে আমরা বলিব, পশ্চিম বংগের আইন-সভার অভিজ্ঞ দলের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে মন্ত্রি-সভায় গ্রহণ করাই সমীচীন, এমন কি যদি তাতে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি আন্তরিক ভাবে পালিত নাও হয়, তা হইলেও তা সমর্থন যোগ্য। কারণ গণতন্ত্রের সম্মান-রক্ষার কতব্য এই চুক্তির চেয়ে বড় জিনিষ। বিরোধী দল

যখন অভিজনে পরিণত হইয়া মস্তিষ্ক গঠন করিবেন তখন তাঁরা নিজেদের আত্মভাজন কোন ব্যক্তিকে মস্তি-সভায় লইবেন, তাই স্বাভাবিক।

কোড়িয়ার যুদ্ধের রোজ নামচা

কোড়িয়ার যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। প্রথমত ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি।

২৫শে জুন। বিকাল বেলা কলিকাতায় সংবাদ প্রচারিত হইল, কোড়িয়ায় হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর কোড়িয়ার সহিত দক্ষিণ কোড়িয়ার সংঘর্ষ। সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন ত্রাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানি, নিউ ইয়র্ক হইতে—উত্তর কোড়িয়া দক্ষিণ কোড়িয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। জাপানের রাজধানী তোকিও হইতে মার্কিন সূত্রে সংবাদ আসে যে উত্তর কোড়িয়ার জংগী বিমান দক্ষিণ কোড়িয়ার রাজধানী সিউলের কিংপো বিমান বন্দরে একটি মার্কিন বিমানের উপর আক্রমণ চালায়। সূদূর প্রাচ্যের মার্কিন বিমান বাহিনী সিউলের মার্কিন জংগী বিমান বহরের সহায়তায় সিউল হইতে মার্কিন নাগরিকদের সরাইয়া লইয়া যাইবে। দক্ষিণ কোড়িয়ায় প্রায় দুই হাজার মার্কিন নাগরিক আছে। উত্তর কোড়িয়ার সৈন্যদল ২০টি ট্যাংক সহ ইমজিন নদী অতিক্রম করে,— উদ্দেশ্য সিউল রক্ষার প্রধান ব্যূহের উপর আক্রমণ চালান। টেলিফোন যোগে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে জানা যায়, উত্তর কোড়িয়ার সৈন্যদল ইমজিন নদীর অপর তীরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। তারা সিউলের ৪০ মাইল উত্তরে কেইমং নামক একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র অধিকার করিয়াছে। ২৫শে জুন রাত্রিতে সম্মিলিত পক্ষের স্বেচ্ছা হেড কোয়ার্টার্সে জেনারেল ম্যাকআর্থার ও অপর ৭ জন জেনারেল এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের উপদেষ্টা মিঃ ড্রলেসের মধ্যে কোড়িয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনা হয়।

কোড়িয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান কমিশন সরকারী বিরতি প্রচার করিয়া যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানাইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ কোড়িয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অন্তশস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দঃ কোড়িয়ার দূত মুন চং রাষ্ট্রসচিব ডীন একিসনের

সহিত দেখা করিয়াছিলেন। দঃ কোড়িয়ার প্রেসিডেন্ট সিংগম্যান রী টেলিফোন যোগে জেনারেল ম্যাকআর্থারের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। উত্তরে বলা হয়, তোকিও হইতে মার্কিন অফিসারকে “পর্যবেক্ষক” রূপে পাঠান হইতেছে। লগুনস্থ দঃ কোড়িয়া রাষ্ট্রদূত সাহায্য চাওয়ার কথা স্বীকার করিয়া বলেন যে, এক পক্ষ পূর্বে দঃ কোড়িয়ার পররাষ্ট্র সচিব বর্তমান আক্রমণের আশংকার কথা বলিয়াছিলেন।

লেকসাকসেস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় কোড়িয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক হয়। সোভিয়েট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। ভারতের প্রতিনিধি শ্রী বোনগল এন্ রাও সভাপতিত্ব করেন। একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল উঃ কোড়িয়া বাহিনী কর্তৃক দঃ কোড়িয়া গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আক্রমণ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ।

২৬শে জুন। তোকিও হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, উঃ কোরিয়ার সাঁজোয়া বাহিনীর একটি বিরাট অংশ পোচুন উইজংবু করিডোর ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। দঃ কোড়িয়া বাহিনীর অধিনায়ক জেঃ চে-বাইং ডুক বলেন, রুশীয় ও সাইবেরিয়ানরা ট্যাংক চালনা করিয়াছে। বিমান-যুদ্ধ চলিতেছে। অন্য ডঃ ম্যাকআর্থার প্রেরিত নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রহরায় ৮০০০ মার্কিন নাগরিক ইনচন বন্দর হইতে ইয়োকোহামা যাত্রা করিবে। ১৮০০ আমেরিকান ট্রেন যোগে ইঞ্চপ যাত্রা করিয়াছে। জাহাজ যোগে তাদের ইয়োকোহামা পাঠান হইবে। রুশ বেতার সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে নাই।

ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অন্য আমেরিকা জেঃ ডগলাস ম্যাকআর্থারকে অবিলম্বে জাপান হইতে দঃ কোড়িয়াকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়া কম্যুনিষ্ট প্রজাতন্ত্র উঃ কোড়িয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

লেক সাকসেসের সংবাদে জানা যায়, কোড়িয়া সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন অন্য রাত্রিতে তা প্রকাশিত হইয়াছে। তাতে বলা হইয়াছে, কোড়িয়ায় কম্যুনিষ্ট অভিযান পুরাপুরি

যুদ্ধের আকার ধারণ করিতেছে এবং উহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে।

লোক সাকসেস—নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরী বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি দ-কোড়িয়ার উপর আক্রমণের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার মর্ম নিম্নরূপ: নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে, দ-কোড়িয়ার গবর্ণমেন্ট আইন অল্পযায়ী প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেন্ট। নিরাপত্তা পরিষদ উ-কোড়িয়া হইতে সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং পরিষদ মনে করে এই কার্যের দ্বারা শান্তি ভংগ হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ উ-কোড়িয়ার কতৃপক্ষকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে ও তাদের সৈন্যদলকে উ-কোড়িয়ার সীমান্ত রেখায় সরাইয়া আনিতে বলিতেছে। পরিষদ কোড়িয়া সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কতৃক নিযুক্ত কমিশনকে উ-কোড়িয়ার সীমা রেখায় উহার সৈন্যদলকে সরাইয়া আনার কার্য পর্যবেক্ষণ করিতে এবং এই প্রস্তাব কি ভাবে কার্যে পরিণত করা হইতেছে, তৎসম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে সকল সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিতেছে। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তজ্জন্ত নিরাপত্তা পরিষদ সকল সদস্যকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছে এবং উ-কোড়িয়ার কতৃপক্ষকে কোন প্রকারে সাহায্য না করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইতেছে।

বুটেনের প্রতিনিধি সার টেরেস শোনের সমর্থনে এই প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদ কতৃক গৃহীত হয়।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, কোড়িয়ায় সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ায়, বিশ্বশান্তিতে জানা গিয়াছে, মার্কিন সমর বিভাগীয় সেক্রেটারি লুই জনসন ও চীফ অব ষ্টাফ জে: ব্রাডলী সম্মতি জাপান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিয়াছেন, তাঁরা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আরও জোরের সহিত দাবী করিবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফরমোজা অধিকার করুক, প্রেসিডেন্ট টুম্যানের নিকট এই সুপারিশ করা হউক।

২৭শে জুন। প্রেসিডেন্ট টুম্যান অদ্য মার্কিন নৌ ও বিমান বাহিনীকে কোরিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। ফরমোজার উপর যদি কোন আক্রমণ হয়, তবে উহা রোধ করিতে মার্কিন ৭ম নৌ-বহরকে নির্দেশ দেওয়া

হইয়াছে। ফিলিপাইন ও ইন্দোচীনে সাহায্য প্রেরণ স্বরায়িত করার জন্তও প্রেসিডেন্ট আদেশ জারী করিয়াছেন।

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দ-কোড়িয়ার সেনাবাহিনী যে প্রতিরোধ চালাইতেছে, উহাতে সাহায্য করার জন্ত প্রেসিডেন্ট টুম্যান মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রতি আদেশ জারী করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপেই তিনি এই সকল আদেশ দিয়াছেন। চীনের মূল ভূভাগে সর্বপ্রকার নৌ ও বিমান আক্রমণ বন্ধ করার জন্ত চীনের জাতীয় সরকারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

জাপানে নিযুক্ত মিত্রপক্ষীয় সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক-আর্থার কোড়িয়া অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনা ও ৭ম মার্কিন নৌ বহরের সর্বময় কতৃক গ্রহণ করিয়াছেন। কোড়িয়ায় স্থল বাহিনী পাঠাইবার ইচ্ছা আমেরিকার নাই।

যুদ্ধরত দক্ষিণ কোড়িয়াকে আর্থিক সাহায্যের জন্ত ৫ কোটি ডলার সহ ৬৫,৩৭,৬১,৮০৮ ডলার বরাদ্দ বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ কতৃক গৃহীত হইয়াছে। মার্কিন পরিকল্পনা অল্পযায়ী সাহায্য ছাড়াও দ-কোড়িয়াকে আরও ১৩,২৩,০০০ ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে। পুনর্গঠন করিয়া অল্পযায়ী সাহায্য দানের সময় হইতে এ পর্যন্ত দ-কোড়িয়াকে ১১,৩৭,৮৪,০০০ ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে তোকিওর সংবাদ—উ-কোড়িয়ার সেনা বাহিনী প্রাতে সাত ঘটিকার সময় সিউলে প্রবেশ করিয়াছে।

দ-কোড়িয়া গবর্ণমেন্ট সিউলের ২৫ মাইল দক্ষিণে সিউওয়ান নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

হংকংর সংবাদ—উ-কোড়িয়ার রাজধানী পিয়ংইয়াং হইতে জানা যায়, উ-কোড়িয়া লোক পরিষদ ৭ জন সদস্য লইয়া এক সাময়িক কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিনা আপত্তিতে এই কমিটির সকল আদেশ মানিয়া লইতে হইবে। সিংম্যান রীর পরিচালনাধীন যে দক্ষ্যদল এই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্ত দেশের সর্বত্র জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব এই

কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। লোক পরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর দেশের সকল ক্ষমতা এই কমিটির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকিবে। ইহার সকল আদেশ ও বিধান অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলি কমন্স সভায় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিবৃতি পাঠ করেন এবং জানান বুটেন উহার সমর্থন করিবে।

৩০শে জুন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান-নৌবহরের সাহায্যে কোড়িয়ার সমগ্র উপকূলভাগ অবরোধের আদেশ দিয়াছেন এবং স্থল বাহিনীকে কোড়িয়ার রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি বিমান বাহিনীকে উ-কোড়িয়া আক্রমণের ক্ষমতাও দিয়াছেন।

মার্কিন স্থল সৈন্য বাহিনী ইতিমধ্যেই কোড়িয়া ঘাট্রা করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ঘোষণার কয়েক মিনিট পরেই এই অভিযান শুরু হয়। মাকআর্থার ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার উত্তর দিকস্থ এলাকায় লক্ষ্য বস্তু সমূহের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য বিমান বহরকে নির্দেশ দিয়াছেন। মস্কো বেতারে বলা হয়, ২৭ থানি মার্কিন স্থপার ফোর্ট বিমান পাই-অংগ এ আক্রমণ চালায়। কিন্তু ওয়াশিংটনে এ খবর স্বীকৃত হয় নাই।

দক্ষিণ কোড়িয়ার প্রধান রদাব্যুহ ভেদ করার জন্য উ-কোড়িয়ার সৈন্য বাহিনী সকালে হ্যান নদী অভিক্রম করিয়াছে। মার্কিন বিমান আগেই নদীর উপরের তিনটি সেতু ধ্বংস করে। উ-কোড়িয়া বাহিনী নুকোহিনান নামে ক্ষুদ্র নৌঘাঁটি দখল করিয়াছে।

দ-কোড়িয়া বাহিনী হ্যান নদী অতিক্রম করার উ-কোড়িয়া বাহিনীর অধিনায়ক মেঃ জেঃ চেবং দুর পদত্যাগ করিয়াছেন।

ক্যানবারা হইতে অষ্ট্রেলিয়ান গবর্নমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন, জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ জাপানস্থ অষ্ট্রেলিয়ান বিমান বহর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কাজ করিবে।

নিউ ইয়র্কের ২৯শে জুনের সংবাদ এই যে, জানা গিয়াছে চীনা কমিউনিষ্টগণ জাতীয়তাবাদিগণ কর্তৃক অধিকৃত ফরমোজা আক্রমণ করিবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে।

জর্জ বার্নার্ড শ বলেন, কোন যুদ্ধান্ত ব্যবহারের ফলে যখন দেখা যায় আক্রমণকারী ও প্রতিপক্ষ উভয় দলের ক্ষতি ঘটিতেছে তখন স্বতই ঐ অস্ত্রের বিলোপ হয়। এই কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ক্লোরাইড অব নাইট্রোজেন, ১৯১৪-১৮ সালে বিস্ফোরক গুলি, ১৮৩৯-৪৫ সালে বিষাক্ত গ্যাস নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তী যুদ্ধেও হাইড্রোজেন বোম ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়া রোগ বীজাণু বা অপর কোন ভয়ংকর মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হইবে।

বিখ্যাত দার্শনিক বার্টাও রাসেল সিড্‌নি (অষ্ট্রেলিয়া) হইতে বলিয়াছেন, রাশিয়া যুদ্ধে যোগদান করিবে এবং দশ বৎসর ধরিয়া তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলিবে। রাশিয়া এশিয়াতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে, আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রায় পর্যায়ে উপনীত হইয়াছি।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কোড়িয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকে কোড়িয়া প্রজাতন্ত্রে একদল হানাদারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের শাস্তি অভিযানরূপে অভিহিত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, কোরিয়াতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে।

যুদ্ধের তাৎপর্য

পূর্বাপর ঘটনার বিবৃতি আমরা আপাতত এখানে থামাইলাম। ইচ্ছা আছে তারিখ ধরিয়া ঘটনা-বিশ্লেষণ পাঠক পাঠিকাগণকে ইহার পরে দেখাইতে পারিব।

কোড়িয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে বর্তমান অবস্থা এই যে দ-কোড়িয়ার সৈন্যরা ৩৭ অক্ষ অতিক্রম করিয়া ৩৬ অক্ষের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধটা এখন হইতেছে উ-কোড়িয়া ও আমেরিকান সৈন্যের মধ্যে। যদিও যুদ্ধটা জাতিসংঘের নামে, কিন্তু বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অত্র কোন রাষ্ট্র যুদ্ধে নামে নাই।

গত মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে ১৯৪৫ সালে, কিন্তু তারপর একপক্ষে ইঙ্গ-আমেরিকা ও অত্র পক্ষে রাশিয়া আগামী যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়াছে। বার্লিন লইয়া কতবার সংগ্রাম আসন্নপ্রায় হইয়াছে। উ-কোড়িয়ায়

যে রাশিয়া ভিতরে ভিতরে সেনাবাহিনীকে তৈরী করিতেছিল, ইহা আমেরিকার না জানিবার কথা নয়। তথাপি দ-কোড়িয়া বাহিনী তেমন ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। ইহার একটা কারণ দেশবাসীর অপদার্থতা হইতে পারে, কিন্তু অল্প কারণ আমেরিকার উদাসিত্যও হইতে পারে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া হটিয়া যাইতেছে। রাশিয়া তাদের অস্ত্র ও রসদ যোগাইতেছে, ইহা জানা কথা। কিন্তু রাশিয়ান সৈন্য কোন জায়গায় যুদ্ধ করিতেছে, ইহার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অথচ আমেরিকার সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধে নামিয়াছে। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে আমেরিকানদের চাইতে কোড়িয়ানরা বেশী যুদ্ধ পারদর্শী?

চার্লিস বলিয়াছেন, কোড়িয়া যদি হস্তচ্যুত হয়, তা হইলে কোড়িয়ার যুদ্ধ বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হইবে। অথচ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধের ফলেও আমেরিকান সৈন্যরা ক্রমাগত পরাজিত হইতেছে, কোড়িয়ার সৈন্যদের হাতে বন্দী হইতেছে, ইহার অর্থ কি? যে আমেরিকান সৈন্যের যুদ্ধ-খ্যাতি আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই, যারা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অসাধারণ শৌর্ষের পরিচয় দিয়াছে, তারা আজ এশিয়ার রণক্ষেত্রে লজ্জা ও অকীৰ্তি কেন বরণ করিতেছে? কেনই বা যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য ও অস্ত্র স্বদেশ হইতে না আনিয়া আমেরিকান সৈন্য বা ম্যাক-আর্থার যুদ্ধে নামিলেন? আমেরিকা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পাঁচ দিন পরে যোগ দিয়াছে। তার মধ্যে লোক ও অস্ত্র আনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। উ-কোড়িয়া প্রকাশ্য ভাবে দ-কোড়িয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। অর্থাৎ পিছনে মস্ত বল ও ভরসা না থাকিলে উ-কোড়িয়া কি এভাবে যুদ্ধে নামিতে সাহস করিত? এবং একথা আমেরিকার অজানা ছিলনা।

তারপর, উ-কোরিয়াকে তাড়াতাড়ি হটাইরা দিতে পারিলে জগতে নিশ্চয় আমেরিকার প্রেষ্টিজ বাড়িত এবং রাশিয়া সহসা লড়াই করিতে অবতীর্ণ হইত না। তৃতীয় যুদ্ধ বাধিলে তাতে সুবিধা হইত। তথাপি আমেরিকা এভাবে যুদ্ধে নামিল কেন?

আমাদের মনে হয় আমেরিকার এই পশ্চাদপসরণ সত্যকার হার নয়। এই সন্দেহের অবকাশ এইজন্য আরও ঘটিতেছে যে নিজেদের হারের কথাটা আমেরিকা সর্বত্র ফলাও করিয়া বর্ণনা করিতেছে। আমরা ঘরে বসিয়া প্রতিদিন আমেরিকার পরাজয়ের কাহিনী পাঠ করিতেছি। এইরূপ সত্য ভাষণ (সত্য হইলে) যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল নহে। কাল যদি রাশিয়ার সহিত সত্য সত্য শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয় তা হইলে আমরা জানিতেও পারিব না কোথায় আমেরিকান সৈন্য হটিয়া আসিতেছে। আর ক্ষুদ্র কোড়িয়ার বিজয়-কাহিনী রটিত হইতেছে। আসলে আমেরিকা দেখাইতেছে, সে যুদ্ধে পারিয়া উঠিতেছে না, রাশিয়া নামিয়া পড়িলে তা আরও সর্বনাশ। ফাঁদে ফেলিয়া রাশিয়াকে যুদ্ধে নামানই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের সন্দেহ। স্ট্যালিন মনে করিতে পারেন, এই উত্তম সুযোগ। জয়ের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বিশ্ব জয় করিতে পারিব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্ট্যালিন যথেষ্ট চতুরতার পরিচয় দিয়াছেন। চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আমেরিকা যেন জাতি সংঘের ও বাহিরের সকল জাতিকে ডাকিয়া বলিতেছে, দেখ, দেখ, আমরা পারিতেছি না। তোমরা সাহায্য কর। সাহায্য করিতে তোমরা বাধ্য। নচেৎ কমিউনিজমকে রোধ করিতে পারিবে না।

আমাদের বিবেচনায় বর্তমানে আমেরিকা এই কুটনৈতিক চাল চালিয়াছে। আমাদের এই অনুমান সত্য কিনা তা শীঘ্রই বুঝা যাইবে। আর যুদ্ধের গতিটাও তখন আমরা ঠিক মত অনুসরণ করিতে পারিব।

মহিলা সমাচার

ত্রিজে্যোতিষচন্দ্র খোঁস

আই, এ, পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, ও আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীর পাশের হার পূর্ব পূর্ব বৎসর হইতে কম হইয়াছে। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ব্যানার্জি মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম যথাযথ ভাবে পালন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অল্পযায়ী বর্তমান সরে কোন বিষয়ে 'গ্রেস্ মার্ক' দেওয়া হয় নাই। ইহার দ্বা : পরীক্ষার মান ও বিশ্বস্ততা রক্ষা পাইবে, ছাত্র ছাত্রীগণের ন দিয়া পড়া ও পরীক্ষা দেওয়া অবশ্য করণীয় বলিয়া ধারণা চিতে জন্মাইবে।

এমন কড়াকড়ির পরীক্ষাতেও আই, এ, পরীক্ষায় লোরেটোর লীলা মিত্র এবং বারহামপুর গার্ল'স কলেজের করুণা ভট্টাচার্য্য এম ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ব্যায়ামে বালিকার শক্তি

কুমারী রেবা রক্ষিত ব্যায়ামাচার্য্য বিফুচরণ ঘোষের ছাত্রী। বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। সম্প্রতি ইনি এক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বুকের উপর এক টন ভার বস্ত্র অনায়াসে ধরিয়া দর্শকদের বিস্মিত করিয়াছেন। কুমারী রেবা অগ্ৰাণ্ড ব্যায়ামেও দক্ষ। ব্যায়ামের দ্বারা দেহ-সুগঠিত হয় এবং ব্যাধির গ্রাস হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েরই প্রয়োজন। নারীর স্বকুমার প্রবৃত্তি ধ্বংস যাহাতে হয় সে প্রকার পুরুষোচিত ব্যায়াম অল্পশীলন অবশ্য কর্তব্য নয়।

আমেরিকার সুকুমারী ১৯৫০ সালের আদর্শ মাতা পুরস্কার

সম্প্রতি উক্ত পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ৪২টি মাতা যোগদান করিয়াছিলেন। ৫৯ বর্ষীয়া হেনরী রোজ ক্লাউড সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে একটি পদক ও একখানি জয়পত্র পাইয়াছেন। তিনি চারিটি সন্তানের জননী,

তাহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম। তাহার চারিটি কন্যা সকলেই স্বাস্থ্যবতী রোগশূন্য। সব কয়টি গ্রাজুয়েট ও মেধাবী। সতত প্রফুল্লমনা। আদর্শ মাতারই পালন গুণে দেশের মেয়ে এরূপ সদগুণাবিতা। মিসেস ক্লাউড রেড ইণ্ডিয়ান বংশোদ্ভবা।

মাদ্রাজ সরকারের মহিলাদের প্রধান ব্যায়াম পরিচালিকা

শ্রীমতী লীলা রায় ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য বিদ্যায় আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মাদ্রাজ সরকার উক্ত প্রদেশের মহিলাদের ব্যায়াম শিক্ষার মহিলা প্রধান পরিচালিকা পদে শ্রীমতী লীলা রায়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি মাদ্রাজে যাইয়া উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন।

ব্রতচারী সপ্তাহকালীন শিক্ষা শিবিরে নারী

সম্প্রতি ব্রতচারী গ্রামে শ্রীমতী স্মৃজাতা রায়ের তত্ত্বাবধানে সাত দিনের জন্য এক শিক্ষাশিবির অল্পষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ২০টি বালিকা ও অনেক বালক ব্রতচারী নৃত্যালী, গীতালী ও কৃত্যালী পদ্ধতি শিক্ষা পান। তাহার সমাপ্তি উৎসবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ডি, পি, আই ডাঃ পরিমল রায় সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তাহাতে ব্রতচারী নৃত্য বাদ্যালীর সাংস্কৃতিক পরিস্ফুরণের এক অভিনব প্রকৃষ্ট আবদান বলেন। অনেক পাশ্চাত্য দেশে তিনি ফোক্ ড্যান্স (পল্লী নৃত্য) দেখিয়াছেন, কিন্তু, ব্রতচারীর ত্রায় এমন সাবলীল দেহ সঞ্চালন ও আনন্দের ঢেউ কোন স্থানে দেখেন নাই। ব্রতচারী নৃত্য চর্চায় নারীর দেহ ও মন আনন্দ ও শক্তিতে, পরিপূর্ণ হইবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মায়ের জাতি পুষ্টি লাভ করিবে।

সমাপ্তি উৎসবের অল্পষ্ঠান দেখিয়া সরকারের প্রধান স্কুল পরিদর্শিকা (স্কুল ইন্সপেক্ট্রিস) শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র

ও শ্রীমতী লীলা রায় পরম শ্রীতলাভ করিয়া ব্রতচারী নৃত্যালী ও কৃত্যালীর প্রশংসা করেন।

জাতীয় সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিযোগিতায়

মহিলার কৃতিত্ব

সম্প্রতি জাতীয় সঙ্গীত সম্মিলনীর ২য় বার্ষিক অনুষ্ঠানে শতাধিক মেয়ে ও ছেলে নানা ধারায় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। প্রায় ৮০ জনকে পারিতোষিক ও জয়পত্র বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমতী রেখা চাটাজিকে সর্বাঙ্গপেক্ষা বড় সিল্ড পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কার বিতরণ করিবার সময় আনন্দ বাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীচন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য বলেন গান জিনিষটা আমরা ওস্তাদের কাছে শিখি বটে, কিন্তু স্বর ফোটে মানুষের মনের মধ্যে। মানুষ সঙ্গীত শিখে স্বন্দরের সাধনায়। যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মনের মধ্যে স্বর ফুটিয়া উঠে। তাহার বেশ অল্প বিস্তর চিরদিন থাকিয়া গিয়া মানুষের জীবনযাত্রার পথ স্বগম করে। দুঃখ কষ্টের মধ্যে একটা গানের স্বর শুনিলে মনে হয় শরীর ও মনের

ক্লান্তি মুছিয়া গেল। গান শুনিলে মনের অবসাদ কাটিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন গান করিতে করিতে কাজ করিবে, তাহা হইলে কাজের শ্রম উপলব্ধি হইবে না। সেইজন্য জাতি গঠনে সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন।

নারী-নির্ধ্যাতনে মুসলিম নারীর ওদাসীন্য

আনন্দ বাজার পত্রিকায় শ্রীমতী নির্মালা দাশগুপ্তর “নারীত্বের লাঞ্ছনায় মুসলিম নারীসমাজ যৌন কেন?” প্রশ্নের উত্তরে বেগম নাগিস বি-এ, জানাইয়াছেন— মুসলিম নারীর নিজ সমাজে কোন মর্যাদা বা প্রভাব নাই, সেখানে তাঁরা শুধু পুরুষের ভোগের বস্তু। সেই জন্য মুসলিম মহিলারা তাঁদের সমাজের পুরুষ ছুর্বৃত্তদের অনাচার দমনে অসমর্থ।

এই কারণে কোন সভ্য সমাজে কোন নারীর চোখের সম্মুখে নির্দোষ নারী ও শিশুর প্রতি অত্যাচার নিশ্চল মুক্তি দেয়া দাঁড়াইয়া দেখা বা স্বধর্মী পুরুষ ছুর্বৃত্তদের দুর্কর্মে সাহায্য করা নারী সমাজেরই কলঙ্ক। মুসলিম নারী সমাজ অপহৃত হিন্দু নারীদের উদ্ধারে পূর্ববঙ্গ সরকারকে সাহায্য করিলে তাঁহাদের নিজ সমাজেরই কল্যাণ হইবে।

গ্রন্থসমালোচনা

শ্রীশান্তা দেবী

আমার বই—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত মূল্য ১০, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। এটি শিশুদের প্রথম পাঠের বই, অক্ষর পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট কবিতা ও ছড়া পর্যন্ত আছে। অক্ষরগুলি আধুনিক প্রণায় এক একটি ছবি ও ছড়ার সাহায্যে শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। বইটির প্রত্যেক পাতায় ছবি এবং ছাপা স্বন্দর। মলাট রঙীন স্বদৃশ্য ও শক্ত। কতক ছবি বহুবর্ণের কতক এক রঙ। এই

পুস্তকের একটি সাধারণ সংস্করণ আছে তাহার ছবি সব গুলিই এক রঙ এবং মূল্য ১০ আনা মাত্র।

বাংলা বর্ষলিপি (সপ্তমবর্ষ) সম্পাদক শিশির কুমার আচার্য্য চৌধুরী। বইটি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। ইহা স্কুল কলেজ ও লাইব্রেরীতে অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীই প্রথম প্রভৃতি অধ্যায়ে আর ও বহু বাঙালীর নাম থাকা প্রয়োজন! বাংলার দুর্দিনে একথা মনে রাখা দরকার।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

টোটকা চিকিৎসা

শ্রীপারুলরাণী ঘোষ

বিখাউজ (একজিমা)

এই রোগ শিশুদের ভিতরেই বেশী দেখা যায়। পায়ের দিকে প্রথম লাল লাল কয়েকটি গোট ওঠে। পরে ক্রমশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মলম (Ointment) ইত্যাদিতে যে কোন কাজ হয় না, তাহা অনেক স্থলেই দেখিয়াছি। ডাক্তারী চিকিৎসায় তত আশাস্বরূপ ফল পাওয়া যায় না। একবার সারেরত আবার বাড়িয়া যায়। এই বিখাউজে আশাতীতরূপে কল পাওয়া গিয়াছে এমন একটি চিকিৎসা প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। আউস ধানের চিঁড়া কাঁচা গোছুন্ধে (খাঁচী হওয়া চাই) ভিজাইয়া নিতে হয়। বেশ ভিজিলে পরে চটকাইয়া কাপড় ছাঁকা করিয়া নিয়া সেটি আক্রান্ত স্থানে লাগাইতে হয়, তাহার উপর কদম পাতা চাপা দিয়া পরিস্কার কাপড় দ্বারা বাঁধিতে হয়। ২৪ ঘণ্টা পর ইহা ফেলিয়া তুলা বা পরিস্কার নেকড়া দিয়া ক্ষতস্থান পরিস্কার করিয়া পুনঃ পূর্বের ছায় কাঁচা গোছুন্ধে ভিজান আউস ধানের চিঁড়ায় সেই পূর্বের ছায় কদম পাতার ঢাকা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইবে। তিন চারদিন ইহা ব্যবহারে বিখাউজ নিশ্চিত কমিয়া যায়।

ইহাতে কোনপ্রকার জ্বালা বা যন্ত্রণা হয় না, তবে শিশু চুলকাইতে চায়। চুলকাইতে চাহিলে একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাতে ক্ষতস্থান এত নরম হইয়া যায় যে, সামান্য আঁচড় লাগিলেই রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। প্রথম দুই দিন ক্ষতস্থান হইতে লালার ছায় ক্রমে নির্গম হইয়া থাকে, সেই কারণেই চুলকাইয়া। আর যে চিঁড়ার লেই বাঁধা হয়, পরের দিন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সহজেই তাহার ভিতর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা দেখা যাইবে।

বয়স্কদেরও কাহারো কাহারো এই বিখাউজ জাতীয় রোগ পায়ের গোড়ালী হইতে উন্নর পর্যন্ত দেখা যায়।

আক্রান্ত স্থান একটু ফুলা থাকে। এই অবস্থায় পূর্ব বর্ণিত চিঁড়ার লেইও ভাল কাজ করিয়া থাকে। যদি ইহাতে কোন কাজ না হয় তাহা হইলে দুগ্ধের পরিবর্তে হকার জলে চিঁড়া ভিজাইয়া লেই করিয়া নিয়া পূর্বের ছায় কদম পাতায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে ইহাতে নিশ্চিত আরাম পাওয়া যায়। কুষ্ঠ ক্ষতও নাকি এই ছাঁকা ভিজান লেইতে সারিয়া যায় শুনিয়াছি, তবে কোথাও ব্যবহার করিবার সুযোগ পাই নাই। তবে শিশুদের বিখাউজ বা বয়স্কদের এই জাতীয় চর্মরোগ যে উপরোক্ত উপায়ে সারিয়া যায়, তাহা অনেক স্থানেই ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি।

রান্নাঘর

আমের আইসক্রীম

শ্রীমীরা মৈত্র

উপকরণ—চার জনের মত—

তিনটে আম। আধপোয়া চিনি। দুটো ডিম। ঘন দুধ বা Klim চার চামচ। জিলাটিন আধ আউন্স। এসেন্স অফ ভ্যানিলা তিন চার ফোটা।

প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে তিনটি আমের রস করে নিয়ে

স্বপ প্লেটে রাখুন। এবার একটা ডেকচীতে বার চা চামচের চিনির সঙ্গে ডিম দুটি ভেঙ্গে তার ক্রমশ দুটি নিয়ে খুব ভালো করে ফেটান। তারপর তার মধ্যে তিন পুন্ডিং চামচ Klim বা ঘন দুধ দিয়ে ও দেড় পেয়ালা ঠাণ্ডা জল দিয়ে সেটি গুলে নিন। গোলা পাঁচ মিনিট হলে ডেকচী উনানে বসান। আধ আউন্স জিলাটিন আধ পেয়ালা জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর ডেকচী উনান থেকে নামিয়ে তার মধ্যে মিশান।

ভাবো করে মেশানো হলে ডেকচী আবার উত্থনে বসিয়ে পাঁচ মিনিট রাখুন। একটা বড় ডেকচীতে ঠাণ্ডা জল রেখে, তার মধ্যে ছোট ডেকচী উনার থেকে নামিয়ে রাখুন, এবং নাড়তে থাকুন। ডিমের সাদা অংশটা ভালো করে ছ চামচ চিনি দিয়ে ফেটিয়ে নিয়ে আমের রসের মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে নাড়তে থাকুন এবং এসেন্স অফ ভ্যানিলা ছয় ফোঁটা দিন এবার একটা লম্বা সস্প্যানের মধ্যে জল বরফ দিয়ে খুব ঠাণ্ডা করে পনেরো কুড়ি মিনিট ডেকচীটা তার মধ্যে বসিয়ে রাখুন।

তারপর কাচের গ্লাসে ঢেলে আলাদা করে ফ্রিজিডিয়ে রাখতে পারেন জমবার জন্ত। খাবার আগে তেরো চামচ চিনি দিয়ে Klim গুলে সব গেলাসের উপর দিয়ে দিন।

আইসক্রীম তৈয়ারীর কল থাকিলে ইহা তাহাতেই বেশী ভালো হয় এবং সামান্য কাজের জন্য ফ্রিজিডেয়ার দরকার হয় না।

তরকারীর ক্যাসেরোল

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

গাজর, কড়াইগুটি, বিন, আলু, সামান্য দুধ ও ময়দা, ১ চামচে মাখন, টমেটো, পেয়াজ ৩৫টা, গোটা গোটা গোল মরিচ, ছুন, মিষ্টি, ধনেপাতা কুচান, গরমমশলা।

প্রস্তুত প্রণালী

তরকারিগুলি আন্দাজ মতন নেবেন। গাজর চাকা চাকা করে কাটুন। বিন এক একটা কেটে ৩ টুকরা করুন। টমেটো, আলু, পেয়াজ ৪৫ টুকরা করুন সামান্য জলে, ছুন আর গোলমরিচ দিয়ে তরকারিগুলি

দমে বসিয়ে দিন। ক্যাসেরোল মানে একটা বন্ধ পাত্র যোত দমে রান্না হয়ে থাকে। কাজেই ডেকচির মুখ ময়দার লেই করে এঁটে দিলে ভাল হয়। নরম আঁচে সেক হওয়া চাই। ২০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট লাগা উচিত।

এখন ময়দা মাখনে ভেজে দুধ আর মিষ্টি দিন তাতে। সবটা তরকারির উপর ঢালুন, সঙ্গে ধনেপাতা দিন। গরম মশলা শুকনো খোলাতে ভেজে দিয়ে দিন। খোলটা ঘন হয়ে এলে, নামিয়ে নিন। (গরম গরম খেতেই ভাল)

ম্যাঙ্গো ফুল

১/১ সের দুধ, ১/১ চিনি, (না পেলে ৪ চামচে সিরাপ দিবেন) ২১/৪ টি কাঁচা আম, ২ বরফ।

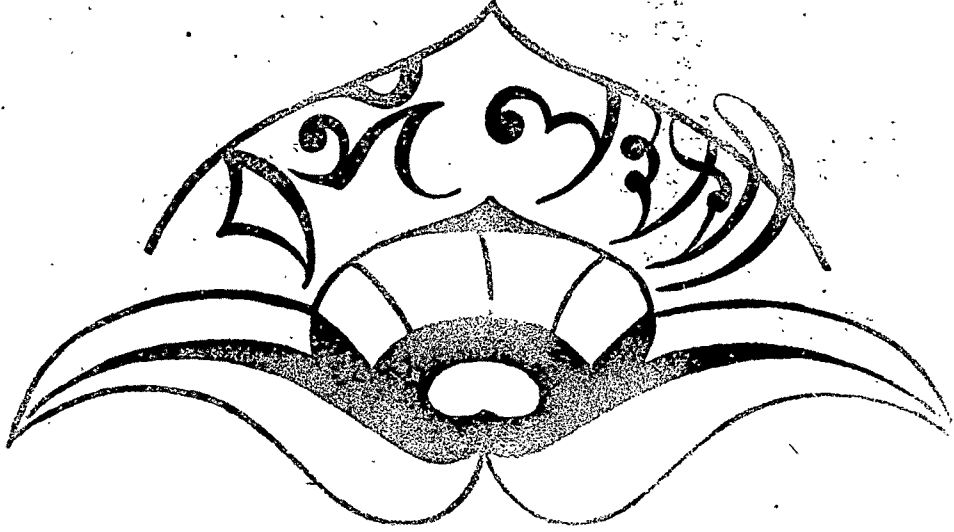
প্রস্তুত প্রণালী

দুধ আর চিনি বা সিরাপ ফুটতে দিন। বেশ ১০/১০ দুধ মরে গিয়ে ঘন হয়ে আসলে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন। আম খোসা শুদ্ধ সিক করতে দিন। পরে, ঠাণ্ডা করে খোসা ছাড়িয়ে চটকে রস বার করুন। ঠাণ্ডা দুধে রসটা ঢেলে দিন। (গরম আম বা দুধ থাকলে দুধ ছিঁড়ে যেতে পারে)। বেশ ভাল করে নেড়ে চেড়ে পাত্রটি বরফে বসিয়ে রাখুন পরিবেশন না করা পর্যন্ত। পেয়াল বা বাটিতে দিলেই সুবিধা হয়।

(৪৫ জনের পরিমাণ)



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
• BHOWANIPUR • CALCUTTA •



২৫শ বর্ষ

ভাদ্র—১৩৫৭

১০ম সংখ্যা

তুমি তো এলে না দ্বারে ?

শ্রীঅপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

হৃদয়ের ঘাট হ'তে গেল ঘট ভরে
দূরের দিগন্ত পারে কে যেন স্বপনে !
এ নিরুজ্জনে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুলিত করে
বিষম বিচ্ছেদ যত উতলা পবনে ।
কে যেন কোথায় কাঁদে বিপ্রলঙ্কা সম,
লোক হ'তে লোকান্তরে-প্রতিধ্বনি ওঠে :
অনন্তের পানে চেয়ে মোঁরা রাত্রি মম
স্নান নভোতলে যেন ব্যথা হয়ে ফোটে ।
বর্ষার নবীন মেঘ-বর্ষণ আবেগে
এলো চরাপুঞ্জী হ'তে কেকা কলরবে ।
আষাঢ়ের অন্ধকারে আমি একা জেগে,
মল্লারের সুরে সুরে নৃত্য করে নভে
গগনের নটী দল দীর্ঘ ছায়া ফেলে :
তুমিতো এলে না দ্বারে দীপ শিখা জ্বলে !

অন্ধণে বহিছে শ্রোত বিনিদ্র যামিনী
ত্রস্ত নীড়ে বিহঙ্গেরা—হুয়ে পড়ে শাখা ;
আধারের স্তরে স্তরে চমকে দামিনী
পল্লী গোষ্ঠী পূর্ণ গৃহ অশ্রু বাষ্প ঢাকা ।
বসায়ছে প্রকৃতির আনন্দের মেলা
আজিকার খেলা ঘরে বর্ষা অবিরল ।
নবতৃণ সাথী সনে করিতেছে খেলা
বিস্তীর্ণ মাঠের 'পরে ধাতু শিশুদল ।
ডাহক ডাহকী ডাকে দাদুরীর সাথে
বর্ষার উৎসব দিনে পরম উল্লাসে ।
বাঁপীতটে শ্রামা মেয়ে পুষ্প মাল্য গাঁথে
অম্বরে উদয়ক বাজে ভাবের উচ্ছ্বাসে ।
আজি এ বাদল রাতে পথিক বধূরে
প্রাণের অরণ্য বীথি খোঁজে বাণে বাণে,

বিজলীর মত হেসে লুকানো স্বদ্রে
কে যেন দাঁড়ায়ে মোর গানের ওপারে !
সজল আঁধির কোণে কাজলের রেখা
নিবিড় হয়েছে মোর দুঃসহ বিরহে :
অস্তরের ক্লান্ত বসন্তে আশা পুষ্প একা
অপূর্ণ বিবর্ণ হয়ে ঝঙ্কাবর্ত্ত সহ্যে ।
কদম্ব কেতকী হেনা ছলিছে বাদলে,
নদীর যৌবন জাগে মেঘের মিলনে ।
পাষণ সমাধি সন্মুখ চিত্ত গুহা তলে
এ আত্মার নির্জনতা তোমারি বিহনে ।
বৃষ্টি ঝরে, ঢেউ ওঠে, স্নিগ্ধ ধরাতল,
মেঘের শৃঙ্গারে নাচে অরণ্য অঞ্চল ।
স্মৃতি হয়ে আছে তব রূপ মধুরিমা,

কেমনে রয়েছ তুমি পৃথিবীতে ভুলি !
অভিসারিকার মাঝে প্রণয়ঃগরিমা
দৃষ্টির নেপথ্যে কত উঠিছে আকুলি !
প্রাণের হিল্লোলে তোলো স্তম্ভুর সুর
মেঘের মেঘের রাতে বন যুথিকারা ।
চপল মুখর হোলো আনন্দ বিধুর
নূতন প্রেমের মত নব বারি ধারা ।
কাহারো কপোলে অশ্রু দুঃখে পড়ে বরি
কাহারো মনেতে স্বপ্ন আশাও ভরসা !
বিরহ মিলন কথা মুখরিত করি
বরষে বরষে আসে অমনি বরষা !
চকিত ছায়ায় কাঁপে তন্দ্ৰা ঘন বীথি,
তুমি নাই : কে শুনাবে মেঘোৎসব গীতি !

‘বাল্মীকি-প্রতিভা’

শ্রীজয়দেব রায়, এম, এ, বি, কম্।

‘বাল্মীকি প্রতিভা’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য (১৮৮১); আমরা কিন্তু যে গীতিনাট্যের রচনার সহিত পরিচিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তৃতীয় গীতিনাট্য। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৯২ সালে তাঁহার পরিমার্জিত বাল্মীকি প্রতিভার তাঁহার দ্বিতীয় গীতিনাট্য ‘কালমৃগয়া’র বহু অংশ সংযোজিত হইয়াছিল।

“বাল্মীকিপ্রতিভা’র গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ কর্তৃক অন্ধমূনির পুত্রবধু তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে ঠেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করণরসে শ্রোতার অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।”

‘বাল্মীকি প্রতিভা’র মূলভাবটি কবি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার কবিগুরু বিহারীলালের কাব্য হইতে! তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সেই কথা স্বীকারও করিয়াছিলেন—

“বর্তমান সমালোচক এককালে ‘বঙ্গসুন্দরী ও ‘সারদামঙ্গলের’র কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত আছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য সৌন্দর্য্যের একটি অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।”

তাঁহার কাব্যগুরুর নিকট আমাদের কবিগুরুর এই ভাবে প্রকটপর্ণ! অপরিণত কবির মনে Romantic গীতি-কাব্যের স্মৃতি বিহারীলালই প্রথম ধরিয়া দিয়াছিলেন!

“এই প্রসঙ্গে আমার সেই কবিগুরুর কাছে আর একটি স্বপ্ন স্বীকার করিয়া লই! বাল্যকালে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ নামক একটা গীতিনাট্য রচনা করিয়া ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’

সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বন্ধিমচন্দ্র এবং অগ্রাণ্ড অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটিকাটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।”

এইখানে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটো বিহারীলালের গীতিকাব্যের মূল ভাব ও ভাষাগত প্রভাবটি কি ভাবে পড়িয়াছে দেখি—

সারদামঙ্গলের ; প্রথম সর্গ।

ললিত ; আড়াঠেকা

(১)

এস মা উষার সনে

বীণাপানি চন্দ্রাননে,

রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয়-কমলে।

এস মা করুণা রাণী

ও বিধু বদনখানি

হেরি হেরি আঁখিভরি হেরি গো আবার।

শুনে সে উদার কথা

জুড়াক মনের বাথা,

এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার !

সারদামঙ্গলের দ্বিতীয় সর্গ

কালাংড়া, যৎ

কেমনে বা তোমা বিনে দীর্ঘ রাত্রদিনে

স্বদীর্ঘ জীবনজালা সব অকাতরে,

আর কার মুখ চেয়ে

অবিশ্রাম যাব ধৈর্যে,

ভাসায়ে তরুর তরী অকূল সাগরে।

(২)

প্রথম সর্গের বিংশ গান

যাও লক্ষ্মী অলকায়,

যাও লক্ষ্মী অমরায়,

এস না এ বোগী-জন তপোবন স্থলে

বান্ধীকি প্রতিভার গান

গৌড়মন্ডার

(১)

হৃদয়ে রাখগো দেবি, চরণ তোমায়।

এস, মা করুণা রাণী, ও বিধু বদন খানি

হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার

এস গো আদরিণী বাণী সমুখে আমার।

মুহু মুহু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি,

আলোয় করেছ আলো, জ্যোতি প্রতিমা ;

তুমি গো লাবণ্য-লতা, মূর্তি মধুরিমা ॥

বসন্তের বনবালা, অতুল রূপের ভালী ;

মায়াব মোহিনী মেয়ে ভাবের আঁধার,

ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার,

অদর্শন হ'লে তুমি তাজি লোকালয় ভূমি-

অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,

হেরে মোরে তরুলতা, বিবাদে কবে না কথা

বিষগ্ন কুসুমফুল বনফুল বনে।

“হা দেবি, হা দেবি” বলি, গুঞ্জরি কাঁদিয়ে অলি,

ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার,

হেরিব জগৎ শুধু আঁধার—আঁধার !

(২)

টোড়ি

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়

এ বনে এস না, এস না

এস না এ দীন জন কুটীরে ॥

বিহারীলালের ‘সারদামঙ্গল’ের বিষয়বস্তু সরস্বতীর আশীর্বাদে অকবি বান্ধীকির কবিত্বলাভ ; কবির ‘বান্ধীকি প্রতিভা’র তাহাই বিষয়বস্তু। নাটকে কবি স্বয়ং বান্ধীকি এবং হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (তৃতীয় ভ্রাতা) কল্পা, ভ্রাতৃপুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতীর অভিনয় করিয়াছিলেন। নাটকের নামকরণে ই ‘প্রতিভা’ নামটির মূলে বোধ হয় শ্রীমতী প্রতিভারই প্রভাব ; বান্ধীকিপ্রতিভা’র সহিতই কবিরও কবিপ্রতিভার স্মৃতিপাত ; তাহার স্নেহপাত্রীর নামটিও অক্ষয় হইয়াছে। শ্রীমতী প্রতিভা সুরবিশেষজ্ঞও ছিলেন, ‘বীণাবাদিনী’ পত্রিকায় তাহার সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা বাহির চইত। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরে তাহার বিবাহ হয়।

রামায়ণের এই রূপকটির উপর কবির একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় বিষয়টির পুনরায় অবতারণা করিয়াছেন—

“যে দিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি’ আসে আসন্ন আষাঢ়,”

কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—প্রথমদৃশ্বে দস্যু বাল্মীকি এবং তাহার সঙ্গীদল বনের মধ্যে কালীপূজায় নরবলি দিবার জন্ত একটি পথ ভোলা বালিকাকে বন্দী করিয়া আনিল। এই দৃশ্বে ভাব মত্ততার, উল্লাসের, শেষ হইল বনদেবীগণের করুণার সুরে। প্রস্তাবনায় সেই ভীতিবিহ্বল শঙ্কার সুরটি ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—

“দেবি তুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে,

রাখো অধিনী জনে, করো শান্তি দান।”

দ্বিতীয় দৃশ্বে বালিকার ক্রন্দনে দস্যুসদস্যের হঠাৎ ভাবান্তর হইল। এই দৃশ্বে সুরে সেই আকস্মিক মনোভাব পরিবর্তনটি রূপায়িত হইয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্বে পুনরায় মেয়েটিকে ধরিয়া আনিয়া দস্যুগণ মত্ততায় মাতিয়াছে, এই সময়ে বাল্মীকির প্রবেশ এবং বালিকাকে মুক্তিদান। এই দৃশ্বে গানে বাল্মীকির ক্রোধটি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্বে দস্যুদলের শিকার আয়োজনের চিত্রে বীররসের অবতারণা, হাঙ্গাপরিবেশে কৌতুকরসের সৃষ্টি এবং তাহার পর আবার করুণরসে প্রত্যাবর্তন।

পঞ্চম দৃশ্বে ব্যাধের ক্রৌঞ্চবধে উদাসী বাল্মীকির অপূর্ব ভাবপরিবর্তন এবং কবিত্বের উন্মেষ—

“মা নিসাদ প্রতিষ্ঠাং স্বমগমঃ শাস্ততীঃ সমাঃ।

যং ক্রৌঞ্চ মিথুনা দেকম বধীঃ কাম মোহিতম্॥

শেষ দৃশ্বে লক্ষ্মী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকে, পাখি বধকে অবজ্ঞা করিয়া সরস্বতী, কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা এবং আশীর্বাদ লাভ—

“আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,

তোর গানে গ’লে যাবে সহস্র পাষণ-প্রাণ।

যে-রাগিণী স্তনে তোর গ’লেছে কঠোর মন,

সে-রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজবে রে অক্ষুণ্ণ।

* * *

বসি’ তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,

শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিথিলে সঙ্গীত কড।

এই নে আমার বীণা, দিচ্ছ তোরে উপহার,
যে-গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার॥”

এই তো কেবল বাল্মীকির বরলাভ নয়, কবি রবীন্দ্র-নাথেরও বাণীর সকাশে বীণার উপহারলাভ, তাঁহার জীবনে তাহাই সার্থক হইয়াছে। তিনিই স্বয়ং এই কবিগুরু, আমরা তাঁহারই পদতলে বসিয়া, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুরশিক্ষা পাইয়াছি, তাঁহারই সুরে যে গান গাহিতে চাই গাহিয়াছি, বিশ্বজনের সহস্র কঠোর পাষণ প্রাণ তাঁহার সুরেই গলিয়া গিয়াছে—এই নাটকের ইহাই রূপক!

‘বাল্মীকি প্রতিভা’ সুরে নাটিকা অর্থাৎ কালমৃগয়ার মতই পড়িয়া রস গ্রহণের জন্ত ইহারও রচনা নয়। কিন্তু সুরটিই একমাত্র অবলম্বন নয়, নাটকের মূল ভাবটিই প্রাধান্য পাইয়াছে। “বস্তুতঃ, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব নহে। (শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।”

‘বাল্মীকি প্রতিভা’ কবির প্রথম যুগের রচনা, তাহার সম্বন্ধে বহু আলোচনা আজ পর্যন্ত হইয়াছে; কবি স্বয়ং তাঁহার ‘জীবনস্মৃতি’তে এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছেন—“এইরূপ একটা দস্তুর ভাঙ্গা গীতি বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই ছুটি নাট্য লেখা। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলা দেশের পাঠক সমাজকে বারম্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতি নাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।”

‘বাল্মীকি প্রতিভা’ কাব্য নাট্যে নানা রাগরাগিণীর উল্লেখ থাকায় সঙ্গীত অনভিজ্ঞ পণ্ডিত কাব্যসমালোচকদের নানা অবাস্তব কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে। ‘রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা’ নামক গ্রন্থে এই সুর সম্বন্ধে নানা অলস জল্পনা করা হইয়াছে!—

“ইহার বন্ধন-বিহীন ছন্দের মধ্যে, ইহার গানগুলির টোড়ি, সিক্কু, রামপ্রসাদী রাগিণীর ও সুর বুনানীর মধ্যে

এমন একটা সহজ সরল উচ্চাস আছে বাহা মাগুযের মনকে আমন্দে উল্লসিত না করিয়া পারে না।”

পাশাপাশি তিনটি গানের শীর্ষে ঐ তিনটি রাগিণীর নাম দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় এই স্বর মন্তব্যটি করিয়া বসিয়াছেন। সারা নাটকে রামপ্রসাদী চণ্ডে এবং টোড়ি রাগিণীতে ঐ দুইটি গানই মাত্র আছে। তিনি বোধ হয় গ্রন্থের ঐ একটা পাতাই দেখিয়াছেন।

বাল্মীকি প্রতিভার গানগুলি বিলাতী রীতিতে রচিত; কবির মনে সেই সময়ে ‘Irish Melodies’ টমাস মুরের গানের একটা বিচিত্র মোহ ছিল। “আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্র-বিচিত্র করা কবি মুরের একখানি আইরিশ মেলডিজ ছিল। অক্ষয় বাবুর কাছে সেই কবিতা-গুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। (শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কবির প্রথম জীবনের রসজ্ঞ শ্রোতা দাদা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ এবং দাদার বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর আন্তরিক উৎসাহে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র সৃষ্টি। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ভাষায়—

“এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ স্বর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটা স্বর রচনা করিলাম, অমনি ইহারা সেই স্বরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।

এই শ্রেণীর :—কথা রবীন্দ্রনাথের, স্বর জ্যোতিরিন্দ্র নাথের, গান এই গুলি—(১) সমুখেতে বহিছে তটিনী, তরীধানি চলেছে ছুটিয়া (মিশ্র সিন্ধু; কাওয়ালি) (২) ফুলে ফুলে চলে চলে বহে কিবা মৃদুবায (সচ্ কেদারা) (৩) সকলি ফুরাইল যামিনী পোহাইল (টোড়ি) প্রভৃতি

বাড়ীতে তখন তাঁহাদের ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের বিশেষ আদর, বহু গুলী তাঁহাদের গৃহের সঙ্গীত আসরে আমন্ত্রিত হইতেন। “এই দেশী ও বিলাতি স্বরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার স্বরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অগ্র ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে।

স্বরে মনোভাব প্রকাশ এই গানগুলির বিশেষত্ব, নানা মানসিক দৃন্দ, ভাবকে গানের স্বরে প্রকাশ করা হইয়াছে। হাসির ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে—(১) আজকে তবে মিলে সবে করবো লুটের ভাগ (কাফি) এবং (২) পথ ভুলেছিল সত্যি বটে? (পিলু) গানের স্বরে। পিলু রাগিণীতে দ্রুত অট্ট হাসিতে অবরোধে হাসিকে ফুটান হইয়াছে—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ। কান্নায় ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে সহজ ভাবে ভৈরবীতে “হা কী দশা হ’লো আমার” এবং অভিনয়ের ভঙ্গীতে গোবিন্দ স্বরে “বলবো কী আর বলবো খুড়ো—উঃ উঃ।” রাগের ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে ‘বেহাগে’ “অহো আশ্পদী এ কী তোদের নরাদম? তোদের কারেও চাহি না আর”, মুগ্ধ বিশ্বয়ের ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে ভূপালীতে “এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা।” বাহারে “এই যে হেরি গো দেবী আমারি।” আক্ষেপের ভাবটি ফুটিয়াছে—হাস্যের রাগিণীর স্বরে “জীবনের কিছু হলো না হায়,” অল্পযোগের ভাব নটনারায়ণে “আর না আর না, এখানে আর না।” এবং উল্লাসের ভাবটি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে জংলার স্বরে “কালী কালী কালী বলোরে আজ” এবং ইমন কল্যাণে “এই বেলা সবে মিলে চল হো”, গানে। বীররস উদ্দীপনার ভাবটি দস্যু দলের প্রতি গানেই আছে, যেমন খান্সাজে “এক ভোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে” বেলাবতীতে “ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়” প্রভৃতি।

এত বিচিত্র ভাবের গানের সমাবেশ ‘বাল্মীকি প্রতিভার’ একটা বৈশিষ্ট্য। কবি বলিতেছেন “হার্ভার্ট স্পেন্সারের একটা লেখার (The Origin and Function of Music) মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়বেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনাই কিছু না কিছু স্বর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ রাগ, দুঃখ আনন্দ বিশ্বয় আমরা কেবল মাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে স্বর থাকে। ... (শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

‘বাল্মীকি প্রতিভা’র কোন গানে ছন্দের নাম নাই। তবে দস্যুদের উল্লাস অথবা উদ্দীপনার গান গুলিতে দ্রুত

তেতালী ছন্দই সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়াছেন, ঠুংরি তালেরও অনেক গান আছে।

“বাল্মীকিপ্রতিভায় অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতি দাদার রচিত গানের সুরে বসানো এবং গুটীতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অপেক্ষে সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে; এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মন্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপ গানে বসাইয়াছি।”

অধিকাংশ গানেই হিন্দী রাগ রাগিনীর নাম দেওয়া আছে; একটি মাত্র গানে বাংলাদেশের নিজস্ব সুর ব্যবহার করা হইয়াছে। ‘রামপ্রসাদীয় সুরে—

শ্রামা, এবার ছেড়ে চলছি মা,
পাষণের মেয়ে পাষণী, না বুঝে মা বলেছি মা।

খাটী বৈঠকি তেলেনা অপেক্ষে চতুরঙ্গের গান—ইমন-কল্যাণে, জলদ তেতাল্য—

এই বেলা সবে মিলে চল হো, চল হো,
ছুটে আয়, শিকারে কে রে বাবি আয়।

সদারঙ্গের এইটির মূল হিন্দী গানটি হইতেছে—

চতুরঙ্গ রস সন গায়ে হো গায়ন গুণী আয়ে মহম্মদ
শাকে ঘর কাজ হস্তী তুরঙ্গ সরস স্বথ পাবে দান মান
সুন্দর জর শির পাইয়ে।

স ধা স ধা গ গ ধা প গ ধা স প প গ গ ধা স
স ধা গ ম প প ধ ধ প ধ ধ প নি নি ধ নি নি ধ
প প ম ম গ গ ধা গ গ ধা স।

নাদের দেব দানি তোম্ দেব দেব দিয়া না রে তোম্
তানানতান তানানানা নাদের দেব দানি তদানি তদারে
তানানানা নানা দীম্ তানাদীম তানানানা নানানানা
নানানানা নানানানা ধলাং ধলাং ধলাং ধলাং ॥

ত্রিগিতোম্ ত্রিগিতোম্ ত্রিমিকেটে ত্রিমিকেটে থারি-
কেটে থারিকেটে তাকুঝাকু, তাকুঝাকু, নাগ, দিগ্ দিগ্,
ঠং নং নং থং দিগ্ দিগ্, তোম্ অসো অসো অসো ইয়া
তিয়া তিয়া তিয়া ইয়া তিয়া ইয়া তিয়া ইয়া তিয়া ইয়া।

বিলাতী সুরের গান তিনটি হইতেছে—

(১) কালী কালী কালী বলো রে আজ
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো, হো,
বলো হো।

এই গানটির মূল সুরটি একটি ইংরাজী গানের;
“Nancy Lee”—একটি নাবিকের প্রিয়া বন্দনার গান।

(২) ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে
না করি ভয়—

এইটিও ইংরাজী সুরের অনুরূপে রচিত।

(৩) মরি ও কাহার বাছা, ও কে কোথায় নিয়ে যায়?
আহা ঐ করুণ চোখে, ও কাহার পানে চায়?

—এইটির মূল সুর একটি আইরিশ গানের “Go where glory waits thee”

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বলিতেছেন—“Go where glory
waits thee সুরটি Tom Mooreএর Irish Melodies-
এর অন্তর্গত!(শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

“বাল্মীকি প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কি কি গান আছে,
তাহার নির্দেশ কেহই ঠিক বলিতে পারেন নাই; তবে
এই গানটির কথা ও সুর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীরই রচিত—

রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।

আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা ॥

(বাগেশ্রী)

“বাল্মীকি প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে
এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের
সারদামঞ্জল সংগীতের দুই এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা
হইয়াছে।

এই গানটি “একডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে”
খান্সাজের গম্ভীর সুরে পূর্ববর্তী তাহার (অথবা জ্যোতিরিন্দ্র
নাথ) “এক স্তম্ভে বাঁধা আছে সহস্রটি মন” গানের
অনুরূপ সুরে রচিত। সুরটি সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ
সংযোজিত।

রাগের রূপটি পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে কয়েকটি গানে—
যেমন ‘অহং’ রাগিনীতে—

“চল চল ভাই, স্বরা ক’রে মোরা আগে যাই”

“বাল্মীকি প্রতিভা কালযুগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম

সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটা গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতে উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।(শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। স্বরগুলি যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতি

এবং শুদ্ধ মন্ত্রারে “বিম্ বিম্ ঘন ঘন রে বরষে”—
[ধা ধা]

পা—১ পা - ধপা | মা পা না না | সী - ১ - ১ - ১ | না রী সী - ১ | রী - ১ | রী - ১ | রী রী রী রী
রি ০ম্ ঝি ০ম্ | ঘ ন ঘ ন | রে ০ ০ ০ | ব র যে ০ | রি ম্ ঝি ম্ | ঘ ন ঘ ন
রী - জী - রী - সী |
রে ০ ০ ০ |

না' রী সী - ১ || { মা মা মা মা | পা মা ধপা - ১ | ম জা জা জা র জ মা | রা রা সা - সা }
ব র যে ০ || { গ - গ - নে - ঘ | ন, ঘ টা ০ | শি ০ হ রে ত ০ ০ | ক, ০ ০ ০ }

দেশী স্বরকে বিলাতী পিয়ানো যন্ত্রের তাগিদে প্রথা বিরুদ্ধ বিদেশী পোষাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। গাহিবার ভঙ্গীটাই বিলাতী, স্বরগুলি সম্পূর্ণ পরিচিত স্বদেশীয়।

‘বাঙ্গালীক প্রতিভা’র স্বরের সার্থকতা Herbert Spencerএর সেই রবীন্দ্র পরিচিত উক্তিতে “The various inflections of voice which accompany feelings of different kinds and intensities, are the germs out of which music is developed. It is demonstrable that these inflections and cadences are not accidental or arbitrary; but that they are determined by certain general principles of vital actions; and that their expressiveness depends on this.”

বাঙ্গালীক প্রতিভার পরে ভিন্ন রীতিতে কবি ‘মায়াবর খেলা’ নামে অপর একটা গীতি নাট্য রচনা করেন, পরে সেই বিষয়ে আলোচনা করিব।

‘বাঙ্গালীক-প্রতিভা’ নাটক নয়, স্তবরাং নাটকীয়তা সর্বত্রই সুপরিস্ফুট হয় নাই। ‘বাঙ্গালীক-প্রতিভা’ রবীন্দ্র কাব্য-প্রতিভারও প্রথম যুগের প্রধান নিদর্শন; ইহাকে খণ্ডকাব্য বলিলে অশ্রায় হয় না।

নাটকীয়তা বা ঘটনাচিত্র কোথাও বিশেষ বৈচিত্র্য আনে নাই; দুই এক জায়গায় যেখানে আমাদের মন নিবিষ্ট হইতে পারিত, কবি সেখানে হঠাৎ সমাপ্তি করিয়াছেন। নাটকীয়তা সৃষ্টি হইয়াছে এইখানে স্বন্দর। বালিকা—একী এ ঘোর বন। এত কোথায়?

দাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরে কথা যোজনায় চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে স্থপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহার। সেই স্বরগুলির বাহনের কাজ করিত।— ‘বাঙ্গালীক প্রতিভা’র সৃষ্টির ইতিহাস এই।

গানগুলির গায়কী বা ‘গীতি রীতি’তেই বৈচিত্র্য;

কাওয়ালি ছন্দে—

পথ-ঘে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না।

কী করি এ আধার রাতে?

কী হবে মোর হায়?

১ম দৃশ্য (বালিকার প্রতি)

পথ ভুলেছি সত্যি বটে? সিঁধে রাস্তা দেখতে চান?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, স্বখে থাকবি বারো মাস।
সকলে—হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ।

২য় (প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই? কেমন সে ঠাই?

১ম— মন্দ নহে বড়ো,

একদিন না একদিন সবাই সেথায় হবো জড়ো।

সকলে—হাঃ হাঃ হাঃ

২য়—আয় সাঁথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,

আর তাহলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।

সকলে—হাঃ হাঃ হাঃ

(সকলের প্রস্থান)

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়?

আহা ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চায়?

এই শ্রেণীর অভিনয় গীতি—আমাদের দেশের অতি

পরিচিত। নেপথ্যে কণ্ঠস্বর, কথোপকথনে ঘটনার বিবরণ, হাস্য কৌতুকের মধ্যে করুণ অথবা জটিল বিষয়ের পূর্বাভাস—এই Technique গুলি কবি যাত্রা ইহাতেই সংগ্রহ করিয়াছেন।

“ফুল ফুটাবে”

শ্রীদীপ্তি দেবী

(৩)

সিঙ্গাপুরের পতনের পর কলকাতা সহরে আর মানুষ রইল না। যে যেখানে পারল পালাল। চারিদিকে যত স্থল কলেজ ছিল তারাও একে একে উঠে গেল কলকাতার বাইরে। সকলের মুখে ঐ এক কথা। কোলকাতার অন্ততঃ ৩০।৩৫ মাইল দূরে না থাকলে বোমার চোটে আর কাউকে বাঁচতে হবেনা। নানা রকম গুজব ছুটতে লাগল লোকের মুখে মুখে। কেউ বলে আর কয়দিন পর কলিকাতা সহরের আর কোন চিহ্ন থাকবেনা। কেউ বলে জাপানীরা এলে কারু ঘরে আর মেয়ে থাকবে না। এই রকম আজগুবি অনেক কথাই শোনা গেল লোক মুখে। অনিন্দিতা চিন্তিত হয়ে পড়ল তার স্থলের জন্ত। স্থলটিকে কোথায় সে স্থানান্তরিত করবে? বাইরে কি আর বাড়ী পাওয়া যাবে? স্বরেশের সঙ্গে পরামর্শ করল। সেও বিশেষ কোন উপায় স্থির করতে পারল না।

শেষে এ সমস্যার সমাধান করলেন হেমাঙ্গিনী দেবী। তিনি দুই ভাই বোনকে চিন্তিত দেখে বললেন—“অত ভাবছিস কেন তোরা? আমাদের দেশের বাড়ীতে তো স্থল উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারিস?” স্বরেশ বলল—“কিন্তু পিসিমা, আমি যে তোমাদের দু’জনকে দেশে পাঠিয়ে দেব”—পিসিমা হেসে বললেন—“তুই অনেক দিন দেশে বাস নি, তাই বাড়ীর কথা তোর মনেই নেই। আমাদের কি আর একটা বাড়ী? ভিতরে আছে অন্দর মহল, আর বাইরে আছে বৈঠকখানা বাড়ী। বারবাড়ীটাতেই ইদানিং বাবা থাকতেন, সে বাড়ীটাতে একটা মাঝারি রকমের পরিবার স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। আমি বলছি তাই, ভিতর বাড়ীটাতে স্থল হ’ক, আর বার-বাড়ীটাতে জামরা থাকব”—পিসিমার কথা শেষ হ’তে না হ’তে অনিন্দিতা আহলাদিত হয়ে বলল—“এ ব্যবস্থা যদি হয় তা হলে খুবই

ভাল। একা হেডমিস্ট্রেসের উপর এতগুলি মেয়ের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ’তে পারতাম না।”

স্বরেশও খুসী হয়ে সম্মতি দিল। অনিন্দিতা বলল স্বরেশকে—“কিন্তু দাদা, তোমাকে আসতে হবে। তোমাকে একা এখানে ফেলে আমরা কি করে যাব? চাকর বাকর সব পালাবে, তোমার খাওয়া দাওয়ার কি হ’বে? একলা এ বাড়ীতে তোমার থাকা কিছুতেই চলবে না।” স্বরেশ বলল—“আমার যাওয়া তো হয় না অনিন্দিতা, আপিস যে তা হ’লে বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে মনে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। Red Cross থেকে এ অঞ্চলে একটা ফ্লাট ভাড়া চাচ্ছে। আমি মনে করেছি নীচের তলাটা খালি করে ওদের ব্যবহার করতে দেব। ভাড়া নেব না। তা হ’লে প্রয়োজন হলে ওদের ওঠান সহজ হবে। অথচ ওরা থাকলে বাড়ীর হেপাজত করবে। চাকর বাকরের দরকার হ’বে না। আমি ক্লাবেই খাওয়া দাওয়া করব।” “কিন্তু দাদা, আমরা যে তোমার জন্ত সমস্তক্ষণ চিন্তার মধ্যে থাকব”—অনিন্দিতার কথাতে সায় দিয়ে বলল স্বরেশের পিসিমা—“আমাদের প্রাণটাই এত মূল্যবান হ’ল?” স্বরেশ হেসে বলল—“বুঝ না পিসিমা, তোমাদের নিরাপদে রাখতে পারলে আমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারব। যদি মতাই তেমন তেমন প্রয়োজন হয় আমি একা থাকলে যেমন করে হ’ক বেরিয়ে পড়তে পারব। কিন্তু তোমরা থাকলে তোমাদের নিয়ে আমি আরও বিপদে পড়ব।” তারপর পিসিমা ও ভগ্নীকে অভয় দেবার জন্ত বলল স্বরেশ—“আমি দশ গ্যালান পেট্রোল আলাদা করে রেখে দেব। তেমন অবস্থা হলে ধ’ করে মোটরে বেরিয়ে পড়ব। জিনিষ পত্র সব আগে থেকে তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব, তাহলে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়তে পারব—”

এই রকম বুঝিয়ে স্বরেশ তার পিসিমা ও বোনকে ঠাণ্ডা করল। দেশের বাড়ীতে হেমাঙ্গিনী দেবীর দূর সম্পর্কের এক দাদা ছিলেন। তিনিই বাড়ীর ও দেশের জমিদারীর সব দেখা শোনা করতেন। এই নগেন দাদাকে চিঠি দিলেন হেমাঙ্গিনী দেবী। ঠিক হ'ল স্কুলের আসবাব পত্র ইত্যাদি সব নিয়ে আগে যাবেন হেমাঙ্গিনী দেবী ও অনিন্দিতা। সব গোছগাছ করে রাখবেন তাঁরা। তারপর হেডমিষ্ট্রেস সব ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের নিয়ে আসবেন। স্কুলের পুরাতন ক্লাক অনন্তবাবুও সঙ্গে থাকবেন। জন পঞ্চাশেক মেয়ে বিদেশে যেতে রাজি হ'ল।

শুভদিন দেখে যাত্রা করলেন মাসি বোনঝিতে। অনিন্দিতাদের ট্রেন যখন স্টেশনে এসে থামল, তখন হেমাঙ্গিনী দেবী মুখ বাড়িয়ে দেখে বল্লেন—“ঐ যে নগেনদা দাঁড়িয়ে আছেন, আয় নেমে আয়।” অনিন্দিতা চুঁ করে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। নগেনদা অনিন্দিতাকে দেখে বল্লেন—“এই বুঝি খেতার মেয়ে? দেখতে অবিকল তার মত।” অনিন্দিতা তার নগেন মামাকে প্রণাম করল। তারপর একটা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ীতে নগেনবাবু তুলে দিলেন হেমাঙ্গিনী ও অনিন্দিতাকে। সঙ্গে তাদের দাসী “বিন্দে” উঠল। স্কুলের এবং হেমাঙ্গিনীদের যে সব ভারি ভারি জিনিষপত্র ছিল তা নামিয়ে নিয়ে নগেনবাবু পরে যাবেন ঠিক হ'ল। হেমাঙ্গিনীদের গাড়ী ছেড়ে দিল।

গরুর গাড়ীতে অনিন্দিতার এই প্রথম যাত্রা। গ্রামের সঙ্গে বলতে গেলে তার এই প্রথম পরিচয়। সে মুখ বাড়িয়ে চল সব দেখতে দেখতে। একটা পাখী মিষ্টি করে ডেকে উঠল, অমনি অনিন্দিতা জিজ্ঞাসা করল—“ওটা কি পাখীর ডাক, মাসিমা?” মাসিমা বল্লেন—“ও হ'ল পিউ কাঁহা? শুনছিস না বলছে পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা?” অনেক দিন পর গ্রামের এই সব পাখীর ডাক শুনে হেমাঙ্গিনীরও কম ভাল লাগছিল না। তিনিও বলতে বলতে চল্লেন—“ঐ দেখ আমাদের কুমরদের বাড়ী। ইষ, চালে কত লাউ হয়েছে দেখ।”—তারপর একজন পথিককে দেখে বল্লেন—“হ্যারে হারান, চিনতে পারছিস?”

“হারান” বলে যাক ডাকলেন মাসিমা, সে তাড়াতাড়ি ফিরে বল্ল—“দণ্ডবৎ হই দিদিমণি, ভাল আছেন? অনেক দিন পরে গেরামে এলেন”—তারপর অনিন্দিতার দিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—“উটি কে দিদিমণি? ছোড়দিমণির মেয়ে? দাদাবাবুর মুখে শুন্লাম তোমরা দু'জনে এবার গেরামে এসে থাকবে। কি একটা পাঠশালা খুলবে। তা বেশ, আবার আমাদের গেরাম জেগে উঠবে। বড় কত্তা গিয়ে অবধি সব যেন ঝিমিয়ে গেছে।”

অনিন্দিতা আগ্রহভরে দেখছিল এইসব পথিকদের দিকে। অধিকাংশই হেমাঙ্গিনীর চেনা। বেশীর ভাগই তাদের প্রজা। এবার গরুর গাড়ী নামলো মেঠো রাস্তায়। মাসিমা বল্লেন—“ঐ যে চক মেলান বড় বাড়ীটা দেখছিস? ঐটা হ'ল আমাদের বাড়ী।” একটা প্রকাণ্ড সাবেকি জমিদার বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে থামল। রাঁধুনী বেরিয়ে এসে প্রণাম করল হেমাঙ্গিনীকে। তারপর অনিন্দিতাকে দেখে বল্ল—“ইটি বুঝি ছোড়দিমণির মেয়ে? ঠিক দেখতে তার মত। মনে হচ্ছে দিদিমণিই বুঝি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।”

নগেনবাবু বাড়ী ঘরদোর আগে থেকে পরিষ্কার করিয়ে রাখিয়েছিলেন এবং মোটামুটি সব ব্যবস্থাও ঠিক ছিল। স্নানের ঘরে ভোলা জলে গা ধুয়ে নিল অনিন্দিতা। হেমাঙ্গিনী দেবী বেশ করে পুকুরে ডুব দিয়ে নেয়ে নিলেন। অনেক দিন এমন করে পুকুরে সাঁতার কাটতে পারেন নি তিনি। মনের সাথে নেয়ে উঠে গেলেন ছাদে। অনিন্দিতাও সঙ্গে গেল। হেমাঙ্গিনী অনিন্দিতাকে সব পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন—“ঐ দেখ আমাদের বিল। এমন মিষ্টি জল ঐ অঞ্চলে আর কোথাও নেই। ঐ দেখ, বিলের ওপারে মুসলমানদের ঘর। ঐ ও পাশে থাকে মালোরা, বা দিকে ঐ যে বড় তেঁতুল গাছ দেখছিস? ঐদিকে হ'ল গয়লাদের ঘর। তারপর দেখছিস কত বড় জঙ্গল? ঐ জঙ্গলের ভিতর এখনও বাঘ বেয়য়। গঙ্গা কত সরে গিয়েছে দেখেছিস? ঐ যে বালির চর দেখা যাচ্ছে না? ওখানে আগে গঙ্গা ছিল। তাদের কেতাবে পড়িসনি? চাঁদরায়, কেদার রায়ের কথা? এখানে চাঁদ রায়ের আমলের ভাঙ্গা মন্দির আছে। লোকে বলে ওর একটি ইট যে ঘরে তুলে এনেছে সে নিরুৎসাহ হয়েছে।”

এইভাবে মাসিমা অনিন্দিতাকে পরিচয় করতে লাগলেন তার মামার বাড়ীর গ্রামের সঙ্গে। খানিক পর নগেনবাবু এলেন মাল নিয়ে। তারপর তিনিও ছাদে এসে বলেন—“হেমা, তুই ঐ সব নতুন বাড়ীটাড়ী গুলো দেখিস নি, না?” তারপর দূরে একটা কারখানার মত ষায়াগা দেখিয়ে বলেন—“ঐটা হ'ল মিলিটারি কারখানা। কলকাতা থেকে একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার এসেছে এই সব এয়ারোপ্লেন ঠিক করাবার জন্তে। ঐ ধারে যে বড় আম-বাগান ছিল সে সব কেটে ফেলে মস্ত এয়ারোড্রাম তৈরী হয়েছে। যিনি এই কারখানার তত্ত্বাবধান করেন তিনি আমাদেরই স্বজাতি—অরুণ চাট্টোয়্যে বুঝি তার নাম। তাকে সবাই ক্যাপটেন চ্যাটার্জী বলেই ডাকে। ছেলে মানুষ হলে কি হবে? খুব কাজের লোক। অনেক বিলিতি ডিগ্রী আছে ওর।”

হেমাঙ্গিনী দেবীর এসব নতুন ব্যবস্থা ভাল লাগল না। তাঁদের শাস্তিপূর্ণ ঘুমন্ত গ্রামে মিলিটারিদের আগমন তাঁর মোটেই লাগছিল না ভাল। তিনি একটু বিরক্ত হয়েই বলেন—“বাবা, এই মিলিটারিদের হাত থেকে কোথাও কি উদ্ধার আছে? সহরে ঘুরছি, ঘোর! গেরামে এসে দৌরাখ করা কেন?” নগেনবাবু হেসে বলেন—“ভুলে যাচ্ছিস কেন যে একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বেধেছে?” হেমাঙ্গিনী অনিন্দিতাকে দেখে বলেন—“সন্ধ্যা নেমেছে, আর খোলা চুলে ছাদে থাকিস নে। নেমে আয়। এতদিন পর দেশে এলাম আজ তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ আমিই জ্বালাব।” বলে নেমে গেলেন হেমাঙ্গিনী দেবী।

সেই সঙ্গে নগেনবাবুও গেলেন নেমে কিন্তু নামল না অনিন্দিতা। সে ছাদের প্রাচীর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল চারদিক। ঐ দূরে বিলের জল স্কাফের চোখের মত চকচক করছে। তার উপর অশু রবির শেষ রশ্মিটুকু পড়েছে। দূরের তাল গাছের সারির পিছনের আকাশ লালে লাল। রাখালদের ছোট ছেলেরা এক পাল গরু নিয়ে যাচ্ছে ঘরে। গরুর গলার ঘটার মিঠে আওয়াজ আসছে ভেসে। দূরের ঐ বাঁশের সঁকোটার উপর মালোদের ছেলেটা বসে বাজাচ্ছে তার বাঁশের বাঁশী।

তার মনের গোপন দুঃখ সে যেন একে দিচ্ছে সন্ধ্যা আকাশের বুকে বাঁশীর সুরে। বিলের পাশের ঐ মেঠো রাস্তা দিয়ে কোন্ এক উদাসী গেয়ে যাচ্ছে রামপ্রসাদের একখানা গান। অনিন্দিতা মনে মনে ভাবতে লাগল তার জীবনের কথা। তার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে আবার আরম্ভ হ'ল নতুন একটা অধ্যায়। যে গুরুভার সে মাথায় তুলে নিল সে তো পারবে তা বইতে? এত গুলি মেয়েদের রক্ষা করবার দায়িত্ব এসে পড়েছে তারই উপর। চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। এই বিপদের মধ্যেই স্থির হয়ে তাকে সব কাজ করে যেতে হবে।

(৪)

পরদিন স্থল সাজাবার কাজ নিয়ে পড়ল অনিন্দিতা। ঘর দোর সব গুছিয়ে ফেলে সে একটা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দিলে রাস্তার দিকে। বড় বড় হরপে স্থলের নাম ছিল তাতে লেখা। কিন্তু শুধু নাম দেখেই তো লোকে মেয়ে ভক্তি করবে না? এখানকার সব মাতব্বর ব্যক্তি যারা আছেন তাঁদের সহায়ত্ব না পেলে স্থানীয় ছাত্রী সংগ্রহ করা তার পক্ষে কঠিন হবে। নগেনবাবু এ গ্রামের প্রায় সকলকেই ভাল করে চেনেন। তিনি অনিন্দিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে রাজি হ'লেন। স্থলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নমিতা দাশ ও স্থলের পুরাতন কর্মচারী অনন্তবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে দু'চারদিন অনিন্দিতা অপেক্ষা করে রইল। সামনের শনিবার স্থল উঠে আসবে, তারপর রবিবারটা বিশ্রাম করে সোমবার থেকে স্থল বসবে। এই রকমই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্থল গোছাতে অনিন্দিতার প্রায় সারাটা দিনই কেটে গেল। শেষে গা ধুয়ে সে যখন সব চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিচ্ছিল তখন সন্ধ্যা নেমেছে। চা পান করে অনিন্দিতা একটু বাগানে বেড়াতে লাগল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে সে ফটকের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ফটকের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে একটা লাল রাস্তা। তার পাশে পড়ে রয়েছে বিস্তৃত সবুজ মাঠ। তারই কোল ঘেঁসে চলে গিয়েছে একটা সরু নদী।

অনিন্দিতা সহরের এদো পচা গলিতেই

মাছ। খোলা মাঠ, গাছ পালা, নদী বিল, এ সব কিছুই সঙ্গে তার পরিচয় ছিলনা এর আগে। সে ঐ ছোট জঙ্গল নদীর আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারল না। সে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিল। বোঁকের মাথায় সে যে বাড়ী থেকে কতখানি দূরে এসে পড়েছে তার ঠাণ্ডা হ'ল না। শেষে ক্লান্ত হয়ে সে বসে পড়ল একটা গাছের তলায়। এই গাছটার নীচে পড়েছিল একটা মস্তবড় গুড়ি। অনিন্দিতা বসল ঐ গুড়িটার উপর। পিছনে ছিল একটা প্রকাণ্ড ঝোপ। তার দৃষ্টি কিন্তু পড়ল না সে দিকে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর এতটা পথ হেঁটে এসে সে সত্যিই হয়ে পড়েছিল পরিশ্রান্ত।

ক্রমশঃ সূর্য্য গেল ডুবে। আকাশের আলো ম্লান হয়ে এল। মুনিষরা তাদের কাজ সেরে চলেছে যে যার ঘরে, দূর থেকে দেখতে পেল অনিন্দিতা। তারও বাড়ী ফেরবার দরকার, কিন্তু সে যেন কিছুতেই উঠতে পারছিল না। একটা আরামের অবসাদ ঘিরে ফেলেছিল তার দেহ মনকে। সে যেখানে বসেছিল তার বাঁদিকে ছিল সেই ছোট জঙ্গল নদীটা। অনিন্দিতা নেই দিকেই মুখ করে বসে দেখছিল নদীর আসে পাশের শোভা। কখন যে একটি মনুষ্যমুক্তি তার দিকে আসছিল এগিয়ে তা' সে টেরই পেল না। পিছনের ঝোপে একটা সরসর আওয়াজ হ'ল। তাও পৌঁছল না তার কানে।

হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন বলছে—“উঠে পড়ুন! সরে দাঁড়ান!” অনিন্দিতা চমকে চেয়ে দেখে একজন থাকিপোষাকপরা সৈনিক তাকে উঠে যাবার আদেশ করছে। সে কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল লোকটির দিকে। মাছটি এবার গম্ভীর মুখে বল—“মাপ করুন!” তারপর তার বাহু ধরে তাকে গুড়িটার উপর থেকে তুলে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে দিল।

অনিন্দিতা কিছু বলবার আগে লোকটি বল—“আপনি কি এই প্রথম গ্রামে এসেছেন? জানেন না যে সন্ধ্যার পর ঝোপের পাশে এমন করে কেউ বসে থাকে না?” অনিন্দিতার রাগ হ'ল। রাগ করে সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু লোকটি তার আগেই বল—“আমার পায়ের দিকে চেয়ে দেখুন!”

স্বর শুনে মনে হ'ল লোকটির আদেশ করা অভ্যাস আছে। তার আদেশ পালন করবার কোন ইচ্ছা ছিল না অনিন্দিতার, তবু কি জানি কেন সে চেয়ে দেখল লোকটির পায়ের দিকে, তারপর বলে উঠলো—“সরুনাশ! আপনার পায়ের নীচে যে একটা সাপ!”

“আর এক সেকেন্ডে দেরি হ'লে সাপটা আমার মিলিটারি বুটের নীচে না থেকে আপনার পায়ের উপরই পড়ত।” অনিন্দিতা অবাক হয়ে চেয়ে রইল লোকটির দিকে। লোকটি তখন দেখছিল সাপটিকে। বিবাক্ত বলেই মনে হ'ল। সাপের মাথাটা চাপা ছিল তার বুটের নীচে। তখনও তার দেহটা থেকে থেকে কাঁপছে। অনিন্দিতা বল—“সাপটা তো এখনও মরেনি? কাউকে ডাকব?”

“কাকে ডাকবেন? এ অঞ্চলে কারু তো আসবার হুকুম নেই। এটা মিলিটারি এলাকা। আর একটু পর থেকে মিলিটারি ক্যাম্প আরম্ভ। ভাগ্যে আর খানিকটা এগোননি। তা হ'লে হয়ত ক্যাম্পের সেক্টর হাতে নির্ধ্যাতিত হতেন।” অনিন্দিতা ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে বল—“এর একটু আগে থেকে মিলিটারি এলাকা আরম্ভ হয় তা তো জানতাম না। আমার মেয়েদের তাহলে এদিকে আসতে মানা করে দেবো।” লোকটি এবার আশ্চর্য্য হয়ে চাইল অনিন্দিতার দিকে। বল—“আপনার মেয়েদের বলেন? কটা মেয়ে আছে আপনার?”

অনিন্দিতা একটু মুচকে হেসে বল—“তা' গোটা পঞ্চাশেক হ'বে। আর এখানে থাকতে থাকতে সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা রাখি।” হুজনে এবার হেসে উঠল। “আপনি বুঝি ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলছেন? আপনিই কি ঐ স্কুলের হেডমিস্ট্রেস?” জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

অনিন্দিতা একটু গম্ভীর হয়ে বল—“আমি স্কুলের সেক্রেটারী—অনিন্দিতা মুখার্জী।” লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে বল—“আমি উপস্থিত এই মিলিটারি ক্যাম্পের চার্জে আছি—আমার নাম অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তবে এখানে আমাকে সবাই ক্যাপটেন চট্টাঙ্গি বলেই জানে।” “আপনিই বুঝি এই সব এরোডোম ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করেন?” জিজ্ঞাসা করল অনিন্দিতা।

লোকটি একটু মুচকে হেসে বল—“আমায় বদনাম এর মধ্যেই আপনার কানে পৌঁচেছে?” “ভয় পাবেন না! আপনার বদগুণ গুল এখনও বোধ হয় তেমন করে প্রকাশ পায়নি। আমার নগেন মামা তো বরং আপনার স্থখ্যাতিই করছিলেন!” হেসে বল অনিন্দিতা। অরুণ এবার জিজ্ঞাসা করল—“আপনি এখানকার জমিদার বাড়ীর দৌহিত্রী?”

একটা ক্ষুদ্র “হ্যাঁ” বেরুল অনিন্দিতার মুখ থেকে। অরুণ বল—“নগেন বাবুর সঙ্গে আমার খুব পরিচয় আছে। তিনি আমায় স্নেহ করেন বলেই বোধ হয় আমার বিষয় দুটো ভাল কথা বলেছেন। অত্ন কেউ বোলবে না। এই যে ধরুন না আপনি? আপনি কি বলবেন না যে একটা অসভ্য জানোয়ার আপনাকে রাস্তায় একলা পেয়ে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছে?” মুচকে হেসে বল অনিন্দিতা, “যে আমাকে সর্পিঘাতে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে তাকে অসভ্য জানোয়ার ছাড়া আর কি বলতে পারি বলুন?” অরুণও এবার একটু হাসল।

অনিন্দিতা দূরের বনটার দিকে দেখিয়ে বল—“শুনেছি ঐ বনে এখনও বাঘ বেরয়। অনেক রকমের বগ্ন জন্তুও নাকি ওখানে পাওয়া যায়?” “অনেক রকমের বুনো জন্তু ঐ জঙ্গলে আছে সত্য, তবে এ অঞ্চলে অনেক বুনো মানুষও আছে; আপনাকে আগে সাবধান করে দিচ্ছি অনিন্দিতা দেবী। যদি কোন সৈনিক আপনার স্কুলের দিকে কোন গোলমাল করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেবেন। আপনার এলাকাটাকে তাহলে out of bounds for troops করে দেব।”

সকুতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে ধনুবাদ জানাল অনিন্দিতা। অরুণের পায়ের নীচে যে সাপটা ছিল তার দিকে সে চেয়ে বল—“এবার এটা মরছে দেখছি।” তারপর অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বল—“জমিদার বাড়ী তো এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে টর্চ আছে তো?” লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল অনিন্দিতা—“আমি তো এতদূর আসব বলে মনে করিনি?” অনিন্দিতার কথা শেষ হ’তে না হ’তে বল অরুণ—“সর্বনাশ! এ অন্ধকারে এ পথ দিয়ে যাওয়া তো ঠিক হ’বে না? আপনি না হয়

আমার টর্চটা নিন”—অরুণ তার নিজের টর্চটা এগিয়ে দিল অনিন্দিতার দিকে।

অনিন্দিতা মাথা নেড়ে বল—“সে হয় না। এ অন্ধকার পথে আপনিই বা যাবেন কি করে? আমি বরং ফিরব লোকালয়ের দিকে। আপনি জঙ্গল পার হয়ে।” অরুণ দৃঢ় ভাবে বল—“আমাকে বেশীদূর যেতে হ’বে না। তাছাড়া এসব পথ আমার পরিচিত। আপনি সবে এ গ্রামে এসেছেন। আপনাকে কিছুতেই এ অন্ধকারে যেতে দিতে পারি না। বিশেষতঃ যে সাপটাকে মেরেছি তার জুড়ি নিশ্চয় আছে কাছাকাছি কোথাও।”

অনিন্দিতাও অরুণের মত দৃঢ় স্বরে বল—“আমিও আপনাকে অন্ধকারে যেতে দিতে পারি না। টর্চ না থাকার দরুণ যদি অস্থবিধায় পড়তে হয় কাউকে, তো সে অস্থবিধা ভোগ করতে হ’বে আমাকেই; আর যদি সাপের কথা বলেন তবে শুধু টর্চ থাকলেই কি আমি পার পাব?” হাল্কা চটি পরা পাখানা দেখিয়ে বল অনিন্দিতা—“এই চটির চাপে তো আর সাপ মরে না? তারপর যদি সে সন্ধীহারী হয় তবেতো আরও ভীষণ মৃতি ধারণ করবে সে। টর্চের সঙ্গে তাহলে আপনার মিলিটারি বুট জোড়াটাও যে দিতে হ’বে?”

অরুণ একবার মূহু আলোতে ভাল করে দেখে নিল অনিন্দিতাকে, তারপর বল “চলুন! আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি” অনিন্দিতা কোন কথা বলল না। শুধু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইল অরুণের দিকে। নিঃশব্দে তারা পথ বেয়ে চলল। অরুণ অগ্রমনস্কভাবে যে রকম বড় বড় পা ফেলে তার চলা অভ্যাস সেইভাবে চলতে লাগল। অনিন্দিতা কিছুক্ষণ জোরে জোরে পা ফেলে অরুণের সঙ্গে চলবার চেষ্টা করল কিন্তু একটু পরেই হাঁপিয়ে উঠে সে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল। অরুণ একা কিছুদূর এগিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ তার মনে হল অনিন্দিতা তার সঙ্গে নেই। ফিরে দেখে মাঝ পথে সে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি অরুণ ফিরে গেল অনিন্দিতার কাছে। “ক্ষমা করুন, আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আমার এই বুট পরা পায়ের সঙ্গে পা ফেলে চলা আপনার পক্ষে অসম্ভব। তা’ আপনিও তো বেশ! আমায় একটু থামতে বলতে পারেন

নি?" তারপর একটু হেসে বলল—“অন্ততঃ একটা বস্ত্র জন্তর সঙ্গে আজ পরিচয় হ'ল আপনার কি বলুন?" অনিন্দিতা তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে অরুণ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—“কি হ'ল? আপনার কি শরীর খারাপ করছে?" মুহূর্ত্তে অনিন্দিতা বলল—“শরীর খারাপ নয়, একটু দম নিচ্ছিলুম। চলুন যাওয়া যাক।” তারপর একটু হেসে বলল—“আজ আপনার দুর্গতির একশেষ হ'ল। কার মুখ দেখে উঠেছিলেন বলুন তো?"

অরুণ একবার চাইল অনিন্দিতার দিকে, তারপর মুহূর্ত্তে বলল—“সেটা ভাববার বিষয় বটে।” তারপর জমীদার বাড়ীর দিকে দেখিয়ে বলল অরুণ—“ঐ আপনার বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আর বেশী হাঁটতে হ'বে না আপনাকে। ভবিষ্যতে মনে রাখবেন এটা কোলকাতা শহর নয়। পাঁচ হাত অন্তর গ্যাসের আলো নেই। সর্বদা একটা টর্চ বা ল্যাণটার্ন নিয়ে বেরুবেন যদি অন্ধকার রাত হয়।”

অরুণ গেট থেকেই ফেরবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু অনিন্দিতা তাকে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠাতে পারলে না। ভদ্রতায় বাধল। যে তাকে অপঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচাল সেই ব্যক্তিকে এমনি করে বিদায় দিতে পারল না সে। নীচু গলায় বলল—“ভিতরে চলুন? আপনি তো নগেন মামাকে চেনেন। তিনি আপনাকে দেখে খুসী হ'বেন।” অরুণ একবার চাইল অনিন্দিতার দিকে, তারপর বলল—“আপনি আজ বড়

পরিশ্রান্ত। আজ আপনাকে বিরক্ত করা কি ঠিক হ'বে?" অনিন্দিতা শুধু বলল—“আমুন।”

জমীদার বাড়ীতে এদিকে হলুদুল পড়ে গিয়েছে। অনিন্দিতাকে খুঁজে পাওয়া বাচ্ছিল না। সে রাস্তাঘাট চেনে না। কোথায় সে গেল? চারিদিকে মিলিটারিদের আড্ডা বসেছে। তারা তো সব লোক ভাল নয়। সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। হেমাজিনী-দেবী বসে গেলেন মালা জপতে। কোন বিপদ সামনে দেখলেই তিনি মালার সহায়তা নেন। নগেনবাবু ল্যাণটার্ন নিয়ে বাইরে খুঁজতে বেরতে বা'চ্ছেন এমন সময় অনিন্দিতা বাড়ী ঢুকল অরুণের সঙ্গে। অনিন্দিতার মুখে সাপের কথা শুনে সকলেই বিচলিত হয়ে পড়ল। মাসিমা, নগেনমামা দু'জনেই অরুণকে তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানালেন। হেমাজিনী দেবী মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছাড়বেন না অরুণকে তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন। অনিন্দিতা বলল—“এত রাতে শুধু মিষ্টিমুখ করিয়ে কি হ'বে? তার চেয়ে একেবারে রত্নের খাওয়াটা খাইয়ে দাওনা?”

এবার অরুণ হেসে বলল—“তা'তে রাজি আছি। ক্যাম্পের খাওয়া খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছে। তা'ছাড়া আমাদের এত ঘুরতে হয়, যে অনেক সময় শুধু টিনের খাবার খেয়েই কাটাতে হয় কতদিন। রাতেও খাওয়ার লোভ সামলান শক্ত।” অরুণের কথায় হেমাজিনী দেবী একেবারে গলে গেলেন—“আহা, বাছারে, শুধু ঐ টিনের ছাই পাশ খেয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে? তোমার বাবা যেদিনই স্ববিধা হ'বে সেদিনই এখানে এসে চাউ ডাল ভাত খেয়ে য়েও।”

রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গ

ত্রিজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন—

“জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব।

বাঙ্গালী আজ গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব।

বাংলা গানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের সময়ে; ত্রিচৈতন্য প্রভাবিত ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দীতে অতি জন্মার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর অজন্মার শেষে বাংলার কাব্যগগনে দুইটি জ্যোতিষ্কের উদয় হইল—ভারত চন্দ্র (জন্ম ১৭০২) ও রামপ্রসাদ (জন্ম ১৭২০)।

দেশে তখন শাস্তির অভাব, উচ্চ আদর্শের অভাব—ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা, কাপালিকের ইন্দ্রজাল, সহজিয়াদের অভিযান বাংলার সমাজজীবন তখন বিপর্যস্ত করিয়াছে; ষোড়শ শতাব্দীর অল্পমম বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব তখন একান্ত মল্লীভূত; নানাবিধ ‘মঙ্গল কাব্য’র প্রতি সাধারণের আকর্ষণ লুপ্তপ্রায়; লিখিবার বিষয়বস্তু ও শিক্ষিত লোকের অভাব, ভক্তিবাহিনী নিছক আচারলিপ্সা ও কুসংস্কারের তাণ্ডব ঐ নিষ্ফল সপ্তদশ শতাব্দীর পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যের এই দুর্দিনে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের দান অতুলনীয়। উভয়েই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্য পাইয়াছিলেন—প্রেরণা তাঁহাদের নিজস্ব। ভারতচন্দ্রই প্রথমে খাঁটি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ রচনা করেন; তিনিই বাংলা কবিতার নবযুগের অগ্রদূত। তাঁহার প্রভাব আগমনী গানের প্রথম কবি রামপ্রসাদের রচনায় বহুস্থানে দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের ‘বিজ্ঞানন্দরে’ কালীর স্তব বর্ণ-মালার ক্রম অহুসারে রচিত, যথা—

কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।

কাতরে করুণা কর কুণপ কর্ণিকা॥

খর খড়্গা খর্বর খেটকে খলনাশা।

খণ্ড খণ্ড করে খলে খল খল হাসা॥

গিরিজা গিরিশী.....।

রামপ্রসাদের ‘বিজ্ঞানন্দরে’ও এই প্রথার অহুসরণ, যথা—

কুড়াঞ্জলী কহে কবি কালী কপালিনী।

কালরাত্রি কংকাল মালিনী কাত্যায়নী॥

কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার।

কপদি কামিনী কিবা করুণা তোমার॥

অহুপ্রাস ও জমকের লীলা, দুর্বোধ্য শব্দ বিজ্ঞাস, ধ্বনি মাধুর্যের পূর্ণতার জ্ঞাত অর্থসঙ্কট, অকারণ বাক্যবাহুল্য ও তাত্ত্বিক দর্শনের অভিব্যক্তি উভয়ের বিশেষতঃ রামপ্রসাদের রচনাতেই পরিস্ফুট; রামপ্রসাদ নিজের রচনার দোষ বুঝিয়া লিখিয়াছেন—

কালী কিস্করের কাব্য কথা বোঝা ভার;

সে বুঝে অক্ষর—কালী হৃদে আছে যার॥

‘সরস্বতী বন্দনায় বলিয়াছেন—

ক্ষুদ্র আমি, ক্ষীণপ্রজ্ঞা, পাল মাতা নিজ আজ্ঞা

কণ্ঠে বসি কহ স্থকবিত্ত।

‘অন্নদা-মঙ্গলে’ সরস্বতী বন্দনায় স্বপ্নাদিষ্ট ভারতচন্দ্র বলিলেন—

‘দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদ ছায়া

পূর্ণ কর নুতন মঙ্গল।’

দেশী বিদেশী মহাকবির বাণী বন্দনা কয়েকটি মাত্র এই প্রসঙ্গে নিতান্ত অবাস্তব হইবে না।

মুকুন্দরাম—“ছায়া দিয়া রাখ তব চরণ কমলে”

কুন্তিবাস—“দীন জনে কর দয়া দেহ রাম পদ ছায়া

আনন্দে গাইল কুন্তিবাস”

মধুসূদন—“উর তবে উর দয়াময়ী বিশ্বরমে

উরি দাসে দেহ পদ ছায়া

ঐ “এ বাক্সাগর আমি যথি সযতনে

লভি মা কবিতামৃত নিরুপম সুধা—

অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিমোহিনি।”

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—“এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনগোপাল”।

রামানন্দ রায়—“হৃদয়ে থাকিয়া তুমি জিহ্বারে

কহাও বাণী।

কি যে বলি, ভালমন্দ কিছুই না জানি—
রবীন্দ্রনাথ—“অন্তর মাঝে বসি অহরহ

মুখ হ’তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায়ে ম্রাপন সুরে।

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই

তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,

সঙ্গীত শ্রোতে কুল নাহি পাই

কোথা ভেসে যাই দূরে;”

তুলসী দাস—জেহি স্মিরত সিধি হোই গননায়ক

করি-বর-বদন।

করউ অহুগ্রহ সেই বুদ্ধিরাশি

শুভ-শুণ-সদন ॥

কবিগুরু Homer—(Pope’s Translation)

“Achilles’ wrath, to Grace the
direful spring

Of woes unnumber’d heavenly
goddess sing.

Declare, O Muse ! in what
ill-fated hour

Sprung the fierce strife, from
what offended power”

Milton—

“Celestial patroness who deigns
Her nightly visitations unimplored
And dictates to me slumbering,
or inspires
Easy my unprecedented verse.”

সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে নান্দী স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের
পর গ্রন্থারম্ভ হইত। ঐশী শক্তির আবাহনে হৃদয়পুরে
নব সুর বাজিয়া উঠে, অপূর্ব সাহসে উৎসাহে প্রাণ ভরিয়া
যায়, আরব্ধ কার্য্য এক অনির্বচনীয় গতিবেগে প্রাপ্ত হয়।
অতুলপ্রসাদ আবেগে কল্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন—

“চিন্তা ছয়ার খুলিবি কবে মা
ও মা চিন্তা কুটির বাসিনী ?”

রামপ্রসাদের চিন্তাছয়ার খুলিয়া গেল—বাণী বন্দনা
সার্থক হইল—নূতন স্বরসম্পদ, স্বতঃউৎসারিত আবেগ
চঞ্চল অহুভূতি, বিশ্বাসময় শরণাগতি, অপূর্ব রচনায়
হিরণ্য জ্যোতিঃতে আত্মপ্রকাশ করিল—সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে
বাঙালী চিরকাল বাঁধা পড়িল।

বৈষ্ণব কবিদের মতো রামপ্রসাদ প্রেরণার বশে ও
নিজের আনন্দের জন্য গান বা কবিতা রচনা করিতেন—
আর্থিক লাভের জন্য নহে, বা সাহিত্যের ব্যবসায়ের জন্য
নহে। সে যুগে বাংলা অক্ষরে ছাপাখানা অজ্ঞাত ছিল—
কর্মকুশলী প্রকাশক, সম্পাদক বা প্রযোজক ছিল না।
প্রবাদের মতো রামপ্রসাদের গান লোকের মুখে মুখে
ফিরিত। ভারতচন্দ্রের সৌভাগ্য তাঁহার ছিল না;
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের চণ্ডী
রচনার প্রণালীতে ‘অন্নদামঙ্গল’ সরল স্থললিত কবিতায়
বর্ণনা করিতে থাকিলে একজন ব্রাহ্মণ-নিয়োজিত হইয়া
তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন ও নীলমণি সমাদ্দার নামক
একজন গায়ক সেই রচনায় সুর-সংযোগ দ্বারা পালাভুক্ত
করিয়া রাখিতেন।

রামপ্রসাদের এ সকল স্বযোগ ছিল না, যদিও মহারাজ
তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিতেন, সাধক বলিয়া শ্রদ্ধা
ও সমাদর করিতেন ভারতচন্দ্রকে “গুণাকর” ও
রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন” উপাধিতে ভূষিত করিয়া
বিতোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাহিত্য-প্রীতির পরিচর
রাখিয়া গিয়াছেন। জীবনসম্বন্ধে রামপ্রসাদকে রাজ-
প্রাসাদে আনাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন ও দিব্যভাবে
তন্ময় হইতেন। হালিসুন্দর কুমারহাটির বিখ্যাত দাতা
কীর্ত্তিবাস সেনের বংশে রামপ্রসাদের জন্ম হয়; তাঁহার
পিতামাতা, ভগ্নী, ভাগিনেয়, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত
পরিচয় তাঁহার রচিত “কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর” নামক
পুস্তকে পাওয়া যায়। বাগবাজারে ৬মদনমোহন জীউর
মন্দিরের অধিকারীগণের পূর্বপুরুষের অধীনে রামপ্রসাদ
সামান্য হিসাব-রক্ষকের কাজ করিতে করিতে প্রথম সঙ্গীত
রচনা করেন বলিয়া বিশ্বদস্তী আছে।

পত্নী সর্বাঙ্গী দেবীও কবিতা লিখিতেন, একটিতে
শরণাগত দীনার্ধ ভক্তের আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হইতেছে—

পতি পদে মতি, রাখিয়া সম্প্রতি
সর্বগী ডাকে তোমারে।
বরদা অভয়া, কর মোরে দয়া।
দেহি পদ ছায়া মোরে।

আমি জানহীনা সাধন বিহীনা
স্বীয় গুণে দয়া কর,
প'ড়ে ভব ঘোরে ডাকি মা তোমারে
তনয়ে অরায় তার।

সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় যেন পতি পায়
এ নারী জীবন কয়
পারি করিবারে—এই ভিক্ষা মোরে
দে মা হইয়ে সদয়।”

সেন পরিবার ভাস্কর কুলাচার পালন করিতেন এবং সাধকপ্রবর আগমবাগীশ রামপ্রসাদকে তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। প্রায় ৮১০ বৎসর তাঁহার নির্জন উতানে বসিয়া নির্দেশ মত বীর ভাবের সাধনা করিয়া অধিকাংশ সময় মৌনী থাকিয়া রামপ্রসাদ দিব্যভাবে উপনীত হন। সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রাম ও শ্রামার সমন্বয়—বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন প্রচেষ্টা তাঁহার অপূর্ণ কীর্তি। দেশের অধ্যাত্মজীবনে তখন এমনি একজন শক্তিশালী সহৃদয়, স্বার্থশূন্য সঙ্গীতকারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তত্রোক্ত বন্দনায় উৎকট শব্দসম্ভারে কয়েকটি (পরিচিত) সঙ্গীত রচনার পর, তিনি সরল গ্রাম্য ভাষায়, অতি সাধারণ উদাহরণের সাহায্যে নূতন উদাত্ত স্বরসৃষ্টি করিয়া শ্রীভগবানকে মাতৃরূপে কন্যারূপে দেখিতে ও অল্পভব করিতে শিখাইলেন; ভক্তির নূতন ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তদানীন্তন দেহাতীত-ছাড়িয়া-দেহ-লইয়া-প্রমত্ত সমাজে স্তম্ভ বুদ্ধিতে জাগ্রত করিলেন। “এলোকেশী দিগ্‌মনা” এবং “তারা আমার নিরাকারা”—

সাকার ও নিরাকার দুইই তিনি মানিতেন; তাঁহার একটি বিখ্যাত গান—

“এমন দিন কি হবে তারা”

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করের বিদ্যুৎ পত্নী

শ্রীমতী লীলা রায়ের দ্বারা ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া P. E. N, Books (Bengali Literature) নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কয়েক ছত্র দিলাম:—

“Will the day ever come

When tears will flood my eyes

As I utter Thy Name, Tara ?

Then the lotus of my heart will

blossom.”

বিশিষ্ট শাক্ত কবিতা কয়েকটির ইংরাজী অনুবাদ Oxfordএর Prof. Thomson সাহেবের প্রকাশিত সঙ্কলনের মধ্যে রামপ্রসাদের সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে। মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্যলনে রামপ্রসাদের শ্রামাসঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। “প্রভাকরে” ঈশ্বরগুপ্ত, “প্রসাদ-প্রসঙ্গে” দয়ালচন্দ্র ঘোষ, “প্রসাদ পদাবলীতে” কালীপ্রসন্ন শর্মা, “সাধক রামপ্রসাদে” স্বামী রামদেবানন্দ, কবির বিষয়ে অনেক তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের গানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক স্বগ্রামবাসী বৈষ্ণব সাধক আজু গোসাই parody দ্বারা তাঁহার কয়েকটি গান আরও যেন সজীব ও সার্থক করিয়াছেন—

রামপ্রসাদ—

“ডুব দেবে মন কালী বলে

হৃদি রক্তাকরের অগাধ জলে।”

“আয়মন বেড়াতে যাবি

কালী কল্লতরু তলে গিয়ে,

চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।”

“এ সংসার ধোকার টাটি

ও ভাই আনন্দ বাজারে লুট।”

• “এবার কালী তোমায় খাব

হাতে কালী মুখে কালী,

সর্বদা কালী মাখিব।

খাবো খাবো বলি মাগো

উদরস্থ না করিব।

এই হৃদপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে
কলা দেখাব।”

আজু গৌসাই—

“ভুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।”
“কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্নেহে তুই
মাঠের মাঝে মাঝে যাবি।”

“এ সংসার রসের কুটী
হেথা খাইদাই আর মজা লুটী।”
“সাদ্য কি তোর কালী খাবি।

সর্কান্ধে নয় উভয় গালে,
ভুষো কালি মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা,
নিজে যে কলা দেখিবি।”

ইহার প্রত্যুত্তরে রামপ্রসাদ গাহিলেন—

“কালী ভেবে কালী হয়ে কালী বলে কাল কাটাও।
আমি কালাকালে কালের মুখে কালী দিয়ে চলে যাব।”

আজু অধুনাতম ছদ্মদিনে রামপ্রসাদের সেই গানটি
সকলের মনে পড়িতেছে যাহাতে তিনি কালীকে জিজ্ঞাসা
করিতেছেন—সর্কান্ধী! ছেলেকে গৃহবাসী করিয়া আবার
কেন সন্ন্যাসী করিলে?

তাঁহার দুঃখবাদ অনন্ত নৈরাশ্যের পথে লইয়া যায় না,
মার কাছে অভিমানে ছুটিয়া গিয়া শাস্তনা প্রার্থনা করে।

রামপ্রসাদ নিজের পরিচয়ে বলিলেন—

“চাক্কা জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর ব্যাটা”

এই উপলক্ষ্যে নানা অলৌকিক কাহিনী তাঁহাকে
ঘিরিয়া রহিয়াছে; বেড়া বাধিবার সময় জগজ্জননী আসিয়া
তাঁহার ক্তারূপে, তাঁহাকে সাহায্য করা, সুন্দরী রালিকার
রূপে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া গান শুনাইবার অহরোধ,
শুভ গৃহ-ভাণ্ডারে অকস্মাৎ অপরিচিত পুরোহিতরূপে
খাতসস্তার আনয়ন প্রভৃতি কিম্বদন্তী ভক্তহৃদয়কে চির-
উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার সঙ্গীতে মুক্তির জগ্ আকুলতা, সম্পূর্ণ
আত্মনিষ্কেপ, বিশ্বাসনির্ভর শরণাগতি, মাতৃপ্রতীকে ঈশ্বরের
আবাহন ও সাম্যপ্রাণাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেন মূর্ত হইয়া
ভক্তের মনের উপর অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করে।
তাঁহার রচনায় স্বর আগে আসিত না কথা আগে আসিত
বলা কঠিন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের রেশ যেন নৃতন সৃষ্টির
প্রাণচাক্ষুসে অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মার্জিত
সাহিত্য সে যুগে বিরল, ভাব ও ভাষার ‘পক্ষবান্ অশ্বরাজ
সম’ উদ্যম গতি, উচ্ছ্বাস বলাহীন, কল্পনা পরপারের
আলোক-লোকচারী; তথাপি বর্তমানের সুসংস্কৃত
মানদণ্ডের বিচারে রামপ্রসাদের গান মৌলিকতা,
আন্তরিকতা, সরল ও বলিষ্ঠ সন্ধান পাইতেছে। বহুম
যুগে তথাকথিত ইংরাজী উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর নিকট
রামপ্রসাদী গানের কথা মার্জিত-কচিসম্পন্ন না হইলেও
তাঁহার স্বর মৌলিকতা ও আন্তরিকতার জগ্ অদরণীয়
ছিল; এই ব্যবধান ঘুচাইতে বহুমচন্দ্র দর্শনে চেষ্টা
করেন। রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদী স্বরে স্বদেশী যুগের এই
শ্রেষ্ঠ গান রচনা করিয়াছিলেন—

“আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।”

মির্জা হোসেন ও সৈয়দ জাফরখাঁ নামক দুইজন
মুসলমান রচিত শ্রামাসঙ্গীত পাওয়া যায়, ‘রামপ্রসাদী
স্বরে’ অনেকে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ
জাতিতে বৈদ্য, কিন্তু তাঁহার রচিত বলিয়া সংগৃহীত
কয়েকটি কবিতা ও গানের মধ্যে “দ্বিজ রামপ্রসাদ” রচয়িতা
বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ‘দ্বিজ রামপ্রসাদ’ কলিকাতা-
বাসী, ‘কবিওয়ালা’ নীলমাধব চক্রবর্তীর (নীলু ঠাকুরের)
সহোদর; ‘কবির দলে’র জগ্ অনেক প্রসাদী সঙ্গীত ও
কবি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন; দুই রামপ্রসাদের রচনার
তুলনা করিলে পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়।

৭৩ বৎসর বয়সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে রামপ্রসাদ
অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের তখন
প্রায় সন্ধ্যা—নদীয়ার খ্যাতি শ্রুতিমিত, রাজসাহায্য-বঞ্চিত
পণ্ডিত মণ্ডলী ভীষণ অরাজকতা ও অপ্ৰত্যাশিত বিপদের
মধ্যে সংস্কৃতির দীপ নির্বাণ আশঙ্কা করিলেন। একটা
নিদারুণ হতাশার স্বর রামপ্রসাদের শেষের দিকের কবিতায়

ও গানে বাজিয়া উঠিল; নিমজ্জমানা কালী প্রতিমা
দেখিয়া জলে নামিয়া পড়িলেন—জনশ্রুতি এই, যে আকর্ষণ
জলে দাঁড়াইয়া তিনি পর পর এই চারিটি গান রচনা
করিয়াছিলেন:—

১। তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,

২। বল-দেখি ভাই কি হয় ম'লে?

৩। মলাম ভূতের ব্যাগার খেটে।

৪। তারা তোমার আর কি মনে আছে?

কথিত আছে—এই ঘটনার অল্পদিন পরেই রামপ্রসাদ
সজ্জানে গঙ্গাতীরে তল্লভ্যাগ করেন।

নৃত্য কলা

শ্রীহীরা লাল মুখোশী

মানব জাতি আজ পর্যন্ত যত কিছু কলাবিদ্যার
অনুশীলন করিয়াছে তাহার আদিতে নৃত্য কলা ও
স্থাপত্য শিল্পের স্থান। নৃত্যকলার জন্ম মানুষের দেহ
ভঙ্গীকে আশ্রয় করিয়া আর স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ
বহির্বস্তুর সাহায্যে। এই সমস্ত কলাবিদ্যার একটি ধারাকে
অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে সঙ্গীত, অভিনয়
আর কাব্য। ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্র এবং আর যে
সমস্ত কারুকলা, সে অল্প ধারায় প্রবাহিত, এই দুইটি
ধারাই শেষ পর্যন্ত একত্র মিলিত হইয়াছে। কোন
কলাশিল্পই এই দুইটি ধারার বাহিরে পড়ে না, কারণ
মানব সৃষ্টির পূর্বেই নৃত্য ও স্থাপত্য শিল্পের সৃষ্টি
হইয়াছিল।

পৃথিবীতে পাখীর বাসাই স্থাপত্য শিল্পের প্রথম
নিদর্শন। এডমণ্ড সেলাস প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন
যে পাখীরা হয়ত কোনও দিন যৌন আবেগে নৃত্য
করিতে করিতে তাহাদের নীড় নির্মাণের সূত্রটি লাভ
করিয়াছিল। কাষেই দেখা যায় নৃত্য কলাই যাবতীয়
কলার উৎস স্বরূপ।

সময়ে সময়ে নৃত্য কলা রুচিবাসিগণের অনাদর
লাভ করিলেও জন সাধারণের নিকট তার আকর্ষণের
মাত্রা মোটেই কমে নাই। একটু বিশ্লেষণ করিলেই
দেখা যাইবে যে দার্শনিকের চিন্তা ধারার উত্থান পতন
এবং শিশুর নব্বয় কচি দেহের লীলায়িত ভঙ্গী একই
নৃত্য তালের অন্তর্গত। আমরা যদি এই নৃত্য কলাকে

অবজ্ঞা করি তাহা হইলে আমরা এই পরিদৃশ্যমান বস্তু
জগতের এবং আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞান হইতেই
বঞ্চিত হইব। অতএব ব্যাপক অর্থে বলা যাইতে পারে
যে জগৎ এবং জীবনের মধ্যে যে অদৃশ্য স্পন্দন নিত্য
প্রবাহিত হইতেছে নৃত্য যেন তাহারই একটি বহিঃ
প্রকাশময় রূপ। এই অদৃশ্য স্পন্দনের আবেগেই—

“গ্রহ মণ্ডল হয়েছে পাগল

ফিরিছে নাচিয়া চির চঞ্চল

ফুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিঁদু

সহস্র-শির নাগিনী

ঘন অরণ্য আনন্দে ছলে

অনন্ত নভে শত বাহ তুলে

নিখার বারে উচ্ছ্বাস ভরে

বন্ধুর শিলা সরণে

নাচে ছয় ঋতু না মানে বিবাহ

বাহুতে ধরিয়া ধরিয়া।”

এই বিশ্ব নৃত্যের ছন্দ পতন হয় না। সমুদ্র তীরে
দাঁড়াইয়া আমরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখি তাহা
হইলে দেখিতে পাইব ঢেউগুলি একই সময়ের ব্যবধানে
বেলাভূমির দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, সাগর জল যেন
তালে তালে নৃত্য করিতেছে। আমাদের আধ্যাত্মিক
ও ব্যবহারিক জীবনেও এই একই তালে নৃত্য চলিতেছে
বলিলে আশ্চর্য্যবিত্ত হওয়ার কারণ কিছুই নাই।

(২)

নৃত্য স্রবণাভীত যুগ হইতে মানবের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে এবং মানব সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই ইহাকে আশ্রয় করিয়া জীব জগতে ভালবাসার অভিব্যক্তি হইয়াছে। অধিকন্তু মানব ঐতিহ্যের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ, শ্রম, আনন্দ উৎসব ও শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে নৃত্য ওতঃ প্রোত ভাবে জড়িত হইয়াছে। কোন কোন দার্শনিক পুরাতন সভ্যতার নজির উদ্ধার করিয়া নৃত্য কলা যে নৈতিক চরিত্র বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। নৃত্যের এই বহুমুখী অবদান মানব জাতির উপরে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তাহা বুঝিতে হইলে মানব জীবনের সূক্ষ্ম এবং গভীর অল্পভুতির ক্ষেত্রে তাহার স্থানটি চিনিয়া লইতে হইবে।

মানুষ নৃত্যের দ্বারা কি প্রকাশ করিতে চায়? সে চায় নৃত্য তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য তার সামাজিক রীতি নীতি, তার ধর্মকেই পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করে। জনৈক নৃত্যবিদ বলিয়াছেন যে অসভ্য জাতি তাহার হৃদয়াবেগকে কথায় প্রকাশ না করিয়া নৃত্যের তালে তালে তাহাকে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করে। পৃথিবীতে এখনও অনেক জাতি আছে যাহাদের নিকট একমাত্র ধর্ম সম্বন্ধীয় নৃত্য ব্যতিরেকে লৌকিক নৃত্যের স্থান নাই। কাযেই এক হিসাবে আমরা বলিতে পারি নৃত্য কলার সৃষ্টি হইয়াছিল মানবের চিরন্তন ধর্মপ্রেরণা হইতে। মানবেতিহাসের আদিম যুগে কোন কিছুই ধর্ম হইতে পৃথক ছিলনা এবং ধর্মই মানব জীবনের অগ্র সমস্ত দিককে নিয়ন্ত্রিত করিত।

আদিম মানবের জীবনে ধর্ম একটা বৃহত্তর অংশ দখল করিয়াছিল এবং নৃত্যই ছিল ধর্মভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন। নৃত্যে পূজা এবং প্রার্থনা ছই-ই সম্পাদিত হইত। (আজও আরতি নৃত্য, দেবদাসী নৃত্য আমাদের দেব পূজার অত্যাগতক অঙ্গ)। তাহাদের জন্ম মৃত্যু বিবাহ এবং যাবতীয় ধর্মাকর্ষণেই নৃত্য অঙ্গাদী ভাবে জড়িত ছিল। পারলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডে, বীজ বপনে

যুদ্ধ রোপণে, শস্ত্র আহরণে, যুদ্ধ বিগ্রহে, শান্তি স্বস্ত্যয়নে প্রত্যেক ব্যাপারেই যথোপযুক্ত নৃত্যের স্থান ছিল। তৎকালে এরূপ ধর্মবিশ্বাস বর্তমান ছিল যে স্বর্গের দেব দেবীরাও জগতে আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করেন; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিও নৃত্য করে এবং নৃত্যের দ্বারাই মানুষ বিশ্বনৃত্যের সঙ্গে ছন্দ সাম্য রক্ষা করিয়া থাকে।

প্রত্যেক ধর্মেরই আরম্ভে রহিয়াছে একটা উন্মাদনা এবং কোন কোন ধর্মে এই উন্মাদনা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। এই উন্মাদনাই ক্রমে নৃত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সারা পৃথিবীতেই আমরা ইহার নিদর্শন দেখিতে পাই। খৃষ্ট ধর্মের গোড়ার দিকে ধর্মযাজকগণ, হিব্রুগণ ধর্মোন্মাদনায় নৃত্য করিত। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের মধ্যেও একই ধর্মপ্রেরণায় চিকিংসকগণ পবিত্র দণ্ড হস্তে নৃত্য করে। উত্তর সাইবেরিয়ার সামানদের মধ্যে, তিব্বতীয় লামাদের মধ্যেও এই ধর্ম নৃত্য বর্তমান। অতি আধুনিক যুগেও যুরোপে তুর্কি দরবেশগণ ধর্মের অত্যাগতক অঙ্গ হিসাবেই নৃত্য করে।

এই ধর্ম নৃত্যে কখনও অন্তরের আনন্দাতিশয্যের অভিব্যক্তি হয় কখনো বা অর্থপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হৃদয়ের ভাব প্রকাশিত হয়। এই দুই ভাবেই মানব পৃথিবীর গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হয়। নৃত্যের উন্মাদনায় ভিক্ত অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও নিজের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তাহারই পরমারাধ্য অরূপের সঙ্গে মিলিত হয়। এইরূপ আনন্দাতিশয্যের নৃত্যই হিন্দুদের শৈব অথবা তাণ্ডব নৃত্য। এই নৃত্যে ভগবানের কর্মরূপের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই, এবং এই তাণ্ডব নৃত্য যে কোন দেশের যে কোন কালের কলা ও ধর্মের গৌরবের বস্তু।

অর্থপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বা মুক অভিনয়ে অভিনেতা প্রাকৃতিক নিয়মের স্বাভাবিক রূপ পরিস্ফুট করে এবং এই ভাবেই ভগবৎ শক্তির একান্ত সান্নিধ্য লাভ করে। মুক নৃত্যে সাধক লোকাভীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া সত্য ও স্নহের রূপের মধ্য দিয়া ধ্যানের বিকাশ এবং ভগবৎ শক্তির পূর্ণ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই ভাবেই মুক নৃত্য ধর্ম সাধনার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত চীন ও জাপানে মুক নৃত্য একান্ত ভাবেই ধর্ম নৃত্যের অঙ্গ হিসাবে ছিল, এই সব নৃত্যের বিভিন্ন নাম ও বিশিষ্ট ছন্দ ছিল এবং বিশেষ সম্প্রদায়ই এই নৃত্যের অধিকারী ছিল।

(৩)

নৃত্যের যে শুধু ধর্মের সঙ্গেই একমাত্র সম্পর্ক তাহা নহে, ইহা প্রণয়েরও রূপক। অমরনাগের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ মানব সৃষ্টির রহ পূর্বের ব্যাপার। নৃত্য প্রেমেরই ত্রায় পুরাতন, পার্থী ও কীট পতঙ্গদের মধ্যে নৃত্য আসক্তির প্রধান অঙ্গ। প্রণয় নিবেদনে পুরুষ নৃত্য করে, কখনো বা অস্ত্র পুরুষের সহিত প্রণয় প্রতিযোগিতায় জীকে আকৃষ্ট করিবার মানসে পুরুষ নৃত্য করিয়া জীর যোনাকাত্তা উদ্ভুদ্ধ করিয়া তাহাকে নৃত্যে উৎসাহী করিয়া তুলে এবং এই নৃত্য পরিণতি লাভ করে প্রণয়ীদের একান্ত মিলনে। বৃহৎ প্রাণীদের উত্তম মানবের ত্রায় নানা ভাবে ব্যয়িত হয় বলিয়াই তাহাদের মধ্যে যৌন নৃত্যের সম্যক পরিষ্করণ দৃষ্ট হয় না। তবুও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে শিম্পাঞ্জীর দুর্বল পায়ের পেশীর আকস্মিক প্রচণ্ড আক্ষেপই বিবর্তনবাদের দৌলতে অ্যানা পাভলোভার স্বর্গীয় নৃত্য পরিণত হইয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে শিম্পাঞ্জি মানবের পূর্ব পুরুষের জাতি, পূর্ব পুরুষ নহে; পার্থী ও কীট পতঙ্গের প্রণয় নৃত্যের ত্রায় নৃত্য পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্য জাতিদের মধ্যে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। আধুনিক সভ্য জগতেও প্রণয় নৃত্যের পুনরাবির্ভাব দেখা যাইতেছে। অঙ্গীল ও জনীতিপরায়ণ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যে নৃত্য সম্পাদিত হয় তাহাতে মানবের দৈহিক কামনা উজ্জ্বল হয় বলিয়াই নীতিবাগীশের নিকট নৃত্য কলা অনাদরের বস্তু হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতিতে এবং আদিম অধিবাসীদের নিকট নৃত্যের মূল্য এই কারণেই, ওমহা জাতির নিকট নৃত্য অর্থই হইল প্রণয়। পুরুষ তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য শক্তি উদ্যম ও চাতুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ করিয়া রমণীর লক্ষ্য আদায় করিয়া তাহার চিত্ত পূর্ণরূপে দখল করিবে। সারা প্রকৃতিতেই পুরুষের ইহা নির্দিষ্ট কর্তব্য বলিয়া

দেখিতে পাই। মানব ব্যতিরেকেও বিভিন্ন জীবগণ নৃত্যকেই রমণীজনয় জয়ের প্রধান উপায় হিসাবে মানিয়া লইয়াছে। বাহারা এই নৃত্য কলায় অপারদর্শী তাহারাই বংশ রক্ষায় পিছাইয়া পড়ে। জীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয়; তাই সুন্দর পুরুষের বংশ রক্ষা ঘটে; ফলে বংশ পরম্পরায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।

কাষেই দেখি নৃত্য দ্বিবিধ কার্য সম্পন্ন করে। প্রথমতঃ নৃত্যের দ্বারা আমাদের অন্তরের আনন্দোচ্ছাস অভিব্যক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ ইহা আমাদের দেহের স্তম্ভ মাধুর্য্য প্রকাশিত করিয়া রমণী চিত্ত জয়ে সহায়তা করে। শুধু যে পুরুষই রমণীকে আকর্ষণ করিবার জন্য নৃত্য করে তাহা নহে, জীজাতিও পুরুষকে আকর্ষণ করিবার জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। বিভিন্ন ঋতুতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের এই মিলন নৃত্য আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এমনি করিয়াই জীব সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে এই নৃত্য সম্পাদিত হয়। উত্তর যুরোপে শীত প্রধান দেশে পদ সঞ্চালনেই নৃত্য করিয়া থাকে। জাপানে যবদ্বীপে ও মাদাগাস্কারে বাহ ও হস্ত সঞ্চালন পূর্বক প্রণয় নৃত্য সম্পন্ন হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে হস্ত ও অঙ্গুলি সঞ্চালনে, ফিজি দ্বীপে শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় নৃত্য করে। তিউনিসে যুবতীগণ চুল উড়ন্ত অবস্থায় রক্ষা করিয়া মস্তক সঞ্চালনে নৃত্য করে। আফ্রিকা এবং পলিনেশিয়া ও রোমে বক্ষ ও কোমর দোলাইয়া নৃত্য করে। তাহিতি দ্বীপে দেহ হস্ত পদ চক্ষু ওষ্ঠ ও জিহ্বা নাচাইয়া নৃত্য করে। স্পেনে উন্মুক্ত বাহ সঞ্চালনে যুবতীগণ যে নৃত্য কলার সৃষ্টি করে তাহা অনবদ্য। যখন স্ত্রী-পুরুষ একত্রে প্রণয় নৃত্য করিয়া থাকে তখনই এ নৃত্য পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে।

(৪)

ধর্ম সাধনার অঙ্গরূপে এবং জী-পুরুষের আসক্তির আত্মবৃত্তিক রূপে নৃত্যের যে স্থান নির্দেশ করিয়াছি তাহা ছাড়াও একটি বিশিষ্ট ললিত-কলারূপে অপরবিধ বহু সার্থকতা তাহার আছে। বহু লোক নৃত্যের সাহায্যে

আনন্দ বিতরণ করিয়া জীবিকার সংস্থান করে, হাওয়াই দ্বীপের ছাড়া নৃত্য ধর্ম নৃত্যের অন্তর্গত। বহু সাধনায় এবং বহু বিধি নিয়মের গুণী মানিয়া লইয়া এই নৃত্যে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়। কিন্তু এই নৃত্যে অধিকার একদল পেশাদারী লোকেরই আছে। ভারতের দেবদাসী নৃত্য ও তদ্রূপ, দেবদাসী নিজেকে ভগবানের সঙ্গে বিবাহিত মনে করিয়া তাঁহাকে নৃত্যছন্দে অন্তরের আকৃতি ও প্রণয় নিবেদন করিয়া থাকে।

কিন্তু আধুনিক যুগের পেশাদারী নৃত্য ধর্ম অথবা প্রণয়ের আসক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাহারা উদয় শঙ্করের নৃত্য অথবা শান্তি নিকেতনের মূক অভিনয়ে নৃত্য দেখিয়াছেন তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে ইহা লোকাভীতি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া সত্য

ও স্তম্ভের রূপের মধ্য দিয়া ধ্যানের ধনধানিকে প্রকাশ করিয়াছে। দেহের লীলায়িত গতিভঙ্গী বিবিধ ছন্দে শিহরণ তুলিয়াছে, ইহা আসক্তি এবং ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হইলেও ইহা পবিত্র, অনবদ্য এবং অতি উচ্চাঙ্গের ললিত কলা বিশেষ।

এমনি জাতের একটি ললিত কলা যে কোনও দিন ষাট্টিক সভ্যতার পীড়নে পড়িলে লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা মনে হয়না, রুচি পরিবর্তনে ইহার রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে। নৃত্য আমাদের সামাজিক রীতি নীতির স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গ, নৃত্য আমাদের জীবনে শুধু প্রণয় এবং ধর্ম্ম সাধনায় নয়, নৈতিক চরিত্র এবং স্বঠাম দেহ গঠনেও সহায়তা করিয়াছে।

বাংলার বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা।

শ্রী—

আজ প্রায় গোটা পৃথিবীতে হাহাকার—খাদ্য নাই, আশ্রয় নাই, ভবিষ্যতের সংস্থান নাই। এই সময়ের বড় চেউ এসে বাংলার বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছে। ষাঁরা সামান্ততম সমাজ কল্যাণ কাজও করেন তাঁরাও জানেন যে শরণার্থীদের মুখে একই বুলি—চাকরী দিন—রোজগারের উপায় করে দিন। শরণার্থী ছাড়া যারা বেকার আছেন তাঁদের ত কোন উপায়ই নাই। শরণার্থী তবু নিজের নাম চাকরীর তালিকাভুক্ত করার আনন্দ লাভ করছেন, অন্তরা যে স্থখেও বঞ্চিত। ফল অবস্থা দুই দলেরই সমান। এমন অবস্থায় করা যায় কি? রাতারাতি ত হাজার ২ চাকরী গজিয়ে উঠবে না। চাকরী জিনিষটা ত সম্পূর্ণ চাহিদার উপর নির্ভর করে। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান না বাড়লে চাকরীর সংখ্যা বাড়বে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পপতিরা নানা কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠান বাড়াবেন না বলে জেদ ধরে বসে আছেন। গভর্নমেন্ট নিজে শিল্প প্রতিষ্ঠান বসাবার মত ক্ষমতা রাখেন না।

কাজেই চাকরীর সংখ্যা কমছে বই বাড়ছে না। কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দের উপর ছাঁটাইএর খাঁড়া উদ্ভূত হয়েছে। শ্রমিক নেতাদের বড় কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই খাঁড়ার কোপ প্রতিরোধ করা। তারপর যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান কিছুটা বাড়বে এবং তাতে যদি হাজার কয়েক লোকের চাকরী হয়ও তবুও তারা মাইনে পাবে নোটে—সেই কাগজের টাকা চিবিয়ে ত তাদের পেট ভরবে না। তাদের চাই চাল ডাল ছুন তেল—সবই ত' দেশে খাঁটতি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরা চাল না দিলে, গম না দিলে বাংলার খাওয়া চলে না; বসে থেকে কাপড় না এলে মেয়েদের লজ্জা নিবারণ হয় না শিশুদের কাঁথা পর্যন্ত তৈরী হয় না। তবে শুধু চাকরী ও কাগজের টাকা দিয়েই বা হবে কি? দলে দলে শরণার্থী পূর্ব বাংলা থেকে শেকড় কেটে এসে হাহাকার করে রাস্তা ঘুরছেন—তাঁদের আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই এমন কি সমাজ সেবার মুখোঁস পরা পাখীদের হাত থেকে নিজের জী কল্যাণকে রক্ষা করবার

ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। গোটা বাঙালী জাতটা আজ মরতে বসেছে। ভারতে স্বাধীনতা আনার জন্য পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের সঙ্গে বাংলা সমানে আত্মবলিদান করেছে। এখন তাকে বাঁচাবার উপায় কি? চাকরী ও কাগজের টাকা ফাকা ও অস্থায়ী উপায় মাত্র। চাকরী মানে শিল্পপতিদের কাছে আত্মবিক্রয়, কাগজের টাকা চোখে ধুলো মাত্র। এ রকম অবস্থায় আমাদের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাংলাকে দ্রব্যস্বাবলম্বী করার পথে নিয়ে যেতে হবে। পরিকার করে একথা সকলে না ভাবলেও বহু সমাজ সেবী আজ এই দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। শিল্পকেন্দ্র মাত্রতেই তাঁত বসান হচ্ছে, সেলাইএর কল বসান হচ্ছে। স্থতার অভাব নাই, গভর্ণমেন্ট অর্ডার ও আসছে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে এই দুটিই অফুরন্ত নয়। মাত্র ছয় সাত বৎসর আগে যুদ্ধের সময় স্থতার অভাবে তাঁতীদের হাত আরেকবার রোদে পুড়েছিল—যেমন প্রথমবার পুড়েছিল কোম্পানীর আমলে ঢাকাই তাঁতীদের হাত। আর গভর্ণমেন্ট অর্ডার রিলিফের—সেও চিরদিন চলবে না। তখন কি হবে? প্রায় প্রত্যেক শিল্পকেন্দ্রই সরকারের অপরিমিত সাহায্যে চলছে; এগুলিতে তৈরী মাল বাজারে লড়াই করতে পারবে কেন? বিশেষ করে যখন সরকারী সাহায্যের উৎস ক্রমশঃ শুকিয়ে আসবে? আর তাঁত ও সেলাইএর কলে খাদ্য উৎপাদন করা যাবে না, খাদ্য সমস্যা মেটাবার প্রয়াস খুব অল্প শিল্প কেন্দ্রই করছে। এই জন্য মনে হয় আজ বাংলার একমাত্র ভরসা বাংলার ছেলের হাতে লাঙল ধরা, বাংলার মেয়ের চরখা ধরা ও ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে তাঁত ধরা। সহজ নয় জানি, কিন্তু বহু শক্ত কাজই মানুষকে করতে হয়—জীবনের লড়াইতে মরণের সম্মুখীন হতে হবে। এ ভিন্ন অল্প উপায় ত রাস্তায় হেঁটে ২ পুরাণ চটা জোড়া সম্পূর্ণ ছিঁড়ে ফেলা, বাড়ীর মেয়েদের গুণ্ডার

হাতে তুলে দেওয়া ও শিশুদের খাদ্যাভাবের সোজা বলিদান করা। অতীত থেকে দেখলে মনে হয় লাঙল চরখা ধরা এত শক্ত থাকবে না যদি বর্তমান অদ্ভুত শিক্ষা প্রণালী বদলে জীবনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করা যায়। যদি দ্রব্যস্বাবলম্বী হওয়াটাকে সবার আগে ধরা যায় তবেই আমাদের মুক্তি। শিল্প কেন্দ্রগুলি যদি আজ শুধু সরকারের সাহায্যে মিলের স্থতার তাঁত বোনা উল বোনা ও সৌখীন কাজ ছেড়ে দিয়ে কিংবা কমিয়ে দিয়ে নিজের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজের হাতে তৈরী করার শিক্ষা দেন তবেই বাংলা আবার বাঁচতে শুরু করবে। এই স্বাবলম্বী হবার পিছনে থাকবে সমাজের সমবায় শক্তি। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠবে সত্যিকারের সমবায় সমিতি, তবেই সমস্যা মীমাংসার রাস্তার চিহ্ন দেখা দেবে।

চরখা ও লাঙলের কথা নতুন নয়। গ্রামীণ সভ্যতা নিভিয়ে দিয়ে যখনই বাংলার ছেলেরা সহরের অভিমুখে ছুটেছিল তখন থেকেই মনস্বীরা গ্রামের দিকে মন ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। কালের স্রোতের খরধারায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর এলেন গান্ধীজী যিনি চরখার নামে গান বাধলেন, যে গানের স্বর ভারতের চিরন্তন স্বর। কিন্তু গান্ধীজীর হাতের চরখা বিষ্ণুর চক্র কিংবা শিবের ত্রিশূলের মত দেবতার প্রতীক হাতে বসেছে, সেইটাই সর্ব্বনেশে। গান্ধীজীর চরখার গানের পিছনে রয়েছে ভারতে জনগণের চরম বেদনা ও লাঞ্ছনার পর্যায় ও তার প্রতিকার প্রচেষ্টা। সেখানে আদর্শবাদের আড়ালে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মূল কথা। যন্ত্রদানবের চাপে মানুষের পিষে মরাকে বাঁচিয়ে তাকে আবার আশার আলো দেখান। ভারতের এই সময়ে কলের সঙ্গে চরখা পালা দিতে পারবে কিনা এই নিরর্থক তর্ক অরুঝেবাই করে থাকেন। আজ বাংলার সকল ছেলে মেয়েকে লাঙল ও চরখার গান শিখতে হবে এই একমাত্র পথ।

ছবি

শ্রীফুল্লরা রায়

আমার চাকর আমার ঐ রকম সাংঘাতিক আহত অবস্থায় খোলা মাঠে রাত কাটাতে দিতে রাজী না হয়ে এক রকম প্রায় জোর করেই আমাকে নিয়ে যে প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলো, সে রকম চমৎকার বিবাদময় প্রাসাদ একমাত্র এপেনাইন পর্বতশ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় মিসেস র্যাড ক্লিকের কল্পনায়। দেখে মনে হলো অল্প কিছু আগে অল্প সময়ের জন্য প্রাসাদটি পরিত্যক্ত হয়েছে। খুব দামি আসবাব পত্র দিয়েই সাজানো কিন্তু সবই একেবারে পুরোনো ধুরধুরে। দেয়ালগুলো নানান রকমের বম ও ছুঁচের সূক্ষ্ম কাজকরা পর্দায় সাজানো; আর ছিল অনেক ছবি, আধুনিক কায়দার ছবি, সোনালী ফ্রেমে আঁটা। ঘরের সব দেওয়াল ও কোনা যুপুটিতে টাঙ্গানো সেই সব ছবিগুলোর উপরেই আমার অস্বস্ত মনের ঝোঁক পড়ায় আমি পেড়োকে হুকুম দিলাম সব জানালাগুলো বন্ধ করে, বিছানার চারদিকের কালো ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে, মাথার কাছে যে মোমবাতিটা ছিল সেটা জালিয়ে দেবার জন্ত। ঠিক করলাম—বিশ্রাম করবো—ঘুমোতে যদি একান্ত নাই পারি তবে শুয়ে শুয়ে ছবিগুলো দেখবো এবং বালিশের ওপরে ছবিগুলোর বর্ণনা ও সমালোচনা দেওয়া যে বইটি পেয়েছিলাম সেটা পড়বো।

কতক্ষণ ধরে যে বইটি পড়লাম—আর কি বিশ্বাসের সঙ্গেই তাকিয়ে রইলাম! সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলাম না—রাত গভীর হোল। মোমবাতির আলো ভাল করে বইএর ওপর পড়ছিল না—নিজেই সরিয়ে নিলাম মোমবাতিটা—চাকরকে আর ঘুম থেকে ডাকলাম না।

মোমবাতিটা সরানোর ফল কিন্তু আশ্চর্য্য হোল—আলোটা ঘরের এমন একটা কোনায় গিয়ে পড়লো যেটা আগে ঋণের ছত্রির ছায়ায় অন্ধকার ছিল। উজ্জ্বল আলোয় আমার চোখ পড়লো একটা নতুন ছবির ওপর।

ছবিটা একটি তরুণীর—প্রায় প্রাপ্ত বয়স্কা। চট করে একবার ছবিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই চোখ বুঁজে ফেললাম। প্রথমে নিজেই বুঝলাম না কেন এ রকম করলাম। চোখ বন্ধ করে ভাবলাম—কেন আমি এ রকম করলাম; ঠিক করলাম যে মনটা একটু চিন্তা করতে চায় বলে হঠাৎ এ রকম হয়েছিল—ভাবতে চাই যে আমার চোখ আমার ঠিকিয়েছে কিনা—কল্পনার চেউকে শাস্ত করে আরো স্থির ভাবে আবার ছবিটা দেখা স্থির করলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার স্থির দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকালাম।

এবার যে আমি ঠিকই দেখলাম সে বিষয় আর কোনো সন্দেহ নেই—কারণ, মোমবাতির প্রথম আলোর রশ্মি ছবিটার ওপর গিয়ে পড়তেই আমার স্বপ্নের বোর কেটে গেল, আমি পুরোপুরি জেগে গেলাম।

আগেই বলেছি ছবিটা একটি তরুণীর আবক্ষ ছবি—কেতাদুরস্ত ভাষায় যাকে বলা যায়—“ভিনেট” কায়দা অনেকটা “সালি”র মাথার যে জনপ্রিয় ছবি দেখা যায় সেই রকম। হাত, মুখ, এমন কি চুল পর্যন্ত এমন ভাবে পিছনের রঙ্গের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যে প্রায় নজরেই পড়ে না। ছবিটার ফ্রেম ভিষাকৃতি—সুন্দর কারুকার্য্য করা। কিন্তু ছবিটার আকার কায়দা বা মুখের সৌন্দর্য্য যে আমাকে এ রকম আকৃষ্ট করলো তাতো নয়—এও সম্ভব নয় যে আধঘুমোন্ত অবস্থায় ছবিটাকে আমি জীবন্ত মানুষ বলে কল্পনা করেছিলাম। তখনই বুঝতে পারলাম যে ছবি আকার কায়দার বিশেষত্ব থেকে ও রকম মনে করা অসম্ভব। এই সব ভাবতে ভাবতে (প্রায় এক ঘণ্টা ধরে) অর্দ্ধেক বসে, অর্দ্ধেক শুয়ে, আমি খুব মন দিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অবশেষে ছবিটার আসল রহস্য বুঝতে পেরে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছবির মুখের অভূত সজীবতার ছাপ আমাকে প্রথমে আশ্চর্য্য ও পরে অভিভূত করে ফেললো। শব্দের সঙ্গে আমি আবার

মোমবাতিটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে রাখলাম। আমার অস্বস্তির কারণ এখন চোখের আড়াল হওয়াতে আমি তাড়াতাড়ি সেই ছবির ইতিহাস দেওয়া বইখানি খুঁজলাম। এই ভিষাকৃতি ছবির যে নম্বর সেইখানে দেখি এই অস্পষ্ট অদ্ভুত কথাগুলো—

“এই মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, আনন্দ উচ্ছ্বাসও তাঁর কিছুমাত্র কম ছিল না। কপাল তাঁর ভাঙ্গলো যখন তিনি এক অশুভ মুহূর্তে একটি চিত্রকরকে ভালবেসে বিয়ে করলেন। সেই কল্পনাগ্রবণ, শক্তিশালী, কঠোর চিত্রকরটি শিল্পকলাকে আগেই বধূরূপে বরণ করেছেন। এই হরিণ শাবকের মত চঞ্চল, হাসিখুসি, আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি সব কিছুই ভালবাসতেন কেবল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এই শিল্পকলা ছাড়া। তিনি ভয় পেতেন কেবল তুলি ও রংগুলিকে যেগুলি তাঁর প্রেমিককে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতো। কাজেই চিত্রকর যখন তাঁরই ছবি আঁকতে চাইলেন তখন তিনি একেবারেই খুসী হলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব নম্র ও বাধ্য—তাই তিনি সেই অন্ধকার ঘরটিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে লাগলেন। চিত্রকর ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর কাজে ডুবে থাকতেন। খেয়ালী চিত্রকর কখন কখন নিজের কল্পনাধারার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন—তিনি বুঝতেই পারলেন না যে সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে মেয়েটি ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছেন। তবু মেয়েটির হাসি মুখ কখন ম্লান হয়নি, কখন টু শব্দটি মুখ দিয়ে বেরোয়নি—

কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে চিত্রকরটি তাঁর কাজের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রেরণা ও আনন্দ পান; তিনি ক্রমেই নেতিয়ে পড়তে লাগলেন—কিন্তু চিত্রকর একেই চললেন। যারা ছবিটি দেখেছিলেন তাঁরা মেয়েটির সঙ্গে ছবিটির অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা বলতে লাগলেন। আশ্চর্য্য সে ছবিটি—এবং তার মধ্যে দিয়ে চিত্রকরের ভালবাসার প্রমাণও পাওয়া গেল। কিন্তু যখন ছবিটি শেষ হয়ে এলো তখন আর কারুর সে ঘরে ঢোকার আদেশ রইল না—কারণ কাজের নেশায় চিত্রকরটি তখন প্রায় পাগল—তিনি আর ছবি থেকে চোখ তোলেন না, এমন কি জীবন মুখের দিকেও তাকান না। তিনি বুঝতেই পারলেন না যে তিনি তাঁর ছবির রং তাঁর সহচারিণীর মুখ থেকেই নিয়ে নিচ্ছিলেন। যখন অনেক সপ্তাহ কেটে গেছে, কেবল মুখের ও চোখের ছুটি রেখা বাকী আছে তখন, প্রদীপ যেমন নিভবার আগে একবার জলে ওঠে সেই রকম মেয়েটিও যেন হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলেন। তারপর সেই রেখা টানা শেষ হোল—আর একটি মুহূর্ত মাত্র চিত্রকর ছবিটির সামনে দাঁড়ালেন—ছবির দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি চোঁচিয়ে উঠলেন—“এ যেন একেবারে জীবন্ত”—হঠাৎ তিনি ঘুরে তাঁর প্রেমিকার দিকে তাকালেন—তিনি মারা গেছেন।” *

* Edgar Allan Poe কর্তৃক রচিত “The Oval Portrait” গল্প হইতে অনুবাদ।

টী পাটি

শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ

বড় রাস্তার মোড়ে ঝক ঝকে তকতকে বাড়ীটা।

সন্ধ্যার দিকে নানা রংয়ের গাড়ী এসে লাগে লোহার ফটকের গায়ে। শ্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানান অভ্যাগতদের গৃহকর্তী করজোড়ে। বেশভূষার পারিপাট্য, শ্মিতহাস্য, চাপা চাপা কথা পরিচয় দিচ্ছে অভ্যাগতদের অভিজ্ঞাতোর। এঁদের সংখ্যা সামান্যই, তিনটি আজুলের ভিতরেই ধরা পড়ে।

কার্পেটি বিছান হলঘর, আরাম কেদারা বসান। দেয়ালে মাত্র কয়েকটি ছবি। ভগবান বুদ্ধ হতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ষাটটি ছবি হবে, বেশী মূল্যের তৈল চিত্র। ঘরে পা দিলেই মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

লম্বা দোহারা চেহারায় আসমানী রংয়ের শাড়ী ও সামান্য কয়েকটি অলংকারে গৃহকর্তীকে দেখাচ্ছে অতীব স্নন্দর ও আকর্ষণীয়। বেশভূষার বাছলো চাপা পড়তে দেন নি নিজেই। অভ্যাগতেরা যার যার আসন নিতেই বেয়ারা এসে দাঁড়ালো একটি ট্রেতে কয়েক গ্লাস সরবৎ নিয়ে। পরিবেশন করতে থাকেন গৃহকর্তী নিজে।

“এক, মিসেস পাঠক” বললেন পিছন থেকে একজন।

“এমন কিছু নয়, একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিন” হেসে জবাব দেন গৃহকর্তী।

“ঠাণ্ডা ত এমনই হয়ে এসেছি, উঃ কি জল যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে...” বলেন সামনের একজন। কমাল মুখের উপর বার বার বুলিয়ে যেন বৃষ্টির ছোপ চোখে মুখে লেগে রয়েছে, মুহুর্তে চায় না।

“ঠাণ্ডা হওয়ার চেয়ে গরমহবার প্রয়োজনই ছিল বেশী” বলেন অপর একজন রহস্য করে।

“দেখা যাক” হেসে উত্তর দেন গৃহকর্তী।

আলোচনা চলতে থাকে, আলোচ্য বিষয় এগোতে থাকে একটু একটু করে, বেশী এগুতে চায় না; একই জায়গায় এসে আটকায়। বেয়ারা পুনঃ আসে দুই হাতে দুইটি থালা

নিয়ে। একটিতে বেগুনি ও-চপ, অপরটিতে অপৰ্য্যাপ্ত সন্দেশ।

“এক কাণ্ড করেছেন মিসেস পাঠক” একজন বলতেই গৃহকর্তী উঠে যান পরিবেশন করতে এবং পরিপাট্যরূপে করে যান পরিবেশন। ঘরের এক কোণে টেবিলের সামনে বসে-নোট করে যাচ্ছেন আলোচ্য বিষয় মাতারী বয়সের এক ভদ্র লোক।

গৃহকর্তী ইংগিতে বেয়ারাকে দেখিয়ে দেন তাঁকে। অভিজ্ঞ বেয়ারা প্লেটে করে দুটি বেগুনী তাঁর সামনে রেখে আনে। সন্দেশে হাত দিতেই কটাক্ষে গৃহকর্তী বুঝিয়ে দেন তাঁকে, বুঝিমান বেয়ারা বুঝে নেয় সব কিছু, সব নিয়ে সে সরে পড়ে আসির হতে।

সম্মুখের প্লেটের জিনিষগুলি দেখে ভদ্রলোক ভেবে পান না কি করতে হবে এ নিয়ে। একবার ইচ্ছে হয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জানিয়ে দেন, এ প্রকার অপমান করার অধিকার তাঁদের নেই। কিন্তু সে যে একজন সামান্য কেরানী, যে বাড়ীতে সে রয়েছে সেই যে তার মনিব। রাগে যেমে ওঠেন ভদ্রলোক। সামনের থেকে সরিয়ে রাখেন প্লেটটি। এর গন্ধ পর্যন্তও তাঁর কাছে বিষের মত লাগে।

“ওকি খেয়ে নিন ওজুটা”, বলেন গৃহকর্তী।

“না, শরীরটা ভাল নয়।”

“তবে এক পেয়লা চা?”

“না, চা খাইনে।”

আলোচনা চলতে থাকে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি, ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—“শরীরটা ভাল না—আমি যেতে পারি কি?”

“বৃষ্টি যে খুব—”

“তা হোক, যেতে পারব।”

অবিশ্রান্ত জল মাথায়ে করেই বেরিয়ে পড়েন ভদ্র লোক, তাঁর মনের ভিতর জ্বলছে এক অব্যক্ত ক্ষোভ বা কাউকে বলার নয়। রাস্তাঘরে চলতে থাকেন, কোথাও থামা বা ট্রামে উঠার

প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেন আজ। ঘটনা এমন কিছু নয়, হয়ত দারোয়ান কর্কশ স্বরে তাড়িয়ে দিচ্ছে তাকে, জল থামার সর্বত্রই ষটে থাকে। বিফল মনে সাপ্তাহিক পাবার চেষ্টা করেন এ ভেবে—ওরা বড়লোক, অ্যারিস্টোক্র্যাট, আর সে দরিদ্র, মন হতে। উচ্চারণ করে Wordsworth এর একটা গদ্যেই অনুকম্পার পাত্র। অতঃপর দুর্বল মন হলে চলবে কেন? চলতে চলতে সে দেখতে পায়, এক গাড়ী বারান্দায় নিরাশ্রয় এক হতভাগ্য রাত্রির শোবার যন্ত্রণা করে নিচ্ছে, করে রেখেছে।

বিদেশিনী

শ্রীমন্দিরী চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন ধনী বিধবার সংকার্ষ্যে বিপুল দান

নিগ্রো প্রতিষ্ঠানের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে, আলাবামা প্রদেশে নিগ্রোদের একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান, “টাঙ্কেজি নর্থ্যাল অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট” সম্প্রতি ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারের মালিক হইয়াছে।

বিখ্যাত নিগ্রো নেতা ও শিক্ষাব্রতী বুকার টি, ওয়াশিংটন ১৮৮১ সনে এই ‘টাঙ্কেজি-প্রতিষ্ঠান’ স্থাপন করেন।

মিসেস মেরি ষ্টীলম্যান হার্কনেস নামে এক ধনী মার্কিন মহিলা বিভিন্ন জনহিতকর এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬ কোটি ডলারের উপরে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বামী, এডওয়ার্ড হার্কনেস একজন প্রখ্যাত ধনী এবং মানব-প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। গত ৬ই জুন (১৯৫০) মিসেস হার্কনেস পরলোক গমন করিয়াছেন এবং তাঁহার উইলের প্রোবেটর জজ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে।

এই উইলের সর্ভাঙ্গায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ নিগ্রো প্রতিষ্ঠানকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার দেওয়া হইবে।

মার্কিন মহিলা বৈজ্ঞানিকের পুরস্কার লাভ
পুরস্কারলব্ধ অর্থ গবেষণার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয়
করিবেন।

মস্তিষ্ক ও শ্বাসসম্পর্কিত শরীর দ্বিচার প্রখ্যাত গবেষিকা,
ডাঃ এলিজাবেথ ক্রসবি তাঁহার উৎকৃষ্ট গবেষণা কার্যের

নিমিত্ত পুরস্কৃত হইয়াছেন। ‘মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা সংসদ’ ১৯৫০ সালের জুন এই পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে ডাঃ ক্রসবিকে নির্বাচিত করিয়াছেন; বার্ষিক ২ হাজার ৫০০ ডলার তাঁহাকে দেওয়া হইবে। ডাঃ ক্রসবি বলিয়াছেন, এই পুরস্কারের টাকা দিয়া তিনি তাঁহার গবেষণা চালাইবার জন্য কতকগুলি দামী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনিবেন।

মানুষের পরমাণু ১২০ বছর হইবেই

ডাঃ গার্ডনারের গবেষণার সাফল্য

এখন যাদের বয়স পঞ্চাশ, আর দশ বছর পরে তাঁদের বয়স হবে ষাট এবং আরও ষাট বছরের পরমাণু তাঁরা ভোগ করে যেতে পারবেন—যদি তাঁদের মনের বাসনা হয় ১২০ বছর বাঁচতে।

মানুষের পক্ষে ১২০ বছর বাঁচাটা এমন কিছুই নয়—আগামী দশ বছরের মধ্যেই ডাঃ টমাস গার্ডনার এটা প্রমাণ করে দিতে পারবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

ডাঃ গার্ডনার একজন বিশিষ্ট মার্কিন বৈজ্ঞানিক (রাসায়নিক)। দৈনিক জরাজীর্ণ ক্রিয়ায় জয় করা যায়—এই নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন।

মানুষের হৃদপিণ্ড, পেশী, রক্তকণাবাহী কোষ এবং দেহ-মধ্যস্থ অপরাপর অংশে ‘কোলেস্টেরোল’ নামক একটি পদার্থ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমা হতে থাকে। বারুকোর জমা

যাদের মৃত্যুর মূখ্য কারণ, সেই বয়োবৃদ্ধদের হৃদপিণ্ড ও রক্ত-বাহী কোষগুলির নিষ্ক্রিয়তাই প্রধানতঃ থাকে তার মূলে। এবং এই নিষ্ক্রিয়তার অন্ততম হেতু হচ্ছে ঐ কোলেস্টেরোল নামক পদার্থটির সঞ্চয়। ডাঃ গার্ডনার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, এই নষ্টের গোড়া কোলেস্টেরোল পদার্থটিকে শরীরের মধ্যে জমতে না দেওয়ার উপায় আছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষের শরীরে কতটা প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে—তিনি এখন তার পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

আমেরিকায় বধির ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোকেশনাল রিহাবিলিটেশন অফিসের (Vocational Rehabilitation Office) মারফত গত বৎসরে ৫ সহস্রাধিক বধির ও স্বল্পশ্রবণ শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার সাহায্য করা হইয়াছে। পূর্বে উপযুক্ত কর্মের অভাবে তাহাদের অধিকাংশ আত্মীয় স্বজনদের উপর নির্ভরশীল ছিল। উক্ত অফিসের ডিরেক্টর মাইকেল জে, সর্টলে জানাইয়াছেন যে ৬ বৎসর পূর্বে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। উহার পর হইতে উক্ত পরিবর্তন অল্পসামান্যে ২২,৬৬৮ ব্যক্তিকে কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া হয়। উহার ফলে শুধু মাত্র ঐ সকল ব্যক্তির পরিবারই উপকৃত হয় নাই পরন্তু সমগ্র সমাজ উপকৃত হইয়াছে।

যাহারা কোনরূপ শারীরিক বৈকল্য বশতঃ জীবিকার্জনে সক্ষম হয় না মাইকেল সর্টলের বিভাগ কর্মসংস্থানে তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে। নানাভাবে এই সাহায্য করা হয়, কখনও কখনও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং কখনও বিদ্যালয় ও শিল্প কারখানায় তাহাদের চাকুরীর উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। উহা ছাড়া পরামর্শ দিয়া বা চাকরী জোগাড় করিয়া দিয়াও সাহায্য করা হয়।

বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যদি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ হয় তবে সরকারী ব্যয়ে তাহার চিকিৎসা বা প্রয়োজন হইলে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হয়।

আমেরিকার অধিকাংশ বড় বড় শহরে এখন বিকলাঙ্গ

ব্যক্তিদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র বিদ্যমান। ভোকেশনাল রিহাবিলিটেশন অফিসের সহযোগিতায় ষ্টেট সরকার উক্ত কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করেন। বধিরদের জন্য ঐরূপ প্রায় ১৩টি কেন্দ্র আছে। ঐ সকল কেন্দ্রে বধির ব্যক্তিগণের নানাপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনমত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের ব্যবস্থাও করা হয়।

নিগ্রো মহিলা কবির পুলিটজার পুরস্কার লাভ

গোয়েণ্ডোলিন ব্রুক্স নামে শিকাগোর ৩৩ বৎসর বয়স্কা জনৈক নিগ্রোমহিলা-কবি কবিতা রচনার জন্য ১৯৫০ সালের পুলিটজার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরলোকগত মার্কিন সাংবাদিক জোসেফ পুলিটজার ১৯১৭ সালে উক্ত পুরস্কার প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। সঙ্গীত, সাংবাদিকতা, ফটোগ্রাফি কবিতা উপন্যাস, নাটক ও ইতিহাস রচনা করা, চিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য প্রতি বৎসর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্কুল অব জাণালিজম হইতে উক্ত পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা সমিতি কাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করেন।

‘এনি এ্যাগেন’ নামক কবিতাগুলি রচনার জন্য মিস ব্রুক্স উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উহাতে ছুঁহিতা, বধু ও মাতারূপে একটি নিগ্রো মহিলার কাহিনী রচনা করা হয়। কবিতাগুলি প্রকাশের পর সাহিত্যিক মহলে বিশেষ চাকল্যের সৃষ্টি হয় এবং উহা সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

পুলিটজার পুরস্কার লাভের পূর্বে মিস ব্রুক্স দুইবার গুগেনহাইম বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯৪৫ সালে ‘ম্যাদমোয়াজেল’ নামক বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা তাহাকে ঐ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ১০ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে অন্ততম বলিয়া উল্লেখ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মিস ব্রুক্সের নাম মিসেস হেনরী এল, ব্র্যাক্সলে। তাহার তিন বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র বিদ্যমান।

স্কুলে সস্তায় পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো

মার্কিন রাষ্ট্রের ৮০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য ব্যবস্থা

ছাত্রদের সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা

মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল যাবৎ করা হয়েছে। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ শক্তি, সুতরাং শিশু বয়স থেকেই তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও কল্যাণকর ব্যবস্থার দিকে-রাষ্ট্রের মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। মার্কিং রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস তাই ১৯৪৬ সালে ছাত্রদের ছপূর বেলাকার খাবার সস্তায় সমস্ত স্কুলে সরবরাহের জন্ত এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পুষ্টিকর খাদ্য এবং টাটকা সজ্জি, ফলফুলারি ইত্যাদি খুব সস্তায় ছাত্রদের দেওয়া হয়। গরীব ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে এর জন্মে দাম নেওয়া হয় না।

মার্কিং কৃষিদপ্তর থেকে সরকারী কৃষি শালায় উৎপন্ন নানারকম পুষ্টিকর শাকসজ্জি ফলফুলারি ইত্যাদি সরবরাহ

করা হয় বিনা মূল্যেই। পণীর এবং বাদাম তেলের মাখন (এতে প্রোটিন আছে), কমলালেবুর ঘন রস, কোটায় রাখা টম্যাটু (ভিটামিন সি আছে) এবং পীচফল (ভিটামিন এ) তাছাড়া অন্যান্য তাজাও শুকনো ফল, সজ্জি মধু ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রাদেশিক দপ্তরকে এই জন্ত অর্থ সাহায্য করা হয়। প্রাদেশিক সরকার সেই এলাকার যে সমস্ত বেসরকারী স্কুল থেকে কোনও রকম অর্থ লাভ করা হয় না, সেই সব বেসরকারী স্কুলেই এই রকম খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। এ পর্যন্ত ৫২ হাজার ৮০০টি বিদ্যালয় এই পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছে।

মহিলা সমাচার

ত্রিজেয়াতিষ চল্ল ঘোষ

লেডী ব্রোবোর্গ কলেজের নতুন অধ্যক্ষা

লেডী ব্রোবোর্গ কলেজটি কলিকাতা মহানগরীর অন্ততম সরকারী মহিলা কলেজ। ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী এম্ এ, পি,এচ,ডি, এই কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হইয়াছেন, প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুনীতিবালা গুপ্ত মহোদয়ার অবসর গ্রহণের পর। রমা দেবী দর্শন ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট উপাধিধারিণী। তাঁহার শিক্ষকতার গুণে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে উপযোগী ছাত্রীর শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র গঠন হইবে আশা করা যায়। নিজ দেশকে না চিনিলে, নিজের জাতির প্রতি মমতা না জন্মাইলে বীর প্রসবিনী মাতা হওয়া যায় না।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের ফল

১৯৫০ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশ হইলেও, পরীক্ষায় কোন প্রকার নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ হয় নাই, পূর্বে হইতে নম্বর জানিবার জন্ত ছুটাছুটি কাহাকেও করিতে হয় নাই। অযোগ্য ছাত্র ছাত্রীর পাশের কোন সুপারিশ জন্ত ব্যস্ত হইতে হয় নাই। এই রীতি অনুসরণ করিলে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ও মেধার গৌরব বাড়িবে ও পরীক্ষায় পবিত্রতাও রক্ষা পাইবে।

বর্তমান বৎসরে মোট ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৮,৩৩৫; উত্তীর্ণ হইয়াছে ১২,৯৩৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৪.৩ জন। কিন্তু নিয়মিত স্কুলে পড়া পরীক্ষার্থী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২,৩৫৬, তাহার মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে ১,২৫৯ অর্থাৎ শতকরা ৫৩.৪ জন। ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় বটে। কিন্তু প্রাইভেট ছাত্রীদের পাশের সংখ্যা অতি কম হইয়াছে। প্রাইভেটে ৩,০৯১ ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৫৩৩ জন পাশ হইয়াছেন অর্থাৎ শতকরা ১৭.২ জন। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গাল্যাগী ছাত্রী সংখ্যা থাকায় কম হইতে পারে। তবে আমাদের মনে হয় মেয়েদের স্কুলে পড়িয়া পরীক্ষা দিবার উৎসাহ দেওয়াই ভাল। ইহাতে মনস্তাপ, সময় ও শক্তির অপচয় ও অভিভাবকদের অর্থ নষ্ট হয় না। আর মেয়েরা যে ছেলেদের অপেক্ষা পড়াশুনায় মন দেন এ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভারতী সেনগুপ্ত জলপাইগুড়ি গাল স্কুলের ছাত্রী, দশম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ৬৫ জন ছাত্রী শতকরা ৭৫ নম্বর পাইয়া ষ্টার পাইয়াছেন।

পরলোকে জেনারেল ইভা বুথ

মুক্তি ফৌজের (স্মলভেশন আর্মির) প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল বুথের কন্যা কুমারী জেনারেল ইভা বুথ মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়িকা ছিলেন। জুলাই মাসে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু আমেরিকায় হইয়াছে, তথায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তি ফৌজ নব প্রথায় গঠনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কত শত সহস্র নর-নারীকে রোগ, শোক, দারিদ্র্য, বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গত দুইটি যুদ্ধের রণ হকার উদ্ভাদনার মধ্যে নির্ভীক চিত্তে পরম ধৈর্য্যে সহিত বিশ্বজনের মুক্তির জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার তিরোধানের একজন বিশ্ব কল্যাণকামীর অভাব হইল। তিনি ও তাঁহার পিতা ইংরাজ জাতির পরম গৌরব। আমরা এই উদারমনা মহিলার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, স্বাধীন ভারতে যেন এইরূপ পরহিতব্রতা শত শত মহিলার আবির্ভাব হয়।

লালমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি বঙ্গ রমণী

বর্তমান বর্ষে লালমোহন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীমতী রেণুকা সেন এম. এ. পরীক্ষায় ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে সর্ব প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এখনও অনেক ছাত্র ও ছাত্রী মেধার পরিচয় দিয়া থাকেন।

তিব্বত সীমান্তে বঙ্গ মহিলা

শ্রীমতী কমলা লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। তিনি সম্প্রতি হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ে উঠিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কালিমপং হইয়া সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক যান। গ্যাংটক ৫৬০০ ফীট উচ্চ পাহাড়ের উপর। চারিদিক পাহাড় ঘেরা মনোরম ক্ষুদ্র নগর।

সিকিম হইতে তিব্বত যাইবার দুইটি মাত্র পথ আছে। তাহার মধ্যে একটি পথ “নাথু লা” অর্থাৎ “নাথু গিরিবর্ত্ত”—গ্যাংটক হইতে ২৮ মাইল দূরে ৫৪০০’ হইতে ১৪,৫০০’ ফীট চড়িয়া যাইতে হয়। পথি মধ্যে একটি “ছাঙ্গু হ্রদ” নামে ১ মাইল দীর্ঘ ও এক ফাং

প্রস্থ স্বচ্ছসলিল জলাশয় বর্তমান। এই স্থানটি ঠিক যেন নন্দন কানন—অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। ইহার শোভা লেখায় বর্ণনা করা যায় না।

এই “ছাঙ্গু হ্রদ” হইতে ৭২ মাইল পাহাড় চড়িলেই “নাথু-লা”—“পাশ”। এখানে পাহাড়ের গায়ে গাছ নাই, কেবল সবুজ বর্ণের শেওলা মণ্ডিত। পাহাড়ে বত চড়া যায় গাছের বৃদ্ধি তত কমিয়া যাইতেছে দেখা যায়।

“নাথু-লা”—গিরিবর্ত্ত হইতে তিব্বত ও লাসা নগরী অতি সুন্দর দেখা যায়, ঠিক যেন রবিকরোজ্জ্বল শোভিত সোনার অলকাপুরী। চক্ষু ফিরান যায় না। এ অভিজ্ঞতা বঙ্গ মহিলা কমলা লাহিড়ী মহোদয়া অর্জন করিয়া আসিয়াছেন। লেখকেরও এই স্থানে যাইবার সৌভাগ্য গত বৎসর হইয়াছিল। তবে একজন বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে এইরূপ দুরূহ অভিযান প্রশংসনীয়।

ব্রাহ্ম সমাজের মহিলা ভবন

কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বাবধানে উদ্বাস্ত নারীদের পুনর্বাসতি ও পশ্চিমবঙ্গ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি মহিলা ভবন স্থাপিত হইয়াছে।

প্রেসের কাজ, আচার, জ্যাম জেলী আদি নানাবিধ উপজ্ঞানীয় শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দ্রুত জীবিকা অর্জনের নানা পথ এই ভবন অবলম্বন করিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ ইহার গোড়ায় পত্তন হইতেই নারীর মুক্তি, নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীমতী লীলা মিত্র ও ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র এই ভবনের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা সুরেন্দ্রা কৃপালিনী, রেণুকা রায়, লাবণ্যলতা চন্দ, নিবারণিনী সরকার মহোদয়ারা ভবন পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীনিকেতনে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

কুমারী উষা মুখার্জি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তি পাইয়া বিশ্বভারতীয় শ্রীনিকেতনে, পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য আগমন করেন এবং কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া শিক্ষালাভ করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রামেও গিয়া সেখানে পল্লী উন্নয়নের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন।

স্বাধীন ভারতে নার্সের স্থান

সকল স্বাধীন দেশের গ্রায় স্বাধীন ভারতে রোগীর সেবিকাদের মান ও স্থান অতি উচ্চে; এই কথা ভারত সরকারের স্বাধীনতা দিবস পালনের বার্ষিক সমালোচনার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবাদ ও প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে :—

নার্সের কাজ যেমন মানবের হিতে প্রয়োজনীয়, তেমনই নারীর সম্মানে উপার্জনের এক প্রধান পথ। এই সেবা কার্যের জন্ত যদিও আকর্ষণ বেশী নাই, তথাপি ঝাঁহারা এই সেবা ধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা এক একটি রোগীর ক্লেশ দূর করিয়া বহু শুভ ইচ্ছা আশীর্বাদ, শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়া থাকেন। ইহা যে কোন শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারীর এক মহান গৌরবের কার্য। জাতির শক্তি বৃদ্ধিতে এবং স্বাস্থ্য উন্নতিতে নার্সের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সকল দেশেই ইহার অভাব, ভারতের অভাব অত্যন্ত বেশী।

নার্সের কার্যের অত্যধিক শ্রম ও সামাজিক নানা বাধা কোমলপ্রাণা অনেক নারীকে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য হইতে বিরত করিয়া রাখে। তথাপি ভারত সরকার বলেন নার্সিং পেশা আজকাল সম্মানিত, বিশ্ব কল্যাণকারী, রোগজগারের ভাল পথ এবং শিক্ষিত নার্সের কখনও বেকার থাকিতে হয় না।

রোগী সেবার জন্ত একটি নার্সের তিন বৎসর শিক্ষা যথেষ্ট, আজ কেবল রোগীর সেবার জন্তই নার্সের প্রয়োজন নহে, জাতির শিশু পালন, জাতির নর-নারীর স্বাস্থ্য, রক্ষণে নার্সের প্রয়োজন। নার্সের জীবনেও অনেক উন্নতির পথ খোলা আছে—ধাত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শিকা, নার্সিং হোম স্থাপন আদি লাভবান কর্মপথ উন্মুক্ত। হাসপাতালগুলির জনপ্রিয়তা ও উপকারিতা নার্সের দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

ভারতে নার্সিং শিক্ষা দিবার ১৫০ প্রতিষ্ঠান ও ধাত্রী বিত্তা শিক্ষা দিবারও ১৫০ বিদ্যালয় আছে। প্রতি বৎসর

তৈরী হন এক হাজার নার্স ও ১২০০ ধাত্রী। কিন্তু বিবাহ হইবার জন্ত এবং কষ্ট অসহিষ্ণুতার জন্ত অনেকে এই পেশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তথাপি সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যদিও চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য।

১৯০৬ সালে ভারত সরকারের অধীনে দিল্লীতে একটি এবং ভেলোরে ক্রীষ্টিয়ান মেডিক্যাল কলেজে একটি নার্সিংএর উচ্চ বিদ্যা শিখাইবার কলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই কলেজে নার্সিং শিক্ষা ব্যতীত সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। কলেজ হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বি এস সি (নার্সিং) ডিগ্রী পায়। কলিকাতার মতন মহানগরীতে একটি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা অতি প্রয়োজন।

নার্সের অভাব পূরণের জন্ত চেষ্টা সকল রাষ্ট্রের কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তার জন্ত অতিশয় চেষ্টা চলিতেছে। ডেনমার্ক ৪০ লক্ষ লোকের জন্ত ১৮ হাজার নার্স আছে। গ্রেট ব্রিটেনে ৪ কোটি লোকের জন্ত ১৩০ হাজার নার্স আছে। আর ভারতে ত্রিশ কোটি লোকের জন্ত মাত্র ৭৮ হাজার নার্স আছে।

নার্সের কাজে অল্পরাগিনী হইবার জন্ত জনমত, সমাজে উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতে হওয়া উচিত। ভারত সরকার নার্সদের শিক্ষার জন্ত স্বল্পকাল স্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র পরিকল্পনা করিয়াছেন। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে নানা স্বচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান নার্স তৈয়ারী করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। আর চিকিৎসকদের প্রধান কর্তব্য নার্সদের উৎসাহ দেওয়া। কথায় বলে “Prevention is better than cure” অর্থাৎ ব্যাধি হইলে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করা অপেক্ষা ব্যাধি যাহাতে শরীরে প্রবেশ না করিতে পারে এমন প্রতিসেধকের ব্যবস্থাই উত্তম।

স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের নারীদের মধ্যে এই গণচেতনা উদ্ভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীমুখাকান্ত দে

উদ্বাস্ত সমস্যা

ভারতীয় পার্লামেন্টে বাংলা দেশের উদ্বাস্ত-সমস্যার আলোচনা শেষ হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর প্রাথমিক বক্তৃতা, শেষ প্রত্যুত্তর, ডক্টর আমাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও অধ্যাক্ষের সমালোচনা, গবর্ণমেন্ট পক্ষীয়দের চুক্তি সমর্থন প্রভৃতি, দেশবাসী সমস্তই শুনিলেন ও বুঝিতে পারিলেন। বক্তৃতা হিসাবে এই সকল বক্তৃতার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার প্রযুক্তি আমাদের নাই। আমরা শুধু ভাবিতেছি, ফল কি হইল? যাদের কথা লইয়া আলোচনা তাদের কতটুকু উপকার হইল, বা তারা কতটা সাফল্য পাইল। এই সম্পর্কে ছেলেবেলায় পঠিত 'আফটার ব্রেনহাইম' (ব্রেনহাইম যুদ্ধের পর) নামক কবিতাটি আমাদের মনে পড়িয়া যাইতেছে। নাতনী ও দাদামশায়ের কথাবাতা হইতেছে—এরা গ্রামের লোক। দাদামশায় যতবার সগৌরবে যুদ্ধের গৌরবের কথা, ইংরেজের শৌর্য বীর্যের কথা বর্ণনা করিতেছে, ততবার নাতনী সব শুনিয়া প্রশ্ন করিতেছে, তা ত হল, দাদা মহাশয়, কিন্তু তাতে ফলটা কি হইল? ততবার দাদা মহাশয়কে বলিতে হইতেছে, তা ত জানি না দিদি।

গোড়াতেই একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। সেটি হইতেছে, উদ্বাস্ত-সমস্যার গুরুত্ব। কেহ কেহ অবশ্য সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এমন এক সমস্যা যার স্বসমাধান না হইলে সমগ্র রাষ্ট্র বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। ইংরেজ কিংবা আমেরিকান রাষ্ট্রনীতিবিদ মাঝেই তাঁদের নিজ নিজ দেশে বেকার সমস্যা একটু বাড়িলেই অস্থির হইয়া যান। লর্ড কেইনসের মত বড় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ তাঁর প্রসিদ্ধ এক গ্রন্থে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। আরও অনেক বড় রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ধুরন্ধর বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আমরা বলি, উদ্বাস্ত-সমস্যা তদপেক্ষাও গুরুতর জিনিষ, এবং যারা

ইহাকে লঘুভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁরা ভুল করিবেন। গবর্ণমেন্টের যারা মস্তিষ্ক, তাঁদের ইহা না বুঝিবার কথা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত লোক বিনিময়ের পর কোটি কোটি টাকা ভারত সরকার খরচ করেন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তদের কথা বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি ভারত সরকার তাঁদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি খাতে ব্যয় সঙ্কোচের আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। উদ্বাস্ত বলিতে অনেকের মধ্যে নাসিকা কুণ্ডনের যে ভাব আছে, তা দূর করিতে হইবে। গত দুই মহাযুদ্ধে ইয়োরোপের লক্ষ লক্ষ লোক আশ্রয় ও কর্মচ্যুত হইয়াছিল, যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন কার্যবলীর ফলে। ইংরেজ সরকার প্রাণপণ চেষ্টায় কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া ইহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশ ইহা তাদের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। আমাদেরও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি পরিবারকে সুবিশ্রান্ত করিবার ভার ভারত সরকারের উপর পড়িয়াছে। তাঁরা বলিতে পারেন, আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, টাকা খরচ করিয়া, লোক নিয়োগ করিয়া, আমরা আর কি করিতে পারি?

করিবার অনেক কিছু আছে। পূর্বতন সাহায্য ও পুনর্বাসতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহন লাল সাকসেনা ভারতীয় মন্ত্রী সমিতি হইতে পদত্যাগ কালে বলিয়াছেন যে, তিনি এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই বলিয়া কাজ ছাড়িয়া দিতেছেন। সমস্যার সমাধান বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন, জানি না। কিন্তু তাঁর বিভাগ সম্বন্ধে বদনাম আছে যে, সরকার যাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও পরে করিবেন, তাদের জন্য তার অতি অল্প অংশই ব্যয় হইতেছে, বাকিটা অর্থাৎ বৃহৎ অংশ চুরি বা অপব্যয় হইতেছে। এই বদনাম অগ্রাণু বিভাগ সম্বন্ধেও আছে বটে, কিন্তু খাদ্য, বা পুনর্বাসতির মত যে সকল বিভাগ মানুষের প্রাণ লইয়া কারবার করিতেছে, সেখানে তা লইয়

খেলিবার ও লক্ষ জীবন নষ্ট করিবার অধিকার কাহারও নাই; পুনর্বসতি বিভাগ আগাগোড়া সং ও কর্মদক্ষ কর্মচারী লইয়া গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার অবহিত হইলে সকল অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দূর হইবে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

যে সকল উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক হইতে তারা অতি নিম্নস্তরে গিয়া উপনীত হইয়াছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমত, ইচ্ছামত চাকুরীদের পূর্ব বা পশ্চিম বঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া, পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানেরা এবং পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা পূর্ব ও পশ্চিম-দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। সে দৃষ্ট আমাদেব বেষ মনে পড়ে। শুধু কংগ্রেসকে দোষ দিয়া লাভ নাই। কংগ্রেসের সহিত মোক্লেম লীগের যে চুক্তি হইয়াছিল, তদনুসারে একরূপ চাকরী পরিবর্তনের অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক ছিল না, ইচ্ছামূলক ছিল। আশ্চর্য এই, পূর্ব বঙ্গে না থাকিবার ইচ্ছাটাই হিন্দু চাকুরীদের প্রায় সকলের হইল, যদিও থাকাটাই বেশী দরকার ছিল, এবং তার ফলে সাধারণ লোকের মনে যে স্বাভাবিক ত্রাস দেখা দিল, তা লইয়া নেতারা আপশোষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নেতারা জনসাধারণকে ভরসা দিবার জন্ত ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গেলেনই না, উপরন্তু যারা পদস্থ, যাদের টাকা পয়সা আছে তাঁরা ধীরে ধীরে হয় সম্পত্তি বেচিয়া নয়ত ভাড়া দিয়া টাকা হইয়া সবিয়া পড়িলেন। ফলে যারা পড়িয়া রহিলেন, তাঁরা উত্তরোত্তর অসহায় ও দুর্বল হইতে লাগিলেন। আমরা ঢাকার কথা ও কতকটা বরিশালের কথা কিছু পরিমাণে জানি। ঢাকার রমনা অঞ্চলে পুরানা পল্টন, রামকৃষ্ণপুর, শান্তিনগর ও অত্রাণ্ড পাড়া হিন্দুবহুল ছিল; আজ সেই সকল স্থানে একটিও হিন্দু দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। ১০ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই ঢাকা বরিশালের বহু পাড়ায় অল্প মাত্র হিন্দু বাস করিতেছিল। স্মরণ্যঃ দুর্ভোগ যখন দেখা দিল ১০ই ফেব্রুয়ারীতে, তখন মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে পূর্ব বঙ্গের

হিন্দু অধিবাসীরা অধঃপতনের নিম্নতম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। এই স্পষ্ট কথায় বর্তমানে যারা উদ্বাস্তু তাঁদের মনে ক্রেশ হইতে পারে। কিন্তু সত্য কথা অস্বীকার করিয়া তাঁদের বা আমাদের লাভ নাই। আমরা চাই, তাঁরা আবার মনুষ্যস্বৈর স্প্রতিষ্ঠিত হন এবং সেজন্ত তাঁদের হইয়া অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁদের পূর্বকার অবস্থাটা ভাল করিয়া তাঁদের বিবেচনা করা দরকার।

উপর যা বলিলাম তা মনে রাখিলে, ১০ই ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী তারিখগুলিতে পূর্ববঙ্গবাসীদের ভীক ও অমাহুয়ের মত আচরণের অর্থ বুঝা যাইবে। পাঠকে যখন যুগপাঠে বলি দেওয়া হয়, তখনও সে খানিকটা আপত্তি করে, বাধা দেয়। কিন্তু ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থলে হিন্দুগণ যেন চুপশব্দ না করিয়া খুন হইবার জন্ত মাথা বাড়াইয়া দিয়াছিল। স্ত্রীলোকের রক্ষার নিমিত্ত প্রতিবাদ করে নাই, লড়াই করা ত দূরের কথা। দেশ-ব্যাপী এই কাপুরুষতার ও ক্লীবতার কথা যত ভাবি, তত হৃদয় আত্মদিকারে পূর্ণ হইয়া যায়। ভাবি, যারা স্বদেশী আন্দোলনে এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছেন, হাসিমুখে বিবিধ নিধাতন বরণ করিয়াছেন, তাদেরই কি আপনাদের জন এই সব উদ্বাস্তুরা। পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়া পরিচয় কি ইহারা দিতে পারে?

উদ্বাস্তুদিগের এই অধঃপতিত অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই গবর্ণমেন্টকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যদি এই লক্ষ লক্ষ লোককে সুবিজ্ঞস্ত না করিতে পারেন, সমাজ-দেহে, আমরা বলিতেছি, ভারতীয় সমাজ-দেহে গ্রহণ করিতে না পারেন, তা হইলে ইহারা একদিন মরীয়া হইয়া উঠিবে এবং যে রক্ত মনের আবেগ লইয়া এখানে আসিয়াছে, তা গবর্ণমেন্টের উপর ফাটিয়া পড়িবে এবং সমাজব্যবস্থাকে অচল করিয়া দিবে।

সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা আমরা প্রয়োজন মনে করি যে, পূর্ববঙ্গবাসীদের স্প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী প্রদেশগুলির চেহারা ফিরিয়া যাইবে। পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধগুণে ভূষিত

পূর্ববঙ্গবাসীর সহিত মিলন ভারতবাসী মাত্রেই কামনার জিনিষ হওয়া উচিত। 'বাঙ্গালদের' সহিত বসবাসের ফলে জীবনধারণের মাপকাঠি উচ্চ হইবে, এবং দেশ স্বফলা হইবে।

উদ্বাস্তর প্রকৃত সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আমাদের কাছে কথঞ্চিৎ বিস্তৃত করে। গবর্ণমেন্ট বলেন, আগন্তকের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। বেসরকারী মতে ৬০ লক্ষ। আমাদের ধারণা, শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক, পূর্ববঙ্গ হইতে ১ কোটির মত লোক চলিয়া আসিবে। এই হিসাব মনে রাখিয়া গবর্ণমেন্টকে স্বস্থূল ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পার্লামেন্টে উদ্বাস্ত আলোচনাকে আমরা অসার ও অলীক বলিয়া মনে করি। কারণ গবর্ণমেন্ট ও উহার সমর্থনকারীরা বলিতেছেন, চুক্তি সফল হইয়াছে। বেসরকারী সকলে বলিতেছেন, হয় নাই। এরূপ ভাবে সত্য নির্ণয় বা পথ নির্দেশ হয় না।

আসামে বাঙ্গালী

আসামের অহোম জাতীয় মহাসভার নেতা শ্রীঅধিকাগিরি রায়চৌধুরী আসাম হইতে বাংলা ভাষা উচ্ছেদ করিতে চান। তিনি ১৬ই জুলাই একটি "বিশেষ দিবস" অনুষ্ঠানের জন্ত আসামের জনসাধারণকে আহ্বান করেন। আসামের রাষ্ট্র-ভাষারূপে ও আসামে শিক্ষাদানের মাধ্যমরূপে অসমীয়া ভাষা গ্রহণের কথা এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু সে জন্ত বিশেষ দিবসের কি প্রয়োজন? বিবৃতিতে রায়চৌধুরী বলেন,—আসাম সরকারকে বাংলা ভাষার প্রভাব লোপ করিতে হইবে—শিক্ষা বিভাগে, সরকারী কাগজপত্রে, রেলওয়ে ও ডাকঘরের কার্ড ও সাইনবোর্ডে অসমীয়া ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। বাঙ্গালী বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করার জন্ত অনুরোধ করা হইবে। বাংলা হইতে অনুবাদ বন্ধ করিয়া হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী, রুশ, জাপানী অথবা অগ্র ভাষায় লিখিত পুস্তক অনুবাদের জন্ত গ্রন্থকারগণকে অনুরোধ করা হইবে। তিনি ভয় দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালী মহিলারা অতঃপর মেখলা না পরিলে আসামে তাঁহাদের স্থান হইবে না। ইত্যাদি।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৬ই জুলাই তারিখটা মোস্লেম লীগের ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিবসকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এবং মোস্লেম লীগের কার্যকলাপের সঙ্কে এই আন্দোলনের অনেক সাদৃশ্য আছে। বস্তুত, কংগ্রেস বিরোধিগণ, আসামের ভূতপূর্ব মোস্লেম এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মুসলমানগণ একযোগে ঐ দিবস পালনে উৎসাহ দেখাইয়াছিল। ইহারা এই মিথ্যা প্রচার

করিতেছে যে, আসামের বাঙ্গালীভাষী অধিবাসীরা, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীরা মিলিয়া এক "বৃহত্তর বঙ্গ" গঠনের ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং আসামকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে।

আসামের বরদলৈ গবর্ণমেন্ট "দিবস পালন"কে এই বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন যে উহা অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ এবং কোনপ্রকার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা উহার নাই। এক সময়ে আসাম পাকিস্তানের কুক্ষিগত হইতে যাইতেছিল, বাংলার চেটায় তাহা হইতে পারে নাই, সে কথা না হয় নাই বলিলাম। সে সময় আসামকে গ্রাস করিবার বিশেষ সুযোগ ঘটয়াছিল, তাও না হয় না বলিলাম। কিন্তু সমগ্র আসাম প্রদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে উহার লোক সংখ্যার ৬ অংশ অসমীয়া, ৬ অংশ পার্বত্য জাতি ও ৬ অংশ বাঙ্গালী। এরূপ বৃহৎ বাঙ্গালী উনজন (অসমীয়ারাও সমগ্র লোক সংখ্যার উনজন) ও তাদের ভাষাকে কোনক্রমেই অগ্রাহ্য করা যায় না। পার্বত্য জাতিরা অসমীয়া ভাষার পক্ষপাতী নহে। তাদের বরং হিন্দুর প্রতি পক্ষপাতী আছে। তারা আসাম দিবসে বিরুদ্ধ শ্লোগান তুলিয়া মিছিল পর্যন্ত বাহির করিয়াছিল। সুবুদ্ধি অসমীয়ারাও ১৬ তারিখের দিবসে যোগদান করে নাই।

আমরা শুধু ভাবিতেছি, ভারত সরকার ও আসাম সরকার কেমন করিয়া এই অন্তর্ঘাতী আন্দোলনকে সহ্য করেন। ভারতীয় কন্সটিটিউশন অনুসারে বাঙ্গালীদের গ্রাযা অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার কথা। জোর করিয়া বে-আইনি কাজ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এবং তার ফলও ভাল হয় না। ভারতকে নব রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার পক্ষে প্রাদেশিকতার মনোভাব শত্রুতুল্য কার্য করে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচন

বর্তমান কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী ৬ই ডিসেম্বর হইতে ১০ই ডিসেম্বর মধ্যে কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রায় ৩ই লক্ষ নাগরিক এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। ৩১শে ডিসেম্বর নূতন মেয়র নির্বাচিত হইবেন, আর জাহ্নসারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই নব গঠিত কর্পোরেশনের প্রথম সভা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কোড়িয়া যুদ্ধের রোজ নামচা

১লা জুলাই। তোকিও টেলিফোন সংবাদ দিতেছে যে, দক্ষিণ কোড়িয়া বাহিনীর প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্ত শায়েকজানে নূতন রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে মার্কিন দেশরক্ষা

দপ্তরের ঘোষণায় জানা যায়, উত্তর কোড়িয়ার সৈন্তেরা সিওলের ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত স্থান অধিকার করিয়াছে। উহাদের সৈন্ত কত, নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। গত কল্যা রাত্রিতে আমেরিকানরা হান নদীর ২৫ মাইল দক্ষিণে স্থানের প্রধান ঘাটিতে আগুন দিয়া আরও ১০ মাইল দক্ষিণে হটিয়া যায়। স্বদ্র প্রাচ্যের প্রধান ব্রিটিশ সেনাপতি এডমিরাল স্মার প্যাট্রিক ব্রিন্ড বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের ব্রিটিশ নৌবহর দ কোড়িয়াকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওয়াশিংটনের খবর— নৌবিভাগের এক মুখপত্র বলেন, যে, কোড়িয়া অবরোধ ও গোলাবর্ষণের জন্য ভারপ্রাপ্ত মার্কিন ৭ম নৌবহরের সহিত ব্রিটিশ রণতরী সমূহ ও একখানি অষ্ট্রেলীয় ডেপ্তয়ার যোগদান করিয়াছে। নৌ-বাহিনীর প্রধান জাহাজগুলি ফরমোজা এলাকা সমাবেশ করা হইয়াছে। সামুদ্রিকের ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব উপকূলস্থ একটি ক্ষুদ্র নৌ-ঘাট উ-কোড়িয়া বাহিনী দখল করিয়াছে।

বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি আইনের মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়াইবার জন্য বিলে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্বাক্ষর করেন। ইহাতে রিজার্ভ ও জাতীয় দলের সংখ্যা ২০ লক্ষ করিতে এবং জল, স্থল ও নৌবাহিনীকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ দিবার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হইয়াছে। মিত্রপক্ষকে অন্তর সরবরাহের জন্য মার্কিন সেনেটে ১২২৩ কোটি ডলার বরাদ্দের দাবীমূলক বিল মঞ্জুর করা হয়। দ-কোড়িয়া ও ফিলিপাইনের জন্য ১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার ধরা হয়। আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলির রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য এই বিলে ১০ কোটি ডলার মঞ্জুর করা হয়।

নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ, দ-কোড়িয়ার প্রতি ভারতের নৈতিক সমর্থন থাকিলেও, আক্রমণকারী উ-কোড়ীয়দিগকে বিতাড়নের জন্য ভারত দ-কোড়িয়াকে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিবে না। আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি থাকায় স্বস্তি পরিষদের সদস্য হিসাবে উহার প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করিয়াছে।

৭রা জুলাই। হংকং—উ-কোড়িয়ার রাজধানী পাই অংং হইতে প্রাপ্ত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া চীনা কমিউনিষ্ট নিউজ এজেন্সি সংবাদ দিয়াছেন, উ-কোড়িয়ায় ব্যাপক সৈন্ত সজ্জার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তোকিও—৭টি কমিউনিষ্ট জঙ্গী বিমান অদ্য পুরোগামী মার্কিন বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। উ-কোড়িয়ার সৈন্তবাহিনী ক্ষত ওসানের (সিওয়ানের ১২ মাইল দক্ষিণে) নিকটবর্তী হইতেছে। আরও দুইটি কমিউনিষ্ট বাহিনী অদ্য প্রাতে ইনচনের (সিওয়ানের ৩৫ মাইল দক্ষিণে)

অগ্রসর হইতেছে; দ-কোড়িয়া বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডন—উ-কোড়িয়ার ট্যাঙ্কগুলি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে।

৫ই জুলাই। তোকিও—জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেডকোয়ার্টার্স হইতে জানান হইয়াছে যে, অদ্য উ-কোড়িয়া বাহিনী সিওয়ান বাহের বিরুদ্ধে সম্মুখ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং অগ্রাগ্র সৈন্তেরা ইয়ংডংপো-ইনচন-সিওয়ান এই ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল পরিবেষ্টনের অভিযান চালাইয়াছে। বর্ষার ফলকের আকারে সম্মিষ্ট উ-কোড়িয়া ট্যাঙ্ক বাহিনী মার্কিন ঘাটির পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইয়াছে। আজ সকালে সিওয়ানের দক্ষিণ মার্কিন গোলন্দাজ বাহিনীর সহিত এই ট্যাঙ্ক বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। বহু ট্যাঙ্ক বহর পুরোভাগে রাখিয়া উত্তরাঞ্চলের পদাতিক বাহিনী মার্কিন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম অক্রমণের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অগ্রসর হয়। সিওয়ানের দক্ষিণে মার্কিন সৈন্তদের ঘাঁটি এবং আরও পশ্চাতে মার্কিন সেনাপতিদের ঘাঁটি এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উ-কোড়িয়ার ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী উপস্থিত হইয়াছে। পাই-অংং বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে কোড়িয়ার পশ্চিম উপকূলবর্তী প্রধান বন্দর ইনচমু (সিউল হইতে ২০ মাইল দূরে) গত কল্যা উ-কোড়িয়া বাহিনী অধিকার করিয়াছে।

সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মঃ গ্রোমিকো সাত হাজার শব্দ সম্বলিত এক বিবৃতি কোড়িয়া পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে উ-কোড়িয়ার আক্রমণকে সমর্থন করা হইয়াছে। যেহেতু রী গবর্ণমেন্ট অযোগ্য ও অত্যাচারী, সেই হেতুই কোড়িয়ার একীকরণ সমর্থনযোগ্য।

লণ্ডন—৪ঠা জুলায়ের খবর। অদ্য রাত্রিতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লণ্ডনস্থ আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উইনষ্টন চার্চিল এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কমিউনিষ্টরা যদি কোড়িয়ায় বিজয় লাভ করে, তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যজ্ঞাবী।

৮ই জুলাই। কোড়িয়া রণাঙ্গণ। উ-কোড়িয়া বাহিনী অদ্য চোনান দখল করিয়াছে এবং আমেরিকান সৈন্তগণকে তায়েজন অভিমুখে হটাইয়া দিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কোড়িয়া সংগ্রামে জেনারেল ডাগলাস ম্যাক-আর্থারকে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের কম্যাণ্ডার মনোনীত করিয়াছেন। জাতি প্রতিষ্ঠানের পতাকা ব্যবহারের আদেশও দিয়াছেন। উত্তর কোড়িয়ার সাজোয়া ও পদাতিক বাহিনী আমেরিকান সৈন্তদের ৩০ মাইল হটাইয়াছে।

ভাবে মনে হয় তারা পুসাল বন্দর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে।

লণ্ডন (১ই জুলায়ের খবর)। উত্তর কোড়িয়ার রাজধানী, পাই-অংগ হইতে প্রচারিত বেতার ঘোষণায় বলা হইয়াছে কাংগুন প্রদেশের উপকূল সন্নিকটে ৪ ঘণ্টাব্যাপী নৌযুদ্ধে উ-কোড়িয়া নৌবহরের জাহাজ সমূহ একটি মার্কিন জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

২ই জুলাই। তোকিও—কমিউনিষ্ট বাহিনীর পুরোগামী সৈন্যদল বর্ষা ফলের আকারে চোনানের ৭০ মাইল ও তায়েজনের ২৫ মাইল উত্তর দিকবর্তী চোলুই সহরে প্রবেশ করিয়াছে। এক পক্ষ কাল পূর্বে উ-কোড়িয়া বাহিনী যে স্থানে সীমান্ত অতিক্রম করে, অন্য রাক্রিতে মার্কিন বাহিনী সেই স্থান হইতে শতাধিক মাইল দক্ষিণে সংগ্রাম করিতেছে।

বিমান হইতে উ-কোড়িয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচার পত্র বিলি করা হইতেছে।

১০ই জুলাই। তোকিও—কমিউনিষ্ট বাহিনী বর্তমানে তায়েজনের ২০ মাইল উত্তরে চোচাই-ওয়ানে পৌছিয়াছে। চোনানের দক্ষিণে কমিউনিষ্ট বাহিনীর আক্রমণে আর এক ব্যাটালিয়ান মার্কিন সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে (ম্যাক-আর্থারের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষিত)। সুদূর প্রাচ্যের মার্কিন বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ জর্জ ট্র্যাটমেরার কোড়িয়ার সামরিক লক্ষ্য বস্তু সমূহের উপর অহোরাত্র বিমান আক্রমণ চালাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। উ-কোড়িয়ান কন্ডময় সমূহ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন চোনান ও উ-কোড়িয়ার অস্থায়ী রাজধানী তায়েজনের মধ্যবর্তী প্রধান সড়ক ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। উ-কোড়িয়ার ৪ ডিভিসন সৈন্য নিযুক্ত আছে। তায়েজনের ৫০ মাইল উত্তর পূর্বে ওন্জু হইতে চুংডু পর্যন্ত প্রসারিত করিডরে আরও ২ ডিভিসন আছে। ৩৮° অক্ষরেখার ৫০ মাইল দক্ষিণে ওন্জুতে ও পূর্ব উপকূলের ওসান ও সাওনের সেতুগুলি মার্কিন জঙ্গী বিমান দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে। হান নদীর উপর অবশিষ্ট সেতুটিও ধ্বংস হয়। মার্কিন স্থপার ফোর্ট্রেস হইতে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ হইতেছে।

১১ই জুলাই। তোকিও—প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধের পর উ-কোড়িয়ার যুদ্ধমান মার্কিন বাহিনী কুম নদী তীরে অটল রক্ষাবাহে হটিয়া আসিয়াছে। ১০ খানি মার্কিন ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও ২ খানি অকেজো হইয়া গিয়াছে (৩৫০ শিফটন)। কুম নদীর দক্ষিণ তীরে মার্কিন সৈন্য-দিগকে সরাইয়া আনার কাজ শেষ হইয়াছে এবং “অবস্থা স্বস্থল” করিয়া আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে। (ম্যাক আর্থার)। সারাদিন অবিরাম চাপ পড়ায় অর্থাৎ

তায়েজনগামী প্রধান সড়কের উপর দিয়া বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও সৈন্যসহ কমিউনিষ্ট বাহিনীর সর্বাঙ্গিক আক্রমণের ফলে রণশ্রান্ত মার্কিন সৈন্যগণ অন্য পুনরায় পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। তায়েজনের ৫০ মাইল উত্তর পূর্বে চিনচোন উমসেন ও চুংজং পর্যন্ত রণক্ষেত্রে রেল পথ দখলে কৃত-সংকল্প উ-কোড়িয়া বাহিনী কমিউনিষ্টদের ২য় ও ১৫শ ডিভিসনের ক্রমাগত চাপে উপহাইয়া পড়িতেছে। কমিউনিষ্টরা গত ৪ দিন যাবৎ ৩৭° ডিগ্রি অক্ষরেখার ঠিক দক্ষিণ দিক দিয়া পাইয়ং-তায়েক হইতে উমসং পর্যন্ত ঘাঁটি গড়িয়া তুলিতেছিল। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কুম নদী রক্ষা বাহ ভেদ করার জন্ত তারা উ-কোড়িয়া বাহিনীর গোটা ৩য় ডিভিসন নিয়োগ করে। যে ত্রিভূজাকৃতি অইডনে বর্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে, উহার শীর্ষদেশ কোচিওয়ান দখলের জন্ত সারাগাত্রি ধরিয়া যুদ্ধের পর সংখ্যার দিক দিয়া হীনবল মার্কিন সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের একমাত্র পথ অন্য প্রান্তে রাইফেল ও মেশিনগানের গুলি বর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়। কোড়িয়ান তায়েজনের প্রায় ২৫ মাইল উত্তরে। প্রত্যাবে কুয়াশার আবরণে মেশিন গান হইতে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করিতে করিতে কমিউনিষ্টরা অগ্রসর হইতে থাকে। উ-কোড়িয়া বাহিনীর ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী যুগপৎ আক্রমণ আরম্ভ করে। ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামানের গোলায় একখানি ট্যাঙ্ক সড়ক সহিতে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পর মুহূর্তেই আর একখানি ট্যাঙ্ক আসিয়া স্থান গ্রহণ করে।

লণ্ডন—উ-কোড়িয়ার আক্রমণে আর একখানি মার্কিন রণতরী জলমগ্ন হইয়াছে।

মস্কো—রুশিয়া কোড়িয়ার রাষ্ট্র সজ্জের সর্বাধিনায়ক হিসাবে জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারের নিয়োগ বে-আইনী বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

১৩ই জুলাই। তোকিও—মার্কিন ও দক্ষিণ কোড়িয়া বাহিনী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিপক্ষ বাহিনীর চাপে স্থানান্তরিত ঘাঁটি ও প্রাকৃতিক রক্ষা প্রাচীরের অন্তরালে বাহ সন্নিবেশের উদ্দেশ্যে আরও পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। মার্কিন সৈন্যরা কোচিওয়ান হইতে হটিয়া আসিয়াছে। মাংকুরিয়া প্রত্যাগত যুদ্ধে অভিজ্ঞ কোড়িয়ানদের দ্বারা গঠিত নুতন সেনাদল সিউলে পৌছিয়াছে। ৫০ খানি মার্কিন স্থপারফোর্ট বিমান উ-কোড়িয়ার সামরিক লক্ষ্য-বস্তু সমূহের উপর অন্য ৫০০ টন বোমা বর্ষণ করে। উ-কোড়িয়ান বাহিনী পশ্চিম মার্কিন বাহের অভ্যন্তরে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। দেশের প্রায় মধ্য ভাগে অবস্থিত তাম্বাং-এ উ-কোড়িয়ান বাহিনী ৭২ ঘণ্টা তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া হান নদী অতিক্রম করিয়াছে। সম্মুখ

ভাগে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী রাখিয়া এক ডিভিসন কম্যান্ডে সৈন্য দ্রুত গতিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। (ম্যাক আর্থার) পাই অংক রেডিও প্রচার করে যে, চোচিওয়ান হইতে কুম নদীর তটবর্তী রক্ষাব্যুহে পশ্চাদপসরণ কালে বহু মার্কিন সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

তোকিও অল্প ১০ জন সদস্য লইয়া গঠিত দ-কোরিয়ার বিপদকালীন জরুরী পরিষদের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। সভাপতি পি এইচ মিনি নি বলেন, ৩৮° পৌছিয়াও দ-কোড়িয়া বাহিনী থামিবে না।

১১ই জুলাই। লঙন দঃ কোরিয়ার পশ্চিম রণক্ষেত্রে হইতে সংবাদ, ১২টি ট্যাঙ্কের সাহায্যপুষ্ট ১০০ কম্যান্ডে সৈন্য তায়েজনের ২০ মাইল উত্তরে চংজুতে কুম নদী অতিক্রম করে। মার্কিনরা ৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। (পি টি আই)

তোকিও—মধ্য রণাঙ্গনের সর্বত্র কম্যান্ডে বাহিনীর চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দ-কোরিয়ার অস্থায়ী রাজধানী তায়েজন আক্রমণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

অদ্য মধ্যাহ্নে কুম নদীর উপর কম্যান্ডে ও মার্কিন বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড কামানের যুদ্ধ হইতেছে।

ওয়াশিংটন—আমেরিকা হইতে পশ্চিম ইয়োরোপে ১৬টি জাহাজে করিয়া কামান, ট্যাঙ্ক, বিমান, অস্ত্র ও অল্প সরঞ্জাম প্রেরিত হইয়াছে। আরও ১৪টি জাহাজে মাল তোলা হইতেছে।

হংকং—২০ হাজার চীনা কম্যান্ডে সৈন্য দক্ষিণ সিংকিয়াং প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে।

নয়াদিল্লী—“কোড়িয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই লঙন, ওয়াশিংটন ও মস্কোর সাধারণ কূটনৈতিক দপ্তরগুলির মারফৎ ভারত কোড়িয়া বিরোধের দ্রুত ও শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির অল্পরোধ একাধিকবার জানাইয়াছে। গত ১২ই জুলাই মস্কোর এবং ওয়াশিংটনের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে পণ্ডিত নেহেরুর ব্যক্তিগত বার্তা মার্শাল ষ্ট্যালিন এবং ভীন একিনসনের নিকট দিবার জ্ঞপ্তি নির্দেশ দেওয়া হয়। পণ্ডিত নেহেরু মিঃ এটলির সহিত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।” (প্রেস নোট)

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

এপার ওপার

শ্রীঅঞ্জলি সরকার এম, এ,

যে রাঁধে তার পক্ষে চুল বাঁধতে পায়াটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার—এই ধরণের একটা কানা ধারণা দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের মনে শিকড় গেড়ে বসে আছে। কিন্তু আজ সে শিকড়ের গোড়া আলগা হয়ে এসেছে যখন দেখছি মেয়েরা ছুটি মাত্র হাত দিয়েই একাধারে সন্তান পালন, পরিজন সেবা, সংসার নিকাহ, অর্থোপার্জন, স্বদেশ কল্যাণ সবই করে থাকে। তবু মনের কোণায় কোণায় যেন একটা খুঁতখুঁতি রয়ে গেছে—“সবই পারি”—এ কথা জোর করে বলার সাহস এখনও আমাদের হয়নি। কিন্তু হতে হবেই। মহাসাগরের অপর তটে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই সেখানের মেয়েদের নিঃসঙ্কোচ প্রসার, অব্যর্থ অগ্রগতি প্রগাঢ় আত্মনির্ভরশীলতা। তাদের পক্ষে যা সম্ভব হইয়াছে আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব হবে কেন? আপন সম্ভার পূর্ণ বিকাশের প্রচেষ্টায় প্রয়োজন হয় না বিশেষ কোনো শক্তির

কোনো অহুষ্ঠানের—প্রয়োজন সংসার সমাজ রাষ্ট্র থেকেই যোলা আনা স্বযোগ আর সহায়ত্ব আর স্বাধীনতা লাভের। ভারতীয় মেয়েদের আদায় করে নিতে হবে সেটাই—প্রত্যক্ষে পরোক্ষে।

মার্কিন মেয়েরা স্বাধীন চিন্তায় স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে আপন গৌরবে গৌরবাঘিতা। তাদের পক্ষে সাধারণ খেয়াল, নগণ্য পরিকল্পনা তুচ্ছ উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করে কেমন ভাবে পরিণত হয় অপূর্ব আর্টে, মহৎ দেশ হিতকারিতায় তার অল্পখানিক পরিচয় আমাদের উৎসাহ দেবে অনেকখানি।

এমনি একটি মেয়ে আনাবেল গ্রাহাম। পিটসবার্গে থাকে, বয়স এগারো বছর। তার নেশা এবং পেশা নানা পশুপক্ষীর আকারে ছোটদের মনোমত খেলনা, টুপী, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করা। এর স্বত্বপাত সেদিন যেদিন আনাবেল তার মায়ের কাছে একটি পনি ঘোড়ার আবদার জানায়। মা বললেন—‘বেশ তো! তার জন্ত চিন্তা কি? সখ মেটাবার টাকাটা রোজগার করে ফেল।’ শুনেই আনাবেল ঢুকল যেয়ে নিজের ঘরে—বানালো একটা ছোট

পাস—দেখতে রবিন পক্ষীর মত। বাবা বিস্মিত হলেন খুসী হলেন সে সৃষ্টি দেখে। জিনিষটির স্বত্বাধিকার স্বীকৃত হলে তিনি স্থানীয় মণিহারী দোকানে কয়েকটি নমুনা সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সেগুলি গৃহীত হোলো এবং অর্ডার হোলো আরও। শুধু তাই নয়, স্থানীয় একটি কারখানাতে তার পরিকল্পিত প্রাণী জন্মগ্রহণ করছে শতশত। আনা বেলের উপার্জন আজকাল অজস্র। জন্তু জানোয়ার আনা সত্যিই ভালবাসে—তার স্বপ্ন কেব সে ঘোড়াভরা আন্তারবলের অধিকারিনী হবে। সে আরও চায় যে যা টাকা সে যোজ্ঞার করছে তা কোন প্রথম শ্রেণীর ডিজাইন—শিক্ষাদানের কোল্ড খাটাবে।

নিউ ইয়র্কের ইভলিন ওয়েরস্বিথ নর্তকীর জীবন ত্যাগ করে বিবাহ করেন এক জমির দালালকে। বিগত যুদ্ধের কয়েক বছর আগে যখন যুক্তরাষ্ট্রে দেশব্যাপী এক বোরতর অর্থ সঙ্কট দেখা দেয় তখন ইভলিন চিন্তায় পড়লেন বড় দিনে বাচ্চাদের হাতে কি খেলনা তুলে দেবেন। ছোট বেলায় মাকে যেমন তাকড়ার পুতুল তৈরী করতে দেখেছেন নিজেও শেষকালে তাই তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল, ইভলিনও পুতুল তৈরী ছেড়ে দিলেন। তারপর এল যুদ্ধ। ইভলিন বিমান-কারখানায় কাজ নিয়ে চলে গেলেন। যুদ্ধ সমাপ্তিতে সোজা হুজি আবার ফিরে এলেন পুতুল তৈরীর কাজে। আজ বাজারে ইভলিনের এক একটি পুতুলের দাম একশ ডলার। গ্লাষ্টিয়ের হাটে ফেলা মাথা আর তাকড়ার তৈরী দেখে—এই পুতুলগুলি আকারে এবং আয়তনে বাস্তব মানুষের মত। চমৎকার সেলাই করা জামা কাপড়ে ইভলিন যখন তাদের সাজিয়ে বায় করেন, দেখলে মনে হয় কেউ তাঁর সন্তান, কেউ বন্ধু, কেউ আত্মীয়। একটি পুতুল তৈরী করতে দু'সপ্তাহ থেকে এক মাস সময় লাগে—এক সঙ্গে দু'তিনটি পুতুলের কাজও তিনি চালিয়ে যেতে পারেন। টাকাও লা লোকের অভাব নেই মাকিন মূল্যে ইভলিনের সৌখীন ব্যবসায়ও তাই লক্ষ্যী কৃপাপ্রাপ্ত।

তকলীহামা সিটির মিসেস নেটা ষ্টকলি আর তাঁর স্বামী একবার বড় দিনের সময় অত্যন্ত খেলনার সঙ্গে ছেলে মেয়েদের কয়েকটি গ্রামোফোন রেকর্ডও উপহার দিয়েছিলেন। মা লক্ষ্য করলেন আর সব খেলা ফেলে বাচ্চারা দিনরাত কেবল রেকর্ডগুলোই বাজিয়ে চলেছে। তখন তাঁর মাথায় এল—রেকর্ডের বিষয় বস্তুর ভিতরে যদি একটু ঘরোয়া ছোঁয়াচ দেওয়া যায়—যেমন ছেলে মেয়েদের নাম, তাদের বন্ধু বান্ধবদের একটু আধটু পরিচয়, পোষা জন্তু জানোয়ারগুলির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি, তা'হলে নিশ্চয় শ্রোতাদের আনন্দ দান করা যাবে আরও বেশী। হোলোও তাই। এক জোড়া এমনই রেকর্ড তৈরী

করলেন তিনি। শিশুদের আনন্দ গেল মাত্রা ছাড়িয়ে। অচিরে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আবেদন এল, তাঁরপর অপরিচিতরা। মিসেস ষ্টকলির দস্তর মত ব্যবসায় আরম্ভ হয়ে গেল। দূর দূরান্তর থেকে আসতে লাগল গ্রাহক। নির্ধারিত প্রমুখত্বের উত্তরে কয়েকটি খবর শুধু তাঁকে জানিয়ে দিতে হয়—শিশুদের নাম, তাদের বন্ধু বান্ধব এবং পোষা প্রাণীদের নাম—সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, যথাঃ জন্মদিন বা দাঁত পড়ে যাওয়া—পছন্দসই খেলা ধুলা এবং ছোট খাটো দোষ ত্রুটি। এই সব সংবাদগুলিকে গল্পে গেঁথে নেওয়া হয়, বাচ্চাদের ভুলগুলো শুধরে নিতে বলা হয় আর শেষে দুচারটে প্রশংসার কথা জুড়ে দেওয়া হয়।

মিসেস কিং-এর হাতের লেখা হাতে খড়ির সময়ও যেমন ছিল পরিণত বয়সেও তার চেয়ে কিছু, উন্নতি লাভ করেনি—অর্থাৎ যাকে বলে একেবারে 'অখাদ্য' ছিল। কিন্তু তাতে তিনি হতাশ-ও হন নি, নিরস্ত-ও হন নি। দাক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে হস্তাক্ষর সংস্কারে লেগে গেলেন। তার পুরস্কার কি পেয়েছেন তিনি জানেন? এখন তিনি কুড়ি রকমের লেখা এবং অক্ষর আয়ত্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেন্টের হাতের লেখা শিখিয়েদের তিনি অন্ততমা। তা' ছাড়া বিশিষ্ট রাজধানীবাসীদের অনেকের সৌখিন লেখার কাজই তাঁকে করে দিতে হয়। সরকারী কাজে যে সব পুঁথিপত্র, সার্টিফিকেট, ফর্ম ইত্যাদিতে হাতের লেখার দরকার হয়, সবই তিনি করে থাকেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট টম্যান-এর কার্যভার গ্রহণ-উপলক্ষ্যে যে সভা হয় তার ৫০,০০০ পত্রের ভিতরে এবং খামের উপরে নিমন্ত্রিতদের নাম ও ঠিকানা লেখা। দিনে ১২ ঘণ্টা করে ৩৮ দিন তিনি সমানে খেটেছেন।

১৯০৮ সালে নেলী কফম্যান প্রথম পাম স্প্রিংস-এ পদার্পণ করেন। তখন তিনি অল্প-ও নানারকম ব্যক্তিগত ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এবং পাম স্প্রিংস তখন ছিল একটি মরুভূমি বিশেষ। সারা অঞ্চলে ডজন খানেক ভাঙ্গা-চোরা কুঁড়ে ঘর ছিল—তার মধ্যে গোটা ছয়কে বাস করত মোট চোদ্দ জন লোক—বাকীগুলোর ছাদও ছিল না, দেয়াল-ও ছিল না, তাই তাতে লোকও ছিল না। রেল লাইন ছ'মাইল দূরে, বাজার ৩৫ মাইল, ট্রেনে এবং বোড়ার গাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চললে হলিউডের মারুভূমি লস এঞ্জেলস-এ পৌঁছান যায়। মিসেস কফম্যানের নিজের ভাষাতে বলা যায়—প্রথম দর্শনেই তিনি পাম স্প্রিংসকে ভালবেসে ফেললেন—মরুভূমির বাতাসে যেন তাঁর দৈহিকমনের সব ক্লান্তি, সব শ্রানি দূর হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির করে ফেললেন—যা আছে ভাগ্যে হোক, এখানেই তিনি-ঘর বাঁধবেন।

প্রাচীন সঙ্কল্প, কারণ মিসেস কসম্যান নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত, সহরের বাইরে কখনও থাকেন নি। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সহরে সম্পত্তি আদি যা ছিল সব বেচে ফেলে পাম প্রিংস-এর সবচেয়ে বড় বাড়ীটি কিনে ফেললেন। বড় অর্থ, তাতে ছ'খানি ঘর, একটা চওড়া বারান্দা, একটি বাথরুম—তাতে আবার শীতকাল ছাড়া জল পাওয়া যেত না, কারণ স্থানীয় পাহাড়ী নদীটি অল্প সময়ে শুকনো থাকত। ময়লা নিকাসনের ব্যবস্থা ছিল না—গ্যাস, ইলেকট্রিক টেলিফোন সবই অজ্ঞাত ছিল। পাহাড় থেকে কাঠ কেটে নিজেরা ঘাড়ে করে বয়ে এনে উত্তুন জ্বালাতে হতো। সর্বোপরি ২৫০০ ডলার মটগেজ সমেত বাড়ীটি কেনা হয় এবং মিসেস কসম্যান জানতেন টাকাটা তাঁকেই উপার্জন করে যেতে হবে।

বয়স্কিশ বছর বয়সে দুই পুত্রের সহযোগিতায় তিনি মরুভূমির বুকে একটি পাঁচশালা খুললেন—নাম দেওয়া হলো “মরু-সরায়ী।” তিন সপ্তাহ নির্জন প্রতীক্ষার পর এল প্রথম পাঁচদল। তাঁদের কাছে খবর পেয়ে এলেন আরেকজন। তাঁরা পঞ্চ মুখে “মরু-সরায়ী”র প্রচার কার্য আরম্ভ করে দিলেন। তখন ঘরের সাপ্তাহিক ভাড়া ছিল ২৫ ডলার, খাওয়া শুদ্ধ। আজকের দৈনিক ভাড়া সেখানে ২০ ডলার। তখন নিজের হাতে মা ও ছেলেরা ভোর চারটে থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত দুধ দোওয়া, মাখন তোলা, রান্না করা, বাঁটপাট দেওয়া, পরিবেশন করা—সবই করে যেতেন।

ক্রমে মিসেস কসম্যানের ভাগ্যভারকা উঠতে লাগল। ধনী ভ্রাম্যমান, ক্রোড়পতি, ব্যবসায়ী, কুবেরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলিউডের ভাগ্য নিয়ন্তাগণ, চিত্রতারকাপুঞ্জ সকলে এসে ভিড় করতে লাগল পাম প্রিংস-এ, নতুন বাড়ী উঠতে লাগল রাশিরাশি, “মরু-সরায়ী” আকর্ষণে গেল অতিথি অভ্যাগতে। মিসেস কসম্যান অল্পবয়সের স্থান দেবেন না পাম প্রিংস-এ, নগর পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হলো। তাঁর বড় ছেলে হলেন তাঁর একজন সভ্য। নিখুঁত ভাবে গড়ে উঠল পাম প্রিংস এবং তাঁর জ্ঞান অকুণ্ঠভাবে মিসেস কসম্যান ধার করে গেছেন, মটগেজ করেছেন লক্ষলক্ষ টাকা। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি সার্থক হয়েছে, সফল হয়েছে তাঁর নির্ভীক পরিকল্পনা, বলিষ্ঠ স্বপ্ন। স্বর্গোদ্যান স্থাপ্ত হয়েছে উত্তর মরুতে।—

সিকাগোর মিসেস স্কেফিটন বা ‘স্কেফি’র যে ব্যাঙ পাঁচটি আছে তাঁর সভ্যদের প্রথম এবং প্রধান যোগ্যতা হলো—তাদের পিতামহী বা প্রপিতামহী হতে হবে। হাতে একটি ছড়ি নিয়ে ‘স্কেফি’ তাঁর দলের ৩০ জন ঠাকুমা এবং বুড়ো ঠাকুমাদের নিয়ে ব্যাঙগাটি চাপান। গত বছর তাঁরা মোটের উপর ৭০টি কনসার্ট বাজিয়েছেন।—

এই পিতামহীর দল বিভিন্ন ক্লাবে, সরকারী উৎসবে পয়সা নিয়ে বাজিয়ে থাকেন। তা’ছাড়া বিনা পয়সায় অনাথ আশ্রমে, দরিদ্র আশ্রমে, হাসপাতালে, গীর্জায় বাজনা শোনান। বয়স তাঁদের কমপক্ষে চল্লিশ, অনেক ষাট, কয়েক জন আশীর উপরে। প্রাচীন স্বর, অতি আধুনিক তান দুই-ই তাঁরা পরিবেশন করে থাকেন। লাল টুকটুকে স্যাটিনের পোষাক পরে ঠাকুমারা যখন জয়ঢাক আর ভেঁপু বাজাতে থাকেন, ঘরবাড়ী যেন কাঁপতে থাকে। ‘স্কেফি’র নিজের বয়স ৬২, দশটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে তাঁর কম বেগ পেতে হয়নি। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর ‘স্কেফি’ দেখলেন তাঁর কোনো কাজ নেই। তিনি অনুভব করলেন অধিকাংশ বুড়ারই আনন্দ পাবার বা স্থায়ী হবার বিশেষ কোনো উপায় নেই। তখন তিনি ভাবলেন এমন অনেকে নিশ্চয় আছেন যারা অল্প বয়সে গান বাজনা করতে ন এবং এখনও করতে চান। তাই তিনি যোগাড় করলেন অবসর প্রাপ্তা গৃহিনী, ব্যবসায়ী মহিলা, শিক্ষয়িত্রী, নাস। তাঁদের কাছে জীবনের নতুন অর্থ প্রতিভাত হলো। ‘স্কেফি’ বলেন—‘তাঁরা আনন্দ দেয় অপরকে এবং নিজেকেও।’

গায়ের রংএ দুধ ঢালা আর চুলে সোনা থাকলেও দেহমনে মার্কিনী নারীরা নারীই। কিন্তু তবু যে এপারে-ওপারে তাঁদের সঙ্গে আমাদের এই অন্তর্লাত্তিক ব্যবধান—প্রতিটি অল্পভূতির প্রকাশরূপ ভিন্ন, শক্তির অভিব্যক্তিতে এত তারতম্য এর জন্ম কি সমাজ এবং সমাজ প্রদত্ত শিক্ষাকেই দায়ী করতে ইচ্ছা হয় না? আমাদের দেশের মেয়েদের সৌখীন কাজ—বড়ি দেওয়া, আচার বা খাবার করা, রকমারি সেলাইয়ের ফৌড় তোলা ছাড়া আর কোনোদিকে এগোয় নি। অর্থের অভাব? সুযোগের অভাব? যাদের অর্থ আছে, সুযোগ আছে তাঁরা কি করে? কি দিয়ে করবে? সমাজের স্যাঁতলা-পড়া অল্পশাসন ফলকে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে—মেয়েদের স্বাধীন চিন্তা করতে নেই, পাপ হয়; সখের খরচ করতে নেই, অপরাধ হয়, হাসি আনন্দে দিন কাটাতে নেই, নারীত্বের অবমাননা হয়, উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করতে নেই, জীবুদ্ভি প্রলয় ঘটায়—সে পাথরের চাপ কি সহজে ঠেলে ফেলতে পারি? শৈশব আর কৈশোর কাটে গুরুজনের চোখ রাঙানির তলে—যৌবন নিষ্পেষিত হয় সমাজের জরুটি শাসনে, বান্ধিয়া আসে পরকালের ভীতি নিয়ে। নিজের বলতে জীবনের একটু সময়ও এদেশের মেয়েরা পায় না। সমস্ত জীবনটাই কাটে ভয় আর আড়ষ্টতার বোঝা বুকে বয়ে। কিন্তু এই লজ্জাস্বাদকে দূর করার মনোবল যতদিন না আমাদের জাগবে আমরা জানব

না কি যোগ্যতা আমাদের আছে কি নেই, শক্তিতে মার্কিন রমণীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আমরা পারি কি পারি না। এবং যতদিন তা না জানব ততদিন বুঝতে হবে গলদ রয়েছে কোথাও আমাদের শিক্ষায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনে। সে গলদ সরিয়ে ফেলতে পারলে আমাদের শক্তি নিজের পথে, নিজের রূপে, অসংখ্য শাখার ক্ষুরিত হবে। পারব আমরা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে, প্রাণভরে জীবনকে গ্রহণ করতে।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য

শ্রীমতী মন্থা গোস্বামী।

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্যের মূল উপাদান। স্বাস্থ্য ছাড়া সৌন্দর্যের ত্রিবিক্তি সাধন ও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ কখনই সম্ভব নয়। কাজেই সৌন্দর্য চর্চার কথা আলোচনা করতে গেলেই আগে মনে পড়ে যায় স্বাস্থ্যের কথা।

মেয়েরা যে সাজে, এবং সাজতে ও সাজাতে ভালোবাসে একথা স্বীকার করতে কোনও মেয়েই কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু কেন সাজে, এই প্রশ্নের উত্তর সকল মেয়ের জানা নেই। মেয়েদের এই সজ্জা বিলাস বিধি প্রদত্ত দুর্লভ দান। এরই মধ্যে রয়েছে মানুষের সংসারের শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্য। যে সংসারে স্ত্রীলোক নেই, অনেকে সেই গৃহকে অরণ্যভূজ্য জ্ঞান করে থাকেন। সৌখীন মেয়েরা নিজের মেহকে যেমন নিত্য নব নব রূপে বেশ-ভূষায় সজ্জিত করে থাকে, তেমনি তার সন্তানকেও সাজিয়ে রাখে। বসবার ঘরটা যেমন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে, রান্নাঘর এমন কি স্নানের ঘরও সেই রকম পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে। কিন্তু পুরুষরা সৌন্দর্যপিশাস্ত্র হলেও, তারা নিত্যকর্মের সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে প্রায় পারে না। একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের পড়ার ঘর পাশাপাশি দেখলেই, এই সত্য স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যই মেয়েদের সৌন্দর্য প্রিয়তাকে বিধাতার দুর্লভ দান বলা চলে। মেয়েরা সাজতে ভালোবাসে, ঠিকই, কিন্তু স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে তারা মোটে সচেতন নয়। একটা মেয়ে হয়ত অতি প্রত্যাষে উঠে পড়তে বসল। কিন্তু একটু খোলা জায়গায়, অর্থাৎ ছাদে খোলা বায়ান্দায়, যাদের মাঠ বাগান আছে সেই রকম মুক্ত জায়গায় যদি পাশচারী করে বেড়িয়ে তারা প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করে তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। শীতল বায়ু সেবন, এবং ব্যায়াম দুইই হয়, কিন্তু তা কেউ করে না। এর মধ্যে নয়টার যাদের স্কুলর বাস আসে তাদের ব্যস্ততা সহজেই বোঝা যায়। কোনও রকমে স্নানাদি গেরে নিয়ে তারা প্রসাধন চর্চায় লিপ্ত হয়। স্কুলে

কলেজে যাবার সময় মেয়েদের শাড়ী ব্লাউসের বাহারের অত হাল্কা না নেই। সাদাসিদে যাহোক একটা হলেই হোল। কিন্তু মুঞ্চিল হয় চুলবাঁধা আর শাড়ী পরা নিয়ে। শাড়ীর কুঁচি ঠিক হয়তো পাট ঠিক হয় না, পাট ঠিক হয়তো বুল কম হয়, বুল ঠিক হয়তো আঁচল ছোট হয়। তারপর সিংগিল ক্রিপ আর কাঁটার সাহায্যে চুলের বাহার ঠিক করতেই যায় আরও খানিক সময় চলে। তারপর আছে ভুরু আঁচড়ানো পাউডার মাখা। এই সব করতেই স্বল্প সময় যায় ফুরিয়ে। তখন ভাত খাওয়ার সময়ের উপর পড়ে টান। কোনও রকমে নাকে মুখে গুঁজে চারিটা খেয়ে মেয়েরা চলে যায় স্কুল কলেজে। মা, বাবা, দিদি, দাদা দোষ দেন স্কুলকর্তৃপক্ষকে। এত সকালে গাড়ী এলে মেয়ে কি খাবে, আর কি পড়া কোরবে?

কিন্তু আজকের যুগে পড়াটা চাই। তাই অভিভাবকরা এ সম্বন্ধে কোনও মাথা খামান না। কিন্তু একদিন তাঁরা দেখতে পান মেয়ের রং ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, চোখের কোলে কালি পড়ছে, গলার হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে—সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মেয়ে দিন দিন কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

এখন উপায় একমাত্র ডাক্তারের স্বরণাপন্ন হওয়া। ডাক্তারবাবু টনিক লিখে দিলেন, ভালো খেতে বলেন। বিশেষ করে ফল আর দুধ। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে কয়জন তার সন্তানকে প্রত্যহ পরিমাণ মত দুধ ফল খেতে দিতে পারে? তখন এই অক্ষমতার স্বযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করে মেয়েদের অর্দ্ধ ভগ্ন স্বাস্থ্য। যে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, তা আর জোড়া লাগে না। ফলে মেয়েদের রূপ থেকে লালিত্য সম্পূর্ণরূপে বারো যায়।

মেয়েরা সাজে, সাজতে ভালোবাসে, সাজাতে ভালোবাসে, এ প্রথা চিরদিনের। পৃথিবী থেকে যেদিন সমস্ত মেয়ে জাতই লুপ্ত হয়ে যাবে, সেইদিনই এ প্রথাও বিলোপ সাধন হইবে। সেদিন গাছে আর ফুলও ফুটেবে না, পাখী আর গানও গাইবে না। সেদিন শিল্পী পুরুষ পরিণত হবে নির্ধর ব্যাধে। কিন্তু সে রকম দারুণ দুর্দিন পৃথিবীতে আসলে বলে মনে হয় না। কিন্তু স্বাস্থ্যকে এমন ভাবে অবহেলা ও উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে একদিন তাদের মন থেকে সৌন্দর্য সাধনার স্পৃহা নিঃশেষ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দেহের সৌন্দর্য ও মনের সজ্জা বিলাসকে ঐশ্বর্যশালী করতে হলে, স্বাস্থ্যের প্রতি বড়শীল হওয়া দরকারে প্রয়োজন। স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান সময়ে আহার বিশ্রামেরও ঠিক সমানই প্রয়োজন।

সরোজ নলিনী নারী মঞ্চল সমিতি

সমিতি ভবনে মহিলাদের ভিতরে চরকা কাটা বিভাগটি গত ২ বৎসর হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। West Bengal Women Emergency Relief Committee Center এর পরিচালনায় মহিলাদের ভিতরে চরকা কাটায় একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর সরোজ নলিনী নারী মঞ্চল সমিতি হইতে শ্রীমতী জ্ঞানদাপ্রভা দেবী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। গত ২৭.৫০ তারিখে মহামাঞ্জ প্রদেশ পাল ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু লাট ভবনে আহত সভায় তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। গত বৎসর শ্রীমতী চাক্রহাসিনী দেবী ও শ্রীমতী শান্তিরামী বসু পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও ঐ দিন পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

সমিতির প্রচার কাজ

প্রচারক শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ ও মহিলা প্রচারিকা শ্রীমতী সুবোধ বালা ঘোষ সমিতির প্রচার কার্যে গত ১৩ই জুন আসাম যাইবার জন্ত রওনা হন। সমিতি গঠনের কাজে প্রথমতঃ তাঁহারা সাহেবগঞ্জ যান। সাহেবগঞ্জে গত ১৪ই জুন স্থানীয় কলোনীর মহিলাদের একটি সভায় আয়োজন করা হয়। প্রচারিকা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে বিষয় আলোচনা করেন। প্রচারক দেশের ও জাতির উন্নতিকল্পে অত্যাশ্রয় দেশের মহিলা সমাজ যে শক্তির অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিয়া বর্তমান সংকটে আমাদের দেশের মহিলাদের দায়িত্ব রহিয়াছে বলেন।

উক্ত সভায়ই একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়।

কাটিহার

গত ১৬ই জুন প্রচারক ও প্রচারিকা সরোজ নলিনী সমিতির অন্তর্ভুক্ত কাটিহার রেলওয়ে মহিলা সমিতি পরিদর্শন

চরকা কেন্দ্র

করেন। কাটিহার মহিলা সমিতির ছাত্রী সংখ্যা ২৬ জনের উপর। প্রতি বৎসর এই সমিতি হইতে জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষায় বহু সংখ্যক ছাত্রী যোগদান করিয়া থাকেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই মহিলা সমিতি হইতে অনেক মহিলা স্বাধীনভাবে সম্মানে জীবিকা অর্জনের পথ করিয়া নিতে সক্ষম হইয়াছেন। সমিতির সম্পাদিকা ও বিশিষ্ট সভ্যাবৃন্দের মিলিত সভায় প্রচারক ও প্রচারিকা, সমিতির উন্নতিকল্পে অধিকতর সচেষ্ট হইতে আবেদন জানান।

স্বাধীনতা উৎসব উদ্‌যাপন

সমিতির প্রাঙ্গণে

বেলা ৮.০ ঘটিকায়

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মনীষা রায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। 'সরোজ নলিনী শিল্প ও ট্রেনিং বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ-কর্তৃক বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি গীত হয়। সমবেত ছাত্রীবৃন্দ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

সরোজ নলিনী নারী মঞ্চল সমিতির চরকা কেন্দ্রের ১৬ জন ছাত্রীসহ-প্রচারিকা শ্রীমতী সুবোধ বালা ঘোষ প্রদেশ পাল ভবনে সূত্র-যজ্ঞে যোগদান করেন। প্রদেশ পাল ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু ও নেতৃবৃন্দসহ এক হাজারের অধিক লোক উক্ত সূত্র যজ্ঞে যোগদান করেন এবং ১ ঘণ্টাকাল পর্যন্ত গান্ধীর্ষ্যপূর্ণ পরিবেশের ভিতরে সূতা কাটেন। শ্রীমতী সুরুতি সেনের পরিচালনায় সমন্বয়যোগী জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। প্রদেশ পাল ও উপস্থিত মন্ত্রীগণ আমাদের লব্ধ স্বাধীনতাকে অপ্রতিষ্ঠিত করিতে আবেদন জানান।

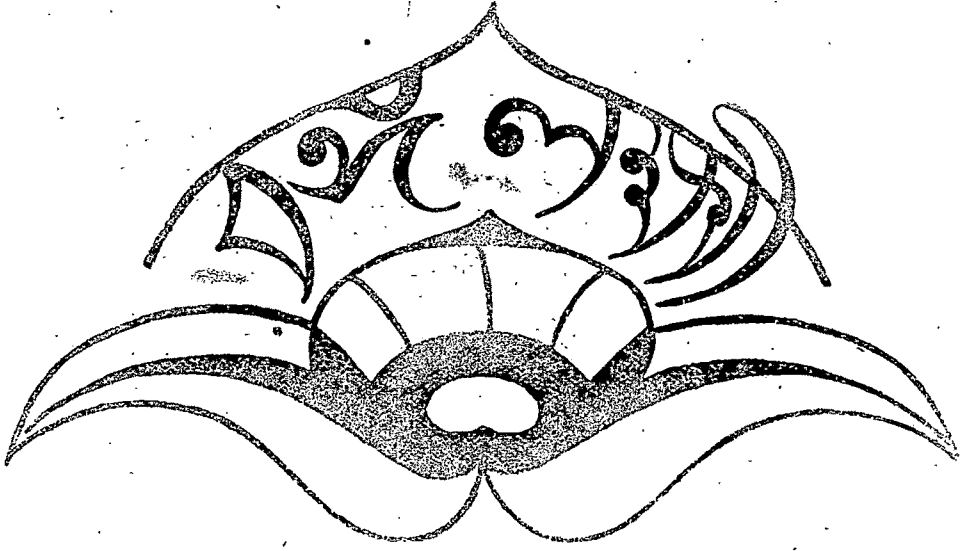


Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
BHOWANIPUR :: CALCUTTA.



হরগৌরী

[শিল্পী—শ্রীহিন্দ্রবা দেবীচৌধুরাণী,
গৌরীপুর



২৫শ বর্ষ

আশ্বিন—১৩৫৭ (শারদীয়া সংখ্যা)

১১শ সংখ্যা

দুর্গতি

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

ক্ষিপ্ত দৃষ্ট যারা ক্ষমতার মোহে,
মানুষকে যারা মানুষ ভাবে না মনে,
নিরাপদ ভাবে যাহারা উচ্ছে রয়ে
দুখী দুর্কলে শক্তিবাহীন গণে,
হোক প্রচণ্ড, হউক দর্পী অতি,
আসিবে তাদের আসিবেই দুর্গতি।

২

আকাশপার্শী যাদের অহঙ্কার,
জায় ও সত্যে সখের বস্তু ভাবে,
স্বার্থে বিবেক বদলায় বারবার
ফেটে মরে যারা মেটে গর্কের ফাঁপে,
হোক মহাবল হোক তারা ধরাপতি
আসিবে তাদের আসিবেই দুর্গতি।

৩

ধ্বংসে যাহারা পটু আর উন্মুখ,
অমর দস্তে বিষাক্ত করে বায়ু।

পশু বলে বলী বোঝোনা পরের দুখ,
সে জাতির আর ফুরায়ে আসিছে আয়ু।
হোক যত বড়, কল্লক যতই ক্ষতি
আসিবে তাদের আসিবেই দুর্গতি।

৫

পুণ্যের নামে করে পাপ আচরণ,
মনুষ্যত্ব দলিত করিছে পদে,
আসিছে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ফণ
মগ্ন রয়েছে মাৎস্য ও মদে।
ভাবিছে অজ্ঞের নিরাপদ তারা অতি।
আসিছে তাদের আসিতেছে দুর্গতি।
স্তম্ভ বিদারি নৃসিংহ আশুমান।
কাঁপে লঙ্কার কনক সিংহাসন।
নাচে চামুণ্ডা সোমরস করি পান
মহাশক্তির হতেছে উদ্বোধন।
মুঘলের পাপই ডুবাইবে দ্বারাবতী।
দুষ্কর্তাদের আসিবেই দুর্গতি।

ভূলের ফসল

(গল্প)

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রবিবার। এদিন বর্ষাঋতুর নয়, আকাশ প্রসন্ন।
সূর্যের আতিথ্য লাভ সবারই ভাগ্যে মটেছে, কিন্তু
বিনায়কের ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত হোলো না। যিনি
অপারূপ, তাঁর আলোকের দাক্ষিণ্য ওর ওপর পড়লো না—
জীবনের জমা খরচের পাতাগুলো খরচে ভরে গেল,
শুণ্য অঙ্ক জমার দিকে, এইটাই ওর সব চেয়ে দুঃখ।

অফিস নেই, এ আনন্দেও যে কিছুক্ষণ বিনায়ক
বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকবে, সেভাগ্য করেনি।
অর্থোপার্জনের আশায় ওকে গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখতে
হয়। লিখেও যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য অর্থ লাভ হয়,
তা নয় : তবে ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা কোন রকমে
দেওয়া চলে। অফিসে যা মাসিক বেতন পায়, তা'তে
সংসার চলে না—অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে ধার
করতে হয় এই তো অবস্থা! মাইনের টাকায় বড় জোর
পনরো দিন কোন রকমে সংসার কটে সুষ্টে চলে।

শারদীয়া সংখ্যায় লেখবার জন্তে কয়েক জায়গা থেকে
আমন্ত্রণ ও ভাগিদ এসেছে। ওর আশা আছে লেখা
প্রকাশ হোলে কিছু টাকা পাবে; সেই টাকায় ছেলে
মেয়েদের যদি জামা কাপড় কিনে দিতে পারে তা হোলে
তাদের মুখে হাসি ফুটবে।

যে কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকায় মোটা টাকা পাবার
সম্ভাবনা আছে, মনে হয় তারা ওকে দলভুক্ত করতে
একেবারেই অনিচ্ছুক। সে জন্তেও মনে ব্যথা পায়, পেলে
কি হবে—ভাদের চড়কের ঢাক বাজে, শিবনৃত্য হয়।
তাদের গাজনে ওর নাচবার অধিকার নেই।

তবু মন বোঝে না, 'হু'একটি জায়গায় অফিস
থেকে বিনায়ক ফোন করে। সে সব জায়গায় শকুনি
মামাদের আধিপত্য যে কত বেশী তা বুঝেও ওর
আত্মবিশ্বাসি ঘটে যায়। অক্ষমতাই দলকেন্দ্রিকতার

ধাতা এবং ধাত্রী। দলকেন্দ্রিক চর্চাকেন্দ্রের উৎকর্ষ
মার্গাভ্যাস এম্মি যে, ভাগিয়ে দেওয়াই তার একমাত্র রীতি
ও পদ্ধতি, আর শ্লেষ বা বক্তোক্তি করাই তার ধর্ম—
যেখানে একেবারে ভাগিয়ে দেওয়া শিষ্টাচার নয়, সেখানে
লেখা চপে দেওয়াই সেখানকার কর্তাদের চিন্তের
ঊদ্যম।

যে নদীর স্রোতধারা শুকিয়ে আসছে, সে নদীতেই
দেখা দেয় পঙ্কিলতা, স্তবরাং এর জন্তে বিস্তৃত হবার কিছু
নেই—এই বলেই বিনায়ক ওর মনকে প্রবোধ দেয়। কিছুদিন
আগেও লেখা প্রকাশের আশায় কোন বিশিষ্ট পত্রিকায়
ফোন করেছে, উত্তর পেয়েছে 'আনুসারটেন', যার ভাবার্থ
হচ্ছে ভাগিয়ে দেওয়া। এর ওপর আর কথা চলে কি?
ও বুঝেছে, যিনি ফোনে উত্তর দিয়েছেন তিনি শকুনি
মামারই অবতার বিশেষ—স্বগোষ্ঠী পোষণই তাঁর জীবনের
উপজীব্য, বন্ধুতোষণই তাঁর জীবনের মহৎব্রত। তাই
তাঁর মত ব্যক্তি যে বলবেন—“আমাদের গোপালের দল
খাইয়ে ভালো”—এতো অস্বাভাবিক নয়। কয়েকটি দল
থেকে উপেক্ষিত ও অপমানিত হলেও লিখে ওর
অর্থোপার্জন বন্ধ হয় না, প্রতিভা এমন বস্তু যাকে জবেহা
করা যায় না, নিক্ষেপিত করা যায় না, কেবল লোকের
কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা যায় মাত্র। এই
ধারণা ওর আছে বলেই এখন শত বাধা বিঘ্ন বিপত্তির
মধ্যেও বহালতব্রিয়তে সাহিত্যসমাজে ও বসে আছে।
ওর সামান্য এই যে, সাহিত্যের যারা গুরুস্থানীয় পূর্বাচার্য্য
তাঁদেরও অনেকে ওর মত বিড়ম্বনা ভোগ করেছেন।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিনায়ক সবেমাত্র গল্প
লিখতে আরম্ভ করেছে, তাও ছোট গল্পবার কথাগুলো
মেপে মেপে আর হিসেব করে করে বসাতে হয়।

গল্প একটু বড় হয়ে গেলে ফরাসীদের মতে কঁৎ হয়ে যায় অর্থাৎ নভেলট, এখন কবিতার ক্ষেত্রে—সনেটেরও চেয়ে ছোট কবিতার সমাদরের দিন এসে পড়েছে, ঠিক জাপানী হকু কবিতার মত, চারিটি চরণের মধ্যে কবিতার ভাববস্তু ঈশ্বর অল্পভূতির মত অব্যক্ত হয়ে থাকবে। বিনায়ক এই সব দিকে খেয়াল রেখেই লেখা শুরু করেছে। যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সাহিত্য বা কাব্য সৃষ্টি না করলে যমির মত ইতিহাসের কবরে রৈঁচে থেকে লাভ কি?

ইতিপূর্বে এই স্বন্দর প্রভাবে জীবী সঙ্গে বাক যুদ্ধ হয়ে গেছে, সে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে রীতিমত কলহের পর। জীবী এসে জানিয়েছেন চাল বাড়ন্ত, তেল ফুরিয়েছে। ও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছে—‘আমি আর কি করবো, সবাই উপোস করে থাকো—’

জীবী বললেন—‘আমার একটা পক্ষে উপোস করা খুব সোজা; তোমার সংসারে এসে বহু কষ্ট লাগুনাই ভোগ করলাম। ছেলে মেয়েরা উপোস করে থাকবে, মায়ের প্রাণ কেমন করে তা সহ্য করে বলা তো।’

বিনায়ক বললে—‘বাদবপুর থেকে এক টাকা সেরের চাল এনে খাওয়াবার অবস্থা আমার নেই, দশদিনের ওপর চল্লিশ টাকা মণের চাল কিনে খাওয়াতে হয়েছে। তোমাদের জন্তে-মরতে তো পারিনে। তোমারও নিজের পথ বেছে নেবার অধিকার আছে, বি.এ. পাস করেছে, লেখাপড়া শিখেছ, সংসারে হাঁড়ি ঠেলে এমিভাবে অসহায় অবস্থায় থাকা তোমার তো সাজে না?’—

জীবী বললেন—‘খুব সাজে, আমি সংসারের গিন্নি, রায় পরিবারের কুলবধু, সন্তানের মা—গাহ’স্থ্য ধর্মই পালন করে যাবো—তুমি তোমার পৌরুষ দিয়ে সংসার গড়ে তুলবে, আমি মাধুর্য্য দিয়ে তার স্ত্রী আর স্ত্রী বজায় রাখবো।’

বিনায়ক বলতে বাচ্ছিল অতীত দিনের সেই কথাটি। এর পর আর বলা চললো না। ওদের পশ্চাতে যে ইতিহাস নীরব হয়ে আছে, ও তাকে এ দিনে মুখর করে জীবী অন্তরে আঘাত দিল না পাছে রবিবারের প্রভাবে পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা ঘটে। ওর জীবী মনে হয় তো সে ইতিহাসের অক্ষরগুলো মুছে যেতে বসেছে, কারণ

একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে মেয়েদের কাছে স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, আর সে অবলম্বন স্তব্ধ হয়ে ওঠে যেদিন তারা মায়ের স্থান অধিকার করে বসে। মাতৃস্নেহই নারীস্বের পূর্ণ পরিণতি।

বিনায়ক সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যার জীবনের পাকা পোক্ত ভিৎ ধসে গেছে, আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে যার সৌধ, স্তম্ভ থেকে আরম্ভ করে ঝিলিঝিলি পর্যন্ত সাম্প্রতিক সভ্যতার রাজ্য পথে; যুগের নিম্ন হৃদয় শূন্য রোলারে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যার অস্থিপিঞ্জর আর যার ওপর দিয়ে চলতে শুরু করেছে ঐশ্বর্য্যের রথ আর ভাগ্যবানের শোভাযাত্রা ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

যারা ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী তাঁরা জানেন বিনায়ক যে শ্রেণী-সমাজে মানুষ তার ঋণ কোন যুগই শেষ করতে পারবে না। ভাবলো না রাষ্ট্র কর্ণধার বা দেশপালেরা যে এই মধ্যবিভক্ত শ্রেণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, সভ্যতা, অল্পশাসন সব কিছুই বিগ্রহের মত বুক করে রেখেছে, বিনায়ক এই সভ্যই বারে বারে তার কবিতায় গল্পে উপন্যাসে উদ্ঘাটিত করেছে।

আজকের মানুষ পাষণ্ড—আত্মকেন্দ্রিক, আজকের দিনে ধর্ম খোলস ছাড়ে না—তাই নয় কি! গল্প লিখতে বসে যে প্লট ওর মাথায় এসেছিল তা দানা বাঁধলো না। ও ভাবলো ওর নিজের জীবনের অতীত ঘটনাকে মুখর করে তুলবে গল্পের মধ্য দিয়ে। নিজের মনে বললে—‘কোন দিন তো নিজের কথা বলা হোলো না।—’

ও লিখতে থাকে নিজের ছায়াচ্ছন্ন জীবনের কথা অক্ষরেব জাল বুনে বুনে গল্পের পটভূমিকার ওপর। ওর জীবী সানন্দা স্বামীর কথায় বিচলিত হয়ে উঠেছেন। সানন্দাও ভাবতে থাকেন নিজের কথা আর আপনার মনে বলে ওঠেন—‘সত্যি তো! আমারও নিজের পথ বেছে নেবার অধিকার আছে, আমি সে অধিকার থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করি?’

বিনায়ক আর সানন্দার মধ্যে বয়সের খুব ব্যবধান নেই, মাত্র বছর চারেকের হবে। বিনায়কের বয়স পঁয়ত্রিশ—হ্যাঁ, পঁয়ত্রিশই হবে, তা হোলো হিগেবে দেখা যায় সানন্দা

একত্রিশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই একত্রিশ বছর বয়সেই উনি চারিটি সন্তানের মা, একটি ছেলে আর তিন মেয়ে। ছেলেটি সবার চেয়ে ছোট।

মেয়ে হওয়া যে বাংলা দেশে কিরূপ ভাগ্যবিড়ম্বনা তা সানন্দা নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে পরপর যখন তিনটি মেয়ে হোলো ওঁর মন ভেঙ্গে পড়লো এই হিসেবে যে, ওদের কত দুঃখ কষ্ট নির্যাতনই না ওঁকে চোখের সামনে দেখতে হবে।

স্বামীর দারিদ্র্যের আভিজাত্যই আছে কিন্তু অর্থের জোর তো নেই যাতে মেয়েদের ভবিষ্যতের পথ সুন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া তিনটি মেয়েই কালো, ছেলেটি মায়ের মত সুন্দর, মুখখানিতে যেন জ্বলন্ত সানন্দার ছাপ রয়েছে।

বিনায়ক স্বপুরুষ, সানন্দারও সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। আশ্চর্য্য এই যে ওদের তিনটি মেয়েই শুধু কালো নয়, তাদের গঠন সৌষ্ঠবেরও একান্ত অভাব। সানন্দা শিক্ষিতা, উনি জানেন ভারতে বহু জাতির সংমিশ্রণে যে সব জাতি গড়ে উঠছে তার মধ্যে বাঙ্গালী জাতি অগ্রতম, আর এ জাতি যে সব চেয়ে বর্ণসঙ্কর তা নৃতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন। স্বতরাং বিজ্ঞানের চোখে ধুলি দিয়ে শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়ায় ধুয়ো ধরে মস্তব্য প্রকাশ করা মানেই হাস্যাম্পদ হওয়া—সানন্দা এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনে বললেন—‘আমার ভাগ্যেই কি দ্রাবিড়ীয় রক্তের ধারা বেশী ভাবে বহমান হ’লে এসেছে।’

এ সব প্রসঙ্গ উঠলে বিনায়ক সানন্দাকে সাস্তুনা দেয়। ও বলে—‘আমার অদৃষ্ট মন্দ! তুমি পরমাসুন্দরী, আমারও বর্ণ গৌর, তবু কেন যে এমন হোলো?—’

দৈন্ত্র অভাবের সংসারে রায়দম্পতীর মনে এদিক দিয়েও সুখ নেই।

তিন কাপ চা আর এক তড়া বিড়ি নিঃশেষ করে বিনায়ক তার ছোট গল্প শেষ করলো, কিন্তু পরিণতিটা আশায়রূপ হোলো না—ফরাসী গল্পের মত পথের মাঝখানে থেমে গেল। আমাদের দেশের পাঠক পাঠিকারা যে ভাবে

গল্পের পরিণতি চান অর্থাৎ হয় কমেডি না হয় ট্রাজেডি তার কোনটাই রূপ পরিগ্রহ করলো না। তবে ওর গল্পের নায়িকা শুভ্রা সেনের বাড়ী থেকে স্বামীকে কটুক্তি করে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে চলে গিয়ে চাকুরি নেওয়াটা যদি ট্রাজেডি হয় তা হোলে বলতেই হবে গল্পটা ঠিক জায়গায় উপসংহারে এসেছে।

কিন্তু পাঠক পাঠিকারা বলতে পারেন, শুভ্রা সেন বাড়ী এলো, না বন্ধুর জীবনসঙ্গিনী হয়ে রইলো লেখক তো এ সম্বন্ধে নীরব। এই নীরবতা কি লেখকের অক্ষমতা নয়? রসজ্ঞরা এর উত্তরে হয় তো বলবেন, না বলাটাই তো হচ্ছে আর্ট। মোদ্দা কথা এই যে, শুভ্রা সেনের হিরণ্ময়ের সঙ্গে সবেগে প্রস্থানের পর গল্পের জের টেনে আনার যুগ চল গেছে।

গল্পটার অবতরণিকা যেভাবে করেছিল বিনায়ক, উপসংহারটা করে দিল একটু ঘুরিয়ে। তারপর ওর চোখে ঘুমের নেশা ভর করাতে বিছানায় আশ্রয় নিল। ওর ঘুমের প্রগাঢ়তা দেখে সানন্দা সদ্য লিখিত গল্পটি নেপথ্যে পড়তে থাকেন। কয়েক লাইন পড়েই মনে হোলো নিজেদের জীবনের কথা। গল্পের অবতরণিকার প্রথম কথাটি ওর কাছে বড় সুন্দর লাগলো সেটা প্রস্তরের আকারে আবর্তিত হয়েছে : জীবনের নদী কি পিছনের দিকে যায় কিরে? ইয়া সার্থক সাধনা বটে।

গল্পের গোড়াপত্তন হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন বিনায়ক সানন্দাকে ব্রাউনিঙের কবিতা পড়াতে পড়াতে রোমান্টিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে। সেদিন ওদের ভেতর প্রথম ভালবাসার অভ্যুদয় ঘটেছিল। শীতের রাত্রে নীলাভ শেডের তলায় ব্রাউনিং-এর কাব্য চর্চা করতে করতে সানন্দার কুমারী মন কল্পনার রঙে রঙে রাঙিয়ে উঠেছিল। বিনায়ক তখন ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। সানন্দা সে সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজের সাহিত্য বিভাগের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। বেশভূষায় চালচলনে, কথাবার্তায়, সৌন্দর্য্যে সানন্দার ব্যক্তিত্ব ঘরে বাইরে ফুটে উঠেছিল।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই দেখা গিয়েছে দ্বৈত ভাব, পরে ভালোবাসা যেখানে রসঘন হয়ে ওঠে,

সেখান থেকেই অদ্বৈত ভাবের সৃষ্টি হয় যা অধিকাংশ স্থলেই স্বামী জীর মধুর সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা চালাতে থাকে সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের সন্ধানে। বিহগ বিহগী নীড় বাঁধে, একত্র বাস করে—তারপর পক্ষ বিস্তার করে উড়ে যায় অনন্তের পথে।

সানন্দার জীবনে যে ছেলেটি প্রথম ভালোবাসার আকাজক্ষা নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছিল, তাকে উনি পেয়েছিলেন খেলার সাথী হিসেবে। দুজনে পিং পং খেলতেন। বড় লোকের মেয়ে সানন্দা, তাঁর সাথীও হবে বড় লোকের ছেলে, এটা স্বাভাবিক। তাই পাশের বাড়ীর ঐ ছেলেটি স্কুমার ধনীর সন্তান হয়ে আশা করতে পারে ধনীর ছালা সানন্দাকে জীবনের সহধর্মিণীরূপে। উভয় পরিবারের অভিভাবকদেরও অবশ্য এদিকে সমর্থন ছিল, তা না হোলে হয় তো তাঁরা ওদের অবাধ মেলামেশার লাগামটা টেনে ধরতেন।

ভাগ্যচক্রে সানন্দার সঙ্গে স্কুমারের বিয়ে হোলো না, হোলো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারে জাত বিনায়কের সঙ্গে যার পশ্চাতে কোন আভিজাত্যই নেই। বিনায়ক ছিল সানন্দার প্রাইভেট টিউটর। ভালোবাসার এমনই মোহ বা টান যে ভবিষ্যতের ভালোমন্দ অবস্থার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সানন্দা রায় পরিবারের বধূ হয়ে প্রবেশ করলেন মাখায় ধানের ঝাপি নিয়ে নম্র, স্পেশাল ম্যারেজ ট্রাস্টের দ্বারা অল্পসারে লিখিত রেজিষ্ট্রেশনের সার্টিফিকেট নিয়ে। ফলে যে পরিবারে উনি এলেন, সে পরিবার ঠেকে বরণ করে নিল না। যে পরিবারে উনি মাছুষ হয়েছিলেন সেই গাছুলি পরিবারও তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল ওদের অন্তঃপুরে।

বিনায়ক জীকে নিয়ে এসে দাঁড়ালো সভ্যতার রাজপথে একান্ত অসহায় অবস্থায়। সানন্দা গ্রাজুয়েট, বিনায়ক পোস্ট গ্রাজুয়েট। বিনায়ক সে সময়ে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কেরানী পদে কিছু দিন মাত্র নিযুক্ত হয়েছে আর অবসর মত লিখতে আরম্ভ করেছে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। ক্রমেই ওর খ্যাতি বিস্তৃত হোতে থাকে। এরকম অসহায় অবস্থায় ওকে সস্ত্রীক বাসা করতে হোলো উত্তর কলিকাতার একটি এঁদো

গলিতে—এক তলায় দুইখনি ঘর, স্যাঁৎ সেঁতে, আলো বাতাস নেই, রান্নার জায়গা সিঁড়ির নীচে এঁদো ঘুলুঘুলির মধ্যে। ওরা এসে পড়লো দারুণ অস্থবিরের মধ্যে। বিনায়ক অশ্রু-সজল চোখে বললে—‘সানন্দা! ধনীর মেয়ে তুমি, এম্মিভাবে থাকা তোমার অভোস নেই—তুমি কষ্ট পাবে এইটাই সব চেয়ে আমার দুঃখ’—

শেষে সানন্দা হাসিমুখে বললেন—‘স্বামীর কাছে থাকলে মেয়েরা সব দুঃখ কষ্ট ভুলতে পারে—আমি তো দুঃখকে অন্তর দিয়ে বরণ করে নিয়েছি, দুঃখকে জয় করতে হোলে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়’—

বিনায়ক জীর মুখের দিকে মৌন বিশ্বয়ে চেয়ে রইলো।

তারপর জীবনের স্তব্ধ দিন চলে গেছে।...

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাতে আর যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ওদের অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়। হয়তো একপ হোতো না যদি শিক্ষিতা সানন্দাও জীবিকাধন্দের কলকোলাহল মুগ্ধিত আবেষ্টনীর মধ্যে এসে উপার্জনের আশ্রয় নিতেন। তিনি তো সে পথে এলেন না, গৃহধর্ম নিয়ে রইলেন সর্বপ্রকার দারিদ্র্য লাঞ্ছনা সহ্য করে, হয়তো এই হিসেবে পাছে স্বামীর মুখ হেঁট হয়।

বিনায়কের গল্পটিতে নিজেদের জীবনের অভিব্যক্তি আর বর্তমান সমাজের আলোচ্য ফুটে উঠেছে। গল্পের উপসংহারটি বিরলে পড়ে সানন্দা নিজের মনে বললেন—‘বেশ তাই হবে’—এত বড় আঘাত পেয়েও যে তিনি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারলেন এটাই লক্ষ্য করার বিষয়। জীর মনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের সঙ্গে বিনায়কের পরিচয় ঘটবার কোন স্বযোগই হোলো না।

সানন্দা বিনায়ককে বুঝতে দিলেন না উনি কোন পথ দিয়ে তাঁর জীবনের ভাঙা রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

দিনের পর দিন এম্মি ভাবেই চলে যায়, বিনায়ক বুঝতে পারে না সানন্দার কোন পরিবর্তন, বরণ ও লক্ষ্য করতে থাকে যেন সানন্দা পূর্বের চেয়ে ওকে গভীর ভাবে ভালোবাসায় আবেষ্টন করেছেন। জগতের এমনই অদ্ভুত গতি আর বিধাতার এমনই লীলা-বৈচিত্র্য যে, কোন কাজ চিরদিন গোপনে থাকে না, একদিন না একদিন তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

জৈশরগোয়র ভেতর ঝঙ্কাবাদলের সাথে সাথে একটি বৎসর চলে গেছে ঋতুদের নব নব পর্যায়ে উৎসব সমারোহ নিয়ে, তবে আশ্চর্য্য এই যে, বিনায়ক লক্ষ্য করে তার সংসারের সর্বদিকে কমলার প্রসন্ন দৃষ্টি, পূর্বের মত অভাবের তাড়না নেই। এর যে কি কারণ এই আপন-ভোলা তরুণটি আদৌ অলুসকান করলো না।

এদিনও রবিবার। ছপূরবেলায় সানন্দা আহাতিদি শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝেতে বিছানো মাদুরের ওপর। পাশের ঘরে বিনায়ক বসে গল্প লিখছিল তন্ময় হয়ে। একটি বারো তেরো বছরের ফুট ফুটে মেয়ে এসে বললে—‘দিদিমণি আছেন?’—

একাত্তিকবার ডাকের পর বিনায়কের কাণে গিয়ে সে কথা পৌছলো।

বিস্মিত হয়ে বললে—‘দিদিমণি?’

মেয়েটি বললে—‘আমাদের ভারতী ইনষ্টিটিউশনের হেডমিস্ট্রেস’—

—‘হেডমিস্ট্রেস! তুমি বোধ হয় ভুল করেছ খুকি, এখানে তো!’—

মেয়েটি কথায় বাধা দিয়ে বললে—‘তিনি এখানেই থাকেন—’

—‘নাম কি বলো তো?’

—‘মিসেস সানন্দা রায়’—

ওর কথায় বিনায়ক অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। ও যেন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললে কোন্ স্বদূরে ভারত অতীত তীরে। ক্ষণকাল স্তব্ধতায় অবগাহন করে

গাভীর্ষ্য অক্ষয় রেখেই ও বললে—‘তাকে কেন বলো তো?’—

মেয়েটি মুহূর্তে বললে—‘আমার এ্যাক্সয়েল একজামিনের ফাষ্ট পেপারের নম্বরটা জানতে এসেছি’—

—‘কি রকম পরীক্ষা দিয়েছ? পাস করতে পারবে তো!’

—‘স্ববিধে নয় স্যার, তাই ভয় হচ্ছে—’

—‘এসো আমার সঙ্গে’—

বিনায়ক সানন্দার ঘরে গিয়ে ঢুকে তাঁর ঘুম ভাঙলো।

বললে—‘তোমার এক ছাত্রী এসেছে, ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—’

সানন্দা কোন কথা না বলে তাকে ঘরে আসতে বললেন। বিনায়ক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, কিন্তু ওর গল্প লেখা হোলো না। সানন্দাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে ওর মনের বিভিন্ন ভাব-ভাবনার উপনিবেশ গঠন।

মেয়েটি চলে গেলে বিনায়ক বললে—‘সত্যি সানন্দা! তোমার বুদ্ধির কাছে আমি হার মেনেছি—পৌরুষ আর মাধুর্য্য দু’ধারাতেই আমার জীবন ক্ষেত্রকে প্রয়াগ তীর্থ করে তুলেছ—’

স্বামীর কোলের ওপর মাথা রেখে সানন্দা বললেন—‘কিন্তু তোমায় সেই শারদীয়া সংখ্যার ‘ভুলের ফসল’র পরিণতিটাকে এ্যামেণ্ড করো, অমন করে আমার জীবনের ওপর কলঙ্কের দাগ টেনে দিও না—’

বিনায়ক সানন্দাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন বদ্ধ করে উঠকঃস্বরে হেসে উঠলো।

তখন সূর্যের উত্তরাংশ পথে পরিক্রমা করেছে। রাতায়ন পথে তার আলোর ছটা প্রবেশ করে সানন্দার রক্তিম মুখখানি স্নানরতর করে তুললো।

“যা ছিল মোদের”

শ্রীবীরেন্দ্র দাশগুপ্ত

হে পবিত্র বঙ্গভূমি ! তব বক্ষো'পর
সহসা হেরিছ আজি একি ভয়ঙ্কর
দানব-তাণ্ডব নৃত্য ! অসির ঝঙ্কারে
নির্ব্যাতিতা রমণীর আর্ত হাহাকারে
বাখিত ধরণীতল, পুরবাসীগণ
হুর্কৃন্তের করে সহি' লাঞ্ছনা ভীষণ
লুপ্তিত ভূতলে—যথা ঘোর ঝঙ্কারে
উৎক্ষিপ্ত কদলীদল ।

তপ্ত অশ্রু পাতে
প্রাবিত তোমার বক্ষ, হে বঙ্গ জননী ।
উঠিছে জগৎব্যাপী ক্রন্দনের ধ্বনি
বাল, বৃদ্ধ রমণীর । শোণিতের স্রোতে
ভাসিয়া চলেছে দিক্-দিগন্তর হোতে
ছিন্নশির নরদেহ । হাসে অট্টহাসি
হিংস্র শৃগালের মতো শোণিত-পিয়াসী
ক্ষিপ্তোন্মত্ত দম্ভ্য-দল প্রলয় উল্লাসে ।
গঞ্জিয়া ভৈরব রবে উঠিছে আকাশে
প্রজ্জ্বলিত দীপ্ত বহি । কুটির কুটিরে
নিমেষে করিছে ভস্ম নিঃস্ব বাঙ্গালী
ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতে ।

নাশি' শত্রুদলে
কে আছে এমন বন্ধু সিদ্ধ হিমাচলে
বাঁচাইতে এ ছুড়িনে । হও আশ্রয়ানু,
যেখানে যে আছ মা'র বীর স্নসন্তান
শাণিত কুপাণ হস্তে জয় জয় রবে

সজ্জিত সমর-সাজে ছুটে এসো সবে
কাল-কৃতান্তের মতো । করো এই পণ
কিরিয়ে আনিতে হবে নাশি শত্রুগণ
আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গজননীকে ।
অঙ্কিত করিতে হবে লুপ্ত সে ছবিরে
নিখিলের ভালে ।

যাহা ছিল একদিন
কালের প্রবাহে আজি হোয়ে গেল নীন
মুছে গেল চিরতরে । যে সোনার গাঁয়ে
প্রতি ঘরে, প্রতি আঙিনায় আঙিনায়
আলিপনা চিত্র আঁকা বিচিত্র শোভাতে
পবিত্র তুলসী মঞ্চোপরে দীপ হাতে
প্রণমিয়া ভক্তিভরে পূরান্নাগণ
করিত প্রার্থনা, কত ব্রত উদ্‌ঘাপন
বারোমাস ধরি,' সেথা প্রভাতে সন্ধ্যার
শেফালি, চামেলি, বেলা, রজনীগন্ধায়
ভরি ডালা, গাঁথি' মালা কুলবালাগণ
পরাতো দেবতা গলে, করি দরশন
সে অপূর্ব শোভারানি, আনত মস্তকে
দেবতা করিত নতি উৎসাহে পুলকে ।
আবার দেখিব মোরা মায়ের সে হাসি'
ভাই ভাই একত্রে মিলিব আসি
জননীর ক্রোড়ে ।

* অন্ধ-আলোক নিকেতন ।



বিদ্যাবৃত্তং যশস্বত্ত্বং লক্ষ্মীবৃত্তঞ্চ গ্রাং বৃত্ত-
দেপং দেহি, জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি
দেহি সৌভাগ্যদোপং দেহি দেবি পুং সুখম্
দেপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি

★

যা দেবী নরোত্তমো জাতি দোষণ সংহিতা
নরোত্তমো নরোত্তমো নরোত্তমো নরো নরো



হিন্দুস্থান

কো-ম্পার্টেট ইন্ডিওলজ
মোমাইটি, লি: হিন্দুস্থান হিন্ডিং, কলিকতা

স্বাধীনতার দান

ক্রীষোংগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(তৃতীয় প্রস্তাব)

হিন্দু ও মুসলমানদের কথা আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। প্রথম কথা এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ত কংগ্রেসের নেতারা আন্দোলন করিলেও তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছিল বাস্তবতার অভাব। কল্পনা ও কথা দ্বারা জাতি গড়িয়া উঠে না। তাহাকে গড়িতে হইলে যে কাঠামোর প্রয়োজন তাহার মধ্যে বিরাট ব্যাপকতা বা জনসাধারণকে উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা বা দীক্ষা বা ক্লেশসহ কর্ম্মার ছিল একান্ত অভাব। বক্তৃতার দ্বারা এবং প্রস্তাবনার দ্বারা দেশের কল্যাণ হয় না। কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার মত যোগ্যতা ও শক্তি আমাদের ছিল না। নেতারা কোন দিন ভাবেন নাই দুই জাতিদের পরিকল্পনা। ভাবিয়াছেন, তাঁহারা বক্তৃতার দ্বারাই দেশ উদ্ধার করিবেন এবং জাতিধর্ম লইয়া কোনও কলহ এবং অশান্তি হইবে না। কেননা ধর্ম ও জাতি সম্প্রদায়গত, তাহার সহিত ভারতবর্ষের জাতীয়তার বা অখণ্ডত্বের অভাব অব্যাহীন। প্রাদেশিকতার বিভিন্ন মনোবৃত্তি লোপ পাইবে এবং তাঁহারা অখণ্ড ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিবেন। পারিতেছেন না শুধু ইংরাজের জন্ত। সে স্বপ্ন যে কতবড় মিথ্যা তাহা বাঙ্গালী বিশেষ কবিয়া বুঝিয়াছে। বাঙ্গালী দুর্বল, ভাবপ্রবণ এবং তাহাদের মনোবৃত্তি ও কলহপ্রবৃত্তির দরুন প্রত্যেক কাজের ভিতরই তাহাদের উচ্ছ্বাস ও উন্নাদনা ও মতভেদ প্রবল। ফলে—আজ তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষেই গুরুতর সন্দেহ আসিয়া পড়িয়াছে। পরস্পরের নিন্দা, কলহ করা ও নিয়ম শৃঙ্খলা না মানিয়া চলাই হইতেছে এই জাতির বিশেষত্ব। অজ্ঞাত প্রদেশের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে বাঙ্গাল দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির মনোবৃত্তির একটু পরিচয় দিতেছি। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের 'বাঙ্গাল' বলিয়া হেয় মনে করা এবং করিবার চেষ্টা বহু দিন হইতেই

চলিতেছে। বেশী দূরে যাইতে হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন কেমন করিয়া বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতেও বিদ্বেষের আগুন প্রধূমিত হয়। কেমন করিয়া একে অপরকে ঘৃণা করিবার মত ইন্ধন যোগায়।

উক্তর শ্রীকুমার সেন এম. এ. পি-এইচ. ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিয়াছেন—আদি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত। এ বইখানির প্রথম সংস্করণের ৬ পৃষ্ঠায় সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—“রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে আৰ্য্য সংস্কৃতি আসিবার অনেক কাল পরে, সম্ভবতঃ এই দুই স্থান হইতে, বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে ইহা বিস্তার লাভ করে। এই কারণে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যথেষ্ট পশ্চাৎপদ থাকায় পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল', আবহমান কাল সাহিত্য ও লোক-ব্যবহারে উপহাসের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে।” আবার ১২ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলাদেশে আৰ্য্যভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন : “সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে চীনের পরিব্রাজক হিউ-এন-ৎ সাঙ বাঙ্গলাদেশে পরিভ্রমণের সময় গোড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা বলিতে শুনিয়াছিলেন। হিউ-এন-ৎ সাঙের পর্যবেক্ষণ অত্রান্ত হইলে, আমরা বুঝিতে পারিব, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আৰ্য্যভাষা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ীয় ভাষা সমূহকে বাঙ্গলাদেশের কেন্দ্রীয় স্থানসমূহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া বাঙ্গলাদেশের জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।”

আপনারা যদি এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্য পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন 'সম্ভবতঃ' শব্দের ব্যবহার দ্বারা আৰ্য্য সংস্কৃতি রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমি হইতে বঙ্গে অর্থাৎ

পূর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করে—আবার “পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যথেষ্ট পশ্চাৎ পদ থাকায় পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বাঙ্গালী উপহাসের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এবং আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।”

ইহা অতিশয়োক্তি। বোধ হয় লেখক বাঙ্গলার ইতিহাসই ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন নাই। যদি বাঙ্গলার ইতিহাস ভাল করিয়া জানিতেন তাহা হইলে অপর্যায়কে এইরূপ হস্তান্তর করিতেন না এবং পূর্ববঙ্গবাসীকে এত বিক্রপ করিতেন না। ডক্টর স্কুয়ার সেন মহাশয় যদি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিতেন তাহা হইলে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরাই শুধু নহেন—পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাও বঙ্গাল এবং বাঙ্গাল পর্যায়ে পড়েন। কেননা—“The original name of Bengal was *Bang*. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty in breadth throughout the province which were called ‘al’ From this suffix, The name Bengal took its rise and currency.”—আমরা এ বিষয়ে বিতর্ক এই প্রবন্ধে করিব না, কেননা তাহা অনাবশ্যক। শুধু তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengal vol I Edited by R. C. Mazumdar, রাখাল বাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস এবং বাঙ্গলা দেশ সম্পর্কিত যে সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা একবার দেখিতে অনুরোধ করি। ডক্টর সেন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার পক্ষে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ অসমীচীন। যদি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব হইতে আর্যভাষা অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়ীয় ভাষা সমূহকে বাঙ্গলা দেশের কেন্দ্রীয় স্থান সমূহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া বাঙ্গলা দেশের জাতীয় ভাবরূপে দাঁড়াইয়া থাকে, তবে সে বাঙ্গলা দেশের সীমা কতদূর পর্যন্ত ছিল এবং কোন্ কোন্ বিভাগ লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং সে কোন্ শতাব্দীতে তাহার সময় ও কালের তিনি কোন নির্দেশ করেন নাই। স্কুয়ার বাবুর ছায়া একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ছায়া-সঙ্গত হয় নাই। এইরূপ অপপ্রচার দ্বারাই দেশে অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে; যাহা প্রমাণসহ নহে এবং যে বিষয়ে

তিনি কোথাও সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলিতে পারেন নাই সেখানে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ শোভন ও সুসঙ্গত নহে। এই বইখানি বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্য এবং (এখন অবশ্য বাঙ্গলার) পূর্ববঙ্গের ছাত্রেরাও গলাধঃকরণ করিয়াছে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, তাহার আর প্রয়োজন নাই। এখানে শিক্ষিত ব্যক্তির মনোভাবের পরিচয় দিলাম।

যে কথা বলিতেছিলাম। ইংরাজ আমলের মুসলমান জাতি আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা করিতে পরাজয় হয় নাই। জাতিগঠনের জন্য লোক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা মুখে ও ভাষায় বলিয়াছি, কাঁধে কিছু করি নাই। মুসলমানদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী হইলেও তাঁহাদের মৌলভী মোল্লারা মসজিদের বৈঠকে একতাবদ্ধ হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, ধর্মের কথা শুনাইয়াছেন। অতীত ইতিহাসের কথা নাই বলিলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাই বলিতেছি। মুসলমানেরা ধর্মপ্রচার দ্বারা কত হিন্দুকে যে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা বড় কম নহে। ১৮২০-২২ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ নামে একজন মুসলমান ওহাবিমতের প্রচারক—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের শাসন উপেক্ষা করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু ব্যক্তিকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; এমন কি, স্বতন্ত্র ভাবে শাসন-সংরক্ষণের ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। হার্টার সাহেব তাহা বলিয়াছেন।

কলিকাতা সহরের নিকটবর্তী এক পল্লীতে তিতুমিঞা নামে একজন মল্লবীর ও মুষ্টিযোদ্ধা ছিল, সে ব্যবসায়ী ব্যায়ামবীর ছিল। তার বাড়ী ছিল বারাসত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রাম। তিতুমিঞা ওরফে নিশার আলির মত দুর্দান্ত ব্যক্তি বা গুণ্ডা সেকালে বড় কম ছিল। তিতুমিঞা বা নিশার আলি সেকালে একজন বিশিষ্ট লেঠেল সর্দার হইয়া দাঁড়ায়। জমিদারেরা আবশ্যক মত তাহাকে নিজ নিজ জমিদারীর সীমানা সংরক্ষণে বা জমি দখল করিবার কাজে নিযুক্ত করিতেন। এই সব দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকিবার ফলে তাহাকে একবার জেলে যািতে হয়। জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর সে মক্কা-শরিফে হজ করিতে গেলে, সেখানে ওহাবি সম্প্রদায়ের সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, সেখান হইতে দেশে ফিরিয়া

আসিয়া কলিকাতার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বহু-নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুকে সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। সে দেশ মধ্যে এক দারুণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই তিতুমিঞা বা তিতুমীর সম্বন্ধে আমি কিছু দিন পূর্বেও 'কৈশোরক' পত্রে আলোচনা করিয়াছিলাম। সে বাহা হউক তিতুমীরকে দমন করা সহজ হয় নাই। সে বাণেশ্বরকে কল্লা তৈয়ার করিয়াছিল। তাহার অত্যাচার যখন অত্যন্ত বেশী রকমের হয় তখন তাহাকে দমন করিবার জন্ত একদল দেশী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তিতুমীরের সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যদলের যুদ্ধ হইল। তিতুমীর স্বকৌশলে অপূর্ণ বীরত্বের সঙ্গে তাহার দলকে পরিচালিত করিয়াছিল। তিতুমীর যুদ্ধ করিতে করিতেই প্রাণ হারাইল। বিদ্রোহী সৈন্যেরা প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর এই যুদ্ধ হয়। ইহাতে কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্যও নিহত হয়। তিতুমীর ও তাহার দলের প্রায় ৫০০ শত অল্পচর গ্রামে গ্রামে লুণ্ঠরাজ গো হত্যা এবং নরহত্যা করিয়া চারিদিকে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিতুমীর কোন শ্রেণীর দেশপ্রেমিক, কি প্রকৃতির লোক, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

উনবিংশ শতাব্দীতেও এইরূপ সাম্প্রদায়িক অশান্তি স্বভাৱে ব্রিটিশ শাসনেও বহুবার হইয়াছে। তিতুমীর ভারতবর্ষীয় ওহাবি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সৈয়দ আহম্মদের সহিত মক্কাশরীফে মিলিত হইয়া যে উপদেশ লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলে দেশে আসিয়া আপনাদের ফরাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে এইরূপ ভাবেই বাঙ্গলা দেশের উপর বিবিধ অশান্তিজনক সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিয়াছে এবং দেশের শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে। হিন্দু উৎপীড়িত হইয়াছে।

ইংরাজ বিদেশী রাজা। তাহারা নিজ সাম্রাজ্য দৃঢ় করিবার জন্ত যদি ভেদবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশবাসী হিন্দু মুসলমান কেন সেই কুটকৌশলে আপনাদের সর্কনাশ করিল? তিতুমীরের দৃষ্টান্ত দিলাম শুধু এই জন্ত যে শক্তিশীল বাঙ্গালী হিন্দু চিরদিনই কাপুরুষতার আশ্রয় লইয়াছে। কোথাও আপনাকে সম্মুখ করিতে পারে নাই। এখনও নহে। অতীতের কথা

বলিয়া লাভ নাই। পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের বিষয়ে আলোচনা করিব এবং পরে আবার বর্তমান বিষয়ে আলোচনা করিব।

প্রথমে মুহম্মদ আলী জিন্নার কথা বলিতেছি। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জিন্নার জন্ম। করাচীতে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা। ধনী খোজা পরিবারের সন্তান তিনি। বিদ্যাশিক্ষা, আইন ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয় এখানে আলোচনা করিব না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে করাচীতে যখন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, সে অধিবেশনে জিন্না বলিয়াছিলেন: "আপনারা জানেন না, করাচীর এই কংগ্রেসের অধিবেশনে আসিয়া আমার কিরূপ আনন্দ হইয়াছে। করাচী সহরে আমার জন্ম। আমি এই সহরে পদার্পণ করিয়া আমার সেই পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের, বাহাদুরের সঙ্গে এক সময়ে খেলাধুলা করিয়াছি, তাহাদের দেখিয়া অসীম আনন্দ বোধ করিতেছি।"

জিন্না, মহাত্মা গান্ধীর ছিলেন একান্ত অনুরাগী। গান্ধীর মৃত্যুর পর ১৯১৫ সালের সে মাসে বোম্বাই নগরীতে যে শোক সভা হয়, তাহাতে জিন্না বলিয়াছিলেন: "We mourn the death of Mr. Gokhale so deeply with the rest of India that I have no words at my command to adequately express our deep sorrow and grief. He was respected by the Mahomedans and Hindus alike and trusted by both." জিন্নার জীবনী লেখক বলেন, জিন্না গান্ধীর প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাবান ছিলেন যে তিনি "The Muslim Gokhale" এই উপনাম অর্জন করিবার জন্ত ব্যগ্র ছিলেন; গান্ধীই ছিলেন তাহার পুরাকালের আদর্শ। একথা যে কতদূর সত্য তাহা ১৯২৫ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় Indian Finance-Bill সম্বন্ধে আলোচনা কালে জিন্না যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই উপলব্ধি হয়। জিন্না বলিয়াছিলেন—"আমি কোন পদের প্রার্থী ছিলাম না এবং প্রার্থী নই। আমি এখানে সম্পূর্ণ সরলভাবে বলিতেছি যে আমি সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী। আমি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া

এই ব্যবস্থাপক গৃহে হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আলোচনার দ্বারা সভার গাভীয়া বিনষ্ট করিবেন না। আহুন আমরা আমাদের এই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এমনভাবে গড়িয়া তুলি যাহাতে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভারতের জাতীয়তা সংরক্ষণের উপযোগী হয় এবং এমন ভাবে এমন আদর্শে ইহাকে গড়িয়া তুলিব যাহাতে পৃথিবীর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমাদের দেশের লোকেরাও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।” বিলাতের ভারতীয় ছাত্র সমাজেও তিনি এই আদর্শবাদই প্রচার করেন।

মিঃ জিন্না বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে প্রথমেই কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং প্রকৃত পক্ষে একজন গোঁড়া কংগ্রেসী ছিলেন। গোথলে, দাদাভাই নৌরজী, স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির রাজনৈতিক আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া ছিলেন। একবার ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না বলিয়াছিলেন :—“আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, রাজনীতি ক্ষেত্রে আর স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রথম গুরু। আমি নিজেকে তাঁহার একজন শিষ্যরূপেই মনে করি, এবং আমি তাঁহাকে দেশবরেণ্য নেতারূপে শ্রদ্ধা করি। স্বরেন্দ্রনাথ এদেশের বহুলোকের শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত নেতা এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। চিত্তরঞ্জন দাশ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তিনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁহার আতিথেয়তা আমি আনন্দের সহিত ভোগ করিয়াছি, এবং অনেকদিন তাঁহার সহিত একসঙ্গে কাজ করিয়াছি; আমি আরও বলিতে চাই যে আর স্বরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ, ইহারাই হইতেছেন দেশের বরেণ্য নেতা, মুসলমানেরাও ইহাদের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান, মুসলমান নেতাদের প্রতি মুসলমানেরা যেরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখেন, এই দুইজনের প্রতিও মুসলমান সমাজের তেমনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। আমি এই দুইজন মনীষীর রাজনৈতিক আদর্শ হইতে ইহাই বুঝিতেছি যে একাই হইতেছে মুক্তির পন্থা।” এক সময়ে জিন্নাকে ‘Ambassador of unity’—জাতীয় এক্য বিধানের আদর্শ দূত বা শান্তির দূত আখ্যা লোকে দিয়াছিল।

জিন্না প্রাচীন ব্যবস্থাপক সভায় ও নবসংস্কারযুক্ত ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুসলমানের উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন।

মুহম্মদ জিন্নার কার্যাবলী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই তিনি ভারতের মুক্তিকামী এবং হিন্দু মুসলমানের মিলন দ্বারা এক মহাভারত সৃষ্টি করিতেই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন, এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিতেন, প্রত্যেকটি দেশহিতকর কার্যেই ছিল তাঁহার অথও মনোযোগ। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, আইন জ্ঞান। হিন্দু মুসলমানের একসাধন প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অধিভূমিক। সরোজিনী নাইডু জিন্নার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, “Hindu by race and Moslem by religion” কি প্রেস এক্ট (The Press Act), কি গভর্নমেন্টের আচরণ, কি ছাত্র সমাজ, প্রত্যেকটি বিষয়ে ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং মিলনাকাঙ্ক্ষী এবং এক্যপন্থী মনোভাব। বোম্বেতে ‘Moslem students union’এ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমাদের সব চেয়ে বড় কথা হবে নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলা, এবং আত্মপ্রত্যয়। তারপর জিন্না বলিয়াছিলেন :—“তোমাদের প্রধান কর্তব্য হবে মৈত্রী এক্য এবং পরস্পরের সহযোগিতা। সে যেমন মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে চাই, তেমনি চাই ভারতের সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর। এদেশের সর্বজাতি ও সর্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য সাধনা হউক তোমাদের মূলমন্ত্র। পুরবাসী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, তোমাদের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইলে পর তোমরা অগ্ন্যাজ্ঞা জাতি ও সম্প্রদায়ের সহিত তোমাদের কর্তব্যের অংশ গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনোভাব ও কার্যপ্রণালী বুঝিতে যত্নবান হইবে। ইহাই হইতেছে দেশের প্রকৃত উন্নতির পন্থা। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এই কথাটি অবধারণ করা উচিত যে অন্ধৈক্য ও মতভেদ এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ দ্বারা দেশের কল্যাণ অসম্ভব। দেশের প্রকৃত উন্নতির মূলমন্ত্র হইতেছে এক্য।”

যখন All India Moslem League স্থাপিত হইল— তখন জিন্না কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তাহা হইতে দূরে ছিলেন। এইরূপ উদারমতাবলম্বী দেশনেতা কংগ্রেস সদস্য জিন্না কেন কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন তাহা আলোচনার যোগ্য। যিনি একসময়ে 'The Bengal Ordinance' এর বিরুদ্ধে অতি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার 'পাকিস্তান' গঠন করিবার জন্ত আগ্রহ এবং দুই জাতিত্ব (Two Nation Theory) প্রতিপাদন করিয়া রাষ্ট্রগঠন আশ্চর্যের বিষয় নহে কি?

কেন এমন হইল তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। যিনি অথও ভারত-রাষ্ট্র গঠন প্রয়াসী ছিলেন—সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন—যাহার কণ্ঠ হইতে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়াছিল—“In unity lies salvation” তাহার কেন এইরূপ মত পরিবর্তন হইল, সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু যদি ধীরভাবে আমরা

এ বিষয়ে বিবেচনা করি, তাহা হইলে একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি—একদিকে ইংরাজের তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কুটিল কৌশল বিস্তার এবং অত্যাচারে কংগ্রেস নেতাদের দূর দৃষ্টি, উদারতা এবং মহানুভবতার অভাব—তাহারই ফলে জানিনা কত কালের জন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের একটি অথও রাষ্ট্ররূপে বিদ্যমান থাকিবার আশা বিদূরিত হইল।

এ প্রসঙ্গে আমাদের নিরপেক্ষভাবে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিয়া আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি, মোসলেম লীগ ও কংগ্রেস—পরস্পরের মতভেদ এবং আদর্শের বৈষম্য, মুসলমানদের সহিত একা স্থাপনের চেষ্টা, ব্যর্থতা, ব্যর্থতার কারণ, ভারতের একত্ব বিধান বা একরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং বিরোধিতার মূল স্তত্র কোথায় তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে।

তোমার পূজা

শ্রীকালিদাস রায়

তোমারে হারাই পূজার আড়ম্বরে

উপচার খুঁজে-মন মোর ঘুরে-মরে।

ধূপের ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পা দুখানি।

ঘণ্টা কাঁসর ডুবায় তোমার বাণী।

তোমার ভোজ্য তোমার সজ্জা বাস,

আমার পূজ্য হয়ে উঠে বারো মাস।

মন্দির তব যে টুকু অর্ঘ্য পায়,

তার শতাংশ তব পদে নাহি যায়।

দিনদিন 'হায় করি' তোমা অবহেলা,

করিতেছি আমি শুধু পূজা পূজা খেলা।

সরলা দেবী

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী।

সংক্ষেপে কয়েক মিনিটের মধ্যে মাননীয়া সরলা দেবীর জীবনী বলতে বলা হয়েছে। কোনো মানুষের জীবন কতগুলি কর্মের তালিকা বা 'ক্যাটালগ' নয়, যে কতগুলি ঘটনা মাত্র দিয়ে যেমন, তিনি ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন, বীরশ্রমী ব্রত প্রচলন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বলে গেলেই সেই জীবনের কথা কিছুমাত্র আমাদের মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যে সমস্ত বিরাটভাবে আনন্দে আবেগে উত্তেজনার এই বীরহৃদয়া নারী-চিত্ত তখনকার কালের মধ্যে অনুশাসনাধারণ হয়ে উঠেছিল জীবনের সেই প্রবল শক্তিকে কতগুলি ঘটনার ফিরিস্তি দিয়ে হুঁচকার মিনিটে প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেক মানব জীবনের বিশেষ একটি রূপ আছে। সেই রূপটি তার কাজে কথায় বেশে-ভূষায় চলনে ধরণে প্রকাশে অনুভবে তার বিশেষ ভঙ্গীটা আনে, তাকেই আমরা বলি তার ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশমান, তবু সেই ঘটনাগুলি মাত্র দিয়েই সেই ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করা যায় না। ঘটনাকে ছাড়িয়ে তা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে মানুষের জীবনের সমগ্রতায়। যে কোনো মানুষকে বুঝতে হলে সেই সমগ্রতার অনুভব দ্বারা তার ব্যক্তিত্বের রূপটি দেখতে পাওয়া চাই। নৈলে শুধু ঘটনা সমাবেশে ইতিহাস যদি বা হয় জীবনী হয় না। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী তাঁর অল্পবয়সে রচিত 'আহিতাগ্নিকা' নামে একটি কবিতায় নিজের অন্তরের রূপটি উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

“সর্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ—

পথ যে দুর্গম একারন—

স্বতীত্র দিবস আর স্বদীর্ঘ শব্দী

অপ্রকম্পাচিত, সর্বভয় পরিত্তরি

পারিবে কি যেতে? রে স্থূলানিতা

দুরাশা চালিতা।

পারিবে নাথিতে শক্তি রিপু নির্বহণা

লোক হাস, ভয় লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা

সহিবে প্রশান্ত চিতে?

অগ্নি আহিতাগ্নিকা অতি সাহসিকা!

যে অগ্নি জালিলে আজি

চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহা?

উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা।

প্রাণাহুতি দিবে তায়। আত্ম বিসর্জন

নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন

সঙ্কল্প অটল রবে, হবে চিরধন্য

অগ্নি বীরমত্তা।

... ...

যদি ঝড় ঝঞ্ঝা উঠে বক্ষ মাঝে

অঞ্চল আবরি

অগ্নি রাখি দিও জাগি সারা বিভাবরী—

আর সব নারী ভবে প্রিয় পরিজন—

ভূমি রহ প্রয়োনিষ্ঠ ব্রত পরায়ণ—

অনাকুলা, অনলসা, স্বকঠোর জপা

দুট পরস্তপা।”

যে তেজবহি এই আহিতাগ্নিকা নারী হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তার সূচনা তাঁর দেশ প্রসিদ্ধ মাতামহ বংশে। মহাবিদেব সম্রাটের মত যে পরিবারের কর্তৃত্ব সমাসীন সেই পরিবারের স্ত্রীপুরুষ অনেকেই অগ্নি বহন করেছেন আত্মায়। সেই বিরাট তেজস্বী পুরুষের বংশধরদের অনেকেই নানারূপে উজ্জ্বল। কেউবা ক্ষুণ্ণ, কেউবা উর্দ্ধমুখী দীপ্তশিখা, কেউবা প্রদীপ্ত ভাস্কর। একটা বিশ্বয়ের ব্যাপার এই যে সরলা দেবীর এই জীবন চরিত পড়লে তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত মাতুল রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার বর্ণনা মনে পড়ে এবং লক্ষ্য হয় যে উভয়েরই শিশুকালে শিক্ষা ব্যবস্থা একই রকম ছিল, অর্থাৎ ১০৮০ বৎসর পূর্বের সেই বাঙালী পরিবারের ছেলেতে মেয়েতে শিক্ষা পদ্ধতির

বিশেষ পার্থক্য ছিল না। যার ফলে এই তেজস্বিনী নারী চিত্ত উজ্জল হয়ে উঠতে পেরেছিল, নানাদিক থেকে দেশকে আলোকিত করতে পেরেছিল।

সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা, মাসিক পত্র চালানর ক্ষমতা দুইই অসাধারণ। আজকের দিনেও মহিলাদের পরিচালিত ভারতীয় মত পত্রিকা বাংলা দেশে নেই। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যে দর্শনে শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, বিপুল উচ্চারণে সংস্কৃত পড়া প্রচলন করতে ব্যস্ত, অতীতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী পদক প্রাপ্ত মহিলা গ্র্যাজুয়েট—তখনকার দিনে যা মোটেই স্বভাব ছিল না। সরলা দেবীর সঙ্গীত সাধনা এখনকার যুগের মত পল্লবগ্রাহী ছিল না। ঐ বিচার মর্মে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। দেশ বিদেশ থেকে কত স্বর সংগ্রহ করে তিনি তাঁর মাতুলের চরণে অঞ্জলি দিয়েছেন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে প্রচলিত নানা স্বর সংগ্রহ করে নূতন নূতন স্বর তৈরী করে তাঁর মাতুলের তুষ্টি বিধান করেছেন। সরলা দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

“প্রাণের গভীরে আমার যে স্বরদেরতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে নিত্য হৃদয়ানুগে পুষ্ট সাধনা করে তাঁর দ্বারা আমারও পুষ্ট বিধানের হোতা হলেন রবিমামা।” এই প্রসঙ্গে বলা যায় বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রথম দুই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বর সংযোগ করেন ও তাঁরই আদেশে সরলা দেবী বাকি—অংশে স্বর দিয়েছিলেন। তারপর বহু জাতীয় উৎসবে বহুজনকে গাইতে শিখিয়েছেন। ঐ ভাবে প্রথমে বাংলার পরে সারা ভারতবর্ষে ঐ গানটিকে মন্ত্র করে তুলতে সরলা দেবীর কণ্ঠস্বর অনেক সাহায্য করেছে। তিনিই প্রথম সপ্তকোটির স্থলে ত্রিংশ কোটি করে বেনারস কংগ্রেসে এই গান গেয়েছিলেন। এই ত্রিংশ কোটি করা থেকে তাঁর সর্ব ভারতীয় মিলন ইচ্ছাটি প্রকাশিত। তাঁর রচিত: “অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী”র মধ্যেও এই ভাবটি দেখা যায়। এই ভাবই মহাজাতি গঠনে সাহায্য করে।

মহিষী নাকি বলেছিলেন “সরলা যদি অঙ্গীকার করে জীবনে কখনো বিবাহ করবে না—তবে আমি তাঁর তলোয়ারের সঙ্গে বিবাহ দিই।” এই রোম্যান্টিক প্রস্তাবটি কিন্তু অনেক দিক থেকে সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবনে। প্রথমতঃ যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল তিনি স্বয়ং একটি খোলা

তলোয়ার দ্বিতীয়তঃ এই বীর নারী ভার নিলেন বীর হস্তে তরবারী দেবার। দেশকে শৌর্য্যে বীৰ্য্যে উদ্বোধিত করা শক্তি সাধনায় নিযুক্ত দেশ-প্রেমিকদের প্রেরণা যোগান, বীরাষ্ট্রমী ব্রত প্রচলন, প্রতাপাদিত্য উৎসব সবই এক একটি অভিনব স্থিতি। প্রতাপাদিত্য উৎসবে লাঠি খেলা তলোয়ার খেলা নানা রকম কুস্তী খেলার শেষে যে মেডেল পুরস্কার দেওয়া হত তাতে খোদা থাকত “দেবোঃ দুর্জয়ল ঘাতকঃ”—স্বহৃদ সমিতি অহুশীলন সমিতি প্রভৃতি নানা শক্তিসাধক মণ্ডলীর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বীরাষ্ট্রমী ব্রতটিও একটি সার্থক উৎসব। মেয়েরা নিজ হাতে অষ্টমী তিথিতে ‘বীরোত্তর’ বলে সাজিয়ে দেবে। পুরাণে উৎসবের রীতিকে নূতন প্রয়োজনে উদ্ভূত করতে পারার ক্ষমতা ঠাকুর বাড়ীর একটি অভূত বিশেষত্ব, এদেশকে যা নানাদিক থেকে স্বন্দর করেছে। উৎসবের সঙ্গে বলবীৰ্য্যকে জাগিয়ে তোলা সেকালের ভীকতা অপবাদক্লিষ্ট বাঙ্গালীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। এইরূপে স্বাধীনতা লাভের জন্ত বলীমান শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলবার জন্ত কায়মনোবাক্যে নিয়োজিতা হলেও দুর্নীতি, হত্যা ডাকাতি প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেবার হজুগ তাঁর adventurous মনকেও আক্রমণ করতে পারে নি।

যদিও সেই adventurous মনোবৃত্তির বলেই পাঞ্জাবের সেই দারুণ দুর্দিনেও অবিচলিত থেকে স্বরলিপি করে জালিওনালাবগের কাহিনী প্রথম সেন্সারের দুর্গ ভেদ করে পাঠাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

এই কৌশলী প্রতিভাশালিনী নারী যে ভাবে সমস্ত দেশের মধ্যে বলচর্চার উৎসব ও প্রচেষ্টা জাগ্রত করে তুলেছিলেন তা অভূতপূর্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎসম্বন্ধে ঐ ভাবে এক পেশো হয়ে তিনি যান নি। অন্তরে বুঝেছিলেন যতই তাঁরা শক্তি সাধিকা হন শরীরের শক্তিই একমাত্র নয়—বলং বলং বাহু বলং বটে—কিন্তু চরম নয়—কারণ বলাবলং বিনাশ্চত্যা ভপোএব পরম্ বলম্। সেই তপস্তার বল সংগ্রহ করতে অল্পসঙ্কানী হলেন। বিবেকানন্দের প্রভাব এল তাঁর জীবনে। তিনি নাকি বলেছিলেন—“সরলার education perfect হয়েছে।” এই বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা করে এই সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করব। সরলা দেবী যে নানা

বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন সেই তাঁর শিক্ষার পূর্ণতার প্রধান কথা নয়। যদিও একথা মানতে হবে যে এঁরা নানা বিভাগে যে রকম পারদর্শিনী হয়েছিলেন, যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা আজকালকার দিনে স্থলভ নয়। যথেষ্ট স্বযোগ, সুবিধা ও স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও এরকম সর্বাঙ্গীন শিক্ষিতা মেয়ে আজকাল তো, তৈরী হচ্ছে না। শিক্ষিতার সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষার গভীরতা নষ্ট হয়েছে একথা মানতেই হয়। যাই হোক, যে কথা বলছিলুম, শিক্ষার পূর্ণতার যে প্রধান পরিচয় সরলা দেবীর জীবনী পাঠ করলে জানতে পারা যায় সে তাঁর মনের সংস্কারমুক্তি। শিক্ষার প্রধান কাজ মনকে জাগ্রত করা। শুধু ছ' একটি বিভাগ নয় সর্বতোভাবে। নানা জ্ঞানে চিন্তায় অহুসন্ধানে। মনের দর্পণকে এমন উজ্জ্বল ক'রে তোলা যাতে সত্য উদ্ভাসিত হবে। চিরাচরিত প্রথা ও অভ্যাসের দ্বারা ভাটাকা পড়বে না। সরলাদেবীর মন যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছিল বলেই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে থেকেও হিন্দু-ধর্মের সত্যকে তাঁর মন খুঁজে ফিরেছে। ধর্মসত্য তত্ত্ব নিহিত গুহায়াং—সেই

গুহার মুখ আগাছা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে যেগুলি দেখে তখনকার আধুনিক সমাজ শিউরে উঠতেন। যে যুগে হিন্দু সমাজ বল্লৈ চোখের সামনে বাল্য বিবাহ বরপণ পুতুল পূজা ইত্যাদি ভেসে উঠত সেই যুগে বাস করেও যে সরলাদেবী তাঁর মনকে হিন্দু-ধর্মের আপাত থেকে গভীরে, প্রতীয়মান থেকে সত্যে অহুসন্ধান করতে পাঠালেন এ তাঁর শিক্ষার perfection এর একটি চিহ্ন !!

সরলাদেবী তাঁর দীর্ঘ জীবনে যত মহৎ প্রয়াস করেছিলেন তার সমস্তই কয়েক মিনিটে বলে ফেলা যাবে না। শুধু এইটুকু বলে শেষ করব যে সাহিত্যে সঙ্গীতে দেশপ্রেমে বলে বীর্ঘ্যে শক্তি সাধনায় ও ধর্ম ভাবে এই সাধিকা নারী তাঁর জীবনকে উদ্ধমুখী হোম শিখা করে জালিয়ে ছিলেন। এ দেশে এ রকম সাহিত্যগিকার এখন প্রয়োজন আছে।

সরলাদেবী জন্মোৎসবে পঠিত।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা স্বর্ণপদক পুরস্কার।

“নারী মঙ্গল কার্য—জাতির শ্রেষ্ঠ সেবা”—এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখক বা লেখিকাকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ স্বর্গায় রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিার্থে শ্রীযুক্ত কে. সি. রায় চৌধুরীর পত্নী শ্রীযুক্তা সুকুমারী রায় চৌধুরী এই পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ সমিতির সম্পাদিকার নিকট ২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধ নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে সমিতির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

নারীর শক্তি

শ্রীমতী অন্নরূপা দেবী

নারী শক্তির নজীর দেখাতে হলে সাধারণতঃ সারা ভারত বাদ দিয়ে রাজপুতানীদেরই দৃষ্টান্ত দেখানো হতো, এখন অবস্থা আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া গেছে। বাংলার নারীশক্তিও যে নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না, আধুনিক অন্ধবৃত্তান্ত দ্বিধা ও ম্যালেরিয়া জর্জরিতা বাঙ্গালী মেয়েদের দেখে দেখে আমরা সে সব কথা ভুলেই গেছি। বছর চল্লিশ আগে শ্রীরামপুর চাতরার এক অভিজাত তরুণীর হাতে একজন জঙ্গী জোয়ান ডাকাতের সর্দার খুন হয়েছিল, এ ঘটনা সে সময়ে দেশে একটা বিস্ময়স্বর্ধ্ব্যে উঠে তুলেছিল। কাটারীর বাট দিয়ে জানালার ফাঁকে প্রবিষ্ট বন্দুকের মুখ ভোতা করে দিয়ে ঐ মেয়েটী দোর ভেঙ্গে সদ্য ঢোকা দস্যু-পতিকে ঐ তীক্ষ্ণ ধার কাটারী দিয়ে পায়ে আঘাত করে এবং লুটিয়েপড়া আততায়ীকে অনন্তসহায় হয়েই ঐ একটা অস্ত্রের সাহায্যে কুপিয়ে মারে।

পুরাতন পুঁথির যুগে অনেক বঙ্গনারীর শৌর্য্য বীর্য্যের কথা লিখিত ছিল, কিছু কিছু তার থেকে উদ্ধার হয়েছে। মেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে ঐ সকল কাহিনী বিশেষ ভাবেই দেওয়া উচিত, যাতে করে অবলা সরলা অপবশ্য থেকে বাংলার মেয়েরা মুক্ত হয়ে আধুনিক বাঙ্গালী মেয়েদের প্রাণে প্রেরণা জোগান দিতে সমর্থ হয়। কালের মিউজিয়ামে তাদের রক্ষা করে ত কোন লাভ নেই। আজ বঙ্গনারীকে তার পুরাতন পথে আত্মরক্ষায় দায়িত্বশীল করে তুলতেই হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে, কার্য্য দিয়ে, অনুপ্রেরণা সকল দিক দিয়েই তাদের কাছে পৌছান চাইই চাই।

ধরা যাক শ্রীধর্ম মঙ্গল বইখানি। রাজকন্যা কানোড়ার ভীষ্ম পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে বীরদর্পে প্রবল পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা, তার তেজস্বিনী দাসী “ধুমসীর” প্রচণ্ড বিক্রম সোজা নয়! হ’তে পারে এসব স্থলে কতকটা কবিকল্পনা সংযুক্ত থাকে, কিন্তু যা আকাশকুসুমের মত একান্ত অলীক তা’দিয়ে একটা শতাব্দি পরজীবী কাব্য রচনা করা যায় না। আর তাই বা হতে যাবে কেন? গতযুদ্ধে চীনে

রাশিয়ায় যা হ’তে পেরেছে এই নিদারুণ যান্ত্রিক যুগে এদেশেই বা সেদিনের স্বাধীন আবহাওয়ায় মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ বা অমেকে তা’ না বা পারেন কেন? সেই একযুগে রজাবতী পুত্র প্রাপ্তির জন্ত গভীর নিষ্ঠাভরে ইষ্ট দেবতাকে দৃঢ়চিত্তে স্মরণ করে আত্মপ্রাণ উৎসর্গই নয়, নিষ্ঠুর ভাবেই নিজেকে কণ্টক শয্যায় নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করেননি। এ’ও বড় সোজা বীরত্ব নয়। অন্তরের আদর্শের জন্ত ঐ বীরাজনাগণ কলিঙ্গপতি ও কামরূপপতির কণ্ঠারা পতিমৃত্যুর মিথ্যা শুভবে অনায়াসেই পতিপ্রেমবিহ্বলা সেদিনের লোকাচার সম্মত সাধারণ শোকার্তা নারীর মতই চিতাশয্যায় শয়ন করবার জন্ত আবেগে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এতেও কি বীরত্ব ও মহত্বের প্রকটিত হয় না? আজকের বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে হয়ত আমরা এই সব আদর্শকে আর উপহাস করে হীন করবার চেষ্টা নাও করতে পারি, যেমন এতদিন করে এসেছি।

সমাজে ও সংসারে যেদিনের যেমন অবস্থা, ব্যবস্থাও তারই অনুকূল ভাবে স্বতঃই তৈরি হয়ে ওঠে। নোয়াখালি ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশালের কথা নিশ্চয়ই আমরা এত শীঘ্র ভুলতে পারিনি। সেদিনের বর্ষের সৈন্তদলের মধ্যেই ত আজকের এই সমস্ত বর্ষের শুণ্ডাদলের আদি পুরুষরা বর্তমান ছিল, তাই পাঠান মোগল যুগের রাজপুত নারীর ইজ্জত রক্ষার্থে জঁহরব্রতের ধরণেই শত্রু হস্তে নিহত রাজাদের পত্নীদেরও আত্মসম্মান রক্ষার্থে চিতারোহণের প্রয়োজন বোধ জাগ্রত হতো। যেখানে সম্ভবপর সেখানে শত্রু ক্ষয় করে আর যেখানে নিরুপায় সেখানে শুধুই শত্রু হস্তে ধরা না দিয়ে সম্ভব রক্ষার্থে আত্মাহুতি ছুটোতেই অশেষ শৌর্য্যের প্রয়োজন। বেপরোয়া আততায়ী লোভী পুরুষদের হাতে ধরা পড়ে কেঁদে সারা হওয়া ও নিরুপায়বোধে তাদেরই কাছে আত্মসমর্পণ করার হীনতা এরা ভাবতেও পারতো না। কতখানি উচ্চ আদর্শবাদ এবং মহত্তর ধার্মিক

চেতনাবুদ্ধি বৃদ্ধ হতে পারলে এত বড় বৃকের পাটা হয়ে ওঠে,
এদিনে তা' ক'জন মেয়ে বা পুরুষে ধারণা করতে পারে ?

এদের যুদ্ধ যাত্রার একটু নমুনা দিই :—

“রাজ আজ্ঞা পেয়ে কত্যা দিলে হাত নাড়া,

সাজ সাজ সত্তর শিঙায় শুধু সাড়া।”

আর সেই বিপুল সৈন্ত সংখ্যাই কি কম ? সংখ্যাও
নাকি নব্বলক্ষ, বিপুল বাহিনী।

রায় রেয়ে বার ভূঞা মীরমিয়া গণে,

তুরগী তুরগে কেহ-ইরাণী বারনে,

হাতি দোড়া উট আর সেপাই ফকির,

বন্দুকী ধামুকী ঢালি পাইক পদাতিক।”

আরও কত কি !

ঐ মেয়ে মহামহিম গৌড়পতিকের প্রত্যাখ্যান করে
তঁার পাঠান দূতকে অপমানের সঙ্গে বিদায় দিতে পিছু পা
নন, আর বারভূঞা বেষ্টিত নব্বলক্ষ সৈন্য সঙ্গে প্রতাপ
গৌড়েশ্বর প্রতিফল দিতে আসছেন দেখে মেয়েকে ঐ
বুড়া বরকে বিয়ে করতে রাজী করাতে না পেরে প্রাণ ভয়ে
ভীত রাজা মেয়েকে অন্ততঃ তঁার সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্ত
সাধনা করেও কোন ফল পেলেন না। উল্টে গুনলেন :—

“কত্যা বলে যাও তুমি বিলায়ে বালাই,

কোন্ ছার মানি ইল্লৈ রাখে কার বাপে,

কোমর বাঁকিলে কেবা বিধাতা বরণ।

সেজে গেলে সংহারিব সহস্র অর্জুন।

মনের আনন্দে আজি পূজিব বাসুলী,

নবলক্ষ বিপক্ষে সম্মুখে দিব বলি।”

নিরীশ্বর সোভিয়েট যদি ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় অলভে
প্রেরার করে অতরুড় দুর্ধর জাশান যুদ্ধ জয় করতে পারে,
তাতে যদি কুসংস্কারের অবাস্তবতার প্রশ্ন না ওঠে এতেই
বা ওঠে কেন ? দৃঢ়তম আত্মবিশ্বাসও মানসিক অটুট বল
মাহুষকে কিনা করাতে পারে ?

আর শুধু রাজার মেয়েরাই নন, তাঁদের দাসীরা পর্যন্ত
দৈহিক মানসিক বলে কম যায় না। ধুমসী রাজকন্ডার
প্রধানা দাসী বৃদ্ধ ফুলিয়ে মালসাট মারছে :—

“আমি কানাড়ার দাসী ধুমসী মোর নাম;

বিপাকে ফেলিব যদি বাধাস সংগ্রাম।

“হান হান বলিয়া ধুমসী দিল হানা,

চমৎকার ভাবে যত ভূপতির সেনা।”

ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেনাপতিরূপে কানাড়া, “দাতে ধরে লাগাম রাণী

হাতে ধরে খাঁড়া,”

লক্ষ্যার, “রঙ্গিনী রণজয়ী হুন্দুড়ি বাজাই, ঘন ঘোর

বাজাই দামা।”

বাংলার মেয়েরা যদি কল্পিনকালেও অস্বাভাবিকও
অসিচালনাদক্ষ না হতেন তবে কবির সাধ্য কি তাঁদের ওই
সব ভৈরবী মূর্তিতে লোক চক্ষে বার করেন ! পুথিপত্র
পুড়ে ছাই হতো না ?

বাংলার আদিবাসীদের এবং হিন্দু ধর্মের আশ্রিত হাড়ি
ডোম কেওড়া প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে মেয়ে
পুরুষের সমান অধিকার চিরদিনই ছিল, আজও অল্প-বিস্তর
যথেষ্ট আছে, এমন কি জালিক কৈরতুদের মেয়েরা ধারালো
মাছকোটা বঁটি হাতে আজও পুলিশী অভিযানের প্রতিরোধ
করতে এগিয়ে এসেছে এখবর সংবাদ পত্রের মারফৎ প্রায়
সবাই জানেন।

কাশীরামে কবি কল্পনেও নারী বীর্ঘ্যের পরিচয় পাওয়া
যায়। ইংরাজ রাজত্বে যখন থেকে বাঙ্গালী অসি ফেলে
মসীজীবী হ'লো এবং ‘বাঙ্গালী অসামরিক জাতি বলে’
আখ্যা লাভ করে গরু বোধ করলে তখন বীরের সঙ্গে
বীরেরাণীরও অনিবার্য পতন। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর,
অল্লাহার কদাহার নৈতিক শিক্ষার একান্ত অভাব
সমস্ত জাতিকেই হীনবীর্ঘ্য করে কলঙ্ক কালিমার প্রলিপ্ত
করে দিলে। উচ্চ বর্ণের মধ্যে এলো ঘোরতর আদর্শচ্যুতি,
জমিদাররা পশ্চিমা শিখ গোঁরা দরওয়ান আমদানী করে
‘রায়বৈশ্যের ব্যায়ামসিদ্ধ প্রচণ্ড বলশালী বাগদী
পালোয়ানদের নির্বংশ করে দিলে, লাঠীঘালবা ছিঁচুকে
চোর হলো।

বাংলার ব্রতকথার মধ্যেও বাংলার সাহসিকতার
আভাস পাই, “রণেএয়ো” একটা বালিকা ব্রত,
পূজার মন্ত্র, “রণে যেন এয়োরই; বীর পুতুরের মা
হই, সঙ্কলকার শুয়ো হই; আকালে ভাত পাই, সকালে
পুত পাই।”

এই সব কি বাঙ্গালী জাতির সামরিকতার ও বাংলার মেয়েদের বীরমাতৃস্বের তীব্রতর আকাঙ্ক্ষার “পাখুরে প্রমাণ নয়?” বাংলা নারীর বা কিছু দীপ্তিত প্রার্থিত-সে তারা মাতৃস্বের চেয়ে তাদের আরাধ্যের চরণেই নিবেদন করতে অভ্যস্ত। সে তার অন্তরের নিবিড় নিষ্ঠার আন্তরিক অভিব্যক্তি। পূজার বেদিমূল তো এদিনের জনসভার বক্তৃতা মঞ্চ নয়, বাঁধানো বানানো কথার মালার সেখানে কোন স্থান ছিল না, হাততালি পাবার আশা নিয়ে ওরা পূজায় বসতো না নিশ্চয়ই। এমন ব্রত ও ব্রতীদের মধ্যে বহু উপকথা পল্লীগাথার ভিতরে বাঙ্গলার ভেজস্বিতাপূর্ণ বীর্ষাবলের নিঃসন্দ্বিগ্ন পরিচয় আমরা খুঁজে দেখলেই পাই। দেশাচারের ভিত্তিতেই লোকাচারের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাই ছোটোকেই একত্রে মিলিয়ে দেখা দরকার। সাত সমুদ্র নদী পার হয়ে পক্ষীরাজে চড়ে হারানো ভাই বা পতি অন্বেষণে রাফসী পুরী যাত্রা না হয় কল্পনা? তার উদ্দেশ্যটা ও উদ্দীপনাটাকে অবিশ্বাস করবার প্রয়োজন বা কি?

মেয়েরা যদি সত্যি অপর্যাপ্ত পর্দানবীন হতেন, অসম্ভব হতো এ সব কাহিনীর কল্পনা করা।

বাংলার “রাণী রায় বাঘিনীর” কাহিনী তো আর কল্পিত নয়, আজ পর্যন্ত যার মূর্তি দেবীরূপে রাজবল হাতে প্রতিষ্ঠিত থেকে পূজা প্রাপ্ত হচ্ছেন! ঘোড়ায় চড়ে দুখানা তলোয়ার নিয়ে যিনি আক্রমণকারী পাঠান সৈন্য ধ্বংস করে তাদের বিতাড়িত করেছিলেন। এবং মোগল বাদশার কাছ হ’তে স্বতঃ প্রবৃত্তরূপে ঐ উপাধি লাভ করে আজও তাঁর প্রজাদের কাছে দেবীরূপে সম্পূজিতা হচ্ছেন, বাংলার মেয়েদের আমলে যে যুগ চলছে এদিনে তাঁদের সর্ব প্রযোজক দৈহিক রূপচর্চা না করে দৈহিক বলচর্চার জগতই সচেষ্ট হওয়ার দিন এসেছে। আজও যে কেমন করে তাদের অভিভাবক ও তারা এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থেকে তাদের গীতশ্রী প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্তির জগতই সাহায্য করে কর্তব্য পালন করছেন জানিনা। আর বিউটী বর্দ্ধনের জগত রূপসাধনার জগত ক্লিনিক খোলার বিজ্ঞাপন দিয়ে দৈনিক মাসিক ভর্তি হচ্ছে, দৈহিক বলচর্চার জগত নয়, এদেখে মনে হয়, বাঙ্গালী সত্যি আজ ক্ষেপে গেছে! চারিদিকে চক্রব্যূহে যখন তাকে ঘিরে ধরেছে, তখন আত্মরক্ষার জগত আপ্রাণ চেষ্টায় ছেলেমেয়েদের বোকা তৈরি না করে তারা “ষ্টার” তৈরির স্বপ্ন দেখছে!

“শিরে হৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা?”

কেনে দেখা

শ্রীচিন্তিতা দেবী

বি, এ পাশ করার পরে ছেলেদের মত মেয়েদেরও একটা ভয়ানক বেকার অবস্থা আসে, যখন লোকে তাদের কাছে খুব দারুণ রকম কিছু একটা আশা করে—অর্থাৎ আশা করে খুব একটা উচুদের বিয়ের, কিন্তু তারা খুব ছোট রকম একটা কিছুও করে উঠতে পারে না। পারে না, একটা নিতান্ত সাধারণ যেমন তেমন বিয়েও করে ফেলত। সেই অবস্থা চলছে ধীমতীর। যেখানেই যাক, সর্বত্রই যেন ছড়িয়ে যায় তার সেই বেকারস্বের হাওয়া। চূপ করে তাকিয়ে থাকা, গুরুজনদের দৃষ্টিতে কেমন যেন ঘনিয়ে আসে আশঙ্কা। কেমন বর হবে কে জানে, হবেই যে

নিশ্চিত, তাই বা কে বলতে পারে? এমন তো আজকাল কতই হচ্ছে। যদি সেই বিয়ে দিতেই হয়, তবে তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই তো ভাল, বড়ো হয়ে বিয়ে করে, কার আর চারটে হাত বেরায়? এই সব আশঙ্কা ঘন হয়ে ওঠে তাঁদের দৃষ্টিতে, আর তার অকথিত ছায়া এসে বার বার ধীমতীর মনে লাগায় অস্বস্তির ধাক্কা।

চেষ্টা চলছিল কিছুদিন আগে থেকেই, কিন্তু হঠাৎ ধীমতী অসুস্থত করল ভালটা যেন অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠেছে, লম্বা প্রায় নেই বললেই হয়। বি, এ, পাশ করিয়ে আর কতদিন মেয়েকে খুবড়ো করে রাখা যায়? মায়ের কণ্ঠে রক্ষতা।

এত দিন চেষ্টা চলত সন্ধ্যাপনে, কন্ঠার আত্মসম্মানকে সম্মেহে স্বীকার করে, ব্যাপারটা চালাবার চেষ্টা হোত ধীমতীর অগোচরে। তবু যেটুকু সে বুঝতে পারত, সে কেবল সে রী-মতী বলেই। হঠাৎ আড়াল গেল ঘুচে রুচ বাস্তব উল্লেখ নিলজ্জতায় ধীমতীর অন্তরাত্মাকে পীড়িত করে তুলল।

ধীমতী হয়ত সিনেমার টিকিট কিনেছে, ক্লার্ক গেবেল কিম্বা ক্লডেট কোলবার্টের মোহময় পরিবেশের মধ্যে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে আসবার জন্তে—মা এসে বলেন, খুকী, আজ আর কোথাও বেরুনো হবেনা তোমার—ঠিক পাঁচটার সময়ে তৈরী হয়ে নেবে, একজনরা আসবেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

এই একজনরা যে কে তা ধীমতী ভাল করেই জানে। বিকেল পাঁচটা বেজে যায়, সেই একজনদের সঙ্গে ধীমতীকে খুব মিষ্টকণ্ঠে আলাপ করতে হয়, তাদের সকল রকম আজগুবি প্রশ্নের ব্যাখ্যা উত্তর দিতে হয়, ঘর থেকে রাজ্যের সেলাই এনে নিজের বলে দেখাতে হয়, গান শোনাতে হয়,—খেয়াল, ঝুংরি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক গীতি, কি নয় বল? তারপরে, মা ও কাকীমা সারাদিন বসে যে সব খাবার করেছেন, তার সমস্ত ক্রেডিট অত্যন্ত উদার ভাবে ধীমতীকে দিয়ে দেন, ধীমতীকে অগ্নান বদনে, সে ক্রেডিট গ্রহণ করতে হয়। আর এত সন্দের পরে, ঘণ্টাখানেক ধরে পাখার বিল বাড়িয়ে, নানা জগতের নানা ধরণের গান শুনে, কাকীমার তৈরী ভাল ভাল খাবার খেয়ে, মিঠে পানে চোঁট রাঙা করে, তাঁরা কি না ধীমতীর মত মেয়েকেও অন্যায়সে অপছন্দ করে দিবি হাসিমুখে চলে যেতে পারেন। দিনের পর দিন এ কী অভ্যাস! অপমানে ক্লিষ্ট হয়ে ধীমতীর কুমারী সন্ধ্যা একদিন বিলোহ করে বসল।

একদিন বিকেল বেলায় ধীমতীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কী কাণ্ড, খোঁজ খোঁজ—না, কোথাও নেই সে মেয়ে। খুঁজতে খুঁজতে ধীমতীর ঘরে পাওয়া গেল, তার বদলে, তার এক চিঠি। ছোট্ট একটুকরো কাগজে লেখা—“চল্লম, দেখাদেখির ব্যবস্থা বন্ধ না হলে ফিরব না।”

শোন কথা, এমন কাণ্ড কেউ বাপের জন্মে দেখেছে কী? কালে কালে সব হোল কী—কলেজে পড়ে বলে কি

এমন সাপের পাঁচপা দেখেছে আজকালকার মেয়েরা? হতবুদ্ধি বাপ মায়ের চোখে জল এসে পড়ে—কি করবেন, কোথায় খোঁজ করবেন? লোক জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষে থাকবে না। আপাতত পুলিশে খবর দেওয়া স্থগিত রেখে সমস্ত পরিচিত বায়গায় টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাক। হায় হায় কে জানে তাঁদের কপালে কি আছে?

ছোট্ট একটা এটাচিকেস হাতে নিয়ে, ঠিক বেলা তিনটের সময়ে সবার অলক্ষ্যে ধীমতী নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। উত্তেজনার মুখ লাল, চোখের মোটা কালো বোদের চশমা মুখের অন্ধক লাগণ্য হরণ করেছে। চুলগুলো টেনে তোলা, উচু করে ক্লিপ দিয়ে আটকানো। সমস্ত শরীরের উগ্র কঠিন আধুনিকতা চেহারায় আনতে চেয়েছে অপরিচিত ছাপ। সোজা একটা ট্যাক্সি ডেকে ধীমতী গেল চলে হাওড়া স্টেশনে, ভয় পাবার মত দুর্বলতা অবশ্য তার নেই। বেনারসের একখানা টিকিট কিনল, ইন্টার ক্লাসের। প্র্যাটফরমে এসে কিন্তু ধীমতীর উৎসাহ একদমকায় নিভে গেল। কী ভীড়, কি হট্টগোল—বিপুল জনশ্রোত এই একটা গাড়ীকে লক্ষ্য করে বন্টার বেগে ছুটে আসছে যেন। ভীড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে এল। ট্রেন ছাড়বারও বেশী দেরী নেই—প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবু কোনমতে প্রাণপণ চেষ্টায় সামনেই যে দরজাটা পেল তারই হাতল ধরে উঠে পড়ল ধীমতী ঠেলাঠেলিতে ওর চশমাটা গেছে ভেঙে গাড়ীতে উঠেই সেটা খুলে ফেলল। তারপরে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল নিজের ভুল—এটা প্রথম শ্রেণীর কামরা—এবং একেকটা বার্থ দখল করে বসে আছেন, একেকটা মিলিটারী অফিসার। যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, সৈন্য এবং তাদের অফিসারদের দল তখনও দেশময় ছড়িয়ে আছে যথেষ্ট। একটু যেন কেমন কেমন লাগে ধীমতীর, গলাটা বুজে আসে একটু—কিন্তু কী আর উপায় আছে, পরের স্টেশন না আসা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বৃহৎ অজগর চলতে আরম্ভ করে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। লজ্জায় ভয়ে মা বাবা বরপক্ষ এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাগে তার অবস্থা তখন চরমে গিয়ে পৌছেছে। এটাচিকেসটা মাটিতে রেখে, দরজা ধরে উঠে দাঁড়াতেই, হঠাৎ কাণের অত্যন্ত কাছে

আওয়াজ হোল—“নমস্কার”। চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে ধীমতী দেখে, ওপাশের বেঞ্চে যে মিলিটারী অফিটারটী বসেছিলেন, এসে দাঁড়িয়েছেন একেবারে ধীমতীর পাশে। “চিনতে পারলেন না বুঝি না?” একটু হাসবার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক—ভাল করে তাকিয়ে দেখল ধীমতী। নাঃ কোন ভুল নেই, এ সেই লোকই বটে। গত সপ্তাহে যারা ধীমতীকে সদলবলে দেখতে এসেছিল, এ লোকটীকে তাদের মধ্যে ধীমতী নিশ্চয় দেখেছে। স্পষ্ট মনে আছে, লোকটা অনবরত ফরমাস দিয়ে দিয়ে তার গান শুনেছিল, তারপরে বাড়ী ফিরে গিয়ে তার মামা বলে পাঠিয়েছিল যে, মেয়ে যদি আর একটু ফরসা হোত তবে আর কোন গোলই হোত না, কারণ তাঁরা খুব ফরসা মেয়ে খুঁজছেন, অবশ্য বি, এ, পাশ ও গান টান গুলো আবশ্যিক। তাছাড়া ধীমতী লোক পরস্পরায় শুনেছিল যে পাত্র বলেছে যে, বিয়ে করলে যদি খালি চোখ বুজে গান শোনা যেত তবে মন্দ হোত না, কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ তো খুলতে হবে, তখন ঐ মুখের দিকে চাইবে কি করে। এসব কথা মনে পড়ে, নিমেষে ধীমতীর সমস্ত শরীর কঠিন হয়ে উঠল—ক্রুদ্ধ মুখ এক ঝটকায় ফিরিয়ে নিয়ে, একান্ত মিমুখ হয়ে সে বলে—না। “কোথায় যাচ্ছেন জানতে পারি কি?” তরল কণ্ঠে আওয়াজ হোল। “আপনার অসম্মত কৌতুহল মেটানোর ইচ্ছা আমার নেই,” ধীমতী দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল। “সত্যি কি আমায় চিনতে পারেন নি?” পাশের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল মনীষের মুখ। রক্ষ চুলগুলি হাওয়ায় বিপর্যস্ত, কালো ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে সহাস্য উজ্জ্বল দৃষ্টি ধীমতীর মুখের উপর বিস্তৃত। রীতিমতো ভালো দেখতে বলা যেতে পারে। সেদিন তো মনে হয়েছিল, অত্যন্ত খেলো এবং জলো। কিন্তু দেখতে যাই হোক—কী অসম্ভব আশ্চর্য।

মণীশের সহাস্য দৃষ্টির উত্তরে, ভুরু বাঁকিয়ে কঠিন কণ্ঠে ধীমতী বলে,—“চিনতে পারলেই কি সব রক্ষ লোককে সব সময়ে চেনা উচিত নাকি?” চাবুকটা ঠিক জায়গায় লাগল কিনা দেখতে গিয়ে, ধীমতী দেখে, আঘাত ওকে স্পর্শও করেনি—রং তার হাসি মুখের প্রত্যেকটি রেখায়, একটা অসংযত উচ্চারণ ফেটে পড়ছে। ধীমতী

তাড়াতাড়ি নিজেকে কামরার ভিতর ঘুরিয়ে নিল, পাশের সাহেবটার বার্থের পাশে দাঁড়িয়ে বলল,—তোমার বার্থের পাশে আমায় একটু বসতে দেবে কি? পরের টেনশনেই আমি নেমে যাব, এটা আমার কামরা নয়। “নিশ্চয় নিশ্চয়, সে তো আমার সৌভাগ্য,” সৌজন্তে গলে গিয়ে সায়েবটী বলল। ধীমতী তার বার্থের একপাশে বসে পড়ে রাজ্যের গল্প জুড়ে দিল,—কোথায় কোন্ স্কটল্যান্ডের পাহাড়ে সাহেবটার বাড়ি—ঘরে তার কে কে আছে, মাঝ দুবছর সে দেশ থেকে এসেছে। ভারতবর্ষ তার কেমন লাগছে—এই প্রথম বাঙালী মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হোল, ধীমতীকে তার মনে থাকবে, এই সব হাজারো রকমের গল্প চলতে থাকে। আর মণীশ তার নিজের বার্থে বসে, একটা সম্ভা বিলিতি নভেল খুলে, কিছু না শোনার ভাগ করে ওদের প্রত্যেকটা কথা গিলতে থাকে।

গাড়ী থামল বন্ধমানে। ছোট এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে স্কটল্যান্ডবাসী সাহেবকে ধন্যবাদ ও বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, ধীমতী ততক্ষণে উঠে পড়েছে। দরজার কাছে এসে ল্যাচকীটা খুঁজে পেতে একটু দেবী হয় তার, আর যায় কোথায়—শিভালুরি দেখাবার এমন স্বযোগ! স্কটল্যান্ডের বীর ছুটে এসে দরজা খুলে, মাথা ঝেঁষ নত করে ‘বাউ’ করে এবং তার বদলে পায় যিষ্ট কণ্ঠের আবার একটা সহাস্য ধন্যবাদ।

মণীশের ইচ্ছে হোল, সাহেবটার বোকা বোকা মুখের উপর প্রচণ্ড এক ঘুসি মারে। কী দরকার ছিল ঐ শাদা চামড়ার, বাঙালী মেয়ের সঙ্গে অত ভাল ব্যবহার করার? একটা কোন অভদ্র কথা বলল না কেন, তাহলে মণীশ দেখিয়ে দিত শিভালুরি কাকে বলে। হায় হায়, শিভালুরির কথা মনে আনে কি করে মণীশ? সেদিন ওদের সঙ্গে তার নিজের তরফ থেকে যা ব্যবহার করা হয়েছিল, তাকে আর যাই হোক শিভালুরি বলা চলে না। সত্যি বড় অভদ্রতা করা হয়েছিল! কিন্তু কী বা করতে পারত সে? ধীমতীর বাবা ঘণ্টা দুয়েক বসে থেকে অনেক চেষ্টা করে ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর যখন গেলই, তখন অমন চমৎকান্ত গান শোনার স্বযোগ পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় কী? মণীশ নিজেকে defend করবার চেষ্টা

করে, মনে মনে। কিন্তু তাই বলেই কি ওরকম ভাবে—
দেখান যায়? রাগ হোল ধীমতীর মা বাপের উপর, ওরকম
করে কি দেখা যায়, না দেখা দেওয়াই চলে? ঠিক সময়ে
ঠিক দেখাটি দেখার জন্তে স্বর্গের চক্রান্ত প্রয়োজন।

ঐ যে জানলা দিয়ে পরিষ্কার মুখটা ফুটে উঠেছিল,
উদ্ভেজনায় দীপ্ত। কাণের দুশাশে চূর্ণ চুলের ঐ যে
মাতামাতি, আর তার ওপরে পড়ন্ত আলোর সোনালী মায়া।
ঐ যে ভুরু দুটো বেকে গেল ধনুকের মত ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে,
বাঁশীর মত সরু অথচ একটু নীচু নাক ফুলে উঠল, গোল
গোল ছোট ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, আর দীর্ঘপক্ষ ঘন
কালো চোখ দিয়ে সেই যে বিদ্যুৎ বর্ণণ হতে লাগল, সেই যে
তলুদেহের স্পষ্ট বিদ্রোহ, যার মধ্যে দিয়ে ওর অপমানিত
অন্তর ফুটে বেরোচ্ছিল; তার তুলনা কোথায়? সাতদিন
ওদের ডুইংকমে বসে, নীচু নাকে পাউভার ঘসা বাঁধা
মেয়েটার ঠুংরি শুনে এলেও মণীশ, তার সেই মানসিক
দীপ্তির সন্ধান পেতনা, যা তার রূপের দৈন্তকে মহিমায়িত
করে তুলেছে। ভেবে আর কি হবে, মনে মনে বলে মণীশ,
ভুল মানুষ মাত্রেই করে। তবু তার ভাগ্য ভাল যে, এখনও
ভুল সংশোধনের সময় আছে, খুব বেশী দেরী হয়ে যায়
নি। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? ষ্টেশনে নেমে
অনেক খুঁজেও পেলনা কোন সন্ধান। সারা রাত ভাল
করে ঘুম হোল না মণীশের। এই সেদিনও যার প্রতি
বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না, যাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে
অপমানকর ঠাট্টা করতেও বাধেনি, তারি কথা মনে করে
ওর সারা রাত ঘুম নেই। গেল কোথায় মেয়েটা হারিয়ে?
যুদ্ধের জের মেটেনি, তার ওপরে—এই পূজার ভীড়ে।
আশ্চর্য্য; যেন ওরই উপরে ধীমতীর সব ভার দেওয়া
আছে।

দেখা মিলল পরদিন বেনারসে। বোঝা গেল, এ মেয়ে
হারিয়ে যাবার নয়। তবু ওকে যেন চেনা যায় না—
পুরো একটা রাত ও অর্ধেক দিন, এই ভীড়ে মধ্য শ্রেণীতে
ভ্রমণের ক্লান্তি ওকে একেবারে বদলে দিয়েছে; অত্যন্ত
করুণ লাগছে দেখতে। বেশবাপি মলিন বিপর্য্যস্ত।
টয়লেটহীন শুকনো মুখ ক্লান্ত অবস্থায়। শুধু ঘন কালো
চোখ দুটো একবার মণীশকে দেখেই দপ করে জলে উঠল।

ধীমতী ইতিমধ্যে ট্যাক্সি ঠিক করে ফেলেছে—যাবে
ইউনিভার্সিটিতে, তার দাদা সেখানে প্রফেসর। মণীশের
গন্তব্য কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট। মুহূর্ত্তে মণীশ নিজের কর্তব্য
ঠিক করে নেয়। দর ঠিক করে, মণীশের দিকে একটা
জলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, ধীমতী সেই গাড়ীতে উঠে
বসেছে, মণীশ টপ করে উঠে গিয়ে ধীমতীর পাশে বসে
পড়ো। বনাম করে দরজাটা বন্ধ করে সোৎসাহে বলে
ওঠে—“আরো তুমি ইতিমধ্যে গাড়ী ঠিক করে ফেলেছ।
বেশ বেশ, চালাও ড্রাইভার ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার।”

গাড়ী চলল গড়িয়ে। ধীমতী এমনভাবে মণীশের
দিকে তাকাল, যাতে সে যুগ হলে ধীমতীর পাশে পড়ে
থাকত, মণীশের বদলে একজুপ ছাই। “আপনার উদ্দেশ্য
কী?” ধীমতী বলে রক্ষ কর্তে। “আপাতত আপনার
সাহচর্য্য লাভ”। মণীশ নিরুবেগ। “বেশ” বিদ্যুৎগর্ভ
মেঘের মত থমথমে আওয়াজ। “দেখুন, সব কারণই
কি জানতে চাওয়া উচিত?” শত চেষ্টা করেও মণীশ
পারল না গভীর হতে, “তবে শুধু এইটুকু জেনে রাখুন,
যে আপনার দাদা অমরেশ আমার অনেক দিনের বন্ধু।
তার কাছ থেকেই আপনার বাবা সংগ্রহ করেছিলেন
যে পাত্র হিসেবে, আমার স্থান একেবারে প্রথম শ্রেণীতে
না হোক, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তো বটেই।” ধীমতী চুপ,
একেবারে চুপ। এমন মৃত্যুর মত নৈশব্দের কোন মানে
হয় কি? কড়া কড়া হলেও কথা বলুক না যা হয় একটা
কিছু। অনেকক্ষণ এমনি চুপচাপ থাকার পর মণীশ
হঠাৎ এক সময়ে মরীয়া হয়ে উঠল,—“দেখুন, সেদিন
আমাদের ভয়ানক অপরাধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও তেমন
অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়, তবু শুনলে বুঝবেন, সবটাই
আমার দোষ নয়। আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না—”

কৈফিয়তের সুরে বলতে গেল মণীশ।—“নাঃ, আপনার
মোটাই ইচ্ছা ছিলনা, শুধু আত্মীয় স্বজন ও আমার বাবার
অনুরোধেই এসেছিলেন, আর তাঁদের অনুরোধেই একজন
অপরিচিত মেয়েকে দিয়ে, একটার পর একটা গান
গাওয়ানোর মত আত্মপক্ষা আপনাদের হয়। হুভাগ্য সেই
বাঙালী মেয়ের যে আপনাদের ছকুম তামিল করার
মত অসম্মানকে গায়ে মেখে নেয়, মা বাবার ভয়ে। ইচ্ছে

আপনার ছিল না বটে, তবু রোজ নতুন নতুন মেয়ে দেখে বেড়ানোর লোভ তো সোজা নয়।” বলসে উঠল ধীমতীর সর্বাঙ্গ শানিত বিদ্রুপে।

“রাগলে আপনাকে সত্যিই খুব ভালো দেখায়”, মণীশ বলে, “তাই বলেই কি অতটাই রাগতে হয়, বিশেষত আমার মত অভাজনের উপর, যে আপনার রাগের মোটেই যোগ্য নয়।”

“দেখুন, আমার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা মিথ্যে। আমার মনসস্তা রোমান্সের গন্ধ পেলেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। আমি অত্যন্ত প্র্যাক্টিক্যাল।”

“তাই এমন আনপ্র্যাক্টিক্যাল কাজ করেছেন”—না বলে থাকতে পারলে না মণীশ। “আমার কাজের কৈফিয়ৎ আশা করি আপনাকে দিতে হবে না। এই ড্রাইভার বাঁয়ে ঘোরাও—দশ নম্বর কোঠি।”

“কৈফিয়ৎ না হয় নাই দিলে, জিগোস করলেও কি বলবে না, আজ না হোক, দুদিন পরে?” অদ্ভুত নরম গলায় মণীশ বলে ঝুঁকে পড়ে।

“একী—সরে বসুন”—গাড়ী ঢুকল কম্পাউণ্ডে। কে শোনে কার কথা, আরো একটু ঝুঁকে মণীশ বলে—“একটা দিন আমার কথা শোন, please”, ওর গলায় একান্ত মিনতি, “এতক্ষণ তো অনেক বকেছ; এখন একবারটা শোনই না আমার কথা—লম্বাটি।”

কী মজার কথা বলে লোকটা, যেন সে তার কতকালের আত্মীয়—রাগ করবার আগেই নিজের অলক্ষ্যে অল্প

একটু হাসি ছিটকে পড়ে ধীমতীর মুখে, বোধ হয় এতক্ষণ পরে পরিচিত যায়গায় এসে পৌঁছতে পারার জন্যেই।

ওদের দেখে বিষ্ময়ে চীৎকার করে ওঠেন দাদা—মণীশকে ছুঁতে জড়িয়ে সোজা দে চোঁচাতে লাগলেন—“দেখে যাও, দেখে, যাও, ওগো শীগির, কালপ্রিট নিজেই ধরা দিতে এসেছে, বামালসমেত। আচ্ছা মণীশ, তোমার পেটে যে এত ছিল, কে জানত?—কিন্তু এঁতাদের কি কাজ বল দেখি, মিছিমিছি মা বাবাকে ভাবিয়ে মারলি। তবে যে সেদিন মা লিখছিলেন, তোর মামার নাকি পছন্দ হয় নি।”

“বাজে বোক না, অমরেশ, আমার মামা তো আর ওকে বিয়ে করছেন না—কিন্তু সে সব পরে হবে, এখন শীগির একটা টেলিগ্রাম করে দাও—আর বৌদি আপনি এখুনি ওকে স্নান করতে পাঠিয়ে দিন, এক কাপ দুধ খাইয়ে। দেখছেন কী অবস্থা হয়েছে।” “বাঃ কি সব বলছ তোমরা” ধীমতীর কথা শেষ হবার আগেই মণীশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ওর দিকে। কাতর চোখে মিনতিভরো ওর দিকে তাকিয়ে, একহাত দিয়ে ওর খুলে খাওয়া বেগীতে আটকানো কাঁটাগুলো খুলতে খুলতে বলে—“একবার আমার কথা শোন, এই প্রথম ও এই শেষ, এরপর থেকে সব কথা শুনব আমি; সত্যি আর দেবী কোরনা স্নান করে refreshed হয়ে নাও শীগির,—নইলে শেষে অস্থখে পড়বে যে—।”

কম্বী চাই

উপযুক্ত বেতন ও এলাউন্স অথবা উচ্চ কমিশনে আমেরিকান ফার্টেন পেন ও স্বইস্‌ ঘড়ি (Swiss watches 1950 model) বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট চাই। নমুনা ও সর্ভাদির জন্য (ইংরাজীতে) লিখুন :—

BANSAL BROTHERS

Khoti Memo, Delhi—6

দীনবন্ধু এগুরুজের মহাপ্রয়াণ *

শ্রীপুষ্প দেবী

চৈত্রের দ্বাদশ তিথি কোন পুণ্যক্ষেণে

কর্মবীর গেলো শান্তিধামে।

দুর্ভাগা ভারত কান্দে হারায়ে তোমারে

সার্থক যে দীনবন্ধু নামে।

ভারতের ঐকান্তিক শুভ অমুখ্যায়ী

সত্যদ্রষ্টা কর্মযোগী ভূমি।

তোমারে পাইয়া কোলে ধরা হয়েছিল

নিপীড়িত এ ভারত ভূমি।

জাতিভেদ অবিচার দলাদলি ঘেষ

ব্যথা দিয়েছিল এই বুকে।

আপন জীবন ভরে প্রাশস্তিত তার

করিয়াছ কি গভীর হৃদে।

সত্য ছিল মন্ত্র তব জনহিতব্রত

দেশ-প্রেমে বুক ছিল ভরা।

মুঠ বুঝি শাস্তি প্রেম নির্ঘাতীত যত

দুখীদের হাহাকার হরা,

ঘৃণিতে না ঘৃণা করে বেসেছিলে ভালো

সম স্নেহ দিয়েছিলে সবে।

সহ আর স্নেহভরা হৃদয় তোমার

তার আশা বুঝা কিগো হবে?

স্বাধীন বটন আর স্বাধীন ভারত

এদোহার মৈত্রী চেয়েছিলে।

বর্ণ ও জাতির বাধা ধুলিসাং করি

ভাই বলি সবে কোল দিলে।

আড়ম্বরহীন তব সরল জীবন

খুঁটের প্রেমের মূর্তি তুমি।

ধন্য এ ভারতবর্ষ সমাধি-কানন

পুত তব অঙ্গ স্পর্শ চুমি।

গির্জায় সমাধি তব হয় নাই বলি

ভক্ত বন্ধু সবে হুংথ করে।

আভিজাত্য গর্ব তুমি বাসনি ত ভালো

তুমি ছিলে সবাংকার তরে।

তাই সাধারণ মাঝে করেছ শয়ন

সকলের হুংথ ভাগ লয়ে।

জীবনের অহরূপ বিশ্রাম আগার

ধন্য তব স্মৃতিকণা বয়ে।

চলে গেছ জানি আজ ছাড়ি জগতেরে

তবু জানি মানবেরই বুকে।

চির শ্রদ্ধাসন পাতা ওগো স্মরণীয়

তব তরে কি গভীর হৃদে।

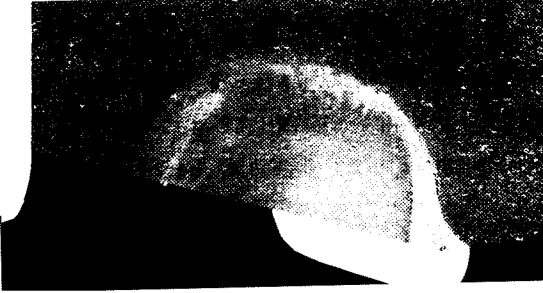
* রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ অবলম্বনে।

চিত্রশিল্পী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ ।

ময়মনসিং জিলার গৌরীপুর রাজবাটীর বধূরাণী শ্রীমতী ১৫ বৎসর বয়স হইতে এক ইউরোপীয়ান 'নানের' নিকট ইন্দিরা দেবী ছিলেন সঙ্গীত বিশারদ কুমার বীরেন্দ্র কিশোর চিত্রাঙ্কণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী রায় চৌধুরীর পত্নী এবং স্বদেশী চিত্রাঙ্কণ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদারে নিকট ৪৫ বৎসর ছবি আঁকা

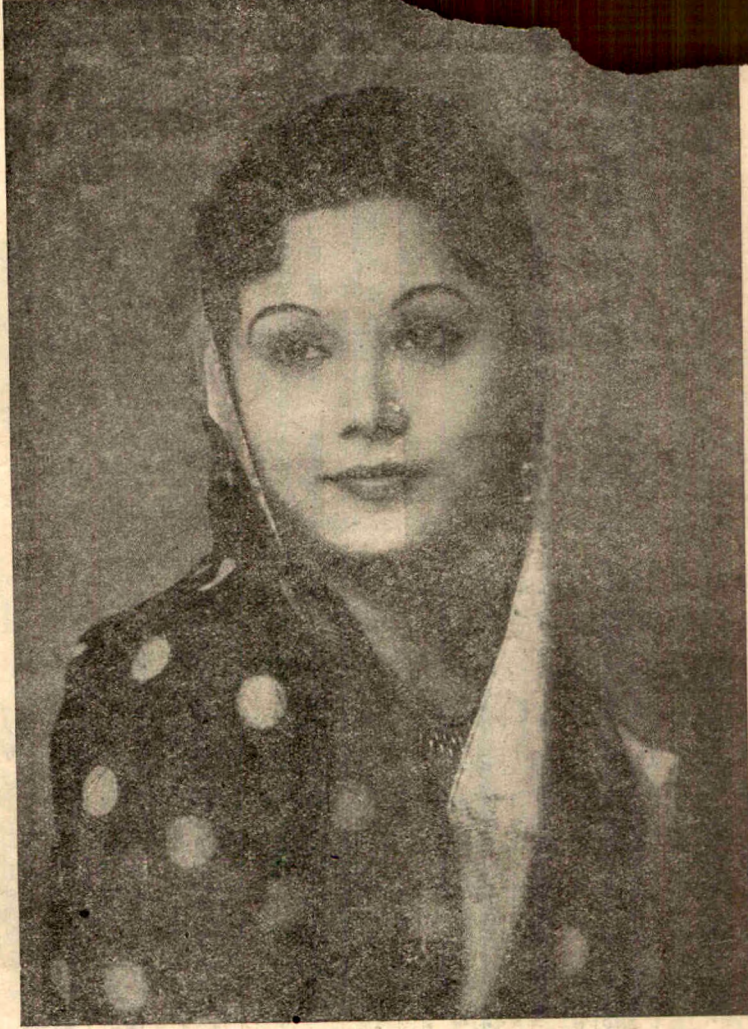
তিনি জল-রং (ওয়াটার কলার) ও তৈল চিত্র (অয়েল পেন্টিং) অঙ্কনে সমানই পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি প্রায় ১০০ শত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন।



প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের নিকট ইহাতে প্রচুর প্রশংসা ও জনরংএ আঁকা চিত্রের জন্ত প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

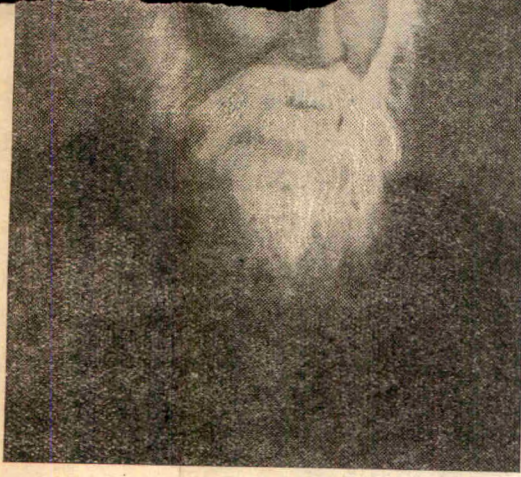
প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার যেমন সুযোগ হইয়াছিল তেমনই তাঁর প্রকৃতির খেলা উপলব্ধি করিবার শক্তি ছিল। তাঁহার অঙ্কিত “তুষার শিখর”, “পাহাড়ী বরুণা”, “সাগরে সূর্য্য অস্ত” চিত্রগুলি নয়ন তৃপ্তিদায়ক, প্রকৃত শক্তির পরিচায়ক। “সুন্দরী” নামের দ্বারা লামা” চিত্রখানি

বদেশী যুগের উৎসাহ



ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর পুত্রবধূ। ইন্দিরা দেবী • শিথিয়াছিলেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসুর
অতি অল্প বয়স হইতেই চিত্রকলার অমুরাগিণী ছিলেন। নিকট প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনের দক্ষতা অর্জন করেন।



রবীন্দ্রনাথ [শিল্পী : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী]

তাঁহার গৃহে যে চিত্রমালা ও সংগ্রহ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যেমন মনোরম তেমনই মূল্যবান। তাঁহার অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। ‘রাম চন্দ্রের বিদায় গ্রহণ’, ‘শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা’ দেখিলে হৃদয়ে দারুণ বিরহ ভাবের উদয় হয়। “রাস লীলা” চিত্রটি বড় আকারে (৫'x৩')। জল রঙা ছবিটি এক আনন্দলীলার উৎস। এই চিত্রে শিল্পীর রেখা অঙ্কন ও রং ফলানর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘হরগৌরী’ চিত্রটি মনোরম।

ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতেও তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিয়াছেন। শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্বাদ ও প্রশংসা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। “বুদ্ধের গৃহত্যাগ” ইবিখানি আঁকিয়া ইন্দিরা দেবী ১৯৪৭ সালের “ম্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস”

য়িক। নিভৃত পল্লীর মায়া হৃদয়ে সেই অসীমের সন্ধানের পরিচয় যেন দিতেছে। এই চিত্রে শিল্পী তাঁর প্রাণের গোপন কোষের খবর দিয়াছেন।

তাঁহার অঙ্কিত ‘রবীন্দ্র নাথ’ ও ‘অরবিন্দ’ চিত্রে মনীষীদের স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা রহিয়াছে। তাঁহার



তুষার শিখর [শিল্পী : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী]

নিজের পুত্রের চিত্রখানিতে মাতৃস্নেহের পীযুষধারা বহিয়াছে, তাহা দর্শক মাত্রেই চোখে ধরা পড়ে। চিত্র সমালোচকগণ তাঁহার চিত্র সমালোচনায় কোন অতিশয় প্রশংসা করেন

নাই। বাস্তবিকই এই বাঙ্গালী পুরুষমহিলার অনন্তসাধারণ অল্পবয়স, একাগ্রতা, নিষ্ঠার সহিত সাধনা তাঁকে চিত্র অঙ্কনের দক্ষতা অর্জনে শক্তি দিয়াছে।

নারীর কোমল স্বভাব ও চিত্রে এইরূপ স্বকুমার শিল্প-কলার সাধনা করাই শ্রেয়। পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া সকল প্রকার শ্রম ও বৃত্তি অহুসরণ করায় স্বথ-শাস্তি আসে না।

এই উদীয়মান চিত্রশিল্পী গত শ্রাবণ মাসে অকস্মাৎ লোকান্তরিত হওয়াতে চিত্রশিল্পী গোষ্ঠির প্রভূত ক্ষতি

হইল। ময়মনসিং জিলার গোপালগঞ্জে ১৩১৬ সালের ১২শে কা্তিক তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বড় ঘরের বধু ছিলেন, স্বপ্নের সাগরে সাঁতার দিবার অবসর তাঁহার বেশ ছিল, তথাপি তিনি সাধারণ লোকের মতন শ্রম করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সহিত যাহারা মিশিয়াছেন তাঁহারা এই তাঁহার সরল ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার রূপ, গুণ ও পদমর্যাদা কখনও মানবতার পরিপন্থী হয় নাই। বড় ঘরের বধু ও কন্যারা এইরূপ চরিত্রের অধিকারিণী হইলে সমাজের ও দেশের কল্যাণ হয়।

ফুল ফুটবে

শ্রীদীপ্তি দেবী

(৫)

পরিদর্শন অনিন্দিতার ফুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা এসে পড়লেন। অনিন্দিতা আগে থেকে সব গুছিয়ে রেখেছিল বলে কারুর কিছু অস্থবিধা হ'ল না। সারা দুপুর মেয়েরা বিশ্রাম করে সন্ধ্যা বেলা প্রাণভরে খেলা করলে মাঠে। কলকাতায় এত খোলা জমি তারা দেখেনি কোনদিন। মেয়েদের খেলার জন্ত মাঠের যে অংশটা অনিন্দিতা ঠিক করে রেখেছিল সেটা ছিল বাড়ীর ভিতর দিকে। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। সেইটাই ছিল মস্ত বড় স্থবিধা। বৈঠকখানা বাড়ীর সংলগ্ন যে ফুলের বাগান ছিল তার সঙ্গে অন্দর মহলের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফটক দিয়ে এলে এই ফুল বাগানটি আগে চোখে পড়ে। অন্দর মহলের দরজাটাই হয়েছিল ফুলের ফটক। বৈঠকখানা বাড়ীর বড় গেট ব্যবহার করত অনিন্দিতা ও তার পরিবারস্থ সকলে। বৈঠকখানা বাড়ীর সঙ্গে ফুলের প্রাঙ্গণ কোনই যোগ ছিল না।

ফুলের যাবতীয় কাজ কর্ম সেয়ে অনিন্দিতা গিয়ে বসল বাগানে। গ্রামে আসবার সময় তার দাদা তাকে অনেকগুলি ভাল রই কিনে দিয়েছিলেন সময় কাটাবার জন্তে। তারই ভিতর থেকে একখানা বই বেছে নিয়ে সে পড়তে শুরু করল। শেষে যখন আকাশের সব আলোটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল তখন সে বইখানা বন্ধ করে ভাবতে লাগল নানা কথা। ফুলের কথা, তাদের গ্রামের কথা, যুদ্ধের কথা, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছিল অরুণের কথা। কী সুন্দর নির্ভীক চেহারা! কি অমায়িক ব্যবহার! মুহূর্তের মধ্যে সে তার পরিবারস্থ সকলকেই আপনাতর করে নিয়েছিল। মাসিমার অন্তরে পুত্রের যে আকাঙ্ক্ষা লুকান ছিল অরুণকে পেয়ে যেন তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হ'ল। তিনি তো সঙ্গে সঙ্গেই 'বাবা' 'বাছা' বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। নগেন মামাও অরুণের গুণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অরুণের কর্মক্ষমতার অশেষ প্রশংসা করে বলেন—“ছেলেটি ভারী মিসুক। তার ব্যবহারটা কী মোলায়েম। অথচ ক্যাম্পের লোকদের

রেখেছে একেরায়ে কড়া শাসনের মধ্যে। কেউ টু শব্দ কক্ষ দিকি? সে সাধ্য নেই কারুর! অরুণ আসবার আগে এই ক্যাম্পের সৈনিকগুলো কি বজ্রাতি'ই না করত! কিন্তু অরুণ আসবার পর থেকে সব বেটা কেঁচো হয়ে গেছে।”

অরুণ সম্বন্ধে মাসিমার, নগেন মামার মন্তব্য অনিন্দিতা চূপ করে শুনে যায়। নিজে সে কোন কথাই বলে না। কি আর বলবে সে? অন্তর তার পূর্ণ হয়েছিল ক্রতজ্ঞতায়। এই স্থন্দের পৃথিবীর সঙ্গে তার সব যোগ ছিন্ন হয়ে যেত যদি অরুণ এক সেকেন্ডে দেয়িত্তে এসে পৌঁছত। কি রকম অনায়াসে সে পায়ের নীচে চেপে ধরেছিল সাপের মাথাটা! এমনি একটা সূত্র ধরে কি ভগবান মিলিয়ে দিলেন অরুণকে তার জীবনের সঙ্গে? আর কি কোনদিন সে ভুলতে পারবে তাকে? অরুণের চেহারাটা তার চোখের উপর ভেসে উঠল। কি প্রশান্ত নির্ভীক তার চোখের চাহনী! মনে যাদের লেশ মাত্র ছলনা বা কুটিলতা নেই তারাই শুধু চাইতে পারে এমন করে। কি স্থন্দের দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ। কি উজ্জল চেহারা! বুদ্ধির জ্যোতি যেন চোখ মুখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে।

একটা Jeep গাড়ী এসে দাঁড়াল ফটকের সামনে। যার চিন্তায় মগ্ন ছিল অনিন্দিতা, সেই ব্যক্তিটি নামূল গাড়ী থেকে। সামনেই অনিন্দিতাকে দেখতে পেয়ে সে বলল—“ওদিকের সব অঞ্চলগুলো পরিদর্শন করে ক্যাম্পে ফিরছিলাম। কাল আপনাকে বড় ক্লাস্ত দেখে গিয়েছিলাম, তাই ভাবলাম যাবার পথে একবার খোঁজ নিয়ে যাই। কালকের পরিশ্রমের দরুণ তো কিছু অসুস্থ বোধ করছেন না?” “আমি ভালই আছি,” মুহূর্ত্তে উত্তর দিল অনিন্দিতা। “যাক, নিশ্চিন্ত হ'লাম। যে ভাবে কাল আপনাকে ঘোড় দৌড় করিয়েছিলাম ভাবলে নিজের উপর এমন রাগ ধরে।” তারপর অনিন্দিতার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল—“আপনারও কিন্তু এতে দোষ আছে। আপনি কেন সঙ্গে সঙ্গেই আমার ক্রটিটা ধরিয়ে দিলেন না?” অনিন্দিতা শুধু হাসল, কিছু বলল না।

অনিন্দিতাকে চূপ করে থাকতে দেখে অরুণ বলল—“আমি তা' হ'লে চলি, আপনি বিশ্রাম করুন।” এইবার

অনিন্দিতা কথা বলল। অরুণের দিকে চেয়ে বলল—“সে কি? ফটক থেকেই বেরিয়ে যাবেন? বাড়ীর ভিতরে চলুন! মাসিমার সঙ্গে দেখা করবেন না?” অরুণ তার কালী ঝুলি মাথা হাত ও পোষাক দেখিয়ে বলল—“এই অবস্থায় আর মাসিমার সঙ্গে দেখা নাই করলাম? আর একদিন না হয় সভ্য ভাব হয়ে আসবে।” তারপর অনিন্দিতার দিকে একবার চেয়ে একটু হেসে বলল—“কাল রবিবার। আমার একটু অবসর আছে। কাল দুপুরে যদি খাবার নেমন্তন্ন করেন তা' হ'লে খুসী হয়েই আসব।” অনিন্দিতা হেসে বলল—“তা' বেশ তো? কাল দুপুরে চাটি খেয়ে যাবেন এখন?” অরুণ একটু অপ্রস্তুত মুখ করে বলল—“এমন করে যেচে নেমন্তন্ন নিলুম, আপনি আমাকে কি মনে করছেন কে জানে?” অনিন্দিতা একটু মুচুকে হেসে বলল—“কাল মাসিমা এত “বাবা” “বাছা” করবার পর'ও যদি আপনি আমাদের সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করতেন, তা' হ'লে সত্যিই দুঃখিত হ'তাম।”

(৬)

এখানকার S.D.O. শশধর বাবু লোক ভাল। অনিন্দিতার কাজে তাঁর যথেষ্ট সহায়ভূতি ছিল। তিনি তাঁর নিজের ছুটি মেয়েকে অনিন্দিতার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। শশধর বাবুর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও এসে স্কুল দেখে গেলেন। দেখতে দেখতে স্থানীয় ছাত্রী সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। অনিন্দিতার স্কুল অল্প দিনের মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসল। ব্যক্তিগত ভাবেও অনিন্দিতা এখানকার বাসিন্দাদের হৃদয় জয় করতে পেরেছিল। একে তো সে এখানকার জমিদার বাড়ীর দৌহিত্রী তার উপর তার নিজের রূপগুণও যথেষ্ট ছিল। তার মিষ্টি নম্র ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নমিতা দাশ শীঘ্রই এখানকার হালচাল সব বেশ বুঝে নিয়েছিলেন; তাই স্কুলের জন্ত অনিন্দিতাকে আর খুব বেশী খাটতে হয় না।

এই সময় যে সব সরকারী কর্মচারীরা সৈনিকদের জন্ত কিছু করতেন না, তাঁদের উন্নতির কোন আশা ছিল না। সেইজন্ত শশধর বাবুর স্ত্রী মৃণালিনীদেবী, স্বামীর যা'তে উচ্চপদ লাভ হয় সেই আশায়, স্থানীয় সৈনিকদের জন্ত একটি

“ক্যান্টিন” খুলেছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসে খুব ঘটা করে ক্যান্টিনের উদ্বোধন করে গেলেন। মুণালিনীদেবী অনেক প্রশংসা লাভ করলেন। অনেক স্বেচ্ছাসেবিকা জোগাড় করলেন তিনি এই ক্যান্টিন চালাবার জন্তে। মুণালিনী দেবী অনিন্দিতাকেও স্বেচ্ছাসেবিকাদের দলভুক্ত করে নিলেন। সোম, বুধ ও শুক্র এই তিন দিন তার পালা ছিল ক্যান্টিনে যাবার। মিলিটারি গাড়ী সব কর্মীদের তুলে নিয়ে যেত ক্যান্টিনে, আর পরে পৌছেও দিয়ে যেত।

অনিন্দিতা যে কাজের ভার নেয় সেটা সে করে মন প্রাণ দিয়ে। এই রকমই ছিল তার রীতি। অত্যাশ্চর্য্য স্বেচ্ছাসেবিকারা প্রায়ই একটা না একটা ওজর করে ক্যান্টিন থেকে ছুটি নিত। কিন্তু অনিন্দিতা একদিনও ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেনি। অনেক সময় তাকে একলাই ক্যান্টিন চালাতে হয়েছে। একজন মাইনে করা মেট্রন ছিল। তারই সাহায্য পেত সে নিয়মিত ভাবে। অনিন্দিতার কাজ করবার ক্ষমতা দেখে মেট্রন অবাক হয়ে যেত। এক সঙ্গে ৫০ জন সৈনিক এসে কেউ চাইত চা, কেউ চাইত কফি, কেউ চাইত সরবৎ। কাউকে দিতে হ’ত টোষ্ট, কাউকে বা দিতে হ’ত বিস্কিট নয় তো কেক। মাদ্রাজিদের জন্ত দোসে ইডুলি রসম্, ইংরেজদের জন্তে কেক শাওইচ, বাঙ্গালীদের জন্ত কচুরী সিঙ্গাড়া সব কিছুই সে হাসি মুখে পরিবেশন করত। একটুও বিরক্তি দেখাত না। এই সব সৈনিকদের মধ্যে অনেকে অশিক্ষিত ছিল। ভদ্রমহিলারা যে স্বেচ্ছায় তাদের জন্ত পরিশ্রম করতেন এ কথা তারা সব সময় মনে রাখত না। চা দিতে একটু দেরি হ’লে অনেক সময় তারা মহিলাদের সামনেই গগগগ করতে আরম্ভ করত। একলা অনিন্দিতার পক্ষে এতগুলি লোককে এক সঙ্গে তাদের ভোজ্য ও পানীয় বিতরণ করা সম্ভব হয়ে উঠত না। দেরি হয়েই যেত। কিন্তু অনিন্দিতার মিষ্টি ব্যবহারে এই সব সৈনিকরা এত মুগ্ধ হয়ে যেত যে তারা রাগ করতে ভুলেই যেত।

মেট্রন হেসে বলেন একদিন অনিন্দিতাকে—“আশ্চর্য্য; আপনি কি করে এই সব লোকগুলকে ঠেকিয়ে রাখেন? বাবা, একটু দেরি হ’লে ওরা কি গুগগোলই না বাধায়।”

একদিন অনিন্দিতা খুব তৎপরতার সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছিল ক্যান্টিনে এমন সময় মেট্রন বলেন—“মেজর গাঙ্গুলি আসছেন ক্যান্টিন পরিদর্শন করতে।”

অনিন্দিতা তখন এত ব্যস্ত ছিল যে মেট্রনের কথা ভাল করে তার কানেই পৌঁছয় নি। সে মাথা নীচু করে এক মনে একজনের জন্ত কোকো গুলছিল, এমন সময় শুনল কে যেন বলছে—“আপনিই কি অনিন্দিতা দেবী?” অনিন্দিতা চোখ তুলে চাইল। একজন থাকি পোষাক পরা ভদ্রলোক তাকে বলেন—“নমস্কার, আমি মেজর গাঙ্গুলী, স্থানীয় মিলিটারি হাসপাতালের চার্জে আছি। আমার উপর ক্যান্টিন পরিদর্শন করবার ভার। সবদিন আমি আসতে পারি না। ভয়ানক ব্যস্ত থাকি তো? আজ একটু অবসর পেয়েই দেখতে এলাম।”

অনিন্দিতা বল—“এই ছেলেটি অনেকক্ষণ থেকে তার কোকোর জন্ত অপেক্ষা করে আছে। একে কোকো দিয়েই আপনাকে সব নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি—” তারপর একটু থেমে বল—“যদি মেট্রনের হাত খালি থাকে তবে তিনিও আপনাকে সব দেখাতে পারেন।” “তার দরকার নেই” বলে মেজর গাঙ্গুলী কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে অনিন্দিতার কোকো বানান দেখতে লাগলেন।

অনিন্দিতার সুন্দর হাতের চামচ নাড়বার স্থলিত ভঙ্গীটি দেখতে তাঁর লাগছিল ভাল। ছেলেটিকে কোকো দিয়ে অনিন্দিতা মেট্রনকে বল—“আপনি একটু এখানে থাকুন, আমি মেজর গাঙ্গুলীকে রান্নাঘরটিরগুলো দেখিয়ে আনছি।”

ক্যান্টিনটা একটা তাঁবুর ভিতর ছিল। একদিকে রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। একটা তারের দরজা দেওয়া ঘরে খাওয়ান হত। একটা বড় হলে গান বাজনা, খেলা ধূলা করবার ব্যবস্থা ছিল। ক্যান্টিনের পরিচ্ছন্নতা দেখে মেজর সাহেব সন্তুষ্ট হলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন অনিন্দিতাকে—“আচ্ছা, আপনি একলাই ক্যান্টিনে কাজ করেন? আপনাকে সাহায্য করবার জন্ত কেউ আসে না?” অনিন্দিতা তাড়াতাড়ি বল—“আজ ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী মনোরমা দেবীর আসবার কথা ছিল আমাকে সাহায্যে

করবার জ্ঞান। কিন্তু তাঁর ছোট ছেলেটির অস্থব বলে তিনি আসতে পারেন নি।”

মেজর গাঙ্গুলী অনিন্দিতার পরিশ্রমে ক্লান্ত মুখের দিয়ে চেয়ে বলেন—“এটা আপনার একার পক্ষে অত্যন্ত heavy কাজ। You look shockingly tired! ক্লান্তির ছায়া আপনার চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ডাক্তার হিসাবে আপনার জ্ঞান সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত আমার।” বাধা দিয়ে অনিন্দিতা বল—“না না, আমাকে যতটা পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে আমি ততটা ক্লান্ত হইনি—।” “আপনি তো ডাক্তার নন। আপনি -বা diagnosis করবেন তার চেয়ে আমার diagnosis এর মূল্য আরও বেশী, এটা তো অস্বীকার করতে পারেন না?” অনিন্দিতা কিছু বল না, শুধু হাসল একটু।

মেজর গাঙ্গুলী যে রকম ভাবে চেয়ে ছিলেন অনিন্দিতার দিকে তাতে তাঁর একটু অপ্রস্তুত বোধ হচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি বল—“আমি তা’ হলে যাই, কাজ সারিগে? আপনার তো সব দেখা হয়ে গিয়েছে?” “The idea! এখনও আপনাকে ক্যান্টিনে কাজ করতে দেব মনে করেছেন? Nothing of the kind—আমি এখন ক্যান্টিন বন্ধ করে দেব। যে টুকু কাজ বাকি আছে মেট্রিং করে নেবেন। I am going to take you out for a long drive. বেশ খানিকটা বেড়িয়ে আনব আপনাকে। Fresh air is what you need young lady, বিশুদ্ধ বায়ুই এখন আপনার দরকার।”

মেজর গাঙ্গুলীর হাব ভাব মোটেই ভাল লাগছিল না অনিন্দিতার। মেজরের সঙ্গে বেড়াতে যাবার কোন ইচ্ছাও ছিল না তার। কিন্তু ভদ্রলোক এমন ডাক্তারি চাল মারতে লাগলেন যে বিরক্তি প্রকাশ করাও সম্ভব হ’ল না। চারিদিকে একটা হৈ চৈয়ের সৃষ্টি করে মেজর গাঙ্গুলী তাঁকে বলতে গেলে এক রকম জোর করেই তাঁর নিজের মোটরে তুলে দিলেন। “এখান থেকে আমার বাড়ী বেশ খানিকটা দূর। বাড়ী পর্যন্ত হুড় নাড়িয়ে গেলেন যথেষ্টই হাওয়া পাওয়া যাবে। বেড়াতে যাবার কোন প্রয়োজন হ’বে না। আপনি আমাকে সোজা বাড়ী নিয়ে চলুন,” বল অনিন্দিতা। “আপনি কি মনে করেন একজন

qualified ডাক্তার আপনার পরামর্শ মত চলবে?” গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন মেজর গাঙ্গুলী। অনিন্দিতার এবার সত্যিই রাগ হ’ল, কিন্তু আত্মসম্বরণ করে বল—“বেড়াতে যাবার সময় হ’বে না।” তারপর হাতের ঘড়ীটার দিকে চেয়ে বল—“পনের মিনিটের মধ্যে বাড়ী না পৌছলে বাড়ীর লোকে চিন্তিত হ’বেন। তা’ ছাড়া স্থলের কতকগুলি কাজও আমার হাতে আছে।” অনিন্দিতার কথা শেষ হ’বার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মেজর—“কাজ, কাজ, কাজ! Do you want to kill yourself with work? আপনার বয়সের মেয়ের এমন কাজ পাগ’লা হওয়া তো উচিত নয়? এখন আপনার ফুর্টি করবার বয়স। Learn to play, my dear young lady! খেলতে শিখুন, ডাক্তার হিসাবে বলছি ফুর্টি করতে শুরু করুন, ফুর্টি না করলে অকালে বুড়িয়ে যাবেন।” তারপর অনিন্দিতার বিরক্তিপূর্ণ গম্ভীর মুখ দেখে বলেন—“আমার কথায় বিরক্ত হ’বেন না। আমি ডাক্তার। আমার এই রকম পরামর্শ দেবার অধিকার আছে।”

মেজর সাহেব তাঁর মোটা গরম হাত দিয়ে অনিন্দিতার একটা হাত ধরলেন। অনিন্দিতার সর্বাঙ্গ রী-রী করে উঠল। ইচ্ছা করছিল চলন্ত গাড়ী থেকেই লাফিয়ে পড়তে। সে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। সে তাঁর হাতটা সরিয়ে নিয়ে আরও একটু সরে বসল। তারপর বাশের শাঁকোটা দেখিয়ে বল—“আপনি আমাকে এখানে নামিয়ে দিন। ওখান থেকে আমার বাড়ী বেশী দূর নয়। আমি অনায়াসে হেঁটে চলে যেতে পারব।” মেজর অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বলেন—“আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কেবল আমার কর্তব্য পালন করছি। ডাক্তার হিসাবে আপনার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তই পরামর্শ দিচ্ছিলাম। আপনার বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রয়োজন। একটা Scientific outlook cultivate করা দরকার। জানি আপনি আমার উপর দৃষ্টিমত বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু আমি নিরপায়। কর্তব্য পালন আমাকে করতেই হ’বে।” তারপর একটু থেমে বলেন—“পথে আপনাকে নামিয়ে দিতে

পারি না। আপনাকে বাড়ী পৌছে দিতেই হ'বে আমাকে। শুধু তাই নয়, আপনার অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করে আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক করে দেব।”

অনিন্দিতা তখনও গম্ভীর হয়ে বসে আছে দেখে মেজর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন—“কর্তব্য পালন করা যে কত কঠিন তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমি হয়ত চিরদিনের জন্ত আপনার বিরক্তিজান্ন হয়ে গেলাম। কিন্তু কি করব? I am cursed with a sense of duty; সত্যি, আমার মত কর্তব্য বোধ থাকা একটা অভিশাপ।” মেজরের কোন কথাই তার ভাল লাগছিল না। অথচ প্রতিবাদ করবার মত কোন দোষও সে খুঁজে পাচ্ছিল না। মেজরের গাড়ী অনিন্দিতার বাড়ীর সামনে আসতেই অনিন্দিতা গাড়ী থামাতে বলল। মেজর নাম্বার আগে একবার চাইলেন অনিন্দিতার দিকে।

এই সমস্ত ব্যাপারটা অনিন্দিতার মোটেই ভাল লাগছিল না। তার সব রক্ত যেন গিয়ে জড় হয়েছিল তার মাথায়। রগ দু'টো টিপ্‌টিপ্‌ করছিল। সাদা গাল দু'টিতে বিরক্তির রক্তিম আভা বেশ স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল। মেজর গাড়ী থেকে না নেমেই বলেন “What is the matter, my dear, you look quite feverish? মুখ চোখ লাল, আমার সন্দেহ হ'চ্ছে, আপনার নিশ্চয় জ্বর এসেছে। গ্রামে এসে ম্যালেরিয়া বাধিয়ে বসেন নি তো?” মেজর সাহেব অনিন্দিতার জ্বর দেখবার জন্তে তার কপালে হাত দিলেন। ঠিক সেই সময় অনিন্দিতাদের ফটক থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন অরুণ চ্যাটার্জী। অনিন্দিতার দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিত হ'ল। অনিন্দিতার লাল গাল আরও লাল হয়ে উঠল। অরুণের দৃষ্টিতে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হ'ল অনিন্দিতার। অরুণ একবার তার দিকে চেয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। মেজরকে সাময়িক কায়দায় উচ্চপদস্থ অফিসারকে যে ভাবে অভিবাদন জানাতে হয় সেইরূপ অভিবাদন জানিয়ে বড় বড় পা ফেলে মুহূর্তের মধ্যে অরুণ তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

কোন নিমন্ত্রণ না পেয়েও মেজর অহুসরণ করলেন অনিন্দিতাকে। বাড়ীতে ঢুকেই অনিন্দিতা খোঁজ নিল

নগেনমামার। ইচ্ছা ছিল তাঁর হাতে মেজরকে সমর্পণ করে সে চলে যাবে, কিন্তু নগেনম বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না। হেমাঙ্গিনীদেবীও তখন তাঁর সইয়ের বাড়ী থেকে ফেরেন নি। অনিন্দিতা বলল—“বাড়ীতে মামাবাবু, মাসিমা কেউই নেই। আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন? হাঁসপাতালে ফিরতে শেষে দেরি হয়ে যাবে।” মেজর বলেন—“আমি না হয় কাল এসে আপনার অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করব।” মেজর ফিরে বাবার জন্তে এক পা এগুলেন। তারপর আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—“By the way, গেটের কাছে যে ছোকরাটিকে দেখলাম ঐটি ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী না?” ক্ষুদ্র একটি “হ্যাঁ” বলল অনিন্দিতা। মেজর আবার প্রশ্ন করলেন—“এ বাড়ীর সঙ্গে খুব পরিচিত বলে মনে হ'ল।” অনিন্দিতা কোন জবাব দিল না। “হঁ” বলে মেজর একবার চাইলেন অনিন্দিতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর আবার একবার বলেন—“হঁ”। এক পা এগুলেন, আবার ফিরে এলেন। তারপর ফের জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনার অস্থখ কি ঐ ছোকরাটিকে কেন্দ্র করে?”

অপমানে অনিন্দিতার সমস্ত শরীর বিধিয়ে উঠল। সে নিজেকে সংযত রাখবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করল। ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে মেজরের দিকে চেয়ে সে শুধু বলল—“নমস্কার, আমি বিশ্বাস করতে যাচ্ছি।” গলার স্বর তার বরফের মত ঠাণ্ডা। মেজর তাতাড়াতি বলেন—“ডাক্তার হিসাবে কতকগুলি অপ্রিয় প্রশ্ন করতে আমরা বাধ্য হই। এতে বিরক্ত হওয়া উচিত নয় আপনার। একটু আগেই তো বলেছি—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে সব কিছু দেখা উচিত। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অধিকাংশ ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ধারাপ হয় প্রেমসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে।” অনিন্দিতা এমন লোকের পাল্লায় পড়েনি কোন দিন। সে যত ইচ্ছা অপমান করে যাচ্ছে অথচ এমন ভাবে কথাগুলো বলছে যাতে তাকে দোষ দেওয়াও চলে না। সে তাতাড়াতি—“নমস্কার” বলে ঘরের ভিতর ঢুক গিয়ে দরজাটা একটু জোরেই বন্ধ করে দিল।

(৭)

অনিন্দিতা বাগানে এক কোণে বসে বই পড়ছিল। অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে সে ভাবছিল “ভজাকে” ডাকবে একটা বাতি দিয়ে যাবার জন্তে। এমন সময় সে শুনল ভজা কা’কে বলছে—“পিসিমা কাকাবাবু ছু’জনেই বাড়ী নেই।” তারপর অনিন্দিতা শুনতে পেল মেজর গাঙ্গুলীর গলা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ভজাকে—“মিস্ সাহেব বাড়ী আছেন?” ভজা “মিস্ সাহেব” কি জিনিষ জানত না। সে তাঁড়াতাড়ি বলল—“ও সব কেউ নেই এখানে। থাকবার মধ্যে আছেন ‘দিদিমণি’—” মেজর বললেন—“That’s right, আমি তোমার দিদিমণিকেই চাই।” এই বলে মেজর সাহেব ভজার পাশ কাটিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালেন অনিন্দিতার পাশে।

একটা টনিকের বোতল বেতের টেবিলটার উপর রেখে তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন—“তোমার জন্তে টনিক এনেছি; খাবে।” অনিন্দিতা এতটা আশা করে নি। সে ভেবেছিল অন্ততঃ কিছুদিন আর এ মুখো হ’বেন না মেজর গাঙ্গুলী। সে কি যে বলবে ঠিক করতে পারল না। অনিন্দিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে মেজর বললেন—“আমি তোমায় ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করলে কোন দোষ হয় না। It is the privilege of age, বয়সের একটা দাবী আছে তো? এটা নিশ্চয় তুমি স্বীকার কর, অনিন্দিতা?”

অনিন্দিতার হাতের উপর একটা হাত রাখল মেজর গাঙ্গুলী। রাগে অনিন্দিতার সর্ব শরীর জলে উঠল। কিন্তু কিছুতেই সে তার মনোভাব প্রকাশ করবে না মেজরের সামনে এ’টা সে ঠিক করেছিল। তাই সে তার হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল—“টনিকটার দাম কত?” বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতব্যাগ খুলে টাকা বের করতে গেল। অনিন্দিতার হাতখানা চেপে ধরে বললেন মেজর—“পাগল নাকি? একটা সামান্য টনিকের দাম আবার তুমি দেবে কি? তার চেয়ে আমাকে একটু লাইম জুস ঢেলে দাও।” টেবিলের উপর লাইম জুসের বোতল ও কতকগুলি গ্লাস আগে থেকেই রাখা ছিল। একটা বড় কাঁচের জগে ঠাণ্ডা জলও ছিল। অনিন্দিতা লাইম জুস তৈরী করে

মেজরকে দিয়ে বলল—“আমাকে একটু excuse করুন, আমি এখনি আসছি।”

সে তাঁড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়ে ভজাকে ডেকে বলল—“চট করে পাশের বাড়ী থেকে মাসিমাকে ডেকে আনতো? আর শোন, হাঁসপাতালের ডাক্তারসাহেব এবার যদি আমাদের বাড়ী আসেন আর যদি মাসিমা বা নগেন মামা বাড়ী না থাকেন তবে তাকে কোন উপায় করে ফিরিয়ে দিস।” “যে আজ্ঞা দিদিমণি, আমি এখনি পিসিমাকে ডেকে আনছি।” অনিন্দিতা ফিরে গেল বাগানে মেজরের কাছে। উদ্বিগ্ন হয়ে সে বসে রইল মাসিমার প্রতীক্ষায়। ঘরের ভিতরে কার পায়ে শব্দ শুনলেই সে ভাবে মাসিমা এলেন বুঝি। সে কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। মেজর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন অনিন্দিতার দিকে। তারপর বললেন—“Why are you so restless, my dear? স্থির হয়ে বসতেই পারছ না যে? এমন ছটফট করছ কেন? তোমার স্নায়ুগুলো এত চঞ্চল হ’ল কি করে? এ’ত ভাল নয়? এ’তে শরীর তাঁড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। অমন করে বাড়ীর ভিতর দেখছ কেন? কারও কি আসবার কথা আছে? সেই ছোকরাটি নাকি?”

অনিন্দিতা কোন জবাব দিল না। ঘরের ভিতর মাসিমার সাড়া পেল সে। তিনি যেন কা’কে বলছেন—“এস না, বাগানে এস।” মিলিটারি বুটের আওয়াজে তার বুঝতে বাকি রইল না কে এসেছে। হঠাৎ তার গাল লাল হয়ে উঠল। মেজর চাইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনিন্দিতার দিকে, তারপর বললেন—“তোমার জর হয় নি তো?” অনিন্দিতা কিছু বলবার আগেই মেজর তার হাত ধরে পালস দেখতে শুরু করলেন। মাসিমা অরুণকে নিয়ে যখন তাদের কাছে এসে পৌঁছেছেন, ঠিক সেই সময় মেজর তার হাত ছেড়ে দিলেন। মনে হ’ল যেন মাসিমার আগমনে মেজর গাঙ্গুলী অনিন্দিতার ধরা হাতখানা ছেড়ে দিলেন।

অনিন্দিতার রাগ হ’ল। যতবার তা’কে অরুণ মেজর গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখবে ততবারই কি এমনি একটা বিলী ঘটনা ঘটবেই? ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী মেজর গাঙ্গুলীকে

অভিবাধন জানালেন। অনিন্দিতাকে কিছুই বলেন না। তারপর মাসিমার দিকে চেয়ে বলেন—“আমি তা’ হ’লে আসি আজ!” মাসিমা তাড়াতাড়ি বলেন—“এর মধ্যে যাবে কি বাবা? বোস একটু।” তারপর অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বলেন—“অরুণকে একটু লেবুর সরবৎ দে।” অনিন্দিতা কিছু না বলে একটা গ্লাসে লাইম জুস তৈরী করে অরুণের দিকে এগিয়ে দিল। অনিন্দিতার দিকে না চেয়েই একটা শুষ্ক “ধনুবাদ” জানিয়ে অরুণ লাইম জুস চুমুক দিল।

মাসিমা মেজরের দিকে চেয়ে বলেন—“অনিন্দিতাকে কেমন দেখছেন? আমি তো ওকে বলেছি এক হপ্তার মধ্যে যদি আগের স্বাস্থ্য না ফিরে পায় তা’ হ’লে আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব।” মেজর বাধা দিয়ে বলেন—“না, না, তার কোন প্রয়োজন নেই। একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি একটা টনিক এনে দিয়েছি। ওটা নিয়মিত খেলে কার্যশক্তি পূর্ণমাত্রায় ফিরে পাবেন।”

এ সব প্রসঙ্গ অনিন্দিতার একেবারেই ভাল লাগছিল না। সে স্কুলের একটা কাজের দোহাই দিয়ে ভিতরে

চলে গেল। কাজ না করে সে সোজা সেই বাঁশের শাঁকোর কাছে গিয়ে বসল। কোন চিন্তার মধ্যে পড়লে সে এই খানটিতে আসে সান্ত্বনার জন্তে। সন্ধ্যার মিষ্টি গন্ধমাখা বাতাস এসে তার মনের প্লানি অনেকখানি উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সবে একটু স্থস্থ বোধ করছিল সে, এমন সময় মেজরের গাড়ী এসে দাঁড়াল ইখানে। এটা ইসপাতালে যাবার বিপরীত রাস্তা। এ রাস্তায় যে মেজরের গাড়ী আসবে তা’ সে ভাবতেই পারেনি। বরং অরুণেরই ছিল এটা চলার পথ। তার অবচেতন মন বোধ হয় তাকেই চাচ্ছিল কিন্তু এসে দাঁড়ালেন মেজর গান্ধুলী। বলেন—“এস একটু বেড়িয়ে আসা যাক। ঐ ছোকরাটি বড় বিরক্ত করে তোমায়? কাজের নাম করে এখানে পালিয়ে এলে যে?” অনিন্দিতা কিছু বলবার আগেই অরুণ সেইদিকে এসে পড়ল। বেড়াতে যাবার নিমন্ত্রণটা ও বাকি সব কথা তার কানে গেল। মেজরকে সেলুট করে সে চলে গেল। শুধু যাবার আগে সে একবার চেয়ে গেল অনিন্দিতার দিকে। তার চাহনী তাকে অনেক কিছু বলে গেল। [ক্রমশঃ

নীলকণ্ঠ

বন্দে আলী মিয়া

ধীরে ধীরে নিভে আসে নিশীথের আয়ু
নিভে আসে জীবনের ভীষণ দীপ শিখা,
কালের প্রহরী হয়ে আমি জেগে আছি
নির্নিমেষ চোখে মোর দহনের জ্বালা।

প্রতিদিন জগ্ন লভি উদয় প্রভাতে
ধরিত্রীর ধূলি পথে যাত্রা হয় স্বপ্ন,
সংসারে নিত্য নব জনতার ভিড়
ইহাদের কেহ চেনা—কেহ বা নবীন।

ছপূরের খর রৌদ্র দেহে মোর লাগে
লাগে এসে তাপ দগ্ধ মনের গহনে,
শতাব্দীর দীর্ঘ পথ ছায়া তরু হীন
দ্রই পাশে মরুভূর উত্তপ্ত বালুকা।

স্বার্থলোভী শকুনেরা পাশে পাশে রহে
রহে তারা এতটুকু সুযোগের আশে,
জানে তারা খুনরাঙা ধূসর জীবন
এখনি হয় তো তার হয়ে যাবে শেষ।

বিষপাত্র পূর্ণ হলো কাণায় কাণায়
দিবসের ক্রন্দে আর রাতের নিশ্বাসে—
জানি এই হলাহল স্তম্ভ মোর তরে
সব তার ধীরে ধীরে করি নিঃশেষ।

রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিদীপ্তি দেবী

আজ প্রায় ৮২ বৎসর পূর্বে বীরভূমের এক পল্লী অঞ্চলে একটি শিশু জন্ম নিয়েছিল তার মাতৃকোড়ে। তার পিতা শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। কে জানত তখন যে একজন কর্মবীর জন্ম নিল বীরভূমের নাক্রাকোন্দা গ্রামে।

রাণীগঞ্জের সন্নিকটে এগেরা গ্রামে মেশোমশাই শ্রীধারব লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে থেকে রাণীগঞ্জ বিদ্যালয়ে বালক অবিনাশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হ'ল। যথাসময়ে এণ্ট্রেন্স পাশ করে অবিনাশচন্দ্র তাঁর অপরিমিত মেশোমশাইয়ের কাছে এলাহাবাদে থেকে এম এ পাশ করে এলাহাবাদ ও আগ্রার কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। সেই সময় যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমত তাঁর কয়লার ব্যবসায়ের কিছু কিছু কাজ অবিনাশচন্দ্র সেই অঞ্চলে করতে থাকেন। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা লক্ষ্য করে যাদবলাল তাঁকে অধ্যাপকের কাজ ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় লিপ্ত থাকতে পরামর্শ দিলেন। তিনি লায়ক ব্যানার্জী কোম্পানীর সহিত যুক্ত হ'লেন।

১৯১১ সালে অবিনাশচন্দ্র নিজে স্বতন্ত্র ব্যবসায় আরম্ভ করেন—এ, সি, ব্যানার্জী ও কোম্পানী নামে। অত্যাঁচ ব্যবসায় ছাড়া রাণীগঞ্জ ও বরিশা অঞ্চলে কয়লার ব্যবসায়েতেই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কি ব্যবসায় জগতে, কি শিক্ষা জগতে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। Indian Mining Federation এর প্রথমে তিনি সম্পাদক এবং পরে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

Bengal Retrenchment Committee ও Agricultural Commission এর সভ্য ছিলেন রায় বাহাদুর। এ ছাড়া Bengal National Chamber of Commerce ও Indian Chamber of Commerce এর Vice-President, Bengal Veterinary College এর Managing Committee এর সভাপতি, Presidency College এর Governing Bodyর সভ্য ইত্যাদি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অবশ্য তাঁর সব চেয়ে বড় কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায় স্থলতানপুর গ্রামে।

বীরভূমের বহু শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। Mor Irrigation Scheme এর পরিকল্পনার সূচনা করেছিলেন তিনিই।

১৯২০ সালে বীরভূম জেলা বোর্ডের প্রথম বেসরকারী সভাপতি হিসাবে তিনি নির্বাচিত হ'ন এবং তখনই তাঁর অসাধারণ কর্ম ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিল বীরভূমবাসী।

অবিনাশচন্দ্র মাতুলগৃহে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পিতার দেশ ছিল বীরভূম জেলার অন্তর্গত স্থলতানপুর গ্রাম। এই গ্রামটি বলতে গেলে অবিনাশচন্দ্রের নিজের হাতে গড়া। “শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়” তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন; তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প একটি উচ্চ স্থানই গ্রহণ করেছে। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকে রায় বাহাদুর একবার নিয়ে গিয়েছিলেন স্থলতানপুরে। তাঁরই মুখে এই বিদ্যালয়ের অশেষ প্রশংসা শুনেছি আর সেই সঙ্গে শুনেছি রায় বাহাদুরের আতিথ্যের বর্ণনা। এক মুহূর্তের জগাও কোন অসুবিধাই ঘটতে দেন নি রায় বাহাদুর। সব বন্দোবস্ত তিনি নিজেই করেছিলেন। স্থলতানপুরের বালিকা বিদ্যালয়টিও হ'ল রায় বাহাদুরের আর একটি কীর্তি।

লাবপুরে যখন অবিনাশচন্দ্র তাঁর মেশোমশায়ের কাছে ছিলেন তখন সেখানকার বালক ও বালিকাদিগের জগা বিদ্যালয়, গণেশ চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনে তিনি তাঁর মেশোমশাইকে উৎসাহিত করেছিলেন। লাবপুরের মধ্যে এই দেশপ্রেমের কাজে অবিনাশচন্দ্র নিজেকে এমনভাবে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যে সেখানকার লোকে তাঁকে “লাবপুরের অবিনাশচন্দ্র” বলে ডাকত এবং এখনও পর্যন্ত লাবপুর অঞ্চলের লোক তাঁকে লাবপুরের “বড় রায় বাহাদুর” বলেই জানে।

ব্যবসায় করে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু

সে অর্থের প্রায় অর্ধেক তিনি ব্যয় করেছিলেন সুলতানপুর গ্রামের জন্তে।

সাধারণতঃ অর্থশালী ব্যক্তির গ্রামের মায়া কাটিয়ে বসবাস করেন সহরে। অবিনাশচন্দ্র সে ধরণের মানুষ ছিলেন না। কাজ নিয়ে তাঁকে থাকতে হ'ত বটে কলকাতায়, কিন্তু প্রাণ তাঁর পড়ে থাকত তাঁর পল্লীমাটির চরণ তলে। একটু স্থবিধা পেলেই তিনি চলে যেতেন গ্রামে। বিশেষতঃ শারদীয়া পূজা উপলক্ষে তিনি নিয়মিত ভাবে যেতেন সুলতানপুরে।

রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্রকে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলাম সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কাজের ভিতর দিয়ে; কিন্তু তাঁকে দেখেছিলাম প্রথমে সরোজনলিনীতে নয়—ট্রেনে। সে আশ্চর্য্য অনেক দিনের কথা। ভোরের গাড়ীতে পাড়ি দিয়েছিলাম “শান্তিনিকেতনের” পথে। ট্রেনে ভীড় ছিল না। আমরা দুইজন বসলাম একটা বেঞ্চে। সামনের বেঞ্চে বসেছিলেন একজন দীর্ঘকায়, সৌম্যকান্তি ঋষিতুল্য ব্যক্তি। তাঁকে দেখে মনটা প্রথমে প্রসন্ন হ'ল। ভাবলাম ষাড়া শুভ। ট্রেন ছেড়ে দিল ক্রমে বেলা বাড়ল। ভোরের মিঠে আলো কড়া বোধ হ'ল। সামনের ভদ্রলোকটি বল্লেন—ঐ দিকে রোদে আপনারা কষ্ট পাবেন। আমার সঙ্গে যায়গা বদল করুন! তারপর সেই মাসের “প্রবাসী” পত্রিকা পড়তে দিলেন। পরিশেষে মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লেন না। বোলপুর স্টেশনে নামবার জন্ত আমাদের তোড়জোড় করতে দেখে আমাদের সহযাত্রী “শান্তিনিকেতনের” কথা পাড়লেন, তারপর এল শ্রীহেমলতা দেবীর কথা। এইভাবে আমাদের একটা মোটামুটি পরিচয় তিনি পেলেন। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি নিজেকে, পূর্বেরই মত অপরিচিত রয়ে গেলেন। এর পর ৩৪ বৎসর গেল কেটে। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে অবসর পেতেই হেমলতা দেবী আমাদের যুক্ত করে দিলেন সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তিনিই সমিতির সাধারণ সম্পাদক রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চেয়ে দেখি হাতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন চার বৎসর আগে ট্রেনে দেখা সেই মানুষটি।

চলার পথে এমন অনেকেরই সঙ্গে দেখা হয়েছে ট্রেনে।

অনেকভাবে অনেকের কাছে উপকারও পেয়েছি। তাঁদের সেই উপকার, তাঁদের সেই সহৃদয় ব্যবহার মনে আছে কিন্তু মানুষগুলিকে মনে পড়েনা। কিন্তু রায়বাহাদুরকে দেখবা মাত্র চিনতে পারলাম, এমনিই জোরাল ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। আমার মনে হয় এই মানুষটির সংস্পর্শে এলে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া কঠিন।

বীরভূমে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ছিলেন স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত, সেই সময়েই অবিনাশচন্দ্র আসেন তাঁর সংস্পর্শে। নারী মঙ্গল কার্যের যে প্রেরণা পেয়েছিলেন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়, তাকেই রূপ দিয়ে ছিলেন রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র “সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল” সমিতির ভিতর দিয়ে। সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে রায়বাহাদুরেরই হাতের তৈরী। এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির স্থাপক তিনিই। প্রস্তরের মত দৃঢ় এই যে ভিত্তি তিনি গড়েছিলেন তারই উপর তাঁর পরবর্তী কর্মীগণ তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার পালিমাটি লেপন করে নানা ফল ফুল ফলিয়েছেন, কিন্তু ভিত্তি যদি না সুদৃঢ় হ'ত তা' হলে এই দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি তার সেবা কার্যে রত থাকতে পারত কিনা সন্দেহ। যে ঝড় ঝাপ্টা গিয়েছে এর মাথার উপর দিয়ে, বালির বাধ হ'লে কবে সব ধসে যেত।

রায়বাহাদুরের অসাধারণ কার্য্যকরী শক্তি ও অদ্ভুত কর্ম ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলাম তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের কাজে। নিজের অফিসের কাজ সেরেই তিনি আসতেন সরোজনলিনী অফিসে। রাত ৮টা, ৮১০টা পর্য্যন্ত ও কাজ করতেন। ক্লান্তি ছিল না, বিরক্তি ছিল না। হাসি মুখেই তিনি সব কাজ করে যেতেন। একাধারে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের গুরু ভার তিনি বহন করেছিলেন বহুদিন। সমিতির কোন কাজই তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে মনে হত না। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি সমানই মনোযোগ দিতেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণ স্বরূপ। বিদ্যালয়ের বনভোজন, কি সমিতির বাৎসরিক জলুষ্ঠান কিছুই সম্পূর্ণ হত না, যদি তার কেন্দ্রে না থাকতেন রায়বাহাদুর। নিশ্চিন্ত মনে আমরা ঘুরতাম তার আশে পাশে। জান্তাম বিপদ আপদ বাই আশ্রক রায়বাহাদুর

সবই পারবেন ঠেকিয়ে রাখতে। সব্যসাচীর মত যে তাঁর ছুটি হাতই তিনি কর্মব্যস্ত রাখতেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলার্থে।

প্রাণ তো চায় প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির জন্তে, নিজেকে রিক্ত করে ঢেলে দিতে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তাল রেখে চলতে যে পারে না মাহুষের এই দেহটা! তাই ১৯৩৫ সালে শারীরিক অক্ষমতার দরুণ রায়বাহাদুরের সক্রিয় সেবা থেকে বঞ্চিত হল সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি। সেইদিনটা যে এই প্রতিষ্ঠানের জীবনের একটা দুর্দিন সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই প্রতিষ্ঠানকে অবিনাশচন্দ্র ভালবেসে ছিলেন, সত্যি ভালবেসে ছিলেন; তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—কিছু দিন Vice-President ও পরে Vice-Patron হিসাবে।

গত ৩১শে আগষ্ট বেলা ১২।০ টার সময় অবিনাশচন্দ্র ৮২ বৎসর বয়সে, সজ্ঞানে, সচ্ছন্দ চিন্তে পরপারের আস্থানে সাড়া দিলেন। অশান্ত, প্রপীড়িত পৃথিবীর কোলাহল ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন পরপারের পরম শান্তি ভোগ করতে। দীর্ঘ দিনের কর্মক্লান্ত দেহখানি তাঁর বিশ্রাম পেল।

অবিনাশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে মর্ম্মর মূর্তি নির্মাণ করবার ক্ষমতা হয়ত আমাদের নেই। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত এইটুকু বলতে পারি যে, যতদিন সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি বেঁচে থাকবে ততদিন এই সমিতির মূলে যার মঙ্গল হস্তের ছাপ রয়েছে সেই রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বেঁচে থাকবেন এই প্রতিষ্ঠানের কাজের ভিতর। পরিশেষে কবির ভাষায় বলি—

“ভরা থাক স্মৃতি স্মৃতি বিদায়ের পাত্রখানি।”

স্ট্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী

শ্রীমুখাকান্ত দে

আমার স্ত্রী। ভারি ভালো লাগে আমার বলতে।
মনে মনে আবৃত্তি করি আমার স্ত্রী,
আমার সম্পত্তি, আমার এটা, আমার সেটা...
জপ-মন্ত্রের মত।
আমি কতী, আমি ঈশ্বর, আমি স্বামী,
আমি এবং আমার এতটুকো কথার জোড়া নেই,
পৃথিবীতে আর সব অপরিচিত, সব অজানা,
তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ এক, নাম তার আমি,
তার মঙ্গল শুধু আমার।
বাকী বৃহৎ অনাস্থীয় জগতের সঙ্গে সীমা-রেখা
টানলে কে?
জামার।

সঙ্গে সঙ্গে আমি একা নই, সঙ্গার মধ্যে এ বোধ
জাগালে কে?
আমার।
নমস্কার করি এই অহং বোধকে। অহংকার এ নয়।
স্বর্ষের জলন্ত তাপ, চন্দ্রের মধুর কিরণ...
এ গুলি কি অহংকার?
অহং বোধকে বিনাশ করলে আমি বিনাশ পাই।
তাই ক্ষমা করো আমার এ রুঢ় আত্মজ্ঞান।

• স্ত্রীকে করছি সন্দেহ অনেক দিন থেকে।
পুরাতন এই আশঙ্কা—স্ত্রী আমার নয়।
এক এক সময়ে ভুল হয়ে যায় মনে, ও কি সত্যি আমার?

এত ভালো, এত সুন্দর, এত কুসুম পেলব—
 বার বার তাকে ছালিঙ্গন করি, বাহুর ভোরে
 বেঁধে তাকে নিষ্পিষ্ট করি,
 বুঝতে চাই, সে নিতান্ত আমার,
 আমার বই আর কারও নয়।
 সে বাধা দেয় না। দিলে হয়ত ভাল করত।
 যত কাছে টেনে আনি, যত মুঠোর মধ্যে ভরি,
 তার সমগ্র সম্বন্ধকে,
 আর মনে করি পেয়েছি, পেয়েছি,
 তত যেন দূরে চলে যায়, সে নয়, তার ভিতরকার
 নাম-না-জানা কিছু।
 পরম মুহূর্তে চরম করে পাওয়ার মধ্যে
 না পাওয়ার এই হাহাকার বুঝতে পারি না।
 দরদী এ মনের কেন বাধা, কিসের বাধা,
 ধরতে পারি না।
 তাকে বুকে রেখেও চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে,
 “কোথায় গেলে?”
 সামলে যাই।
 আমার স্বামিত্ব, ঈশ্বরত্বকে খণ্ডিত করে কে?
 মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি ভালবাসা মিথ্যা?
 আমার এবং তার।
 হায়! মৃত্যু আমি সহিতে পারি, কিন্তু ভালবাসার মৃত্যু—
 কেমন করে সহিব তা।
 ক্রমে ক্রমে মন হয় মেঘাচ্ছন্ন।
 আমার ভিতরে আছে এক পরম পবন ও বিজ্ঞ,
 মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, সংশয় কর দূর,
 পরখ কর, বাজিয়ে নাও।
 হলই বা নিজের জ্ঞী, সে যে পরের জ্ঞীর চেয়ে
 বেশী আপন্যার, প্রমাণ আছে কিছূ?
 প্রমাণ আছে। রাশি রাশি।
 সেবায় যত্নে দিনে রাতের অবিশ্রাম শ্রমে,
 তার বেঁচে থাকায়,
 সন্দেহ করবার জো নেই,
 সুন্দরী বটে,

কিন্তু সে-জ্ঞাতের মেয়ে সে নয়
 যে উচ্চ কণ্ঠে স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করবে।
 তবু আমার মধ্যকার বিজ্ঞের পরামর্শ শুনি।
 পরখ করতে হবে।
 জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই।
 যদি শুধাই আমায় ভালবাসে কি না
 বারে বারে বলবে বাসে।
 মুখের কথা যদি প্রাণের কথা না হয়?
 বলেছিল একদিন, আমি তোমার, জন্ম-জন্মান্তর।
 জন্মান্তরে সে আমায় পাবে কিনা,
 সে কথা ভেবে কুল পাব না।
 সে কথা থাক।
 এ জন্মে তার ভালবাসায় ফাঁক না থাকে ত বতে যাই।
 বড় ব্যস্ত আমি। অনেক কাজ।
 অকাজ হল কাজ। সত্যিকারের কোন কাজ নেই।
 কিন্তু দেখাতে হবে তিলমাত্র সময় আমার নেই।
 হস্ত দস্ত হয়ে ছুটাছুটি করি।
 পাখা খুলে দুমিনিট ঘাম মারবার সময় পাই না।
 স্ত্রী কাছে এসে বসে। চৌঁট তার কাঁপে।
 “হল কি? কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠলে!
 একটু আশ্তে চলো মহাভারত অন্তক হবে না।”
 না ক্ষেপলে আমার চলে না যে।
 ইচ্ছা করে দূরে সরে থাকি, অনেক—অনেক—ক্ষণ।
 সারা দিনমান।
 অবকাশ যদি যা খুসি করবার।
 বুঝতে দি, কেউ আড়ি পাতেছে না।
 ছকুম দি, যাতে সে যা খুসী করতে পারে।
 কাউকে জিগোস্ করি না, সে কি করে দিন কাটায়।
 আমি অসাবধান, প্রতি পদে দি বুঝতে।
 কিন্তু ঘরে খাটের তলে ডিক্টোফোন বসিয়ে রাখি।
 জানতেও পারে না আমার স্ত্রী।
 তার অলক্ষিতে সাবধানে প্রতিদিন যন্ত্রটি
 খুব ভোরে উঠে নিজের নূতন আপিসে নিয়ে যাই।

চারিদিকের দরজা বন্ধ করে শুনি আমার হৃদয় কি বলে।

সরু গলা। আশ্চর্যের কি আছে। প্রিয়তমের জন্ত বধু
কোন ত্যাগকে ত্যাগ বলে মনে করে না।

নানা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনায় প্রথম প্রথম শিউরে উঠত গা।
এখন ময়ে গেছে।

মোটা গলা। আশ্চর্য।

পরস্পর অনেক কথা, কল্পনা ও করিনি ওর মুখ থেকে বেরোবে।
সাদা আর কালো।

সরু গলা। [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] বুঝেছি, ভালবাসা
আছে তোমার, কিন্তু সাহস নাই। আমাকে
নিয়ে অকূলে ভাসবার দুঃসহ সাহস তোমার
কোথা? ভালবেসে আমি তোমায় টেনে
নামিয়েছি। তোমার ভালবাসায় জোর
কোথায় আমায় টেনে উপরে উঠবার
কিংবা নিজের উপরে উঠবার?

অসতর্ক মুহূর্তে আমায় কি বলি

খেয়াল থাকে কি সব সময়ে?

জানতে পারি, মাঝে মাঝে কথা কয় কার সঙ্গে।

একই লোক কিনা, তার প্রমাণ পাওয়া শক্ত।

তবে একই লোক বলে ভাবলে গল্পটা জমে।

টুকরা টুকরা কথাবার্তার নমুনা,

মোটা গলা। আমি তা ভাবছি না।

সব জড় করে কোন মতে গল্প একটা বানান যায়।

সরু গলা। যাই ভাব, আমার যা ভাববার তা
ভেবে রেখেছি।

সরু মোটা ছু রকম গলায় কথা হয়।

মোটা গলা। আচ্ছা চল, পালাই।

সরু গলা। জানতে পারলে কি হবে? লজ্জার আর
অবধি থাকবে না।

মোটা গলা। জানতে পারবে কে? কেমন করেই বা
পারবে?

সরু গলা। ভয় করে, বড় ভয় করে।

মোটা গলা। ধরা পড়বে বলেই ত ভয়, কাজটাকে
ত ভয় নয়। ধরা না পড়, তার সব
ব্যবস্থাই ত করেছে।

সরু গলা। আর হয় না। সেই পরম ক্ষণটি গেছে
বয়ে, আর ফিরবে না। সামনে পানে চলেছি,
পিছন ফিরে আসতে পারি কৈ? অতিক্রান্ত
হল সময়, তাঁকে অতিক্রান্ত করতে পারেন না
স্বয়ংবিধাতা। স্মরণে তোমার সঙ্গে শেষ
প্রাপ্ত পণ্ডিত যেতে প্রস্তুত যে ছিল সে আর
বৈতে নাই।

সরু গলা। তবু ভয় করে, যদি ধরা পড়ি। তোমার
জন্ত আমি সব করতে পারি। দিতে
পারি প্রাণ। কিন্তু দেখো আমার
মান যেন যায় না, যায় না।

মোটা গলা। এত শীগ্গির শেষ হয়ে গেল। ভালই হল।
আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মনে
ভয় ছিল, পাছে তুমি রাজি হও। বাইরে
সাহস দেখাতে গিয়ে বুকের ভিতর বল
পাচ্ছিলাম না। এই হয়েছে ভাল। যেমন আছ,
তেমনই থাক। তোমাকে তোমার স্বামী, বাজী
আর ঐশ্বর্য ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না,
আমাকেও তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে হবে
না। শোধবোধ।

মোটা গলা। দিনরাত আশঙ্কা! সব আনন্দ
মাটি করে দিচ্ছে। চল পালিয়ে যাই।

সরু গলা। সেই ভালো, চল।

মোটা গলা। একটু ও বাধল না চল বলতে, আশ্চর্য!
এই তোমার পুরাণ ঘর বাড়ী, তোমার
পুরাণ স্বামী-ছেড়ে চলে যাবে?

সরু গলা। একে বলে শোধবোধ! দেবতা বলে যাকে মনে
বরণ করেছি, তার অপদেবতার রূপ আমার
মনে ক্রেশ দেয়। ওতে আমার উপায় নেই।
ভাল যাকে বেসেছি, তাকে চির জন্ম

সরু গলা। সব ছেড়ে চলে যাব। এক বস্ত্রে। শুধু তুমি
সঙ্গে থাক। তাহলেই স্থখী হব।

মোটা গলা। আশ্চর্য!

বেসেছি। সে অপদেবতা হলেও তাকেই
নমস্কার।

এই স্বরে একটানা চলে কথা।

মান-অভিমান।

দিনের পর দিন।

সাত দিন ধরে ডিক্টোফোন শুনি আর ভাবি;

ভাবি আর শুনি।

ভাবি, আমার জী, এত ভাল করে থাকে জানি,

অন্তত মনে করেছি জানি,

কই, পারে সে এমন কবে কথা কইতে?

কোন দিন ত সে পরিচয় পাই নি।

বরং উল্টোই জানি সত্যি বলে।

মুখচোরা সে। উপস্থাসের নাট্যিকার মত কথা

যোগায় না তার মুখে।

তবে। খটকা একটা লাগে।

সন্দেহ করবার অবকাশ থাকত যদি ভাষা চলত

সরু গলায় কথা যে কইছে সে আমার জী নয়।

বৎসরের পর বৎসর ধরে যে আওয়াজ আমি

শুনে আসছি,

ঘুমিয়ে থাকলেও যে আওয়াজ তুল করবার

আমার ঘো নাই,

সে আর কারও নয়—আমার জী র—আমার জীর।

মোটা-গলাকে চিনিনে,

কিন্তু সরু গলাকে চিন্তে একটুও দেবী হয় না।

দশ দিন এল, গেল।

দৈর্ঘ্য আর কত দিন রাখা যায় বল।

একদিন হঠাৎ তিন পহরে, বলা নাই, কওয়া নাই,

আমি ঝড়ের মত ঢুকে পড়ি আমার শোবার ঘরে—

আশা আর আশঙ্কায় বুক কাঁপছিল, স্বীকার করা ভাল।

নিরাশ হলাম, আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ হল।

দেখি, সোফার উপর জী ঘুমিয়ে পড়েছে কাৎ হয়ে

‘পল্লবিনী লভেব’,

ঘুমের ভঙ্গিটি সুন্দর।

মুখের উপর ছ এক গোছা চুল এসে পড়েছে,

মাথার উপর পাখা ঘুরছে,

চুল উড়ছে, কাপড়ও উড়ছে।

খোলা জানালা দিয়ে আসছে শরতের আলো।

স্বথ-স্মৃতির প্রীতির রেশ ঘরে।

সবটা মিলে একটা স্নিগ্ধ, পবিত্র ছবি।

নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকি ওর পানে।

চিনি কি? যত চিনি, তার চেয়েও বেশী চিনি না।

মনে কর কলকাতা শহর, বাংলা দেশ, ভারত;

মনে কর পৃথিবী, সৌর জগৎ, বিশ্ব,—

আজকের ছবির কোন মূল্য নেই।

মনে কর এক বছর, এক শ বছর, হাজার, লক্ষ বছর

আগে বা পরে,

মনে কর এক থেকে লক্ষ আলোর বৎসরের আগে বা পরে,

তুমিই বা কে আমিই বা কে?

এই আমার জী!

আমার বটে, কিন্তু আজকের পরম ক্ষণেও নিতান্ত আমার

বলে জানতে পারলে-বেঁচে যাই।

পারি কৈ? ওকে পাই কৈ?

না, মনকে কর শক্ত।

সুদৃঢ়তা ও কোমলতা যেন জয় না করে মনকে।

দৃঢ় হই। কঠিন হই।

আজকের এই দৃশ্য দেখে ভুললে চলবে না,

এটা ক্ষণিক ছেলেভুলান গল্প মাত্র হতে পারে।

আজকে সত্য প্রকাশিত হয় নি।

কিন্তু ঝড়ের বেগে এসে অথবা আস্তে এসে

একদিন না একদিন আমার জীর দয়িতকে ধরবে,

আর সেদিন সত্যি মন আনন্দিত হবে।

আজ হই নি।

আমার ডিক্টো-ফোন কি কখনও মিথ্যা কথা বলে?

জী একটু নড়ে চড়ে-শুল, আরামের নিশ্বাস ফেলল।

জানালা দিয়ে স্নিগ্ধ আলো-সবটা শরীরের উপর পড়ল।

শব্দ হল।

চেয়ে দেখি, হাত থেকে মাটিতে বই পড়ে গেল।
বই পড়তে পড়তে তাহলে ঘুগিয়ে পড়েছে।
কৌতূহল হল। কি বই পড়ে ও। কোন্ দিকে
দৌড়াচ্ছে ওর চিন্তাগুলি, বই থেকে তার কোন পরিচয়
পাওয়া যাবে কি?
ধর্ম-পুস্তক নয়, জানি। নিশ্চয় গল্প বা উপন্যাস।

তুলে দেখি নূতন লেখকের লেখা আনন্দের এক নাটক।
লেখককে চিনি নে। নাম তার স্বধাকান্ত দে।
রাবিশ ত কতজনেই লিখেছে। এও হবে রাবিশ-লেখক।
অতি-আধুনিক। প্রগতিপন্থী।
লেখা একটাও পড়িনি কারও,
কিন্তু ধরে নিয়েছি, এদের লেখায়
পড়বায় মত থাকে না কিছু।
বরং মালুমকে নীচের পথে নিয়ে যাবার কৌশলী এরা।

আন্তে আন্তে পাতা উল্টাতে লাগলাম।
তারপর কখন যে তন্ময় হয়ে গেছি জানিও নে।
তারপর এক জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল,
আর নড়তে পারে না। পড়ছি—

জানতে পারলে কি হবে? লজ্জার আর
অবধি থাকবে না।

জানতে পারবে কে? কেমন করেই বা
পারবে?

দিনের আলোর চেয়েও সব স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে।

স্ত্রী এইটাই টেচিয়ে টেচিয়ে পড়েছে,

আর ডিক্টোফোন তাই ধরে রেখে আমায় উপহার দিয়েছে।

তারই উপর রচনা করেছি আমি
বালির বিপুল সৌধ,
তাসের ঘর,
ভূমিসাৎ হয়ে গেল এক নিমেষে।

একবার চোখ তুলে তাকাতাই দেখি স্ত্রীর চোখের দৃষ্টি
আমার চোখে নিবদ্ধ।

হাসছে। অন্তত আমার মনে হল, হাসছে।

চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে মুহূর্ত জ্যোতি।

সকলের উপহাস সওয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের নয়।

আর সে স্ত্রীলোক যদি নিজের স্ত্রী হয় ত কথাই নাই।

মনে মনে বললাম, 'ধরনি, দ্বিধা হও,

এ লজ্জা ঢাকবার আর স্থান নাই।'

কিন্তু আমার সন্দেহের কথা ও নাও জানতে পারে ত।

এই ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম

বোকার মত।

কথা বললে না।

একবার শুধু হেঁট হয়ে খাটের তলাটা দেখে নিলে

যেখানে ডিক্টোফোনটা থাকে।

হাসলে, কথা কইলে না সে।

কিন্তু তার চেয়ে কথা কইলে পারত,

কিংবা একটা চাবুকও মারতে পারত।

বুঝতে পারি

কেন শাজ্জ বলেছে, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী।"

কেন বলেছে, "পথে নারী বিবর্জিত।"



ছোট দেশলাইওলী

* ডেনিশ লেখক হান্স ক্রীশ্চিয়ান এণ্ডারসনের

গল্প হইতে অনুবাদ।

ত্রিবাণী দাশ

সেদিন ভয়ানক ঠাণ্ডা, সারাদিন ধরে বরফ পড়েছে। সন্ধ্যার আগেই আকাশ গাঢ় অন্ধকার। তারপর সন্ধ্যা হয়ে এল—বছরের শেষ সন্ধ্যা। ঐ ঠাণ্ডা আর অন্ধকারের মধ্যে একটা গরীব ছোট মেয়ে, খালি মাথায় খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বাড়ী থেকে বাইরে আসবার সময় তার পায়ে নাম মাত্র একটা চটি জুতো ছিল। তার পক্ষে ভয়ানক বড়,—তার মায়ের; তিনি জুতো দুটিকে মেয়েটা বাইরে আসবার আগের মুহূর্ত্ত অবধি ব্যবহার করেছেন। ছোট মেয়েটি রাস্তা দিয়ে আসবার সময় জোরে-চলা-গাড়ীর মাঝখানে পিছলে পড়ে জুতোজোড়া হারিয়ে ফেলেছে। তখনই একটা কোথায় ছিটকে পড়েছিল, খুঁজে আর পাওয়া যায়নি, আর অল্পটা রাস্তার একটা ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ছোট ছেলেটার মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে তার যখন আবার ছোট ছোট ছেলে হবে, তখন তাদের ঐ জুতোর মধ্যে শুইয়ে রাখবে। ছোট মেয়েটার জুতো দিয়ে পা ঢাকাও আর হয়নি। খালি পায়ে পথ চলে ঠাণ্ডা পা তার নীল হোয়ে গেছে। একটা পুরোণো এপ্রনে, অনেকগুলো দেশলাই-এর কাঠি, হাতে এক বাণ্ডিল দেশলাই। সারাদিন তার কাছে কেউ একটা দেশলাইও কেনেনি, আর এক ফার্দিংও কেউ দেয়নি।

দুঃখ ও কষ্টের একটা জীবন্ত ছবির মত, মেয়েটি ফুপায় ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে চলছিল। তার হালকা রঙের খোকোখোকো চুলে ঘাড় অবধি ঢাকা; মাথায় চুল বরফের গুঁড়িতে ঢেকে গেছে। মেয়েটি কিন্তু সে সব কিছু ভাবছিল না। তখন প্রত্যেক জানলার ভেতরে আলো ছিল আর হাঁসের মাংসের স্বগন্ধ ভেসে আসছিল। নতুন বছরের আগের সন্ধ্যা ছিল সে দিন, মেয়েটা সেই কথাই ভাবছিল।

দুটো বাড়ীর মাঝখানের কোণার বৈখানে একটা বাড়ীর কোণে অল্প বাড়ীর কোণে ছাড়িয়ে একটু বার হয়ে আছে, সেখানটায় কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়ল, হাঁটু দুটো গুটিয়ে বুকের কাছে এনে একটু গরম হবার চেষ্টা করল, কিন্তু শীত তার একটুও কমল না। তার বাড়ী ফিরে যাবার সাহসও ছিল না। সকাল থেকে সে একটাও দেশলাই-এর কাঠি বিক্রী করতে পারেনি, এক ফার্দিংও তার উপার্জন হয়নি, এ অবস্থায় বাড়ী ফিরলে তার বাপের কাছে নির্ধাৎ মার খাবে। তাছাড়া বাড়ীটাও ভীষণ ঠাণ্ডা, ঘরের উপর একটা ছাদ ছাড়া আর কোন বন্দোবস্তই নেই, ফুটো ছাদ দিয়ে ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া হু হু করে ঢুকে পড়ে।

মেয়েটার হাত দুটো ঠাণ্ডায় একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিল। যদি একটা দেশলাই বাণ্ডিল থেকে বার করে দেওয়ালে ঘষে জ্বলে নিতে পারে, সেই আগুনে হয়তো হাতটা একটু গরম করা যেতে পারে। একটা দেশলাই সে বার করে নিলে। ক্র্যা-মা-র, একটা কি রকম ফ্যাস ফ্যাস আওয়াজ করে জ্বলে উঠল। ছোট ছোট হাতদুটা আগুনের উপর ধরতেই শিখাটা একটা ছোট মোমবাতির মত উজ্জ্বল আর গরম মনে হল। আলোটা তারি ভাল লাগল। মেয়েটির মনে হল সে যেন একটা খুব সুন্দর পালিশ করা ষ্টোভের সামনে বসে আছে। পাতুটোও যেন পিতলের হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ঢাকাটাও। আগুনটা কি সুন্দর জ্বলতে লাগল আর উত্তাপটাও তারি আরামের মনে হল। কিন্তু একটু পরেই দেশলাই-এর আগুন নিবে গেল, আর সেই সঙ্গে ষ্টোভের সুন্দর ছবিটাও মিলিয়ে গেল; পড়ে রইল শুধু তার হাতে দেশলাই-এর পোড়া কাঠিটা।

দ্বিতীয় কাঠিটাও দেওয়ালে ঘষে জ্বালা হ'ল, এবার যখন কাঠিটা জ্বল তখন তার আলো দেওয়ালের উপর

পড়তেই দেওয়ালটা কি রকম স্বচ্ছ হয়ে গেল। মেয়েটি সেইখানে বসেই ঘরের ভেতরটা যেন দেখতে পেল। বরফের মত সাদা একটা চাদর টেবিলের উপর ঢাকা আছে, তার উপর সাজান আছে ঝকঝকে খাবারের বাসন। আপেল ও প্লামপোরা বলসানো হাঁসটা থেকে তখনও খুব ঘোঁয়া বার হচ্ছে। এসব দেখতে তো খুব ভাল লাগল, আরও ভাল লাগল যখন সেই হাঁসটা টেবিল থেকে লাফিয়ে পড়ে বৃকের উপর ছুরি কাঁটা নিয়ে তার কাছে গড়াতে গড়াতে এসে পৌঁছাল। ঠিক সেই সময় দেশলাইটা শেষ হ'য়ে গেল, চোখের সামনে মোটা ঠাণ্ডা স্যাঁতে ঠাণ্ডা দেওয়াল ফুটে উঠল। মেয়েটি আবার আর একটা দেশলাই জ্বালল। এবারে সে দেখলে সে বসে আছে একটা সুন্দর ক্রীসমাস্ গাছের তলায়। দোকান ঘরের কাঁচের জানলায় ভেতর থেকে যে সব সুন্দর সাজানো গাছ দেখতে পাওয়া যায়, এ গাছটা যেন তার চেয়ে অনেক বড়, আরও সুন্দর, হাজার মোমবাতি জ্বলছে, সবুজ ডালের উপর; ছবির দোকানের সবচেয়ে ভাল ছবি মোমবাতি গুলোর উপর ঝোলান রয়েছে। মেয়েটি সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল ঐ গুলোর দিকে, দেশলাইটা অমনি নিবে গেল। কিন্তু ক্রীসমাসের উৎসবের আলো তখন ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠছে। মেয়েটি দেখল ঐ আলো আকাশের তারা হ'য়ে গেছে। একটা তারা খসে পড়ল, আকাশের গায়ে একটা আগুনের রেখা।

মেয়েটি মনে মনে বলে উঠল “এখন কেউ মারা যাচ্ছেন।” কারণ তার বৃদ্ধা ঠাকুরমা, একমাত্র যিনি মেয়েটিকে ভালবাসতেন, বলেছিলেন যে যখন তারা আকাশ থেকে খসে পড়ে তখন একটা আত্মা উর্দ্ধে ভগবানের কাছে চলে যায়। সে আরেকটা দেশলাই-এর কাঠি দেওয়ালে ঘষে জ্বলে

নিলে, আবার জায়গাটা আলো হয়ে উঠল, সেই আলোর মাঝখানে সে স্পষ্ট দেখল তার ঠাকুরমা দাঁড়িয়ে আছেন।

“ঠাকুরমা” মেয়েটি জ্বোরে বলে উঠল—“আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও—আমি জানি তুমি এই দেশলাইটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে। তুমি মুহূর্ত আগুনের উত্তাপের মত, গরম খাবার, আর ঐ ক্রীসমাস গাছের মত মিলিয়ে যাবে।”

মেয়েটি তাড়াতাড়ি করে দেশলাইয়ের পর দেশলাই বাণ্ডিল থেকে নিয়ে জ্বালতে লাগল—ঐ আলোর মাঝখানে যতক্ষণ ঠাকুরমাকে ধরে রাখা যায়। ঐ কাঠিগুলোও এমন জ্বোরে জ্বলতে লাগল যে দিনের আলোও তার কাছে ম্লান হোয়ে গেল। ঠাকুরমাকে কখনও এমন সুন্দর ও বড় দেখায়নি। তিনি ছোট্ট মেয়েটিকে তার কোলের মধ্যে উঠিয়ে নিলেন এবং এমন এক আলো ও আনন্দের মধ্যে ভেসে গেলেন পৃথিবী থেকে খুব উঁচুতে, যেখানে ঠাণ্ডা স্ফূধা ও কোন কিছুর তাগিদ নেই—তারা ভগবানের কাছে চলে গেলেন।

কিন্তু কোণে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে যে গরীব ছোট্ট মেয়েটি, গোলাপী গাল ও মুখে মুহূর্ত হাসি নিয়ে বসেছিল, সে পুরোণো বছরের শেষ সন্ধ্যাটিতে জমে গিয়েছিল। নতুন বছরের সূর্য্য তার ছোট্ট মৃতদেহের উপর উদ্ভিত হল। মেয়েটি বসেই ছিল, শত ঠাণ্ডা হ'য়ে নামনে দেশলাই নিয়ে, মাত্র এক বাণ্ডিল জ্বালা হয়েছিল। যারা ওখান দিয়ে যাচ্ছিল তারা বললে—“মেয়েটি বোধ হয় নিজেকে গরম করার চেষ্টা করেছিল।” কিন্তু কেউ জানল না, কী সুন্দর জিনিষ ছোট মেয়েটি দেখতে পেয়েছিল এবং সে নতুন বছরে তার ঠাকুরমার সঙ্গে কি গৌরবময় আনন্দের মধ্যে চলে গিয়েছে।

কুকী

(গল্প)

শ্রীমণি ভট্টাচার্য্য

মেয়েটির ডাক নাম হ'ল 'কুকী'। দেখতে চলনসই। ছোট জাত বলে সদাই সজ্জচিতা। অপর সমাজে ত বটেই, নিজেই সমাজেও তেমন সম্প্রসারিতা নয়।

সদাই কেমন যেন আনমনা। কি যেন ভাবে। কিসের অভাব যেন মনকে আঁকড়ে ধরে রাখে—স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস ফেলতেও সে যেন অস্বস্তি বোধ করে।

আজ মহালয়া। তায় গান্ধী জয়ন্তী। গ্রামে মিছিল বসেছে। জাত ছোট হলেও সে যে হিন্দু সে কথা সে কোনদিনই ভোলে না। হিন্দু হওয়ার গৌরব সে যেন অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প। কাজেই মহালয়ার পার্বণের ঘটাতেও তার যেমন লক্ষ্য আবার রাষ্ট্রপিতা গান্ধী মহাত্মনের জন্মদিবস উপলক্ষে সমারোহ সম্মিলনীতেও তার অনুরূপ আস্থা।

গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই যেন মেতে উঠেছে। চারদিকে হৈ চৈ। শ্রীমঙ্গলা কুকীর এখান ওখান থেকে নেমস্তম্বর ঘটা, পালে পার্বণে, বিশেষতঃ এরকম ক্ষেত্রে, কোন দিনই কম নয়। এ বলে, 'চল না ভাই', ও বলে, 'আয় না ভাই'।

জলে ছুলের কি প্রাণ নেই? তাদের শরীরে কি ভিন্ন রক্ত? মানবতার দাবী নিয়ে তারা কি কোন দিনই মাথা উচু করে দাঁড়াতে পাবে না? মল্ল নির্ঝংশ হোক! জাত নিয়ে মারামারি কেন বাপু—ধর্ম যখন এক! সমস্যা! সমাধান বিহীন। কুকী ভাবে, ম্লান হয়ে পড়ে।

'কি লো? এখনও যে সেজেগুজে তৈরী হোস্ নি? আজ তো তোর রথ দেখা কলা বেচার দিন। মনমরা হয়ে কার পিতিক্ষেষ্ট আছিস?'

দত্তগিন্নী কথা কয়টা বলে বেশ একটু হাস্য উপভোগ করলেন। ভাবগতিক বোঝা গেল বেশ একটু শ্রীত হ'য়েছেন। তিনি তন্তবায়-জায়া! পয়সার জোরে 'তৃণবৎ মন্যতে জগৎ' করে থাকেন।

কুকী স্বভাবজাত গাণ্ডীষ্য একটুও বাহত হ'তে দিল না। তার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল সেও যেন 'ডোন্ট কেয়ার' কলে। 'তা হলে তুই আজ যাবিনি বল?'

'যাব, মাসিমা। যাতায়াতে ত আমাদের কোনও বাধা নেই। মহাত্মার রূপায় এটুকু লাভই আমার আপনার পক্ষে মস্ত লাভ বলে মনে করি।'

দত্তগিন্নীর মুখথানায় কেউ যেন এক খালা ছাই মাখিয়ে দিল।

মনে মনে বল্লেন—ছোট মুখে বড় কথার যুগ এসেছে। ইতর ভদ্র একাকার না কলে বুঝি রামরাজ্য হবে না। ওরে বাপু কথায় বলে 'তথাপি চাষা ন চ ভজলোক।'

গর গর ক'রে পাশের বাড়ী ঢুকে পড়লেন।

ব্রাহ্মণ বাড়ী হ'লেও তাঁর অব্যবহিত দ্বার। তাঁকে পেলে তাঁরা হাতে স্বর্ণ পান। লগ্নী কারবারের এমনই মাধুর্য্য।

কুকীর যেন আপদ বিদেয় হল। মুখের ঘাম পুছে সে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিল—ইঠাৎ দূরে একটা হট্টগোল শুনতে পেল।

'পালাও পালাও—'

এধার ওধার তাকানর পূর্বেই কে যেন তাকে লুফে নিয়ে পথের ওধারের বড় চত্তরটায় উঠে দাঁড়াল। ভিরমি যাওয়ার অবস্থায় কুকী অনুভব করল এক জোড়া বলিষ্ঠ হাত তাকে আবক্ষ বেঁধন করে ধরে রেখেছে। স্পর্শ মধুর। তাকে যেন এলিয়ে দিয়েছে।

উর্দ্ধ্বাঙ্গে মেয়েপুরুষ ছুটে আসছে—মহালয়ার মহাপ্রলয় হ'ল নাকি। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করার অবসরটুকুও পাচ্ছে না।

কুকী এতক্ষণে চত্তরে নীত হ'য়েছে। সাবধানী বাহক তাকে বাহুপাশ হ'তে মুক্তি দিয়েছে সত্য, কিন্তু পাশ ছাড়ে

নি। তাকিয়ে দেখার সাহসটুকুও যেন তার হ'রে নিয়েছে। নিশ্চল দেহে সলজ্জ সঙ্কোচ এক অপূর্ণ অবসর এনে উপস্থিত করেছে। কবি কালিদাস থাকলে হয়ত একটা কাব্যই সৃষ্টি করে দিতেন।

‘ধরে ফাল ওরে দড়িটা ধর, পায়ের দিকে—তাড়া দিস্ নে—তাড়া দিস্ নে বলছি’—বিক্ষিপ্ত জনতা পরস্পরকে সাবধান করছে—উৎপাত কিন্তু তখনও অদৃশ্য হ’য়েই আছে। কাকে ধরো,—কিসের দড়ি, পা ছাড়া মাথার দিকেও দড়ি আছে—না কি—কি যেন হেঁয়ালিতে ফেলেছে।

কুকী এতক্ষণে অবকাশ বুঝে পার্শ্বের ত্রাতাকে একবার দেখে নিতে চাইল।

গ্রামের চৌকিদার হস্তদন্ত হ’য়ে ঘোষণা দিয়ে চলেছে—

‘ভয় নেই—ভিড় কমাও বাপু—পানা পুকুরের পাড়ে নেবে পড়তেই জানোয়ার দুটোকে ধরে ফেলা গেছে।

কুকী তখনও ইতস্ততঃ করছিল—এইবার সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে পুরো দস্তুর তাকিয়ে দেখল। সর্কনাশ! করেছে কি—এষে তর্কপঞ্চননের বংশধর! কুকী আঁড়ষ্ট হ’য়ে গেল।

মালার ঝোলায় নারায়ণ শিলা নিয়ে—সত্যনারায়ণ পূজার ব্রতী শাস্ত্রী সোমনাথ আত্মরক্ষার সাথে সাথে আত্মরক্ষা করে ব্রতভঙ্গ করে বসেছেন।

মেলার মাঠে দুই পাঠান দুটো ঘোড়া বেচতে এনেছিল। লোকের ভিড় আর চিংকার শুনে ঘোড়া দুটো দড়ি ছিঁড়ে পাড়ি দেয়। তাই নিয়ে এত হৈ চৈ! যাক সে বালাই ত মিটল।

কুকী ভাবছে এখন উপায়। গ্রামের মধ্যে জানাজানি হ’লে ঠাকুরের ত ধোপা নাপিত বন্ধ হ’বেই, আর তার হয়ত মস্তম মুণ্ডন করে ঘোল ঢালার বিধি ব্যবস্থা হ’বে।

‘আমাকে ছুঁলেন কেন ঠাকুর। যখন পূজায় চলেছেন।’

‘তাতে সঙ্কুচিত হ’চ্ছ কেন মা। তুমিও ত শক্তির আধার। তোমার ভগবান ত ভিন্ন নয়।’

কুকীর জীবনে আজ প্রথম নারায়ণ দেখা দিল। মৃত্যু জাতির জাতীয়তা বোধ আজ উন্নত দেখে সে সশ্রদ্ধ গলবস্ত্রে ঠাকুরের পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিল।

মহিলা সমাচার

ত্রিজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

ফুলব্রাইট স্কলার বৃত্তিপ্রাপ্ত মহিলা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যবস্থায় “ফুলব্রাইট স্কলারের” প্রথম বর্ষের বৃত্তি পাইয়াছেন বাঙ্গলার ৪ জন বিদ্বান। তাঁহাদের মধ্যে মিস্ প্রতিভা বসু এম-এ অন্ততম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৮ সালে অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। তদাবধি তিনি ডাউলিং কলেজ, কারলিং এ শিক্ষয়িত্রীর কার্যে ব্রতী আছেন।

তিনি “ফুল ব্রাইট স্কলার” ভাণ্ডারের সত্ব অস্থায়ী যুক্ত-রাষ্ট্রে বাইবার পথ খরচ, তাহাদের বিদ্যায়তন হইতে বিশেষ

বৃত্তি ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার হইতে খাবার ও থাকিবার খরচ পাইবেন। প্রতিভা দেবী ব্রুমিংটনের ইণ্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্ত বাইতেছেন। আশা করি তিনি বাঙ্গলার নারী সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া ভারতে আসিয়া তাঁহার অধীত বিদ্যার দ্বারা দেশের উপকার করিবেন।

অনুরূপা দেবীর শোক

স্ববিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী পরিণত বয়সে পুনরায় শোক পাইলেন। মাত্র দুই বৎসর

পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অম্বুজ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে পিতা মাতাকে অপার শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র কন্যা অঞ্জলি দেবী মাত্র ১২ বৎসর বয়সে চই আশ্রণ তাঁহার হৃৎখিনী মাতা, বৃদ্ধা পিতামহী, বৃদ্ধ পিতামহকে ব্যথা দিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

অঞ্জলি ১৩৪৫ সালের ২ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার ঠাকুরমার সাহিত্য সাধনায় সহযোগিতা করিতে করিতে বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

আমরা অনুরূপা দেবীর উপর্যুপরি শোকে সহানুভূতি জানাইতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা তাঁহাদের ব্যথা সহিবার শক্তি প্রদান করুন।

কলিকাতায় এ-আই-উইমেনস্ কনফারেন্স-এর

কমিটির অধিবেশন

সম্প্রতি নিখিল ভারত নারী-মহাসম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী ব্রহ্মকুমারী রায় পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের নিদাক্ষণ ক্রেশ ও উদ্‌বিগ্নের মধ্যে অধিবেশন হওয়াতে নানা ক্রটির উল্লেখ করেন।

শ্রীমতী রেণুকা রায় এম-এ প মর্মস্পর্শী ভাষায় পূর্ববঙ্গের নারী ও উদ্বাস্তু নারী ও শিশুদের অসহায়, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও ক্রেশের বিবরণ প্রদান করেন। এবং সভানেত্রী ও প্রতিনিধি সভ্যগণকে স্বচক্ষে বাংলার নারীদের দুর্দশা দেখিবার জন্ত অহুরোধ জানান।

শ্রীমতী উর্মিলা মেহতা ও বঙ্গের বাহির হইতে আগত সভ্যগণ কয়েকটি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র ও শিয়ালদাহ স্টেশনের অবস্থা দেখিয়া মর্মাহত হন। শ্রীমতী উর্মিলা দেবী বলেন—বাঙ্গলার নারীর নিখ্যাতন ও ক্রেশ সমগ্র ভারতের নারী সমাজের বেদনাদায়ক। ভারতের প্রত্যেক নারীর বাঙ্গলার ভগ্নিদের হৃৎ দূর করিবার জন্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য। তিনি ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে এই সব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসতি, সামাজিক জীবন ব্যাহত ও শিক্ষার ব্যয়স্থা আশু করিবার জন্ত কাতর অহুরোধ জানান।

কলিকাতা শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী চারুবালা মুখার্জির (মিসেস্ এস-সি মুখার্জির) নেতৃত্বে এক জনসভায় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভ্যগণ বর্তমানে নারী সমস্যাগুলি অলোচনা করেন। তাঁহারা বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম ও নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিয়া বে-সরকারী নারী কল্যাণ কার্যের প্রশংসা করেন।

অভিনব মহিলা সমিতি

ইহা একটা পল্লী সমিতি। ইহাদের কর্মপন্থা অভিনব। তাঁহারা নিজ পল্লীর মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা, কলার সাধনা, মিলনবাসর পরিচালন করেন। তাঁহারা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নারীর অভিজ্ঞতা ও কার্যতৎপরতার সাধনা ও শিক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনা করিয়া নিজ নিজ সংসারের চাহিদা পূর্ণ্য গ্রাহ্য মূল্যে ক্রয় করিবার পন্থা অবলম্বনে আগ্রহাষিত। ইহার সাংসারিক অপব্যয় বা অথবা অতিরিক্ত ব্যয় নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কালবাজারের ও মুনাকাথোরীদের হাতে না পড়িবার জন্ত ইহার বন্ধ করিবার। এইরূপ অভিনব প্রতিষ্ঠান দেশে পল্লীতে পল্লীতে স্থাপিত হইলে সহজে পল্লীর মেয়েরা নানা বিষয়ে স্বথ ও সুবিধা পাইবেন। 'অভিনব মহিলা সমিতি' ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ইহার সভানেত্রী শ্রীমতী আভা বহু এবং সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দাস গুপ্ত, কার্যালয় ৬, এ কালু ঘোষ লেন।

আমেরিকায় বাঙ্গালী মহিলা শিল্পীর কদর

যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়াস্থ "ল্যাথাম ফাউণ্ডেশন" গত কয়েক বৎসর হইতে মানবিক শিক্ষা, মনস্তত্ত্ব ও বিশ্বমৈত্রী বিষয়ে বিভিন্ন দেশীয় ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীদের প্রতিযোগিতামূলক পোষ্টার চিত্র অঙ্কনে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।

কুমারী বাবলু ঘোষ ভারতবর্ষ হইতে বর্তমান বর্ষে ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তিনি প্রথম ভারতবাসী প্রাচীর চিত্র (পোষ্টার) অঙ্কনের প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—“ল্যাথাম ফাউণ্ডেশন” প্রাইজ।

কুমারী বাবলু ঘোষ হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রী এস. কে. ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

দুর্গাপূজা ও নবপত্রিকার বৈশিষ্ট্য

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

“জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।

দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্ত তে ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লেখা আছে যে ভগবান ক্রীষ্ণ এই বিশ্বজননী মহামায়াকে প্রথম পূজা করেছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়, দুর্দান্ত দানব-মধু কৈটভের অত্যাচার হতে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্তু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই দেবীকে মহাকালীরূপে পূজা করেছিলেন। তৃতীয় স্তরে দেখি, ত্রিপুরাসুরকে বধ করার জন্তু এই মহাদেবী স্বর্গের দেবতা কর্তৃক পূজিত হয়েছিলেন। চতুর্থ স্তরে দেখি দুর্বাশা মুনির অভিশাপে অভিশপ্ত স্বর্গরাজ্যচ্যুত দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর স্বতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্তু এই দেবীর স্তুতি ও আরাধনা করেছিলেন। তারপর পঞ্চম স্তরে দেখি, সত্যযুগে মেধা ঋষির শিষ্য রাজা সুরথ রাজ্যপ্রাপ্তির জন্তু ও সমাধি বৈশ্য পরলোকে স্থখ শান্তিলাভের জন্তু এই মহাদেবীকে বসন্ত কালে মুম্বয় মূর্তিতে পূজা করেছিলেন। তারপর শরৎ-কালে এই মহাদেবীর প্রথম পূজা করলেন রামচন্দ্র। রাবণ বধের জন্তু তাঁকে অকালবোধন করতে হয়েছিল। দেবী তখন ছিলেন দক্ষিণায়ণে। সাধারণতঃ দেবদেবীর রাত্রি যাপন করে থাকেন দক্ষিণায়ণে। রামচন্দ্রের সেই দুর্গাপূজাই বাংলাদেশে বাঙ্গালীর মহাপূজা রূপে আজ প্রচলিত। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মউৎসব বলে পরিগণিত।

প্রতিমা গঠন বিধি

কালিকা ও মৎস্য পুরাণের মতে, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র কাষ্ঠ অথবা মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমা গঠন করা হয়। মৎস্য পুরাণের মতে, দেবী ত্রিনয়নী। তাঁর স্ববক্ষিম জয়গুণ্ডে মুখ্যস্থলে তৃতীয় নয়ন আছে। এবং সৃষ্টিত ললাটে চক্রকাস্ত মণির গায় অলৌকিক দ্যুতিসম্পন্ন অঙ্কচন্দ্র

শোভমান। স্থূললিত তাঁর দেহ অতি সুন্দর ত্রিভঙ্গ বক্ষিম-চিহ্নিত হয়েছে, ক্রীষ্ণ কটিদেশ ও জাহ্নু, এই তিনভাগে। তাঁর অঙ্গবরণ অতি সুন্দর। কাঁচা স্বর্ণের গায় পীতাম্ব। অতসৌ-পুষ্পের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আসে। দক্ষিণে এবং বামে, উভয় পার্শ্বে—পাঁচটি করে দশটি বাহ। দক্ষিণের পঞ্চহস্তে ধৃত আছে, ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, ও শক্তি। বামে পঞ্চ হস্তে আছে খেতক, পূর্ণ চাপ, নাগ-পাশ, অক্ষুশ ঘণ্টা বা পরশু। দেবীর অলঙ্ক রাগরঞ্জিত দক্ষিণ পদ হস্তে রয়েছে তাঁর বাহন সিংহের পুষ্ঠোপরি। আর বাম পদে নিষ্পেষিত করছেন দুর্দান্ত দানব মহিষা-সুরের বক্ষ। তাঁর পদপার্শ্বে খড়্গ হস্তে দেবীকে আক্রমণোচ্চত সেই হিংস্র অসুর দারুণ জিঘাংসায় দেবীর প্রতি ক্রকুটী করে রয়েছে। মহামায়ার দক্ষিণ হস্তের ত্রিশূল সেই অসুরের বক্ষে বিদ্ধ; এবং বাম হাতে তিনি আকর্ষণ করছেন তাঁর কেশ। তাঁর অপর হস্তের নাগ পাশের দ্বারা দুষ্ট-অসুরের দেহ কুণ্ডলাকৃত। তাঁর বক্ষ হতে যে ঋষির নিঃসৃত হচ্ছে, তাহা পরম আনন্দে পান করছে দেবীর বাহন সিংহ। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা, চণ্ডদুর্গা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, এবং অতিচণ্ডিকা, এই অষ্টদেবী দুর্গার চতুষ্পার্শ্বে বিরাজমান।

আধুনিক কালের প্রতিমা গঠন বিধি, মৎস্য ও কালিকা পুরাণের মত নয়। কারণ উক্ত পুরাণ বিধিতে, মহামায়ার পার্শ্বে, পুত্র কন্যাস্বরূপ অল্প কোনও দেবদেবীর মূর্তির উল্লেখ নেই। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে বর্তমানের পূজা বিধি কি পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয় না? তার উত্তরে বলা যায়, ইং পৌরাণিক বিধি অনুসারেই আধুনিক পূজার্চনা হয়ে থাকে। কেননা, কালিকা বিলাস-

তজ্ঞে আমরা দেখতে পাই :- দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে, পদ্ম ও ধাত্ত মঞ্জরী হস্তে, সর্ব সুলক্ষণা ভাগ্যদেবী লক্ষ্মী বিরাজিতা। তার নীচে সর্ববিঘ্নবিনাশকারী মানবকল্যাণরূপী সিদ্ধিদাতা গণেশ, মুখিক বাহনে বিরাজমান। দেবীর বামপার্শ্বে, জ্ঞান ও বিজ্ঞা দাক্ষিণ্যেতবরণা দ্বিজা, বিনোদিনী সরস্বতী বাহন রাজহংসীসহ বিরাজিতা। তার নীচে ময়ুরাসীন প্রিয়দর্শন, দেবসেনাপতি কাতিক্যে বিরাজমান। দেবীর দুই সহচরী জয়া ও বিজয়াও এখানে দৃষ্ট হন। গণেশের দক্ষিণ দিকে রক্তবস্ত্রাবৃত নবপত্রিকা বিরাজমান। যিনি সর্বসাধারণের নিকট কলাবউ নামে পরিচিত। কলাবউ গণেশের পার্শ্বে অবস্থিত। বলে সকলে তাঁকে গণেশের স্ত্রী বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। কলাবউয়ের শাস্ত্রীয় নাম নবপত্রিকা। তিনি উদ্ভিদরূপী বিশ্বমাতা, গণেশ জননী স্বয়ং মহামায়া।

নব পত্রিকা

দুর্গাপূজাকালে, মনুষ্যপ্রতিমাকে শাস্ত্রানুযায়ী জ্ঞান করানো যায় না বলে বিকল্পে কলাবউকে জ্ঞান করানো হয়। যে নয়টি উদ্ভিদ দ্বারা এই নবপত্রিকাকে রূপায়িত করা হয়েছে, তাহা বাংলার মাটির নিজস্ব সম্পদ; এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এর প্রত্যেকটি উদ্ভিদই কার্যকরী। এই উদ্ভিদ এবং তার অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী নাম, ও তার গুণাগুণ নীচে দেওয়া হোল।

উদ্ভিদ	অধিষ্ঠাত্রী দেবী	উদ্ভিদ	অধিষ্ঠাত্রী দেবী
কদলী	ব্রহ্মাণী	জয়ন্তী	কাতিকী
কচু	কালিকা	বিষ	শিবা
হরিদ্রা	দুর্গা	দাড়িম্ব	রক্ত দন্তিকা
ধাত্ত	লক্ষ্মী	অশোক	শোক রহিতা
		মান	চামুণ্ডা

গুণাগুণ—কদলী বৃক্ষজাত প্রত্যেক বস্তু মানুষ্যের উপকারে আসে। কলা—অত্যন্ত পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর ফল। মোচাতে লৌহজাতীয় পদার্থ বেশী আছে। খেড় মৃত্তরাশি পরিকার রাখে।

কচু—কোষ্ঠ কাঠিহের এবং অর্শরোগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী খাদ্য।

হরিদ্রা—নানা প্রকার চর্মরোগের প্রতিষেধক অব্যর্থ ঔষধ।

জয়ন্তী—ইহা তেঁতুল পাতার ত্রায় একপ্রকার ফুল। শিরার যাবতীয় রোগ প্রতিহত করতে ইহা অব্যর্থ।

বিষ—এই ফল খেতে অত্যন্ত স্বাদযুক্ত। কাঁচা বেল আমাশয় উদরাময় রোগের মহৌষধ। বেলপাতার রস কচি শিশুদের সর্দি কাশীতে অত্যন্ত উপকারী।

দাড়িম্ব—এই ফল অত্যন্ত মিষ্ট, ও পুষ্টিকর। এই ফলের রসে ফলজ শর্করা বিদ্যমান। ফলের খোসা ও গাছের গোড়া নানাবিধ কীট পতঙ্গ বিনাশের সহায়তা করে।

অশোক—এই বৃক্ষের ছাল যাবতীয় স্ত্রীরোগের একমাত্র মহৌষধ।

মান—শোথ, এবং উদরী রোগে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

ধাত্ত—একবাক্যে বলতে গেলে, ইহা বাংলার সম্পদ ও বাঙ্গালীর জীবন। নব পত্রিকার এই নয় জাতীয় উদ্ভিদ অপরাজিতা লতা দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

অপরাজিতা লতা—এই লতার মধ্যে বিষ নাশক গুণ আছে। এর শিকড় সর্প দংশনের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস, বৃশ্চিক, বোলতা, ইত্যাদি বিষাক্ত কীটের দংশনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

চালচিত্র

দুর্গা প্রতিমার কাঠামোটিকে চতুর্দিক হতে বেঁধে রাখা আছে এই চালচিত্র। দেবাদিদেব মহাদেব, ও মহামায়ার (পুরুষ ও প্রকৃতি) লীলাও মহিমার বিভিন্ন চিত্র এই চালচিত্রে চিত্রিত আছে। তার মধ্যস্থলে মধ্যমণিস্বরূপ সর্বভাগী অব্যক্তরূপী, মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত। ভারতীয় ঐতিহ্য ও নিকাম ধর্মের মহিমার প্রকট মূর্তি।

ঘটপূজা—পুরাণে আছে সিন্দুর চর্চিত একটি স্তূপ মূর্তিকা কলসে, দেবীর হাতের কোণেও একটি অস্ত্র, ডালযুক্ত ডাব, এবং নব পত্রিকার নয়টি উদ্ভিদ স্থাপন করে সেই ঘট প্রতিমার সম্মুখে রাখা হয়। প্রথমে ঘটপূজা করে তারপরে দেবী পূজা আরম্ভ হয়। অনেকে দেবীকে প্রতিমার পূজা না করে শুধু ঘটই পূজা করে। কেননা এই ঘট মহামায়ার

প্রতীক। নব পত্রিকা সমেত, এই মুম্বয় প্রতিমার পূজা একমাত্র বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য।

পূজা বিধি

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে শারদীয়া পক্ষ বা দেবী পক্ষ বলে। এই দেবী পক্ষের ষষ্ঠীর দিন বেলগাছতলায় দেবীর বোধন হয়। বোধন অর্থে দেবী মহামায়াকে স্তুতি মিনতি করে আহ্বান জানানো হয়, পূজা গ্রহণ করার জ্ঞাত। একে অধিবাসও বলে। এই সময় বেলগাছের একটা ডাল কেটে নবপত্রিকা রচনা করা হয়। তারপর দিন, অর্থাৎ মহাসপ্তমী তিথির অতি প্রভাত্যে নিকটবর্তী নদীতে, নদী অভাবে কোনও জলাশয়ে, নানাবিধ বাদ্য ভাঙসহ পুরোহিত ঠাকুর নব পত্রিকার স্নান পর্ব সম্পন্ন করেন। স্নানাবসানে সুসমারোহে নবপত্রিকা গৃহে এনে অগুরু চন্দন কস্তুরী, সুবাসিত তৈল, ও নানাবিধ ধাতু দ্বারা চর্চিত করে পুনরায় তাকে স্নান করানো হয়। ১। ঋণার জল ২। সপ্ত সমুদ্রের জল ৩। বৃষ্টির জল ৪। গঙ্গার জল ৫। সুগন্ধি জল ৬। ডাবের জল ৭। গরম জল। এই সাতরকম জলে, নব পত্রিকার উদ্ভিদগুলিকে স্নান করিয়ে একজোড়া বেলের সঙ্গে অপরাজিতা লতা দ্বারা আবদ্ধ করে, একখানি রাঙ্গা পাড় বৃত্ত রেশমী বস্ত্র দীর্ঘ অবশুষ্ঠন দ্বারা আচ্ছাদিত করে গণেশের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপনা করা হয়। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই চারিদিন ব্যাপী মহা আড়ম্বরে দেবীর পূজা আরাধনা করা হয়। অষ্টমী ও নবমীর মিলন ক্ষণে যে পূজা হয়, তাকে সন্ধি পূজা বলে। এই পূজাই সবচেয়ে বড় পূজা। দশমীর দিন সন্ধ্যাবেলা নবপত্রিকা সহ দেবী প্রতিমার বিসর্জন নিকটস্থ জলাশয়ে সাজ করা হয়। প্রতিমা বিসর্জনের অপর নাম বিজয়া। এইদিন মহাপূজা সাজ হয়। এই বিজয়া দশমীর দিনটা বাঙ্গালীর জাতীয়

জীবনের এক মহা মিলনোৎসবের দিন। এই দিন শত্রু মিত্র সকলে অতীতের হুঃখ বেদনা বিস্মৃত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রত্যেকের সঙ্গে মিলনের জ্ঞাত প্রত্যেকে উৎসুক হয়ে থাকে। মহাদেবীর বিসর্জনের বেদনা আমরা পরস্পরে মিলিত হয়ে ভালোবাসার আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে বিস্মৃত হয়ে যাই। মহামায়ার এও একটা মায়া বটে।

দুর্গাপূজা আমরা কেন করি? শাস্ত্র বলে এই মহাপূজা করলে একসঙ্গে ধর্ম অর্থ, কায়, মোক্ষ, এই চতুর্বার ফল লাভ হয়। বাংলাদেশ তান্ত্রিকের দেশ বলে এদেশে তন্ত্র মতে পূজা প্রচলিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পূজা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলার সম্পদ হোল কিরূপে? আমার মনে হয় তার একমাত্র কারণ, বাঙ্গালীরা জগজ্জননী মহামায়াকে দেশমাতৃকারূপে কল্পনা এবং পূজা করে। তাই মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমা গঠন করে উদ্ভিদরূপী নবপত্রিকাকে এই মহাদেবীর প্রতীক করে তারা মহাশক্তিরূপিনী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার পূজা বিধিপালনের মধ্যে দিয়ে স্বজলা স্বকলা শস্যশ্রামলা জননী জন্মভূমিরও আরাধনা করে। মা ও মাটিকে এক অখণ্ডরূপে, চিন্তা, শ্রদ্ধা, ও পূজা করে বলেই বোধহয় এই মহাপূজা আজ একমাত্র বাঙ্গালীর সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ঋষি বঙ্কিম বলেছেন :—

(১) স্বজলাং স্বকলাং মলয়জ শীতলাং

শস্য শ্রামলাং মাতরম্।

(২) “বাহুতে, তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা, ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে” ॥

বন্দেমাতরম্

তিন, চার বছরের মোয়েদের কোট

শ্রীমমতা দেবী

উপকরণ :—৪ আউন্স তিন তার উল।

১ জোড়া ৯নং বোনার কাঁটা।

৪টি বোতাম।

প্যোটার্ণ লেখার কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন।

..... এই দুটি তারকা চিহ্নের অর্থ মাঝের ঘরগুলি পুনরাবৃত্তি করা।

সো—সোজা বোনা।

উ—উল্ট বোনা।

উ, সা—উল সামনে এনে এক ঘর বোনা, (পরের লাইনে এখানে একটি ফুটো হবে।)

জোড়া—দুইটি ঘর এক সঙ্গে বোনা।

পি, জোড়া—ঘরের পিছনের স্থতো নিয়ে, জোড়া বোনা।

ঘর বাড়ান—একই ঘরে পিছনে ও সামনে দুইবার বুনলে এক ঘর বাড়বে।

প্লেন বোনা—এক লাইন সোজা ও এক লাইন উল্ট।

সাবুদানা প্যোটার্ণ—১টি সোজা ও ১টি উল্ট, পরের লাইনে সোজার উপর উল্ট ও উল্টের উপর সোজা হবে।

ডানদিকের বুক

৭১ ঘর কাঁটায় তুলুন।

.....

১ম লাইন—১ সো, উ ১, সো ১, থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। সাত লাইন সাবুদানা প্যোটার্ণ বুনুন। ৭ম লাইনের গোড়ায় ১ঘর বাড়ান।

২ম লাইন—(১ সো, উ ১,) তিনবার, সব সোজা শেষ পর্যন্ত।

১০ম লাইন ও প্রত্যেক উল্ট দিক—১ সো, সব উল্টা, শেষ ৬ ঘর, (উ ১, ১ সো,) তিনবার।

১১শ লাইন—(১ সো, ১ উ) তিনবার, জোড়া, * উ, সা, ৫ সো, উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্গে বুনুন, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ৮ ঘর, উ, সা, ৫ সো, উ, সা, পি, জোড়া ১ সো।

১৩শ লাইন—(১ সো, ১ উ,) তিনবার, ২ সো, * উ, সা, পি, জোড়া, ১ সো, জোড়া, উ, সা, ৩ সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ পর্যন্ত।

১৪শ লাইন—১১শ লাইনের মত।

১৭শ লাইন—সব সোজা।

১৯শ লাইন—(১ সো, ১ উ,) তিনবার, * উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্গে বুনুন, উ, সা, ৫ সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ৭ ঘর, উ, সা, ৩ ঘর এক সঙ্গে বুনুন, উ, সা, ৪ সো।

২১শ লাইন—(১ সো, উ ১) তিনবার, ১ সো, * জোড়া,

উ, সা, ৩ সো, উ, সা, পি, জোড়া, ১ সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ১ ঘর সোজা।

২৩শ লাইন—১৯শ লাইনের মত।

২৪শ লাইন—১ সো, সব উল্ট, শেষ ৩ ঘর, (১ উ, ১ সো) তিনবার।

২ম লাইন হইতে ২৪শ লাইন পর্যন্ত ৪ ঘর বুনুন। তারপর ২ম ও ১০ম লাইন একবার করে বুনুন।

এবার এই ভাবে বুনুন :—

১ম লাইন—(১ সো, ১ উ,) তিনবার, * (জোড়া) ৬ বার, তিন ঘর এক সঙ্গে * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ৬ ঘর (জোড়া) তিনবার।

৫ লাইন—সাবুদানা প্যোটার্ণ বুনুন।

৭ম লাইন—১ সো, ১ উ, ১ সো, উ, সা, জোড়া, (বোতাম ঘরের জন্ত)

.....

উ ১, ১ সো, থেকে পুনরাবৃত্তি করুন।

৫ লাইন সাবুদানা প্যোটার্ণ বুনুন।

১৩শ লাইন—(১ সো, ১ উ,) তিনবার, ২ সো, (এর পরের ঘরে ১ ঘর বাড়ান, ১ সো) ১৩ বার, ৩ সো, (এখন ৫০ ঘর কাঁটায় থাকবে)

১৪শ লাইন—১ সো, সব উল্ট, শেষ ৬ ঘর, (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

১৫শ লাইন—(১ সো, ১ উ) তিনবার, সব সোজা।

১৪শ এবং ১৫শ লাইন দুইবার করে বুনুন।

২০শ লাইন—তিন ঘর বন্ধ করুন, সব উল্ট, শেষ ৬ ঘর (১ উ, ১ সো,) তিনবার। বোতাম পটির জন্ত ৬ ঘর সাবুদানা প্যোটার্ণ বুনুন। সব প্লেন বুনুন প্রত্যেক লাইনে বগলের দিকে এক ঘর করে কমান। ৪৪ ঘর কাঠিতে থাকবে। তারপর খানিক সোজা দিকে ১ ঘর করে কমান। (৪১ ঘর রইল)। একটি করে বোতাম ঘর প্রত্যেক অষ্টম লাইনে হবে। ১৮ লাইন সমান বুনুন। প্লেন বোনা হবে।

তারপর :—১ সো, ২৪ উ, বাকি ১৬ ঘর একটি শেফটি-পিনে তুলে রাখুন। এখন এই ২৫টি ঘর নিয়ে, ১ লাইন সোজা ও ১ লাইন উল্ট বুনুন। সোজা দিকে একটি করে ঘর কমান, (গলার দিকে)। ঘর কমিয়ে ২১ ঘর থাকবে। ২ লাইন সমান বুনুন।

কাঁধ

১ম লাইন—সোজা, ৭ ঘর বাকি থাকবে।

২য় লাইন—সব উল্ট শেষ পর্যন্ত।

৩য় লাইন—সোজা, ১৪ ঘর বাকি থাকবে।

৪র্থ লাইন—সব উল্ট শেষ পর্যন্ত।

৫ম লাইন—সব সোজা।

ঘর বন্ধ করুন।

বাঁ দিকের বুক

৭১ ঘর তুলুন।

১ম লাইন—১ সো, ১ উ, শেষ পর্যন্ত। আরো ৭ লাইন সাব্দানা প্যাটার্ণ বহুন। সপ্তম লাইনের গোড়া ১ ঘর বাড়ান।

২ম লাইন—সব সোজা, শেষ ৬ ঘর (১ উ, ১ সো) তিনবার।

১০ম ও প্রত্যেক উল্টা দিক (১ সো, ১ উ,) তিনবার, সব উল্ট, শেষ ১ ঘর সোজা।

১১শ লাইন—১ সো, জোড়া, * উ, সা, ৫ সো, উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্গে * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ১৩ ঘর, উ, সা, ৫ সো, উ, সা, ২ সো, পি, জোড়া, (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

১৩শ লাইন—* ৩ সো, উ, সা, পি, জোড়া, ১ সো, জোড়া উ, সা, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ৮ ঘর ২ সো, (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

১৫শ লাইন—১১শ লাইনের মত।

১৭শ লাইন—সব সোজা।

১৯শ লাইন—৪ সো, * উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্গে, উ, সা, ৫ সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ১২ ঘর, উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্গে, উ, সা, ৩ সো (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

২১শ লাইন—১ সো, * ১ সো, জোড়া, উ, সা, ৩ সো, উ, সা, পি, জোড়া, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ৭ ঘর, ১ সো, (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

২৩শ লাইন—১২শ লাইনের মত।

২৪শ লাইন—(১ সো, উ, ১,) তিনবার, সব উল্ট, শেষ ১ ঘর সোজা।

২ম লাইন হইতে ২৬শ লাইন ৪ বার বোনবার পর ২ম ও ১০ম লাইন ১ বার করে বহুন।

এবার এই ভাবে বহুন।

১ম লাইন—(জোড়া) তিনবার, * তিন ঘর এক সঙ্গে, (জোড়া) ৬ বার * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ৬ ঘর (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

১১ লাইন সাব্দানা প্যাটার্ণ বহুন।

১৩শ লাইন—৩ সো, (পরের ঘরে এক ঘর বাড়ান, ১ সো)

১৩ বার, ২ সো, (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

৫০ ঘর এখন কাঠিতে থাকবে।

১৪শ লাইন—(১ সো, ১ উ,) তিনবার, সব উল্ট, শেষ ১ ঘর সোজা।

১১শ লাইন—সব সোজা, শেষ ৬ ঘর (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

১৪শ ও ১৫শ লাইন একবার করে বহুন।

১৪শ লাইন আর একবার বহুন।

১৯শ লাইন—তিন ঘর বন্ধ করুন, সোজা, শেষ ৬ ঘর (১ উ, ১ সো,) তিনবার।

৬ঘর বোতাম পটি জুতা সাব্দানা প্যাটার্ণ বহুন।

প্রত্যেক লাইনে ৩ বার বগলের দিকে ১ ঘর কমান ও প্লেন বোনা হবে। ৪৪ ঘর কাঠিতে থাকবে। এর পর খালি সোজা দিকে ১ ঘর করে কমান। ৪১ ঘর কাঠিতে থাকবে। এবার ১৭ লাইন প্লেন বহুন।

তারপর :—২৫ সো, বাকি ১৬ ঘর একটি সেফ্টিপিনে তুলে রাখুন। এখন এই ২৫টি ঘর নিয়ে ১ লাইন সোজা ও ১ লাইন উল্ট বহুন। সোজা দিকে একটি করে ঘর কমান (গলার দিকে)। ঘর কমিয়ে ২১ ঘর থাকবে। ১০ লাইন প্লেন বহুন।

কাঁধ

১ম লাইন—১ সো, সব উল্টা, ৭ ঘর থাকবে।

২য় লাইন—সর সোজা শেষ পর্যন্ত। ৩য় লাইন—১ সো, সব উল্ট, ১৪ ঘর বাকি থাকবে। ৪র্থ লাইন—সব সোজা শেষ পর্যন্ত। ঘর বন্ধ করুন।

পিঠ

১ম লাইন—১সো, * ১উ, ১সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। ৭ লাইন সাব্দানা প্যাটার্ণ বহুন।

২ম লাইন—সব সোজা।

১০ম ও প্রত্যেক উল্টা দিক—১ সো, সব উল্ট, শেষ ১ ঘর সোজা।

১১শ লাইন—১ সো, জোড়া, * উ, সা, ৫ সো, উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্গে * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ৮ ঘর, উ, সা, ৫ সো, উ, সা, পি, জোড়া ১ সো।

১৩শ লাইন—* ৩ সো, উ, সা, পি, জোড়া, ১ সো, জোড়া, উ, সা, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ তিন ঘর সোজা।

১৫শ লাইন—১১শ লাইনের মত।

১৭শ লাইন—সব সোজা।

১৯শ লাইন—৪সো, * উ, সা, তিন ঘর একসঙ্গে, উ, সা, ৫ সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ৭ ঘর উ, সা, তিন ঘর একসঙ্গে, উ, সা, ৪ সো।

২১শ লাইন—২সো, জোড়া, উ, সা, ৩সো, উ, সা, পি, জোড়া, ১সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ১৪ঘর সোজা।

২৩শ লাইন—১৯শ লাইনের মত।

২৪শ লাইন—১সো, সব উল্ট, শেষ ১ ঘর সোজা।

২৫শ লাইন হইতে ২৪শ লাইন ৪ বার বোনবার পর ২ম ও

১০ম লাইন একবার করে বুলুন।

এবার এইভাবে বুলুন :—

১ম লাইন—১সো, * জোড়া * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ২ ঘর সোজা।

১১শ লাইন—সাবুদানা প্যাটার্ণ বুলুন।

১৩শ লাইন—৩ সো, (পরের ঘরে এক ঘর বাড়ান, ২ সো,) ৪ বার, (১ ঘর বাড়ান, ১ সো,) ১৭ বার। (১ ঘর বাড়ান, ২ সো,) ৪ বার, ২ সো, (৮৮ ঘর কাঠিতে থাকবে)।

১৪শ লাইন—১ সো, সব উল্ট, শেষ ১ ঘর সোজা।

১৫শ লাইন—সব সোজা।

১৪শ ও ১৫শ লাইন একবার করে বুলুন, ১৪শ লাইন আর একবার বুলুন।

৩ ঘর করে বন্ধ করুন পরের দুই লাইনে। প্লেন বোনা হবে এবং প্রত্যেক লাইনের শেষে এক ঘর করে কমবে। কমিয়ে ৭৬ ঘর থাকবে। এবার খালি সোজা দিকের প্রথমে ও শেষে এক ঘর করে কমান। ৭০ ঘর থাকবে।

৩১ লাইন—প্লেন বুলুন।

কাঁধ :—

১ম লাইন—সব সোজা, ৭ ঘর বাকী থাকবে।

২য় লাইন—সব উল্ট, ৭ ঘর বাকী থাকবে।

৩য় লাইন—সব সোজা, ১৪ ঘর বাকী থাকবে।

৪র্থ লাইন—সব উল্ট, ১৪ ঘর বাকী থাকবে।

৫ম লাইন—সব সোজা, ২১ ঘর বাকী থাকবে।

৬ষ্ঠ লাইন—সব উল্ট, ২১ ঘর বাকী থাকবে।

৭ম লাইন—সব সোজা, শেষ পর্যন্ত।

৮ম লাইন—২১ ঘর বন্ধ করুন, ২৮ উ ২১ ঘর বন্ধ করুন।

বুক এবং পিঠের কাঁধ জুড়ে রাখুন।

হাত :—

৩৫ ঘর তুলুন।

২০ লাইন সাবুদানা প্যাটার্ণ বুলুন।

.....

২১ম লাইন—৫ সো, পরের ঘরে এক ঘর বাড়ান থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ৫ ঘর সোজা। ৬০ ঘর কাঠিতে থাকবে।

২২শ লাইন—১ সো, সব উল্ট শেষ ১ ঘর সোজা।

২৩শ লাইন—সব সোজা।

২২শ ও ২৩ লাইন—পুনরাবৃত্তি করুন যতক্ষণ না ৭ ইঞ্চি বোনা হয়। উল্ট দিকে শেষ হবে।

১ ঘর বন্ধ করুন প্রত্যেক লাইনে আরম্ভের সময়। ৫৪ ঘর কাঠিতে থাকলে এই ভাবে বুলুন :—

১ম লাইন—সব সোজা। ২য় লাইন—সব উল্ট।

৩য় লাইন—১ ঘর বন্ধ করুন। সব সোজা।

৪র্থ লাইন—১ ঘর বন্ধ করুন, সব উল্ট। ১ম

হইতে ৪র্থ লাইন আর একবার বুলুন।

তারপর ৩য় ও ৪র্থ লাইন ৫ বার বুলুন।

এইবার এইভাবে বুলুন :—

১২শ লাইন—সব সোজা, শেষ, ২ ঘর বাকী থাকবে।

২০শ লাইন—সব উল্ট, শেষ ২ ঘর বাকী থাকবে।

২১শ লাইন—সব সোজা, শেষ ৪ ঘর বাকী থাকবে।

২২শ লাইন—সব উল্ট, শেষ ৪ ঘর বাকী থাকবে।

এইভাবে প্রত্যেক লাইনে ২ ঘর করে কম বুলুন যান।

প্লেন বোনা হবে। ১৩ ঘর বাকী থাকলে,

পরের লাইনে সব সোজা বুলুন। উল্ট দিকে

সব উল্ট জোড়া। এবার ঘর বন্ধ করুন।

অন্ত হাত এই রকম বোনা হবে।

গলার পটি :—

(সোজা দিক থেকে আরম্ভ করুন) :—শেফটিপিন্ থেকে ১৬ ঘর কাঠিতে তুলুন। পশম নিয়ে একই কাঠিতে গলার দিকে ১৩ ঘর তুলুন। পিঠের দিকে যে ঘরগুলি বাকী আছে এবার

বম্বে মিউচুয়েল লাইফ

এমুরেন্স লিমিটেড।

স্থাপিত—সন ১৮৭১ সাল।

ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম

জীবন বীমা কোম্পানী।

জনস্বার্থ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

পলিসি হোল্ডারদের সেবায়—

গত ৭৯ বৎসর যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।

সর্ত্তাবলির জন্য সত্ত্বর লিখুন—

হেড অফিস :

বম্বে মিউচুয়েল বিল্ডিং

হর্নবাই রোড, ফোর্ট, বম্বে।

সেগুলি বুন, ৩ সো (জোড়া, ৩ সো)
৭ বার বা গলার দিকে ১৩ ঘর তুলুন,
সেক্টিপিনে ১৬ ঘর আছে, কাঁটায় তুলে
বুন—১০সো, (১উ, ১ সো) তিনবার।
৮১ ঘর কাঠিতে থাকবে। তিন লাইন
সাব্দানা প্যাটার্ণ বুন।

৪র্থ লাইন—১সো, ১উ, ১সো, উ, সা, জোড়া, ১উ, ১সো,
শেষ পর্যন্ত। ২ লাইন আরো সাব্দানা
প্যাটার্ণ বুন। ঘর বন্ধ করুন। পাশ শেলাই
আগে করুন। হাতা সেলাই করে কোটের
বগলে জুড়ে দিন। বোতাম ৪টি পটিতে
লাগান।

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি

স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত রবিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল
সমিতি অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশ্যে
শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব
করেন এবং শ্রীযুক্তা গীতা দেবী, শ্রীযুক্ত স্বদেশ চন্দ্র রায় ও
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, বক্তৃতাতে স্বর্গতের নানা
গুণাবলী বর্ণনা করেন।

যাঁরা এই সমিতিতে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন ও যাঁদের
সেবা যত্নে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে,
স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি সমিতির
প্রথম সম্পাদক ছিলেন এবং পরে সহকারী সভাপতি হন।
তিনি নিজে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, অত্যাশ্রয় বহু গুণের অধিকারী
ছিলেন, কিন্তু সমিতি তাঁর প্রাণের প্রিয় বস্তু ছিল এবং ইহার
জন্ত তিনি বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করিতেন। ভগবান স্বর্গত
আত্মাকে শান্তি দিন ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাহসনা
দিন।

সমিতি পরিদর্শন

সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মনীষা রায়, মহিলা
সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা আরতি দত্ত ও মহিলা প্রচারিকা
শ্রীযুক্তা সুরোধা বালা ঘোষ গত ৩রা জুলাই শ্রামনগর
মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। সমিতির শিশু বিভাগ,
বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ ও শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা
সকলে বিশেষ প্রীত হন। শ্রীযুক্তা মনীষা রায় শিক্ষার্থিনী
কতিপয়কে সমাজ-সেবা মূলক নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা
করেন এবং তাঁহাদের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হন। নানাপ্রকারের
শিল্পদ্রব্য দ্বারা একটি ছোট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সমিতিতে করা
হইয়াছিল।

পরে তাঁহারা রাহতা সেবক সজ্জ মহিলা সমিতি পরিদর্শন
করিতে যান। এই সমিতি পল্লী-উন্নয়নমূলক কাজ যে
পদ্ধতিতে করিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ প্রীত
হন। মহিলাদের ভিতরে শিক্ষালাভের আগ্রহ, সরল ও
সহজ আচরণ দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ আকৃষ্ট হন। এই
সমিতির উন্নতি স্থানিচিত; এই আশা নিয়া তাঁহারা
অপরূপে প্রত্যাবর্তন করেন।

গত ১১ই আগষ্ট সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মনীষা রায়

ও প্রচারিকা শ্রীযুক্তা সুরোধা বালা ঘোষ কাঁচরাপাড়া মহিলা
সমিতি পরিদর্শন করেন। তাঁহারা বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ ও
শিল্প-বিভাগ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেন। বয়স্কদের
শিক্ষার আগ্রহ দৃষ্টে সাধারণ সম্পাদিকা অতীব প্রীত হন।
উক্ত সমিতির আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য তিনি দূরীভূত করেন,
এবং সমিতির ক্রম উন্নতি হইবে, এই আশা নিয়া প্রত্যাবর্তন
করেন।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

পল্লীতে পল্লীতে ও সহরে মহিলা সমিতির সংগঠন দ্বারা
মহিলাদের সাধারণ ও অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা সরোজনলিনী
নারী-মঙ্গল সমিতি সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছে।
স্বাধীন ভারত সরকার জনগণের শিক্ষার মান উন্নতিকল্পে
যে 'বয়স্ক শিক্ষা' পরিচালনা নীতি বাস্তবে অবতীর্ণ হইয়াছেন,
তাঁহা জাতির পক্ষে বিশেষ আশা প্রদ। ভারত সরকারের
বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা ও শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনে কেন্দ্র
সমিতিতে গত ১ বৎসর হইতে বয়স্কদের টেনীংপ্রাপ্তা
শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্ববধানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই সামান্য
সময়ের মধ্যেই অনেক নিরক্ষরা মহিলা আক্ষরিক জ্ঞান লাভ
করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বয়স্ক ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি
পাইতেছে।

বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া সমিতির
অন্তর্ভুক্ত মফঃস্বল মহিলা সমিতির ১১টি সমিতিতে বয়স্ক
শিক্ষাকেন্দ্র গত ৬ মাস হইতে খোলা হইয়াছে। প্রতিটি
সমিতিতেই টেনীংপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছেন।

পল্লী মহিলাগণ সোৎসাহে উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান
করিতেছেন এবং আমরা দেখিয়া বড়ই প্রীত ও আশান্বিত
হইয়াছি যে, আমাদের দেশের নিরক্ষরাদের শিক্ষালাভের
প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ রহিয়াছে। আরও উল্লেখযোগ্য
যে পল্লীবাসিনীরা নিরক্ষরা হইলেও তাঁহাদের ভিতরে
স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বীশক্তি রহিয়াছে এবং তাহার দ্বারা
তাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় অতি দ্রুত করায়ত্ত করিতে সক্ষম।

নিম্নলিখিত ১১টি মফঃস্বল সমিতিতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র
খোলা হইয়াছে :—

১। বাদবপুর (রিফিউজী ক্যাম্প) মহিলা সমিতি।

২। বাদবপুর কলোনী মহিলা সমিতি।

- ৩। শ্রামনগর মহিলা সমিতি।
- ৪। রাহতা সেবক সঙ্ঘ মহিলা সমিতি।
- ৫। কাঁচরাপাড়া (রেলওয়ে) মহিলা সমিতি।
- ৬। হাওড়া ই, জাই, আর, মহিলা সমিতি।
- ৭। ডাঙ্গাপাড়া মহিলা সমিতি।
- ৮। সইদ নগর বাস্তুহারা পল্লী উন্নয়ন সমিতি।
- ৯। বাইনান মহিলা সমিতি।
- ১০। বালুরঘাট মহিলা সমিতি।
- ১১। ব্যাণ্ডেল রেলওয়ে মহিলা সমিতি।

রাহতা সেবক সঙ্ঘ মহিলা সমিতি

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাহতা সেবক সংঘের উদ্যোগে প্রভাত ফেরী বাহির হয় সকাল ৫।০ টায়। বেলা ৮।০ টায় সংঘপতি শ্রীযুক্ত হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংঘের সকল কর্মীভাই ও গ্রামস্থ সকল নর নারীর উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, জাতীয় সঙ্গীতের পর উপস্থিত সকলে এক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। বেলা ৯।০ টায় বাস্তুদেবপুর কেন্দ্রের সকল কর্মীভাই ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় রাহতা সংঘের কর্মীভাইরা প্রায় এক মাইল রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কার কার্য করে। এইরূপ কার্যে সকলের মনে এক নতুন আশা ও আনন্দের সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যা ৬।০ টায় এক সাধারণ সভা হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত প্রীতিরঞ্জন ঘটক মহাশয় পোরোহিত্য করেন এবং শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীসতীনাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীদের বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করেন।

বন্দে মাতরম সঙ্গীত ও মেয়েদের ব্রতচারী নৃত্যের পর সভায় শ্রীঅরবিন্দ জন্মদিন সম্পর্কে এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কয়েকজন বক্তৃতা করেন।

শেষে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র লাল ঘোষ মহাশয়ের পল্লী উন্নয়ন ও নারী শিক্ষা সম্পর্কে আলোকচিত্র প্রদর্শনের পর রাত্রি ৯।০ টায় সভার কার্য স্বর্ধ্বনির মধ্যে শেষ হয়।

রাহতা সেবক সংঘের উদ্যোগে গ্রাম কর্মীকে বাস্তুদেবপুরে ১৪ই আগষ্ট ১৯৫০ সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রচারক মহাশয় স্বর্গীয় সরোজ নলিনী দত্তের নারীশিক্ষা ও জাগরণের কার্যে অক্লান্ত চেষ্টা ও তাঁর দানের কথা উল্লেখ করিয়া আলোকচিত্র সাহায্যে এক সার্বগর্ভ বক্তৃতা দেন। অধিক রাত্রে 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতের পর সভার কার্য শেষ হয়।

শ্রামনগর মহিলা সমিতি

ভারতের ঐতিহাসিক দিবস হিসাবে "স্বাধীনতা দিবস" শ্রামনগর মহিলা সমিতির ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীম্মহ সেন সভানেত্রী ও শ্রীম্মনোরমা দেবী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীদয়্য মুখার্জি কর্তৃক "বন্দে মাতরম" সঙ্গীতের পর সভানেত্রী পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীসবিতা কর শহীদ বেদীতে মালাদান করেন। শ্রীশান্তা চাটার্জি, ছবি ব্যানার্জি ও শ্রীদেব বানী মুখার্জি কর্তৃক সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শেষে সভানেত্রী বলেন "আমাদের এই শুভ দিনের আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হ'ত যদি উদাস্ত সমস্তা আমাদের সকল পরিবেশকে উৎপীড়িত না করিত।"

শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব উৎসব

গত ১৫ই আগষ্ট, ৫০ শ্রীঅরবিন্দ নাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহ প্রাঙ্গণে শ্রামনগর মহিলা সমিতির উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের ৭২তম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। শ্রীম্মহ সেন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীদেববানী মুখার্জি কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীম্মনোরমা দেবী শ্রীঅরবিন্দের আলেখ্যে মালাদান করেন। শ্রীসবিতা কর, ছবি বানার্জি, আভা চাটার্জি প্রভৃতি শ্রীঅরবিন্দ জীবনীর আলোচনা করেন। পরে সভানেত্রী বলেন "গান্ধীজির মৃত্যুর পর গান্ধীযুগ শেষ হইয়াছে, এখন অরবিন্দের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সকলে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।" শ্রীদয়্যমুখার্জি কর্তৃক জনগণমন গায়ার পর সভার কাজ শেষ হয়।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
BHOWANIPUR :: CALCUTTA.

ক্রীমুধাকান্ত দে

১৫ই জুলাই। তোকিও—দ-কোড়িয়া গবর্ণমেন্ট তায়েজন ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। প্রধান সড়ক ধরিয়া কুমচনের ভিতর দিয়া পুমানের প্রায় ৫০ মাইল উ-পশ্চিমে অবস্থিত তায়েজুর দিকে গুধু এখন পশ্চাদপসরণ হইতে পারে।

উ-কোড়িয়ার ট্যাক ও সৈন্য কুম নদীর দক্ষিণ পারে আমেরিকানদের অটল বাহে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ জ্ঞত কয়েকটি সেতুমুখ স্থাপন করিয়াছে। উ-কোড়িয়ানগণের উত্তর তীরে পূর্ণ তিন ভিভিসন সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে। বিস্তৃত বৃত্তাংশের তিন জায়গায় উ-কোড়িয়াবাহিনী সেতুমুখ অধিকার করিয়া উ-পশ্চিম, উত্তর, পশ্চিম দিক হইতে নগরীকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কুম ফীতিমুখের অভ্যন্তরে মার্কিন রক্ষাঘাটগুলির পার্শ্ব বেঠন করার উদ্দেশ্যে তায়েজনের প্রায় ২০ মাইল দূর হইতে কম্যানিষ্টদের বৃহত্তম আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। সমেগিও সেতুমুখে কম্যানিষ্ট সৈন্যরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বহু মালবাহী মোটরযান ও জীপ দখল করে। তারা দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছে। তায়েজনের ২২ মাইল উত্তরে চংজু হইতে বাছাই কম্যানিষ্টবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দ-কোড়িয়ান সৈন্যগণ আরও পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তারা কুম নদীর বাকি প্রধান রক্ষা-বাহের পশ্চাত্তাগে পৌছিতে।

অবস্থা অনিশ্চিত (ম্যাক আর্থার)।

লণ্ডন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলির নিকট যে পত্র লেখেন, বিশেষ বাতর্বিহ মারফৎ লণ্ডন হইতে ৪০ মাইল দূরে চেকাসের পল্লীভবনে তাহা মিঃ এটলির নিকট পাঠান হয়।

১৬ই জুলাই পণ্ডিত নেহরু রুশ ও মার্কিন রাষ্ট্র নায়কদের নিকট পত্রে সংঘর্ষ কোড়িয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। নিরাপত্তা পরিষদে চীনের কমিউনিষ্ট গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া বর্তমান অবস্থার অবদান ঘটাইবার অনুরোধ তিনি জানাইয়াছেন।

পোর্টসমাউথ (১৪ই জুলাই)—বৃটেনের বৃহত্তম নৌ-ঘাটি পোর্টসমাউথে গত রাত্রে কতকগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। ঘাটির বিপরীত দিকে বিস্ফোরক পদার্থ বোঝাই কতকগুলি বজরা ছিল, তাহার দুটিতে বিস্ফোরণ হয়।

১৬ই জুলাই। তোকিও—রনকান্ত আমেরিকান সৈন্যরা কুম নদীর তীরবর্তী রক্ষাবাহ হইতে হটিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। উ-কোড়িয়া বাহিনী উভয় পার্শ্বে অক্রমণ

চলাইয়াছে। দ-কোড়িয়ার জরুরী গবর্ণমেন্ট তাঁদের সাময়িক রাজধানী তায়েজন পরিত্যাগ করিয়া তায়েজু চলিয়া গিয়াছেন। তায়েজুতে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকানরা তায়েজনের ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তায়েজুকে কেন্দ্র করিয়া কোড়িয়ার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে দ্রুত গণীবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। দ পূর্ব প্রান্তে একমাত্র পুমানই এখন তাদের ব্যবহারের উপযোগী বন্দর। উ-কোড়িয় সৈন্যরা কংজুর ৬ মাইল পূর্বে মেওগু পর্যন্ত কুম নদীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে।

স্মিমাউথ (১৫ই জুলাই)—রক্ষণশীল দলের নেতা হিসাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ উইনষ্টন চার্চিল বলেন, কোড়িয়া সংগ্রাম মূলতঃ হিটলারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের পুনরাবৃত্তি। কমিউনিজমের পশ্চাতে আমি রুশিয়ার বিপুল সশস্ত্র শক্তির পরিচয় পাইতেছি। তারা চীনে বিজয় লাভের পর তিব্বতের নিকটে দৈন্য সমাবেশ করিতেছে। পারস্যকে বিপন্ন করিয়া তুলিবার এবং ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। যুদ্ধ প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে করি না; কিন্তু সময় আমাদের অল্পকালে নহে। কোড়িয়ায় যা ঘটতেছে তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে স্বাধীন বিপুল বিশ্বের অধিকাংশ জনতা নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। কোড়িয়ায় একদিকে বিশ্বের প্রায় সকল স্বাধীন নাগরিক, অত্ৰদিকে রুশ-সংগঠিত কোড়িয়ার সুসজ্জিত বাহিনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়সংকল্প ও নির্ভীক চিত্তে এই সংঘর্ষের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বের সর্বত্র কমিউনিষ্টদের পররাজ্য আক্রমণ। ক্রেমলিনের ১৪ জন কতৃপক্ষ হিসাব করিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী চলিতেছেন।

তোকিও (১৬ই জুলাই)—অণু জেনারেল ম্যাকআর্থার ঘোষণা করিতেছেন যে ২৭শে জুন তারিখের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুসারে ফরমোজার উপর আক্রমণ নিরোধ এবং চীনের প্রধান ভূখণ্ডের উপর ফরমোজাস্থিত চীনা গবর্ণ-মেন্টের বিমান ও নৌ আক্রমণ নিবারণের জন্ত ৭ম নৌ বাহিনীর বিমানসমূহ ফরমোজা প্রণালী ও চীন সমুদ্রের দক্ষিণ উপকূলের মধ্যে টহল দিতেছে। এই টহলদারী বিমান সমূহের প্রতি কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, চীনের প্রধান ভূখণ্ড ও ফরমোজা দ্বীপের অধীন সমুদ্র এলাকার বাহিরে তাদের থাকিতে হইবে।

নয়া দিল্লী (১৬ই জুলাই)—মার্শাল ষ্টালিন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পত্রের উত্তর দিয়াছেন। তিনি নেহরুর

শান্তি প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিরাপত্তা পরিষদের মারফৎ কোড়িয়া সমস্তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধি সহ পঞ্চশক্তি নিরাপত্তা পরিষদে যোগ দিলেই সমস্তার সমাধান হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। কোড়িয়ার জনসাধারণের প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

১৭ই জুলাই—দক্ষিণ-পশ্চিম কোড়িয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথ কেন্দ্রে তায়েজনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পতন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। উ-কোড়িয়ার কমিউনিষ্ট সৈন্যদের অবিরাম আক্রমণে মার্কিং ২৪ তম ডিভিশনের সৈন্যেরা ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। তারা তায়েজনের ৮ মাইল পূর্বে কোচনে ঘাটি স্থাপন করিতে পারে। বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধের অবস্থা—পশ্চিম রণাঙ্গণে আমেরিকান সৈন্যরা চেন্টিওয়ান ও কংজু হইতে বহির্গত সড়কের মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ উ-কোড়িয়ার সৈন্যদের দ্বারা কোণঠাসা অবস্থায় রহিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গণে মুংং ও ইয়েচনের পশ্চাতে উ-কোড়িয়াদের ট্যাক্স, পদাতিক ও লরীর বিপুল সমাবেশ হইতেছে। এই স্থান দুইটি তায়েজন ও তায়েগুর মধ্যবর্তী সরবরাহ কেন্দ্র কুমডনে যাইবার গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি। পূর্ব রণাঙ্গণে দ-কোড়িয়ার ২৩ তম ডিভিশন অগ্রসরমান কমিউনিষ্ট বাহিনীকে প্রচণ্ড আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করিয়াছে।

লগুন—মস্কো রেডিও হইতে প্রচারিত উ-কোড়িয়া বাহিনীর ইস্তাহার উদ্ধৃত করিয়া টাস এজেন্সির সংবাদে বলা হইয়াছে : কোড়িয়া গণতন্ত্রের গণ-কোজের সৈন্যরা সমস্ত রণাঙ্গণে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। গণ-কোজের সাহায্যার্থ কোড়িয়ার পূর্ব উপকূলে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

লগুন—লগুনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার ব্রিটিশ, কে, কৃষ্ণমেনন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলির সহিত তাঁর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটস্থ সরকারী রাসভাবনে ২০ মিনিট কাল সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভায় কোড়িয়া সম্পর্কে আলোচনা হইবে—তৎপূর্বে এই সাক্ষাৎ।

বারাণসী—রাষ্ট্র বিপ্লববিভাগের ৫ হাজার ছাত্র ও অধ্যাপকের সম্মুখে ২০ মিনিট ব্যাপী অভিভাষণে সঙ্কটজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া বলেন, বর্তমান বিশ্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার মনোভাব নিন্দনীয়।

নৌ-বিভাগ বাংলার যুবক

গত ১৫ই জুলাই গার্ডেন রীচ এলাকায় গঙ্গাতীরে পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ জলযান নাবিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম ৩১ জন শিক্ষানবিশী লস্করদের শিক্ষোত্তরণ অনুষ্ঠানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এক ভাষণ দেন। এই

বৎসরের ১লা এপ্রিল সরকার এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিন মাসের পর তাঁরা শিক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রায়াণ্য পত্র দেন। ইহারা প্রত্যেকে কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করিতেছেন। আগামী এক মাসের মধ্যে আরও ৩২ জনের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। আরও ৫০ জনকে নতুন শিক্ষানবিশীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া শিক্ষোত্তীর্ণদের সার্থক জীবন কামনা করেন। বর্তমান দলে বাংলা, বিহার ও আসামের যুবকেরা আছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সহিত আমরাও বাংলার যুবকদের নৌ-বিভাগ গ্রহণে উৎসাহ প্রকাশ করিতে বলি। বলা বাহুল্য, জল, স্থল ও আকাশ বাহিনী এমন একটি স্থল যেখানে ভারতীয়ের স্বদেশ-প্রেম ভারতীয়রূপে বিকাশ পায়। সেখানে সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা, ধর্মাত্মতা ও কুসংস্কার চূর্ণ হইয়া যায়; আমরা অনুভব করি, আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা ভারতীয়।

মশলার দর

মশলা ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও মহরতলীতে বিক্রয়ের জন্ম মশলার সর্বোচ্চ দর বাণ্টিয়া দিয়াছেন। ইহা ১৯৫০, ১৫ই জুন অর্থাৎ কোড়িয়া যুদ্ধের এক সপ্তাহ পূর্বের দরের উপর শতকরা ৫ বেশী।

মশলার নাম ১৫ই জুলাই—১লা আগষ্ট ২রা আগষ্ট হইতে

লক্ষা	৩৮০/০	৩৮০
মোতি	১০	১০
বড় এলাচ	৩৬০/০	৩৬০
ধনিয়া	১৬০/০	১৬১০
কালজিরা	২৮০	২৮০
দারুচিনি	৬০	৬৮০
সাপ্ত	২৮০	১৬০
লবঙ্গ	৫৮০	৪৮০
এরাঙ্কট	২৮০	১৮০/০
গোলমরিচ	১৩৯	১২৯
কপূর	১০৯ (পাউণ্ড)	৯৯ (পাউণ্ড)

কে. হোডের

মামবোদীয়া

চল ওঠা
একাত্তর
মাথার

বন্ধ করে

১,০০০, হাজার টাকা পুরস্কার

অমৃতসহরে মাত্র ২৫০ টাকা সোণার ভরি।

ধরশালার বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী এল, মুরিয়াম লিখিয়াছেন :—“১৩ ভরির আমেরিকান-নিউগোল্ডের পার্শেলটি পাইলাম, আপনাদের প্রেরিত সোণা ও খাঁটি সোণার ভিতরে কোনপ্রকার পার্থক্যই নাই দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। এই নিউগোল্ড প্রস্তুত করিয়া আপনারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। অল্পগ্রহ করিয়া আরও ১২ ভরি সোণা ফেরৎ ডাকে পাঠাইবেন। আরও অর্ডার পাঠাইতেছি” এই চিঠি যিনি জাল প্রমাণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরোক্ত নগদ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমাদের নিউগোল্ড কষ্টিপাথরের উপর খাঁটি সোণার মতই দাগ কাটে, খাঁটি সোণার তায়ই ইচ্ছানুযায়ী গাথান যাইতে পারে। সকল প্রকার অলঙ্কারই এই নিউ গোল্ড দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে। এমন কি অতি সূচতুর স্বর্ণকারও এই নিউগোল্ড ও খাঁটি সোণার মধ্যে কোন পার্থক্য ধরিতে পারিবেন না। বাজারে প্রচার করিবার জন্ত নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হইতেছে।

১ তোলা ২৫০ টাকা। ৩ তোলা ৭৫০। ৬ তোলা ১৩০০। ১৫ তোলা ৩০০০। এবং ৪০ তোলা ৬০০০।

৩ ভরি অর্ডারে ২টি বোম্বাই ফ্যানানের আংটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৬ ভরির অর্ডারে ২টি বোম্বাই ফ্যানানের আংটি, একটা ইয়ারিং, এবং ২ গাছা বালা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ১৫ ভরির অর্ডারে ২টি বোম্বাই ফ্যানানের আংটি, ২ জোরা ইয়ারিং, এবং লকেট সহ একটি চেইন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৪০ ভরির অর্ডারে ৪টি বোম্বাই ফ্যানানের আংটি, ৪টি বালা এবং লকেট সমেত একটি চেইন বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

মাত্র কয়েক দিনের জন্ত এই সুযোগ পাইতেছেন, আজই অর্ডার দিন। ডাক ব্যয় ও প্যাকিং খরচা ফ্রি। অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

New Gold Supply Coy. (B.L.C.)

Post Box 86, Amritsar.

বিনামূল্যে



আমাদের ব্লেক হেয়ার অয়েল নং ৫০১ (রেজিষ্টার্ড) ব্যবহার করিলে চুল মসৃণ ও কালো হয় এবং চিরকালই কালো রহিবে। ইহা চুল উঠা নিবারণ করে, চুল দীর্ঘ ও কঁকড়া হয়। প্রতি বোতলের দাম ২৫। তিন বোতল (এক সাথে লইলে) ৫৫০।

এই আশ্চর্য তৈলটি প্রচার করিবার জন্ত ১ বোতল তৈল ফ্রিতে ১৫ বৎসরের চুক্তি দিয়া একটি হাত ঘড়ী ও একটি আংটি (নিউগোল্ড) বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। তিন বোতল এক সাথে লইলে ৪টা হাত ঘড়ী আর ৪টা আংটি বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

অল্পগ্রহ পূর্বক ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

Add :—Sanyasi Ayurvedic
Pharmacy (B. L. C.)
P. B. 95, Amritsar.

বিনামূল্যে

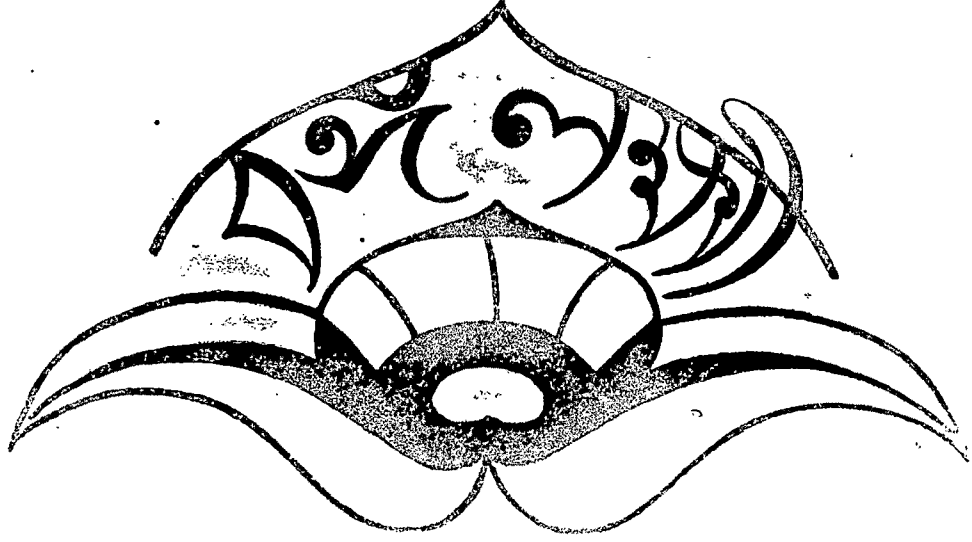
আমাকে একটি ফুলের নাম লিখিয়া জানাইলেই, আমি আপনার ১২ মাসের ভাগ্য ফল বিনামূল্যে পাঠাইব। আর আপনার দুঃখ কষ্ট প্রতিকার এবং উদ্বেগ সিকি কল্পে একটি ভাগ্য আংটি পাঠাইয়া দিব। এই সুবিধা মাত্র কয়েক দিনের জন্ত দেওয়া হইবে। ইংরাজীতে আমার সহিত পত্রালাপ করিবেন।

Add :—Mahamuni Jyotish Ashram.
(A. G.) Azad Nagar,
Amritsar.

অভিনব পুস্তক

শ্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপযোগী যুগান্তককারী এই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া জীবনে জয় ও উন্নতির সন্ধান এবং স্বস্থ দেহে শতবর্ষকাল দীর্ঘায়ু লাভের উপায় অবগত হউন। ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

India Book Depot. (G. L. C.)
Azadnagar. (Amritsar)



২৫শ বর্ষ

কার্তিক—১৩৫৭

১২শ সংখ্যা

দাদু-বানী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার।

(‘ঘটি কস্তুরী মিরিগকে ভরমত ফিরে উদাস’ বাণীর অলুবাদ)

মুগের দেহেতে যদিও কস্তুরী
উদাস হ’য়ে সে বেড়ায় ঘুরে,
অস্তর গতি বুঝিতে পারে না
তৃণ লতা তাই শুঁকিয়া মরে।
যাহার কারণে জগতে ভ্রমিছে
সে রহে আপন মানস-সরে,
ডুবিয়া সেথায় দেখিল না কেহ
মরম-তাহার বুঝিতে না পারে।
দূরে যদি কহ, দূরে র’ন তিনি—
প্রভু চারি দিকে বিরাজ করে,
নয়ন অভাবে পায় না দেখিতে
মনে হয় রবি কত না দূরে।
সদাই সমীপে সদা সন্মুখে
এ গৃঢ় রহস্য বুঝিল না রে,
স্বপনেও ইহা কিছু না বুঝিল
অবঝ পাইবে কেমনে তারে ?

পলাতক

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

অভিমত্য়র ছুঁর্ভাগ্য যে তার প্রথম প্রেমের তীব্র আবেদন নিয়ে যে মেয়েকে ভালোবাসলো, জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা আর সমস্ত স্বপ্ন চুকিয়ে বসে আছে সে।

স্মৃতি বিধবা।

সভ্য সমাজে ‘বালবিধবা’ শব্দটা আজ অর্থহীন হয়ে গেছে তাই, নষ্টলে বালবিধবা বলাই উচিত ছিল বোধ হয়। একুশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে, সে মেয়ে যদি বাইশ বছর না হতেই বিধবা হয়ে ফিরে আসে, বারো বছরের চাইতে সে কি কম ভয়াবহ?

তাকে নিয়ে কী করবে বাপ মা?

কী সাম্বনা দেবে তাকে সভ্য ভব্য আধুনিক সমাজ? বড়োজোর দেবে—‘সজ্জা’ একদশীর অস্মৃতি, দেবে—‘খানখুতি’ থেকে অবাহতি। আর কি? আর কিছু তো নয়?

মেয়েদের “দ্বিতীয় পক্ষের” পক্ষ নিয়ে আইন যতোই উঠে পড়ে লাগুক, সমাজে—স্মৃতিদের মতো মধ্যবর্তী সমাজে—আজও ও আইন অচল।

কিন্তু সমাজসমস্যার কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে অভিমত্য়কে নিয়ে।

অভিমত্য় পচা পুরনো প্রথার দাস নয়। কুসংস্কারকে ভাঙবার মতো জোর ওর আছে। ও জানে—যৌবন নিঃশেষিত হবার আগে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় না। ‘বৈধব্য’ একটা ঘটনা মাত্র। সেই দৈবাতের একটা ঘটনাকে অনর্থক প্রাধান্য দিয়ে, স্মৃতির মতো একটা জীবনকে অপচয় হতে দেওয়া পাগলামীর সামিল।

অভিমত্য় কোনো কিছুকেই ভয় করেনা। ভালোবেসে সে অক্লান্ত নয় মোটেই। অথচ স্মৃতি ভয় করে প্রত্যেককে।

পাপপুণ্য, শাস্ত্র-সমাজ, আচার অনাচার, থেকে

স্বরু করে—মা বাপ, ঠাকুমা পিসি, পাড়াপ্রতিবেশী, একধার থেকে সকলকে ওর ভয়।

বাইশ বছরের নিরর্থক যৌবনকে নিয়ে সে যেন নিজেই লুপ্ত করে ফেলতে পারলোই বাঁচে। অদৃষ্ট হয়ে যাবার কোনো মন্ত্র যদি জানা থাকতো স্মৃতির!

জানা ছিলোনা।

তাই দৃষ্টমান হওয়া ছাড়া উপায় কোথা? অতএব কোন এক দৈবমুহুর্তে অভিমত্য়র মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়ে গেলো সে। বলাবাহুল্য নিজের দৃষ্টির এই নীতি বিগর্হিত কাজের জন্য মোটেই কুণ্ঠিত হলোনা অভিমত্য়। জায় সদ্ধত মিলনের সমস্ত পথঘাট খোলা না রেখে প্রেমে পড়াটা অসদ্ধত—এ ওকে বোঝাতে পারলোনা স্মৃতি।

অথচ স্মৃতির পক্ষে ভালো করে বোঝানোর অস্ববিধে কতো!

যাবতীয় ভীতিকর বস্তুর চোখ বাঁচিয়ে তবে তো?

কিন্তু স্মৃতির নিজেব চোখই কি ছিল নিষ্ক্রিয় হয়ে? বৈধব্য কি হরণ করে নিয়েছে ওর দৃষ্টি শক্তিকে?

কে জানে স্মৃতিদের মতো চাপা স্বভাবের মেয়েরা—কী ভাবে, কী না ভাবে, বোঝা দায়!

এদিকে—বেপরোয়া অভিমত্য় বেই আবিষ্কার করলো—স্মৃতিকে তার চাই, স্মৃতিকে না হলে তার চলবেনা, সেই মুহুর্তেই ব্যক্ত করে বসলো দ্বিধাহীন সবল ভঙ্গীতে।

বললো—স্মৃতি, তোমাকে আমার চাই।

শুনে স্মৃতি চমকে উঠলো, শিউরে উঠলো, স্তব্ধ হয়ে গেল।

অভিমত্য় আবার বললো—জেনো এটা আমার আবেদন নয়, সংকল্প!

স্মৃতি একবার ওর দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললো—কিন্তু তোমার সংকল্পটাই তো সংসারের শেষ কথা নয়!

—সংসারের ধার আমি ধারিনা। আমার কাছে আমার সংকল্পই শেষ কথা। তোমাকে আমি নেবোই।

স্মিতা মুহূ হেসে বললো—ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়ে?

—তাতেও আপত্তি নেই—অভিমত্যাও হাসলো—
বলপ্রয়োগ যদি বলো? সে তো করতেই হবে প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর। আর কৌশল করতে হবে তোমার গার্জেনদের নিকট। বাকীটা—

—বাকীটা বোধহয় আমার জন্তে?—বলে আর একবার হাসলো স্মিতা।

যে হাসি দেখলে—প্রতীক্ষা দুঃসহ হয়ে ওঠে অভিমত্যার।

অভিমত্যা বললো—তোমার জন্তে তোলা আছে যথা সর্বস্ব, সেখানে বাকীও থাকবেনা, ফাঁকিও থাকবেনা, কিন্তু সে তো পরে। এখন চললাম তোমার গার্জেনদের কাছ পর্যন্ত পৌছবার সুড়ঙ্গ খুঁজতে।

—পাগলামী কোরোনা—বচে পালায় স্মিতা।

একটানা বসে গল্প চালিয়ে যাবে, এতো সহজ তো নয় পৃথিবীটা! এখানে শুধুই কি আছে, অভিমত্যার অভিবৃত্ত চোখ? আছে—স্মিতার আত্মনিবেদনের দৃষ্টি? নেই সতর্ক প্রহরীর সজাগ চোখ? নেই—নিঃস্বার্থ হিতৈষীর তীক্ষ্ণ শ্রোণ দৃষ্টি?

তবু—এমনি টুকরো দেখা আর টুকরো কথার সোনালী রেশমে বোনা হচ্ছে ওদের রঙিন প্রেমের উত্তরীয়।

অদ্ভুতকর্মা অভিমত্যা।

কি করে যে ও স্মিতার বাবার সঙ্গে দিব্য জমিয়ে ফেললো, আদায় করে নিলো স্মিতার মার স্নেহের ভাঁড়ারের চাবিকাঠি, সে এক অলৌকিক রহস্য!

পাঁচজনে স্তন্যদে পেলো স্মিতার মাকে ‘মা-জননী’ বলে ডাকছে—অভিমত্যা। প্রথম দর্শনেই ও নাকি বলেছে—
কথা বলতে বসে ‘আপনি আজ্ঞে’ করতে পারবোনা কিন্তু, ডাকতে পারবোনা সেই তত্ত্বকে ‘মাসীমা’ ডাকে। তোমায় আমি ‘মা জননী’ বলবো।

বলাবাহুল্য বিগলিত স্নেহে ভাঁড়ারের চাবি খুলে দিতে দেবী হয়নি নিরুপমাদেবীর।

কথাটা যা তা ঘরের বাজেমার্কী কোনো ছেলের মুখে

শুনলে অবশ্যই গা জলে যেতো। মনে হতো ‘আদিখ্যেতা’। কিন্তু তা তো—নয়? ও যে ‘হীরের টুকরো’দের একজন। যে গাড়ীখানা চড়ে বেড়ায় সে, তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় সেটাকে।

সেই গাড়ীতে চড়িয়ে—অভিমত্যা নিরুপমাকে—
নিরুপমার পিতৃসম্পর্কের যতো আত্মীয় আছে, মামাতো, মাসতুতো, জ্ঞাতি আর পড়শী, যাদের সঙ্গে দেখা হবার কোনো আশাও ছিলোনা, প্রয়োজনও ছিলোনা, তাদের বাড়ী বাড়ী বেড়িয়ে আনলো একে একে।

স্মিতার বাবার হাঁটুর বাত চাগলে সেই গাড়ীতে চড়িয়ে অফিস, পৌছে দিলো পর পর এগারো দিন। স্মিতার ঠাকুমা আর পিসীকে নিয়ে গেলো কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে।

এর পরেও যদি বজ্রআঁটনির ‘গেরো’টা একটু টিলে না হয়, তাহলে—মল্লময় মনস্তত্ত্ব যে বেবাক মিথ্যে হয়ে যায়! অতএব—‘গেরো’ একটু টিলেই হয়ে গেলো একদিন।

ছোট ছোট ভাইবোনদের রক্ষীদল হিসেবে নিয়ে একদিন বেলেডে যাবার অল্পমতি পেলো স্মিতা ‘অভিমত্যার সেই চকোলেট রঙের চকচকে গাড়ীখানা চড়ে।

—গাড়ীখানা আজ ধন্য হলো।

মন্দিরের গেটের কাছে নামবার সময় দরজা খুলে দিয়ে এই মন্তব্যটা প্রকাশ করলো অভিমত্যা।

—সুধু গাড়ীটা?.. মুহূ চাপা-গলায় বললে স্মিতা—
আর কেউ নয়? কিন্তু থাক, শিশুরা সব সময় শিশু নয়।

—উঃ! তুমি বোধ করি কীট পতঙ্গকেও ভয় করো, না? এতো ভয় কেন?

স্মিতা উত্তর দিলে না। একবার কেবল অভিমত্যার মুখের দিকে সোজা সজ্জি তাকালো। সাদা ধবধবে স্রু সিঁথির দু’পাশে ভাগকরা ঈষৎ সোনালী চুলের নীচে চকচকে মাজা কপালটাও যেন তাকিয়েছে—অভিমত্যার দিকে—ঈষৎ সোনালী ছুটি চোখের সঙ্গে।

চোখেরই সুধু ভাষা থাকেনা, থাকে—চুলের, কপালের, আঙুলের ডগার। ভাষা থাকে—বাঁকানো গ্রীবার বিশেষ ভঙ্গীর।

উত্তর বোধ করি পেলো অভিমত্যা, তাই আঁর্ষির

বললো—কিন্তু এ ভয়কে জয় করতেই হবে স্মৃতি।
কারণ আমরা দুজনে দুজনকে চাই।

—তোমার কথাই বলো—স্মৃতি হাসলো—বাড়ীর
গণ্ডির বাইরে বলেই বোধকরি সত্যিকার হাসি। যে
হাসি কোনোদিন দেখেনি অভিমহু।—তোমার নিজের
কথাই বলো—আমার কথা কি জানো তুমি?

—সবজানি।

—কে বললে?

—আমার অন্তর্যামী।...আচ্ছা ছেলেগুলো ছিটকে
পালালো কোথায়?...এই শোন্ শোন্ দেদার চকোলেট
এনেছি তা জানিস? কি করবো? মা গন্ধাকে অর্ঘ্য
দিয়ে দেবো? না নিবি তোরা?

চকোলেট এবং স্বাধীনতা। জগতে আর বেশী কি
কাম্য থাকতে পারে?

ছোটোরা মহোৎসাহে শুরু করলো ছুটোছুটি। ওরা
দুজনে বসলো গন্ধার ধারে। আরতি আরম্ভ হলে উঠে
যাবে। আগে ভেবেছিল—কতো কথা কইবে, এতো
বড়ো স্রোতঃব্যর্থ হতে দেবে না। কিন্তু কথা জোগাচ্ছে
না মুখে।

মিনিটের পর মিনিট কাটছে... পশ্চিমের জলন্ত আগুন
স্তিমিত হয়ে আসছে...রূপান্তরিত হচ্ছে সোনায়।

হঠাৎ এক সময় অভিমহু বলে উঠলো—ঠিক এই
মুহুর্তে কি ইচ্ছে করছে জানো স্মৃতি?

—কি?

—ওই জলে ঝপিয়ে মরতে।

—চমৎকার।

—পরিহাস কোরোনা স্মৃতি, দোহাই তোমার।
স্বপ্নের পাত্র যখন উপছে ওঠে, তখন বড়ো একটা কিছু
ত্যাগ করতে ইচ্ছে করে স্মৃতি।

—কিন্তু প্রাণত্যাগটা বাদে হলেই ভালো হয় না কি?

—স্মৃতি, সব সময় সব কথা হেসে উড়িয়ে দাও
কেন? এ ঘেন তোমার নিজের চারিপাশে দুর্ভেদ্য-
দেয়াল খাড়া করে রাখা। একটু গম্ভীর হতে পারো না?

—হলে তোমার ভালো লাগে?

—সব সময় না হোক, এক এক সময়!...

—আচ্ছা গম্ভীর হচ্ছি। যা বলবে—শুনে যাবো,
কথাটা কইবো না।

—তাই বলেছি আমি?

অভিমহু রেগে ওঠে।

—তবে? উত্তর চাও—কিন্তু নাটকীয় ভাষায়। এই
বলছো?

—হ্যাঁ বলছি।

বলে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো অভিমহু।

স্মৃতি অস্থির হলোনা, চুপকরে তাকিয়ে থাকলো
গন্ধার একুল ওকুল ভরা জলের দিকে।...ওই ভরা হৃদয়ের
ওপর যখন ভেসে আসছে এক একখানা নৌকো, ছলছল
করে উঠছে জল। তরঙ্গ উঠছে অনেকটা জায়গা জুড়ে...
কিন্তু নৌকোখানা চলে গেলেই তো নিস্তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে
আবার।

জলের বুকে তরঙ্গ তোলা নৌকোর কাজ, জল
নির্লিপ্ত।...

আচ্ছা, মানুষের হৃদয়কে তবে নদীর সঙ্গে তুলনা করা
হয় কেন?...কিন্তু অভিমহু কি অভিমান করলো? চোখ
বুজে পড়ে আছে যে। ওর কপালটার ওপর যদি
একটাবারের জন্তে রাখতে পারা যেতো ডান হাতখানি।

ক্ষতি কি? পৃথিবীটা তাহলে চলতে চলতে থেমে
যাবে? বাতাস শুষ্ক হয়ে যাবে? নদীর জল শুকিয়ে
উঠবে? স্মৃতির এই অনাচার দেখে?

.....

চমকে উঠলো অভিমহু।

আবেগের বেগে চেপে ধরলো কপালে রাখা ঠাণ্ডা
হাতখানা।

—স্মৃতি, স্মৃতি, তোমাকে আমার চাই। আর
অপেক্ষা করতে পারছিনে। আজকেই আমি—তোমার
মাকে—

—পাগলামী কোরোনা। তা'হলে বাড়ীর লোকে
ভাববে ষড়যন্ত্র করবার জন্তেই এসেছিলাম আমরা।

কথাটা মিথ্যা নয়। অভিমহু বুঝলো। তবু বললো—
উঃ কী বিরাট দৈর্ঘ্য তোমার! কী অগাধ বিবেচনা!

* * * *

এরপর সন্ধ্যা নেমে এলো, বেজে উঠলো আরতির ঘণ্টা। তৎপর হয়ে উঠলো ছু'জনে। ছোটোদের ডেকে নিলো।

ফিরবার সময় আর কথা নেই।

কাণায় কাণায় ভরা পাত্র নাড়াচাড়া করতে ভয় করছে বুঝি বা।

সেদিন নয়—কদিন পরে একসময় এই অদ্ভুত প্রস্তাবটা করে বসলো অভিমহ্ম নিরুপমার কাছে।

কিন্তু নিরুপমাও কি মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন? চমকে উঠলেন না কেন? কঠে যথাসম্ভব বিষাদ এনে বললেন—কি বলবো বলো বাবা? আমাদের মতো ঘরে এরকম তো এখনো চলু হয়নি। আমি যদি বা হতভাগীর মুখ চেয়ে সংস্কার ত্যাগ করতে পারি, আর সবাই? আমার শাশুড়ী ননদ তাহলে জীবনে আর মুখ দেখবেন আমার?

অভিমহ্ম বললো—তাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হবে তোমার বলতে পারো?

নিরুপমা বিমূঢ়ভাবে বলেন—ক্ষতি নয়? সংসারে অশান্তি, লোকনিন্দে, আত্মীয় স্বজনের কাছে—

বাধা দিয়ে অভিমহ্ম বললো—এ সমস্তই তো তোমার নিজের অহঙ্কার মা জননী। না হয় নিন্দে করলোই লোকে, না হয় আত্মীয় স্বজনে ত্যাগই করলো তোমাকে। স্মিতার স্মৃতির জন্তে এটুকু মূল্য দিতে পারোনা? তোমাকে লোকে কি বললো সেইটাই এতো দামী কথা? স্মিতার জীবনটা—বাজে খরচ হয়ে যাওয়ার চাইতেও?

অভিভূত নিরুপমা বললেন—কিন্তু উনি? উনি কি রাজী হবেন?

—সে ভার তোমার। যদি না পারো, বোঝা যাবে তোমার মাতৃস্নেহে ফাঁকি আছে।

এ এক অশ্রুতপূর্ব নতুন কথা।

এদিক দিয়ে তো কোনোদিন চিন্তা করে দেখেননি নিরুপমা।

তা' চিন্তা করতে যদি শুরু করে একবার, তাহলে অসাধ্য সাধন করতে পারে মেয়েরা। স্বামীকে রাজী করিয়ে ছাড়লেন তিনি। মা বাপ হঠাৎ মরে গেলে কী

না কী দুর্দশা হতে পারে মেয়ের, তার প্রজ্জলিত উদাহরণ দেখিয়ে দেখিয়ে একেবারে মুক করে দিলেন ভদ্রলোককে।

তবে শাশুড়ী ননদরূপী ভয়ঙ্কর প্রাণীদের স্বমতে আনবার অনর্থক চেষ্টাটা আর করলেন না। ঠিক হলো বিয়েটা হবে চুপি চুপি। স্মিতার এক উদারপন্থী বিপত্নীক পিতৃবন্ধুর বাড়ী থেকে। কেবল মাত্র স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোনো এবং পুরো একটা দিন রাতের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিতে—গল্প একটা বানাতে হলো স্মিতার বাবাকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে।

নিয়ম লক্ষণ, দাবী দাওয়া, যৌতুক অলঙ্কার বর্জিত বিয়ে। অগ্র হাঙ্গামা তো কিছু নেই। অভিমহ্মার দিকে অতো চিন্তা নেই, ও স্বাধীন।

এর পরে—বাসরঘর অথবা ফুলশয্যার রাত্রির একটা মধুর ছবি এঁকে শেষ করা যেতো স্মিতার কাহিনী। স্মৃতি হতো শ্রোতার, শাস্তি পেতো লেখনী। কিন্তু তা' হলো কই?

নাশকতামূলক কার্যের জগৎ বিখ্যাত বিধাতাপুরুষ, ছোট্ট একটা “ফিশ্‌প্লেট” অপসারিত করে লাইনচ্যুত করে দিলেন—স্মিতার জীবনের মেলট্রেনখানা। যেখানে—বহুক্ষণ ‘সাইডিং’এ পড়ে থেকে সবেমাত্র আবার চলতে শুরু করেছিল।

সকালবেলা বন্ধুর বাড়ীতে মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে কর্তাগিন্নী ছু'জনে ছুটেছেন গুরুআশ্রমে। বোধকরি এই অসামাজিক কাণ্ডের জগৎ অনুমতি আদায় করতে। সংস্কার যেখানে প্রবল, সেখানে বাইরে থেকে কিছু সমর্থন না পেলে চলেনা।

তাছাড়া—এখন আর ভয় কি? ভয় কি স্মিতাকে একা রাখায়?

অভিমহ্ম যদি আসেই তো আশ্বক না।

করুক না যেতো খুসি প্রেমালাপ।

আজ রাত্রেই তো আইন সঙ্গত অধিকার দেওয়া হচ্ছে ওদের।

তা' অভিমহ্ম এলোই সত্যি সত্যি।

স্মিতার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে নয়—তার

অভিভাবকদের সঙ্গে কাজের কথা কইতে। ওর বিয়েতে তো আর লুকোচুরি নেই, বন্ধুরা বরষাত্রী হয়ে আসবার দাগী ছাড়তে চাইছে না। কি করে ঠেকানো যাবে তাদের? তাদের ঠেকাতে না পারলে, এঁরা ঠেকাবেন কিসের জোরে?

কিন্তু পরামর্শের লোকেরা পলাতক।

গৃহকর্তা বোধকরি অভিমতাকে বিয়ের বর বলে আন্দাজ করতে পারেন নি, অজ্ঞীয় গণ্য করে সহজভাবে বলেন—ওঁরা তো নেই, মেয়ে রয়েছে—যান। এই যে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানহাতি ঘর—উঠে যান না।...কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই, আমি একা মাল্লু, সদর অন্দর সবই সমান।

এরপর আর কে পারে লোভ সামলাতে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানহাতি ঘর অভিমুখে অগ্রসর হয় অভিমত্যা ধোসমেজাজে।

কিন্তু ঘরের এককোণে নিবিষ্ট হয়ে বসে কি করছে স্মিতা?

পূজো না কি?

পূজো আর্চাও আছে বুঝি ওর? জানা ছিল না তো!

ঈশং সোনালী কৌকড়ানো চারটা চুলে সমস্ত পিঁঠটা ঢাকা পড়েনি। দেখা যাচ্ছে কালো পাড়ের গরদের শাড়ীর একাংশ, দেখা যাচ্ছে—অনাবৃত দুটি বাহুল। পিছন থেকেই বোঝা যাচ্ছে করযোড়ের ভঙ্গী।

ভাগ্যদেবতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে স্মিতা?

অসম্ভব নয়। আজকের দিনে সেটাই স্বাভাবিক।

নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকলো অভিমত্যা, দাঁড়ালো পিছনে এসে।

কিন্তু এ কী?

এ কে?

এই কি স্মিতার ভাগ্যদেবতা? এর কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসেছে স্মিতা? এই স্মিতার ধ্যানের মূর্তি?

একটা তরুণ যুবকের আবক্ষ ফটো।

ফ্রেমে বাঁধানো নয়, শুধু কার্ডবোর্ডে আঁটা।

হাসি হাসি পুরস্ক মুখ। উল্টে আঁচড়ানো চুলের নীচে

চওড়া কপালটা চোখে পড়বার মতো। শেলের চশমার নীচে চোখ দুটি কৌতুকে উজ্জল।

* * * *

কৌতুক কেন? অভিমত্যার খেলোয়াড়ী দেখে?

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই ফিরে যায় অভিমত্যা। স্মিতার ঘর থেকে মিলিয়ে যায় ওর পদচিহ্ন।...

বিধাতা পুরুষের দুর্ভিক্ষ সারা হয়েছে।

অপসারিত হয়েছে ফিশপ্লেট।

ট্রেণখানা চলতে চলতে যে, লাইনচ্যুত হয়ে খাদে গিয়ে পড়েছে—সেটা ধরা পড়লো সন্ধ্যার পর।...যখন লগ্ন গিয়েছে পার হ'য়ে, ফুলের মালা ঘান হয়ে এসেছে, চন্দন উঠেছে শুকিয়ে।...চেলির শাড়ীতে দুঃসহ জালা!...

অনেক রাত্রে গাড়ী নিয়ে ফিরে এলেন পিতা আর পিতৃবন্ধু।

নাঃ কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলোনা অভিমত্যা।...জানা অজানা, সম্ভব অসম্ভব, কোনোখানেই খুঁজতে বাকী রাখেননি তাঁরা।

বাড়ীর চাকরটার কাছে, 'এইটুকুই শুধু জানা গেলো—কোন এক বন্ধু না কে আসবে বলে, কদিন ধরে নাকি বাড়ীঘর সাজানো গোছানো নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিল অভিমত্যা। কাল তো আসবার কথা। কি হলো—অভিমত্যাই জানে।...

বন্ধুকে আনতেই গেলো বুঝি বা।

তার অনুমানে ভর করেই সে বলেছে যা হোক।

কিন্তু বন্ধু আর এলো কই?

বন্ধুর আসার দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে গেছে অভিমত্যা। জীবন থেকে বিদায় দিয়ে গেছে তাকে।

অথচ কেন?

বি, এন, আর, লাইনের একখানা ফাষ্ট ক্লাশ কামরার বাক্সে গুয়ে সেই কথাই ভেবে চলেছে অভিমত্যা...কেন? হঠাৎ এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো পালিয়ে এলো কেন সে?

স্মিতার সেই নিভৃত প্রণামনিবেদনের কোমল

ছবিখানি এমন অসহ্য হলো কেন তার? স্মৃতি বিধবা—
এতো তার অজানা নয়?...জীবনের মোড় ফেরাতে গিয়ে
স্মৃতি যদি পুরণো পথের হারাণো সাথীকে উদ্দেশ্য
করে একটি প্রণাম নিবেদন করতে চায়, কী এমন অপরাধ?
অভিমন্ত্রার কী এলো গেলো তাতে?

সেই তো স্বাভাবিক। সেটাই তো উচিত।

স্মৃতি যদি এর চাইতে হান্ধা হতো—হতো—নতুন
স্বপ্নের আবেশ বিভোর, হতো—হৃদয় ধর্মের বালাইহীন,
তাহলেই কি স্মৃতি হতো অভিমন্ত্র্য? কেন? অভিমন্ত্র্য
তো এমন হৃদয়হীন নয়।

বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে বসলে—বিচার ফল যাই
হোক, নিজের কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই—পালিয়ে
আসা ছাড়া উপায় ছিলোনা তার। গ্রহণ করবার শক্তি
ছিলোনা স্মৃতিতে।

তর্কের জোরে উড়িয়ে দিতে পারে স্থবির শাস্ত্রের অর্থহীন
অনুশাসন, সাহসের জোরে ভাঙতে পারে পচা সমাজের
চিরচরিত শৃঙ্খলা, অস্বীকার করতে পারে আইন কানুন
দেশাচার, অস্বীকার করতে পারেনা—শিরায় শিরায়
প্রবাহিত পূর্বপুরুষের রক্তকে। যে রক্ত বহন করছে
ওর পৌরুষ, ওর আত্মাভিমান।

কুসংস্কারকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু মজ্জাগত
সংস্কারকে?

উদারতার প্রশ্ন নিষ্ফল।

সহ করা অসম্ভব—অগ্র পুরুষের পদপ্রান্তে প্রেমসী
নারীর নম্র প্রণাম নিবেদনের জালাময় ছবি!

তাই নিজের দুষ্কৃতির জন্ত অহুতপ্ত হবার একান্ত
চেষ্টায় যতোবারই মনে আনতে চাইছে স্মৃতির
অপমানাহত মুখছবি, ততোবারই ব্যর্থ হচ্ছে অভিমন্ত্র্য।
স্মৃতির কোনো মূর্তিই আর মনে পড়ছে না ওর। শুধু
ঈষৎ সোনালী চারটি চুল, শাড়ীর কালোপাড়ের বন্ধিম
একটি রেখা, আর অনাবৃত দুখানি হাতের প্রণামভঙ্গী।

আর—আর—স্মৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার
কৌতুক উজ্জল দুটি চোখের দৃষ্টি নয়? যে দৃষ্টির অশ্রুশ
তাড়া দিয়ে দিয়ে এনে ফেলেছে অভিমন্ত্র্যকে—দুশো—
তিনশো—পাঁচশো মাইল দূরে।...যে দৃষ্টি বিজ্ঞানের
আলোক-বন্ধনে বন্দী হয়ে, হারিয়ে গিয়েও অক্ষয় হয়ে
আছে চিরদিনের জন্তে।

নাঃ, হার মানছে অভিমন্ত্র্য।

পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিলোনা ওর।

অকাল বর্ষা

শ্রীসুখরঞ্জন মৈত্র (১৩ বৎসর)

বর্ষা-দিদি রাগ করেছে,
হাসবে নাকো আর।
কত পুতুর ভরে গেছে,
চোখের জলে তার।
কাঁদছে দিদি দেশে দেশে,
বিরাম নাহি দেয়।
বর্ষা দিদির কান্না দেখে
কান্না যে ভাই পায়।
ও দিদি আর কেঁদনা,
এদিক ফিরে চাও।
সেই সকালে ভাত খেয়েছ,
এখন কিছু খাও।

দেখতে তুমি পাওনা দিদি
তোমার চোখের জলে।
কত পাখী ভিজছে বসে,
কত গাছের ডালে।
কত পখিক ছাতাবিনে
ভিজছে পথের মাঝে।
চাষী ভাইরা ভাবছে বসে
কেমনে যাবে কাজে।
বর্ষা দিদি বর্ষা দিদি,
কেঁদনাকো আর।
ঘরের দরজা বন্ধ করে,
ঘুমাও একটবার।

শিক্ষার গতি

শ্রীবিমল চন্দ্র সেন

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বের কথা। তখন বাঙলায় কুটীর-শিল্পগুলি সজীবতার মধ্য দিয়া স্বাভাবিক গতিতে পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া চলিয়াছে। দেশের ছয় কোটি অধিবাসীর দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য পল্লী-শিল্পীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাইয়াছে। এ যুগের ত্রায় বিদেশ হইতে জাহাজ বা প্রদেশান্তর হইতে নৌকা করিয়া মাল আমদানী করিতে হইত না, বরং বর্তমানকার ব্যাধি ও অভাব-জর্জরিত বাঙলাই তার সীমার বাহিরে উদ্ভূত দ্রব্যসম্ভার রপ্তানি করিয়া দেশের ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধি করিত। একুপ শিল্পের সংখ্যা বড় কম ছিলনা, যেমন—পরিধানের বস্ত্র ও যাবতীয় সূতার দ্রব্য, আলোয়ান, মোজা, নানা শ্রেণীর টুপী, বহুবিধ অলঙ্কার, থালা-বাসন, কলম-পেন্সিল, বেত-বাঁশ-মাটি প্রভৃতির অসংখ্য দ্রব্য। বস্তুতঃ অতীত যুগ হইতেই কর্মবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ সমাজে 'জাতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যেমন—কাঁসারী, কুস্তকার, মালাকার, কর্মকার, শাখারী...প্রভৃতি। পল্লীজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল সূতার দ্রব্য, অর্থাৎ বস্ত্রাদি। গ্রামের সম্পদে সম্পন্ন হইয়া গোটা বাঙলাই তৎকালে ছিল আর্থিক দিকে বর্তমান যুগ হইতে অনেক বেশী স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছল।

ইংরাজ আসিল। তারা বুঝিল যে, নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে গ্রামের এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া দিতে হইবে, স্বদেশের বস্ত্রজাত অসংখ্য শিল্পদ্রব্য কল-কারখানাশূন্য বাঙলার হাজার হাজার পল্লীতে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং তাহা হইলেই এ দেশকে দৃষ্টিশ্রমে শোষণ করিয়া নিজ দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যাইবে। ইংরাজের সর্বনাশা ক্ষুধা ও নিষ্ঠুর গ্রাস ঐ ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা অল্পযায়ী বাঙলা দেশে ধীরে ধীরে করাল ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। চতুর ইংরাজ স্থান-স্থিতি হইয়া মাগি ছাড়িবার সুবিধার জগু এবং নির্বিচক্রে দেশ শোষণের

সর্বাধিক সুযোগলাভের জগু সহর সৃষ্টি করিতে লাগিল। এইভাবে পল্লী-অঞ্চলের সংখ্যাভীত কুটীর-শিল্পের বনিয়াদ ভাঙিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তারা অল্প একটি অতি-প্রয়োজনীয় দিকে মনোনিবেশ করিল।

মুষ্টিমেয় ইংরাজ বিশাল দেশের শাসন কার্য চালাইতে পারে না। তাই সহর সৃষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠায় তারা আত্মনিয়োগ করিল। দেশের লোককে নিঃস্বার্থ ভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার অকপট আগ্রহেই যে ইহা করা হইল, তাহা নহে; কিছু ইংরাজী-জানা ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন একটি অভিজাত সম্প্রদায় সহরাক্ষরে সৃষ্টি করিতে না পারিলে বাণিজ্য-ব্যপদেশে দেশ-শাসন সুশৃঙ্খলভাবে চলিবে না—ইহা তারা ভালোরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক তারা বাঙলায় ঐ যুগে বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এ হতভাগ্য দেশকে শাসন ও শোষণ উভয়বিধ স্বার্থকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যেই। পরে অবশু বিধির বিধানে সেই আলোকই মায়ামুগ্ধ বাঙালীর চোখের তুলি খুলিয়া ও মনের কালিমা ঘুচাইয়া দিল; আর ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিল তার আত্মচেতনা, জাগ্রত হইল তার জাতীয়তাবোধ। তারপর তৎকালীন ঐ দুটি (অর্থাৎ, দেশের সম্পদহরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা) অভিশাপরূপী প্রচুর আশীর্বাদের অব্যর্থ অস্ত্রই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংরাজের বৃকে নিষ্ঠুর আঘাত হানিতে থাকিল। রাজনৈতিক ইতিহাস সৃষ্টি হইয়া চলিল এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের জাতীয় জাগরণের বহু ইংরাজকে এদেশ হইতে সূদূর সাগরপারে ভাসাইয়া লইয়া গেল, অর্থাৎ ইংরাজ বিতাড়িত হইল—দেশ স্বাধীন হইল।

যা হোক, গত শতাব্দীতে বিদেশের চাকচিক্যময় সুন্দর সুন্দর দ্রব্যে যখন বাঙলার পল্লী ক্রমেই ছাইয়া

বাইতে লাগিল, তখন শান্ত ও শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর চক্ষু ধাঁধিয়া বাইতে সুরু করিল। খাদ্যের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও তারা হুটচিতে ঐ সব কিনিতে লাগিল; বিশেষ করিয়া সহরে ঐ ব্যয় অমার্জনীয় বিলাসের সীমায় গিয়া পৌঁছিল। কালক্রমে বাঙলার কুটীর-শিল্পগুলি নির্জীব হইতে থাকিল। তারপর বিংশ শতাব্দী সুরু হইবার পূর্বেই বাঙলার নিজস্ব ঐ মহাসম্পদ কোনটা হইল মৃত, কোনটা বা জীবন্মৃত হইয়া জঘন্তভাবে অস্তিত্বমাত্র বজায় রাখিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের ধন বিলাতে জনসাধারণের পকেট ফাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। এ সবের অনিবার্য ফলস্বরূপ পল্লী-বাঙলার দুঃস্থ শিল্পী-সম্প্রদায় অর্ধাশ্রিত বা অনাহারের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে থাকিল দুর্নিবার গতিতে।

এইভাবে কুটীর-শিল্পগুলি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, হালচাল প্রকৃতি লোকের মনে একটা সর্বনাশা বিভ্রান্তি আনিয়া দিতেছিল; তারা ঐরূপ হুদিনে যেন ভালোরূপ বুঝিতেই পারিতেছিল না যে, চোখে রঙীন চশমা পরাইয়া, যাছ করিয়া, ভুল বুঝাইয়া তাদের সর্বতোভাবে নিঃশেষ করা হইতেছে! সেই যুগ-সমীক্ষণ বাঙলার পক্ষে সত্যই ভয়াবহ একটা দুঃসময় গিয়াছে।

তখন হইতে সুরু করিয়া দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি বাহ্যিক-রূপ বদলাইতে বদলাইতে বর্তমানকার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইংরাজ দেশ ছাড়িবার কিছুকাল পূর্ব হইতেই এই মায়ালা ফাসানের উচ্চশিক্ষার গলদ যেমন লোকের চোখে ধরা পড়িয়াছে, তেমনি জনসাধারণ এ কথাটিও বুঝিতে পারিয়াছে যে বৃন্যাদী শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশের দুর্গতদের প্রাণবায়ু পরোক্ষভাবে প্রায় কণ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে। কারণ বাঙলার শতকরা ৯৫ জন লোকই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং (বর্তমানে) শতকরা মাত্র বোলজন সহরে বাস করে। লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসীর জীবিকার সর্বপ্রধান বাহক তো ছিল ঐ কুটীর-শিল্পগুলিই।

দেশের এই শিক্ষা-সম্পর্কীয় আত্মহ্রাসকান স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে যেমনটি আরম্ভ হইয়াছে, পূর্বে আর কোনদিন এমনটা হয় নাই! আমাদের বড় বড় সহর-

গুলিতে বহু কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাহাতে সহরের মুষ্টিমেয় ধনী-সম্প্রদায় ও পুঁজিপতিরাই কোটার মালিক হইতেছেন; সহরই জাঁক-জমকপূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ কটিবস্ত্র সঞ্চল করিয়া অর্ধভুক্তই থাকিয়া বাইতেছে।—রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—‘যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্ত চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সঙ্কীর্ণ-স্থানে আবদ্ধ হইয়া ঐখন্ডের যে মায়া সৃষ্টি করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত-সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।’ এ মহৎ উক্তির তাৎপর্য যে কতখানি সত্য, তাহা সহরের নগণ্য ধনী-সমাজের বিলাস-বাসনের সঙ্গে বিস্তীর্ণ বাঙলার বুভুক্ষু জনগণের উৎকট অভাব জনিত হা-হুতাশের তুলনা করিলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি দ্বারা যাইবে।

ইংরাজের দেওয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা সবটুকুই মন্দ বা ভুলপথে পরিচালিত, এ কথা এখানে বলা হইতেছে না; বরং ইহা সমাজের কদর্য সঙ্কীর্ণতা ও অর্থহীন রক্ষণশীলতা প্রভৃতি দূর করিয়া সে স্থলে সাম্য, উদারতা ও জাতীয়তা প্রভৃতি নানা শুভ মনোবৃত্তি দেশবাসীর মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্নবস্ত্রে ও দৈনন্দিন জীবনের অগ্ন্যগ্ন অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যে দেশকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সমগ্র দেশে সে ব্যবস্থা কতটুকু হইয়াছে? প্রাচীন বাঙলা নিজস্ব উপায়ে কুটীর-শিল্পগুলির দ্বারা দেশের জন্ত ঐ সব অপরিহার্য দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরী করিয়া খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতিতে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এত বড় একটা সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া পোঁনে দুই শত বৎসরের মধ্যে ঐসবে আমরা শুধু রিক্ত হইয়াই আসিয়াছি। নেহাৎ একমুখী ও সাধারণ শিক্ষাই (General Education) আজ পর্বস্ত্র প্রসারলাভ করিয়া চলিয়াছে। একটু অগ্ন্যগ্নে আলোচনা করিলে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তাহার বাস্তব ফলাফল প্রভৃতি আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় একশ শত এবং ছাত্র সংখ্যা সওয়া পাঁচ লক্ষের কিছু উর্দ্ধে; গ্রাম্য

সংখ্যা হইল প্রায় পৌণে পয়ত্রিশ হাজার। কিন্তু সারা বাঙলায় বুনियाদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কটি, ছাত্র-সংখ্যা তাহাতে কতজন? এই যে হাজার হাজার দুঃস্থ পল্লী, আর তার অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন নরনারী, তাদের বুনियाদী শিক্ষালাভের সুযোগ কতটুকু?

এখানে কল্পনা করা যাক যে, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি ছেলে মহুরে থাকিয়া গরীব বাপকে রিক্ত করিয়া কোনমতে বি-এ পাশ করিল। বৃদ্ধ পিতা ও দুঃখিনী মাতা দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন যে, ছেলে মানুষ হইবে, তাঁদের পারিবারিক ধার দেনা পরিশোধ হইবে, বয়স্থা মেয়ের বিবাহ দিবেন, একটু স্বস্তির সঙ্গে অপর ছেলেদের শিক্ষা দিবেন এবং ভাগ্যক্রমে অন্ততঃ শেষ বয়সটায় একটু শান্তির মুখ দেব্রিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যাহা হয়, হয়তো দেখা গেল যে, ছেলেটি বি-এ পাশ করিবার পর দু-তিন বৎসর ভালো চাকুরীর জন্ত ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে একশত বা দেড়শত টাকা মাহিনায় কলিকাতায় একটি চাকুরী গ্রহণ করিল। এ কঠিন বাজারে ঐ ক্ষুদ্র চাকুরী করিয়া তার বোনের বিবাহ, ভাইয়ের শিক্ষা, পারিবারিক দেনা-পরিশোধ প্রভৃতির যে পরিকল্পনা, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল! এরূপ স্থলে বুক ভাঙা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ও সীমাহীন দুঃস্বপ্না নিয়াই কি বাপ-মায়ের ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল না! ছেলেটির নিজ ভবিষ্যৎ জীবনই বা সে গড়িয়া তুলিবে কি সম্বল অবলম্বন করিয়া!

এইভাবে এই যে একটি মূল্যবান জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল, আর তার সম্পর্কিত একটি হতভাগ্য পরিবার যে নিঃশেষে ডুবিতে বসিল—ইহার জন্ত দায়ী কে? কিন্তু ইহা তো বিক্ষিপ্ত বা কদাচিৎ-শোনা ঘটনা নয় যে, চোখ-মুখ বুজিয়া ও অগ্রাহ্য করিয়া চলা যায়; বরং এই শ্রেণীর ঘটনাই তো বাঙলা দেশে প্রায় প্রতি পরিবারে সুদীর্ঘকাল যাবৎ অতি নিয়মিতভাবে ঘটিয়া আসিতেছে।

তবু সৌভাগ্যের বিষয় এই-যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে সরকারের দৃষ্টি শিক্ষার উল্লিখিত সমস্তার দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষার 'দিক' পরিবর্তন ও পরিবর্তনের বহু চিন্তাকর্ষক পরিকল্পনা তাঁরা করিয়া

ফেলিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এসব বিস্তৃত দিকের প্রতি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে নানা শুভ ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু মামুলী ও জটিল অর্থনৈতিক যে বাধা, তাহাই আজ সব-কিছুর অগ্রগতির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে এ চিরন্তন অন্তরায়টি যেহেতু অল্প-বিস্তর বহুকাল থাকিয়াই যাইবে; তাই যেখানে ও যতটুকু সম্ভব, বুনियाদী শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র খুলিয়া চলা ছাড়া গতাস্তর কি।

কল-কারকাথা ক্রমেই বেশী প্রতিষ্ঠিত হয় হোক; সে দিক দিয়া, অর্থাৎ যান্ত্রিক শিল্পোন্নতির দিক হইতে বিচলিত বা ভীত হওয়াও এ যুগে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে এত জন-বহুল ও পরম দরিদ্র দেশে, জনসাধারণের অতলম্পর্শী অভাব-অনটন মিটাইবার যোগ্য কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে ও তাহা দ্বারা সত্যায় সবার দুঃখ দূর করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবেই; বস্তুতঃ মহাদেশের জায় এত বড় একটা দেশের পক্ষে, আর ঐরূপ একটা বিরাট ও মঙ্গলজনক পরিবর্তন আনিবার পক্ষে পঞ্চাশ বা একশত বৎসর অতি দীর্ঘকাল বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে কল্পিত সেই অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ যেহেতু শীঘ্র আসিবার নয়, তজ্জন্ত দরিদ্র দেশবাসীর স্বল্প আয়োজনের মধ্য দিয়াও বুনियाদী শিক্ষার ভিত্তিপত্তন সূত্র করিলে, স্বদেশের জন্ত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর ব্যবস্থাই করা হইবে; জনসাধারণের ও সরকারের মনেও আজকাল এ ধারণাটা অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মহাত্মাজীর ওয়াধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই দিকটিতে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে; যতই দিন যাইতেছে, ততই স্বর্গত এই ভবিষ্যৎ-মহাদ্রষ্টার বাস্তব জ্ঞানের প্রতি দেশবাসী শ্রদ্ধাবনত হইতেছে।

যন্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলির অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সহজেই দেখা যাইবে যে, সেখানেও দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা রহিয়াছে এবং পাশাপাশি পুঞ্জ-পত্তিয়া ও তাঁদের রাজকীয় বিলাস-ব্যসন রহিয়াছে। সুতরাং ইহা অনেকটা সত্য কথা যে, যন্ত্রশিল্পের জন-কল্যাণ করিবার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, স্বদূর পল্লীর প্রতি গৃহের অন্ন বস্ত্রের অভাবজনিত হাহাকার, পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলিও সবটুকু আজ পর্যন্ত মিটাইতে সক্ষম হয় নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে, সহরের বাহিরে থাকিয়া ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে স্বল্প মূলধনে পল্লীবাসীরা নিজ নিজ ঐ দুর্গতি স্বল্পায়সে মিটাইয়া নিতে পারে। তারপরে ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও ভয়াবহ নিঃস্বতা—এসবও বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্র তৈরী করিয়া আছে। নানা দিকের এ বাস্তব সত্যগুলিকে আজকাল আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি যন্ত্র শিল্প সস্তায় সমগ্র দেশের অভাব ভবিষ্যতে সত্যই কোনদিন মিটাইতে সক্ষম হয়, তখন সে শুভদিনের মঙ্গলাশীর্ষাদের আলোক হইতে দেশবাসী তো মুখ ফিরাইয়া থাকিবে না—শুভকে কল্যাণকে সবাই আনন্দে অভিনন্দন জানাইবে।

যাহা একদিন ইংরাজ নিজ উৎকর্ষ-স্বার্থের নিষ্ঠুর প্রয়োজনে ধ্বংস করিয়াছিল, বিভ্রান্ত দেশবাসী তখনকার দিনে যাহাতে ক্ষীণ প্রতিবাদেই বেশী কিছু জানানো প্রয়োজনবোধ করে নাই এবং বর্তমান বহু-প্রচলিত উচ্চ-শিক্ষার গৌরব যেখানে কুটীর-শিল্পগুলিকে দেশোন্নতির

ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত প্রায়-সবটুকু অপাংক্তেয় করিয়াই রাখিয়াছে, সেই বিস্মৃত ও উপেক্ষিত দিকে এখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙলায়, তথা ভারতবর্ষে, শিক্ষা-ব্যবস্থার গীতি পরিবর্তন হইয়া সত্যই আজ যেন নূতন যুগের সূচনা করিতেছে—কালের ঢাক সত্যই বুঝ ঘুরিয়াছে—বুনিয়াদী শিক্ষার দিকে জনগণ মনে অকৃত্রিক আকর্ষণের স্পষ্ট আভাষ সত্যই যেন আজ পাওয়া যাইতেছে।

যে সব প্রতিষ্ঠান নানা বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যেও স্ব-প্রেরণায় কাজ করিয়া দীর্ঘকাল হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার দিকে ও কুটীর-শিল্পগুলির পুনর্জীবনলাভের দিকে অকপট নিষ্ঠার সঙ্গে আগাইয়া চলিয়াছে, সেগুলির উদ্যোক্তাদের প্রতি সমগ্র দেশ আজ শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারে না; মনে হয়, তাঁরা যেন তাঁদের অভিনব কর্মপ্রেরণার স্নিগ্ধ আলোক-বর্তিকার সাহায্যে পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে পথ-নির্দেশ করিয়া চলিতেছে।

‘প্রিয়তম’

ক্ষণপ্রভা ভাঙুড়ী

আমারে করিও ক্ষমা,
জেনে যদি করে থাকি অপরাধ কোন;
ভুলে যেও প্রিয়তম, কোরনাকো অভিমান,
একটা মিনতি শুধু শোনে।
তোমার সান্নিধ্য হতে ফিরে যবে
আসি, করি মস্তক আনত;
তুমি কি বুঝিবে মোর,
সে দুঃখ কি স্বগভীর,
বেদনা বিক্ষত?
তবু কেন বারে বারে,
ডাকো মোর নাম ধরে,

অলক্ষ্য হইতে নিতি
অদৃশ্য ইঙ্গিতে।
কেন তুমি অঙ্গ মম,
স্পর্শ কর বহিঃ সম,
রক্তে তুলি মত্ত বঙ্গা
বিস্কন্দ সঙ্গীতে।
তুমি ত জানোনা হায় মোর প্রত্যাভার;
মুহুর্তে ঘুরিয়া আসে অতিক্রমি
জন্ম জন্মান্তর।
খুঁজে নাহি কোথা পায়,
তোমার ঠিকানা হায়;

তবু বুথা খুঁজে মরে ব্যাকুল সন্ধানে ।

তুমি কি জানোনা প্রিয়

এ আশা অভাবনীয়,

কোন মন্ত্রবলে আমি ছিন্ন করি,

মৃত্তিকা বন্ধনে ।

কেমনে অন্তর মোর স্পর্শ করে,

দূরাতীত তব তীর্থ রেণু ;

তবু অবুঝের মত কেন ডাকো অবিরত,

বাজিয়ে বেদনা ঝরা ব্যাকুল বিভল বেণু ।

তুমিত জানোনা মোর অন্ধরাত্রে

ভেঙ্গে যায় ঘুম ।

ধরণী যখন শুক্ল ক্রান্তি ভরে

নিদ্রায় নিরুদয় ।

খোলা জানালাটি খুলে

তন্দ্রা হারা দৃষ্টি তুলে,

চেয়ে থাকি মহাশূন্যে নাক্ষত্রিক লোকে ।

যেথা, সপ্তর্ষি মণ্ডলের

মধ্যমণি বশিষ্ঠের,

অতি কাছে অরুন্ধতী থাকে ।

মধুমত পূর্ণিমায়, অতি স্বচ্ছ নীলিমায়,

আকাশের বক্ষে জাগে দ্রুন্ত যৌবন ।

অজস্র স্থলিত পুষ্পে, ব্যক্ত হয় অরণ্যের,

মর্ম আবেদন ।

বনস্পতি পত্র শীর্ষে, মনে হয় কোন্ অদৃশ্যে,

প্রচ্ছন্ন রয়েছে নব সৃষ্টির অঙ্কুর ।

অন্ধ মৃত্তিকার নীচে, অগ্নি তার বন্দী আছে,

রক্ত রাঙ্গা কুণ্ডলুতা তারি জন্ম প্রতীক্ষায়,

বর্ণে রাগে হয়েছে বিধুর ।

(তুমি) জানোনা সেখানে মোর, লুপ্ত ইচ্ছা,

সপ্তরঙ্গা রামধনু সম ।

হৃদয়ের নীল নভে তোমাংরে চিত্রিত করে;

সজোপনে মুগ্ধ মনোরম ।

বিরহের অশ্রুজলে, পূর্ণ করে মিলনের

মঙ্গল কলস ।

সঙ্গীহীন চিস্তা সেথা, রাত্রি দিন অগ্নমনা,

নিত্য নিরলস ।

তবু কোনও আরক্তিম আসন্ন সন্ধ্যায় ;

মালঞ্চে মল্লিকা ধবে করে ফুটি ফুটি

সন্ধ্যা মালতী আর রজনী গন্ধায়,

গন্ধ জাগে মঞ্জরীর পত্র পর্ণ টুটি ।

আধার গুণ্ঠন টানি, আবরি আনন থানি,

অভিসারে যায় দিবা দিনান্তের তটে ।

তাহারই অঞ্চল চুমি

কল্পনায় যাই আমি,

তব সন্নিকটে ।

হে সম্রাট জানি তুমি মোর প্রিয়তম ।

(তোমার) রাজৈশ্বর্য শেল সম

বক্ষ দহে মম ।

আমার পূজারুঁডালা,

শুধু পুষ্প গন্ধ ঢালা,

আমার নৈবত্ত শুধু হৃদয়ের

স্পর্শ ভরা, প্রেম স্তম্ভুর ।

সুবর্ণ দেউলে তব সে অতি সামান্ততম,

সরম সঙ্কোচে মান রিক্ত অপ্রচুর ।

তুমি যদি মোহ বশে দূরে থাকো,

নাহি আসো কাছে ।

এ দারুণ লজ্জা মোর

রাখিবার কোথা স্থান আছে ?

তাইতো আড়ালে থাকি;

সুখে প্রাচীর রাখি,

প্রেম দিয়ে স্পর্শ করি

তোমার অন্তর ।

• দূরে থাকি সেই ভালো,

জালিয়ে প্রেমের আলো

স্মরণের ভূজপত্রে লিখি তব

নাম নিরন্তর ।

ফুল ফুটাবে

শ্রীদীপ্তি দেবী

(৮)

অরুণ আর আসে না অনিন্দিতার বাড়ী। রাস্তা ঘাটে নগেন বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে সে ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে চলে যায়। হেমাজিনী দেবী প্রায়ই বলেন— “অরুণ আর আসে না এদিকে। ছেলেটার উপর এমন একটা মায়্যা পড়ে গিয়েছে, একবার না দেখলে মনটা কেমন ছটফট করে।” নগেন বাবুও সায় দেন। কিন্তু অরুণের অচুপস্থিতি যার মনে অহোরাত্র কাঁটার মত বিধে আছে সেই অনিন্দিতাই চুপ করে থাকে। কোন কথাই বলে না।...

কোন নিমন্ত্রণ না পেয়েও মেজর রোজই একবার করে আসেন অনিন্দিতার চিকিৎসার জন্ত। কে যে ঠিকে অনিন্দিতার চিকিৎসক নিযুক্ত করেছে তার নাই ঠিক। নগেন বাবু একদিন বলেন—হেমাজিনীকে—আচ্ছা, ঐ মেজর গাঙ্গুলী কি অনিন্দিতার চিকিৎসা করছেন?

বাগ করে হেমাজিনী বলেন “কিসের চিকিৎসা? কি আর ওর হয়েছে? খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু বিশ্রাম পেলেই ঠিক হয়ে যাবে। কেন যে ঐ হাঁসপাতালের ডাক্তার রোজ রোজ এখানে আসে তা জানি না। শিশি শিশি ওষুধ পচছে ঘরে। অনিন্দিতা তো কিছুই খায় না। তবু রোজ একটা না একটা ওষুধের শিশি বগলে করে ওঁর আসা চাই-ই। বাস্তবিক এত ঘন ঘন ডাক্তার বাড়ীতে এলে লোকে বলবে কি? আমার এসব কিছু ভাল লাগছে না।”

নগেন বাবু একবার তাঁর টাক মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে বলেন—“হু, ব্যাপারটী আমার ও তেমন ভাল ঠেকছে না। না হয় দিন কতক অনিন্দিতাকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দাও।”

অনিন্দিতাকে কোলকাতায় পাঠানই স্থির করে ফেলেছিলেন তার মাসিমা, এমন সময় দুর্ভিক্ষ দেখা

দিল। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। এক মুঠো ভাতের জন্ত মানুষ পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। বোধ হয় অনেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল, নয়ত কি আর মা ছেলের মুখ থেকে আহার কেড়ে খায়? স্বজ্ঞা স্বফলা বঙ্গভূমি আজ শ্মশানে পরিণত। কারো ঘরে অন্ন নাই। মাঠে ফসল নাই। বাংলার ভাঙার আজ শূন্য।

স্বরেশ শনিবারে এসেছিল দেশে, পিসিমার আহ্বানে। অনিন্দিতাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথাতে সে বল্ল—“পাগল? সেখানে তোমরা একদিনও টিকতে পারবে না। যে সব বীভৎস দৃশ্য রোজই দেখতে হচ্ছে আমাদের সে দৃশ্য দেখলে তোমরা এক দিনও সেখানে থাকতে পারবে না। অন্নহীন পুরুষ, নারী, শিশু রাস্তায়, ফুটপাথে মরে পড়ে রয়েছে। চারিদিকে কেবল রব শুনবে—ছুটি ভাত দাও! ছুটি ভাত দাও! পেট ভরে খেতে এখন নিজেরই লজ্জা বোধ হয়, নিজেকে অপবাদী মনে হয়। মুখে এক গ্রাস তুলবে কি অমনি রাস্তায় শুনবে করুণ স্বরে কে ছুটি ভাত চাইছে। অর্ধেক দিন খাওয়া হয় না। মুখের ভাত বিলিয়ে দিয়ে উঠে পড়তে হয়। খাওয়া যায় না এ অবস্থায়। গ্রামে বরং তোমরা ঢের ভাল আছ।”

কলকাতার কথা শুনে সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। এই সব অনাহারী নরনারী ও শিশুদের জন্ত কি ব্যবস্থা হয়েছে জানতে চাইল অনিন্দিতা। স্বরেশ বল্ল— “নন্দরথানা, দুগ্ধ বিতরণী কেন্দ্র ইত্যাদি সহরের যায়গায় যায়গায় খোলা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান শুধু প্রাইভেট চ্যারিটিতে তো হবে না। সরকারী ব্যবস্থার দরকার।” “তা দীদা, এই সব দুঃখীদের জন্ত আমরা কিছু পারিনা করতে?” কাতর দৃষ্টিতে চাইল অনিন্দিতা স্বরেশের দিকে। স্বরেশ বল্ল—“আমাদের অফিস থেকে

একটা ফ্রী কিচেন খোলা হয়েছে। আর রেড ক্রশের সাহায্যে আমরা একটা দুগ্ধ বিতরণী কেন্দ্রও খুলছি।” “এই ফ্রী কিচেন ও মিল্ক সেন্টারে সাহায্য করবার জন্ত লোকের দরকার কে? তা আমি গিয়ে তোমায় সাহায্য করতে পারিনা?” জিজ্ঞাসা করল অনিন্দিতা। “সাহায্য করবার জন্তে আমরা লোক পেয়েছি। লেডী চৌধুরী এ কাজে যথেষ্ট ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন। তাঁর বোনঝি নয়নতারা দেবী কি কাজটাই না করছেন! সে আর কি বলি? অগ্রা সব যাবার জন্তই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু নয়নতারা দেবী শেষ পর্যন্ত একাই কাজ চালান। কী অসাধারণ কর্মশক্তি তাঁর, এমন দেখা যায় না।”

পরের মেয়ের এত প্রশংসা শুনে হেমাজিনী দেবী বলেন—“আর আমাদের অনিন্দিতা বুঝি খাটতে পারে না? এখানকার ক্যান্টিন না কি একটা আছে না? সেটা তো বলতে গেলে ও একাই চালায়।” হেমাজিনীর কথাতে স্বরেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—“অনিন্দিতা তো একটা বাহাদুর মেয়ে। কি রকম করে ইস্কুলটাকে রক্ষা করল বলতো? কজন অমন পারত?”

দুর্ভিক্ষ কোলকাতায় যে ভীষণরূপ নিয়েছিল গ্রামে ঠিক সেই রূপে দেখা দেয়নি, তবু আস্তে আস্তে অবস্থা অবনতির দিকেই বচ্ছিল। চাল সংগ্রহ করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছিল। অনিন্দিতা চিন্তার মধ্যে পড়ল। এতগুলি মেয়েকে সে খাওয়াবে কি দিয়ে? S. D. O. শশধর বাবু প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন তার স্কুলের জন্ত। কিন্তু এমন একদিন এল যেদিন তিনিও আর চাল জোগাড় করে দিতে পারলেন না। বলেন তিনি অনিন্দিতাকে—“তুমি কটা দিন আমায় সময় দাও মা, আমি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করছি। গভর্ণমেন্টের রিজার্ভ ষ্টক থেকে অন্ততঃ তোমার স্কুলের জন্ত কিছু চাল আমি সংগ্রহ করে আনবই।”

অনিন্দিতার মাথায় বাজ পড়ল। চার পাঁচ দিনই বা সে কি খাইয়ে রাখবে এতগুলি মেয়েকে? শশধর বাবুর দিকে সে চেয়েই রইল। চোখ তাঁর ভরে এল জলে। শশধর বাবুর মনও খারাপ হয়ে গেল। তিনি বলেন—“আমি যতশীঘ্র পারব তোমায় চাল জোগাড় করে দেব।

উপস্থিত ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জীর স্মরণাপন্ন হও। মিলিটারিদের হাতে নিশ্চয় কিছু রিজার্ভ আছে। আমার বিশ্বাস তিনি এ বিপদের সময় তোমায় সাহায্য করতে পারবেন।”

অরুণ তাদের সঙ্গে প্রায় সব সম্পর্কই কাটিয়েছে। এখন তার কাছ থেকে সাহায্য নিতে তার বাধল। কিন্তু ওর নিজের কুষ্ঠার জন্ত সে এতগুলি মেয়েকে অনাহারে রাখতে পারবে কি? সে আস্তে আস্তে বল শশধর বাবুকে—“আপনি যদি দয়া করে একবার ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জীকে এ বিষয় জানান তো বড় ভাল হয়। তাঁর কাছে খবর পাঠান আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চাকরারা কেউ ভয়ে মিলিটারি ক্যাম্পের দিকে যেতে চায় না।” বেশ আমিই না হয় ফেরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব। তারপর একটু থেমে বলেন শশধর বাবু—“তুমি না হয় এক লাইন লিখে দাও। উনি যদি এখন ক্যাম্পে না থাকেন তবে চিঠিখানা সেখানে রেখে আসতে পারি।”

কোন উপায় না দেখে অনিন্দিতা অরুণকে দিখলে—“সবিনয় নিবেদন, আপনি একবার বলেছিলেন কিছু দরকার হ’লে আপনাকে জানাতে। তাই সাহস করে লিখছি। আমার স্কুলের ভাণ্ডারে চাল নেই। S. D. O. শশধরবাবু চার পাঁচ দিনের মধ্যেই চালের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু এই ৪৮ দিনই বা আমি কি করে ৫০টি মেয়েকে না খাইয়ে রাখব? এ বিপদে নিশ্চয়ই আপনি আমার স্কুলকে রক্ষা করবেন। দয়া করে কিছু চাল যদি সংগ্রহ করে দেন তো বড়ই উপকার হয়। আশা করি আপনার সাহায্য হ’তে আমরা বঞ্চিত হব না। ইতি বিনীত অনিন্দিতা।”

চিঠি নিয়ে শশধরবাবু চলে গেলেন। এদিকে অনিন্দিতার মাথায় চিন্তার বোঝা চাপল। কি করে সে তার মেয়েদের বাঁচাবে? হেমাজিনী বলেন—“হাসপাতালের ডাক্তার ওষুধ নিয়ে এসে রোজ এখানে বাজে ধরা দিয়ে পড়ে থাকত। একটু চাল জোগাড় করতে বলতে সে তো আর এ মুখেই হয় না। “আমার ভাণ্ডারে যা ছিল সবই উজাড় করে দিয়েছি এখন যে কি হ’বে তা’ নারায়ণ জানেন।”

অনিন্দিতা চুপ করে রইল। ফের বলেন হেমাজিনী—“অরুণকে জানিয়েছিস? সে জানতে পারলে নিশ্চয়

একটা উপায় করবে। এসে অবধি কত উপকার যে করেছে অরুণ তা বলতে পারব না।” অনিন্দিতা বলে—“অরুণবাবুকে চিঠি দিয়েছি।” হেমাঙ্গিনী আশ্বস্ত হয়ে বলেন—“তবে ও একটা উপায় করবেই।

হেমাঙ্গিনীর দাঁতের গোড়া ফুলে যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি গুতে গেলেন। অনিন্দিতা অপেক্ষা করে রইল নগেনমামার জন্তে। তিনি রাত ১১টার আগে খান না। তাঁকে না থাইয়ে অনিন্দিতা নিজেও খেতে পারল না। চাকর বাকররা তাদের মহলে গল্প গুজব করেছে। এ মহলে সবই নিস্তব্ধ। বৈঠকখানায় সামনের বারান্দাতে বসে অপেক্ষা করছিল অনিন্দিতা তার মামার জন্তে। কিন্তু ভাবছিল সে অরুণের কথা। যদি চাল সে নাই সংগ্রহ করতে পেরে থাকে তবু সে কথাটা তো সে জানিয়ে দিতে পারত? অরুণ কি এখানে আছে না কোথাও চলে গিয়েছে? চলে গিয়ে থাকে যদি তা’ হ’লে কি শশধরবাবু জানতেন না? তিনিই যে অরুণের সাহায্য নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। অরুণের পূর্বের ব্যবহার তার মনে হ’তে লাগল। কি রকম নীরবে সে তার পরিবারের সেবা করে গিয়েছে। যখন যে’টি দরকার হয়েছে, বলবার আগেই সে সেই জিনিষটি এনে দিয়েছে। মুখ থেকে শুধু কথা খসাতে হ’ত অনিন্দিতার। যেমন করে পারত একটা ব্যবস্থা করে দিত’ই অরুণ। সেই অরুণ তার বিপদের সময় ডাক পেয়েও সাড়া দেবে না এ’টা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সে যখন এই সব চিন্তায় মগ্ন ছিল তখন তাদের ফটকে এসে দাঁড়াল একটা মিলিটারী ট্রাক। চালকের স্থান থেকে নেমে এল অরুণ। অনিন্দিতাকে বলে—“লরীতে চাল আছে। চাকরদের বলুন নামিয়ে নিতে।” একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে অনিন্দিতা—“আপনি চাল সংগ্রহ করতে পেরেছেন? জান্তাম, আপনাকে বলে আপনি একটা উপায় করবেনই; আমার কৃতজ্ঞতা কি করে জানাব? ৫০টি বালিকার ক্ষুধা নিবারণ করলেন অল্প জুগিয়ে দিয়ে—”

অরুণ একথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বলে—“কই! কাউকে দেখছি না তো? বস্তাগুলো নামাতে বলুন!” অনিন্দিতা ভজাকে ডেকে চালের বস্তাগুলো নামিয়ে নিতে

আদেশ দিয়ে অরুণকে বলে—“বসুন।” অরুণ বলে—“আর বসব না, অনেক রাত হয়েছে, বস্তাগুলো নামান হ’লেই বাব।” অরুণের কথায় কোথা হ’তে একরাশ অভিমান এসে ঘিরে ফেল অনিন্দিতাকে। সে একটু মুখ ভার করে বলে—“চালের জন্ত কত দিতে হ’বে বলুন।” অরুণ গম্ভীর হ’য়ে বলে—“কিছুই দিতে হ’বে না। মিলিটারি স্টোর থেকে চাল দিতে হ’লে হেড্ কোয়ার্টার্স থেকে অল্পমতি আনবার দরকার। এদিকে আপনার প্রয়োজন এখনি; তাই আমি দেশে গিয়ে মার ধানের গোলা থেকে মাত্র দু’মণ ধান জোগাড় করতে পেরেছি। আর তাঁর ভাগুর থেকে একমণ চাল নিয়ে এসেছি।”

অনিন্দিতা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—“আপনাকে কত কষ্ট দিলুম।” অল্পদিকে চেয়ে বলে অরুণ—“কষ্ট আর কি। পরস্পরের জন্ত এ’টুকু তো সবাইকেই করতে হয়। আমাদের ধানজমী আছে। যা ধান হয় তা’ আমাদের প্রয়োজন হয় না। মা অধিকাংশ চাল গরীব প্রতিবেশীদের বিতরণ করে দেন। দিনের বেলা হ’লে আরও কিছু সংগ্রহ করতে পারতাম। কিন্তু যখন আপনার চিঠি পেলাম তখন সন্ধ্যা ৬টা।” বাধা দিয়ে অনিন্দিতা বলে—“শশধরবাবু তো সকাল ১০টায় চিঠি নিয়ে গিছিলেন?” “হ্যাঁ, আমি সেই সময় ক্যাম্পে ছিলাম না। ৬টায় কাজ থেকে ফিরে চিঠি পেলাম। তখনি বেরলুম লরী নিয়ে। কিন্তু গ্রামের পথে তো তাড়াতাড়ি গাড়ী চালান যায় না? পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল।”

অরুণের কথা শেষ হ’তে না হ’তে জিজ্ঞাসা করল অনিন্দিতা—“আপনার তা’ হ’লে এখন’ও পাওয়া হয় নি?” “মা বলছিলেন খেয়ে যেতে কিন্তু তখন খেতে বসলে ফিরতে দেরি হয়ে যেত।” “তা’ হ’লে এখানে চারটি খেয়ে যান।” “এত রাতে আপনি আবার রাঁধতে বসবেন নাকি? আমি আমার আদালিকে বলে এসেছি আমার খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে রেখে দিতে।” “সেই জুড়ন অথাত কুখাত না খেয়ে এখানেই দু’টি খেয়ে যান। না খেয়ে গেলে গৃহস্থর অমঙ্গল হ’বে জানবেন।” অরুণ আর কোন কথা না বলে হাত মুখে মুখে খেতে বসে গেল।

আজ তার নিজের খাবারগুল অরুণের সামনে ধরে দিতে

পেয়ে অনিন্দিতা ধল হ'ল। দুজনের মধ্যে কেউই বিশেষ কথা বার্তা কইছিল না। খাওয়া শেষ করে অরুণ বলল—“আজ তবে আসি। পরে আরও কিছু চাল সংগ্রহ করে দেবার চেষ্টা করব।” অনিন্দিতা প্রথম কিছু বলল না। তারপর চোখ নীচু করেই বলল—“আপনি দেখছি আমায় ‘মুন্সিল-আসান’। বখনই বিপদে পড়ি তখনই আপনি আমায় উদ্ধার করেন—” “অত বাড়াবেন না আমায়, কি আর এমন করতে পেরেছি? অন্তত যতটা করবার ইচ্ছা তার স্বযোগ তো আর বেশী পাই না আজকাল।” একটু হাসল অরুণ। হাসিতে তার স্বাভাবিক উজ্জলতা ছিল না। একটু যেন ম্লানই মনে হ'ল।

অনিন্দিতা মগ্নিয়া হয়ে বলল—“আপনি আজকাল আর আসেন না কেন? এত বোঝা চাপাই আপনার ঘাড়ে তাই বুঝি ক্লান্ত হয়ে সরে পড়েছেন?” “বোঝা আর চাপাচ্ছেন কই? বোঝা বহন করবার লোকের অভাব তো দেখি না? তাই আজ হঠাৎ আমাকে স্মরণ করাতে আমি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি।” অরুণ কি বলতে চাচ্ছে তা' বেশ ভাল করেই বুঝল অনিন্দিতা। লজ্জায় তার গাল দু'টো বেশ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে আজ আর নীরব থাকবে না। তাই সে বলল—“বোঝা বহন করবার অল্প লোকও যদি থাকে তা'তে আপনার কি? আপনাকে তো ছুটি দিই নি, আপনি নিজেই অবসর নিয়েছেন।”

অরুণ এবার চাইল অনিন্দিতার দিকে। দৃষ্টি তার গভীর প্রশান্ত। সে ধীরে ধীরে বলল—“মুখে ছুটি দেবার প্রয়োজন হয় না সব সময়। বাক্য ছাড়া আরও অনেক উপায় আছে জানিয়ে দেবার।” “আপনি বোধহয় একটা বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করে এই কথা গুলি বলেন—কিন্তু সেদিন আমি আপনাকে অপমান করবার জন্তে উঠে যাই নি। মেজর গান্ধুলী গায়ে পড়া আত্মীয়তা সহ্য করতে পারছিলাম না বলেই একটা বাজে ওজর দিয়ে উঠে গিয়েছিলাম। তিনি যে শাঁকোর পথ দিয়ে যাবেন এ কথাও আমি ভাবিনি।” তারপর একটু খেমে একবার অরুণের দিকে চেয়ে বলল—“বরং আশা করেছিলাম আপনিই আসবেন।” “কেন? আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার জন্তে যে আমার আসা যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়?”

অনিন্দিতার রাগ হ'ল অরুণের কথায়। কিন্তু সে আজ আর রাগ করবে না। বুঝা অভিমানে এ স্বযোগটা সে হারাবে না। সে বলল—“না, ও বোঝাবার দরকার ছিল না। যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা' যদি আপনি বুঝেও না বোঝেন তবে বুঝা কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।”

“কি বোঝাতে চেয়েছিলে বল?” অরুণের স্বর গভীর, পরিপূর্ণ। এই প্রথম সে তা'কে তুমি বলে সম্বোধন করল। অনিন্দিতা চোখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলল না। অরুণ সপ্রেম দৃষ্টিতে চাইল অনিন্দিতার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল—“তুমি যা বলতে চাও তা বুঝেও বোঝাবার অধিকার নেই আমার উপস্থিতি। তোমাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে পাবার চেষ্টা আমি করতাম বহু আগে, কিন্তু এখন বিবাহের প্রস্তাব করবার উপায় নেই আমার। যে কোন মুহূর্তে আমায় চলে যেতে হ'তে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে। ফিরতে পারব কিনা জানি না। তাই তোমাকে আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে কিছুতেই পারব না। কিন্তু এ'টা জেন যে, যে মুহূর্তে তোমায় দেখেছিলুম সেই নদীর ধারে, সেই মুহূর্তেই আমার মন তোমায় চেয়েছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে আছি। আজ উত্তেজনার মুখে অনেক কথাই বলে ফেললাম। ক্ষমা কর।”

(৯)

মৃণালিনীদেবী এসে বলেন অনিন্দিতাকে—আমাদের হেড কোয়ার্টার্সে লার্ট সাহেব আসছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খবর পাঠিয়েছেন এ এলাকা থেকে চাঁদা তুলে তাঁকে দিতে হ'বে একটা টাকার তোড়া। এই সব দুর্গতদের সাহায্য করবার জন্তে। আমি কয়েকজনের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি। ক্যাপটেন চ্যাটার্জী একটা সিনেমা শো'র ব্যবস্থা করেছেন মিলিটারি ক্যাম্প। মেজর গান্ধুলী ও তাঁর হাঁসপাতালের কর্মচারী মিলে একটা চায়ের দোকান খুলবেন। লাভের অংশ চ্যারিটিতে দেবেন। তুমি যদি তোমার মেয়েদের দিয়ে একটা চিত্র বিনোদনের ব্যবস্থা কর তা' হ'লে খুব ভাল হয়।

মৃণালিনীর কথা এড়াতে পারল না অনিন্দিতা। “চিত্রাঙ্গদা” প্লে করিয়ে সে কিছু টাকা তুলে দিতে রাজী

হ'ল। রিহার্সেল চলতে লাগল। অনিন্দিতা মেয়েদেয় গান শিখিয়ে দেবে ঠিক হ'ল। একদিন সে বসবার ঘরে টেবিল-হারমনিয়ামটা বাজিয়ে চিত্রাঙ্গদা নাটকের গানগুলির সুর ঠিক করে নেবার চেষ্টা করছিল। একটু গুণগুণ করে গাইতেও শুরু করল। তারপর পূর্ণস্বরে গান ধরল—“রোদন ভরা এ বসন্ত সখি, কখন আসেনি বুঝি আগে—” গান শেষ হ'তে সে চেয়ে দেখে অরুণ বসে আছে চুপ করে। অনিন্দিতা হিজিমা করল—“গান কেমন লাগল?”, অরুণ সহসা কোন জবাব দিতে পারল না। অনিন্দিতা ফের বলল—“গান বুঝি ভাল লাগেনি, তাই বুঝি চুপ করে আছেন?” “এক একজন মানুষ আছে তারা ভাল লাগলে চুপ করে থাকে। যখন মনের ভাব ব্যক্ত করবার ভাষা মানুষ পায়না খুঁজে, তখন নীরব থাকাই উচিত।” গল্পীর ভাবে বলল অরুণ।

“কেউ কাউকে আনন্দ দিতে পেরেছে জানলে তো তার ভাল লাগে? একেবারে চুপ করে থাকলে মনে হয় বুঝি সে আনন্দ দিতে পারে নি।” বলল অনিন্দিতা। অরুণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—“জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ গান আমি ভুলব না।”

কি জানি কেন দু'জনেরই চোখ ছলছল করে এল। একটা আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা যেন বেজে উঠল দু'জনেরই মনে। যুক্ত চলেছে। কবে অরুণের ডাক পড়বে আরও বিপজ্জনক স্থানে যাবার, তার কথা মনে পড়ে গেল অনিন্দিতার। অরুণ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—“যে টিকিট গুল বেচতে দিয়েছিলে সেগুল বেচে দিয়েছি।” পকেট থেকে একটা চেক বের করে বলল—“এটা আমার donation।” তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—“কাল ভোরেই আমায় যেতে হ'বে কোলকাতা। হেডকোয়ার্টার থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমাকে অন্ত্র পাঠাবে তারা।”

অনিন্দিতার চোখ জলে ভরে এল। অরুণ একবার চারদিকে চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল। তার অন্তর ব্যথায় ভরে গেল। সে বলল—“যদি যুক্ত থেকে বেঁচে ফিরতে পারি, আর ফিরে যদি দেখি তুমি তখনও বন্ধন মুক্ত, তা' হ'লে আমার বা চ'ইবার তা' চাইব, তখন আমি যেন বঞ্চিত না হই।”

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা স্বর্ণপদক পুরস্কার।

“নারী মঙ্গল কার্য জাতির শ্রেষ্ঠ সেবা” এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখক বা লেখিকাকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিার্থে শ্রীযুক্ত কে, সি, রায় চৌধুরীর পত্নী শ্রীযুক্তা সুকুমারী রায় চৌধুরী এই পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ইনি অবিনাশ চন্দ্রের কন্যা।

প্রবন্ধ সমিতির সম্পাদিকার নিকট ২৩।১, বালিগঞ্জ স্টেশন-রোডে ১লা জানুয়ারীর মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধ নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে সমিতির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

জর্জ বার্নার্ড শ

শ্রীশান্তা দেবী

২৪ বৎসর বয়সে জর্জ বার্নার্ড শ'র জীবনপ্রদীপ নিভিল। বার্নার্ড শ আমরল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিলেও ইংল্যান্ডকে তাঁহার স্বদেশ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের সাহিত্যরথীদের মধ্যে তাঁহার ইংরাজী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার কেহই বোধ হয় ইহার ত্রায় বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই। জর্জ বার্নার্ড শ শুধু ব্রিটিশ সাহিত্যিক নন, তিনি বিশ্বসাহিত্যিক। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, সদা জাগ্রত মন, আত্মিক তৃতীয় নেত্র, চুল চেঁচা বুদ্ধি প্রয়োগের অদ্ভুত ক্ষমতা, হাস্যরস ও শ্লেষের অসাধারণত্ব তাঁহার মনীষাকে হীরকের সহস্র ছটার মত দীপ্তি দিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাই ছিল তাঁহার শিক্ষক। মাত্র পনের বৎসর বয়সেই তিনি স্কুল ছাড়িয়া কাজে নামেন। ডাবলিন সহরে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু যোল বৎসর বয়সেই তিনি মা ও দুই বোনের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া লণ্ডনে আসেন। তাঁহার মা সঙ্গীতের আশ্চর্য্য অনুরাগিণী ছিলেন। ইহা তাঁহার সংসার পালনের উপায়ও ছিল। ১৫ বৎসর বয়সেই মার সঙ্গীত চর্চার জন্য জর্জ বহু বিখ্যাত সুরশ্রষ্টার অপেক্ষা প্রভৃতি কর্তৃত্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে এই জন্যই তিনি সঙ্গীত সমালোচক রূপে কিছুকাল জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন।

প্রথম দিকে তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম পাঁচটি উপন্যাসই পুস্তক প্রকাশকেরা ফেরত দেন। আর্থিক কষ্ট এই সময় তাঁহাকে অল্প নানাপথে উপার্জনের চেষ্টায় টানিয়াছিল। তিনি শেলির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। সিডনি ওয়েব প্রভৃতি সোসিয়ালিষ্ট চিন্তানায়কগণ তাঁহার অল্প বয়সের বন্ধু ছিলেন। অল্প বয়সেই ইনি ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকেই তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠেন। বহু জনসভা ও তর্কসভায় তাঁহার

স্বযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শোনা যাইত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Pall mall Gazette প্রভৃতির লেখক হন। এই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধেই তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও অভিনবত্ব, দুঃসাহস, রসবোধ, উচ্চস্তরের বিচার বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনের জার্নালিষ্টদের মধ্যে বার্নার্ড শ'র লেখনীতেই জীবন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় অধিক পাওয়া যাইত। শ্লেষ ও বিদ্রোপের মধ্য দিয়াই তিনি গুরুত্বপূর্ণ বহু সমস্যার মূলে কঠিন আঘাত করিতেন। অশিক্ষা, শ্রমজীবীদের দুর্গতি সমাজের নানা দুর্নীতি প্রভৃতি তাঁহার মনকে এমন পীড়া দিত যে বিদ্রোপের কশাঘাতে ও ঠাট্টার হাসিতে তিনি ইহাদের ভিত্তি টলাইয়া তুলিতেন। পরে বিবাহ ও প্রেম সমস্তা, ইম্পিরিয়ালিজম ক্যাপিট্যালিজম মিলিটারিজম প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবও অস্ত্রাঘাত করেন।

কিছুকাল পরে নাট্যক্ষেত্র সাহায্যে মানব সমাজের নানা ব্যাধির সংস্কার করিবার ইচ্ছায় তিনি নাটক রচনায়া নামিলেন। তাঁহার নাটকের ক্রটি অনেক থাকিতে পারে। কিন্তু তৎসঙ্গেও অনেকেই সেক্সপিয়রের পর বার্নার্ড শ'কেই নাট্যকার হিসাবে দ্বিতীয় স্থান দেন। নাট্যকাররূপেই শ' যে চিন্তাশীলতা যুক্তিবাদ চিন্তানায়কতা ও সংস্কারমুখিতার পরিচয় দিয়াছেন ইংরাজি ভাষার লেখক হিসাবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোন অন্য নাট্যকার বা সাহিত্যিক তা দেন নাই। শ' দুর্নীতির বিরুদ্ধে এমন নিদারুণ যুদ্ধ করিতেন যে যোদ্ধা হইতে গিয়া তিনি স্বেচ্ছায় নিজের সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষুরধারকে চাপা দিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি প্রেমকাহিনীর ছবি আঁকিতে ভালবাসিতেন না। তিনি art for arts sakeএ বিশ্বাস হারাইয়া নৈতিক কারণেই আর্টকে কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় যেন ছিল আর্টিষ্ট ও সংস্কারকের যুদ্ধের ছবি। তাঁর স্বাভাবিক সাহিত্যিক প্রতিভা

হৃদয়াবেগ ও আর্টিষ্টের অল্পভূতি উচ্চদরের হইলেও তাঁহার মনীষা, সংস্কারপ্রবৃত্তি, মানবপ্রীতি, সাহস ও সংগ্রাম-শীলতা ছিল তাহার চেয়ে অনেক বড়। সেই জন্ত পৃথিবীর নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানই তাঁহার রচনায় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বহু ক্ষেত্রে একদিন যাহা লইয়া তিনি লড়িয়াছেন, আজ মানুষের চিন্তা সেই পথেই চলিয়াছে।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল প্রাইজ পান। পৃথিবীর এমন কোন সমস্যা নাই যে বিষয়ে তিনি চিন্তা করেন নাই বা বাক্যে কি রচনায় তাহার বিষয়ে কোন মন্তব্যপ্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বলিবার ভঙ্গী ছিল ঠাট্টার সুরে। তাঁহার রসবোধ ও চিন্তার বিদ্যুৎগতি ছিল পৃথিবীর বিষয়। তাঁহার হাসি তাঁহার যুক্তিজাল, তাঁহার গলায় স্বর, তাঁহার প্রস্তোত্তরের অপূর্ব ভঙ্গীর তুলনা বর্তমান যুগে কোথাও পাওয়া যায় না। প্রায় শতবর্ষব্যাপী এই অপূর্ব মানব প্রতিভার তিরোধানে পৃথিবী কতখানি দরিদ্র হইল তা' ভাষায় বলা চলে না।

শোনা যায়! তাঁহাকে কেহ কথায় হার মানাইতে কখনও পারে নাই। তবে দুইটি মহিলার নিকট তিনি হার মানিয়াছিলেন। একজন তাঁহার স্ত্রী এবং আর একজন লেডি রাণ্ডল্ফ।

শ' মিসেস শকে বলেন 'পুরুষের বিচার বুদ্ধি যে

স্ত্রীলোকের চেয়ে বড় একথা তোমাকে মানতে হবে।' মিসেস শ' বলেন "নিশ্চয়, তাই ত তুমি আমাকে নির্দোষ করেছ আর আমি তোমাকে করেছি।"

লেডি রাণ্ডল্ফ শকে লাঞ্ছনামূলক করায় শ' বলেন, "কখনই যাব না। আমার প্রত্যাহিক অভ্যাসকে এমন আক্রমণ করার কি অর্থ?"

লেডি রাণ্ডল্ফ জানালেন, "আপনার অভ্যাস সম্বন্ধে কিছু জানি না। আশা করি তা আপনার শিষ্টাচারের মতই ধারাপ নয়।"

শ' বিশ্বের প্রাণশক্তি (Life force) তে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিতেন "এই শক্তিকে তুমি যদি সাহায্য কর তবেই এশক্তি তোমার সহায় হবে। বিশ্বকে উন্নত করতে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য এই শক্তির সহায় হওয়া।"

শ' নিরামিশাষী ছিলেন এবং শীতের দেশের মানুষ হইলেও মদ খাইতেন না। নিরামিশ আহার বিষয়ে তিনি বলিলেন "আমি আমার শরীরটাকে যত মৃত জন্তুর কবর খানা করিতে চাই না।"। কিঞ্চিদধিক একমাস পূর্বে শ' পা ভাঙিয়া হাসপাতালে যান। তখন তিনি বলেন, "এখনও যদি বাঁচিয়া ফিরি তাহা হইলে আমি চিরজীবী হইব।" বাস্তবিকই তিনি চিরজীবী। মানুষের চিন্তাশক্তি যতদিন থাকিবে ততদিন তিনি তাহার খোরাক জোগাইবেন।



পরলোকে কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

বর্তমান যুগে যে কয়জন কথা সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বজনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতি ভূষণ ছিলেন একজন। তিনি কেবল যে সাহিত্য স্বজনে দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, তিনি তাঁহার সাহিত্য সাধনার মধ্যে বাংলার ও বাঙ্গালী সমাজের নিখুঁত চিত্র আঁকিয়া সাধনার পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সরল ও মধুর বাবহারে তিনি বন্ধু, স্বজন এবং পাঠক পাঠিকাদের চিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে ৩১শে ভাদ্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুরারিপুর নিভৃত পল্লীতে মাতুলালয়ে বিভূতি ভূষণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বাল্যকালে পল্লীর পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। যৌবনকালে তাঁহার লেখনীতে “অপুর পাঠশালার” যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা তাঁহারই বাল্যস্মৃতির এক রূপ।

তিনি ১৯১৯ সালে রিপণ কলেজ হইতে সম্মানে বি-এ পাশ করেন। তিনি প্রথমে হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে শিক্ষা দিবার ব্রত গ্রহণ করেন। পরে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্ত স্বজন পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করায় তিনি ভাগলপুর জিলায় বিখ্যাত জমিদার খেলাং ঘোষ মহাশয়দের ইসলামপুর কাছারীর ম্যানেজার হইয়া প্রবাসে যান। কিন্তু এ আবহাওয়া ও প্রবাস বাস তাঁহার চিত্তে আদৌ শান্তি দেয় নাই। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীর স্তূথ দুঃখের কথা যেমন অবগত হইতে ব্যস্ত ছিলেন তেমনই বাংলা মায়ের পল্লীর প্রতি তাঁহার মন টানিত। এই প্রবাসে বসিয়াই তিনি “পথের পাঁচালী” লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি দরদী মন তাঁহাকে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পুনঃ পুনঃ টানিয়া লইত। তিনি একাধিকবার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্যের কথা বাঙ্গালীকে স্মরাইয়া দেন। ১৯৪৭ সালে বোম্বাইতে প্রবাসী

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের সময় তিনি লেখকের সহিত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীর স্মারক লিপিতে স্বাক্ষর করিবার জন্ত সাহিত্যিক ও স্বজনকে অহুরোধ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি করাই তা সাহিত্যিকদের ধর্ম।

জমিদারীর কার্য তাঁহার বেশীদিন ভাল লাগিল না এবং প্রকৃতি প্রতিকূল হইল। তিনি সরল ও জাতি গঠনকারী শিক্ষক জীবন গ্রহণ করিয়া আজীবন তাঁহার স্বগ্রাম গোপালনগর স্কুলের শিক্ষকতায় আত্ম নিয়োগ করেন। সাধুজন পাঠাগারের এক উৎসবে যখন বনগ্রামে লেখকের ঘাইবার সুবিধা হয়, তখন বিভূতি ভূষণ তাঁহার জ্যোতিষদাকে পল্লী আবাস দেখাইতে যে উৎসাহ, যে যত্ন ও যে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন তাহা লেখকের চিরস্মরণীয় ও পরম গোবের কথা।

১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর, ১৫ই কার্তিক ১৩৫৭ সালের বুধবার আমাদের জনপ্রিয় বিভূতি ভূষণ এ মরজগৎ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় প্রতি বৎসর ঘাটশিলায় ঘাইতেন, এ বৎসরও গিয়া ছিলেন। আমাদের পাড়ার ছেলে মেয়েরা ছুটির ভ্রমণ অভিযানের সময় গিয়া বিভূতি ভূষণের সহিত এক আসরে মিলিত হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। ইহা তাঁহার তিরোধানের দুইদিন পূর্বের ঘটনা।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভূতি ভূষণ আমরণ সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার “পথের পাঁচালী” “অপরাজিতা” “আরণ্যক” “আদর্শ হিন্দু হোটেল”, “দৃষ্টি প্রদীপ”, “মেঘ মল্লার” পুস্তকগুলি তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার শেষ পুস্তক ইছামতী। তাঁহার লেখনী শুষ্ক হইয়াতে বাংলা সাহিত্যের পরম ক্ষতি হইল। স্বজন অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন, আর তাঁহার সহধর্মিণী কল্যাণী দেবী ও শিশুপুত্র বাবলু যে ব্যথা পাইলেন যে অভাবে পড়িলেন, কোন শোকবাক্য সে ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে না।

বিদেশিনী

ছয়টি প্রতিভাময়ী মার্কিন মহিলা

পুরস্কার প্রেরণা জোগায়। প্রশংসা কে না ভালবাসে? গুণীর সমাদর কেবল যে গুণীকেই তৃপ্ত করে তা নয়। যিনি কদর দেন, খ্যাতি এবং সম্মান তাঁরও ছড়িয়ে পড়ে। নব-রঙ্গ যার সভা আলো করেছিলেন তাঁর গৌরবও কিছু কম ছিলনা নয়টি রত্নের চাইতে।

কবি, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, যোদ্ধা সৈনিক ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে প্রতিভার পুরস্কার-ব্যবস্থা রয়েছে আজকাল প্রায় সব দেশেই। মহিলাদের এর থেকে বাদ দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রতি বৎসরই গুটিকতক লোককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্তে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা যদি থাকে, তা হলে আমরা নিশ্চয় খুশি হই। যদি সব দেশেই এই ব্যবস্থা থাকতো সব দেশেরই লোক খুশি হতো। জাতীয় সংস্কৃতির মুখ উজ্জলকারী প্রতিভার পরিচয় যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে, এই রকম লোককেই পুরস্কার দিতে হবে— তা সে পরিচয় ফুটে উঠুক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয় কিংবা খেলা ধুলায় অথবা দেশের শিক্ষাবিস্তারে— এমন কি, সিনেমার পদায়, দর্জির দোকানে হলেও।

যথার্থই এই রকম প্রতিভার পুরস্কারের আয়োজন করা হয়েছে। পুরস্কার অবশ্য প্রচণ্ড রকমের কিছু অর্থায় মোটা টাকার নয়; নিতান্তই কাগজের উপরে লেখা একটি স্বীকৃতিপত্র মাত্র। কিন্তু সকলেই জানে, এহ বাহ্য। জলপাই পাতার মুকুটের সম্মান কি স্বর্ণমুকুটের চাইতে কম ছিল—?

আর—আয়োজন করা হয়েছে কেবল প্রতিভাশালিনীদের জন্তই এবং প্রতিবৎসর ছয়জন করে।

প্রতিভার পুরস্কার—

সামান্য একটি গ্রামের কণ্ঠা গ্রাম্য নগণ্য পাঠশালায় মাষ্টারি করছেন' সেই সঙ্গে পড়ছেন কলেজে। করলেন বি.এ, পাশ—নিলেন একটা হাই স্কুলে মাষ্টারি, বিদেশে

গিয়ে। তারপর ফিরে এলেন নিজের জেলাতেই স্কুল-সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়ে। তারপর পা বাড়ালেন রাজনীতিতে, দাঁড়ালেন আইন সভার নির্বাচনে, সদস্য নির্বাচিত হলেন— একবার, দু'বার, তিনবার। সমস্ত স্কুলে সরকারী সাহায্য ও শিক্ষকদের বেতনের পরিমাণ বাড়াবার এবং অবসর গ্রহণ সম্পর্কিত নিয়মের পরিবর্তন করবার জন্তে দু'হাতে লাগলেন লড়তে। সর্বক্ষেত্রে হলেন বিজয়িনী। দেশের স্কুলগুলিতে ঘটালেন যুগান্তর, বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাঁর অভুৎ ক্ষমতা, আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি দেখে হলেন স্তম্ভিত, মুগ্ধ। গরীব স্কুলগুলির জন্তে বিশেষ সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাকে পাকাপাকি করবার জন্তে তাঁর পরামর্শমত নতুন আইনই তৈরি হয়ে গেল একটা।

একটি মাত্র ঘর নিয়ে তাঁর গ্রামের বিদ্যালয়টি ছিল খাড়া—যেখানে তাঁর শিক্ষকতার হাতেখড়ি হয়েছিল। এর দুঃখটা বুঝেছিলেন। তাই ক্ষুদে ক্ষুদে ২ হাজার ৭০০ স্কুলকে কমিয়ে করলেন ৮০০ বড়সড় সঙ্গতিপন্ন স্কুল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যাও যেমন বাড়লো, তেমনি বাড়লো তাঁদের বেতন। ছিটেফোঁটা নয়—প্রায় ৯০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি। আর সমগ্র জেলাটিতে সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের হার, চাকুরির মেয়াদ, ছুটিছাটার নিয়ম সব এক নিয়মে চলতে লাগলো।

এই রকম প্রতিভার সম্মান যে দেশ করে, সম্মান বাড়ে সেই দেশেরই।

এমন কর্মময়, অনলস জীবন—অথচ নিতান্ত স্বাভাবিক পারিবারিক বেষ্টনীতেই মহিলাটি স্বামীপুত্র নিয়ে সংসারধর্ম পালন করছেন। এর নাম শ্রীমতী পাল এগার্সন ওয়ানামেকার, স্বামী তাঁর একজন ইনজিনিয়ার। এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীমতী ওয়ানামেকার প্রভূত সম্মানের অধিকারিণী, বড় বড় সম্মেলনে তাঁকে সদস্য, এবং রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছে। জাপানের শিক্ষা-বিভাগে সংস্কারের জন্ত অগ্রাগ্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁকেও ডেকে নিয়েছিলেন জেনারেল ম্যাক আর্থার।

এই রকম প্রতিভাময়ীদের প্রতিভার স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মহিলা—সাংবাদিক গোষ্ঠী—“উইমেনস আশনাল প্রেস ক্লাব।” বিগত বৎসরের শীর্ষ স্থানীয়া ছয়টি প্রতিভাময়ী মার্কিন কণ্ঠকে এই মহিলা প্রেসক্লাব থেকে সম্মানিত করা হয় প্রতি বৎসর। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ৩২২ জন মহিলা-সাংবাদিক এই প্রেসক্লাবের সদস্য। খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই এদের এই বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্নক্ষেত্রে, ১৯৫০ সালের পুরস্কৃত ছয়টি মহিলা হচ্ছেন :—

- ১। শ্রীমতী পাল ওয়ানামেকার (শিক্ষা)
- ২। কুমারী মিলড্রেড রেবষ্টক (বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার)
- ৩। কুমারী মার্থা গ্রাহাম (নৃত্য)
- ৪। কুমারী ক্লেয়ার ম্যাককার্ডেল (পরিচ্ছদশিল্প)
- ৫। কুমারী ডরোথি ফশডিক (কুটনীতিজ্ঞান)
- ৬। শ্রীমতী অলিভিয়া দে হ্যাভিল্যান্ড (চিত্রাভিনয়)

মিলড্রেড রেবষ্টক—পেনিসিলিন, ট্রেপটোমাইসিন আজ জগদ্বিখ্যাত। রোগবীজনাশক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ওষুধ এগুলি। কিন্তু এই দুটি ওষুধও যেখানে ধরে না সেইসব ক্ষেত্রে আরেকটি ওষুধ খুব আশ্চর্য কাজ দেয়। এটির নাম ক্লোরোমাইসেটিন পেনিসিলিন গোষ্ঠিরই অন্তর্ভুক্ত। ছত্রাক থেকে এর সৃষ্টি। টাইফয়েড রোগীকে দ্রুতগতিতে সারাবার ক্ষমতা ইহার আছে।

এই নূতন ওষুধ আবিষ্কারের গৌরবে গৌরবান্বিত একটি মহিলা বৈজ্ঞানিক—শ্রীমতী রেবষ্টক।

মার্থা গ্রাহাম—মিস মার্থা গ্রাহাম নৃত্যপটঙ্গী। বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সভ্যতার রূপ, মার্কিন জীবন-যাত্রার প্রতিচ্ছবি তাঁর অপূর্ণ সুন্দর কল্পনাময় নৃত্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। তিনি স্বয়ং তাঁর নৃত্য-নাট্য রচনা করেন। থিয়েটার কিম্বা সঙ্গীতের অল্পপূরক রূপেই নৃত্যের অস্তিত্ব, নৃত্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা নেই—এই মতবাদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ তিনি চালিয়ে এসেছেন। সঙ্গীতকেই তিনি বাধ্য করেছেন নৃত্যের অল্পপূরক এবং

অল্পপূরক হতে। তাঁর অনেক নৃত্য কল্পনার অল্পপূরক সঙ্গীত রচনা করেছেন বিখ্যাত সুরকারগণ।

পিতামাতার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মার্থা নাচের দিকে ঝুঁকেছেন কিশোর বয়স থেকেই এবং আজ তাঁর খ্যাতি সমস্ত মার্কিন রাষ্ট্র জুড়ে। তাঁর প্রবল প্রাণোচ্ছাস মূর্ত হয়ে ওঠে নৃত্যভঙ্গিমায়, যা দেখে শিল্প-সমালোচকেরা বলেছেন—“যেন ক্ষুদ্রে ঘূর্ণীবায়ু নৃত্য করে প্রমত্ত আবেগে।”

শ্রীমতী মার্থা বিবাহিতা এবং দুটি নাচের স্কুলও তিনি প্রতিষ্ঠান করেছেন।

ক্লেয়ার ম্যাককার্ডেল—ভালো পোষাক আধাক কি রকম হবে এটা একটা দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়! পুরোণো হলেই ফ্যাশানের মূল্য আর থাকে না। ‘সুতরাং নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সমাদর ফ্যাশনের রাজ্যেও কেন থাকবে না? বরঞ্চ খুব বেশীই আছে। এই দিকে মাথা ঘামালেও যে সেটার কদর হয়ে থাকে—তার প্রমাণ দিলেন শ্রীমতী ম্যাক কার্ডেল।

পত্রিকার পাতা থেকে রঙ্গীন ছবি কেটে ছেলেবেলায় তাদের গায়ে রঙ্গীন টুকরো কাপড়ের পোষাক চড়ায় অনেক মেয়েই। ক্লেয়ারও তাই করতেন। শেষে শিল্পী হবার সখ তাঁকে পেয়ে বসে এবং কলেজ ছেড়ে তিনি নক্সা আঁকা মক্দ্দ করতে লেগে যান। আজ তাঁর তৈরি নিত্য নূতন ধরণের পোষাক মার্কিন তরুণীদের অঙ্গে অঙ্গে। কলেজের কন্ঠারা বলেন—ওটা তাঁদের চাই কাজুরে কার্মিনীরা বলেন—কাজ করবার পক্ষে ক্লেয়ারের পোষাকের জুড়ি নেই।

ডরোথি ফশডিক—

লেখাপড়া করে অনেকগুলো পাশ দিয়ে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে চলবার ক্ষমতা মেয়েরা দেখিয়েছেন। নানা ক্ষেত্রেই তাঁরা নর-নারীর অসাম্যকে অস্বীকার করে সমান সমান বায়গা জুড়ে বসবার চেষ্টা করেছেন। কুট রাজনৈতিক মস্তিষ্ক মহিলামহলে স্ফুল্ভ হলেও একেবারেই তার অস্তিত্ব নেই একথা ঠিক নয়। মিস ডরোথি ফশডিক তার জীবন্ত প্রমাণ। এম,এ, এবং পি, এইচ, ডি ডিগ্রী তাঁর আছে—কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্র দপ্তরে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ণয়কারী মহাপদস্থ উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদেরও

তিনি অধিকারিণী এটাই খুব বড় কথা। বড় বড় আন্তর্জাতিক কূটমন্ত্রণার বৈঠকে তাঁর ডাক পড়ে।

অলিম্পিয়া দে হ্যাভিলিয়াও—

চিত্র জগতের এই উজ্জ্বল তারকার পরিচয় নিম্নয়োজন। বহু বিখ্যাত চিত্রে অনবত্ত অভিনয় করে তিনি অজস্র প্রশংসা লাভ করেছেন—জনসাধারণ নয় বিদগ্ধজনের কাছ থেকেও। ‘স্মেক পীট’, ‘ডার্ক মিরর’, ‘গণ উইথ দি উইণ্ড’, ‘এ্যান্টনি এ্যাভভাস’, ‘রবিনহুড’, ‘টুবেরি ব্লগ’ ইত্যাদি ছবি খারা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই স্নিগ্ধ শান্ত-মুখশ্রী অভিনেত্রীটির প্রাণবান অভিনয়ের ঐশ্বর্য্য কত। তাঁর সম্প্রতি-অভিনীত “এয়ারেস” চিত্রটিতে যে সংযত এবং নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন তা অতি উচ্চাঙ্গের বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক।

ঘর সংসারের কাজে টেলিভিশন, মার্কিং কৃষি

দপ্তরের উত্তমে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

ঘর সংসারের নানা প্রয়োজনীয় কাজ কর্ণে টেলিভিশন কি রকম সাহায্য করতে পারে তার পরীক্ষা চলছে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে। ক্ষেত খামারের কাজেও এর প্রয়োগ চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-দপ্তর এই প্রচেষ্টায় উত্তোগী হয়েছেন এবং “গ্রাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর” সহযোগিতায় তাঁদের কার্য্যসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

বাড়ীর হাতায়কে ঘাসঢাকা জমিটুকু রয়েছে সেটাকে আরও ভালো ভাবে কি করে সাজানো যায়, মাংসটা টাটকা রাখা যায় কেমন করে, বাজারে কোন্ জিনিষটা কোন্ খান থেকে ভালো আর সস্তায় পাওয়া যায়, পোকামাকড় ইত্বের অত্যাচার নিবারণের উপায় কি এবং নানা রকম খাবার তৈরি করবার প্রণালী ইত্যাদি বাৎসরে দিয়ে ঘর সংসারের নানা রকম কাজে সাহায্য করা হচ্ছে কৃষি দপ্তরের পরিচালিত টেলিভিশন-প্রোগ্রাম অল্পযায়ী।

এই প্রোগ্রাম বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। একদিন প্রোগ্রামের বাইরে, অর্থাৎ প্রোগ্রামে যার উল্লেখ ছিল না এমনি একটা বিষয় টেলিভিশনে বলা হলো। বিষয়টি ছিল পোষাক তৈরি করা সম্বন্ধে। বলা হয়ে যাবার ঘটনা

খানেকের মধ্যেই হাজার খানেক অর্ডার এসে গেল টেলিফোন যোগে।

বাজারে নানা ‘বাড়তি’ জিনিষ খুব সস্তায় পাওয়া যায় মাঝে মাঝে; টেলিভিশন প্রোগ্রামে তার সংবাদও দেওয়া হয় এবং ক্ষেতারা খুশি হন সস্তায় সেই সব ‘বাড়তি’ জিনিষ কিনতে পেয়ে। শিশুপালন, ঘর-দুয়ারের সাজসজ্জা, ইসমুগীর ডিম-ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয় এবং সেটা হয় সচিত্র।

চেয়ার, কোচ ইত্যাদি ঢাকনা কি করে বেশ পরিষ্কার আর অনেক দিন টিকিয়ে রাখা যায়—এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে আগামী হেমন্তকালে।

ক্ষেত খামারের মার্কিং কৃষকেরা কি রকম কাজ করছে তার সচিত্র বেতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে ধারাবাহিকভাবে গত এক বছর ধরে।

আমেরিকার খামার-বাড়ীতে আজকাল টেলিভিশনসেট আর খুব একটি ছলত বস্তু নয়। নিউজাসি, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, ওহায়ো, আইওয়া, লুইজিয়ানা, টেক্সাস, জর্জিয়া, মিসৌরি, আর্কানসাস, প্রভৃতি প্রদেশের খামার-বাড়ীতে টেলিভিশনসেট দেখতে পাওয়া যাবে। নিউইয়র্কের প্রায় সর্বত্র, পেনসিলভেনিয়ার পূর্বাঞ্চল ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণে ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয় এবং উইসকন্সিনেব কোনও কোনও যায়গায়, নেব্রাস্কার পূর্বাঞ্চল ও টেনেসির পশ্চিমাঞ্চলেও এর চলন হয়েছে।

অকাল-নবজাতকের প্রাণরক্ষার উত্তম

মার্কিং-রাষ্ট্রে শিশু-মৃত্যুর হার কমানোর চেষ্টা অনেক-খানি সাফল্য অর্জন করেছে; ১৯৩০ সালের তুলনায় বর্তমানে শিশুমৃত্যু শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে সেখানে। কিন্তু অকাল-জাত শিশুদের বাঁচাবার প্রকৃত পন্থা এখনও আবিস্কৃত হয়নি। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে মার্কিং রাষ্ট্রের কলোরাডো প্রদেশে যে-ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে উৎসাহিত হয়ে অপরাপর প্রদেশ ও নগরও তার অনুসরণ করে চলেছে।

ডেনভারে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হাসপাতালে বিশেষভাবে এই অকালজাত শিশু-চিকিৎসার

জন্ম একটি শিশুপালন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং শহরের উপকণ্ঠে স্থিত পল্লী অঞ্চলেও অনুরূপ কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

দেখা গিয়েছে, অকালে প্রসূত নবজাতকদের প্রাণ বাঁচাবার আয়োজন এতটা ব্যয়বহুল, যে সাধারণ লোকের পক্ষে তা বহন করা হুঃসাধ্য। তাই কলোরাডো-সরকার এর আংশিক ব্যয়ভার বহন করবেন—এই রকম পরিকল্পনাতে সেখানে কাজ চলেছে।

নিউইয়র্ক শহরেও এইরূপ অকাল-নবজাতকদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ডাঃ জোসেফ ড্যান্সি এই রিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এই নবজাতকদের মৃত্যুর অনেকগুলি কারণ বর্তমান রয়েছে এবং অনেকগুলি কারণ এখনও অজ্ঞাত। সে সম্বন্ধে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করছেন। যে কোনও নবজাতকের পক্ষেই জন্মের প্রথম দিনটি বেশ আশঙ্কাজনক এটা সকলেরই জানা আছে। অকাল-নবজাতকের পক্ষে যে আশঙ্কাটা অনেক বেশী পরিমাণেই হবে, তা বলাবাহুল্য। নিঃশ্বাস নিতে বা গিলতে পারা কিম্বা শরীরের স্বাভাবিক তাপ বজায় রাখতে পারা নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান যদি না করা যায়, তা হলে অকাল-জাত শিশুটিকে অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

প্রসূতির আত্মরক্ষিক অবস্থা এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ডেনভার শহরের উত্তোক্তারা এই দিকটাতেও নজর রেখেছেন। সেখানকার সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং সেবিকা সংঘের মিলিত পরিকল্পনায় তাই আসন্নপ্রসবী নারীদের বিশেষ সেবা যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ীতেই তাঁদের ঠিক হাসপাতালের মত নিয়মমাফিক খাওয়া-বসার-শোওয়ার কড়াকড়ি ব্যবস্থায় রাখা হয় এবং বাড়ীর অগ্রাংশ লোকজনদের দেখবার ব্যবস্থাও করা হয়। ইনকিউবেটর (সদ্যোজাত শিশুকে নিরাপদ রাখবার যন্ত্র) সম্বলিত এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী প্রস্তুত থাকে দরজায়, নবজাতককে নিয়ে হাসপাতালে ছুটবার জন্তে। হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবার পক্ষে অকাল-নবজাতকের স্বাস্থ্য রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে

বাড়ীর লোকজনদের উপরেই, ডাঃ ড্যানসিস্ এই কথা বলেছেন। তিনি আরও একটা নূতন কথা বলেছেন। মায়ের দুধই এই অকাল-নবজাতকদের একমাত্র পুখ্য, এই ধারণা ভ্রান্ত এবং এই পুখ্য ঐ নবজাতকদের পক্ষে অল্পপুজ্জ, আধুনিক গবেষণার ফলে এটা জানা গিয়েছে।

মার্কিন জনস্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের মতে, অকাল-নবজাতকের অকাল-মৃত্যুর মোটামুটি কতগুলি কারণ দূর করা সম্ভব হয়েছে—আসন্ন প্রসবী মাতার সেবা শুশ্রূষা, নবজাতকের পরিপুষ্টি এবং ছোয়াচে রোগের প্রতিবেদ প্রভৃতির উন্নততর ব্যবস্থার ফলে।

মার্কিন শিশু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাঃ লেওনা বনগার্টনার সম্প্রতি সমগ্র মার্কিন রাষ্ট্রে অকাল-নবজাতকের মৃত্যুহার কমানোর জন্তে একটা বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে কর্ত্তে অবতীর্ণ হবার আহ্বান প্রচার করেছেন।

যক্ষা রোগীর চিকিৎসার নূতন যন্ত্র আবিষ্কার

লোহার ফুসফুসের কথা অনেকেই শুনেছি। অনেকটা সেই রকমই দেখতে, আরেকটি নূতন হৃদয়-যন্ত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে আমেরিকায়। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ডাঃ বারাচ এই যন্ত্রের উদ্ভাবক।

যক্ষারোগে আক্রান্ত যে সব রোগীর ফুসফুস জন্ম এবং খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেই সব ফুসফুসকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়াই হলো এই যন্ত্রটির কাজ। অল্প কোনও চিকিৎসাতেই যে সব রোগীর কোনও ফল হয়নি, তাদের এই যন্ত্র-ফুসফুসের সাহায্যে বেশ সেরে উঠতে দেখা গিয়েছে।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার কাজ থেকে ফুসফুসটি অবসর নিলেই সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় হৃদয়ের চঞ্চলতা, রক্তের চাপ যায় কমে এবং শরীরে আড্রেনালিন নামক পদার্থটির সংক্ৰমণও হ্রাস পায়। ডাঃ বারাচ বলেন—মাস চারেক এই যন্ত্র চিকিৎসার ফলে হৃদিকাংশ রোগীরই ওজন বাড়তে দেখা গিয়েছে। তাঁর ১৯টি রোগীর মধ্যে ১২টিই বেশ হঠপুট হয়ে উঠেছেন।

একটা মুশ্লিল আছে এই চিকিৎসায়। যন্ত্রটি বড় দুর্ঘূল্য—সাড়ে চার হাজার ডলার এক একটির দাম।

চিকাগোর হাসপাতালে অভিনব অস্ত্রোপচার,

মানুষের শরীরে নূতন কিডনী সংযোগ

শিকাগোর একটি হাসপাতালে একটি স্ত্রীলোকের রোগগ্রস্থ কিডনী অপারেশন করিয়া উহার স্থানে একটি নিরোগ কিডনী জোড়া দিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুস্থ কিডনীটি লওয়া হয় অপর একটি মৃত স্ত্রীলোকের শরীর হইতে। স্ত্রীলোকটি মারা যাইবার ১০ মিনিটের মধ্যে তাহার কিডনীটি তুলিয়া লওয়া হয়। দুই দল চিকিৎসক পাশাপাশি দুইটি ঘরে মৃত ও জীবিত স্ত্রীলোকদ্বয়ের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করেন।

যে মৃত স্ত্রীলোকটির কিডনী তুলিয়া লওয়া হয় তাহার বয়স ও আকৃতি অপর স্ত্রীলোকটিরই অনুরূপ। জীবিতাবস্থায়ই তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য স্বীয় কিডনী দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

যে স্ত্রীলোকটির শরীরে নূতন কিডনী জোড়া লাগান হইয়াছে তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং সুস্থই আছেন। তবে কিডনীটি যথোপযুক্তরূপে কার্য্য করিতেছে কিনা উহা আরও পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

দার্জিলিংএ পাহাড়ী মেয়েদের বাংলা শিক্ষা

দার্জিলিং জিলায় বহু সংখ্যক নেপালী, গুর্খা, লেপচা আদি পাহাড়ী নর-নারী বসবাস করেন। তাঁহারা বাঙ্গালীর সংস্পর্শে প্রায় ১৫০ বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে বাংলা ভাষা জানেন। শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অনেকে বাংলা ভাষা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছেন। বাংলা ও নেপালী ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য খুবই আছে। যদিও নেপালীদের ব্যবহারিক অক্ষর দেবনাগরী বা সংস্কৃত তথাপি উহারা হিন্দী শিখিবার জন্য আগ্রহান্বিত নহে। কয়েক বৎসর গুর্খা লীগের আন্দোলন চলিয়া ছিল দার্জিলিংকে হিমালয় প্রদেশ করা ও নেপালী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

এখন তাহাদের সে মনোরক্তি পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহারা সমৃদ্ধিশালী ও এই প্রদেশের সরকারী ভাষা বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত। এই উদ্দেশ্যে নিখিল

ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি দুই বৎসর দার্জিলিং, কারসিয়াং, মিরিক, টিনটেডীয়া, কালিমপং, মারগারেট হোপ, সোনাদা, এমন কি সিকিমে গ্যাংটকে বাংলা শিখাইবার ক্লাশ খুলিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইহার জন্য সমিতিকে সরকারী গ্র্যান্ট দিয়া থাকেন।

সম্প্রতি সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ দার্জিলিং জিলায় বাংলা ক্লাশ পরিদর্শন ও স্থাপনের জন্য গিয়াছিলেন। এবং ফল দেখিয়া খুব আশান্বিত হইয়াছেন।

অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের দার্জিলিং শাখায় কর্মীদের সাহায্যে লেখক পাহাড়ী মহিলাদের একটি বাংলা শিখিবার ক্লাশ আর্থ সমাজ বালিকা বিদ্যালয়ে স্থাপন করিয়াছিলেন গত এপ্রিল মাসে। এই ক্লাশে শিক্ষা প্রদান করেন নেপালী-বাঙ্গলা ভাষা অভিজ্ঞ শ্রীমতী ঈশানন্দী। কয়েক মাসে ছাত্রী সংখ্যা হইয়াছে ৬২ জন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ৭ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। কয়েক মাসে মেয়েরা প্রথম ভাগ শেষ করিয়াছে। লেখক

পরিদর্শন কালে মেয়েরা বেশ শুদ্ধ উচ্চারণ এবং সঠিক তালমান রাখিয়া সমবেত কর্তে “সংকোচের বিহীনতা” রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া প্রীতি উৎপাদন করে।

মারগ্যারেট হোপ পল্লী স্কুলে লেখকের উপস্থিতির সময় “জনগণ মন” সঙ্গীত ব্যাণ্ড বাজাইয়া গাহিয়া চমৎকৃত করে—অনেকে বাংলা ভাষায় কথা-বাতী কহে। লেখকের চেষ্টায় সরল বাংলা-নেপালী পাঠ নামে দোভাষী পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে পাহাড়ীদের বাংলা শিখিবার সুবিধা হইবে। এই ক্লাশ পরিচালনায় শ্রীমতী পাশাং ডোমালা, শ্রীমতী দেব কুমারী সিং, শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত সহায়তা করিয়া থাকেন।

পরলোকে মায়ী বসু

গত ১৬ই অক্টোবর দার্জিলিং শৈল নগরে শ্রীমতী মায়ী বসু (ডাঃ অজিত মোহন বসুর স্ত্রী) অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলার নারী সমাজের উন্নতির জন্ত কিছু কার্য করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাশাগর বাণী ভবনের ঝাড়গ্রাম শাখা পত্তনের সময় তাঁহার কার্য শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বহু দিন তিনি মাননীয় লেডী অবলা বসুর বিদ্যাশাগর বাণী ভবনের উন্নতির কার্যে সহায়ক ছিলেন।

তিনি দার্জিলিং এ অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সভানেত্রী ছিলেন। ২৬ তারিখে বর্তমান সভানেত্রী বর্ধমানের মহারাণী নুপেন্দ্র নারায়ণ হলে হিজ একসেলেস্টী ডাঃ কাটজুর উপস্থিতিতে বিচিত্রা অনুষ্ঠানের পূর্বে তাঁহার প্রতি অঙ্কাজলি প্রদান করেন। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

চীনা মহিলাদের ভারতীয় স্বামী গ্রহণ প্রীতি

কয়েক বৎসর হইতে মালয় দেশে চীনা নারীর মধ্যে ভারতবাসীকে বিবাহ করিবার আকাজক্ষা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউনাইটেড প্রেসের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের খবরে প্রকাশ পাইয়াছে যে কোলালামপুর অঞ্চলে চীনা মহিলাদের ভারতবাসীকে বিবাহ করিবার খুব ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

যে সব চীনা যুবতী শাস্ত্রীয় ও আইন মতে ভারতবাসীকে বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল জীবন যাপন

করিতেছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন “ভারতীয় পুরুষকে বিবাহ করিয়া তাঁহারা অতি সুখের ও শান্তিময় সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। তাঁহাদের অভিমত ভারতীয় স্বামীগণ তাঁহাদের প্রীতি ও সুখ যেমন প্রদান করে আর কোন দেশের পুরুষ তেমন করিতে পারে না, চীনা রমণীরা নারীর মর্যাদা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব বহনে ভারতবাসী স্বামীর উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করিতে পারে।

এতদিন প্রকাশ হইয়াছে ভারতের নারী বিশ্বের সকল নারী অপেক্ষা স্বামীর অহুরাগী ও সাধবী নারী। এখন ভারতের পুরুষের পত্নী অহুরাগের সংবাদ নিশ্চয় গৌরবের বিষয়। ভারতের দাম্পত্য জীবন পৃথিবীর অগ্রাং যে কোন দেশের বিবাহিত নর-নারীর জীবন অপেক্ষা সুখ-শান্তিময় প্রমাণিত হইলে সুখের হইবে।

কলিকাতায় নারী যাত্রাকর

সম্প্রতি শ্রীমতী উমা দাসগুপ্ত একবিজয়া সম্মিলনের অনুষ্ঠানে চিত্তাকর্ষক যাত্রা বিদ্যায় ও খেলার দ্বারা সকলকে মোহিত ও অভিভূত করিয়াছেন। আমরা সার্কাসে নারীর ক্রীড়া কৌশল, ব্যায়াম, নানা কশরৎ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখন নারীকে যাত্রা বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করিতে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিতেছি। অবশ্য বালো বেদেনীদের দেখিয়াছি আমাদের ও অগ্র গাছের আঁটা পুতিয়া দশ মিনিটের মধ্যে আম, পেয়ারা, আপেল আদি ফল ফলাইয়া থাওয়াইয়া চমৎকৃত করিত।

জলপদ্ম ভাসান উৎসবে মহিলা পরিচালক

বিশাখাপট্টম বন্দরে ভারত স্বাধীন হইবার পর তিনখানি জাহাজ নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন সিক্রিয়া শিপ বিল্ডিং কোম্পানী। তাঁহাদের উদ্যমে যে জাহাজটী প্রথম নির্মিত হইয়াছে তাহাকে জলে ভাসাইবার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি বিশাখাপট্টম বন্দরে সম্পাদিত হয়।

এই জাহাজটির নির্মাণের পরিকল্পনা ও আদেশ শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডঃ শ্রীমাশ্রমাদ মুখার্জির মন্ত্রীকালে হইয়াছিল। এই জাহাজ ৮০০০ টনের এবং ইহার নির্মাণে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, বিদেশী কোম্পানীর কারখানায় নির্মাণ করাইবার ব্যয় হইতে ইহার ব্যয়

২৪ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। তথাপি ইহা গৌরবের কথা।

সিদ্ধিমা শিপ বিল্ডিং কোম্পানীর অগ্রতম ডাইরেক্টর মিসেস্ স্মৃতি শান্তিকুমার মুরারজী এই ভাসান উৎসবের যাবতীয় ক্রীড়া অল্পাধীন করেন। প্রায় দশ হাজার নরনারীর উপস্থিতিতে “জলপদ্ম” জলের উপর সগর্বে ভাসিয়া উঠিল। উৎসবের প্রারম্ভে বরুণ দেবের কৃপা ভিক্ষা করা হয় এক বৈদিক মন্ত্র পাঠ দ্বারা। তৎপর ভারতের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় হরেকৃষ্ণ মহতাব

কুমকুম দিয়া জাহাজের অগ্রভাগে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকিয়া দেন। তখন জাহাজের উপর শান্তি মন্ত্র উচ্চারণের সহিত আতপ চাউল ও পুষ্প বৃষ্টি করা হয়। পুষ্পদ্বারা জলপদ্ম নাম লিখা হয় এবং মহতাব মহাশয় স্বইচ্ছা টিগিয়া দিবামাত্র বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জাহাজখানি দ্রুত অসীম সাগরে অসীমের জয়গানের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ শুভ অল্পাধীনের সহিত এক মহিলা জড়িত থাকায় ভারতের নারী সমাজের গৌরব বর্দ্ধিত হইল।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীমুখ্যাকান্ত দে

কোড়িয়া যুদ্ধের রোজ নাম্চা

১৮ই জুলাই। হংকং—পিকিং গভর্নমেন্ট নিউজ এজেন্সির এক সংবাদে প্রকাশ যে উ-কোড়িয়ার সৈন্যদল ১৭ই জুলাই পরিত্যক্ত সাময়িক রাজধানী তায়েজেন অধিকার করিয়াছে।

দ-কোড়িয়ার রণক্ষেত্র কুম নদীর দক্ষিণে আপাতদৃষ্টিতে সবই শান্ত। মাঝে মাঝে আমেরিকানদের কামান গর্জন শুদ্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

তোকিও—সিউল রেডিওর সংবাদ এই যে, দ-কোড়িয়ার পূর্ব উপকূলে সরবরাহ বন্দর পুসান হইতে ১২ মাইল উত্তরে ইয়াংডক নামক রেল জংসনটি উ-কোড়িয়া সৈন্যদল অধিকার করিয়াছে। তারা ভিতরের দিকে ইয়ার-ইয়ং নামক স্থান অধিকারে গেরিলাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

লণ্ডন (১৭ই জুলাই) রাড্রিতে পিকিং রেডিও প্রচারিত উ-কোড়িয়ার ইস্তাহারে প্রকাশ, কমিউনিষ্ট সৈন্যদল তায়েজেনের ১৯ মাইল উ-পশ্চিমে কংজু নামক স্থান দখল করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা : পশ্চিম

রণক্ষেত্র—যুদ্ধে উ-কোরিয়ানরা ক্ষুণ্ণগতি। সকাল পর্যন্ত তায়েজেন মার্কিনদের হাতে ছিল। মধ্য রণক্ষেত্র—দ-কোড়িয়ার ১ম বাহিনীর বাম দিকের মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত আছে। কমিউনিষ্টরা তায়েজেন হইতে ৫৫ মাইল উ-পশ্চিমে চুংজুর দিকে যাইতেছে। পূর্ব রণক্ষেত্র—পুসানের ৯৫ মাইল উত্তরে পাই-এম-ভ্যাগে জয় লাভের পর উ-কোড়িয়ানরা পাণ্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

কোড়িয়া রণক্ষেত্র (১৭ই জুলাই)—অল্পাধীন সহকারে মার্কিন ৮ম বাহিনীর কোড়িয়াস্থিত কার্যালয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে।

ওয়াশিংটন (১৮ই জুলাই)—মার্কিন রাষ্ট্র দপ্তরের জর্নৈক মুখপাত্র অদ্য রাড্রিতে বলিয়াছেন যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর কোড়িয়ায় শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে মার্কিন গবর্নমেন্টের উত্তর গুতকল্য রাড্রিতে ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ লয় হেগারসনের নিকট পাঠান হইয়াছে।

১৩ই জুলাই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং মার্শাল ষ্ট্যালিন তার যে উত্তর দিয়াছেন,

সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান “টাস” ভা প্রচার করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুর প্রথম পত্র—“মস্কোতে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর সহিত আমাদের দূত যে কথাবাতা বলিয়াছেন, তাতে তিনি কোড়িয়ার সংকট সম্পর্কে ভারতের মতামত বুঝাইয়া বলিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইতেছে এই সংকটকে কোড়িয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা। তজ্জন্ম ঘাতে নিরাপত্তা পরিষদে বর্তমান অচল অবস্থার অবসান হয় এবং প্রজাতান্ত্রিক চীনের সরকারী প্রতিনিধিগণ পরিষদে যোগদান করিতে পারেন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ফিরিয়া আসেন, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থা হইলে পর পরিষদের মধ্যে থাকিয়াই হউক বা পরিষদের বাহিরে বেসরকারী যোগাযোগের দ্বারা হউক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও চীনের প্রতিনিধিগণ অপরাপর শান্তিকামী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় কোড়িয়ার সংগ্রামের অবসান ঘটাইয়া একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারিবে।

‘আপনি যে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও তদ্বারা সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সংহতি রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর সে সম্পর্কে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার নিকট এই আবেদন করিতে সাহসী হইয়াছি। শান্তি ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সংহতির উপরই মনুষ্য সমাজের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। আশা করি, এই কল্যাণের জন্ত আপনি আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়োগ করিবেন। আমার প্রদ্বা গ্রহণ করুন।’

মার্শাল ষ্ট্যালিনের উত্তর : “শান্তির অল্পকূলে আপনার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনি মনে করেন যে, কোড়িয়ার সমস্যাটির সমাধান নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃকই হওয়া উচিত। এই সমাধানের জন্ত পরিষদে প্রধান পাঁচটি রাষ্ট্রের তথা প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আমি আপনার সহিত একমত। আমার মনে হয় যে, কোড়িয়ার সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্ত কোড়িয়ার জন-প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনা উচিত।”

• পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয় পত্র : “আপনি সম্ভবতঃ

সহিত যে উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দিয়াছেন, তার জন্ত আমি অতীব কৃতজ্ঞ। আমি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গবর্ণমেন্টের সহিত যোগস্থাপন করিতেছি। আশা করি, শীঘ্রই পুনরায় আপনাকে বক্তব্য জানাইতে পারিব।”

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “প্রাভদা” প্রথম পৃষ্ঠায় নেহরু-ষ্ট্যালিন পত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছেন (১৮ই জুলাই)।

নয়া দিল্লী (১৮ই জুলাই)—সরকারীভাবে জানান হয় যে, কোড়িয়ার সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্ত পণ্ডিত নেহরু, মার্শাল ষ্ট্যালিন, মিঃ ডিন একিনসন ও মিঃ এটলির মধ্যে পত্র-বিনিময় হইয়াছে। সকল পক্ষের নিকট জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ভারত সরকার প্রকাশ করিবেন না। টাস এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত নেহরু-ষ্ট্যালিন পত্রাবলী ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

লেক সাকসেস (১৭ই জুলাই)—কোড়িয়া যুদ্ধে সামরিক সাহায্যের জন্ত রাষ্ট্রসভ্যের সেক্রেটারি জেনারেল টিগডি লী যে আবেদন করিয়াছিলেন, এ পর্যন্ত ২০টি রাষ্ট্র তার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু সৈন্যদল পাঠাইবার কথা কেহ বলেন নাই।

তোকিও (১৮ই জুলাই)—অদ্য জেনারেল ডাগলাস ম্যাক-আর্থারের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কোড়িয়ার উপকূলবর্তী দরিয়ায় তিনটি অজ্ঞাত পরিচয় সাবমেরিন দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্বারা কোড়িয়ার যুদ্ধে নতুন বিপদের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে।

লণ্ডন (১৮ই জুলাই)—ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, কোড়িয়া সম্পর্কে নীতি পরিবর্তনের অভিপ্রায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নাই। তিনি আরও বলেন যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণা সমর্থনে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। (তুমুল হর্ষধ্বনি)

১৯শে জুলাই।—তোকিও—অদ্য নতুন মার্কিন বাহিনী তাদের কোড়িয়ার পূর্ব উপকূলেস্থিত নতুন সেতুমুখ হইতে কমিউনিষ্টদের তিনটি মারাত্মক রকমের নতুন আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ত অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে। কোড়িয়ার সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধের সংবাদে তিন দিনের স্তব্ধতা ভাঙিয়া গিয়াছে। ঐ তিন দিনের মধ্যে জাহাজ ও

যেমান যোগে মার্কিন সৈন্যগণ প্রথম অবতরণ করে এবং দ-কোড়িয়ার প্রায় পরিত্যক্ত সাময়িক রাজধানী তায়েজেন দূতভার সহিত রক্ষা করিতে থাকে।

গতকাল প্রধান মার্কিন সরবরাহ কেন্দ্র পুমানের ৬৬ মাইল উত্তরে কোয়াং-ডং-এ মার্কিন সৈন্য অবতরণ করে এবং প্রথম সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সেতুমুখে ৫ হাজার মার্কিন সৈন্য আছে এবং আরও নূতন সৈন্য আসিতেছে। বর্তমানে কোড়িয়ার তিনটি মার্কিন ডিভিসন আছে এবং আরও নূতন সৈন্য আসিতেছে। কমিউনিষ্টদের আক্রমণের ফলে তায়েজেন ফেলতেইগু রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

তোকিও (১৯শে জুলাই)—পাই-অংং রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উ-কোড়িয়ান বাহিনী তায়েজেনের ৩০ মাইল পশ্চিমে পায়-ওগ শহর অধিকার করিয়াছে।

তায়াজেনের ৮ মাইল পশ্চিমে উ-কোড়িয়ার গোলন্দাজ বাহিনী সমাবেশ করা হইয়াছে। ৬৮ ঘণ্টা যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া আজ তারা পশ্চিম-রণাঙ্গনে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। কাল পূর্ব উপকূলের পোহাং নামক স্থানে মার্কিন সাঁজোয়া বাহিনী অবতরণ করিয়াছে। নূতন সৈন্য আমদানি করিয়া কোড়িয়ার মার্কিন স্থল বাহিনীর শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উপকূলে সৈন্যাবতরণ কালে প্রতিপক্ষ জানিতে পারে নাই, সেজ্জ্ব কোনও বাধাও দিতে পারে নাই। তায়েজেনের পশ্চিমে নূতন মার্কিন ফৌজ নিযুক্ত করা হইয়াছে। ২৫শ ও ১ম মার্কিন সাঁজোয়া বাহিনীর সৈন্যরা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। তায়েজুতেই মার্কিন সেনা ও সামরিক দ্রব্যাদি আনিয়া সমাবেশ করা হইতেছে। মার্কিন ও অষ্ট্রেলিয়ান বিমান বাহিনী কোড়িয়ার সংগ্রামরত স্থল বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। (জেনারেল ম্যাক-আর্থারের ঘোষণা)।

ওয়াশিংটন (১৯শে জুলাই)—অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিবার জন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে আহ্বান জানাইয়াছেন, কংগ্রেস দ্রুত সাড়া দেয়, এবং তাঁকে বিদেশে কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্ত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে ১২২২৪ কোটি ডলার মূল্যের সামরিক সাহায্য দিবার ক্ষমতা দেয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসকে এই মর্মে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, কোড়িয়ান সংকটে ব্যয়ের জন্ত তাঁর হাতে যেন এক হাজার কোটি ডলার অর্পণ করা হয়,— বাধ্যতামূলক সেনা-সংগ্রহের অব্যাহত ক্ষমতা ও অস্ত্রাদি বিবয়েও যেন তাঁর হাতে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কংগ্রেসের নিকট বাণী পাঠাইয়া তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন, যে সকল আইনের বলে মার্কিন বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, সেগুলি বাতিল করিতে হইবে।

“কেবল কোড়িয়া সমস্যা সমাধানের জন্ত নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট অস্ত্রাদি স্বাধীন রাষ্ট্রকে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে সাহায্যের জন্তও আমেরিকার সৈন্য-শক্তি ও সমরোপকরণ বাড়ান প্রয়োজন। জাতীয় রক্ষা বাহিনীর বা স্থল, নৌ ও বিমান বহরের রিজার্ভ বাহিনীর যত সৈন্য প্রয়োজন হোক না কেন, রণক্ষেত্রে তাদের আহ্বান করার ক্ষমতা আমি দেশরক্ষা-সচিবের হস্তে অর্পণ করিয়াছি।

“নূতন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে আংশিক সমরায়োজনও দরকার। মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং প্রবর্তিত হইবে না। কিন্তু পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং প্রবর্তনে দ্বিধা করা হইবে না।

“বর্ধিত হারে কর নির্ধারণের জন্তও কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইব। সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করার নিয়ম বাতিল করিতে হইবে। আইন মত মার্কিন সৈন্য সংখ্যা নিম্নরূপ : স্থলবাহিনী ৮,৩৭,০০০, নৌবাহিনী ৬,৬৬,৮৮২, বিমান বাহিনী ৫,০২,০০৫ : মোট ২০,০০,৮৮২।” (কংগ্রেসে প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বাণীর সারাংশ)

প্রেসিডেন্ট কোড়িয়ার ঘটনাবলী এবং কেনই বা মার্কিন সৈন্য স্বদেশ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়া সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া বলেন, কোড়িয়া সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট দল অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্ত সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনায় প্রস্তুত রহিয়াছে।

মার্কিন হেডকোয়ার্টার্স (কোড়িয়া) ১৯শে জুলাই—

উ কোড়িয়ার সৈন্যদল পীত সাগর হইতে জাপান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

“(কোড়িয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক হস্তক্ষেপ) পছন্দ করি আর না করি নিরুপায় হইয়া ইহার জন্ত সায়া দিয়া আমাকে ইহা সমর্থন করিতেই হইবে। আমার এই বিষয়ে কোন পছন্দ অপছন্দ নাই বলিয়া আমি ইহা লইয়া মাথা ঘামাই না। (কোড়িয়ার যুদ্ধ বন্ধ করিবার ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াইবার জন্ত পণ্ডিত নেহেরু যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করিতেছেন) আমার সমর্থনের উপর পণ্ডিত নেহেরু নিভরশীল নহেন। আমি তাঁকে সমর্থন করি আর না করি, তাতে কি যায় আসে?... আশা করি, তাঁদের উভয়ের মধ্যেই (নেহেরু ও ষ্ট্যালিন) কোড়িয়া সমস্যার সমাধান হইবে। (কোড়িয়া সমস্যার সমাধান কি ভাবে, হইবে) আমি তার কি জানি? কারও পক্ষে জানারই বা উপায় কি? (আয়াল্যাণ্ড বা ভারতের মত কোড়িয়া বিভক্ত হইবে কি না) একমাত্র ভবিষ্যদ্বক্তা তা বলিতে পারেন। আমি একজন মহাত্মা মাত্র।’ (বার্গাভ’শ)

১২শে জুলাই (নয়া দিল্লী)—১৩ই জুলাই তারিখে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মিঃ ডিন একিসনকে ষ্ট্যালিনকে লিখিত পত্রের অনুরূপ এক পত্র লেখেন। ডিন একিসন ১৮ই জুলাই নিম্নলিখিত জবাব দিয়াছেন।

“প্রিয় প্রধান মন্ত্রী ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মারফৎ আপনার ১৩ই জুলাই তারিখের পত্র পাইয়াছি। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আপনি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছেন, তা খুবই প্রশংসনীয়। মার্শাল ষ্ট্যালিনকে আপনি ১৩ই তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তার উত্তরে মার্শাল ষ্ট্যালিনের পত্রের মর্ম ও আমাকে ১৭ই তারিখে জানান হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও আমি উভয়েই গভীর ভাবে এই সকল পত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছি।

“বিশ্বশান্তি বজায় রাখার সাহায্য করাই মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। অতএব জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা ও উহাকে বজায় রাখার জন্ত যা করা প্রয়োজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা কল্পিতে অত্যন্ত ব্যগ্র।

“কোড়িয়া সম্পর্কে মার্কিন গবর্নমেন্ট ও আমেরিকার জনসাধারণের নীতি হইতেছে, কোড়িয়ায় সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ঐ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্ত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে সমর্থন করা। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তানুযায়ী যুদ্ধ যাতে কোড়িয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া না পড়িতে পারে এবং যাতে ঐ স্থানেই যুদ্ধের অবসান হয়, তার ব্যবস্থা করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য। এই আক্রমণের সহিত যে সকল সমস্যা জড়িত হইয়াছে তার সহিত এবং এই ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সহিত যে বিশ্বের জনসাধারণ ও নিয়মাহুগ গবর্নমেন্ট সমূহের বিশেষ সম্পর্ক আছে তৎসম্বন্ধে আমরা খুবই সচেতন। নিরাপত্তা পরিষদের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যদি সনদ অনুযায়ী তাদের করণীয় কতব্য পালনে ব্যর্থ না হইত, এবং যদি যুদ্ধ বন্ধ করিতে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগে অস্বীকৃত না হইত, তা হইলে অনেক পূর্বে শান্তি স্থাপিত হইত এবং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যারায় যুদ্ধ করিতেছে, তাদের অনেকের জীবন রক্ষা করিতে পারিত। তাঁরা যদি সনদ অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করেন, এবং তাঁদের প্রভাব প্রয়োগ করেন, তবে আগামী কল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। শান্তিভঙ্গ অথবা আক্রমণকে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গুরুতর সমস্যা বলিয়া মনে করেন। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে বর্তমানে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে, তার সমাধানের উপর উ-কোড়িয়ার অভিযানের অবসান নিভর করে বলিয়া আমরা মনে করি না।

“জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কাজে সোভিয়েট ইউনিয়ানের যোগদানে কখনই কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। উহার পক্ষে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তা সোভিয়েট গবর্নমেন্টের সিদ্ধান্তের জন্তই হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বজায় রাখার জন্ত তার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

“আমাদের অভিমত এই যে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আসন সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি গবর্নমেন্টের দাবী সম্বন্ধে ঐ প্রতিষ্ঠান যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তা দাবীর গুণাগুণ বিবেচনা করিয়াই করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে বিরাট মতভেদ

ভয়ে ভীত হইয়া যে কোন
চত নহে, ইহা আপনি স্বীকার
জানি। আমি ইহাও জানি যে,
তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করুক
চান না।

জানি যে, আপনি নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব
যা কোড়িয়ায় শীঘ্র শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদেরই
আগ্রহসম্পন্ন। আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি
তছি যে, পৃথিবী হইতে আক্রমণের আশঙ্কা চিরতরে
করিবার জন্ত আমরা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আপনার
টি দেশের সহিত একযোগে কাজ করিতে অত্যন্ত
গ্রী।

পণ্ডিত নেহেরুর উত্তর : “প্রিয় রাষ্ট্রসচিব, আপনার
দূতের হাতে প্রাপ্ত আপনার পত্রের জন্ত ধন্যবাদ
নাইতেছি”।

“১৩ই জুলাই তারিখে আমি যে পত্র দিয়াছিলাম, তা
বচনা করার জন্ত আমি আপনার ও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের
টি কৃতজ্ঞ। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার সাহায্য করাই
কণ যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রতম উদ্দেশ্য, ইহা আমি স্বীকার করি
মার্কিন গবর্ণমেন্ট রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকেই আন্তর্জাতিক
স্ত ও নিরাপত্তা বজায় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পক্ষে
মাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন, ইহাও
মি বুঝি। আপনি নিশ্চয় জানেন, শান্তি বজায় রাখা
রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে সমর্থনই ভারত গবর্ণমেন্টের নীতি।

“ঐ নীতি অল্পস্বল্পেই নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান
ন অবস্থার সমাধান করলে আমি প্রজাতন্ত্রী চীনের
তিনিধি গ্রহণের এবং সোভিয়েট রুশিয়া যাতে নিরাপত্তা

পরিষদে পুনরায় যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করার
প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আক্রমণ প্রতিরোধে রাষ্ট্রপুঞ্জ
প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই আমরা ২৫শে ও
২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদে কোড়িয়া প্রস্তাবের অন্তর্কুলে
ভোট দিয়াছিলাম। ১৯৪৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে
ভারত গবর্ণমেন্ট প্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকার করিয়া লওয়ার
পর হইতে আমরা প্রজাতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের
বিভিন্ন কমিটিতে গ্রহণের জন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।
আমাদের বর্তমান প্রস্তাবে সেই চেষ্টাই পুনরায় করা
হইয়াছে।

“সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং উহার দ্বারা
কোড়িয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষে উপযুক্ত
অবস্থার সৃষ্টি হইবে এই আশা করিয়াই ঐ প্রস্তাব করা
হইয়াছিল।

“আমি মনোস্থ আমাদের দূতকে আপনার পত্র এবং
আমি আপনার পত্রের যে উত্তর দিয়াছি তা মার্শাল
ষ্ট্যালিনকে জানানোর জন্ত অগ্ররোধ করিয়াছি। এই দুইটি
পত্রের অনুলিপি ১৬ই জুলাই তারিখে আপনার নিকট এবং
মার্শাল ষ্ট্যালিনের নিকট লিখিত আমার পত্র এবং ১৫ই ও
১৬ই জুলাই মার্শাল ষ্ট্যালিন ও আমার মধ্যে পত্র বিনিময়
হয় তার অনুলিপি আগামী কল্যা প্রকাশের ব্যবস্থা করা
হইয়াছে।

মার্শাল ষ্ট্যালিনের নিকট প্রধান মন্ত্রীর পত্র : “মার্কিন
রাষ্ট্রসচিবের নিকট আমি ১৮ই জুলাই যে পত্র লিখিয়া-
ছিলাম তার উত্তর এবং আজ আমি তার যে উত্তর দিয়াছি
তা আপনার নিকট পাঠাইতেছি।...”

সরোজনলিনী নারীমঞ্চল সমিতি

বাদবপুর মহিলা শিল্প সমিতি

(বাদবপুর কলোনি)

এবার বাদবপুর মহিলা শিল্প সমিতির “বিজ্ঞান সম্মিলনী” উপলক্ষে ১লা ও ২রা নভেম্বর ছাত্রীদের হাতের কাজের এক বিরাট প্রদর্শনী ও মেলা হয়। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না শীল উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা সর্বদা সুন্দর ও আনন্দদায়ক হয়। ছাত্রীরা, সভাগণ ও জন সাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্ধন করেন। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া সমিতিতে উৎসাহিত ও সহানুভূতি দান করেন। ২ বৎসরের মধ্যে বাদবপুর মহিলা সমিতি যথেষ্ট উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও শ্রীমণ্ডিত ও উন্নতি লাভ করিবে।

সমিতিতে তৈরী হাতের কাজ প্রত্যেকে প্রশংসার সহিত ক্রয় করিয়াছেন মেয়েরা নিজেদের হাতে চিনাবাদাম ভাজা, মোয়া, ঘুগুনী, চা, ডালমুট, গজা সন্দেশ, নাড়ু ইত্যাদি তৈরী করিয়া মেলায় বিক্রী করিয়াছেন।

হাওড়া মহিলা সমিতির বার্ষিক বিবরণী (১৯৪৯)

১৯৪৬ সনের ১লা জানুয়ারী এই সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থাপিত হইবার পর প্রথম ৬ মাস কাজ ভালই চলিতেছিল এবং সপ্তাহে দুইদিন করিয়া একটি শিল্পশিক্ষা শ্রেণীও খোলা হয়, তারপর ১৬ই আগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ত সমিতি প্রায় ৯ বৎসর বন্ধ থাকে। ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী হইতে মুষ্টিমেয় সভ্য সংখ্যা লইয়া পুনরায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং ইহার পর হইতে সভ্যাগণের সম্মিলিত চেষ্টায় ও কেন্দ্র সমিতির সাহায্যে ও উৎসাহে সমিতি দিন ২ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

সমিতির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ইন্সটিটিউটের গৃহে ১৯৪৮ সনের এপ্রিল হইতে একটি সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগ পরিচালিত হইতেছে। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে স্থানীয়

বালিকাগণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সমিতি না থাকার দরুন শিল্পশিক্ষা বিভাগ ১৯৪৮ সনে পারা যায় নাট, তবে এই শ্রেণীর অভাব একান্ত হওয়ায় '৪৮ সনের ডিসেম্বর হইতে সম্পাদিকার গৃহে সাত মাত্র দুইদিন করিয়া একটি শিল্পশিক্ষা শ্রেণী খোলা এই শ্রেণী খোলা হইবার পর হইতেই সভ্যসংখ্যা বাড়িতে থাকে, বর্তমানে সভ্যসংখ্যা প্রায় ৪৫। আরো বেশী হইলে তবে রেল বদলী ইত্যাদির জন্ত প্রায়ই সংখ্যা কমে বাড়ে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে ও তদানীন্তন ডিভিসা সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত জে. এন. দাসের অল্পগ্রহে সমিতি জুন '৪৯ সনে নিজ গৃহ প্রাপ্ত হয়। এই মা শিক্ষয়িত্রীর বেতন বাবদ S. B. Fund হইতে ৭০ টাকা বার্ষিক গ্র্যান্ট পাওয়া যায় এবং স্থির হইয়া গৃহ পাওয়া গেলে প্রত্যহ শিল্প শিক্ষা শ্রেণীর অধিবেশন হইবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ২৯শে মে তারিখে সমিতি আসিবার কালে বাস এ্যাক্সিডেন্ট শিক্ষয়িত্রীর হাত ভা যাওয়ায় তাঁহাকে ১ মাসের পুরা ও ১ মাসের অর্ধ বেতনে ছুটি দিতে সমিতি বাধ্য হয়। ঐ কারণে মাসে কোনো শিল্প শ্রেণীর অধিবেশন হয়নাই। পরে জুন মাস হইতে অস্থায়ী ভাবে শ্রীযুক্তা পাকুল দেকে নি করা হয় এবং পূর্ববৎ সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ক্লাশ হইতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী অমিয়া পাল পুনর্বার কার্যে যোগদান করেন, কিন্তু চিকিৎসকের বারণ থা সপ্তাহে দুইদিনের বেশী ক্লাশ করা হয় না। নবে মাসে তিনি সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হন ও ঐমাস হইতে (রবিবার ব্যতীত) শিল্প শিক্ষা শ্রেণীর অধিবেশন হইতেছে। এই প্রকার নানা কারণের জন্ত বৎসরে মাত্র ৫ জন ছাত্রী জুনিয়ার ট্রেনিং কোর্স প দিতে পারিয়াছে। আগামী বৎসর প্রত্যহ ক্লাশ আশা করা যায় অধিক সংখ্যক ছাত্রী পরীক্ষা পারিবে। বর্তমানে প্রায় ৪০ জন ছাত্রী শিক্ষা

তছে। সমিতির সভ্যাগণ নিজ নিজ গৃহে যে কার্য
রা থাকেন তাহার মূল্য প্রায় মাসিক ২০।২৫ টাকা
তাহার বেশী হইয়া থাকে। ২।৩ জন বিধবা মহিলাকে
তিতে স্বাবলম্বী হইবার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

৪। গত ৩ বৎসর হইতে সমিতির সভ্যাগণ “রবীন্দ্র
উৎসব” অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। এবৎসর তাঁহারা
র বিখ্যাত নাটক “চিত্রাঙ্গদা” সাফল্যের সহিত
নয় করেন। ঐ উৎসবে অদ্বৈত শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
শয় ও শ্রীমতী সুবোধ বালা ঘোষ যোগদান করেন
প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত ভক্তমহোদয় ও মহিলাগণকে
লা সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার বিষয় বুঝাইয়া
ন। তাঁহাদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া তদানীন্তন
ডাঃ ডি, এস শ্রী জে, এন দাস মহাশয়, ই, আই,
ন আরো সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিতে
তরত হন। তাঁহার ও শ্রীমতী ঘোষের সমবেত চেষ্টায়
নান, ব্যাণ্ডেল ও সাহেবগঞ্জে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত

২। Welfare Department এর তত্ত্বাবধানে
র নানা জায়গায় মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান
। হাওড়া মহিলা সমিতির চেষ্টায় হাওড়ায় এরূপ

একটি প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হইয়াছে তথায় সপ্তাহে
দুইদিন করিয়া মহিলা ও শিশুগণের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান
হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত ঔষধ ইত্যাদি বিনা মূল্যে
সরবরাহ করা হয়। সমিতির তরফ হইতে দুইজন সভ্যা
এই সমিতির কমিটিতে আছেন।

৩। সমিতির নিজ তহবিল হইতে স্থানীয় একটি
শিশু বিদ্যালয়ে এককালীন ২৫ টাকা দেওয়া হয়।

৪। ‘স্বাধীনতা’ দিবস উপলক্ষে সমিতির গৃহে
বৃক্ষরোপন উৎসব হয় ও কিছু কলা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি
বৃক্ষ রোপিত হয়। এই উপলক্ষে শিশুগণকে মিষ্টান্ন
ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

সমিতির সভ্যাগণের একান্ত ইচ্ছা যে এখানে একটি
শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, এজন্য এই সুযোগে আমরা
প্রত্যেক শাখা সমিতিতে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা
সংবাদ পাইলে এই প্রদর্শনীতে, নিজ ২ সমিতিতে প্রস্তুত
শিল্পদ্রব্য পাঠাইয়া ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে সাহায্য
করেন।

গত বৎসরের সমিতির মোট আয় ১৯৩০৬৮—মোট
ব্যয় ১২৫৩৬৮

সম্পাদিকা—শ্রীআশালতা দাস

বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ

সমিতির পৃষ্ঠপোষক, আজীবন ও সাধারণ সভ্য, মহিলা সমিতির
সম্পাদিকা ও সকল সভ্যাগণ, বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক, গ্রাহিকা ও বিজ্ঞাপন
দাতাগণ আমাদের বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

কবি তরু দত্ত

ও

ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য

শ্রীঅনীতা বসু বি-এ,

নদীর স্রোত চলতে চলতে তার উৎসমুখ থেকে দূরে এসে অনেক সময় হয়ে পড়ে ক্ষীণকারী,—বন্ধ-জলরাশির সমান। তখন তার মুক্তি আনে কে? মুক্তি আনে অল্প খাতে বয়ে আসা নূতন কোন জল রাশি। সে যদি তার বিপুল বেগ আর প্রেরণায় মুখর জলরাশি নিয়ে এসে নবজীবনের উন্মেষ করাতে পারে ঐ বন্ধ জলরাশিতে তবে সেই ক্ষীণাঙ্গীই আর একদিন হয়ে ওঠে বর্ষার স্রোতস্বতীর মত। ঠিক এমনি ধারাই হয়েছিল আমাদের দেশের সাহিত্য স্রোতস্বতীর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এসে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূল উৎস শাক্ত ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রেরণা মাল্লবের মনে আর জাগাচ্ছিল না সেই আন্তরিকতা,—যার প্রাণময় শক্তিতে জয়দেব লিখেছিলেন তাঁর গীতগোবিন্দ, কবিকঙ্কণ লিখেছিলেন তাঁর চণ্ডীমঙ্গল, মিথিলার কবি 'বিদ্যাপতি' আর নানুরের কবি চণ্ডীদাস অন্তরের মধ্যে অনুভব করেছিলেন রাধার বিরহ ও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন কামনা এবং যার তীব্র আবেগে দর্শনের কঠিন তত্ত্ব ও রূপক রাধা হয়ে উঠেছিলেন প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব কাব্যের নাটিকা।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটা যুগশেষের সূচনা বুঝা যায় কারণ

ভারতচন্দ্রই ছিলেন প্রাচীন যুগের কবিগোষ্ঠির শেষ স্বতন্ত্র উত্তরাধিকারী তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে যুগশেষের সূচনা হয় তার পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে দ্বৈতচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। নদীর তুলনা দিয়ে আমি মধ্যবর্তী সময়টির কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। এবং দেখি বাংলা সাহিত্য নূতন দিকে বাক নিচ্ছে। নূতন পথে বয়ে যাওয়ার শক্তি সাহস আর প্রেরণা পশ্চিম দিক থেকে। ইয়োরোপের শিক্ষা কুপ্তি আমায় কাছে বহন করে নিয়ে এল নূতন জগৎ নূতন সৃষ্টি। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনা, লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও রামমোহন চেষ্টায় এদেশের লোকদের ইংরাজী সাহিত্য পাঠ ও ইং ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি কয়েকটা ঘটনা বাংলা দেশের, তথা ভারতের কুপ্তির ইতিহাসে নূতন যুগ সূচনা করে। রামমোহনের এই ইংরাজী প্রীতি তখন অনেকেই ইং ভাষা চোখে দেখেন নি, কিন্তু আজ আমরা সাহিত্য চিন্তায় মনীষার বাঙালীর তথা ভারতীয়ের যে দেখতে পাই তা এই ব্যবস্থার ফলে সম্ভব হওয়া সাময়িকভাবে তদ্রূপ জাতি নূতন সূর্যের আলোয় জীবনে জাগ্রত হল। শুধু ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষা দ্বারা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠেই যে এমনটা হ

।। জিরোজিও রিচার্ডসন প্রভৃতি দরদী শিক্ষকগণ বাবে বাঙালীর মনে জ্ঞানস্পৃহা অল্পসন্ধিস্থা ও কর্মক্ষমতা তৈরি করে দিয়েছিলেন তার ফলে গড়ে উঠেছিল ন বাংলা। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কলেজে ও কলেজের বাইরে এসে সমিতি করে ও নানারকমভাবে দেশের উন্নয়নসাধনায় বিনয়িত আনলো। এইভাবে আমরা পেলাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু সেনু ইত্যাদি বহু গুণীকে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখলাম একদল সাহিত্যিক দেশী ভাষার ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেদ করে নিজের চিন্তাধারা উন্নততর মান সমাজে বিস্তৃত করে দেবার প্রয়াস করছেন। মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গানের দত্ত পরিবারের রমেশচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দ দত্ত ও অরুণ দত্ত, মনোমোহন ঘোষ ইত্যাদি অনেকেই দেশী এবং বিদেশী ভাষায় লিখিত একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

অরুণ দত্ত ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের কন্যা। গানের এই দত্ত পরিবার শিক্ষা, দীক্ষায়, সাহিত্যে আধুনিকতায় তখনকার দিনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। এই পরিবারের রমেশচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দ দত্ত অরুণ প্রভৃতি আরও অনেকে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ত থেকে Dutt family 'Album' নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

অনেকে হয়ত মনে করেন বাঙালীর এই বিদেশী সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা কি? এইভাবে লিখে গান বাঙালী শ্রেষ্ঠ ও সার্থক সাহিত্য রচনা করতে পারেন? এর চেয়ে নিজের ভাষায় লিখলে হয়ত ভাল মত অনেকেই চিরস্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন,—এর উত্তরে কয়েকটা কথা বলা চলে। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মনে কোন অলীক স্বপ্ন বা ছুরাশা ছিল? ইংরাজী ভাষায় লিখে তাঁরা যে শৈলী কীটসের মতো আসন পাবার ছুরাকাজ্জা করেছিলেন তা নয়। ভাষা ও সাহিত্য তাঁদের মনকে এতখানি অধিকার করেছিল যে ভাষা সম্বন্ধে কোন রকম গোঁড়ামী মনে আসত না এবং প্রকাশের ছুরাকার বাসনায় হয়ত তাঁরা

চেয়েছিলেন বৃহত্তর ও বিদগ্ধ পাঠক গোষ্ঠী। এই দুই কারণে তাঁরা তাদের মনের আবেগ ঢেলে দিয়েছিলেন ইংরাজী ভাষার মধ্যে। ইংরাজী শিক্ষিত জনসমাজের সঙ্গে ও বিদগ্ধ ইংরাজ সমাজের সঙ্গে হয়ত ভাবের আদান প্রদান তাঁরা তখন করতে চেয়েছিলেন। মনের ইচ্ছা যাই হোক, এ বিষয়ে যে কয়জন কৃতিত্বলাভ করেছিলেন তাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম মনে পড়ে তরুণী কবি তরু দত্তের কথা। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই তরুণী কবির জন্ম হয়। বাবা গোবিন্দ দত্ত ছিলেন শিক্ষিত ও উদার মতাবলম্বী, মা ক্ষেত্রমণিও ছিলেন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহশীল। গোবিন্দ দত্তের মধ্যেও যে কবি-প্রতিভা ছিল একথা আগে বলেছি। 'The Loyal Hour' 'Cherry Stones' নামে তাঁর লেখা দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল। এই রকম শিক্ষিত পরিবারে ও শিক্ষিত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হাওয়ার ফলে অতি কিশোর বয়সেই তরুর মধ্যে কাব্য-প্রতিভার স্ফূরণ হয়। তরুর কৈশোর কাল কেটেছিল পিতামাতার সঙ্গে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইটালীর সৌন্দর্য্যপূর্ণ অভিনব আবেষ্টনীতে। বিদেশে চার বৎসর শিক্ষা পাওয়ার ফলে মাত্র সতের বৎসর বয়সেই তরু ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এমন স্বন্দর করে শিখলেন এবং কৈশোরের সমস্ত দরদ দিয়ে তাকে গ্রহণ করলেন যে ১৮৭৩ সালে দেশে ফিরে আসার পর ফরাসী সাহিত্য আর ইংরাজী সাহিত্যকে কেন্দ্র করে তরু স্বরূপ করলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবন। এর ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেরোল তাঁর প্রথম কবিতার বই,—'A sheaf Gleaned in French Fields'. এটি তরুর মৌলিক কবিতা রচনা নয়। বহু ফরাসী কবিতার স্বন্দর স্থললিত ইংরাজী অমূল্যবাদ। এই বইএর ভূমিকা লিখতে গিয়ে এডমণ্ড গস্ লিখেছিলেন, "If modern French Literature were entirely lost, it might not be found impossible to reconstruct a great number of poems from this Indian version." ১৯২০ বছরের একটা বাঙালী মেয়ের কাছে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা যেন একেবারে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

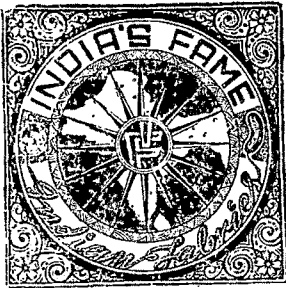
বলে মনে হয়। বিলাতের Saturday Review কাগজ লিখেছিলেন যে যদি জর্জ স্যাণ্ড কিম্বা জর্জ এলিয়টকে মাত্র ২১ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত তবে তাঁরা তরুর মত প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও প্রমাণ কিছুতেই রেখে যেতে পারতেন না। যে রকম সুন্দর, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দভাবে ইংরাজী অনুবাদ করে গেছেন তরু তাতে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। বারে বারে মনে প্রশ্ন জাগে, এই কি একটা ২০।২১ বছরের বাঙালী মেয়ের সৃষ্টি? দুটি বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের মর্মোদ্ঘাটন করতে না পারলে কি এমনটা সম্ভব হয়?

শুধু অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যেই তরুর প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিলনা। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় দুটি উপন্যাস, মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ, বহু স্বরচিত কবিতা, —এই ছিল তরুর স্বল্পায়ু জীবনের সৃষ্টি!

ইঙ্গ ভারতীয় কবিতায় তরু একটা নতুন স্বর এনেছিলেন। সে স্বর ভারতের মর্ম ও ধর্মকে বিদেশী ভাষার মধ্যে রূপায়িত করেছিল। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরাজীতে যে কবিতা লিখতেন তা ছিল অনেকটা বিদেশী ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁদের যে দখল হয়েছে সেটার প্রকাশ বিশেষ। কিন্তু সর্ব প্রথম তরু আনলেন ইংরাজী ভাষার কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় প্রাণ ভারতীয় সংস্কৃতি। মধুসূদনের Captive Lady'র বিষয়বস্তু অবশ্য ছিল ভারতীয় কিন্তু যেভাবে সেটাকে রূপায়িত করা হয়েছিল তাতে বিদেশী ধারা অনুসরণ ছিল বহুল পরিমাণে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রমেশ দত্ত, মনোহন ঘোষ ইত্যাদির সঙ্গে, তরুর তফাৎ এইখানে—তরুর বৈশিষ্ট্য এইখানে। শিশুকালে মায়ের কাছে শোনা পুরাণের গল্প, সাবিত্রী সত্যবান ধ্রুব, প্রহ্লাদ, এই সব চরিত্র তরুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাই ইংরাজী ভাষার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠলো ধর্মপ্রাণ

ভারতের মর্মবাণী। এই সব গাথা কবিতার সাবিত্রী-সত্যবান, সীতা ও ধ্রুবের কাহিনী এত সুন্দর বলেছিলেন তরু যে পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। তরুর মনে পরে এডমণ্ড গস্‌এর ভূমিকা সহ Ancient Ballads and Hinduism নামে তরুর যে কবিতার বইটা প্রকৃত হয় তার মধ্যে প্রায় সবই গাথা ধরনের objective রূপে আছে। তরুর "Our Casurina Tree" নামে কবিতার সুন্দর ভাব সঙ্গীত ও ভাষার জগৎ বিখ্যাত। কবিতাগুলি পড়লে দেখা যায় কবি যুক্তি, তর্ক আর সব কিছুকে অতিক্রম করে পুরাণের গল্পগুলিকে কি সহজভাবে এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বলে গেছেন। সাবিত্রীর সঙ্গে যমের কথোপকথন, দশরথের প্রতিমূর্তির তিরস্কার ইত্যাদি সমস্তগুলিই খুব চমৎকার বর্ণনা করেছেন। গল্প বর্ণনা করতে করতে বোঝে তরু চলে যেতেন সেই কালে সেই আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠত ধর্মগ্রন্থের পরিচয় ও সরলতা। ছন্দের উপরও তরুর সুন্দর দখল তাঁর কবিতার মিলগুলিও সুন্দর হত। তরুর কবিতা কিছু কিছু শোনানরু ইচ্ছা থাকলেও স্থানান্তরে সম্ভব হল না।

এইভাবে ইঙ্গ-ভারতীয় কবিতায় তরুর Indianism এর স্বর আনলেন পরবর্তী কালে তাকে সম্পূর্ণ কবিতা দায়িত্ব নিলেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু। শ্রীযুক্তা নাইডু পর তিনখানি কবিতার বইতে ভারতের জীবন, ভারতীয় সৌন্দর্য ভারতের ধর্ম, —এক কথায় ভারতের সমগ্র কবিতার রেখায় রেখায়িত করলেন। কবি তরুর জীবনের স্মরণীয় কাব্য সৃষ্টিতে আমরা গৌরব বোধ আনন্দ বোধ করি আজকের ইঙ্গ-ভারতীয় যে পাঠ্য দেখতে পাই এটিকে একান্তভাবে তরুর দান বলে গণ্য না করলেও তিনি-ই যে ছিলেন প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
• BHOWANIPUR :: CALCUTTA •